

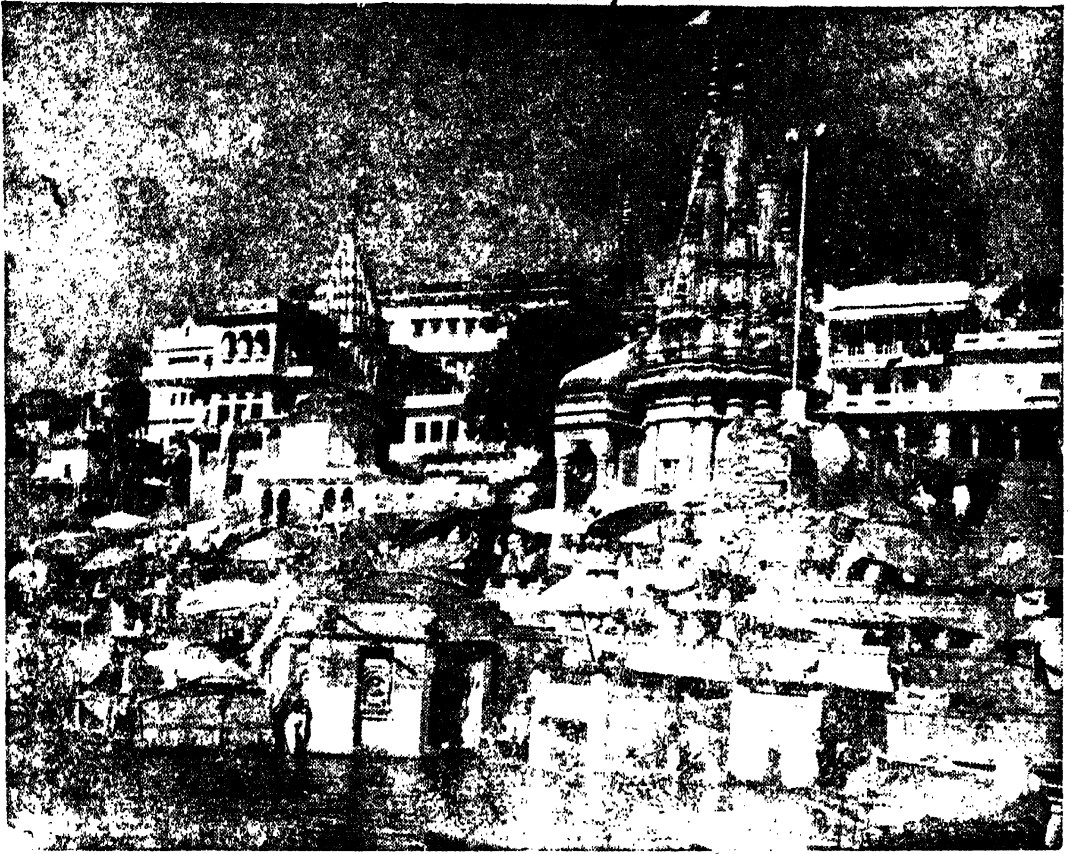
শ্রীমদা আনন্দমাজার পত্রিকা

মহালিঙ্গা



অকাল বোধন

মা আসিতেছেন। বঙ্গের অগনতলে মায়ের বোধন-শব্দ বাজিয়া উঠিয়াছে; বঙ্গব্যাপী অন্ধকারে মঙ্গলদীপের আলো জ্বলিয়াছে। বাঙালীর এ বোধন অকাল-বোধন। বাঙালী মাকে শয্যে সুখের দিনেই চাহে নাই, দুর্দিনে সে দুর্দিনতলনী দুর্গা বলিয়া ডাকিয়াছে। বাঙালী কালের হিসাবে মাকে ভাবে নাই; কালের বিচার বিস্মৃত হইয়া কলা-কাষ্ঠাদিরূপে যিনি পরিণাম প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জননীস্বরূপে বরণ করিয়া নিজের ঘরে আনিয়াছে। দুঃখরূপে দর্পণে বাঙালী মায়ের ঈশৎ-সহাস ও অমল আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং জননীর খজপ্রভানিকর-বিস্মরণ ও শলাগুকান্তিনিবহ আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করিয়াছে। সে রূপ দেখিয়া বাঙালী মাতিয়াছে এবং মায়ের চরণে একান্তভাবে আত্মনিবেদনের জন্য অকল হইয়াছে। বাঙালার আজ বড় দুর্দিন; দুঃস্বপ্ন এ অকাল; কিন্তু এ দুর্দিনে অতি ঘোর এই অকালেই বাঙালী মায়ের অকাল-বোধনের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভব করিতেছে; নহিলে বাঙালীর মাতৃপজার বিশিষ্টতা থাকে না। যে জাতির প্রাণশক্তি আছে, পরিপাক্ষিক প্রতিফল অবস্থার চাপেও সে তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা পরিচায়িত করিতে পারে না; বাহ্য বিচারকে গোণ করিয়া তাহার অন্তঃপ্রকৃতি একান্তভাবে কর্ম-ভ্রমে তাহাকে প্রণোদিত করে। বাঙালীর মাতৃপজার এই প্রবৃত্তি তাহার অন্তঃপ্রবৃত্তিতে পবিত্রীকৃত এবং সেই অন্তঃপ্রবৃত্তির আকর্ষণে বাঙালীর প্রাণে প্রাণে এই দুর্দিনেও মায়ের অশ্রুসিক্ত আহবান বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মাতৃপজা ছাড়িতে পারিবে না; সে আজ আত্মশক্তিতে দৃঢ় হইয়া দেবীর অকালবোধনে প্রবৃত্ত হইবে। মহাশক্তিধরপিশী জননীর প্রেরণায় বর্তমান বিশ্বব্যাপী আনন্দিক অত্যাচার এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার জন্য সে অকলভয়ে অগ্রসর হইবে। বাঙালার মহামশানেই আজ সে আনন্দময়ী জননীর উদ্বেগন করিবে। শক্তির পথে এ সাধনা, বীর্যের পথে এ সাধনা। এ সাধনা দুষ্কর, কঠোর এবং নিদারুণ। প্রতিপদে প্রেতের নিভীষিকা ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে; কিন্তু দুর্দিনতলনী দুঃখহারিণী জননীর সন্তানদল মাতৃগায়ী সংকল্প হইতে বিচলিত হইবে না। তাহাদের ভৈরব সাধনার দৃষ্ট জ্যোতিতে দিগমন্ডলে পরিব্যাপ্ত দীর্ঘোপের মেঘজাল খণ্ড খণ্ড হইবে এবং শরভের অরুণ-লোখা আকাশের কোলে দেখা দিবে। সেই শারদ-প্রভাতে বঙ্গের সূর্যকরোজ্জ্বল অগনতলে মা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইবেন। মাতৃপজার শূভলক্ষ্য এই আশ্বাসই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।



সমাজতত্ত্ব ও শাস্ত্র

আধুনিক বিজ্ঞান মানব জাতির সর্বপ্রকার ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ভারতের অগণিত লোক যে দুঃখ-দায়িত্বের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে—তাহা সুস্থপণ্ট কিন্তু একমাত্র আর্থিক সুব্যবস্থা দ্বারাই সুখ-শান্তি আনয়ন করা যাইবে না।

আমাদের সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠের শাস্ত্রভাণ্ডারে যে জ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা শত শত বৎসর পূর্বে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতা হইতে সুচিন্তিত প্রণালীতে সমাধান করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতে ও বটনে আজ ভারতে চাই আধুনিক বিজ্ঞানের কলা-কৌশলের সুযোগ-সুবিধার সহিত এই জ্ঞানের সংমিশ্রণ।

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিড়লা ব্রাদার্সের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—এই দুইটির অর্থিক পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল ও ভারতের শাস্ত্রজ্ঞান ধারার অপূর্ব সমন্বয় দ্বারা।

বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড

৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ম্যানোজিং এজেন্টস্ :-

কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ • জীয়াজীরাও কটন মিলস্ লিঃ • বিড়লা কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ • সার্ভিলেজ কটন মিলস্ লিঃ • ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্ লিঃ • বিড়লা জুট ম্যান ফ্যাক্টারিং কোং লিঃ • ইন্ডিয়ান শীপিং কোং লিঃ • হিন্দুস্থান মোটরস্ লিঃ • হিন্দু স ইকোলস্ লিঃ • টেলিটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিঃ • প্রিমিয়ার টেলস্ সাপ্লাইং কোং লিঃ • ইন্ডিয়ান প্লাস্টিকস্ লিঃ • হিন্দু গ্যাস্ কোং লিঃ।

কটন এজেন্টস্ লিঃ—এইগুলির ম্যানোজিং এজেন্টস্ :-

আপার গ্যাজেট্ স্গার মিলস্ লিঃ • ভারত স্গার মিলস্ লিঃ • নিউ ইন্ডিয়া স্গার মিলস্ লিঃ • নিউ স্বদেশী স্গার মিলস্ লিঃ • আউথ স্গার মিলস্ লিঃ • বিড়লা ল্যাবরেটরিজ প্রোপ্রাইটস্ :- আপার গ্যাজেট্ স্গার মিলস্ লিঃ।

ইন্সুরেন্স—

নিউ এশিয়াটিক ইন্সুরেন্স কোং লিঃ
মদ্রাসী জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ



ধম্মপদ

বুধীভূতান্থ চাম্পুর
— কর্তৃক আবৃত্তিত

যমকবঙ্গগো

মনোপদুসংগমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া।
মনসা চ পদট্টেন ভাসতি বা বরোতি বা।
ততো ন দুঃখমশ্বেতি চক্ষঃ ব দহতো পদং॥১॥

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে,
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভনে
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্রে যথা গোরুর পিছনে।

মনোপদুসংগমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া।
মনসা চে পসরেন ভাসতি বা বরোতি বা।
ততো নঃ সুখমশ্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥ ২ ॥

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে,
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভনে,
সুখ তার পাছে ফিরে, ছায়া যথা কায়ার পিছনে।

অক্লোচ্চি মং অরীশি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনবৃত্তান্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩ ॥

আমারে রুঁষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল,
একথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলি বাড়িল॥

অজ্ঞানি মং অর্থাৎ মং অজ্ঞানি মং অহাসি মং।
যে তৎসং উপবাহন্তি বেরং তৎসংস্মৃতি ॥ ১০ ॥

আমারে রুখিল, আমারে মারিল,
আমারে জ্বিনিল, আমার কাড়িল,
একথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল ॥

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীষ কৃদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধহেমা সনন্তনো ॥ ৫ ॥

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্ম কয়।

পরে চ ন বিজ্ঞানন্তি ময়মেষ যমামসে
যে চ তৎসং বিজ্ঞানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা ॥ ৬ ॥

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে।

সুভান্দুপস্মিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং।
ভোজনেমহি চামন্তঃপ্রঃ কুশীতং হীনবীরিয়ং।
অং বে পসহতী মারো বাতো রুদ্রং ব দ্বন্দ্বং ॥ ৭ ॥

শরীরের শোভা খোঁজে, ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত
ভোজনে রাখে না মাত্রা, বীর্যহীন, অলস সতত,
ঝড়ে বথা বৃক্ষ হানে, 'মার' তারে মারে সেই মত।

অসুভান্দুপস্মিং বিহরন্তম্ ইন্দ্রিয়েসু সুসংবৃতং।
ভোজনেমহি চ মন্তঃপ্রঃ সন্ধ্যং আরম্ভবীরিয়ং।
অং বে নপসহতী মারো বাতো সেলং ব পশ্বতং ॥ ৮ ॥

অঙ্গশোভা নাহে খোঁজে, ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত
ভোজনের মাত্রা বোঝে, শ্রদ্ধাবান কর্মঠ নিরত
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মত।

অনাক্সাবো কাসাবং যো বখং পরিদহেস্মতি।
অপেতো দমসচেন ন সো কাসাবমরহতি ॥ ৯ ॥

দমহীন সত্যহীন অন্তরে কামনা
গেরুয়া কাপড় তার শূন্য বিভূষণ।

যো চ বন্তকসাবস সীলেন্দু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচেন স বে কাসাবমরহতি ॥ ১০ ॥

নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে।

অসারে সারহতিনো সারে চাস্যরসস্মিনো।
তৎ সারং নাথিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসক্তপ্ণগোচরা ॥ ১১ ॥

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার।

সারং সারতা গ্রহা অসারং অসারতো।
তৎ সারং নাথিগচ্ছন্তি সম্মাসক্তপ্ণগোচরা ॥ ১২ ॥

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য-সংকল্পের কাছে সার মিলে তার।

বখাগারং দুচ্ছমং বুট্টী সমতিবিস্কৃতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিস্কৃতি ॥ ১৩ ॥

ভাল ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে।

বখাগারং দুচ্ছমং বুট্টী ন সমতিবিস্কৃতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিস্কৃতি ॥ ১৪ ॥

ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা
সতর্ক যে মন তারে কি করে বাসনা!

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ং সোচতি।
সো সোচতি সো বিহংগতি দিম্বা কম্মাকিলিটমন্তনো ॥ ১৫ ॥

হেথা মরে শোকে সেথা মরে শোকে
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে
যথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম আপনার চোখে।

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপ্ণং উভয়ং মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি দিম্বা কম্মাবিসম্মি মন্তনো ॥ ১৬ ॥

হেথা সুখ তার সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায়, বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়ং তপ্পতি।
পাপং মে কতন্তি তপ্পতি ভীষ্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৭ ॥

হেথা পায় তাপ সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ,
"এই মোর পাপ," এই বলে তাপ—
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ!

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কত প্ণং উভয়ং নন্দতি।
প্ণং কতন্তি নন্দতি ভীষ্যো নন্দতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৮ ॥

হেথা আনন্দ সেথা আনন্দ
দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত!
পুণ্য করেছি বলে আনন্দ,
সুগতি লাভের পরমানন্দ!

বহুপক্ষি চৈ সহিতঃ ভাসমানো

ন তঙ্করো হ্যোতি নরো পমস্তো।

গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং

ন ভাগবা সামগ্র্যসু হ্যোতি ॥১৯॥

যে কহে অনেক শাস্ত্র বচন

কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি

—অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল ?

হয় কি সে জন শ্রেয়ের ভাগী ?

অপমিষ চৈ সহিতঃ ভাসমানো

ধম্মসু হ্যোতি অনুধম্মচারী

গু দোসগু পহায় মোহং

সম্মপজানো সাধুমুত্তচিত্তো

অনুপাদিয়ানো ইধ বা হরং বা

স ভাগবা সামগ্র্যসু হ্যোতি ॥২০॥

অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য

ধর্মের পথে করে বিচরণ,

রাগ দোষ মোহ করি পরিহার,

জ্ঞানসমাপ্ত, বিমুক্তমন

বিষয়বিহীন ইহ পরলোকে

কল্যাণভাগী হয় সেইজন।

পদ্পৃফবগ্গো

কো ইমং পঠিৎ বিজেস্সতি যমলোকং ইমং সদেবকং।

কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পদ্পৃফমিব পচেস্সতি ॥১॥

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকेतন
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া ফুলের মতন।

সেখো পঠিৎ বিজেস্সতি যমলোকং ইমং সদেবকং

সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পদ্পৃফমিব পচেস্সতি ॥২॥

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকेतন
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন।

ফেন্দুপমং কারিমং বিদিস্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বধানো।

ছেদান মারস্স পদ্পৃফকানি অদস্সনং মচ্ছুরাজস্স গচ্ছে ॥ ৩ ॥

ফেনের মতন জানিয়া শরীর মরীচিকাসম বদ্বিয়া তারে
ছিঁড়ি মদনের পদ্পৃফায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা' রে!

পদ্পৃফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।

সুত্তং গামং মহোদোহং মচ্ছু আদারং গচ্ছতি ॥৪॥

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পদ্পৃ চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্যায় যেন সদৃশ পল্লী, মৃত্যু তাহারে ভাসিয়ে লয়।

পদ্পৃফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।

অতিত্তং য়েব কামেসু অন্তকো বুরুত্তো বসং ॥৫॥

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পদ্পৃ চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পদ্রিতে তার তৃষা বাসনার, মরণ তাহারে ছিনিয়া লয়।

যথাপি ভুমরো পদ্পৃফম্ বরগম্মং অহেঠয়ং।

পলৈতি রসমাদায় এবং গাবে মুন্নী চরে ॥৬॥

বরণ সুবাস না করিয়া হানি ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি,
যায় সে উড়ে,
সেই মত যত জ্ঞানী মুনীজন সংসার মাঝে করি বিচরণ,
পালান দূরে।

ম পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কভাকত্তং।

অন্তনোহব অবেক্খেযা কভানি অকভানি চ ॥৭॥

পর কি বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে
তাহে কাজ নাই তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখ রে!

যথাপি রুচিরং পদ্পৃফম্ বরবত্তং অগম্মকং।

এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হ্যোতি অকুস্বতো ॥৮॥

যেমন রঙীন সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী কাজে যদি নাহি লাগে।

যথাপি রুচিরং পদ্পৃফম্ বরবত্তং সগম্মকং

এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হ্যোতি কুস্বতো ॥৯॥

যেমন রঙীন সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম, বাণী কাজে গাটাইলে তাকে।

যথাপি পদ্পৃফরাসিমহা করিরা মালাগুণে বহু।

এবং জাতেন মচ্চেন কত্তবং কুসলং বহুং ॥১০॥

ফুলরাশি লয়ে যথা নানা মত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিধির কুশলকর্ম রচনা করিবে নয়।

১ পাঠান্তর—ধর্ম মনঃপ্রস্তুত, মনোময়

২ পাঠান্তর—কর

৩ পাঠান্তর—নিশ্চয় যে, দর সজ আছে যার মধ্যে

৪ পাঠান্তর—কে পৃথিবী লবে

৫ পাঠান্তর—ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে পৃথিবী লইবে ফুলের মতন।

৬ পাঠান্তর—বর্ণগম্ম

৭ পাঠান্তর—সুন্দর

[বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অনুবাদবিভাগও যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-পশে সমাধিলাভ করিয়াছে, একথা সবসাধারণের নিকট পরিদ্রষ্ট নহে। বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইহাজেজ কবির রচনা-নিদর্শন পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন—একর সংগৃহীত হইলে তাহাতে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। প্রথম-যৌবনে বিদেশী কবির যে-সকল অনুবাদ তিনি করেন, ‘প্রভাসংগীত’, ‘কাদ ও কোমল’ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত নব-রমমালা (১৩১৪) গ্রন্থে রঘুবংশের কিয়দংশ এবং সংস্কৃত কতকগুলি প্রচলিত ইত্যাদির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়; গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে কৃত বেদমন্ত্রান্বাদের সংগ্রহ বিম্বভারতী পত্রিকায় (প্রাপ্ত আশ্বিন, ১৩৫০) প্রকাশিত হইয়াছে; মেঘদূতের গ্রীষ্মারামোহন মেন কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে উহা পড়িয়া তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করিতে উৎসাহ হন এবং উক্ত সংস্করণের একখণ্ড গ্রন্থের মাজিমে মেঘদূতের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনো নিতরবোধী ব্যক্তির নিকট শূন্যিয়ারি; এ পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীচর্য্যচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদিত ধর্মপদ গ্রন্থের গদ্য বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন (১৩১২) পথে উহার প্রশংসিত প্রকাশ করেন ও এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও ইতিহাস সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া পরিশেষে বলেন : “যুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ-কথা আমাদেরকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে। এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র যুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গবর্ণমেন্টের দ্বারে ভিক্ষাকার্য্যের মতোই আবদ্ধ—আর কোনোদিকেই তাহার কোনো গতি নাই? সমস্ত দেশে পাঠজন্য লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনককে তরুণ যুবর উৎসাহ এই পথে ঝাঝিত হইবে না?”

সম্ভবত এই সময়েই, চার্য্যচন্দ্র বসু সম্পাদিত গ্রন্থের একখণ্ডের মাজিমে রবীন্দ্রনাথ ধর্মপদের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই দীর্ঘকাল ইহা অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। এই অনুবাদের কথা শুধন যাহাদের জ্ঞানবীর সন্যোগ হইয়া থাকিবে তাহারা ইতমধ্যে পর-লোকগত, বা এবিষয় সম্ভবত বিস্মৃত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে, ‘ব আশ্রম্য বলদ’ বৈদিক মন্ত্রের একটি বিস্মৃত ও একটি অপ্রকাশিত অনুবাদ প্রকাশ-প্রসঙ্গে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯) শ্রীমতিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই অনুবাদ বিষয়ে উল্লেখের কথা প্রচার করেন। এই আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র, জয়পুরপ্রবাসী শ্রীসমীরাচন্দ্র মজুমদার, তাহার পিতা, শ্রীমতিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভূত-পূর্ব অধ্যাপক, অক্ষলপরলে কগত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাগজপত্রের মধ্য হইতে এই অনুবাদ উদ্ধার করিয়া বিম্বভারতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বশীকে বাহ্যে করিতে দেন। বিম্বভারতী কর্তৃ-পক্ষের সৌজন্যে ইহার একাংশ মুদ্রিত করিতে পারিয়া আমরা আনন্দ-ভারতী কর্তৃপক্ষ ও শ্রীসমীরাচন্দ্র মজুমদারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; অবশিষ্টাংশ বিম্বভারতী পত্রিকার আগামী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অনুবাদের সহিত মূল পালি শ্লোকগুলিও মুদ্রিত হইল।

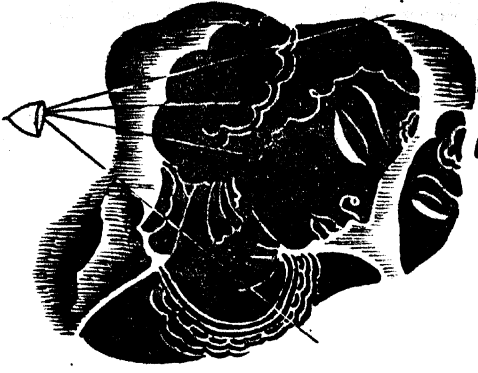
বৌদ্ধশাস্ত্র পালিপিটক, বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্মপিটক এই তিন ভাগে বিভক্ত। সুত্তপিটক দীর্ঘ, মধ্যম, অল্প, সংযত ও ধর্মপদ এই পাঁচটি নিকরে বিভক্ত; ধর্মপদ ধর্মদর্শনিকায়ের অন্তর্গত। ‘জগতের যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধর্মপদ তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধর্মপদ গ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থকারে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, অতএব একথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিকাব্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।...এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাষার দ্বারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে এমন করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এই-গুলিকে চতুর্দিক হইতে সহজে অক্ষর করা, রাখা, আগনার করিয়া, সুসংবদ্ধ করিয়া, ইহা দিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়ী দিয়া গেছেন—বাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে একাস্ত্রে গাথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব ভগবদ্গীতার ভারতবর্ষে যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেশটা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্মপদ গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিন্তার একটি পরিচয় ভেদান বাক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধর্মপদ, কি গীতা—এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে বাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।”—রবীন্দ্রনাথ

ধর্মপদ পূর্ববীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, যুগে যুগে অগণিত ধর্মার্থীকে পথপ্রদর্শন করিয়াছে। অধ্যাপক আলবট ডে এডমন্ডস তাহার কৃত অনুবাদের ভূমিকায় ধর্মপদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

“If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it is this. . . . These old refrains from life beyond time and sense, as it was wrought out by generations of earnest thinkers, have been fire to many a muse. They burned in the brains of the Chinese pilgrims, who braved the blasts of the Mongolian desert, climbed the cliffs of the Himalayas, swung by the rope-bridge across the Indus where it rages through its gloomiest gorge and faced the bandit and the beast to peregrinate the Holy Land of their religion, and tread in the footsteps of the Master. Verses were graven on walls of the august temples at the command of Hindu emperors who abolished capital punishment, mitigated slavery, and established hospitals for men and animals, under the sway of this marvellous cult; and by Ceylon monarchs whose ruined reservoirs, as large as lakes, astonish us among the wonders of antiquity. And to-day after twenty centuries of Roman and Christian culture, they have won the admiration of Europeans and Americans in every seat of learning from Copenhagen to the Cambridges, and from Chicago to St. Petersburg.”

কবিসার্বভৌম-কৃত এই সার্বভৌমপ্রভাব ধর্মগ্রন্থবলীর অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত।—সম্পাদক, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা।]





শিল্প-দৃষ্টি

শ্রীলল জ্ঞান বসু

রিম্মালিটি কী কুমারস্বামী একটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে কোনো অভাববোধ থাকে না। অর্থাৎ, আর্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, চিত্রে এবং চিত্রের বিষয়বস্তুতে মিল না থাকলেও যখন অভাববোধ হয় না।

চীনেরাও এই কথাই বলেছেন। পাকা আর্টিস্টের কাজ কেমন? না, আশ্চর্য্যভাবে বস্তু প্রতীতি হয়, অথচ কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—কালির পেঁচ, ভুলির ছাপ, তা ছাড়া কিছুই নয়।

চীনেরা এইজন্য বলেন, টেকনিক কিছুই নয়। মনই আঁকে। মন যখন যেতে ইচ্ছা করে, তখন টেনে হিঁচড়ে কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যায় তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পাকা আর্টিস্টের টেকনিক বা ঠিক টেকনিক হল, তন্ত্রের একটি শ্লোকে যেমন বলেছে, পাখির ওড়ার মতো, এক গাছ থেকে আরেক গাছে বসল, বাতাসে কোনো চিহ্ন রইল না।

কারো কারো এইটি হয়েছে, যে জিনিসই আঁকুন তাতে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশ করা কি রকম? তোমার হাতটা ধরে এইখানে এইভাবে রেখে দিলাম, আবার তুলে নিয়ে অন্য স্থানে অন্য ভঙ্গীতে রাখা গেল, তোমার ধরে ওঠালাম বা বসালাম, এই এক। আরেক হল—তোমার ভিতরেই আমি যদি প্রবেশ করতে পারি, তাহলে তোমার হাত নিয়ে পা নিয়ে আমি বা

খুঁশ করতে পারি; উঠতে, বসতে, দৌড়তে, নাচতে কিছুতেই কোনো আয়াস লাগে না, বাধা হয় না—সেটা সহজও হয়, সত্যও হয়।

ছোটো ছেলের আঁকা ছবিও খুব সুন্দর হয়; আশ্চর্য্য ছন্দ, আশ্চর্য্য রঙ তাতে থাকে। তবুও ছোটো ছেলের কাজের নকল করে আর্টিস্ট হওয়া যায় না।

ছোটো ছেলের কাজের গুণ বড়ো আর্টিস্টের কাজে পড়ায় যখন তিনি জ্ঞানের চরমে পৌঁছে যান। কারণ বড়ো মানুষ ছোটো ছেলের অনুকরণ করলে হয় ন্যাকামি, অথচ বিনা আয়াসে বড়ো মানুষও ছোটো ছেলের মতো হয়ে থাকেন জানি—তাকেই আমরা বলি সাধু বা পরমহংস।

এক জাপানি কবিতায় কবি বলছেন, তাঁর চোর ফুল হতে সাধ হয়। মানুষ তো চোর ফুলের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক মহান, তবে এরকম বিপরীত ইচ্ছা কেন?—তার মানে আছে। মানুষ মানুষ বলেই তার এমন ইচ্ছা হয়েছে, চোর ফুলের ইচ্ছা হয় না মানুষ বা আর কিছু হতে। বিচিত্র পথে বিচিত্র লক্ষ্যে ধী ও অনুভূতি প্রসারিত হয় মানুষের। মানুষের চেতনা জগতের সবটাই প্রবেশ করতে চায়। আরেক অর্থ এই ধরা যেতে পারে যে, মানুষ মানুষই থাকতে চায় অথচ চোর ফুলও হতে চায়; মানবসত্তার যে অনন্ত জটিলতা, আশেয মিশ্রণ, অপরিসীম ঐশ্বর্য, সবকে জয় করেই হাস্যময় চোর



শ্রীলল জ্ঞান বসু

শ্রীলল জ্ঞান বসু



ফুলের সহজ শোভা নিয়ে সে ফটে উঠতে চায়।

ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক বড়ো ঈর্জনি। ওতে যা করেছে আর কোনো দেশে আর কোনো যুগে তা করবার কল্পনাই করে নি। একটা নটরাজমূর্তি, একটা বৃদ্ধমূর্তি বা গিমূর্তি যতক্ষণ আছে—ভারত-শিল্প, ভারতসভ্যতা ওরই মধ্যে সম্পূর্ণ আছে। ওতে বিমূর্ত আইডিয়াকে মূর্তি দিয়েছে। স্বভাবের এটা - সেটার নানারকম প্রতিরূপ অনেকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু একটা করুণা বা মৈত্রী বা অন্য কোনো আইডিয়ার মূর্তি সমস্ত শিল্পজগতে দুলে। চিহ্ন বা প্রতীক রচনা করে নি, প্রতিমা সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ, আইডিয়ার 'বাচন' বা রূপায়ন ওখানে কন্ট্রোল্ড কল্পনাকৃত নয়, রীসকের কাছে অর বোধ

ব্যবাস্যপেক নয়। আইডিয়াই জন্ম নিয়েছে, আইডিয়াই হু হয়েছে।

এক সময় রুরোপ স্বভাবের হুবহু নকল করার দি বকেছিল। সেটা আর্টের ঠিক রাস্তা নয়, তাতে শেষ পহ তৃপ্ত দিতে পারে না। প্রতিভার বশে এখন স্বভাবকে এ ব্যারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে; সেটাও অস্বাভাবিক, তা কোনো রস নেই। সমস্ত অনুষ্ণ বাদ দিয়ে মানুষ ভাবতে পারে না, দেখতেও পারে না। বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের তথ্য নি কী হবে? সেটাই যে আর্টের সত্য তা নয়। আর্টের কি আর আর্টিস্টের মন যেন বস্তু আর আলো। সূর্যের আট মাটি-পাথরে চুষে নেয়; সেই হল স্বভাবের অনুকরণকারী আর্ট কাঁচে, আয়নায়, জীলে প্রতিফলিত করে; সেই হল ভারতীয় প্রাচ্য শিল্পের জাত। এ আর্ট খুব ক'রে অনুকরণ করতে য নি, খুব বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অনুষ্ণগভীর হবারও তার দরক নেই। এর যা সত্য তা রূপ ও অপরূপ দুই মিলিয়ে, দুইয়ে মাঝামাঝি বিরাজ করছে।

নিসর্গ চিত্রে বা ল্যান্ডস্কেপে যে রস তা নব রসে কোনোটা নয়। বড়োজোর শান্তরস বলতে পার, বা একান্ত রস। চীনেরা, মনে হয়, লাওৎসের বাণী থেকে তা পেয়েছিল। একটা ভূদংশের মধ্যে একজন মানুষ—ভূচিত্রটিই বিশেষ ক'রে আঁকবার বিষয় হলে মানুষটি অণকতে চেষ্টা করা উচিত আর, মানুষটি আঁকাই যদি লক্ষ্য হয় তবে, ভূচিত্রটি একে তুলে যত্ন করা ভালো। ছবির বিষয়কে সামনা-সামনি বা হঠকারিতা সঙ্গে আয়ত্ত করতে গেলে তা এড়িয়ে যায়। প্রেমেরও যেম রীতি, তাতে বাকা ভংগী আছে। যেদিকে যেতে চাও সেদিকে সোজা যাও না, যা বলতে চাও তা সোজাসুঁজি বল না; হ চাও তা ব্যঞ্জনায সুন্দর করে প্রকাশ কর—ইংগিত, ইশারায় তাইতে প্রেমিক আর প্রিয়া দুজনেই খুশি হয়, প্রেম সফল হয় আর্টই বল আর প্রিয়াই বল, তার সম্পর্কে হঠকারিতা ভালো নয়, 'না চাইলে' তাকে পাওয়া যায়।



ভৃদশ্যের ছবিখানি কেবল গাছপালা, বাগির চর, জলের ধারা একে সম্পূর্ণ মনের মতো হল না—একটা কোথাও একটা ল্যাজঝোলা ফিটে কি পটিনি-হাতে রাখাল কি উপড় হয়ে একটা বাদির জল খাচ্ছে, এইটে একে দিতে হল; অমনি দেখা যায়, সমস্ত ন'ড়ে চ'ড়ে কথা ক'য়ে উঠল। প্রাণের সংগেই প্রাণের পরিচয়। উদাস বা সুন্দর ভৃদশ্যের মাঝখানে ঐ ফিটে পাখীটি, ঐ রাখাল ছেলেটি হল স্বয়ং আর্টিস্ট।

শিল্পে যে সিম্ব হয়েছে তার ভুল হয় না। গল্পে শোনা যায়, চীনা শিল্পীর পা লেগে কালির বাটি উলটে গেল হঠাৎ, সে হাত বুলিয়ে একে দিল আশ্চর্য এক ভ্রাগন। আকিয়ের মনেত আকবার বিষয়টি ঠিক-ঠিক যখন আছে, তখন মন থেকে তুলে কাগজে রেখে দিলেই যেন হল। কিম্বা পদা সরিয়ে দিতেই যেন দেখা গেল কী আছে। এজন্য যে হাত, হাতিয়ার, কাল এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন তা থেকেও নেই; কারণ শিল্পীর এবং শিল্পরসিকের তার সম্বন্ধে কোনো হুঁশই নেই যেন। তীরখনুক নিয়ে অনেক নিশানা ক'রে, অনেক যন্ত্র ক'রে, লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করা যেতে পারে; তাতে লক্ষ্য বিম্ব হতেও পারে, না-হতেও পারে। আরেক, যখন লক্ষ্যই তীরকে আকর্ষণ করে নেয় চুম্বকের মতো—কোনো চেষ্টা নেই বলেই দ্রান্ত বা চূড়তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

কুটুমকাটাম বলে একটা কথা অবনীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবের বস্তু কী, শিল্প কী, কুটুমকাটাম কী, এটা ভাববার বিষয়। কোনো একটি মেয়েকে তিন রকম ক'য়ে পরিচিত করা সম্ভব। প্রথমতঃ, মেয়েটি অমৃকের মেয়ে, অমৃকের স্ত্রী, অমৃকের মা। দ্বিতীয়তঃ, সে হল মা, তার কোলে ছেলে আছে বা এমন কিছ, লক্ষণ আছে যা অতিক্রম করে অন্য কিছ, ভাবা যাচ্ছে না। তৃতীয়তঃ, সে মা নয়, স্ত্রী নয়, মেয়ে নয়, কোনো

সম্বন্ধেই অছেল্যভাবে কথা নয়—সে নারী মাত্র। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের পরিচয় হল শিল্পের পরিচয়। একখণ্ড পাথরের কথা ধরা যাক। যখন তা এমন যে কারো কাছে জটাই বুড়ি, কারো কাছে গজকচ্ছপ, কারো কাছে শিব, আর-কারো কাছে আর-কিছ, তখন তা কুটুমকাটাম; বহু লোকের সঙ্গে বহু কুটুম্বিতাসেই তার পরিচয়। যখন তা পাথর সে কথা ঢাকা পড়ে গিয়ে দেখছি সেটি একটি নির্দিষ্ট রূপ, নির্দিষ্ট মূর্তি—হোক চাই শিব, হোক চাই পার্বতী, একই জিনিস, দুই বা বহু নয়, তখনই তা একজন শিল্পীর শীলক্ষ্মহর-করা রচনা; তা সৃষ্টির প্রতিসৃষ্টি বা আর্ট। যখন তা পাথর এই পরিচয়ই তার জানছি বা মানছি তখন তা স্বাভাবিক সৃষ্টি, স্বভাবের জিনিস।

পূর্বদিকে সবুজ বনের মাথায় কাজলকালো মেঘ আমার এত ভাল লাগছে কেন—মনকে এমন ক'রে নাড়া দিচ্ছে? কাম্বল আর কিছ, নয়, একই সত্তার একই চেতনার এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি।

এক দিকে মেঘ আরেক দিকে আমি, তাই মেঘের, সুখ আমাতে বা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। আমার ইন্দ্রিয়গুলি দরোজা-জানলি মাত্র। সেই পথে, আমি ও আমার বিষয় মিলছে, মিশছে; একই চেতনায় নানারকম দোলা লাগছে, ঢেউ জাগছে।

কুণালজাতকে আছে কামলোকের কথা। তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। আমি বলি, তারও উপরে আনন্দলোক। কামলোকে আসক্তি, তাই অম্ব-তা। রূপলোকে উঠে রূপ গোচরীভূত হয়েছে। অরূপলোকে উঠে প্রাণে নিখিল-প্রাণের ছন্দস্পন্দ অনুভব করা গেছে। আনন্দলোকে রস। শাস্ত্রই বলেছে, রসো বৈ সঃ।*

* শিল্পাচার্য শ্রীমদলাল বসু, মহাশয়ের উক্তির সংগ্রহ। সংগ্রাহক শ্রীকানাই সামন্ত।



প্রফুল্লকুমার ও রাষ্ট্রভাষা

শ্রীনিবেশ পাথ বসু

স্বগত প্রফুল্লকুমার সরকার সর্বসাধারণের নিকট “আনন্দ-বাজার পত্রিকা”র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি এবং সম্মান লাভ করিলেও মাতৃভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠার জন্যই তিনি সাহিত্যিক বন্ধুগণের নিকট সর্বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব সামান্য ছিল না, সেই কৃতিত্বকে স্মরণ করিয়াই “ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবি-সংঘ” তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করেন। কিন্তু “প্রফুল্লকুমার তাঁহার যথার্থ আজ্ঞাপ্রকাশের পথ সংবাদপত্র সেবায় লাভ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রাথমিকে তিনি ছিলেন আজীবন সাহিত্যরসিক। নিশ্চয়ই সংবাদপত্র তাঁহার অনেকটা রস শূন্যিয়া লইয়াছিল।” সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের এই সূচিন্তিত অভিমত অন্তরের সহিত সমর্থন করিয়া লইতে আমাদের কোন বাধা নাই।

পঠন্দশাহেই প্রফুল্লকুমার মাতৃভাষার সেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বঙ্গভাষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ‘বিশ্বকম পদক’ প্রাপ্ত হন। দেশভক্ত তরুণ প্রাচ্যবাসী দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়াই প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত “ভাস্কর” পত্রিকায় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। নব-পর্যায়ের “বঙ্গদর্শন” এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রফুল্লকুমার ওকালতি ব্যবসায় সন্নিবিষ্ট করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে হইতেই তাঁহার জীবনে যে সাহিত্যানুরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। ইহা তাঁহার আইন ব্যবসায়ের অনুকূল ছিল না। প্রফুল্লকুমার অল্প কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যে রাজপুত্রের গৃহশিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। প্রবাসে অবস্থানকালে তিনি ১৩২০ সালের মাঘ মাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় “আদমসুয়ারীতে বাঙ্গালার অবস্থা” শীর্ষক এবং ১৩২৩ সালের আশ্বিন মাসের “নারায়ণ” পত্রিকায় “জাতীয় জীবন ধ্বংসের কারণ” শীর্ষক যে দুইটি অতি সুলিখিত ও সূচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালার সুধী-সাহিত্যিক ও মনীষীগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ

করিয়াছিল। প্রফুল্লকুমার দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত “নারায়ণ” পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

মাতৃভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা লইয়া প্রফুল্লকুমার সংবাদপত্রসেবায় রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আজ “আনন্দবাজার পত্রিকা” সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অতি উচ্চ-স্থানে অবিস্থিত এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা দেশের অতি গৌরবের সমগ্রাণী।

সাংবাদিকের জীবন কিন্তু সাহিত্যনিষ্ঠ প্রফুল্লকুমারের জীবনকে একেবারে কবলিত করিতে পারে নাই। স্বল্প-অবসরের মধ্যেও তিনি সাহিত্যসাধনা হইতে বিরত ছিলেন না। তাঁহার প্রণীত ‘অনাগত’, ‘বালির বাঁধ’, ‘লোকারণ্য’, ‘দ্রষ্টলগ্ন’ ও ‘বিদ্যুৎলেখ’—এই কয়খানি উপন্যাসের ভিতর দিয়া প্রফুল্লকুমার বাঙ্গালার সংসার ও সমাজ-জীবনের সমস্যাসমূহের উপর যে আলোকসম্পাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত জীবনী “শ্রীগোরাঙ্গ” এবং সামাজিক সমস্যামূলক গ্রন্থ “ক্ষয়িকু হিন্দু” গ্রন্থকারের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। প্রফুল্লকুমারের অক্লিষ্ট সাহিত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় উৎসাহ করিয়াছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি উহার কার্যনির্বাহক সমিতির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। সাহিত্যসেবীগণের মিলন-সভা ‘রাবি-বাসরের প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই

তিনি উহাতে অতি অন্তরঙ্গভাবে যোগদান করেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এবং বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির তিনি একজন উৎসাহদাতা ও সুহৃদ ছিলেন। প্রফুল্লকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মাতৃভাষা—বাঙ্গলা ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। তাঁহার এই বিশ্বাস ও আশাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

“রাবি-বাসরে”র বৈঠকে সদস্য শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার ১৩৪৪ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে সর্বপ্রথম “বাঙ্গলা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা” বিষয়ে আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেন। সেই অধিবেশনে সর্বাধিক রায় জলধর সেন বাহাদুর এবং বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। প্রফুল্লকুমার সৌদিন এক ঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া নানা যুক্তি সহযোগে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত





বাঁশবাড়ি

আচিন্ত্যকুমার মেনশস্ত

খোঁড়াগাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছ্ নেই। তেলেভাজা দুর্গন্ধ পাপির, বিয়ে খানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুঁরফুরি নেই একখানাও। মাটির পতুল-কুকুর-বেরাল, হাতি-ঘোড়া-সকলের এক রঙ, শব্দ, চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝাবার জন্যে কালোর দু'একটা ফেটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছ্, চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, বড়ি-চামড়া, খারা-খালুই। আর আছে হাড়িকুড়ি সরি-মালাসা, কলকে-ধনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমালা। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেঁম বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না। "আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।" আকুল আফুট চোখে কাদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়েস, পেঁকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টোঁট আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি? কাদছে কেন?

সবাই বললে, বাঁশবাড়ি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে

বুঁকি ছেলেটাকে, তাই কাদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা।

বাঁশবাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

"মাটিতে পড়ে মেরে তো বাঁশটা?" কে একজন জিগ্গেস করলে।

না এ সে মামুলি খেলা নয়। ওরাকি-বহাল কে একজন বললে, ভারীকি গলায়, না, বাঁশটা বড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে বকে পড়বে। আর, বড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরাকির মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা।

ঐ বড়ো বুঁকি?

'হাঁ, ওই মস্তাজ।'

শনের দাঁড় মত পার্কয়ে গেছে বড়োর শরীর, খুঁতনির উপর



"খেলা সুরু হোলো না-আগেই পরসা"

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, কিম-মারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে মরতে। চলায়-বলায় ফুঁত' নেই এক রীতি। পরনের কাপড় কান হয়ে আসছে দিনে দিনে।

হলবটে ক'গাছ দাঁড় রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা টিপলে মতন, পেটটা দ পড়া, হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কেঁচিকান চোখ দুটো স্তর চকচক করছে-সেইটুকুই তার যা-কিছ্ সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে রাজ সবাইর কাছ থেকে পরসা কুড়োচ্ছে।

‘খেলা সুরু হল না, আগেই পরসা?’ কে-একজন ধমকে লো।

‘খেলা হয় কি করে? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কে’দে লাভল করছে। ‘পড়ে যাব, মরে যাব’—এ কেমনতর কামা? পড়েই দ যাব তব কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে?’

ছেলের কান্নাতে মস্তাজের জুকেপ নেই। ‘হবে, হবে, সুরু হচ্ছে এখনি।’ সবাইকে আম্বাস দিয়ে সে শূন্য মগ দখিয়ে দৌঁধিয়ে ঘুরে যায়।

‘খেলা তো আর ওর’ তুন দেখাচ্ছে না, তবে তব কান্না কেমন ঐ ছেলোটা?’ জিগ্গেস করলাম পাশের লোককে।

‘এতদিন ও ছিল না। ও নতুন।’

‘তবে কে ছিল এতদিন?’

‘ওর দাদা—’

‘না, না, ঐ ছেলোটাও দেখিয়েছে দু’একবার।’

‘কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। ‘সরস্বতী’

পঞ্জার সময় তে’তুনের ইস্কুলের মাঠে এই

ছেলোটাই উঠাছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রসত

হুসনি-বেয়ে বেয়ে চুড়ায় উঠে আসেটাই সেদিনকে

ওর খেলা ছিল। আসল খেলা

দে খি য়ে ছি ল আশিয়া ওর দাদাই। আর

হাই বলান আসল কসরৎ যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে

ভার নয়, যে বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধরে রাখে

তার-মস্তাজের।’

‘কই ওর দাদা?’

‘কে জানে!’

টুন করে একটিও

আওয়াজ হল না মস্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ

পরসা দিতে রাজি নয়।

জনন্যোপায় হয়ে মস্তাজ ছোট ছেলোটার কাছে এগিয়ে

গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি

ভয়ে চর্ণাচর্ণে উঠেছে ছেলোটা। ‘না, না, আমি না। আমি পড়ে

যাব, আমি মরে যাব—’

বাপ একবার তার হাত ধরে টান দারলো হেঁচকা। মারবার

জনো হাত ওঁচালো একবার।

‘হেঁ, ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে

এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে

পারবে না, পুঁচকে একরসি ছেলে।’ বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ

কেউ তিরস্কার করলে।



“পেটোপটে এক”

মস্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

‘পড়েই যদি বাস, বাপ তোকে দু’হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? নে, উঠে আর।’

যে লোকটা ট্যামটোম বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কামাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তা হলে। দু’একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মস্তাজ অসহিষ্ণুর মত গলা উঠিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাটতে হাটতে কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা আখ-খাওয়া পিপর।

‘ওই ওর দাদা।’ জানা লোকেরা হেঁ-হেঁ করে উঠল।

বছর দশেকের রোগ-পটকা ছেলে। লিকালিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। চৌটির চার পাশে, গালে ও বুতিনের নিচে কাটা খা, একটা টাটনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাই’র কাছে এগিয়ে গেল। বললে, ‘তোকে কাদিতে হবে না আবু, আমিই খেলা দেখাব।’

আবু চুপ করল। মোমের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটোমের বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কোমর ও হাটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আট করে নিল মস্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুন্ডলের গর্তে। কি যেন বলল বিভ্রিড় করে। পোষহয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বলিয়ে মস্তের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখিনি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

‘চলে আর, ইন্তাজ।’ ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইন্তাজ মুহুর্ভে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি

আঁকে উঠলাম। ছেলেরা বকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগু, দগু করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই চটনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক শ্বশ্টি পেলাম। কেন না পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

‘কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা?’ জিগ্গেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালর বাবুদের বাড়ীতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বড়ো তার কর্তন আরে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পালতাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বকে পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেরা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

‘মাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?’ জিগ্গেস করল মন্তাজ।

‘না।’ দু’হাতে ধুলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের

পেটে, বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে বেয়ে উঠতে লাগল। দু’হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মন্তাজ।

‘দেখুক, দেখুক এবার আক্সা। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।’

আক্সা বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন টামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চড়ার কাছে এসে ইন্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘা-গুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখা লাগল। অসহ্য লাগল। ভাললম, চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, ‘তার পর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শুনো, তখন ওসব ঘাটা কিছু দেখা যাবে না।’

‘বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি?’

‘কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনাই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।’

‘নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগ্‌বাজি বাওয়াটা তো সেক্ষেত্রে। তাতে আর বাহাদুরি কি।’ আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে শুরু করেছে মন্তাজের দু’হাতে। চোট খাবার পর ছেলেরা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ক্রমশঃ মত। হাত পা ছাড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোকা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদড় না চামড়াকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম মন্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরল বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের

পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশী দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মন্তাজের পেটে এ সাময়িক গর্ত তৈরী হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘটে ঘটে ঘুরছে না জানি কোন জন্মলত মস্তনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কত দূর পর্যন্ত চেপে, তেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হাচ্ছিল না। পেটে-পিটে এক, এমনতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভূঁড়ি শুকিয়ে কুকড়ে জ্বাখায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সংযোগ, চোঁকর খেতে-খেতে খটাখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরনি।

প্রতি মূহুর্তে যা ভয় করছিলাম। ইন্তাজ ফসকাল না, মন্তাজই টলে পড়ল। শেষ মূহুর্তে দু’হাত বাড়িয়ে ছেলেরা কে লুফে নেবার চেষ্টা করছিল মন্তাজ, কিন্তু যতই ঘুরেঘুরে



‘তাকিয়ে

আছে শূন্য মগের দিকে’

পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইন্তাজকে।

‘আজকাল বারবারেই বড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে—’ কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মন্তাজ দু’হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। দোঁড়-খাওয়া পাকতেড়ি ঘোড়ার মত ধুকছে, আর ডাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তার জন্যে হয়তো খেলা শুরু হবার আগেই মগটা সে জুলে ধরেছিল সবাইর কাছে। কয়েকটা পরসে আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পিঁপির কি চামড়ার মত শুকনো দু’একটা ফলদ্রি। পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এক চোটেই পিঁঠ হয়ে পড়ত না, খুঁচুরে বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানে যায়, শুধু বুঁকি

(১৭ পৃষ্ঠায় প্রস্তুত)

দূর দূরান্তে ৭ ভারতীয় শিল্পের প্রভাব ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বগচী

খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারা প্রচ্যা এশিয়ার নানা দেশে প্রসার লাভ করে। সমুদ্রপথে ভারতের বণিকসম্প্রদায় বহুপূর্ব থেকেই শ্যাম, ইন্দোচীন যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বণিজ্যের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করে। এ সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা সেকালে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল এবং সেখানে কোন ক্ষমতামূলী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না। এই কারণেই ভারতীয়গণ অল্পকালের মধ্যেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে উপনিবেশ স্থাপন ও শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন। গুপ্ত যুগের পূর্বেই যে সব হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ইন্দোচীনে কম্বুজ ও চম্পা এবং দ্বীপময় অঞ্চলে শ্রীবিজয়রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্বুজ রাষ্ট্র বর্তমান কম্বোডিয়া ও শ্যাম নিয়ে গঠিত হয়। চম্পারাজ্য আনাম প্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং শ্রীবিজয় সুমাত্রার পালেমবাং প্রদেশে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে যবদ্বীপ ও মলয় উপদ্বীপের কতকাংশ শ্রীবিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সমস্ত রাজ্যে হিন্দু সংস্কৃতিই ছিল প্রাচীনকালে স্থানীয় সভ্যতার মূল উপাদান। যতদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় ছিল, ততদিন ছিল এই সমস্ত রাজ্যের গৌরবময় যুগ। এই যুগের যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন আছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারা রক্ষা করেছে। চম্পা, কম্বুজ, শ্যাম ও যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু মন্দির-গুলির মধ্যে শৃংখ, যে হিন্দু ধর্মের প্রভাবেই পাওয়া যায় তা নয়। তাদের উপাদান, গঠন পদ্ধতি, মন্দিরগাঠে প্রস্তরের কারুকর্ম, ভাস্কর্য প্রভৃতিতেও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পের অবনতি ঘটে। স্থানীয় সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় তা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে কোন নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টিও করতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে ভারতীয় কৃষ্টির যেসব ধারা পৌঁছায় তা স্থানীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয় এবং নতুন সংস্কৃতির গঠনে সহায়তা করে। তার কারণ চীন দেশের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত ধরনের, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই সে দেশের শিল্প ও সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেশের ধর্ম ও দর্শন সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে প্রসারলাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তখন চীনারা ভারতীয় সভ্যতার সেই সমস্ত ধারাই গ্রহণ করল যা তাদের অতি নতুন ও প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে চীন দেশে ভারতীয় সভ্যতার ধারা পৌঁছায় মূলপথে। এ পথ আফগানিস্তান, বাহ্যিক (বাল্খ), মধ্য এশিয়ার নানা জনপদ—কাশগর, খোতান, কুচী প্রভৃতি হয়ে চীন দেশের উত্তরাঞ্চলে শানশি ও হোনাং প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ক্রমাশঃ সেসব দেশে যাতায়াত সুরু করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্যদের চেষ্টায়

আফগানিস্তান হতে চীন পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুপ্ত যুগের পূর্বেই এই সমস্ত দেশে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল ভারতীয় সভ্যতা। স্থানীয় সভ্যতার ধারাও একে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ধারাও মধ্য এশিয়ার পথে চীন দেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে একটি উন্নত ধরনের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এই শিল্পের দুটি প্রধান অবদান হচ্ছে স্তূপ ও চৈত্য-বিহার। চৈত্য-বিহারগুলি গৃহা-মন্দির বলেও ভুল হয় না। কারণ এ শিল্প পর্বত গাত্রে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম গৃহা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। একটি প্রশস্ত গৃহায় চৈত্য স্থাপিত হত এবং সেই গৃহায় পর্বদিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্মিলিত হতেন। এই চৈত্য-গৃহায় নিকটে পর্বত-গাত্রে আরও অসংখ্য গৃহা নির্মিত হত। সেই গৃহাগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। তারা সেখানে নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও অধ্যয়ন কালাতিপাত করতেন। এই ধরনের গৃহা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই নির্মিত হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গৃহা দেখতে পাওয়া যায় বিহার প্রদেশে বরাবর পর্বতে। এই গৃহার নাম 'লামাশ ঋষির গৃহা'। এখানেও ভিক্ষুরা বাস করতেন। পরবর্তী যুগে ভাজা, নাসিক, কালো, খাঙগিরি প্রভৃতি স্থানেও এই ধরনের গৃহা-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় গুপ্ত যুগে—তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তায়। প্রথম যুগের গৃহাগুলির মধ্যে কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরবর্তীকালে এইগুলিকে অবলম্বন করে নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি চলে—গৃহার মধ্যে নানা কারুকর্ম, গৃহার গাঠে চিত্রাঙ্কন, প্রস্তরে নানা মূর্তির কল্পনা। এই চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের চরম পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় অজন্তার গৃহায়। বৌদ্ধ শিল্পের এই সমস্ত ধারাই মধ্য এশিয়া ও চীন দেশ পর্যন্ত প্রসারলাভ করে।

মধ্য এশিয়ার পথে হিন্দুকুশ পর্বতের অন্তঃপাতী বামিয়ান নামক স্থানে এই বৌদ্ধ শিল্পের যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসরণ করে। এই স্থানে প্রাচীন যুগের গৃহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গৃহা-মন্দিরের প্রাচীর চিত্রের কতকাংশ এখনো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। সেই চিত্রগুলি অজন্তার প্রাচীর চিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে অজন্তার অনুরূপ। এই সমস্ত গৃহার নিকটে পর্বতগাত্রে কতকগুলি বিরাট বুদ্ধমূর্তি ক্ষোদিত হয়েছিল। এই মূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির উর্ধ্বতা প্রায় ৯০ ফুট। এ ছাড়া আরও অনেক বুদ্ধমূর্তি এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভাস্কর্যের ধারা অনুসৃত হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতীয় শিল্পের এই বিশিষ্ট ধারাকে Indo-Greek Art এই আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে যে সমস্ত গ্রীক স্থানীয়ভাবে

বসবাস করত তাদের মধ্যে অনেক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। খৃস্টাব্দ তাদের হাতেই এই নতুন শিল্প পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই শিল্প পদ্ধতির চরম বিকাশ হয় কুশাণ যুগে—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শীতক। এই কারণেই বামিয়ানে এবং মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে, এমন কি চীনের হোনান প্রদেশে ভাস্কর্যের এই বিশিষ্ট রচনামূল্যের নিদর্শনই বেশী পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, গুপ্ত যুগে গ্রীকপ্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারাও যে, এই সব অঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল তারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

খোটাণ ও কাশগরের নিকটবর্তী নানা স্থানে বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসস্তুপ হতে প্রাচীন কালের নানা শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা বৌদ্ধমূর্তি, চিত্রিত পট, ভারতীয় লিপিতে লিখিত নানা পুঁথি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধমূর্তি হতে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে বিশিষ্ট ধারার খোঁজ পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক। অনেক স্থলে এরূপ অনুমানও করা হয়েছে যে, অনেক মূর্তির মূল উপাদান তক্ষশীলা হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খোটাণের নিকটবর্তী দাম্পান উইলিক্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে। এই গুহাগুলির প্রাচীর চিত্রের মধ্যে বামিয়ানের প্রাচীর চিত্রের মতই ভারতীয় ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। চিত্রের পরিকল্পনায় দুই এক স্থানে পারসিক প্রভাব চোখে পড়লেও মূল ভারতীয় প্রভাব অক্ষর রয়েছে। বিষয়বস্তু ও রচনা নৈপুণ্য হতেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এই গুহাগুলিও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নীরব সাধনা, অধারন ও অধ্যাপনার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন যুগের চীনা পরিব্রাজকেরা এ অঞ্চলে আরও অনেক গুহা দেখেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চীনা পরিব্রাজক, হিউয়ান-সাং খোটাণের পথে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি বলেছেন—“ইয়ারকন্দের দক্ষিণে যে উচ্চ পর্বত-শ্রেণী আছে তা ঘন বনানীর দ্বারা আবৃত। এই পর্বতমালা হতে নানা স্রোতস্বতী জল বহন করে আনে। সেই সব পর্বতের ধারে বনানীর অন্তরালে কিংবা স্রোতস্বতীর নিকটবর্তী স্থানে অনেক গুহা আছে, আর সেই সব গুহা হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকদের নিজস্ব সাধনার স্থান।” এই সব গুহার সম্মান এখানে পাওয়া যায়নি। এ সব গুহাও যে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য গুহা-মন্দিরের মতই ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

খোটাণ হতে যে পথ চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে এই পথের উপরে দাম্পান-উইলিক্ হতে আরও পূর্বদিকে মিয়ান নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অনেক ধ্বংসস্তুপ আছে। এই সমস্ত স্তুপ হতে প্রাচীন যুগের যে বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তা খোটাণ অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এই নিদর্শনগুলি দুটি বিশিষ্ট যুগের। কতকগুলি হচ্ছে গুপ্ত যুগের অনাগুলি পরবর্তীকালের, খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের। প্রথম যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে ইন্দো-গ্রীক এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির প্রভাব বর্তমান। পরবর্তী যুগের শিল্প চীনা ও তিব্বতী প্রভাবেই অনুপ্রাণিত।

মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুচী প্রদেশেও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কুচীর নিকটবর্তী কিজিল নামক স্থানে বৌদ্ধ যুগের অনেক গুহা-মন্দির আছে। এই গুহা-মন্দিরগুলিকে কুচী ভাষায় ‘মিং উই’ বলা হয়। এ কথার অর্থ হচ্ছে ‘হাজার মন্দির’। স্থানে স্থানে এই সব গুহা-মন্দির যে সংখ্যক ঠিক ‘হাজার’ না হলেও অনেক বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিজিলের গুহা মন্দিরে প্রাচীরচিত্রের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে নানা দেশের প্রভাব বর্তমান। পারসিক, রোমক ও চীনা প্রভাব তাতে থাকলেও সে শিল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ অঞ্চলে যে ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক রীতির অনুবর্তী।

ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা মধ্য এশিয়ার পথ বেয়ে মিলিত হইয়াছিল চীনা সীমান্তে তুন-হোয়াং নামক স্থানে।

মধ্য এশিয়া হতে যে সব পথ চীনদেশে গিয়েছে তুন-হোয়াং তার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ স্থান চীনা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও চীনাযাত্রী নানা বিশিষ্ট এখানে বসবাস করত। চীনাযাত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও এখানে সাময়িকভাবে থাকতেন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। এই সব কারণে তুন-হোয়াং-এ নানা বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তুন-হোয়াং পল্লীর নিকটে একটি ছোট নদীর ধারে অনুচ্চ পর্বতমালা আছে। এই পর্বতের নানা গুহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আকৃষ্ট করে। নিভৃত সাধনার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর বেশী ছিল না। সেই কারণে গুহাগুলি ক্রমশঃ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেই এই কাজ আরম্ভ হয় এবং সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত চলে। অসংখ্য গুহা নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়। প্রতি গুহা চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত হয় এবং সবসময়ে এক হাজার বৌদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়। চীনদেশে এ গুহাগুলি “হাজার বুদ্ধের গুহা” (Caves of the thousand Buddhas) নামে পরিচিত। এত বড় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মধ্য এশিয়া বা চীনদেশের অন্যত্র ছিল না।

বৌদ্ধ শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলির স্থান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মেলনে যে কি চিত্রাকর্ষক চিত্র-কলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। গুহাগুলির প্রাচীর চিত্রে ভারতীয়, পারসিক, চীনা প্রভৃতি নানা ধারার সমন্বয় ধরা পড়ে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির চিত্রার করলে তার মধ্যে বিভিন্ন রচনামূল্যের প্রভাব দেখা যায়। ইন্দো-গ্রীক ও গুপ্ত যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চীনা ও তিব্বতী প্রভাবের রচিত নানা বুদ্ধ মূর্তি ও পটচিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

এই বৌদ্ধশিল্পের ধারা উত্তর চীনে শানশী ও হোনান প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শানশী প্রদেশে ইউন-কাং ও হোনান প্রদেশে লুঙ-মেন নামক দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে এ অঞ্চল বিশেষী রাজাদের হস্তগত হয়। তাদের প্রথম রাজধানী তা-তং-ফু নামক স্থানের অতি নিকটেই ইউন-কাং অবস্থিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশমত ইউন-কাংএর পর্বতমালায় এই সময়ে বহু গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ কাজে সহায়তা করেন। পর্বত গাত্রে বিরাট আকারের বুদ্ধ মূর্তি ক্ষোদিত হয়। অনেক মূর্তি প্রায় ৬০ হতে ৭০ ফুট।

লুঙ-মেন হোনান প্রদেশে চীনের প্রাচীন রাজধানী লো-য়াঙ নগরের নিকটে অবস্থিত। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লুঙ-মেনের পর্বতমালায় নানা গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। এ গুহাগুলিও ইউন-কাংএর গুহার ধরনের এবং প্রায় একই যুগে নির্মিত। ইউন-কাং ও লুঙ-মেনের ভাস্কর্যে দুটি বিশিষ্ট ভারতীয় ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি ইন্দো-গ্রীক পদ্ধতি, অন্যটি গুপ্ত যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি। সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছেও এই দুই শিল্প তাদের বিশিষ্ট রূপ হারায় নাই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে এই সব বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া খৃস্টাব্দে ভারতীয় শিল্পীরা প্রভুত লাভের আশায় এ সব দেশে যাতায়াত করত। পরবর্তীকালে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাল যুগে বঙ্গদেশের অনেক শিল্পী বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের জন্য বিস্তৃত পর্যন্ত যেত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অনীক নামক একজন বিখ্যাত নেপালী শিল্পী ভিক্ষাতে যান। পরে চীন সাম্রাজ্যে আদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে যান এবং সরকারী শিল্প বিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হন। তাঁর হাতের নানা কাজ চীনা শিল্পীদের চমৎকৃত করেছিল।

ইউন-কাং ও লুঙ-মেনে যে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন আছে সে শিল্প চীনারা অতি শীঘ্রই আপন করে নিয়েছিল। যদিও তাদের প্রাচীন জাতীয় শিল্প ছিল, কিন্তু এই নতুন ভারতীয় ধারা নিজস্ব করে নিয়ে তারা সেই শিল্পের পরিপূর্ণ সাধন করে। ফলে পরবর্তীকালের চীনা ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব (১৭ পৃষ্ঠার প্রস্তাব)



শিল্পাচার্য শ্রীমঙ্গলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

ঘহাতপা

তপের তড়িৎ-সূত্রে একো গাণিত্য প্রেম আর প্রেম
অমোঘ মৈত্রীর মণ্ডে চ'ড়ালেও বক্ষে টানে কে ও!
ধ্যানোন্মীল ধুবনেতে জাগে নবযুগের মৈত্রের।
এ ভারতে কার দৃষ্টি নিনিমিষ আজ?

—গান্ধী মহারাজ।

অস্থিংশীর্ণ কৃশতনু দুঃদীপ্ত কৃশানুসূন্দর
ভ্যাগের সবস্ব পণে মহাভিক্ষু গুজর-শঙ্কর
কটিবাস মাত্র সাজে ত্রিশকোটি দরিদ্র-নিভর।
পরজীবী গৃধ্রদের কে বাহিছে লাজ?

—গান্ধী মহারাজ।

কুণ্ডল ক্রিম লক্ষহীন লক্ষপ্রাণে স্বত্বব্যাক্য যার
তিলে তিনে অলিঙ্কিতে আশ্রিতের করিছে সন্ডার,
শৃঙ্খলে সংগীত হানি' বন্দী গাহে কুন্দনা তাহার।
সুপ্তচিত্তে কার বাণী সমুদাত বাজ?

—গান্ধী মহারাজ।

ক্রোধের অক্রোধে জিনি' অপ্রেমের প্রেমের আগ্রহে
আলিঙ্গন দানিল যে বেদনার সপ্নাবশে দহে,
শক্তি তার অপ্রহত জীবয়জ্ঞে অনন্ত নিগহে।
মানব মার্জিত এ কী সমুদ্র বিরাজ!

—গান্ধী মহারাজ।

শ্রীমঙ্গলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঁশবাঁজ

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহুর, ছেলে, ঘা—সব
কিছুরই মূখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—
শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইন্তাজ আরো দূরে। উঁখিত
গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনেতে পেলাম না। কেউ বললে,
হয়ে গেছে। কেউ বললে, বৃকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।
কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া
বাঁচিয়ে ইন্তাজকে ধরাধরি করে করা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়।
ঘটনাটা সদা-সদা ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে
ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ
নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেবার
সময় একটানা করে পরসাদ দিতে পারত না মস্তাজ। যদি এক-আধ
আনা পরসাদ তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের
ঘা শুকোবে, না পেটের ভিতরের ঘা?

মস্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে
আজ্ঞা কান্দছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জনেই
দুখি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আতর্জন, এবার আরো
নিঃসহায় কণ্ঠে: 'এবার আমার পাল্লা। এবার আমার পাল্লা। আমি
নিঃশ্বাস পড়ে যাব, মরে যাব আমি—'

মস্তাজ কিছই বলল না। আকুল হাত ধরে চলল
হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আজার কাছে শিশু-
কণ্ঠের কমল অঞ্চ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি।

মস্তাজ কিছই বলছে না। পাখুরে মুখে নিষ্ঠুর
নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি,
তাকে খেতে হবে টো।

দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় শিল্প

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে চীনারা নিদেশী ধর্ম বলে অগ্রাহ্য মনে করে
নাই। সে ধর্ম হতে বহু প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে চীনা
মনীষীর অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিল্পের
ধারাকেও চীনা শিল্পীরা অগ্রাহ্য মনে করেনি। বরং সে শিল্পের
অনুপ্রেরণায় তারা যে নতুন সৃষ্টি করল তা সমস্ত জগতকে আজও
চমৎকৃত করে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে উত্তর চীন হতে ভারতীয় শিল্পের এই ধারা
জাপানে পর্যন্ত পৌঁছায়। ঐ সময়ে কোরিয়া হতে বৌদ্ধ ধর্ম
জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গেই জাপানের
রাজধানী নারার নিকটে প্রথম বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই
বৌদ্ধ বিহারের নাম হোরিয়ুজী। এই বিহারেই জাপানী চিত্রকলা
ও ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিদর্শনে
যে চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে তা অজস্র চিত্রকলার অনুরূপ।
এই চিত্রকলার বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, যে সব
শিল্পীদের হাতে এর সৃষ্টি হয়েছিল তারা নিশ্চয় ভারতীয়
চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সেই আদর্শই হোরিয়ুজীর চিত্রে
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে চিত্রকলায় জাপানী হাতের কোন বিশিষ্ট
ছাপ নাই। চিত্রবিদ্যায় এই প্রথম দীক্ষা লাভ করবার অল্পকাল
পরেই জাপানী শিল্পী চিত্রকলায় তার বিশিষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয়
দিতে পেরেছিল। বিদেশী শিল্পপদ্ধতি সে নিজস্ব করে নিয়েছিল।

নাটকীয় কথা

সাহিত্যিক জীবন মজুমদার -

নাটক সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যে এ পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই; বাংলা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব ও তাহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী, এবং প্রথম যুগের নাট্যকারগণের নাট্যরচনা-প্রয়াসের কথা অল্প-বিস্তর লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক; সেই স্বেচ্ছা নাটকীয় প্রতিভার যে বিচার-বিশ্লেষণ থাকে তাহা খেল-করতাল সহযোগে একরূপ কীর্তন বলিলেই হয়। অথচ, বাংলা সাহিত্যে না ইউরোপ-বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাটকের প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; নাটকের আকৃতি-প্রকৃতি ও অভিনয়কলায় নবত্বের লক্ষণও দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টি হিচাবেও নাটকের একটা বড় মূল্য আছে—নাট্যকারের প্রতিভাও একটা বড় কবি-প্রতিভা; এজন্য নাটকের রসবিচার কোন আদর্শে করিতে হইবে সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে এখনও আমাদের মধ্যে জন্মে নাই, ইহাই আশ্চর্য। আমি এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ নাটকীয় রস-তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুৎ আলোচনা করিব, এবং প্রসঙ্গতঃ আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিব।

নাটক সম্পর্কে সবপ্রথম কথা এই যে, ইহা উপন্যাস বা কাব্যের মত একা একা ঘরে বসিয়া উপভোগ্য করিবার বস্তু নয়; যিনি নাটক রচনা করেন তিনিও, কবি বা উপন্যাসিকের মত, স্বকীয় রূপনা লইয়া সন্মুখিত থাকিলে চলিবে না; কারণ, নাটকের রস-পরিণাম ঘটাইতে হইলে দর্শকমণ্ডলীর সহযোগিতা চাই; নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক এই তিনে মিলিয়া নাট্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তিনের মধ্যে দর্শক-চিত্তের আকর্ষণ-বিকর্ষণই নাটকের সব চেয়ে বড় নিয়ন্তা। এই-খানেই কবিও মনুষ্যসাধারণের মধ্যে একাধানে বসিতে হয়—ব্যক্তি-মানসের উৎকৃষ্ট ভাব, উৎকৃষ্ট চিন্তা বা স্বাধীন-স্বলভ দিব্যাদৃষ্টির অভ্যন্তরীণ আভাস প্রকাশিত হয়; আর্টের ডিমোক্রেনী যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে। যে-নাটক রঙ্গালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের চিত্ত ধরন করিতে পারে না, তাহা নাটকই নয়—কেবল সাহিত্যিক রচনা হিসাবে তাহার যে মূল্যই থাকুক।

অমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে নাটক ছিল, আধুনিক নাটক তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—আমি সংস্কৃত নাটকের কথা বলিতেছি। সেখানে “অপরিচোদ্যে বিদ্যাং” নাট্যাভিনয় সার্থক বলিয়া নির্ণেয় হইত না; যে “সহায় সামাজিকবর্ণ” তাহা উপভোগ্য করিতেন তাহা হইলে চিত্তপ্রকর্ষণ রসিক-মত্তত্ব, এবং সমস্ত ভাব-চিন্তা নাট্যশিল্পে আধুনিক রঙ্গালয়ের মত সাধারণের রঙ্গালয়ে ছিল না; রাজসভা-প্রভৃতির চিত্রশালাতেই তৎকালীন নাটকের অভিনয় হইত। অতএব সে নাটক ছিল বিশেষভাবে আনন্দোৎসাহিক; প্রাচীন যুরোপীয় নাটকের মত তাহা সর্বজনস্বার্থে ছিল না। ভারতবর্ষে নাটকের যেমন প্রচার ঘটে নাই এবং তাহার ধারাও নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই, বোধ হয় এই কারণেই। ইহারও মূলে আছে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট প্রকৃতি। ভারতীয় আদর্শের কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে রসই ছিল মূখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ।

মানুষেরই যে সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সর্ব-মানুষের মধ্যে সংস্করণে বিরাজমান—মানুষের সেই জীবনকে, তাহার সেই রক্তমাংসঘটিত হৃদয়সংবেদনাকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নির্বিশেষ ‘রস’ বস্তুকে দৃষ্টি রাখা হইত। যুরোপে তাহা হয় নাই—সেখানকার প্রকৃতি-উপাসক জাতিদের পিপাসা ছিল অন্যরূপ; তাহারা প্রাকৃত মানবজীবনকেই নাটকের দৃশ্য করিয়াছিল, সুন্দর-বেশের অপরিস্রব সাধনার মনকে বা Intellectকে যতই প্রাধান্য দিক, নাট্যকলায় তাহারা মানুষের জীবনের এই রহস্যকেই রসবস্তু করিয়াছিল। তাহার যে রস, সে রসের একমাত্র প্রমাণ এই যে, মানুষ মাতেই তাহাতে সজ্জা দিবে—অন্ততঃ এক যুগের এক সমাজের সর্বল মানুষই সেই নাটকের অভিনয়দর্শনকালে নিজেরাও অন্তরে অন্তরে সেই অভিনয়ে যোগ দিবে; সেই যোগদানে যদি বাধা ঘটে তবে সেই নাটক যথার্থ নাটক হয় নাই। আধুনিক কালে যুরোপেও নাটকেব সে রস-প্রমাণ আর নাই—এখন জীবনে দেহ অপেক্ষা মনই প্রাধান্য লাভ করায়, সে নাটক প্রকৃত জীবন-কাব্য—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত নহে; প্রাচীন রাসিকাল ও পরবর্তীকালের রোমাণ্টিক নাটকের রূপনা-গৌরব তাহাতে আর নাই। তথ্যনির্ভর অভিনয়-সাফল্যের প্রয়োজনে তাহাকেও কোন না কোন দিক দিয়া বহু-জ্ঞানচর্চের সহিত যোগ দিয়া করিতে হয়—তাহারই কৌশল যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই নাটক রচনা করিয়া সাময়িক ব্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তেমন নাটক স্থায়ী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটকে যে রসকে দৃশ্য-কাব্যের আকারে রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা প্রাকৃতজনসেবা নয়; পরবর্তীকালে প্রাকৃত সমাজের প্রাকৃত রসপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় যে ধরনের নাট্য-লীলার প্রচলন হইয়াছিল, তাহা যেমন খাঁটি নাটক হইতে পারে নাই, তেমনই সেই প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের আদর্শে নাট্যভিনয়ও বহুকাল পূর্বে একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তারপর, যখন যুরোপীয় নাটকের অনুকরণে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, তখন যে বস্তু বিশেষ করিয়া চক্ষু লাগাইয়াছিল, তাহা একটা বহিঃপ্রাণঘটিত ব্যাপার। নাটক-রচনার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, তাহার নিত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও—প্রকৃত নাট্যরস কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চেতনা জন্মিবার পূর্বেই—রঙ্গমঞ্চে, সজ্জা-ভাড়া ও বস্ত্রতাই যে সকালের নাগরিক বাঙালী সমাজকে উত্তমা করিয়াছিল, তার প্রমাণ—বাংলা নাটকের অভাবে সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় করিতে আমাদের বাধে নাই। আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তিও যেমন তাহার বিকাশের ইতিহাসও তেমনই অনুধাবনযোগ্য। জাতির রস-সংস্কারের অনাকুল নয় বলিয়া, এবং বিলম্বিত ধরনের রঙ্গমঞ্চে স্থাপন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপযোগী নয় বলিয়া, এই বিলম্বিত বিস্তরণকে বজায় রাখিয়া নাটকের উন্নতি সাধন বড়ই বিঘ্নসংকুল হইয়াছিল। খমীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সেখের নাট্যাভিনয় একটা প্রমোদ মাত্র—নাটক হিসাবে তাহা প্রাণহীন; কারণ, সে নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চপ্রবাহী রসধারা সর্বজনহৃদয়াভিমুখী হইবার

উপায়ও ছিল না—অবশ্যকতাও ছিল না; অতএব তাহা জাতির চিন্তা-সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইয়া নাটকের রসপ্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিত না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ গ্রন্থই একটা বিড়ম্বনার মত, একটা ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজের বাথ প্রমোদ পিপাসার নিদর্শন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওদিকে তখন গ্রামে গ্রামে বাঙালীর খাঁটি বাঙালী-প্রাণ উন্মুক্ত আকাশতলে শামিয়ানা ঘাট হইয়া, ইতর-ভ্রমের বিরাট আসর জমাইয়া, সারারাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণযাত্রা ও নানা পুরাণ-প্রসঙ্গের গীতাভিনয় শুনিতোছে। সহরের বাবুরাও তাহাদের প্রতি কম আসক্ত ছিলেন না; নাটক ছিল তাহাদের একটা পোষাকী আমোদ মাত্র; পোষাকী কথাটা এখানে উভয় অর্থেই সত্য।

এই যে যাত্রাগান, ইহারই রসপিপাসা আমাদের জাতিদেহের রক্তাণু। এ রস-রসিকতা ঠিক জীবন-রস-রসিকতা নয়—ইহা ভাষা-সে, বাস্তববিশ্বভিত্তিক একরূপ আত্মবিভোরতার রস; এই রসই দুর্বলচিত্ত, কর্মবিমূখ, অলস, কল্পনাপ্রবণ জাতির জীবনে সর্বকালে নবোপেক্ষা উপায়ে হইয়া আছে; বাংলা সাহিত্যে—অর্থাৎ বাঙালীর মস্তজীবনের ধারাবাহিক কাহিনীতে—সেই আদিতেও যেমন, রাজকার এই অস্তেও তেমনই, এই গীতিরসই আর সকল রসকে পরাভূত করিয়া বাঙালীর চিত্রে অধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য বাঙালী মহাকাব্য লিখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারে নাই—তাহার মস্তজাগত বৈষ্ণব ভাবাকুলতা মহাভারতের কৃষ্ণার্জুন-নির্যাত্তেও অনন্তদীর্ঘ ও অনন্তবিক্রম নায়ক না করিয়া মহাভারতের চরিত্র করিয়া তুলিয়াছে, সেখানেও সেই যাত্রাগানের গীতিরসবস্তুরূপে পোষাকে—কেবলমাত্র লম্পশাটপটাবৃত হইয়া, মহাকাব্যের সাকার-প্রাণশূন্য মাত্র লাভ করিয়াছে।

(২)

উৎকৃষ্ট নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে মানুষের জীবন; ভাবের বা চিন্তার জীবন নয়—নিয়ত অবর্তমান সৃষ্টিচক্রের ঘূর্ণাঙ্গ-তাড়িত, স্বেচ্ছা-মন-প্রাণের উৎক্ষেপ-আক্ষেপময় গতি-শক্তিমান জীবন; অর্থাৎ সৃষ্টির নিগূঢ় উৎস হইতে যে দূর্ধ্ব প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে একটা বিরাট কর্ম-যজ্ঞশালায় পরিণত করিয়াছে—মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য গীতমান ও বেগবান রাখিয়াছে—সেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-দুঃখাশা, সুখ-দুঃখ, পাপপণ্য প্রভৃতির স্বরূপ যে অপূর্ব রসরূপে মানুষের হৃদয়গোচর হয়—নিজেরই দেহমন-প্রাণের প্রবল অথচ অবশ ঘোষণাতে সে চািনতে যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা ভাব-জীবনে বা মনোজীবনে সম্ভব নয়; তাহা ওই প্রবৃত্তিময় জীবনেই সম্ভব; নাটকের রস এই রহস্যের রস, তাই নাটক এই জীবনেরই দৃশ্য-স্বরূপ। নাটক মাঝেই অভিনয়াক্ষর এই জন্য যে, উহার কোন অংশই চমক নয়, ভাব নয়, স্মৃতি বা ধ্যানের বিষয় নয়; তাহাতে সৃষ্টির সেই যদি গতিধারা; জীবন মূহুর্তে মূহুর্তে ঘটনাময় হইয়া উঠিতেছে, দশে ও কালে বিবর্তিত হইতেছে—একটা পরিণামমুখে দ্রুত ছুটিয়া লিতেছে। এই অর্থে ইহা দৃশ্যমাত্র—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির যথ্যা। যখন আমরা নাটকভিত্তিক দেখি—তখন জীবনের একটা ঘটনাক্ষর পুণি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; নাটকের যে Illusion তাহা আর কিছু নয়—অভিনয়ের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করে—সেই ঘটনার ধারায় আমরাও যেন 'ঘটিতে' থাকি। ইহােকই বলে নাটকীয় বস্তুর 'সাধারণ-গীত'—যাহা অপরের তাহা সকলের হইয়া উঠে, আমার চেতনা মানব-ধারণের চেতনায় এক হইয়া যায়, একযোগে সকলের সঙ্গে এই ও একই প্রকার অনুভূতি, ইহার মূলে আছে বিশুদ্ধ মানবতার প্ররণা; সে প্ররণা কোন বিশেষ আদর্শ, বিশেষ চিন্তা, বিশেষ নৈভাবমূলক নয়; কারণ, তাহাতে মানুষে মানুষে ভেদ আছে—ভিন্ন গীত, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কার ও ভিন্ন মতের বাধা বা আঘাত আছে; সেখানে বিশুদ্ধ জীবন-চেতনা যেমন থাকে না, তেমনই টানাক্ষর জীবনের অবকাশ নাই—ভাবনা আছে, ভাবকতা আছে, বক্তব্য-বিকল্পের বিরোধজনিত নিস্ক্রিয়তা আছে, নিস্তেজ প্রাণ-স্তব্ধ বার্যবিকৃত আছে; তেমন জীবন নাটকোপযোগী, অর্থাৎ 'দৃশ্য'

হইতে পারে না। এইরূপ জীবনের দৃশ্যও আধুনিক রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে অভিনয়ের রস দশকের সূক্ষ্মাং জীবনানুভূতির রস নয়—তাহাতে সে জীবনকে দেখে না, কতকগুলো ভাবনা-ধারণা-চিন্তাকে 'দৃশ্য'রূপে উপভোগ করে; এবং জীবন-চেতনার পরিবর্তে একরূপ মানস উত্তেজনা মাত্র অনুভব করে।

অতএব নাটক সার্থক হইতে হইলে তাহার উপাদান হইবে যে-জীবন—সে-জীবন স্থিতিশীল নয়—গতিমান, ভাবাক্ষর নয়—কর্মাক্ষর। সৃষ্টির প্রচণ্ড গতি-প্রবাহে—সেই বিরাট ঘূর্ণাচক্রে অবর্তন-মুখে মানুষের জীবনও যে গতিবেগ লাভ করিয়াছে এবং ঘটনাক্ষরে তাহার যে অশ্রুত বিকাশ ও পরিণাম—কেবল তাহারই রস প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়গোচর করানোই নাটকের একমাত্র কৃতিত্ব। নাটকের সহিত উপন্যাসের তুলনা করিলেই এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট বোধগম্য লগ্না যাইবে। উপন্যাসে ঘটনার ধারা নাই, কাহিনীর পূর্ব-পর বিবৃতি আছে। সেখানে গ্রন্থকারও যেমন নিজেকেই ভাবনা-ধারণা ধ্যান-কল্পনার বলে এবং স্মৃতিগত অভিজ্ঞতা হইতে, জীবনের একটা রূপ গড়িয়া তোলেন—তেমনই পাঠকও আপনার মানস-মুকুরে তাহার প্রতিচ্ছায়া ধরিয়া একটা কল্পনা-রস আশ্বাদন করিয়া থাকে—সে আশ্বাদনে জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার অবকাশ নাই—ভাবগত রসোন্মাদ আছে, প্রত্যক্ষদর্শনের চিত্তমগ্নকার নাই। নভেলের জীবন কাহিনীগত জীবন—সে কাহিনী 'লিখিত' হইয়াছে, অর্থাৎ লেখক তাহা বলিয়া যাইতেছেন; তাহা আর ঘটিতেছে না—ঘটিয়া গিয়াছে; এবং লেখক তাহাকে নিজের ভাববৃষ্টির দ্বারা যেমন দেখিয়াছেন, তাহার আবেশেই যে অর্থ বুঝিয়াছেন, সেই মত একটা রূপ তাহাকে দিয়াছেন। আমরাও যখন তাহা পাঠ করি তখন তাহার সেই ভাবনাকেই অনুসরণ করিয়া সেই পদ্যের ভিতর বিয়া তাহাকে দেখি—সে পদ্যের সঙ্গে আমাদেরও মনের পদ্যের নানা রং ও নানা নক্সার বহুটা সাদৃশ্য থাকে ততটাই তাহাকে স্বীকার করি। এই স্বীকার আমরা সেই চেতনা দিয়া করি না—যে চেতনা দিয়া আমরা নাটকের জীবনকে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। তাই যখন কোন উপন্যাসকে নাটকের আকারে অভিনয়যোগ্য করিয়া তোলা হয়, তখন প্রায় দেখা যায় যে, উপন্যাসে আমরা যাহা আশ্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম—নাটকে তাহা আশ্বাদন করিতে বাধা ঘটে, সেখানে জীবনকে যেখানেই না দেখিলে আমাদের সেই চেতনার উল্লেখ হয় না, সেরূপ দেখিতেছি না; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, উপন্যাসের সেই জীবন সাক্ষাৎ-দৃশ্য জীবন নয়; তাহাতে যে গতি আছে, তাহা প্রাণের গতি নয়—মনঃকল্পিত গতি; তাহাতে যে তাপ আছে, তাহা ভাবের তাপ—বক্ষণের তাপ নয়; তাহার কাহিনীও ঘটনা নয়—কল্পনা; তাহার রসও স্বতন্ত্র। কিন্তু নাটকে জীবনের যে রূপকে দৃশ্যমান করা হয় তাহা একান্তই ঘটনাক্ষর, তাহার প্রতি মূহুর্তকে এক একটি ঘটনার লক্ষণ বলা যাইতে পারে; সেখানে সকল কাজ, সকল কথাই সেই সেই ঘটনার লক্ষণ, যেন স্মৃতিগতের মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটনার সেই লক্ষণগুলিই মূখ্য, তাই সেখানে কথাগুলিও বাক্যময় ঘটনামাত্র; উপন্যাসের জীবন-চিত্রে এইরূপ হইবার প্রয়োজন নাই। উপন্যাসে কাহিনীবস্তুত্ব নাম স্পষ্ট; নাটকে কোন কাহিনী নাই—আগাগোড়াই 'action' বা ঘটনাবস্তু। নাটকে জীবনকে এইরূপ একটা actionরূপে দেখাইতে হয়। এ যেন একটা-কিছু আপনই আপনার অন্তর্নিহিত বেগের বশে, নিজেরই নিয়ন্ত্রিত তড়নায়, কোন-একটা বিশুদ্ধ হইতে সহসা উদ্ভূত হইয়া, আকাশে, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিপথে, আগনের রেখা টানিয়া অশ্বকার হইতে অশ্বকারে অদৃশ্য হইয়া গেল! তাহার যে দীপ্তি তাহাও সেই বেগের দীপ্তি; যদি সে বেগ না থাকে তবে দীপ্তিও নাই, এই দীপ্তিই তাহার নাট্যস্বরূপ; এজন্য যাহাকে action-রূপে ধরা যায় না, জীবনের সেই রূপ নাটকের উপযোগী নয়।

অতএব নাটকে আমরা জীবনকে, তাহারই নিজস্ব নিয়তি-নিয়মে, কেবলমাত্র ঘটনার মধ্য দিয়া একটা পরিণাম লাভ করিতে দেখি; সে পরিণাম আমাদের ইচ্ছানুরূপ নয়, কিন্তু আমাদের

গভীরতর চেতনার অনুমোদিত। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে কোন মত পোষণ করেন না—তিনিও জীবনের ভাবিয়াতা নহেন, দর্শক মাত্র। জীবনের গ্রাহ্যে ও ভিতরে যত সমস্যা আছে, তাহার জীবনেরই—তাহার মনের নয়; জীবনের মূলে কোনও ধর্ম বা নীতিসম্মত আদর্শ আছে কি না সে জিজ্ঞাসাও তাহার নাই; তিনি কেবল জীবনের সেই গতিরেখাটি আবিকার করিয়াছেন—সৃষ্টির সেই বিরাট গতিবেগের চক্রাক্ষুর রেখায় মানব-জীবন যেভাবে যে মুখে আবির্ভূত বা বিবর্তিত হইতেছে তিনি তাহারই রহস্য কেবল অনুভব করেন; বিচার করেন না, চিন্তা করেন না—অপরোক্ষ করেন। এই যে দর্শন ইহা যত গভীর ও ব্যাপক হয়, ততই নাটকে সেই দৃশ্যরস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। তখন নাটক আর শুধুই দৃশ্যকান্য নয়—উচ্চতর কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে। এইরূপ কাব্যগুণাগ্রাণ্ড নাটক জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে, এবং এইজন্য সেক্ষপীয়ার আভিও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি।

কিন্তু নাট্যকারও এমন কবি হইয়া উঠেন কোন্‌ গুণে? এক কথায় বলিতে হইল—জীবনকে আতিশয় বিশুদ্ধ ও সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারার গুণে; সে দেখায় এমন একটা অনুভূতির উদয় হয়—যাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ রসিকতা। আমাদের দেশের দার্শনিক ভাষায় ইহাকেই সংচিৎ-আনন্দ বলে। জীবনের সেই 'সং' অর্থাৎ তাহার অন্তঃপ্রত্যয়ের সেই খাঁটি 'অস্তি'-স্বরূপটির অখণ্ড অপরোক্ষ দর্শন যখন হয়, তখন তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যে বোধ এবং রসাস্বাদ অবশ্যলভ্যরূপে উদ্ভূত হয়, তাহার তুলা অনুভূতি মানুষের চেতনায় আর নাই। ঐ যে খাঁটি দৃশ্যরূপ (দর্শকের ভাব, ভাসনা, চিন্তা প্রভৃতির সর্ব প্রলেপ-মুচ্ছ) তাহারই দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র হইয়া আমরা তখন সে মুক্তি অনুভব করি, তাহা হইতেই পরম রসাস্বাদ হইয়া থাকে; কারণ, জীবনকে যত প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে উপলব্ধি করি ততই আশ্চর্য্যজন্য প্রসূদ্ব হয়, আবার সেই প্রসূদ্ব চৈতন্যই জীবনকে একটা লীলারূপে আস্বাদন করে। ইহাই প্রকৃত রসাস্বাদ; এটি রসাস্বাদের জন্যই নাটকে জীবনকে বাস্তবের ক্ষেত্র হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া তাহাকে একটা আভিনয়িক রূপ দেওয়া হয়। তখন বাস্তব প্রয়োজন বা স্বার্থঘটিত সকল সংস্কার মুক্ত হইয়া আমরা আমাদেরই সহজ ও সুগভীর মানবতার চেতনায়—চিন্তাহীন, তর্ক-সংশয়হীন অকুণ্ঠিত অবাধ জীবন-বেগকেই অনুভব করি; যে-সুখ-দুঃখ, ভর-ভাবনা, পাপ-পুণ্যবোধ বাস্তবের অর্থাৎ জাগর-চেতনার কঠিন বন্ধন আমাদের একে এত উদ্ভাসিত করিয়া থাকে, তাহারই তখন এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করে যে, মনে হয়, আমরা তাহাদের দাস নই, তাহারাই আমাদের দাস। তথ্যটি ইহা যেসময়ের স্পর্শক'না নয়। ইহার আদিতেও যেমন, অন্তেও তেমনই, জীবনের অনুভূতি আছে—সেই জীবন মানবীয় জীবন;—মানুষের চারিত্র, মানুষের নিয়তিই সেই জীবনের মূলে গ্রন্থি। তাই নাট্যকার যখন আমাদের সেই জীবনানুভূতিকে নাটকের সাহায্যে এমন স্পর্শক, এমন অপরোক্ষ করিয়া তোলে, তখন তাহার মত কবি কে? মানুষের জীবনেই—তাহার দেহমন-প্রাণের বশ্চরিত্র উপরে সৃষ্টির শতদল পরাগ-মধুতে ভরিয়া উঠে; যে পদ্মের চারিপাশে অপহ কাবণ্য ভ্রমরের মত গীতিগুঞ্জন করিয়া থাকেন, সেই পদ্মই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রতিভায় নাটকরূপে প্রক্ষুণ্ণিত হইয়া মধু ও মধুপের, গীতি ও গুণনের—অচিন্ত্যভেদভেদ একই কালে আমাদের চিত্তগোচর করে; কারণ, তখন আমরাই পদ্ম, আমরাই মধু, আমরাই আবার ভ্রমর হইয়া থাকি; অশেষতর এই শ্বেতরিলাসই শ্রেষ্ঠ কাব্যরস; একন এই কথাটাই আমি নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলাতে বলিতে চাইয়াছিলাম—

মধু সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
আপনারি প্রাণ দুইখান হয়ে—হল বর, হল বধু!
একখানি তার ফলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আরখানি তার প্রজাপতি হয়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাশুড়ি কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু, কার মধু!

নাহি গুজন, শব্দ, ভুজন! স্ফূপাশন—শব্দ, শব্দ!

(অধারের লেখা—স্বপন-পসার)

এই প্রসঙ্গে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। জীবনের সম্বন্ধ, সকল বিরোধ, বৈষম্য ও নিষ্ফলতার উপরে মানুষের অন্তরে যে দিব্যদৃষ্টি জয়ী হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজ আধুনিক ইরাজ মনীষী বিলাতী নাটকের শ্রেষ্ঠ রসরূপ—টোজেভ' উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

Of all the arts tragedy is the proudest, the most triumphant; for it builds its shining citadel in the very centre of the enemy's country... within its very wall the free life continues while the legions of death and pain and despair, and all the servile captives of tyrant fate afford the burghers of that dauntless city new spectacles of beauty. Happy those sacred ramparts, thrice happy the dwellers on that all-seeing eminence.

(৩)

নাটক সম্বন্ধে এই যাহা বলিলাম, ইহা নিতান্ত তত্ত্বকার মত হইলেও অর্থাৎ নাটক-সৃষ্টি ও নাটক-উপভোগ—নাট্যকার ও দর্শক—এই দুয়ের যে সম্বন্ধ বা সহযোগ, সাক্ষাৎভাবে তাহার বিচার এইরূপ আলোচনার দ্বারা সম্ভব না হইলেও—আমি এই প্রসঙ্গের অবকাশ নাটকীয় তত্ত্বেরও একটু ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছি; কারণ, ইহা হইতে নাটকের আদর্শ কি, তাহার প্রেরণা কত গভীর হইতে পারে, এবং তাহার সেই রস-প্রেরণা আমাদের চিত্তের কোন্‌ তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহার একটু ধারণা করা সম্ভব হইবে; এবং সেই ধারণা হইতে নাটকের নান্যতম সাফল্য কিসের উপর কতটুকু নির্ভর করে তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে। আরও কারণ এই যে, আধুনিককালে নাটকের নান্যরূপ ও নানা আদর্শ দেখা দিয়াছে—কাব্য, উপন্যাসে, চিত্রকলায় যেমন, তেমনই নাটকের রসসৃষ্টিতেও এখন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এজন্য নাটকের সংজ্ঞাও নানা প্রকার হইতে বাধ্য—নাটক নামটি সর্বনামের মত ব্যবহার করাও যেন আর চলে না। অতএব, আমি নাট্যরসের বিচারে একটা মূলতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি—যাহাতে রূপভেদ ও সংজ্ঞা-ভেদ সত্ত্বেও, সর্বত্র উৎকর্ষের আদি প্রমাণটি হারাইয়া না যায়। তত্ত্ব-আলোচনার আরও প্রয়োজন এই যে, আধুনিক মানুষের রুচি ও রসবোধ—জীবন সম্বন্ধে নূতন বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রভাবে এমনই ভিন্নমুখী হইয়াছে যে, আমি নাটকের যে আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি—তাহাকে 'অনেকেই' হয়ত স্বীকার করিবেন না। তা' ছাড়া, আরও বিপদ আছে; একালের 'ইণ্টেলেক্টুয়েল'গণ 'ডায়ালেকটিক'-বর্জিত কোন বিচারকে গ্রন্থা করেন না; কাব্য, নাটক, উপন্যাসের রসবিচারেও 'ডায়ালেকটিক' মানা করা চাই—নতুবা, আদিম সংস্কার অথবা ফ্যাসি-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হইবে। তাহাদের মতে জড়-তত্ত্বই জগতের মূলতত্ত্ব, অধ্যাত্ম বা অধিভূত বলিয়া কিছু নাই; প্রাণ ও মন দুইই জড়তত্ত্বের অধীন; ভাব বলিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন কিছু নাই—বস্তুই প্রভু। এহেন দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের যে মুক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে নাট্যীকৃত করিলে নাটকের রূপ-রস অবশ্য বিপরীত হইতে বাধ্য। এইজন্য আমি একটা মূল তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি; তাহাতে আশা হয়, নাটকের রূপভেদ যেমনই হোক, তাহার কোন্‌ রূপটিতে মানবচিন্তার গভীরতম উৎকর্ষের তৃপ্ত-সম্ভাবনা আছে—যাহারা কেবলমাত্র মানুষ, কোনরূপ মতবাদের চিন্তা-যন্ত্র নয়, তাহারা আশ্চর্য্য-প্রমাণেই তাহা স্থির করিয়া লইবে।

কিন্তু সে কথা এখন এই পর্যন্ত। উপস্থিত প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন ছিল—সার্থক-নাটক ভিতরে ও বাহিরে কোন্‌রূপ উপকরণের উপরে নির্ভর করে? ভিতরের কথা বলিতে গিয়া আমি তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার সকল জটিলতা ত্যাগ করিয়া শুধু ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মানুষের জীবনই হইবে নাটকের আশ্রয়-বস্তু, এবং জীবন বলিতে—মানুষের দেহমন-

প্রাণের সকল
আকৃতি, উৎকর্ষ
ও প্রবৃত্তির
সাক্ষাৎ কার্য-
কারণ গণিত যে
নিরন্তর উত্তে-
জনা ও তাহারই
ঘাত প্রতিঘাতে
কর্মরূপে ই
তাহার যে অভি-
বাস্তি — তাহাই
বুদ্ধিতে হইবে;
অর্থাৎ, সেই
জীবন, যাহাতে
তাহার চরিত্র ও
ও সেই চরিত্র-
গত নিয়মিতই
মুখ্য। 'চরিত্র'

সত্য দিবসের ব্যর্থ প্রাণের ২৩ বীণা ২৩ কালী
প্রতি উত্তর দেহ নবীন আশার আলো দিবে প্রকাশিত।

মে বিদ্যাসহস্র

৪ মে ১৯৫৬

শ্রী অজয়ীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

হা সোয়া দ্বীপ ক
তু জ্ঞান বা
প্রাণী জনক
মহত, আশানু-
রূপ সফলতা
বা হৃদয়বিদারক
নিষ্ফলতা —
পরিণাম যেমনই
হোক, সকলের
মতোই সেই
এক অনুভূতির
বীজ বিদ্যমান—
জীবনের গতি
ও নিয়তির
একটা রহস্য-
বোধ। এই
বোধটি জাগাই-
বার জন্য ই

কথাটি আমরা এক্ষণে যে অর্পণ করি তাহাতেও গোল আছে।
খাটি হিন্দু দর্শনের ভাষায় 'চরিত্রকে সেই মনোদেহ বা সূক্ষ্মশরীর
বলা যাইতে পারে, যাহা জন্মান্তরীয় কর্মের দ্বারা গঠিত হইয়াছে—
যাহা নিজেরই অনুরূপ একটা ভোগাতন স্থলদেহ ধারণ করে।
এই চরিত্রই তাহার স্ব-প্রকৃতি যাহাকে সে লক্ষ্যন করিতে পারে না,
যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— "Character is Fate" বা

সদৃশ চেষ্টাতে বসমা প্রকৃতিজ্ঞানসান্নিধ্য।

প্রকৃতিগত যান্ত্রিক ভূতানি নিরন্তর কিং করিয়াতি ॥

পাশ্চাত্য মনীষীও এই প্রকৃতিকেই মানুষের জীবনের প্রকৃত
নিয়ন্তা বলিয়া, Reason বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহার নিম্নে
স্থান দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে 'চরিত্র' অর্থে শুধু এইটুকু মত
বুদ্ধিবেশে চলিবে যে, মানুষের সকল প্রবৃত্তির মিলিত একটি যে
বাস্তব-সত্তা ভিতরে বিদ্যমান থাকিয়া বাহিরেও একটি অনিবার্য
কর্মধারায় তাহার জীবনরূপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে তাহাই
মানুষের চরিত্র। মানুষের এই চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার
মস্তিস্কজাত যান্ত্রিক বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার আত্মগোপনের যত প্রকার
সামাজিক পোষাকপরিচ্ছদ, অথবা তাহার প্রাণশক্তিহীন মনোবিকারের
যত লক্ষণ—সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে। সে যাহা বলে
তাহা নয়—যাহা করে তাহাই তাহার চরিত্রের পরিচয়। কারণ তাহাই
তাহার সেই চারিত্রিক প্রবৃত্তি; এবং ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই
দেখা যাইবে—যে-চিন্তা, যে-নীতি, বা যে-মতবাদের দোহাই সে
দেয়, তাহার মূলে কোন আত্মনিরপেক্ষ সত্যের উপাসনা নাই;
নিজের প্রবৃত্তি অনুসারেই সে একটার পক্ষপাতী ও অপরটার
বিরোধী হয়; অথবা সেই নীতি তাহার একটা মুখোশ মাত্র। তাই
নাটকে এইরূপ মতের মতহিসাবে কোন পৃথক মূল্য নাই; চরিত্রগত
একটা লক্ষণ হিসাবেই তাহা মূল্যবান—সেও তাহার 'প্রকৃতিরই
একটা চেষ্টা'।

তবে নাটকের বিষয়ীভূত সেই যে জীবন, তাহার গতি-
চক্রে এই চরিত্রই আবর্তিত হইয়া শিখায় ও স্ফুলিঙ্গমালায় মানুষের
নিরীতিকে নিরীতিশয় দৃষ্টিগোচর করিয়া তোলে! 'নিয়তি' অর্থে
শুদ্ধই ঘটনার শৃঙ্খল নয়; তাহারই মধ্যে যে অনিবার্য পরিণাম-
মুখিতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং সর্বশেষে একটা কোনরূপ
পরিণাম, অর্থাৎ ঘটনা-পরপরার একটা অর্থ আমাদের চিত্তে প্রকাশ
পায়—তাহাই মানবজীবনের অন্তরালে একটা অলক্ষ্য বা অদৃষ্ট
শক্তির লীলা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। সে যে কি, তাহা বাক্যে প্রকাশ
করা যায় না; সে একটা অনুভূতি মাত্র; কিন্তু তাহাই আমাদের কাছে
আশ্রয় করে—তাই রসদ্রেক হয়। নাটক-বিশেষের পরিণাম যেমনই হোক,

নাটকের ঘটনাবলী একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সমান সুসম্পন্ন—আদর্শ-
যুক্ত অর্থাৎ সমান্তরালসম্পন্ন হইবে; আরম্ভের মধ্যেই যাহার বীজ
ছিল—যাহা ঘটনাপন্থারূপে অনিবার্যবেগে বিকাশ হইয়া
চলিতেছিল, তাহার সেই বেগ, নিঃশেষ হইবার কালে, আরম্ভ ও
পরিণাতিকে যেন একটি মুহূর্তে মিলাইয়া এক করিয়া দিবে।
এজন্য কেবল কতকগুলি ঘটনার সমাবেশই নাটক নয়; তাহা আমাদের
চিত্তে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সাড়া জাগায় মাত্র; তাহাতে জীবনের
সেই অখণ্ড রহস্যের অনুভূতি নাই; তাহাতে জীবনের সঙ্গে
সাদৃশ্যবিশ্বাসের যোগসূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না; যে-নিয়তি বা অদৃষ্ট
নাটকেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অদৃষ্টই থাকিয়া যায়।
এই যে আদর্শযুক্ত আরম্ভ-পরিণামী ঘটনার ধারা, ইহাই নাটকের
ঘটনাবলীর সমান্তরাল action; এই action-এর ছাঁচে ফোঁটিতে
না পারিলে জীবনকে নাট্যীকৃত করা যায় না।

(৪)

এতক্ষণে বোধ হয় বুদ্ধিতে পারা গিয়াছে—জীবনকে কোন
রূপে দেখানো নাটকেই সম্ভব, এবং দেখাইতে না পারিলে নাটক
সার্থক হয় না। এই যে দেখানো-ইচ্ছার বা অর্থ কি? যাহা
দেখানো হইবে ও যে দেখাবে—দৃশ্য ও শ্রুতি, এই দুইয়ের, অর্থাৎ
সাক্ষ্য ও সাক্ষীর মধ্যে যে সাক্ষাৎকার, তাহা যত অব্যাহিত হইবে,
নাটক ততই জীবনায়িত্ব হইয়া উঠিবে। যাহা দেখিতেছি, তাহা
ভাবনা, চিন্তা নয়, তাহা একটা গতিমান বস্তু; যেন বস্তুও নয়—
নিচক গতি; গতিমান বস্তুকে দূর হইতেও দেখা যায়, মনের
দ্বারা তাহার একটা ধারণা করা যায়; কিন্তু যাহা গতিমান—
প্রাণবেগের গতি, তাহাকে দেখার অর্থ তাহার সহিত প্রাণে যুক্ত
হওয়া—সেই গতিতে নিজেও যেন গতিশীল হওয়া। দৃশ্য ও শ্রুতির
মধ্যে এই যে ব্যবধানের লোপ, নাটকান্ধনয়কালে ইহাই হওয়া চাই
—নতুবা নাটকের নাট্যরূপ সার্থক হইবে না। নাট্যকার 'দেখাইবেন',
দর্শক 'দেখিবে'—উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট সহযোগিতা রহিয়াছে।
এখন সেই—'একাকী গায়কের নহে ত' গান, গাহিতে হবে
দুইজনে।' কিন্তু তাই কি? অর্থাৎ নাটকের সেই সার্থক রসরূপের
জনা দুই পক্ষই কি সমান দারী? এই প্রশ্ন একটি বড় প্রশ্ন,
ইহার ভালরূপ মীমাংসা আবশ্যক। পূর্বে যাহা বলিমাছি তাহাতে
একটা কথা সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে কথা এই যে, নাট্যরস
আস্বাদনের জন্য দর্শকের কোন বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা বা চিত্তপ্রকর্ষণ
প্রয়োজন নাই; তাহাতে যে কবুতর সাড়া জাগে, তাহা শিক্ষিত-
অশিক্ষিত পণ্ডিত-মুখ নির্বিশেষে মানুষমাত্রের অন্তঃকরণে নিহিত
আছে—তাহা মানুষের স্বপ্রকৃতিগত। এজন্য নাটক কোন পণ্ডিত বা
রসিক বা মাজিতরুচি ও সুশিক্ষিত দর্শকের জন্যই নয়—মানুষ-

মায়েরই উপভোগ্য; শুধু তাহাই নয়—পাঁচ-দশ সর্কলেরই একত্রে একযোগে উপভোগ্য; নাটকের সেই দৃশ্যবস্তুর দেখবার জন্য কোন পুষ্টিগত-পাণ্ডিত্য অথবা বিশিষ্ট রুচি কিম্বা বিশেষ কোন ভাবুকতা-শক্তির প্রয়োজন হয় না—কোনও মতবাদ বা তত্ত্বমস্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয় না। অতএব, সে পক্ষ নাট্যকার বা অভিনেতার কোন আশংকার কারণ নাই; সেই সাদা জাগাইতে হইলে তাহার নিজেরই কৃতিত্ব চাই—যেখানে তাহা জাগে না, সেখানে দর্শকমণ্ডলী দারী নয়। কিন্তু মীমাংসা এত সহজ নয়; কারণ, দর্শকমণ্ডলীর চিন্তাহরণ করিতে পারিলেই নাটক যে উৎকৃষ্ট নাটক না হইতেও পারে, তাহাও আমরা জানি; সেখানে নাট্যকার নয়, দর্শকমণ্ডলীর জীবনরসরসিকতার মাত্রাভেদ, অথবা একান্ত অভাবই তাহার কারণ। সেসঙ্গে ক্ষেত্রে অভিনয়-সাক্ষ্য সত্ত্বেও নাটকের উৎকর্ষ ঘটিল না; এবং যেহেতু সাধারণ রসগ্রাহিতার উপরেই নাটকের নাটকীয় নির্ভর করে, অতএব তেমন মনেছ উৎকৃষ্ট নাটক জন্মিতে পারে না; সেজন্য নাট্যকারও দারী নহেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নাটকের সাক্ষ্য যদিও নির্ভর করে প্রোত্মণ্ডলীর রসগ্রাহিতার উপরে, সেই রসগ্রাহিতাও নির্ভর করে সূক্ষ্ম ও প্রবল জীবনচেতনার উপরে। এই জীবনচেতনার মাত্রাভেদ আছে, জাতি ও সমাজবিশেষে ইহার প্রকৃতিভেদও আছে; যুগও অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। এজন্য শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অল্পসংখ্যক নাটকই উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নাটক-হিসাবে নাটকের একরূপ সাক্ষ্য বা সার্থকতার কোন বাধা ঘটিবে না—যদি কোন-না-কোন কারণে তাহা দর্শকমণ্ডলীর সেই 'দেখা'র বস্তু হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ এখানেও সেই গটাইলের কথা থাকে। নাটকের বস্তু যেমনই হোক, যদি তাহা 'দৃশ্য' হইয়া থাকে, তবে তাহা 'good style'-এর নাটক বটে—'great style'-এর উৎকৃষ্ট নাটক হয়ত নয়। এইখানেই নাটকের কাব্যগুণের প্রশ্ন উঠে; দর্শকের চিত্তে সাদা জাগাইলেই হইবে না—তাহা না হইলে সে তা নাটকই নয়, অর্থাৎ good styleও নয়; তাহারও উপরে যে গুণ না থাকিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট নাটক বলা যাইবে না—তাহা এই কাব্য-গুণ, অর্থাৎ জীবনের সমগ্র-গভীর দম্যন্ত অনুভূতি-উদ্বেগের গুণ। এই গুণের উপরেই নাটকের মহত্ত্ব নির্ভর করে—এই গুণেই তাহা সাহিত্যেও অমরত্ব লাভ করে।

তথ্যাপ খটি নাটক বলিতে কি বুদ্ধি—সে বিষয়ে কোন গোল থাকিলে চলবে না। এতক্ষণ সে বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে খটি নাটক সম্বন্ধে একটা ধারণা নিম্নে হইয়াছে, এবং তাহা এই যে, নাটকে জীবনকেই গতিমান রূপে দেখানো হয়—সে-রূপ 'ঘটনার' রূপ; তাহাতে মানুষের 'চরিত্র' অর্থাৎ স্ব-সংস্কার ও কর্ম-প্রবৃত্তি 'রিয়ান' হইয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়া, জীবনের একটা বিশেষ অনুভূতির উদ্বেগ করে। কারণ, সেখানে যাহা কিছু হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই ঘটনাস্থল; সে সকল ভাব ও ভাবনা, আবেগ ও উদ্দীপনা, হর্ষের উল্লাস ও বিষাদের অবসাদ—ঘটনারই ঘাতপ্রতিঘাতমূলক; অস্তরের ঘ্যান, চিন্তা বা কল্পনার বাহ্যিক প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস নয়, বাদ-বিতর্ক নয়, বৃক্ষতা বা কবিত্ব নয়। নাটকের সব কিছুই ঘটনামূলক—অর্থাৎ সেই 'কিমান' প্রবৃত্তির তৎসংগত অভিব্যক্তি। প্রবৃত্তির এই সাক্ষ্যই ক্রিয়মান অবস্থার বাহিরে আমরা যাহা কিছু, চিন্তা করি, ঘ্যান করি বা কল্পনা করি, অর্থাৎ যাহা ভাবমাাত্রা—জীবনের সেই গতির আবেগের মধ্যে পড়িয়াই আমরা যাহা অনুভব করি না; একটু দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে, যাহার কোন বিশেষ দেশ কাল নাই, অস্তরে উদ্রিক্ত হইলেও বাহিরের সহিত যাহার কোন নিয়তি-শাসিত কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই—তাহার উপরে নাটকের প্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, কেবল রসের আশ্বাদনই নাটকের অভিপ্রায় নয়; সেইরূপ আশ্বাদন জীবনকে বিস্মৃত হইবারই একটি উপায়; তাহাতে জীবনেরই কোন রূপ দেখবার প্রয়োজন হয় না; হৃদয়ের কতকগুলি আবেগ ও ভাবকে (emotions) অনুভবে

(sentiments) পরিণত করিয়া বেদান্তরস্পর্শন্য একটা মাধুর্যের অনুভূতি হইলেই হইল। ইহাকেই অতি সূক্ষ্ম কাব্যরস বলে—ইহা সত্যকার জীবনরসরসিকতার পরিপন্থী। নাটকেও যদি ইহার প্রাধান্য ঘটে, তবে তাহা খটি নাটক নয়, তাহা কবাই বটে।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটক হইতে আধুনিক নাটক পর্যন্ত এই ভাবরসের উদ্দীপনাকেই মূখ্য করিয়াছে—মুরোপে এইরূপ নাটকের পৃথক জাতি ও পৃথক নাম নির্দিষ্ট আছে। আমাদের আধুনিক নাটকও মানব-চরিত্রের বা নিয়তি-নিয়মের গূঢ়তর রহস্য অনুপ্রাণিত নয়। ইহাও এই দেশেরই জলবায়ুর গুণ; এখানে সকল চেতনাই যেন বাস্তববিমূখ—বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া বেশী দূর অস্তর হইতেই পারে না, মধ্যপথেই ঘুরিয়া ভাবমার্গে প্রস্থান করে। যাহারা প্রকৃত বৈ-রসিক তাহারা যোগসনে বসিয়া দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরাজ্ঞানের সাধনা করে; রসিক হইলে, ভক্তিমার্গের মিস্টিক সাধনায় জীবনকে ঘাঁকি দিবার উপায় করে। আমি ইহার কোনটাকেই নিন্দা করিতেছি না—বরং ভারতীয় প্রতিভা ও মনীষার এই স্বকীয়তাকে গভীর প্রশংসা করি। এখানে আমি এ জাতির পক্ষে নাটকসৃষ্টির যে বাধা আছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি; নাটকের নাটকীয় বিচার করিতেছি; যাহাকে খটি নাটক বলিয়া বর্ণিয়াছি, আমাদের জীবনে তাহার অত্যাবশ্যক উপাদান ও উপকরণের অভাবের কথা বলিতেছি।

এই যে ভাব-মাত্রের কথা আমি উত্থাপন করিয়াছি—ইহার সম্বন্ধেও যেন কোন ভুল ধারণা না ঘটে। আমি কোন ভাব বা emotionকে নাটক হইতে বহিষ্কার করিতেছি না। মূল কথা, সকলই চরিত্রের অর্থাৎ প্রকৃতি-জীবনের ঘটনাগত অভিব্যক্তি হওয়া চাই। একথা ত আমরা সকলেই মানি যে, নাটক দর্শনিকালে আমরা অতি গভীর আবেগে অবশে অভিজুত হই। এই যে ভাবের আবেগ, ইহা মানসিক চিন্তাপ্রসূত নয়—ইহা জীবনচেতনার—দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনের—মস্তনজাত আবেগ; ইহাতেই আমরা আমাদের অস্তরের অন্তরতম পরিচয় লাভ করি। কিন্তু যে আবেগ সাধারণ জীবনানুভূতির আবেগ নয়, যাহা ঘ্যান-চিন্তা, ভাবনা-কল্পনা, অথবা কোন তত্ত্ব-বিচারের ভাবোদ্দীপনা মাত্র—বাস্তব প্রবৃত্তি বা সূখ-দুঃখের কর্মপ্রেরণার সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই, বরং যাহা কর্মপ্রবৃত্তিকে স্তম্ভিত করিয়া অলস-উপভোগেই পর্যবসিত হয়, তাহার স্থান নাটকে নয়—কাব্যে। কিন্তু এই সকলই যদি সত্যকার জীবনানুভূতির অঙ্গাঙ্গী হইয়া উঠে—মানুষের চরিত্রকে তথা নির্যাতকেও আচ্ছন্ন করে, তবে ইহারাও খটি নাটকেরই উপাদান; বরং সেই নাটকই উৎকৃষ্ট কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে।

আমাদের নাটকগুলির সম্বন্ধে এই শেষের কথাগুলি বিশেষ প্রণয়নযোগ্য। সে নাটকে যে-বস্তুর অত্যধিক সম্ভাব দেখা যায়, তাহা এরূপ ভাবমাত্রের উদ্দীপন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমাদের জীবন-সংস্কার বা জীবন-চেতনা খটি নাটকের অনুকূল নয়। আমরা 'চরিত্র'বান নই, আমরা জীবনের সহিত খুব গভীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সাধনের পক্ষপাতী নই—বাস্তবের আঘাতে আমাদের প্রবৃত্তি কঠিন হইয়া উঠে না; তার কারণ, আমরা বহুকাল হইতেই অহিফেন সেবন করিতেছি—হাস্য, হাওয়াতেও যেন অহিফেন-বিষ আছে, তেমনই দেহের রক্তেও তাহা পূর্ব হইতেই ছিল, কিম্বা জল-মাটির গুণেই এমন হইয়াছে। আমরা মূলে বস্তুতাত্ত্বিক নই—ভাবতাত্ত্বিক; বস্তু আমাদের সহিত বেশী বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিলেই, আমরা তাহাকে ধাম্পাকায়ে ভাবলোকে পাঠাইয়া সকল বিশ্ব দূর করি; যত বড় আঘাত হউক, আমরা তাহা মনে মনে এড়াইবার উপায় করিয়াছি—বৈরাগ্য এবং ভক্তি—এই দুই-এর তত্ত্ব আমাদের একরূপ সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে; এজন্য কোন ধাক্কাই ভিতরে বেশী দূর পৌঁছিতে পারে না। আমাদের জীবন-চেতনায় 'চরিত্র'রোষ নাই—যে 'নির্যাত' সেই 'চরিত্রের পরিণামরূপে প্রকাশ পায়, তাহার ধারণাও নাই। অদ্ভুতরূপী 'দৈব' আছে, তাহারই মার খাইয়া মানুষ কঠিন; এবং অতিশয় 'সাদু' 'ভালমানুষ'ও যখন

કાકા અને
જાકા
શ્રીગણેશ



সন্তান জাতির ভবিষ্যৎ



সন্তান-জনন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য
উন্নত মানুষ। মৌডেলিয়ান
আইন আবিষ্কারের পর জনন-
শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইন
প্রমাণ করেছে যে, পিতামাতার
দোষগুণ সন্তানে দেখা দেয়।

মানুষের চরিত্র নির্ভর করে দুটো জিনিষের উপর: পারিপার্শ্বিক ও জন্মগত উত্তরাধিকার।
জীবনের জন্মে উন্নত ব্যবস্থা করে উপস্থিত জনগণের স্বাস্থ্য ভালো করা যেতে পারে,
শিক্ষার সুব্যবস্থা করে সামর্থ্যের সম্ভাব্যহার করা যেতে পারে; কিন্তু স্থায়ী উন্নতি সম্ভব
হবে শুধু উপস্থিত বংশের স্বাস্থ্য ভালো হলে। রক্তে যদি দোষ থাকে, তাহলে শুধু
পারিপার্শ্বিকের উন্নতি করে বিশেষ কিছু লাভ নেই। স্বাস্থ্যের অভাব শুধু বিস্তৃত
নয়, ধনীরা ঘরেও রয়েছে। প্রত্যেক নগরবাসীর কর্তব্য হ'ল অসুস্থ, পঙ্গু, প্রাণশক্তি-
হীন সন্তানের জন্ম না দেওয়া।

আপনার রক্ত পরীক্ষা করান সরাসরি ভি, ডি, ক্লিনিক্স-এ

অনুসন্ধানের জন্য:- চিঠিপত্র লিখুন-ডাইরেক্টর, হাইজিন ইনস্টিটিউট, ১১০,
চিকিৎসক এডিনউ, ডাইরেক্টর, ভি ডি ক্লিনিক্স, ৮৮, কলেজ স্ট্রীট। ফোন করুন-বি, বি,
৫৯২১ অথবা পি, কে, ১২০। দেখা করুন। ডাইরেক্টর, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

বিনামূল্যে ও গোপন ব্যবস্থাপ্রদানে চিকিৎসা করা হয়।



পুরুষদের
চিকিৎসাকেন্দ্র

মহিলাদের
চিকিৎসাকেন্দ্র

মেডিকেল কলেজ
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ
ক্যামেল মেডিকেল স্কুল
চিকিৎসক হাসপাতাল
শমভূনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল
লেডী ডাক্তারি হাসপাতাল
আলীপুর ভলান্টারী ভেনিরিয়াল হাসপাতাল

সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র সকালে ও বিকালে খোলে।

তখন আমার সরাসরি খাওয়া উচিত নয়। তবে কান্ট'কবাব, হাট পুরাম' করবার জন্যে লেজে আমাকে ডাকেন তো আমি যেতে পারি।" বিনয় কাঁচুমাচুমে কহিল, "বেশ! আমি তাই বলব।"

থুকী এক কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "কালও আসবেন কিম্বা?" পরেশ কহিল, "নিশ্চয়! এমন নগদ কী পেলে আবার ডাক্তার না আসে?" বিনয় থুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাব কি করছে রে? ডেকে দে তো। আর দেখ, চায়ের জল কি শুধু এক কাপের জন্যেই চড়িয়েছিল? মানে—আমার জন্যে—মানে—" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আজ ঠান্ডাটা একটু বেশি পড়েছে না?" সুখদা কহিল, "আবার চা কেন? এই খেলে যে!" বিনয় কাঁচুমাচুমে কহিল, "তা খেলায় বটে, তবে—থাক।" থুকী কহিল, "গরম জল এখনও আছে বাবা, আমি চা করে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনয় হাকিয়া কহিল, "আর তোর দিদিকেও ডেকে আনি।"

কিছুক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা হস্তে ববির আবির্ভাব ঘটিল। দীর্ঘপদে—নতমুখে বিনয়ের কাছে গিয়া তাহার হাতে পেয়ালাটা দিয়া তাহার অন্য পাবে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ চা-পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখানে একবার এস দেখি, ওজনটা একবার নিয়ে নিই।" ববি আনতমুখে বাম পায়ের বাড়ী আঙুল দিয়া মেঝেটা ঝুটিতে ঝুটিতে নিন্মকণ্ঠে বিনয়কে কহিল, "কেমন করে ওজন করতে হয় তুমি দেখে নাও বাবা! পরে তোমার কাছে ওজন হবে।" বিনয়া ববির দিকে তাকাইয়া সম্মুখে কহিল, "লজ্জা করছে? পরেশের কাছে লজ্জা কি মা! যা।" ববি আবদারের সুরে কহিল, "না বাবা!" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ওজন হবে নাব? যাও না।" সুখদা বিনয়ের দিকে সংকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ঐ রকমই বৃদ্ধি কিনা!" তীব্রকণ্ঠে কহিল, "নিজের যাও না।" স্ত্রীর কঠিনরে ক্রোধের আভাস দেখিয়া বিনয় মাঝড়িয়া গিয়া কহিল, "আমি বাব? কি বল হে পরেশ! তাহাট্টে যাই তা হ'লে।" পরেশ বিরমুখে কহিল, "বেশ তো তাই আসুন।"

(৭)

ঘোষালপাড়ার ও চক্রবর্তীপাড়ার মাঝখানে যে পড়ে জমিটা লইয়া দুই পাড়ার মধ্যে অনেক দিন দরিয়া মাঝমাঝসে চলিয়াছিল, কান্ট'ক ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সেইখানেই। ঘোষাল ও চক্রবর্তী উভয় পক্ষই কান্ট'ক ডাক্তারকে এই জমিটা রণিতমত দানপত্র লিখিয়া দান করিয়াছে। কান্ট'ক ডাক্তারের বাড়ি এ গ্রামে নয়; দামোদরের তীরে কোন এক পল্লী-গ্রামে। আর জি কর স্কুল হইতে পান করিয়া সেইখানেই প্রাক্টিস শুরুর করিয়াছিলেন। মালেরিয়ার মহাশো অল্পদিনের মধ্যেই বাদসা জমিয়া উঠিল, রোগীর ভিড়ে ডাক্তারের নাওয়া-খাওয়ার সময় রহিল না; ডাক্তার দুই হাতে পরসা কুড়াইতে লাগিলেন। পৈতৃক মোটে, খাড়া বাড়ির জায়গায় একতলা পাকা বাড়ি উঠিল; জমি-জমা পুকুর-বাগান হইল; ডাক্তার জিহবীর অঙ্গে ও কাশবাজে স্বর্ণালঙ্কার ধরবার স্থান রহিল না; পাশাপাশি দশ বারোটা গ্রামের মধ্যে কান্ট'ক ডাক্তার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন রহিল না। হঠাৎ দামোদরের গতি ও মতির পরিবর্তন হইল; এতদিন দরিয়া ও-কূল ঘেঁষিয়া বহিতোছিল, ১৯১১ সালে এ-কূলের উপর অনুকূল হইয়া উঠিল। কুলেরতী গ্রামের লোকেরা কোলাহলসহকারে প্রতিবাদ করিল এবং গ্রাম দেবতার দরবারে নজির ও নজরানাসহ আবেদন করিল। ফলে ১৯১২ সালে দামোদর পটখানা গ্রামের পট শত বিধা জমি উদরসাৎ করিল। শঙ্কাতুর গ্রামবাসীরা বৃষ্টে দামোদরকে শান্ত করিবার জন্য পূজার বাক্ষ্য করিল এবং মেজাজ শান্ত হইলে পর বৎসর প্রচুর উপাচারসহ পূজা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯১৩ সালের বনায় প্রায় দশখানা গ্রাম দামোদরের গর্ভে নিশ্চিহ্নভাবে অন্তর্ধান করিল। কান্ট'ক ডাক্তার স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া একবন্দে গৃহত্যাগ করিয়া এই গ্রামে পিসতুতো ভাই অনুকূল চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় উঠিলেন। গ্রামের সকলে তাহাকে আগ্রহ ও আপ্যায়ন সহকারে গ্রহণ করিল। এ গ্রামে তখন মালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, অচল ভাল ডাক্তার ছিল না। চার মাইল দূরে মনিয়াড়া গ্রামে সরকারী হাসপাতালে একজন ক্যাম্বেল স্কুলে পাস করা ডাক্তার ছিল বটে, কিন্তু তাহার হাকিমী মেজাজের জন্য লোকের তাহাকে পছন্দ করিত না। কাজেই সকলে কান্ট'ককে ধরায় করিয়া এই গ্রামেই বসাইয়া

দিল। জমি দিল ও সেখানে সকলে চম্বা করিয়া একটি ছোট্ট মেটে বাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিল এবং ভবিষ্যতে কিছু ভূ-সম্পত্তি করিয়া দিবার ভরসা দিল। কান্ট'ক ডাক্তার নতুন করিয়া প্রাক্টিস শুরুর করিলেন; কিছু টাকা ধার করিয়া অনুকূল চক্রবর্তীর বৈঠকখানার একটি ছোট্ট ডিসপেন্সারি করিলেন। এখানেও নিজের কৃতিত্ব ও হাতখশ এবং গ্রামের লোকদের প্রাণপণ প্রচারকার্যের ফলে অল্পদিনেই তাহার বেশ পসার হইল। দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; বাবসাক্ষেত্র ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল; এবং বৎসর দুইয়ের মধ্যেই এমন অবস্থা করিয়া তুলিলেন যে, সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাড়ি পর্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া রোগীদের সহিত হাসিয়া কথা বলিতে শুরুর করিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কান্ট'ক ডাক্তারের অবস্থা প্রায় আগের মতই হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকদের তৈয়ারী করিয়া দেওয়া ছোট্ট মেটে বাড়িটি ভাঙিয়া টিনের চালওয়ানা পাকা কোঠা তুলিলেন; গ্রামের শ্রমজীবীদের সাহায্যে জমিজমা পুকুর-বাগান কিনিলেন; ডিসপেন্সারিটি অনুকূল চক্রবর্তীর বৈঠকখানা হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন; ডিসপেন্সারির ঔষধপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইলেন; গ্রামের একজন বেকার যুগ্মক কন্সাল্ট্যান্ট নিযুক্ত করিলেন এবং "জ্বরবজ্জ" নাম দিয়া একটি ম্যালেরিয়া রোগের অমোঘ অথচ অল্প-মাত্রা ঔষধ বাহির করিয়া এ তরোটার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের অশেষ শ্রম ও অনুব্রতী অর্জন করিলেন।

পরেশ কান্ট'ক ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, সামনে টৌবলের উপর কেরাসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। কান্ট'ক ডাক্তারের পিছখানে লংক্লেবের কামিজের উপর গলাবন্ধ গরম কোট, পাডহীন শূঁত—কোচাটি পাট করিয়া পেটের উপরে গেঁজা, পায়ে আলবাকটী স্লিপার, বকের উপরে রূপার খড়ির চেনটি কলিতেছে। কান্ট'ক ডাক্তারের লম্বা-চওড়া দশসাই চেহারা, বয়স পঞ্চাশের ওপরে; মাঝে ফ্রেণ্কেট দাড়ি ও পরিপুষ্ট গেক; চুল ও দাড়ি দুইই পাকিয়া প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে; মাথার ঠিক মাঝখানে মেয়েদের সিঁখির মত তেড়ি, চোখে নিকলের ফ্রেমওয়ালা চশমা। ডাক্তারের সামনে টৌবলের উপর স্টেথোস্কোপ, প্রেসক্রিপশন লিখবার কাগজ, মোমাত-কলম, একটি অতি পুরাতন ডাক্তারী জানাল, একটি বাংলা ডাক্তারী বই ইত্যাদি। কান্ট'ক ডাক্তারের পাশে চেয়ারে ঘনশ্যাম বসিয়া আছে, গারে স্ক্রানেলের হাতকোটা ফতুরার উপরে পিঠে রক্তের গরম আলোয়ান, পায়ে ভালতলার চটি। ঘরের অন্যান্য কন্সাল্ট্যান্ট জগদীশ চক্রবর্তী রোগীদের ঔষধ দিতে ব্যস্ত। ঔষধ তৈয়ারী করিতে হইতেছে না—আলমারির পাশে একটা প্রকাণ্ড জালায় সকল হইতেই "জ্বরবজ্জ" প্রস্তুত করা আছে। জগদীশ একটা অপরিচ্ছন্ন কলাইকরা মগ ডুবাইয়া ঔষধ বাহির করিয়া শিশি ভরিতেছে, জানালার সামনে দণ্ডায়মান খরিশদারের হাতে দিতেছে ও পয়সা গণিয়া লইতেছে।

পরেশকে দেখিয়া কান্ট'ক ডাক্তার মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "এস বাবাজী! তোমারই কথা হইছিল এতক্ষণ। তা এত দেরি হল যে? বিনয়ের ওখানে গিজলে বৃষ্টি?" পরেশ চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর মুখে কহিল—"আজ্ঞে হাঁ।" ঘনশ্যাম কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, "বিনয়ের ঘরের অসুখ এখনও চলছে বৃষ্টি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে না। অসুখ সেরে গেছে। তবে টাইফয়েডের পর শরীরের স্বাভাবিক স্বেচ্ছতা ফিরে আসতে অনেক দেরি হয় কিনা, তাই এখনও ঔষধ চলছে।" কান্ট'ক ডাক্তার তামাক খাইতে খাইতে ঘাড় নাড়িয়া সার করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "তাই নাকি! তা হলে তো ভারী দুশ্কল।" বিনয়ের ভাগা ভাগ—ভূমি গিয়ে বসেছে—একেবারে বাড়ির ডাক্তার, হুঁ করতই হাজির হও;—কিন্তু ভূমি না থাকলে কি হত বল দেখি?" পরেশ গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। কান্ট'ক ডাক্তার নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ফতুরার পকেট হইতে নসোর ডিবা বাহির করিয়া একটপ নস্য লইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "হাতে আরও দুগুণী আছে তো? মানে এই হল—কাজের ব্যস। এক জায়গায় বসে সময় নষ্ট না করে হুদয় ছুটোছুটি করতে হবে। আমাদের কান্ট'ক দাদা কি রকম খাটতেন চোখে দেখেছো তো! চিবুদ ঘণ্টার মধ্যে চোখ পর্যন্ত বজ্জতে চাইতেন না।" পরেশ কহিল, "কাজ থাকলে ছুটোছুটি করতে পারি। কিন্তু কাজ না থাকলে—" ঘনশ্যাম কথাটা লক্ষিয়া লইয়া কহিল, "ছুটোছুটি করতে হবে, আর তাতেই কাজ হবে। গরলাবাদের শশী ডাক্তার সকালে বেশ করে এক পেট দুধ-চিড়ে খেয়ে, একটা লোকের মাথার ডাক্তারী ব্যাগ চাপিয়ে, সাবানটা টোটে করে বিশুদ্ধ গা হয়ে আসত। সেই শশী ডাক্তারের শেষে কি

পশায়। বহুমানের কোন এক ডাক্তারের কাছ থেকে নাকি ফিভার-মিস্রচারের প্রেসক্রিপশনটি শিখে এসেছিল; তারই জোরে মরার সময়ে রেখে গেল—
মস্ত কুম্ভাদার, বিস্তর টাকাকড়ি, রাজ অট্টালিকার মত পাকা বাড়ি। আরও
কত কি।”

পরেণ মূঢ়াকি হাসিয়া ঘনশ্যামের দিক দ্বিহতে মুখে ফিরাইয়া লইল।

কার্তিক ডাক্তার কথাবার্তার মোড় ঘুরাইবার জন্য কহিলেন, “তোমার সেই
বড়জুড়িত কেসটার কি হল?” পরেশ কহিল, “আজ সকালে একবার
রেমিশান হয়েছিল। বিকালে ১০০° পর্যন্ত উঠেছে ফ্বর গেলো। দৃ-এক
সন্ধ্যায়ের মধ্যে সেৱে উঠবে যোগ হয়।”

“কুইনিন দাও নি?”

“ম্যালেরিয়া নয় বলেই মনে হচ্ছে—প্যারোপ্যুরি প্যারা-টাইকয়েড।”

কার্তিক দুই চোখ বুজিয়া ষাড় নাড়িয়া কহিলেন, “না। এই যে
জ্বরটুকু রয়েছে, ওটি কুইনিন না দিলে যাবে না। আজ দশ বছর যবে
এখানে প্রাকটিস করে এই আর্মি বোর্ডে যে, এখানে যে রোগই হোক
না কেন, তার মূলে থাকে ম্যালেরিয়া। কাজেই যাই চিকিৎসা কর,
ম্যালেরিয়া চিকিৎসা না করলে রোগী সারবে না।”

পরেণ প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঘনশ্যাম কহিল,
“উনি স্বপ্ন বলছেন, তখন দাগ কয়ক কুইনিন খাইয়ে দিও বাবা! এ
তরফের লোকদের নাড়ী ওঠ হাতে বাধা কিনা, তাই কোথাও একটু
খোঁচ-খাঁচ হলে উনি যতদূর বকছেন, তা তোমরা বুঝবে না।” কার্তিক
ডাক্তার কুণ্ডলীর বদনে বসিয়া রহিলেন, পরেশ ডাক্তারী জানালটা টানিয়া
লইয়া ডোহাতে দৃষ্টি সংযোগ করিল। ঘনশ্যাম কহিল, “তা ছাড়া এতবড়
একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। কাজ না থাকলে, যেখানে-সেখানে বাজে গল্প না
করে, এখানে এসে ওর কাছে যদি বস, ওর চিকিৎসা প্রশাসী চোখে দেখ,
ওর কাছে দ্রুত উপশম শোন, তা আরোহের তোমার ভালই হবে। তোমরা
পানই করছে, চিকিৎসা তো কিছুই শেষ নি।”

ডাক্তার আসিয়া থপর দিল, “বাড়িতে ডাকছেন।” কার্তিক ডাক্তার
কহিলেন, “খাচ্ছি, স্বপ্ন দেখে। আর গড়গড়াটা নিয়ে যা।” ডাক্তার
গড়গড়াটা লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কার্তিক ডাক্তার
কপাটখিলের উদ্দেশে কহিলেন, “সব বুঝি বিয়ায় হাল হে জগদীশ?”
জগদীশ টলে বসিয়া, মাথা নীচু করিয়া, হিসাব মিলাইতেছিল, মাথা না
তুলিয়া কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।” ডাক্তার কহিলেন, “আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুমি
হিসাব তিক করে, দরজা-জানালা বন্ধ করে টাকা আর চালি আমার হাতে
পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবে।” জগদীশ কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “এস বাবা পরেশ! এস হে
ঘনশ্যাম।”

ডিলপেশনারির পিছনেই কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির সদর দরজা।
চকিতেই বিস্মৃত উঠান, উঠানে চার পাঁচ ধানের মরাই। তাহাদের মাঝ
দিয়া আসিয়া কতকটা আগাইলেই ডান দিকে তিরতরকারী বাগান,
বামদিকে রাস্তার ও ভাঁড়ার ঘর, সামনে চওড়া বারান্দাবিশিষ্ট টিনের
চালওয়াল প্রকাণ্ড কোঠা ঘর। নীচে দুইটি কুঠুরী, উপরে দুইটি কুঠুরী,
বারান্দার কোলে একটি পাকা তুলসীমণ্ড, তাহাতে এক একটি সতেজ,
সুশুশু ও লাখা-প্রাণা-পত্র-হল তুলসী গাছ; বারান্দার এক পাশে একটি
দড়ির খাটিয়া, তাহার উপরে একটি কালা কবল বিভ্রাণো; নীচের দুইটি
কুঠুরীর মাঝখানে একটি দরজা, তাহা দিয়া দোতলায় যাওয়া যায়। দরজার
এক পাশে একটি লঠন জুড়িতেছে।

বারান্দায় পা দিয়াই ডাক্তার হাঁকিলেন, “কোথায় গো?” রাস্তায়
হইতে গৃহিণীর সাড়া আসিল, “এই যে হাই।” কার্তিক ঘনশ্যাম ও
পরেণের কহিলেন, “কোথায় বাস?” বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে খাটখোঁচ
দিলেন করিলেন। ঘনশ্যাম—চটি, পরেশ—জুতা খুলিয়া খাটে বসিল।
ইতিমধ্যে বারান্দার ডাক্তার-গৃহিণীর আবির্ভাব ঘটিল—মোটামোটা ঘেরে-
খাচ্চ; স্নেহে পায়ের রক্ত; হাথের স্বল্প, অবগুণ্ঠন; হাতে একহাত সোরা
চুড়ি, গলার মোটা হিঙ্গা হাম, নাকে নাকফিঁদ; পরাধনে আধ হাত চওড়া
কালা পাড়ওয়ালা শাড়ি ও সেমিজ। কাজে আসিলেই ডাক্তার কহিলেন,
“পরেণ বারান্দা এসেছেন। ঘনশ্যাম ভায়াকেও যথেষ্ট আনন্দ। খেতে
কেবারে বাধ্য করা। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।” ডাক্তার-গৃহিণী
যেমনটি কুড়ি, টানিয়া, পরেশের দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া মসৃণকণ্ঠে
কহিলেন, “তুমি এস শিগগির, রাসা-বাসা হতে খেতে অনেককণ।” বলিয়া
রাস্তায়ের দিকে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার মাঝের দরজা দিয়া লঠন হাতে
উপরে উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার নামিয়া আসিলেন। কামিজ ও কোট খুলিয়া
ফেলিয়াছেন, গায়ে শুধু একটি লম্বাখের ফড়িয়া, পা খালি। রাস্তায়ের
বারান্দার নীচে এক বালতি জল ছিল; সেখানে গিয়া ডাক্তার হাত পা
ধুইলেন। ইতিমধ্যে ডাক্তার একজোড়া খড়ম আনিয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া
গিয়াছিল; খড়ম পায়ে দিয়া খট খট শব্দ করিতে করিতে বারান্দার
আনিয়া ডাক্তার হাঁকিলেন, “কই গো! হল?” গৃহিণী জবাব দিলেন,
“এস সবাইকে নিয়ে।” ডাক্তার কহিলেন, “এস বাবা পরেশ! এস হে
ঘনশ্যাম।”

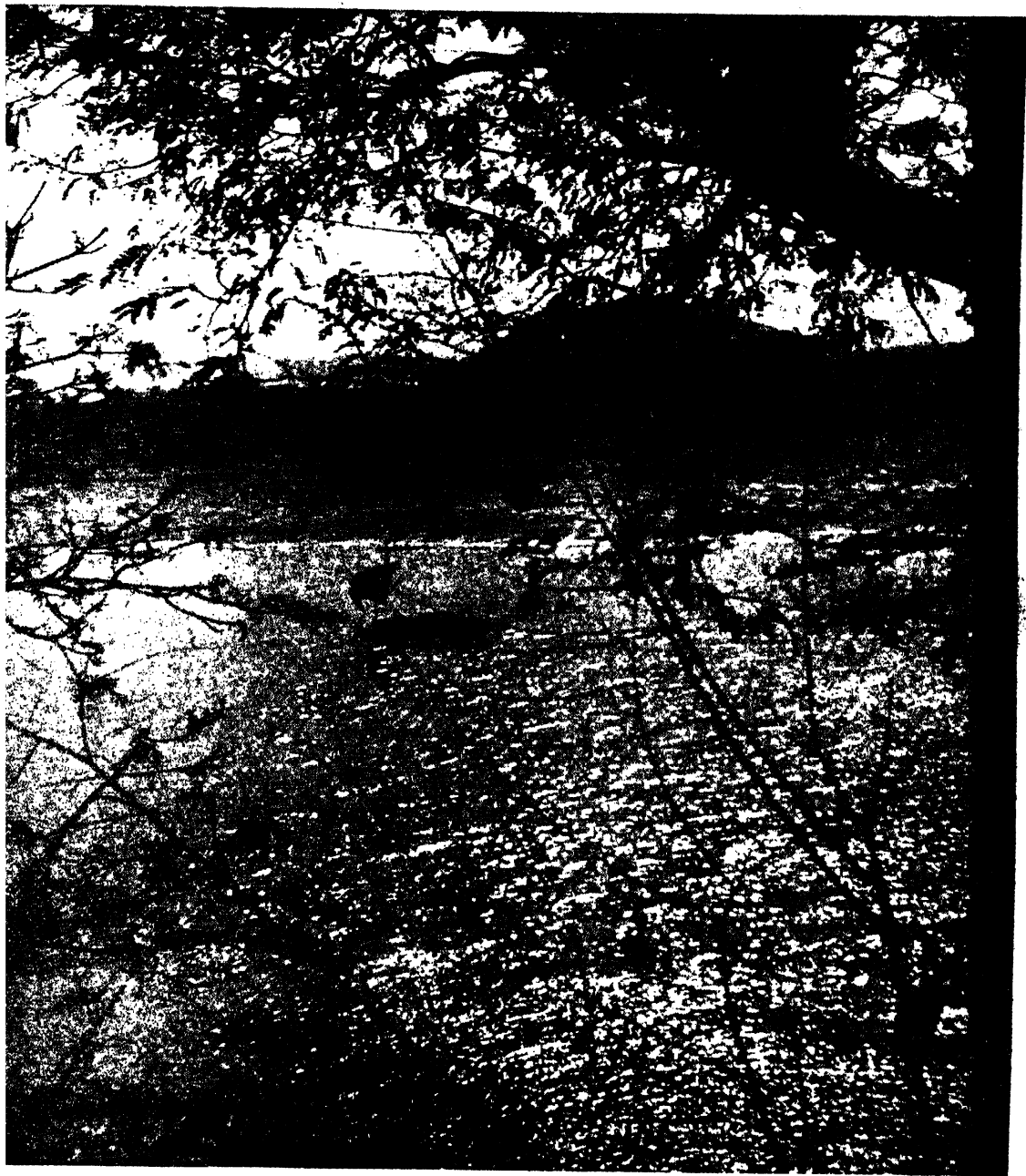
রাস্তায়ের বারান্দার পাশাপাশি তিনটি পুরু গালিচার আসন পাতা
—প্রত্যেকটির পাশে ঢাকনা দেওয়া হুপার প্লাস। ডাক্তার একপাশের
আসনে দাঁড়াইয়া পরেশকে মাঝের আসনে বসিতে আহ্বান করিলেন,
ঘনশ্যামকে চক্ষের ইঙ্গিতে কারিয়া কহিলেন, “বস হে।” পরেশ ও
ঘনশ্যাম বসিতেই ডাক্তার নিজে বসিয়া হাঁকিলেন, “আন গো।” গৃহিণীর
কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “আপেল দিলেন, “যা, দিয়ে আয়—একে একে।”
অনতিবিলম্বে যে থালা হাতে বাহির হইয়া আসিল সে আর কেহ নহে—
ডাক্তারের কনিষ্ঠা কন্যা কমলা, বয়স—পনেরো কি বোলে, উজ্জ্বল শ্যাম
গরের রঙ, লম্বা ছিপছিপে গঠন, লম্বা ধরনের মুখ; চোখ, নাক, চিক
ও অধরোষ্ঠের গঠন ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে হয়তো মুখের গঠন
নিশ্চয় নহে, কিন্তু সমগ্র মুখের মধ্যে এমন একটি নবপল্লবের মত পেলব
ও চিকণ শ্রী আছে, যে একবার দেখিলে আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে।
কমলা বাহির হইয়া আসিতেই ঘনশ্যাম তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,
“এই যে মা কমলা স্বয়ং আজ পরিবেশ করছেন।” পরেশ মুখ তুলিয়া
চাহিল; মেয়েটি লজ্জিতমুখে পরেশের দিকে চাহিতেই দইজনে চোখা-
চোখি হইল; পরেশ মুখ ফিরাইয়া লইল; কমলা মুখ নামাইয়া লইয়া
কার্তিকের সামনে নত হইবার উপক্রম করিতেই কার্তিক কহিল, “এখানে
নয় মা, ওখানে দিও।” বলিয়া পরেশের সামনের জায়গাটি নির্দেশ করিলেন।
মেয়েটির লজ্জা শিগগির হইল; একেবারে গাভার সাইত মুখ
মিলাইয়া দিয়া, লজ্জা-জড়িত পদে, কম্পিত হস্তে, থালাটা পরেশের সামনে
নামাইয়া দিয়া, দ্রুতপদে রাস্তায়ের পলায়ন করিল।

রাস্তায়ের ভিতর হইতে গৃহিণীর মৃদু তর্জন শোনা গেল, “যা,
সব দিয়ে আয়।” কার্তিক-তনয়ার চাপা প্রতিবাদও দ্রুত হইল, “পারব
না আমি, তুমি দিয়ে এস।” কার্তিক কহিলেন, “তুমিই দিয়ে যাও গো!
কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে।” দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া কার্তিক গৃহিণী
বাহির হইয়া আসিলেন, এবং একে একে বাক্সখানে নামাইয়া দিয়া কহিলেন,
“জারী লাভুক! অথচ সব নিজে রাসা করেছে, আমাকে কিছুটা করত
দেয় নি।” ঘনশ্যাম দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, “বলেন কি ভাণ্ডান!
সব নিজে? মা তো তা হলে সাক্ষ্য অনুপর্ণা দেখাচ্ছি।” গৃহিণী
ষাড় নাড়িয়া কহিলেন, “সব শিখছে যে, আমাকেই হার মানিয়ে দেয়
আজকাল। খেয়ে দেখনা কেমন হয়েছে!” ঘনশ্যাম মাঝের কোল মিশ্রিত
এক মৃদা পেলায় ও মুখে তুলিয়া পরম আরামে দুই চোখ বুজিয়া কহিল,
“চমৎকার!” স্বয়ং জগদীশ দেবেরও কোনদিন এমন ঘোটে নি যোগ হয়।
এ মেয়ে যখন ঘরে মাঝে তার ঘরে আনন্দানন্দ কোনদিন পা দেবে না—জোর
করে বলতে পারি।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “তা হলে তো
ভারী মুশকিলের কথা বললেন। আজকাল এই মালিগাভার
দিকে রাসায় গুণে ঘনশ্যাম লোকের জটরানল যদি দাউ দিউ
করে জ্বলে ওঠে, তবে তো জে গৃহস্থকে পথে বসতে হবে।”
কার্তিক-গৃহিণী এই বেকস কথা বসার জন্য ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া
বিরক্তচক্রে চক্ৰবর্তী করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, “তোমরা গৃহস্থের
বাড়িতে পড়বে কেন বাবাজী! লক্ষ্য মেয়ে লক্ষ্যমন্ত ঘরেই পড়বে।”
জবাবকল বদনে, গদগদকণ্ঠে, দুই কুবুজ চোখের দৃষ্টি ঘন করিয়া,
কহিল, “আহা! মা আমার নামে কমলা, কাজেও কমলা। আমি বড়ল
দখি বউঠান! বে বাড়িতে এ রেখে যাবে, তার ঈশ্বর্য উল্লে পড়বে।”
কার্তিক ডাক্তার মূঢ়াকি হাসিয়া কহিলেন, “ওহে, বড়ভাট করছ যে!
যাও—সব ঠাট্টা হয়ে গেছে যে।” ঘনশ্যাম দুই চক্ষের দৃষ্টি স্মরণে
জগদীশ হইতে এক হৃদয়ে মিজের হালার উপরে ফিরাইয়া আসিয়া
কণিতহস্তে বাকি বক্সা উল্লে করিতে শব্দ করিল।

(৬)

পরদিন পুর্বাহ্ন—বেলা আটটা। পরেশ তাহার বৈঠকখানার
দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল। বড়জুড়ির যোগনির্মাণের ফ্বর
লইয়া লোক আসিবার কথা আছে, তাহাই প্রতীক্ষার যোগ হয়। সে আজ

সম্ভারাগে ফিল্মিং—



কোম্পানী—মিনীস্টার

প্রায় সাত মাস এখানে আসিয়াছে, এখনও তাহার রোগীর সংখ্যা কুড়ির কোঠা অতিক্রম করে নাই। গ্রামের সকলেই কার্তিক ডাক্তারকে ডাকে। তবে রাতে কহাঁড় রোগের ব্যুধ হইলে তাহারই ডাক পড়ে। অবশ্য কি দম্বী কি দরিদ্র, কেহই ফী দেয় না। যাহারা তাহার অশ্রয় তাহাদের কাছে সে ফী দাবী করে না, কিন্তু যাহারা অনাচারী, পিতার মৃত্যুর পর হইতে যাহারা বরাবর তাহাদের বিরুদ্ধতাই করিয়াছে, তাহারাও ফী চাহিলে আঁকাইয়া উঠে, দুই চোখ বতশুর সম্ভব চাড়িয়া বলে, “সে কি বাবা! তোমাকে ফী দিতে হবে? আমাদের মহেশ দাদার ছেলে তুমি! ঘরের ছেলে যে বাবা!” কেহ মূখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, “ও কথা বলো না বাবা! চন্দ্র, সূর্য এখনও উঠছে, ধর্মই সইবে না। মহেশ দাদার অনেক করেছে আমি।” হঠাৎ ফাঁট করিয়া কাদিয়া ফেলিয়া কহে, “কি লোক ছিলেন! তার ছেলে তুমি! আজ থাকলে কত আনন্দ করতেন।” কেহ কেহ রাগিয়া উঠিয়া কড়া গলায় শুনাইয়া দেয়, “তোমাকে আবার ফী দিতে হবে নাকি? তা’ হলে তো হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকতে পারতাম।” কেহ বা মেলবের খবর কহে, “অগা চিকিৎসা শেখ, বাবা! তারপর ফীরের ব্যস্ত করবে। এই যে শেখবার সুযোগ পেয়েছ, তার জন্যে বরং কিছু দিয়ে যাও।”

গ্রামের বাহিরে দুইচারজন যাহারা তাহাকে ডাকিয়াছে, তাহারাই শূন্য যথাযথ ফী দিয়াছে, এবং রোগী আরোগ্য লাভ করিবার পর গ্রামের অধিকাংশ লোকের বিশেষ করিয়া প্রতিনেশীদের মত, কার্তিক ডাক্তারকে দেখাইলে রোগী আরও সহজে ও স্বল্প আরাম হইত বলিয়া বসিয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নিন্দা করে নাই।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া পরেশ খাড়া হইয়া বসিল। লোকটা আসিচ্ছে বোধ হয়। টেবিলের উপর দেয়াত কলম ও কাগজ ছিল। কলমটা কালিতে ডুবাইয়া, একটা কাগজ টানিয়া লইয়া নতমস্তকে লিখিতে লাগিল। পদশব্দ স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হইয়া ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেই পরেশ মূখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—কেহ আসে নাই। কলমটা ফেলিয়া দিয়া, কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া, পরেশ পূর্বপন টিলা পোকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—লোকটা আজ আর আসিবে না বোধ হয়। হয়, রোগী ভাল আছে, কিবা প্রতিনেশীদের পরামর্শে রোগীর অভিজাবক কার্তিক ডাক্তারকে অথবা হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিবার উদ্দেশ্য করিতেছে। এখানের লোকদের ধরনই এই। একজনের বাড়িতে অসুখ হইলে গ্রামের সকলে গিয়া জড়ো হয়; কোন সাহায্য না করিলেও অযাচিত অজ্ঞ প্রদেশ দিয়া দিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনদের উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয়। এমনকি ডাক্তারকেও চিকিৎসা-প্রণালী সম্পর্কে উপদেশ দিতে তাহারাই ইচ্ছুক করে না। বিবির অসুখের সময় গ্রামের লোক বিনয় মাস্টারকে পরামর্শ দিতে কসুর করে নাই—“করছ কি! এতবড় শক্ত রোগী, এ অনাড়ম্বর ডাক্তারের হাতে! এর চেয়ে কার্তিকের কম্পাউডারকে ডাকলে ভাল চিকিৎসা হ’ত যে! কলীন বাবুনের মেয়ে বলেই পারছ, ছেলে হ’লে কি পারতে?” তাহাকেও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জন জিজ্ঞাসা করত, “কেমন মনে হচ্ছে?” দারুণ উৎকর্ষ ভরণীতে বলিত, “আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। একবার কার্তিক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলে হ’ত না?” বিনয় মাস্টার কাহারও পরামর্শ শুনেন নাই, একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছিল। বঁবিও তাই। ভগবানের উপরে ভরসা মায়ের উপরে শিশুর, রেলগাড়ির চালকের উপরে যাত্রীর অসম্মিত বিশ্বাস লইয়া সে নিজেকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। কোনদিন বিধবা করে নাই; কোন দিন কোন অকাল অধায়া হয় নাই; নিদারুণ রোগের যক্ষণাতেও কোনদিন বিরাক্ত প্রকাশ করে নাই। সারিয়া উঠিবার পরও তাই। সারিয়া দিখানায় শুইয়া বা বাঁশলে ঠেস দিয়া বসিয়া, ক্রান্ত চক্ষের করণ দৃষ্টি মেঘিনা তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। তাহাকে দেখিবারমত তাহার মুখ ও চোখ পরম ভীষণত উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বৈঠকখানা ও অশ্রমের মাঝখানের দরজা খুলিয়া একজন বিধবা মহিলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মহিলাটির বয়স চাষাশের কাছাকাছি—সেখিতে ফরসা ও কাহিল; মাথার চুল ছোট করিয়া ছুটি, তাহার উপরে স্বর্ণ অংগুঠন। পদশব্দ শুনিয়া পরেশ তাহার দিকে চাহিতেই বিধবা কহিলেন, “কিছু খাবি না?” পরেশ কহিল, “না। কাল রাতের খাওয়া এখনও হজম হয় নি।” একটা ঢেঁকুর তুলিয়া বিকৃতমুখে কহিল, “আজ দিনের বেলায় কিছু খাব কিনা ভাবছি।” বিধবা মৃদু হাসিয়া মিহি গলায় কহিলেন, “কি এমন খেয়েছিস কাল?” দুই চোখ বড় করিয়া পরেশ কহিল, “কিন্তু! ডাক্তার এমনই না পারুক, দিন কতক

খাওয়ালেই না থেকে আমাকে পালাতে হবে।” বিধবা স্মিতমু কহিলেন, “তোর যেমন কথা! যা ভাল বদ্বিস কর!” বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তরে চলিয়া গেলেন।

বিধবা পরেশের মাসীমা। — তাহার মায়ের ছোট বোন। সংসার তাহার একটিমাত্র পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা। কন্যাটির বিবাহ দিরাছেন, জাম চাকুরী করে। কন্যা সংসারে শাসুড়ী, বিধবা নন্দ বা এমনই ধরণের কে অভিজাবিকা না থাকায় জামাইয়ের অনুদ্রোহে পত্রটিকে লইয়া এতদিন কন্যা কাছেই ছিলেন। পরেশ প্র্যাগ্জিস করিবার জন্য গ্রামে আসিবার সময়ে তাহারে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছেন।

মাসীমা প্রস্থান করিতেই পরেশের মনে হইল, এমন করিয়া বসি থাকিয়া লাভ নাই, একটু ঘুরিয়া আসিলেই হয়; বিনয় মাস্টার বোধ হ এখনও বৈঠকখানায় বসিয়া মেয়েদের পড়াইতেছে, বঁবিও হয়তো কা বসিয়া পড়িতেছে; সেখানই একটু আড়া দিয়া আসিলে মন্দ হয় না। বঁবি কথা মনে হইতেই পরেশের দেহে ও মনে উৎসাহের জোয়ার আসিল, চেয়া হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একলক্ষ দেওয়ালে টাঙানে ফোটাক কাছে আসিয়া, টান মারিয়া ফোটাকে হুক হইতে খুলিয়া লইয়া, গায়ে দি উন্মত হইল। হঠাৎ জুতা ও কাসির শব্দ শোনা গেল। পরেশ ভাবিল লোকটা আসিয়াছে বোধ হয়। অতএব এক মুহূর্তে স্থিরভাবে ধারণ করিল তারপর ধীরেসুস্থে জামাটি গায়ে দিয়া, লোকটাকে ডাক্তারের সময়ে মহাঘাটা সন্মুখাইয়া দিবার জন্য মুখে কঠোর গাম্ভীর্ষের অবতারণা করি পরজার দিকে তাকাইতেই দেখিল—ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, “কি বাবা! কোথাও বেরোছ নাকি? কল-টল আছে বন্ধি?” পরেশ কহিল, “আজ্ঞে হাঁ। বসুন।” ঘনশ্যাম মচকি হাসি কহিল, “বসতে তো বলছ, কোথায় বসি বলতে পার? আসবাবপত্র তো এখনও কিছু কর নি। বসবার ব্যবস্থা তো এই একটি টাঙা টিনের চেয়ার, আর এই একটি ভাঙা টুল—”বলিয়া চোখ ও মূর্খের ইঙ্গিতে চেয়ার ও টুলটি নির্দেশ করিল। পরেশ লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া কহিল, “এই চেয়ারটাতে বসুন আপনি।”—বলিয়া সারিয়া দাঁড়াইয়া নিজের চেয়ারটা আগাইয়া দিল। ঘনশ্যাম দুই হাত বাড়াইয়া প্রসারিত করল নাড়িয়া কহিল, “থাক, থাক। বসব না। সময় নেই, স্কুলের সময় হয়ে এল।”

ঘনশ্যাম কিন্তু নেহাৎ মিথ্যা কথা বলে নাই। ঘরটিতে আসবাবপত্র বেশ কিছু ছিল না। ঘরের এক দিকে একটি টেবিল—তাহার এক পাশে একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার, আর এক পাশে একটি সবুজ রঙের টিনের চেয়ার। কাঠের চেয়ারটিতে পরেশ স্বয়ং বসে এবং কেহ আসিলে টিনের চেয়ারটি বসিতে হয়। ঘরের আর একদিকে আর একটি ছোট টেবিল— তাহার উপরে একটি ওজন করিবার নিকি, শাদা পাথরের হামাম-দিস্তা, ছুরি, মেজার প্লাস ইত্যাদি, কতকগুলি ঔষধের শিশি ও একটি বড় বোতলে জল। টেবিলের সামনে একটি টুল। এই টুলটি কম্পাউডারের বসিবার জন্য। অবশ্য পরেশের কম্পাউডার রাখিবার অবস্থা এখনও হয় নাই। ডাক্তার ও কম্পাউডারের কাজ তাহাকে একলাই করিতে হয়।

পরেশ প্রশ্ন করিল, “আপনার কোন দরকার ছিল কি?” ঘনশ্যাম ঔষধের টেবিলটার দিকে তাকাইয়া কহিল, “ডেবেছিলাম একটু ওষুধ খাব—সকাল থেকে পেটটা বেঁটাচ্ছে, তা তোমার কি ওষুধপত্র কিছু আছে? টেবিলটাতে তো দেখছি মাত্র কয়েকটা শিশি।” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “আজ্ঞে হাঁ, আছে বৈকি! বাড়ির ভিতরে আছে—আপনার ওষুধ দিচ্ছ তৈরি করে।” ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ তাহাকে বসিবার জন্য আর অনুদ্রোহ না করিয়া, ও-দিকের টেবিলটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে মেজারপ্লাসে ঔষধ তৈয়ারি করিয়া আনিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিয়া কহিল, “খেয়ে ফেলুন—” ঘনশ্যাম প্লাসটি লইয়া বারকয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, “হজমের ওষুধ দিয়েছ তো?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আজ্ঞে হাঁ।” ঘনশ্যাম কহিল, “তবে খেয়ে ফেলি কি বল?” বলিয়া ঢকঢক করিয়া ওষুধটা গিলিয়া ফেলিয়া ঔষধের কাজে চোখ-মুখ কুঁচকাইয়া কহিল, “ভারি কাজ।” পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “জল খাবেন নাকি?” ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া “হ্যাঁ” জানাইতেই পরেশ টেবিল হইতে জলের বোতলটা আনিয়া প্লাসে ঢালিয়া দিল। ঘনশ্যাম জল গিলিয়া কহিল, “আর একটু দাও বাবা! প্লাসটা এটো হয়ে গেল, ধরে দিই।” পরেশ কহিল, “থাক, আপনাকে খতে হবে না, দিন।”—বলিয়া প্লাস লইয়া নিজেই খেইয়া টেবিলে রাখিয়া দিল।

ঘনশ্যাম কহিল, “এখনই বেরোছ?” পরেশ কহিল, “না, একটু কাজ আছে—আপনি এখানে।” ঘনশ্যাম কহিল, “খুব কি দৌর হবে? তাহলে

না হয় একটু অপেক্ষাই করি।" পরেশ যথাসম্ভব বিরক্তি চাপিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, "না, বোধক্ৰমে দৌর হবে না। আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে না থেকে চোয়ারটোতেই বসুন।" বলিয়া বিনা প্রয়োজনে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ কহিল, "চলুন।" ঘনশ্যাম দাঁড়িয়াছিল, কহিল, "চল বাবা।" বারান্দার খুঁটিতে ঠেসানো সাইকেলটা হাতে লইয়া পরেশ কহিল, "আপনি কোথায় যাবেন?" ঘনশ্যাম ভ্রু কুচকিয়া কহিল, "কোথায় আবার? বাড়ি যাব।" পরেশ কহিল, "তাহলে আপনি যান, আমাকে এই দিকে একটু স্থান দেও।"—বলিয়া সাইকেলের মূখ্য ঘুরাইয়া দাঁড়িতে উদাত হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, "বেশ তো! আমিও এই দিকে দিয়েই যাব—একটু ঘোরটু হবে, তা হোক। কথা কইতে কইতে যাওয়া হবে তো।" ঘনশ্যামের ঘনায়মান ঘনিষ্ঠতার ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, "তাহলে আপনার সঙ্গেই যাই—বড়কুড়ি যেতে হবে একবার—এদিকের কাজটা বিকালে সারাবখন।"

কতকটা দূর গিয়া ঘনশ্যাম হঠাৎ পরেশের কাছে হাত দিয়া চাপ দিয়া কহিল, "দাঁড়াও একটু।" পরেশ থমকিয়া দাঁড়িয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কি হ'ল?" ঘনশ্যাম কহিল, "কিছু না, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।" ঘনশ্যামের মূখ্যোন্মুখ দাঁড়িয়া পরেশ উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিল। ঘনশ্যাম গলা খাড়িয়া কহিল, "কাল কি রকম দেখলে?" পরেশ বিস্মিত স্বরে কহিল, "কাকে?"

"কেন—কার্তিক ডাক্তারের মেয়ে কমলাকে?" পরেশ ভ্রুকৃষ্ণিত করিয়া কহিল, "এ প্রশ্নের সহিত?" ঘনশ্যাম কহিল, "বলছি। আগে বল—কেমন দেখলে?" পরেশ একটু ভাবনার ভান করিয়া কহিল, "মন্দ কি!" ঘনশ্যাম মাথার কাঁকান দিয়া কহিল, "মন্দ নয়। বেশ! রঙটাই যা একটু নীলস, না হ'লে এমন মূখ্যচোখ তুমি বিনয় মাশ্টারের বাড়ি চষে বেড়াতেও পারো না।" বিরক্ত সহিত পরেশ কহিল, "তার মানে?" ঘনশ্যাম কহিল, "মানে—বিনয়ের বড় মেয়ে রঙটাই যা ফরসা—কমলায় মত মূখ্যচোখ নয়।" পরেশ কহিল, "ওদের কথা আপনি মিছেমিছি টানছেন কেন?" ঘনশ্যাম চোখ মটকিয়া কহিল, "টানছি কি সাধে রে বাবা! সবাই মিলে তোমার টানাচ্ছ যে! এ যে সারাদিন বিনয়ের বাড়িতে বসে আছা দাও, বিনয় বা বিনয়ের স্ত্রী টু শঙ্কটি পর্যন্ত করে না, এর কি ভাবছ কোন উদ্দেশ্য নেই? পাড়াগায়ে সমাজে বাস করে, পড়শীদের চোখের সামনে, একজন যোয়ান ছেলেকে নিজের বাড়ি মেয়ের সঙ্গে রাতদিন মোটে থাকতে শব্দ শব্দ কেউ দেয়?"

পরেশ তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আপনি যা-তা বলতে আরম্ভ করেছেন।" ঘনশ্যাম দাড় নাড়িয়া কহিল, "যা-তা বলি নি বাবা। পাড়াগায়ে অনেক দিন একটানা বাস কর নি কিনা, তাই এখানকার লোকের স্বভাব জান না। বাহরে মনে হয় বেশ সাদাসিধে, হাবাগোবা মানুষ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এভাবে জিলিপির পাটা। এ যে বিনয়, হেসে হেসে কথা কয়, সোজা লোক নাকি? বিশেষ করে ওর স্ত্রীটি—একটু শব্দে রক্ত আছে যে!" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ও কথা আমি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না—এতটুকু থেকে ওদের দেখে আসছি; বরাবর আমাকে ও'রা খুব স্নেহ করেন।"

ঘনশ্যাম ভাঙ্ছিলের হাসি হাসিয়া কহিল, "স্নেহ! দু'খানা মণ্ডা, দু' কাপ চা খাইয়ে সবাই স্নেহ করতে পারে।" মূখের কাছে মূখ আনিয়া নাক উড়াইয়া কহিল, "কিন্তু ও তো মূখের স্নেহ, আসল স্নেহ হ'ল ভিতরে।"—বলিয়া নিজের বৃকে হাত দিয়া কহিল, "বৃকের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে থাকে, সহজে ভোকা যায় না। যেমন ঘরো—আমার স্নেহ, কোন দিন বৃক্ষেতে পেরেছে? অথচ লিভার ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে দিনরাত—রাতে শব্দেও তোমার কথা ভাবি। শব্দ আমি নয়—তোমার খুঁড়িও।" পরেশ কহিল, "কিন্তু বিনয়কাকা আর কাকিমা মায়ের অসুস্থের সময়ে যা করেছিলেন, তা কোন দিন ভুলব না। তা ছাড়া মায়ের মৃত্যুর পর—পরেশের মূখের কাছে জানহাতটা আনিয়া ঘনশ্যাম নাড়িয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ও কথা যেতে দাও। সব গায়েই আন দলাদলি থাকে; মানুষ মরলে সব গায়েই আন একটু চাপ দেয়; কিন্তু হাতে-পায়ে ধরলেই, সমাজের সম্মান করলেই সব মিটে যায়।"

উভয়ে চলিতে শব্দ করিল এবং অচিরে বিনয়ের বৈঠকখানার সামনে আসিয়া হাজির হইল। প্রতিদিনের মত বৈঠকখানায় বসিয়া বিনয় মেয়েদের পড়াইতেন। ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "কি হে বিনয়বাবু, কি হচ্ছে?" বিনয় মূখ ভুলিয়া চাহিয়া কহিল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল—পরেশের কাছে নাকি? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ বাব?" বলিয়া উঠিয়া বারান্দার আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশের নাম শুনিয়া বিনয় মূখ ভুলিয়া চাহিয়া পরেশের

সহিত চোখেচোখি হইতেই মূখ নামাইয়া লইল। ঘনশ্যাম কহিল, "বাড়ির অসুখ নয়, নিজের পেটটা সকল থেকে ভাল নেই! কাল কার্তিক ডাক্তারের বাড়িতে পরেশ বাবাজীর নেমস্তত্য ছিল; ডাক্তার আমাকেও ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল। ওর বাড়ির খাওয়ার ব্যাপার জান তো, শেষকৃত্যের খেচ টাকে গুঁজে খেতে বসতে হয়। থাকে-তাকে পশুখাজন দিয়ে না খাওয়ালে ডাক্তার-গিল্পীর তুষ্টি হয় না, কাল তো বিশেষ ব্যাপার।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "চল, বাবা! তোমার আবার কোথায় ডাক আছে বলাচ্ছে, মিথ্যা দেীর করে লাভ নেই।" বিনয় মূখ চাহিয়া কহিল, "আপনিও ওর সঙ্গে ডাকে চলেছেন নাকি?" ঘনশ্যাম কহিল, "পাগল নাকি! স্কুল আছে না? এমনই কাকা-ভাইপো গল্প বরতে করতে যাব আর কি।" বলিয়া চলিতে উদাত হইতেই বিনয় কহিল, "পরেশের চা খাওয়া হয়েছে?" ঘনশ্যাম মূখ ফিরাইয়া বাকি হাসি হাসিয়া কহিল, "না—এখনও বাকি আছে—নটা বাজছে কি না।" পরেশ বিনয় দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া নিরুশাস্যমুখে কহিল, "হ্যাঁ, আচ্ছা, বসুন, আমি—" বলিয়া ঘনশ্যামের অনুগামী হইল। কিছুদূর আসিয়া ঘনশ্যাম মূখ ভেঁচাইয়া কহিল, "চা! এক কাপ করে চা খাইয়েই ভাবছে মেয়েটিকে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, মূবোদ তো কত। পণ্ডাশ টাকা মাইনে, জমি-জিরেং এক ছটাক নেই। তার ওপর দুটো মেয়ে।" চোখ দুটি বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "তুমি কারণে খাপ্পা ভুলে না বাবা! তোমার মাথার উপরে কেউ নেই। শব্দ মূখ দেখলেই তোমার জলবে না; মেয়ের চোয় মেয়ের বাবাটি দেখে তোমাকে বিয়ে করতে হ'বে।" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, "কিন্তু শুধু তো আমার সঙ্গে বিয়ের কথা কোনদিন বলেন নি। বরং আমাকেই বাবর জন্য এর যোগাড় করতে বলাছেন।" "হেং হেং" করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "খাপ্পা! স্নেহ খাপ্পা! বললাম যে, ওরা মূখে এক, মনে আর। মনে মনে তোমাকে গাখিয়ার ইচ্ছে বরাবরই, শব্দ টোপ গিলেছ কিনা দেখবার জন্য, ঘাই মেরে দেখছে।" পরেশ কহিল, "মানে?" ঘনশ্যাম চোখ ঠারিয়া কহিল, "মানে পরে বৃক্ষেতে পারবে, বাবা! তবে সত্যিকার শাকাক্ষীর একটা কথা শোন—ওদের যদি আর পা দিত না, বড় সাংঘাতিক লোক ওরা।" পরেশ বিরসমুখে বিনা প্রতিবাদে চুপ করিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "মেয়ের শব্দ মূখ থাকলেই হয় না, ভাগা থাকা চাই। কমলার কান্দিতে জাগাখানে স্বয়ং বহুপতি। না হ'লে অত বড়লোকের বাড়িতে জন্ম হয়?" দম লইয়া কহিল, "কার্তিক ডাক্তার নাকি জমি-জায়গা-টাকা-কড়ি সব ছোট মেয়েটিকেই দিয়ে যাবে।" পরেশ নীরব। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘনশ্যাম কহিল, "ত মেয়ের অবশ্য পাঠের অধার হবে না। 'বিয়ে দেব' বলতে না বলতে কত বড় বড় ঘর থেকে ভাল ভাল ছেলে এসে ওকে লুফে নিয়ে যাবে, তবে—" হঠাৎ খামিয়া, মায়ের কাছে মূখ আনিয়া, কটকট নীচু করিয়া কহিল, "কথাটা কি জান, ডাক্তার-গিল্পীর ভাড়াই হচ্ছে—তোমাকে জমাই করতে। মনের মত ছেলেও কটে, তা ছাড়া মেয়েটি চোখের সামনে থাকবে, কোলের মেয়ে কিনা। ডাক্তার প্রথমে রাজী হয় নি—মন্দ বড় কুলীন কিনা—বরানগরের বাড়িচ্ছে—পাকা সোনাতেও খাদ আছে—ওদের কুল একেবারে নিখাদ।" চোক গিলিয়া কহিল, "তবে গিল্পীর জিন্দে শেষে রাজী হয়েছে।" পরেশ গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল। দুইজনে আবার চলিতে শব্দ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে যেখানে হাজির হইল, সেখানে হইতে রাস্তাটা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা ঘণিকার গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে; আর একটি শাখা সোজাসুজি গিয়া সরকারী পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলিয়াছে। ঘনশ্যাম খামিয়া কহিল, "এখানে বিয়ে করলে তোমার অনেক সুবিধে হবে বাবা! অতবড় একটা ডাক্তার মরুখ হ'বে। এমন দিনরাতও একটা যোগীর মূখ দেখতে পাছ না, কার্তিক ডাক্তার পিছনে থাকলে রোগীদের টানাটানিতে নিশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। ভেবে দেখো, যে ঘাই বলুক, আমরা সবাই তোমার মগপলাকাক্ষী।" বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল। পরেশও সাইকেলে উঠিয়া সোজা রাস্তাটা দখিয়া বিনা কাজেই ছুটিতে শব্দ করিল।

(৯)

গ্রাম পার হইলে, দুই পাশে বিস্তৃত প্রান্তর; মাটির রঙ লাল; মানে মাঝে অ-গভীর খাদ; মাটি খুঁড়িয়া লইয়া গিয়া গ্রামের লোক গরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ওড়ায়াল লেপিয়া থাকে। জান দিকে হরিদ্রানাগুর, নেহেং ছোট গ্রাম—শব্দ, গয়লাদের বাস। গ্রামের বাহিরে গয় ও মাইয়ের



আপনার
ছান্দিত দেহিক
ভারতীয় সিল্পে
অপরূপ করে
তুলুন

ফোন • বি.বি. ৪১১

ইণ্ডিয়ান সিল্প হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে জাতির সহানুভূতি!



ফোন :

"কাল ২৭৬৭"

(স্থাপিত-১৯৩৫)

হেড অফিস-৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা

গ্রাম :

"জনসম্পদ"

শাখাসমূহ

কলিক	ভাগলপুর	ডোমার	বোলপুর
ঢাকা	মৌলভীবাজার	তামলুক	শাকটী
নারায়ণগঞ্জ	জানকীপুর	বাঁকুড়া	পূর্বী
নীলফামারী	কর্ণেলগোলা	চাটুলিয়া	বালেশ্বর
মালদহ	বাগীচক	কুমিল্লা	কটক
শান্তিপুর	কোলাঘাট	চুয়াডাঙ্গা	টাটনাগর
মেহেরপুর	বেলঘা		

কলিকাতা শাখা

বড়বাজার শ্যামবাজার হাওড়া দক্ষিণ কলিকাতা

১৯৪২ সালে শতকরা ৫, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সালে শতকরা ৬, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাংক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

ঋণ ও ওভার ড্রাফট-সুবিধাজনক সত্তে অনুরোধিত সিকিউরিটীর উপর দেওয়া হয়।

এসিস্টেন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মি: এম. কে. ভদ্রা ও মি: পি. ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

ডাঃ এম. এম. চ্যাটার্জী

শাল দেখা যাইতেছে—রাস্তা জমে উঠেইয়া উঠিতেছে। একটু অগ্রসর হইলেই সামনে বেঁড়ে বন—ছোট বড় শাল ও পিয়াল গাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল—গাছের কোলে কোলে হালধে ফুলওয়ালা কাটাগাছের ঘন সমাবেশ। শেষ-শেষ মাসে এই বনে এঁটেরীফুল ফোটে; গম্ভীর চারিদিক ভরিয়া উঠে; রাস্তা হইতে মোম্যাঁছদের গুঞ্জন শোনা যায়। সরস্বতী পুজার সময়ে কাছাকাছি গ্রামের ছেলেরা (অবশ্য বাছাদের মা সর্বস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে) এই বনে এঁটেরীফুল তুলিতে আসে। একদিনের জন্য নিজের বনভূমি বলকদের তীক্ষ্ণ ও তরল কন্ঠের উজ্জাসধ্বনিতে ম্খরিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, দিগন্তের কোলে বিরাট নীল হস্তীর মত শৃঙ্গনিয়া পাহাড় দেখা যাইতেছে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রাস্তাটি সরকারী পাকা রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে জেলা শহর হইতে বাহির হইয়া, চক্ষিণ পাশে মাইল ধরিয়া, নানা গ্রাম, বন ও প্রান্তর পার হইয়া, উত্তর দিকে দামোদরের তীর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া পথের উত্তর দিকে চলিল। বাম পাশে রাইল বেঁড়ে বন। দেখিতে দেখিতে বনের সীমা পার হইল; তখন বাম দিকে রাইল—স্বত্দের দৃষ্ট যায় সমাকর্ষিত-শব্দ মাঠের স্রোত; ডান দিকে বিস্তৃত মাঠের পারে ছোট ছোট গ্রাম। আরও কিছুদূর গেলে রাস্তা হইতে একটি ছোট কাটা রাস্তা বাহির হইয়া ডান দিকে বড়জুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। এইখানে আসিয়া পরেশ বাইক হইতে নামিল। বিনা আহ্বানে রোগীর বাড়ি যাওয়া উচিত হইবে কি? অবশ্য বলা চলে—এই দিকে কোন কাজে আসিয়াছিলোম, এমনই খবর লইতে আসিয়াছি। রোগীর প্রতি ডাক্তারের এই নিষেধ নিষ্ঠা দেখায়া রোগীর অস্বাভাবিক প্রশংসা করিবে কি? রোগীটি নৈরাগালিকা বা বংশ হইলে কোন চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তরুণী যে! এম্মা ছাড়া রোগীর অভিব্যক্তি যদি আর কাহারও ডাকিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে? পরেশ বাইকের মুখটা ঘিরিয়া মোজা করিল ও বাইক উঠিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। মাইলখানেক পরে একটা পান্ডা পূল; রাস্তার দুই ধারে বসিয়া মগ্ন; পরেশ বাইকটা এক পাশের মগ্নের গায়ে ঠেসাইয়া দিয়া, অন্য পাশের মগ্নের উপরে বসিল।

পরেশের মনটা বিষন্ন। শেষ রোগীটিও বোধহয় হাতছাড়া হইয়া গেল। আশু ভবিষ্যতে আর কোন রোগী জটিলে বসিয়া ভরসা নাই। জটিলেও কার্তিক ডাক্তারের দান্যদানের কৃপায়া বেশ দিন হাতে থাকবে না। তারপর, স্নোহীন, তরুণহীন, বাইরের বাহ্যে জীবনপ্রবাহের মধ্যে লেশমাত্র সম্পর্কহীন, পল্লীজীবনের মধ্যে সে কর্মহীন সঙ্গীহীন দিনগুলি কেমন করিয়া কাটািবে? যাহারা পল্লীগ্রামে আত্মা বাস করিয়াছে, তাহারা কাইয়া, ঘুমাইয়া, দাম-পান খেলিয়া, পরনিপা ও পরচর্চা করিয়া, একসময়ের জীবন কাটািয়া দেয়। কিন্তু তাহার মত যাহারা বাহিরের তরুণশো-বেল, কোলাহল-মুখর জীবনের অস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা এখানে বাঁচিবে কি লইয়া? বাবির কথা মনে পড়িল। এই বন্যমাসেও তো কোন কাজ ছিল না, তবু এই স্ত্রী, শান্ত, নম্র, স্ববন্দ্যাক্ষর মেয়েটির সাহচর্যে দিনগুলি যে কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, সে বর্ণিত পারে নাই। অবশ্য বাবিকে সে একলা খুব কর্মনিদ্রি পাইয়াছে। তবু সে বর্ণিত পারে, যতক্ষণ সে কাছে থাকে, যতক্ষণ কথা বলে, বাবির সঙ্গের পছন্দে বসিয়া দুই চোখের দৃষ্টি একত্র করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, কদাচিৎ চোখাচোখ হইয়া গেলে মুখখানি নামাইয়া লয়। লাতন্তরুর মত একটি স্ফূর্ত, স্ফূর্তময় স্রোত বর হৃদয়ের সহিত যেন তাহার হৃদয়কে মিশ্র করে; সেই যোগসূত্র দিয়া বাবির হৃদয়-স্পন্দন তাহার হৃদয়ে বাহিত হয়, বাবির মনের একান্ত কামনা তাহার মনের মধ্যে সংক্রান্ত হয়। কথা আর শেষ হইতে চাহে না; কত রকমের কথা, কত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র অভিব্যক্তি, ভাব্য জীবনের কত রক্তন আভাস। এই গ্রামে রিদিম এমনই অবজ্ঞাতভাবে সে পড়িয়া থাকিবে না, তাহার বিদ্যা বৃষ্টি শিক্ষা দীক্ষার মর্মীলা একদিন এ তরুণীর লোকদের দিতে হইবে। তখন কার্তিক ডাক্তার কোথায় যে কেণ-গাঙ্গা হইয়া থাকিবে, তাহার পাতা পাতায় যাইবে না। হাসপাতালের ডাক্তারও তাহার পরামর্শ লইবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। হয়তো ভবিষ্যতে এ গ্রাম ছাড়িয়া সে জেলা সহরে বাসনা শুরু করবে; তখন সারা জেলার লোকের মধ্যে ডাক্তার বলিতে তাহার ছাড়া আর কাহারও নাম শুনো যাইবে না, ইত্যাদি—ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে বাবির মুখ ও চোখ উজ্জল হইয়া উঠে এবং এমনই আশ্বাসা হইয়া যায় যে, চোখোচোখ হইলেও চোখ নামাইতে ফুলিয়া যায়। এই সকল বক্তৃতা যে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহাই উদ্দেশ্যে কেমন করিয়া সে মনে বর্ণিত পারে। তাহা ছাড়া তাহার মনের মত হইবার জন্য তাহার কি প্রচেষ্টা? একদিন সে শিষ্টিতা মেনেদের

প্রশংসা করিয়াছিল; সেইদিন হইতে বাবির লেখাপড়া শিবিবার জন্য উঠিল পড়িয়া লাগিয়াছে এবং অল্প দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি করিয়াছে। বাবির কি তাহাকে ভালবাসে? হয়তো তাই। না হইলে কাল, তাহাৎ অন্য বিবাহের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া সে কাঁদিয়াছিল কেন?

কিন্তু সে নিজে কি বাবিকে ভালবাসে? ভাল লাগে—এ কথা সে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু ভালবাসে এ কথা বলিবে কি করিয়া? হিন্দু সমাজের ছেলে সে, বিশেষ করিয়া পাড়াগায়ের ছেলে; রিদিম মেয়েদের কাছ হইতে দূরে দূরে মানুষ হইয়াছে। কলেজে দুই-চারি জন মেয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কোনদিন বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্তরের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় নাই। কাজেই ভালবাসার লক্ষণ সে জানিবে কি করিয়া? তবে যদি দেখিতে ভাল লাগা, কথা কহিতে ভাল লাগা, ভবিতে ভাল লাগা, ভালবাসার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে হয়তো সেও বাবিকে ভালবাসে।

কিন্তু, বাবির সহিত বিচ্ছেদও তো আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের শূক্ৰদিদের শানিত দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে। ইহার সহিত সংযোগসূত্র বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও বাধা কম নহে। প্রথমতঃ সামাজিক বাধা; বাবির মামুন্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন তুলসী সন্তান ছাড়া কাহারও হাতে বাবিকে দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক বাধা, তাহার বর্তমান আর্থিক অবস্থা খেয়ল, তাহাতে বাবিকে বিবাহ করিয়া এই পল্লীগ্রামে বেকার জীবন যাপন করা উচিত হইবে কি? কার্তিক ডাক্তার বাঁচিয়া থাকিতে তাহার প্রতি-যোগিতা ও প্রতিশ্রদ্ধিতা পরাস্ত করিয়া এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কোনদিন সম্ভব হইবে না। কাজেই বাবিকে বিবাহ করিতে হইলে তাহার আগে এখানে যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে সব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন ছোট সহরে নতুন করিয়া বাসনা শুরু করতে হইবে। কিন্তু বিনয় ও তাহার স্ত্রী বাবিকে কি ততদমন-জাহার আশীষ বশাইয়া রাখিবেন? বিনয় রাজ্যী হইলেও তাহার স্ত্রী কখনোই রাজ্যী হইবেন না।

অতএব বাবির মগ্নদের জন্যই বাবির সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে হইবে। না করিলে, গ্রামের মক্ষিকাবৃন্দের মধ্যে যে মৃদু গুঞ্জন শ্রুত হইয়াছে, তাহা ক্রমে কণপটভেদী হইয়া উঠিবে। ইহাতে তাহার কেন ক্ষতি হউক আর নাই হউক, বাবির পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে—হয়তো তাহার সহজে বিবাহ দেওয়াই দৃষ্ট হইবে। তবু, বাবির সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না, দিনান্তে তাহাকে একবার দেখিতে পাইবে না, তাহার প্রতীক্ষা-বাকুল চোখের সঙ্গে একবার চোখ মিলাইতে পারিবে না এবং অদূরভবিষ্যতে কোন এক স্থলীন-পূর্ণব চাক-চোল বাজাইয়া আসিয়া দুইটা মগ্ন পড়িয়া জন্মের মত তাহাকে তাহার জীবন হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে—ভাবতে তাহার বুকের ভিতরটা টন টন করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল, সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠি উঠি করিতে লাগিল, রৌদ্রের উত্তাপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, যে পাতলা কুহেলিকার আবরণ একক্ষণ দূরের গ্রামগুলিকে দৃষ্টিপথ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল, শব্দ, উত্তর দিকে দিগন্তবর্তী তরুণেশীর মাথার উপর বৃণ্ডাভরণের মত বাক্য ক্রান্তিগত অস্তরালবর্তী দামোদরের বিন্দুম গতিপথকে নির্দেশ করিতে লাগিল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া দূর বনরেখা, প্রসারিত মাঠ, মাঠের মধ্যে ঘোড়ার ভূমি, তাগাছেরো দীর্ঘ, বোপা-কাপ ভরা গ্রাম, ইত্যাদি দৃশ্যবলী দেখিয়া লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহাদের সহিত তাহার জীবনের যেন একটি যোগসূত্র আছে; ছাড়াইবামে অঙ্গল মাহাত্ম্য ও বিন্দু রজনীতে কলসায়ের তুলি দিয়া যে বিচিত্র বর্ণের ভাববস্তুর ছবি সে আঁকিত, ইহারা তাহার অজ্ঞাতসরে সেই ছবির পটভূমিকায় স্থান অধিকার করিত। অথচ বাস্তব জীবনে ইহাদের সহিত হয়তো তাহার কোন সম্পর্কই থাকিবে না।

বাইক উঠিয়া পরেশ বাড়ির দিকে ছুটিতে শুরু করিল। রাস্তা ক্রমে উঠে হইয়া গিয়াছে, কাজেই স্বত্দের সম্ভব জোলের সহিত চালাইতে হইল। রাস্তার ডান পাশে কতগুলো শালিখ পাখী জড় হইয়া কণরক করিতেছিল। কলরবের কারণ দুইটি শালিখের কলহ; লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা পরস্পরকে নখ ও চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছিল; বাকি শালিখ-গুলো দুইদলে বিভক্ত হইয়া নিজের নিজের কোণেতে উপসাহিত করিতেছিল। যুগ্মমান পাখী দুইটির সহিত নিজের ও কার্তিকের তুলনা করা পরেশের ওঠে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এখানে জোর করিয়া থাকিতে হইলে বা তরুর সহিত হয়তো একদিন এমনই হাতাহাতি করিতে হইবে; গ্রামের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুইজনের পিছুনে দাঁড়াইয়া এমনই দূরে দিতে

ফোন :—কাল : ১৪৬৪ ও ১৪৬৫

গ্রাম :—“এরিও প্লাস্টস্”

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট্

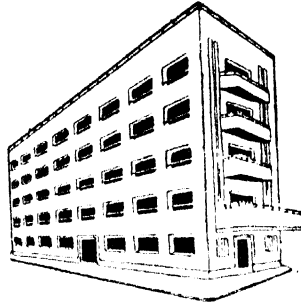
লি মি টে ড্

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়ে
ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস

শাখা ও এজেন্সী :

এলাহাবাদ,
বম্বে, বেনারস,
ভাগলপুর, বাকুড়া,
দিল্লী, ঢাকা,



শাখা ও এজেন্সী :

লক্ষ্মী
মুর্শীগঞ্জ, ময়মনসিংহ
পাটনা, রাঁচি।

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”

(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	২৫,০০,০০০/-
বিক্রীত	১৮,০০,০০০/-
আদায়ীকৃত	১০,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে

* আমরা সব রকম শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি।

* টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্বাপেক্ষা লাভজনক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।

* ভাল সুদে “স্থায়ী আমানত” গ্রহণ করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের “মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” নিয়মিত পাঠ করুন।

বিনামূল্যে নমুনাসংখ্যা পাওয়া যায়।

থাকিবে। অথবা ঘনশ্যাম যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাই সেবন করিতে হইবে। ঔষধটির চেহার মনে পড়িল—রঙ কালা হইলেও দেখিতে মন্দ নয়; লম্ফার বাহ্যে অল্পে বটে, শুষ্কও কম নহে; একটু স্বেদোপ পাইয়াই তাহার উপর একটি দৃষ্টিবোধ হানিয়াছিল, অবশ্য ধরা পড়িয়া লম্ফার আরও জড়োসড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জীবন-সালিনীর প্রতিমূর্তি হিসাবে যে মানসপ্রতিমাকে সে দিনে তিল তিল করিয়া রচনা করিয়াছে, তাহার সহিত বাবর হয়তো কিছু মিল থাকিতে পারে, কিন্তু এই মেয়েটির কোন মিলই নাই। তবু চিকিৎসার অসাধ্য রোগী যেমন দৈবঔষধ সেবন করে, বিপন্ন ব্যক্তি যেমন সর্ব-বিপদ-নিবারণী কণ্ঠ ধারণ করে, তাহাকেও তেমনই (ঘনশ্যামের মতে) এই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে হইবে। এবং বিবাহ করিলেই তাহার ভাগ্যাকাশে যে নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা এক মুহূর্তে মিলাইয়া গিয়া সাক্ষ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে। কান্টিকের কঠোর প্রতিরোধ শেষে সরস শাওলোয় পরিণত হইবে, ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার অযোগ্যতার মিথ্যা কাহিনী প্রচার না করিয়া যোগ্যতার প্রচার করিয়া উঠিবে এবং গ্রামের প্রতিবেশীরা যাহারা পরামর্শক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধতা করিয়াছে, তাহারা বাতাবর্তি মণ্ডলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিলে। এবং কান্টিকের কর্তৃত্বপ্রভা বাড়ি করিয়া একদা সে কান্টিকের মতই একহাতে চিকিৎসা আর একহাতে সুদী ও তেজস্বী কারবার করিয়া ঐ তরুণী কান্টিকের পরেই হইয়া উঠিবে।

চড়াইনি অতিক্রম করিতেই পরেশের চোখে পড়িল, একটা ছুই দেওয়া গরুর গাড়ি আসিবে—সামনের দুখটা কাপড় দিয়া ঢাকা। গরুর গাড়ীটা পার হইয়া গিজন মিথিয়া তাকাইতেই দেখিল, গরুর গাড়ির পিছন দিকে তার গেরিগণের সভিভাবক বসিয়া আছে। রেক কমিয়া গাড়ি হইতে নামিতেই লোকটি লম্ফজন্মের গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং কাছে আসিয়া বিনীতভাবে নামস্বাক্য করিল। পরেশ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, “কোথা গিয়েছেন?” লোকটি হাত কচলাইতে, কচলাইতে কহিল, “একবার কান্টিক ডাক্তারের কাছে গিচ্ছলাম।” পরেশ কান্টিকের ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ওহ! আপনার মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গিচ্ছলেন ব্যক্তি?” লোকটি বাক্যের মত হাসিয়া কহিল, “ঠিক বলেছেন আপনি—নিয়েই গিচ্ছলাম বটে; গায়ের মুরগিরো সব বললেন, একবার কান্টিক ডাক্তারকে দেখাতে।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “আপনার মেয়ের কি আবার জ্বরটা বেড়েছে?” লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আজ্ঞে না, কাল আপনারকে যা বলে পাত্তিগড়লান তাই—জ্বরটা বিকেলে ১০০ হইয়াছিল, রাতে আর বাড়ি নি, সকালে আবার মন্দ হইয়াছিল। তবে সবাই বললেন, ঐ তরুণীর রোগ কান্টিক ডাক্তারকে না দেখালে যেতে চায় না, তাই একবার দেখিয়ে আনলাম। আপনি এবং কাল আবার যাবেন দেখে আসবেন।” পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “আমার যাবার আর কি দরকার? কান্টিক ডাক্তারকে যখন দেখিয়েছেন, তখন জ্বর এবার পাগলে নিশ্চয়। আচ্ছা, আপনি আসুন।” বলিয়া নাহকে উঠিয়া দ্রুতবেগে চলাইয়া দিল।

কতকটা দূর গিয়া, পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—গরুর গাড়ীটা গজানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একটু ফেড়ের নিশ্চয় ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা! কি অশ্ল বিন্দবাস! স্বয়ং যবনকর্তার এলেও এদেশে প্র্যাটিন্স জমতে পারে না।”

বিনয়ের গাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ প্রতিদিনের অভ্যাসমত ঘণ্টা বাজাইল। আজও বিনয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া খুকী পুতুল খেলিতেছিল এবং বাব পাশে বসিয়া খুকীর খুকীসের সজ্জা ও প্রসাধনে সাহায্য করিতেছিল। বাব বেগ ধবি ঘণ্টার শব্দের জন্য এক্ষণে উৎকণ্ঠ হইয়া দাঁসিয়াছিল, শব্দ শুনিতোই চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে খুকীকে কহিল, “পরেশদাদাকে আজ ডাকবি না?” খুকী অনামনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না—আজ তো আমার খুকী ভাল আছে।” বাব কহিল, “কোথায় তোর খুকী ভাল আছে? ওই তো মুখ ঘন ঘন বরছে, জ্বর আছে নিশ্চয়ই।” খুকী এবার উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “সহি জ্বর আছে? ওহা! আমি ভাবছি—ভাল হয়ে গেছে, খেলেছে, দলেছে, ঘরে বেড়াচ্ছে।” বাব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ভাল নেই। যা তুই পরেশ দাদাকে ডেকে নিয়ে আয়।” পরেশ সশব্দে গাড়ি থামাইতেই খুকী হাঁকিয়া কহিল, “পরেশদাদা!” পরেশ জবাব দিল, “এই যে।” বাব ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল, “বাইরে যা।” খুকী কহিল, “তুমি যাওনা দিদি, দেখছ না খুকীটা বসতে চাচ্ছে না।” পরেশ কহিল, “কাউকে আসতে হবে না, আমি নিজেই যাবি”—বলিয়া অনতিবিলম্বে ঘরের মধ্যে আসিয়া গাড়িইল। বাব নতমুখে বসিয়া কহিল। খুকী মুখ ফিরাইয়া কহিল,

“পরেশদাদা! এসেছেন?” পরেশ কহিল, “হুঁ, এসেছি তো। তোমার খুকী কেমন আছে বল দেখি?” বাব সন্তুষ্টভাবে খুকীর দিকে তাকাইল। খুকী কহিল, “ভাল আছে বলে তো আমার মনে হইছিল, দিদি! বললে—এখনও জ্বর আছে—একবার দেখুন না।” পরেশ আগাইয়া আসিতেই বাব উঠিয়া একপাশে বসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ খুকীর পাশে উৎসাহে হইয়া বসিয়া রোগী দেখিয়া কহিল, “তোমার দিদি ঠিক বলেছে খুকী। জ্বর আছেই তো।” খুকী বাবর দিকে তাকাইয়া কহিল, “তুমি ঠিক বলেছ দিদি। ভাগ্যে তুমি পরেশদাদাকে ডাকতে বললে।” পরেশ বাবর দিকে তাকাইয়া কহিল, “তুমিই তা হলে আমাকে ডাকতে পরামর্শ দিয়েছিলে?” বাব এতক্ষণ বিরতিসূচক ভ্রূণলী করিয়া খুকীর দিকে তাকাইয়াছিল, পরেশের কথা শুনিয়া লজ্জাক্ত মুখে কহিল, “আমি কেন পরামর্শ দিতে যাব?” খুকী কহিল, “তাহলে আজও ওষুধের ব্যবস্থা করে দিন।” পরেশ কহিল, “দেব—তুমি ফাঁয়ের ব্যবস্থা কর, চা নয়—সরবত।”

খুকী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই পরেশ উঠিয়া, বাবর সামনে দাঁড়াইয়া তাহার আনত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “গাণ্ডী পড়েছে নিশ্চয়—না হলে কি আমার জন্যে দালাল করতে?” মুখ না তুলিয়াই বাব মুদ্রকণ্ঠে কহিল, “রাগও করি নি, দালালও করি নি।” পরেশ কহিল, “রাগের কথা যাক, কিছু দালাল যে করেছে, তা তো আমি স্বকর্ণে শুনছি।” হাসির একটি ক্ষীণ আভা বাবর গুণ্ঠমুখে ক্ষণকের জন্য বিকসিত করিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, “এর জন্যে তোমাকে সর্বমস্তকরণে ধন্যবাদ, তুমি চেষ্টা না করলে এই শেষ রোগীটিও আমার হাতছাড়া হয়ে যেত।” বাব মুখ তুলিয়া কহিল, “কেন, যাকে দেখে এতদিন সে তো রয়েছেন।” পরেশ দুই করতল চিত্ত করিয়া সন্ধেতে কহিল, “হায়! হায়! সেও শেষ হয়ে গেছে।”

বাব সাক্ষ্যে কহিল, “সে কি মারা গেছে?”

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “একরকম মারা যাওয়াই, অন্ততঃ আমার পক্ষে।” বাব সন্কেতে কহিল, “সে আবার কি?” পরেশ জবাব দিল, “কান্টিকের করাল কবলে গেছে।” বাব শব্দটির নিশ্চয় ফেলিয়া কহিল, “ওহ! তাই!” সহানুভূতির সুরে কহিল, “আপনার হাতে তো সেরে উঠেছিল, আবার হাত বদলাল কেন?” পরেশ কপালে করাঘাত করিয়া শোকাকুলতার ভঙ্গী করিয়া কহিল, “আমার অদেষ্টা।” তারপর সানন্দ্য কণ্ঠে কহিল, “বাব, একটা কাজ করতে পার?” বাব সোৎসুক কণ্ঠে কহিল, “কি?” পরেশ কহিল, “কোমর বেঁধে গিয়ে গায় বসে আসতে পার—দেবীর বরাভদ্রদান-ভঙ্গিতে জন হাত প্রসারিত করে বস্তুত্তর সুরে।” হে জ্বরজর্জর গ্রামবাসিগণ! তোমরা কান্টিক ডাক্তারের জ্বর-রক্ত খাইয়া নিজদিগকে জ্বরমুক্ত ভাবিতেছ—কিন্তু ভুল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তোমাদের কাহারও জ্বর ভাল হয় নাই। তোমরা পরেশ ডাক্তারের কাছে সবার আসি। নচেৎ জ্বরজীর্ণ হইয়া অচিরেই নিজের লোকে প্রস্থান করবে—”

বাব নিরোপের মত তাকাইয়াছিল, বস্তুতা শেষ হইতে কহিল, “সে আবার কি?”

হাত নাড়িয়া পরেশ কহিল, “প্রচার। প্রচার ছাড়া কোন কাজ জগতে হয় নি—হলে না। যদি হাতে একটা খবরের কাগজ থাকত, আর তুমি হতে তার এডিটর—” বাব ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। পরেশ বিনত লোচনে কহিল, “তা হলে দুদিনে কান্টিক ডাক্তারকে বেসিটি পরিয়ে, লোটা কবল পরিয়ে দেশছাড়া করে দিতাম।”

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাব কহিল, “আচ্ছা জামাই তো আপনি! শব্দরকে দেশছাড়া করতে চান?” নিশ্চয়বিশ্বাসিত চক্ষে চাহিয়া পরেশ কহিল, “তার মানে?” বাব স্মান হাসিয়া কহিল, “তার মানে আর কি। কমলার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।”

“কে বললে তোমাকে?”

“কে? আবার বলবে? গায়ের সবাই জানে।”

পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “এই দেখ—এও এক প্রচারের ফল; দশচক্রে ভগবান কৃত—”

পিছন হইতে ডাক আসিল, “এই যে বাবা পরেশ।” বাব ও পরেশ দুইজনেই তাকাইতেই দেখিল—সুখদা প্রবেশ করিতেছে—হাতে একটি কিসার প্লাসে শরবত, সুখদা তাঁকি দৃষ্টিতে বাবর দিকে তাকাইয়া আদেশের সুরে কহিল, “খোকা একলা আছে, ঘরে যা।” বাব সলজ্জ-মুখে নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল। সুখদা আগাইয়া আসিয়া পরেশের

হাতে 'লাসটি' দিয়া কাঁহিল, "কখন এসেছে?" পরেশ কাঁহিল, "এই মাত্র।" শরৎ চুম্বক দিয়া কাঁহিল, "আপনি যুগ্মে নি অজ্ঞ?" সুখা গম্ভীর-মুখে কাঁহিল, "না—না শুনছি—তারপর দিনে রাতে আমার ঘুম আর আসবে কি না, কে জানে।" পরেশ শরৎকে 'লাস' হাতে মুখ তুলিয়া উৎকণ্ঠার সাহচর্য কাঁহিল, "কি শুনছেন?"

সুখা কহিল, "তুমি শরৎকে খেয়ে নিয়ে বাস—বলছি।" পরেশ শরৎকে একটু কহিয়া গিয়া 'লাসটি' সুখার হাতে দিয়া খাটের উপর বসিয়া কাঁহিল, "কি বলুন দেখি?"

সুখা কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁহিল, "তোমাকে আমরা নিজের ছেলে বলেই মনে করি চিরদিন। আমাদের ছেলেমেয়েরাও তোমাকে নিজের বড়ভাই মত মনে করে।" পরেশ সায়া দিয়া কাঁহিল, "আমি তা জানি খুঁড়িমা।" সুখা কহিতে লাগিল, "তুমি হামেশা আমাদের বাড়িতে আস, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব কর, আমাদের-আমাদের কর, এতে আমরা কেউ কোনদিন কিছু মনে করি নি—মনে করবার কোন কারণ আছে বলেও ভাবতে পারি নি।" পরেশ গম্ভীরমুখে সুখার মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁহিল। সুখা বলিতে লাগিল, "কিন্তু এই নিয়েই গিয়ে নানা কথা উঠেছে—আমরা নাকি তোমাকে তুলিয়ে বহির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, নাকি নাকি তোমাকে—খারাবা! না হলে আর মুখ ফুটে বলতে পারছি না।" বলিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মুখ লাল করিয়া সুখা পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ শব্দ-কণ্ঠে কহিল, "কর কাছে শুনলেন আপনি?" সুখা ধারালো কণ্ঠে কহিল, "কর কাছে আমার? শ্রীমতী বামনী ওরোলা উনি শুকলে যাবার পরেই এসেছিল। কখনও আসে না আমাদের বাড়িতে; বোধ হয় কে কথা শোনাবার জন্যেই এসেছিল।" পরেশ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি উঠছি খুঁড়িমা! এদনি যখন তখন আর আসব না; তবে দরকার হলে ডেকে পাঠাতে কিংবা করবন না।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুখা অনুসরণে সহিত কহিল, "আমাদের ওপর রাগ করে না বাবা! জান তো! পাড়াগায়ের সমাজ—পন থেকে চুপটি বসলে সব হা হা করে ওঠে—খোঁচি পাকতে বসে।" পরেশ কহিল, "আজ—চল আমি"—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্ভট হইয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, "বহিরে ওলুটা খাওয়াছেন তো! ওটা নিয়মমত খাওয়াছেন আর ওজনও নেবেন। যদি উগ্ৰিত না হয় তো, এটটা খবর দেবেন দয়া করে"—বলিয়া বাহিরের দিকে চলিল। সুখাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে কহিল, "আমাদের একবার ভাগ করে না বাবা! মাঝে মাঝে খবর দিবা।" পরেশ কৃত্রিম আগ্রহের সহিত কহিল, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! সুখা কহিল, "আর একটি কথা বাবা! তোমাকে যে চিঠি লিখতে বলেছিলাম—লিখছে?" পরেশ ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কি চিঠি?" তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, "ওহা!" ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না লিখি নি এখনও—লিখব আজ।" সুখা কণ্ঠ-স্বরে খেদের স্বর মিশাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, "লিখো বাবা! জানতো ওকে, কোন চেষ্টা নাই। দিবা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমিও লিখছি আমার বাপের বাড়িতে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো আসছে মধ্য মাসে মেয়েটিকে পর করতে পারব।" পরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আজ—আসি খুঁড়িমা।" সুখা কহিল, "এস বাবা।" তারপর—পরেশ দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিতেই কহিল, "শুনেন খুব সুখী হলাম বাবা! কমলা বেশ মেয়ে! শান্ত, শিষ্ট; রঙটাই বা একটুখানি খোটে। না হলে গরম-পটিন ভালই। তা ছাড়া অমন বাপ! ছোট মেয়েকেই নাকি সব লিখে দেবে—শ্রীমতী বস্টিছিল।" পরেশ কিছুই জবাব না দিয়া বহিরে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

(১০)

ভাত খাইবার সময়ে খেলের বাড়িতে প্রকাশ্যে মাছের মূড়া এবং খালার পানের রেকাবিতে ক্ষীর ও মিষ্টান্ন দেখিয়া পরেশ কিশোর প্রকাশ করিয়া কহিল, "এসব আমার কোলকে এল?" পরেশের মাসীমা পাখা হাতে সামনে বসিয়া মাছ তাড়াইতেছিলেন, তেঁকে হাসিয়া কহিলেন, "কাঁচকি ডাঙারের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে।" পরেশ মনে মনে আশীর্বাদ করিয়া এই আর্জিত ভাতমণ্ডলের হেঁচু বসিতে পারিল, তবু না বসিবার ভাগ করিয়া কহিল, "ইহাও এক ভালবাসা! কল মেয়েদের করে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতো, তা হজম হতো না হতেই মাছ-মিষ্টান্ন সওয়াতে—বাপারটা কি বল দেখি? এতদিন তা গায়ে লোকের সঙ্গে জোট বেঁধে এখন থেকে ডাঙাবার চেষ্টা করছিলাম।" মাসীমা কহিলেন, "তোরা যেমন কথা!

ডাঙার ডাঙাবার চেষ্টা করবে কেন? পরের পিছনে লাগা পাড়াগায়ের লোকের অভাস। না হলে ডাঙারগামী যখনই দেখা হয়েছে, হেসে কথা বলেছে, তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছে।" গদগদ স্বরে কহিলেন, "গিন্নিটি ভারী ভাল মানুষ; এত বড় লোকের শ্রী—অহংকারের নামমাত্র নেই।" "হু" বলিয়া পরেশ খাইতে শুরু করিল। মনে মনে কাঁচকি কটু-কৌশলের তারফ করিতে লাগিল। পুরাপুরি হট্টোলায় নীতি অবলম্বন করিয়াছে ডাঙার—প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছে, ঘষা খাওয়াইয়া পশ্চিম বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে, ঘনশ্যামও খুব সম্ভব গ্রামের অন্যান্য পাড়াগায়ের সঙ্গে দল বাঁধিয়াছে, ইহার পর একদিন তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে লোপাট করিয়া দিবে বোধ হয়। মাসীমা কহিলেন, "শ্রীমতী বামনী এসেছিল আজ।" মুখ তুলিয়া, হু কুচকিয়া পরেশ কহিল, "কখন?"

"ভূই বেরিয়ে যাবার একটু পরেই। যে লোকটা মাছ-মিষ্ট নিয়ে এল, তার সঙ্গে।" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "তারপর?", মাসীমা স্মিতমুখে কহিলেন, "বস্টিছিল—ডাঙার-গিন্নীর ভারী ইচ্ছে—তোরা সঙ্গে ওর ছোট মেয়েটির বিয়ে দেয়।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বৃদ্ধি শুনবামাত্র নাকিয়ে উঠে বলল—দেখতো! যোগাড়-যুক্ত করে রাখবে—এলেই পড়িয়ে দেব এখনই।" মাসীমা আশ্বাসের স্বরে কহিলেন, "তোরা যেমন কথা! আমার কি ফালনা ছিলে, নাকি! বিয়ে এখন কর না বস্টিছিল তাই, না হলে হু করবামাত্র কত বড় বড় লোক পরজার গোড়ায় এসে গড়িয়ে পড়বে।" পরেশ দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "তাই নাকি মাসীমা! ভগবান রক্ষা করুন আমাকে—ইহাও যেন হু" না বলে ফেলি। না হলে বাড়ির সামনে যত সব বড় বড় লোক—বড় বড় ছুঁড়ি নিয়ে কিংবদন্তি মুন্ডা-গোড়ার দেরে—বস ভারি বিক্রী ব্যাপার হবে।" মাসীমা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "আমি তাই বলছি নাকি! তোরা যেমন কথা! তবে একথা গরব করে বলব—আমার ছেলের মত ছেলে ও তরুণী কম আছে।" বলিয়া সেন্নে ও গর্বে চোখ ও মুখ বিস্তারিত করিলেন। পরেশ কহিল, "তা হলে তুমি শ্রীমতীকে কি জবাব দিলে?" মাসীমা কহিলেন, "আমি বললাম—ওঁদের ইচ্ছে হলেই চো হতে না, ছেলের ইচ্ছে আনছে দেখতে হবে। আজকালকার ছেলে তো!" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হলে তুমি দর বাড়িয়েছ বলা।" মাসীমা কব্জার দিয়া কহিলেন, "দর বাড়ানোই আমার কি? আমার ছেলের যা আসল দাম, তা দেবার সাধি এ গিন্নির বারও আছে নাকি?" পরেশ ভরতী মুখে হু নাড়িয়া জানাইল, "না।"

মাসীমা কহিলেন, "তবে গিন্নির লোক, মানুষের মত লোক, পিছনে দাঁড়ালে তোর অনেক সন্নিবেহ হবে। তা ছাড়া মেয়েটিও ভাল, চোখ মুখ-নাকি চমৎকার। সেদিন ঘাটে নাইতে গিচ্চল, দেখলাম—এক পিঠি কালো কোঁড়া কোঁড়া চুল।"

পরেশ নতমুখে খাইতে লাগিল। মাসীমা বলিতে লাগিলেন, "এ কামাস তো দেখলাম—গায়ে লোক কাঁচকি উত্তাপকে কি রকম খাতির করে। ও যদি তোর বশব্দ হয়, তা হলে কেউ আর তোর পিছনে লাগতে সাহস করবে না।"

পরেশ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কাঁচকি ডাঙার বৃদ্ধি কুলীন নয়?" মাসীমা গালে হাত দিয়া চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, "ওনা। সে কি কথা! বাড়িয়ে কুলীন হইকি!" পরেশ কহিল, "তবে যে আমাদের মত নীচু ঘরে যিয়ে দিতে চাইছে?" মাসীমা মুখ নাড়িয়া কহিলেন, "তোরা যেমন কথা! ভাল ছেলে পোলে আজকাল এত কুল-কুলজি বেঁটে দেখে নাকি?" পরেশ স্থান হসিয়া কহিল, "দেখে বহিঁক মাসীমা।" মাসীমা ঠোঁট কুচকিয়া কহিলেন, "কই বাবা! আমি তো দেখি নি। আমাদের গায়ে পরেশ চাটুজ নেইকি। কুলী—একমাত্র মেয়ের বে দিল এক ভগ্ন কুলীনের ছেলের সঙ্গে।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "ছেলেটি বৃদ্ধি খুব ভাল?" মাসীমা মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "হু। দারোগা! তা আমার ছেলেও কম কিসে? কলকাতায় সাহেবদের কলেজ থেকে পাসকরা ডাঙার।" কণ্ঠের নীচু কায়ী কহিলেন, "শ্রীমতী বস্টিছিল—ডাঙার-গিন্নী নাকি বলেছে—কুল নিয়ে কি হয়ে থাকে। আটটা মেয়ের সাতটাকে পার করে দিলে; আর ছেলে-পিলে নেই যে বিয়ে পৈতে দিতে হবে।" পরেশ হাসিমুখে কহিল, "এখনও তো হতে পারে।" মাসীমা কহিলেন, "তোরা যেমন কথা! এই বরষে আবার ছেলে হয়? তা ছাড়া এ হাতীর মত শরীর, তোর কিছুর চিন্তা নেই।" পরেশ চিন্তাকুলতার ভাগ করিয়া কহিল, "তুমি তো বলছ চিন্তা নেই; কিন্তু

কার্তিক ভাঙার যদি আবার বিয়ে করে—কুলীন তো! বিশ্বাস নেই।”

মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “তোমার যেমন কথা! কার্তিক ভাঙারের সান্না আছে আবার বিয়ে করব না। বাইরে তো অত বড় গণি-মানি লোক, কিন্তু ভিতরে শূন্যেই একবারে কেঁচো—গিন্নী উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে। তা ছাড়া সব সম্পত্তি গিন্নীর নামে, টাকাকড়িও সব গিন্নীর হাতে; কি লোভে লোভে মেয়ে দেবে ঐ বুড়োকে?” পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া কহিল, “অত খবর যখন সংগ্রহ করছ তখন পরীক্ষা আনিবে দিন-কণ ঠিক করে ফেল। কার্তিক-কন্যাকে বিয়ে করে তবে অন্য কাজ।” মাসীমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “ঠাট্টা নয়, বাছা! শ্রীমতী আমাকে তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে বলছে। মেয়ে তো নিজের চোখে দেখেছিল, মেয়ের বাপের অবস্থাও সব জানিস। এ গায়ে বাস করতে হলে, বাবসা করতে হলে, একজন পছন্দে মূর্খশি না দাঁড়ালে তুই দিয়ে উঠাবি না, তাও বৃথাই পেরোঁস যোগ হয়। তা হলে বল দেখি তোর ওখানে বিয়ে করা উচিত কি না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর বাছা, আমি বলে দিচ্ছি—আমার খুব মত আছে।”

মুখ ধুইতে ধুইতে পরেশ পরিহাসের স্বরে কহিল, “তোমার যখন মত আছে, তখন তো বিয়ে হয়েই গেছে ধর। আমি একটু ঘুমিয়ে চাওয়া হয়ে নি, তুমি ইতিমধ্যে পাটের জোড়, চৌপার আর মালাচন্দন ঠিক করে রাখ; আর ভাঙার-গিন্নীকেও খবর দাও—মেয়েকে যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে; আজ রাতেই তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসব।” বাছে আসিয়া, মাসীমার সামনে বসিয়া, মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, “কার্তিক ভাঙারকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।” মাসীমা কৌতূহলের সহিত কহিলেন, “কি?” পরেশ কহিল, “সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে হোম।” মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “তোমার যেমন কথা! বনবাসী হবে কিসের মধ্যে? ঘর আলো করা উপযুক্ত জমাই হলে—বনের বল দশগুণ বেড়ে যাবে বুড়োকে; আরও দশটা হাত বার করে পরয়া বুড়োকে।”

পরেশ অবিনাশী উঠিয়া কহিল, “ওরে বাবা! তা হলেই তো হয়েছ।” সান্না দিবার সূত্রে ও ভাষ্যিতে মাসীমা কহিলেন, “সে তো তোদের জনাই। সব দিয়ে যাবে তোদের দেখাবি।” পরেশ বদ্বন্দ্ব স্বরে কহিল, “তা হ্যাঁ দেবে, কিন্তু আমার বেকারদুটি তো কাটবে না।” মাসীমা গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, “ঠাট্টা নয় বাছা! সত্যি বলছি, বড় ভাললোক ওয়া। অনেক দিনের জন্য ঘর। একবার বিয়ে করাই দেন—কত আনন্দ-খুশি করবে ওরা। অপর বাসে বাপমা বেছে।” মাসীমা কন্ঠের সুর ধরিয়া কহিলেন, “কোন সাথ মেটে নি তোরা। বাপ-মার মতই ওরা তোমার সব সাথ মেটাবে।”

পরেশ বৃদ্ধিতে পারিল, মাসীমা প্রায়পরিভাবে পৃথক বাহিনীতে যোগ দিয়াছেন। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “একটু ভেবে পরে তোমাকে মতামত জানাব।”

(১১)

স্কুল হইতে আসিয়া, হাত পা ধুইয়া বিনয় খায়ার খাইতেছিল। ববি অদূরে ছোট খোকাবকে কোলে করিয়া বসিয়া ছিল। সুখদা রান্নাঘর হইতে আসিয়া বিনয়ের সমনে বসিয়া ববিকে কহিল, “খোকাবকে আমার কৈলে দিয়ে সন্ধ্যা দেখাও যা।” ববি প্রত্যক্ষ করিতেই সুখদা কহিল, “আজ তুমি স্কুলে যাবার পরেই শ্রীমতী বাননী এসেছিল।” বিনয় জড়ুটি করিয়া কহিল, “ও মাগী আসাদের বাড়িতে কেন? এমনই কখনও আস না।” গম্ভীর হইয়া সুখদা কহিল, “কাজ ছিল তাই এসেছিল।”

“কি কাজ?”

“বলিছিল, পরেশ রাজ আমাদের বাড়িতে আসে, গম্প করে বলে—গায়ে কথা উঠেছে।” বিনয় প্রশ্ন করিল, “কি কথা?” সুখদা রাগত স্বরে কহিল, “বৃদ্ধিতে পারহ না—কি কথা? বাড়িতে যদি বাড়ি মেয়ে থাকে, আর একজন জেয়ান ছেলে দিনরাত আনগোনা করে, তা হলে কি কথা উঠে? ন্যাকা!” বিনয় কড়া সুরে কহিল, “ও রকম কথা কেন উঠবে?” সুখদাও স্বকসার দিয়া কহিল, “তোমার মতে বৃদ্ধি নাই বলে। গায়ের লোকের ভাবছ চোখ নেই? বাড়াবাড়ি হ’লিছ বলেই কথা উঠেছে।” বিনয় চোদা গলায় কহিল, “ঘরের ছেলে ঘরে আসে, তাতে বাড়াবাড়ি কিসের? ঐ মাগীই হত বদমায়েসী—বাঁধুদেী মাগী!”

সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “এত চোচ্ছ কেন? মেয়েরা শুনতে পারে যে! ওরা কিছু জানে না।” বিনয় কণ্ঠস্বর ক্রিষ্ট নামাইয়া কহিল, “ঐ মাগীই রটছে—গায়ের লোক কেউ কিছু বল নি। কই,

আমি তো কিছু, শুনিনি নি।” সুখদা শেলখের সহিত উত্তর দিল, “তোমার কানের পর্দাটা একটু পেরু কিনা, তাই কানের কাছে ঢাক লা পিটোলে মাথায় ঢোকে না।” বিনয় ভাল করিয়া ভাবিয়া কহিল, “বাইরের সুখদা বলিতে লাগিল, “গায়ের নানা লোক নানা কথা বলছে। আর অনায়ে তো কিছু বলে নি! অতবড় বিয়ের ব্যাঘ্য মেয়ে, তাকে বাইরের একটা পেড়ে ছেলেপের সামনে বাসিয়ে—” বিনয় প্রতিবাদ করিল, “বাইরের মানে? এতটুকু বেলা থেকে ঘরের ছেলের মত—” সুখদা বাধা দিয়া কহিল, “বাইরের বই কি! ওদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?” বিনয় কহিল, “সম্পর্ক করলেই পার। বলেছিলাম তো করত—তোমার যে আবার হত বৃদ্ধকি—” সুখদা সজোরে কহিল, “চুপ কর। যা তা বল না বলিছ। বৃদ্ধকি! যেসে ঘরে মেয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াই না কি? আর তোমার ছেলেমেয়ে নেই? বিয়ে পৈতে আর দিতে হবে না তোমাকে?” বিনয় কিছুমাত্র মুখে চুপ করিয়া রহিল। সুখদা সফলভে কহিল, “তা ছাড়া তুমি বললেই বৃদ্ধি ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করত।” বিনয় স্বীকারভে কহিল, “তা চোখ হয় করত।” সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “না বরত না। বাড়িতে খাড়া মেয়ে বাসিয়ে রাখলে, বাইরের ছেলেরা সবিলে পেয়ে—অমন ঘরের ছেলের মত নাওটা হয়ে ঘুরখুর করে। কিন্তু বিয়ে করতে বললেই সার পড়ে।” বিনয় ঘাড় নাড়িয়া নিবেদন করিল, “পরেশ ভেমন ছেলে নয়। এখনও বললে—ও বোধ হয় বিয়ে করবে।” বিনয়ের স্বরে সুখদা কহিল, “যাও না একবার জিজ্ঞাসা করতে, তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে কি না।” বিনয় সোহাসে কহিল, “হ্যাঁ, তা যেতে পারি, আর আজ রাতেই সমস্ত পাকাপাকি করে আসতে পারি।” সুখদা দুই চোটে চাপিয়া বিনয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “কি যে মানুষ! গায়ে কি কানে তুলো গুঁজে বাস কর কিছু শোন নি?” বিনয় জিজ্ঞাসামুখে কহিল, “কি?”

“পরেশের যে সম্পদ হয়ে গেছে।”

বিনয় সন্ধিস্থরে কহিল—“পার সংগে?”

“কার্তিক ভাঙারের মেয়ের সংগে, তবু ভালসা যাচ্ছে—সব প্রায় ঠিক। অত পরয়া খাচ করে কলকাতা থেকে ভাঙার পাস করে এসে কেউ পণ্ডাশ ঢাক মাইনের মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করে? তোমার মত লোকরাই তা বিশেষ করে।” বিনয় নীরবে চাহিয়া রহিল। সুখদা কহিল, “আমি দুপুরবেলা পরেশ এসেছিল। আমি একরকম বলেই দিলাম।” স্বেচ্ছাবে বিনয় কহিল, “কি বলল?” চোখ দুটো ছোট করিয়া, কপালটা বুটকাইয়া সুখদা কহিল, “বললাম বাবা। গায়ে নানারকমের কথা উঠেছে—তুমি আর হামোরা আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা করো না।” গম্ভীর লম্ফা ও পরিচাপের সহিত বিনয় কহিল, “ছিঃ ছিঃ!” ধারালো-কণ্ঠে সুখদা কহিল, “ছিঃ ছিঃ কিসের? আমার মেয়ে কি খেলনা? গায়েঘর মেয়ে বলে রক্ত মাংস নেই তার শরীর? ঐ ছেলের সামল গম্প-গম্প করে, মিলে-মিলে তাই তার মন শিগড়ে যাবে, তা হ’লে গম্পলাব কি করে? আমি ঠিক কথাই বলেছি, পরে বুঝতে পারবে।” বিনয় বিহবল নয়নে গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুখদা আবেশের স্বরে কহিল, “খাওয়া-পার এখনই একবার বেরোও। ঐ ওষুধটা আর যন্ত্রটা পরেশকে দিয়ে এস। যখন তখন আসবার আর যেন কোন ছতো না থাকে।” বিনয় অনুযোগের স্বরে কহিল, “পাওয়াল নাকি। ও আমি পারব না। দু’দিন যাক, তারপর দিয়ে এলেই হবে।”

চোখ ও মূর্ধের ভাব কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুখদা কহিল, “তুমি পারবে না, তা আমি আগেই জানতাম।” বিনয় ভরে ভরে কহিল, “পারব না কেন? মাংস—মজা নাই বা হ’ল। গায়ে বাস করতে হ’লে ওর সংগে সম্পর্ক তো একবারের কাটলে চলবে না, ভাঙার—” সুখদা কঠোরকণ্ঠে কহিল, “সম্পর্ক কাটতে কে চাচ্ছে? গায়ের ছেলে—গায়ের ভাঙার—আসবে, ঠিককথামান বসবে, চা খেতে চায় থাকে, আশার চলে যাবে। তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে মেয়ের সংগে বাসিয়ে গম্প করতে না দিলেই যে তার সংগে সম্পর্ক রাখা হবে না, তা নয়।”

বিনয় কহিল, “তা হ’লেও আজ দুপুরবেলা ঐ কথার পরে, সম্ভাব্যেলাতেই সব ফেরত দিতে গেলে কিছু মনে করবে না?”

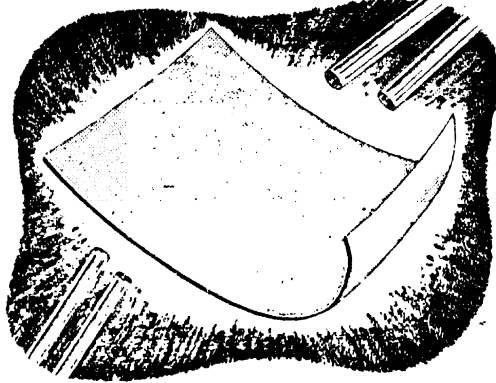
জ্ঞ-ভাষী করিয়া সুখদা কহিল, “মনে করবে কেন? বৃদ্ধিবে বলবে—মেয়ের এমনই শরীর সাপে, ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই, ওজন নেবারও দরকার নেই—” বিনয় এবার বিরাগিত সহিত কহিল, “ও তো আর নিজ হতে দেয় কি—তুমিই চেয়েছিলে। এখন তাকে মিছেবিশ্ব অপমান না করলে বৃদ্ধি—” বাধা দিয়া সুখদা কহিল, “অপমান কে

“তাজা চা, তাজা মন”

—“আনন্দের সুধাপাত্র ভরি,
আনন্দ উথলে ওঠে
কাণায় কাণায়”

ডি লুক্স টি কোং

হেড অফিস—
১৭এ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট,
কলিকাতা।



বিখ্যাত জিনিষগুলি

মজা মেটাল রডস্	ব্রাইট এম্ এন্স বারস্
ফস্ফোর ব্রোজ রডস্	কপার অয়্যার
ব্রাশ রডস্, রাউন্ড (পিভলের বস্)	ব্রাশ অয়্যার
কপার রডস্, রাউন্ড (তামার বস্)	কপার, স্কেয়ার
ব্রাশ রডস্, হেক্সাগন	ব্রাশ, স্কেয়ার
কপার রডস্, হেক্সাগন	কপার টেপ
কপার ফ্লাট্ বারস্	লেড্ শীটস্
ব্রাশ ফ্লাট্ বারস্	জিঙ্ক শীটস্

এবং আমাদের প্রস্তুত অন্যান্য নন-ফেরাস মেটাল এর জিনিষ কাজে
নির্ভরযোগ্য এবং কাস্টিংরিতে শ্রেষ্ঠতার জন্য প্রসিদ্ধ।

ইণ্ডিয়া রোলিং মিলস লিমিটেড

সিটিফেন হাউস, ডলহোসী স্কোয়ার, কলিকাতা।
টেলিফোন : ক্যাল ৫৬১০ টেলিগ্রাম : “INDROLMILS”

পূজার পসরা

১৯৪৪

পাইওনীর রেকর্ড

শ্রীমতী নমিতা সেন

ছটির বাঁশী বাজল : আমি জ্বালব না মোর
(রবীন্দ্র-গীতি—N Q 253)

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

যদি ভুলে যাও : ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ
(আধুনিক—N Q 256)

অঞ্জলি মুখার্জী

নীলবে ফিরিয়া যাব : ফালগুন ফুলদল
(আধুনিক—N Q 254)

বেচু দত্ত

হৃদয় কাহ্নে যেন
হুমি যারে চাও
(কাব্য-গীতি—N Q 255)

পাইওনীর রেকর্ড ক্লাব
A man & 99 women
(কবিতা—N Q 257)

ভারত রেকর্ড

কুমারী নীলিমা গুপ্ত
আমার দোষের যে জন
বুঝি বেলা বয়ে যায়
(রবীন্দ্র-গীতি—S C 58)

কুমারী কমলা সেন
আমার এ পথ
পূর্ণ চাঁদের মায়ার
(রবীন্দ্র-গীতি—S C 59)

খোকা-খুকুর আসর

হুলো আর মেনী
ফড়িংবাঘের পদা লেখা
(N Q 258)

মজার ছড়া আর গানে ভরা

‘শেষ-রক্ষা’ বাণীচিত্র থেকে
কমলমণির গান

পা ই ও নী য়া র রেকর্ডে



কে, সি, দে য়াও সন্ম

১৬১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

করবে ?” বিনয় কহিল, “অপমান বই কি ! একজন একটা জিনিস দিয়ে গেল, কি একটা শুধুই সেটা ফেরত দিলে অপমান করা হয় না ?” সুখদা জবাব না দিয়া, কাল কুচকাইয়া উপরে দাঁত দিয়া নীচের টেবিলটাকে কাপিয়া—কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, “বেশ ওষুধ থাক, যশ্ৰাট দিয়ে এখন। বলবে—ছেলেগো নাট্য করে দেখে—দাম্পত্য জিনিষ দরকার হ’লে নিয়ে যাব এখান।”

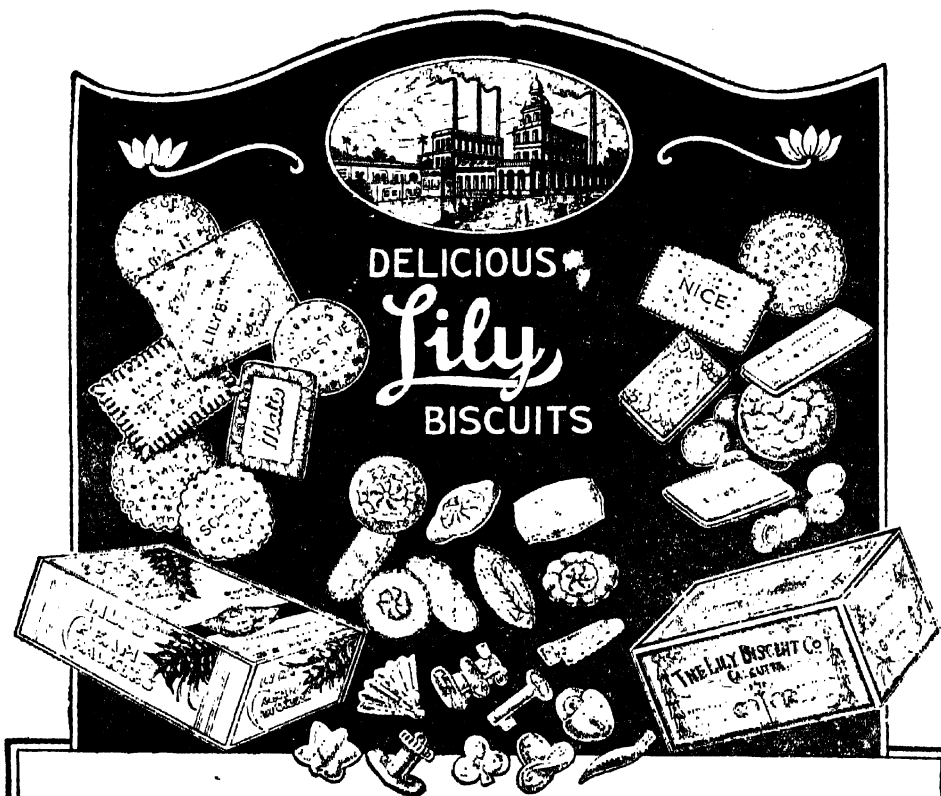
(၁၃)

সারা বিকালটা পরেশের বড় অস্বাস্থিতে কাটিল। কি করিবে—
সে স্থির করিতে পারিল না। যদি 'হা' বলে, কাণ্ডকের দল অমনি হেঁ-হেঁ
করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কাণ্ডক-কন্যার সহিত তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে
আঠেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর, আর নাড়বার চড়বার উপায় থাকিবে
না, কোন দিকে তাকাইবার উপায় থাকিবে না, বাহু হইতে কাণ্ডকের অঙ্গর-
মূল পৰ্যন্ত বাধা-সড়ক ছাড়া কোথাও হাটা চলিবে না এবং যেহেতু যদি
মায়ের মত পরামর্শশালিনী হইয়া উঠে তো আমরাণ কাণ্ডক-কন্যাগত প্রাণ
হুইয়া কাটাওঁতে হইবে। যদি 'না' বলে, তাহা হইলে এই গ্রাম হইতে বিদায়
লওয়া ছাড়া গন্তব্যর থাকিবে না। তাহা ছাড়া বাবা। তাহার সহিত সম্পর্ক
একদমের ছুটিয়া দিতে হইবে অতন্ত নরায়ণ বলিয়া মনে হইতেছে। নেশা
মত বঁধি তাহাকে পাইয়া বাঁসিয়াছে। এক্ষণে দেখা না হইলে, কথা না
বলিলে, মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেং। কোন কারণে মনঃসংযোগ করিতে পারে
না, নেশাখোরের মত যেন সারা অন্তর কোন ক্রমাগত গাঝোড়া ভাঙিতে ও হাই
ভুলিতে থাকে। তাহা ছাড়া বীর দিকটাও চিন্তা করিবার আছে। মনঃসং-
যোগের দাপকাটী অনুসারে বীরক নামসক অবস্থাপটিকে ঠিক 'ভালবাসা'
না বলা গেলেও, সে যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহাকে
দেখিতে চায়, তাহার কথা শুনিতে চায়, তাহারে দেখাবামাত্র তাহার মুখে
আনন্দের অগ্ন্যুত্তাপ ফুটিয়া উঠে। আজও তাহারই প্রচোরাগ্নয় শব্দী তাহাকে
একিঞ্চাচ্ছিন্ন এবং হঠাৎ কঁকিঝারে বীরের অলংকারে বিন্দু-চোমকের মত সে
একটি কটাক্ষ হানিয়াছিল। তাহার সম্পর্কে নিজের যে দুর্দাম রচিয়াছে,
হয়তো সে এখনও জানে না; জানিলে নিচুর তাহাকে জাকিয়া পঠাইত না।
এবে তাহার সাহিত কাণ্ডক-কন্যার যে বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, সে
শুনিয়াছে। ইহাও তাহার মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা তাহার মলিন
বিশ্বাস মুখের স্ফান হাসিচোখে হয়তো ঘরা পড়িয়াছে। পাড়াগায়েদের মেয়ে
সে, শিক্ষার জোন্স ও তার নাই। আলোকপ্রাপ্ত অসুস্থিকায়ের মত
স্বাধীনতা ও স্বাভিমতের দাবি করিতে শিখে নাই; তাহার সে একটি পুঙ্খ-
মম আছে, ইচ্ছা আছে, রুচি আছে, সে কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার
মত হৃদয়ের শক্তি অর্জন করে নাই। কাজেই, যাহারই সাহিত বিবাহ-বন্ধনে
তাহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হউক বিনা বিম্বায়া, বিনা প্রতিযোগে, আমরাণ তাহারই
পাছ, পাছ চলিবে। তাহার অন্তরের মধ্যে অহরহ সে কটা নির্দিয়া থাকিবে,
তাহার বিন্দুমাত্র অভাস তাহার আচার ও আচরণে, বাক্যে ও বাহ্যারে কোন
দিন প্রকাশ পাইবে না। হয়তো ভাবাজীবনে স্বামী-প্রতি-কন্যা-পারিত
সমসারের অপরাধান্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে মগ্ন অবসরে, কোন কোন দিন
সেইশরের এই দিনগাতির কথা স্মরণ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে
তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, হয়তো বা মূহুর্তের জন্য ক্ষণ
বিন্দু-চোমকের মত পলানহাসি তাহার অধরোষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই
মিলাইয়া যাইবে। আর সে নিজে? নিজের হৃদয়ের অবস্থা সে ব্যস্তিতে
পারিতেনে না। নারীসম্পদের ক্ষুদ্র তাহার বুকের মধ্যে জাগিয়াছে, কিন্তু
তাহা যে শব্দ বাক্যে পাইলেই শব্দ হইলে, আর কাহাকেও পাইলে হইলে
না, এতখানি সাংঘাতিক অবস্থা তাহার অসমর্থ হয় নাই। তবে বাক্যে
তাহার ভাল লাগে; ভাল লাগে তাহার সুকুমার তারণা, ভাল লাগে তাহার
শব্দ কলমের দেহলাগা, ভাল লাগে তাহার নম্র সরল সুন্দর বাহ্যর, ভাল
লাগে তাহার নির্বিচার নির্ভরতা। যাহাকে সে বিবাহ করুক, বাক্য সে কেন
নিম্নে ভুলিবে না। আজ যদি ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি কার্পণ্য না করিতেন,
বাক্যে বিবাহ করিতে সে বিন্দুমাত্র শিখা করিত না। সামাজিক বাধা কাণ্ডক
যদি অতিক্রম করিতে পারিত, বিনিয়ের পক্ষেও তাহা দুর্য্যতবশ্য হইত না।
বিনিয়ের স্ত্রী হয়তো শ্রী-সুলভ নির্দম্ভতা ও গোড়ামির জন্য এবং মিথ্যাতার
সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে প্রতিরোধ করিত, কিন্তু বিনিয় রাজি হইলে এবং
তালিম দিয়া তাহার মন ও মস্তকে একটুখানি শক্ত করিয়া তুলিতে পারিলে
সে প্রতিরোধও দূর হইত। কিন্তু ভাগ্য কি কোন দিন প্রসন্ন হইবে না?
ইহার মধ্যেই এত নিরাশ হইবার সময় আসে নাই। পড়ার খরচ চালাইয়াও
তাহার যে পৈতৃক সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করিলে চালাইতে
শরয়ে ছোট ডিসপেন্সারি করিয়া নতুন করিয়া ব্যবসা শব্দে করিবার মত

মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে। তাহার উপরে ববি যদি গৃহলক্ষ্মীরূপে তাহার সুন্দর মুখের অঙ্কন হাসি, সুকোমল হস্তের সেবা এবং হৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মণ্ডলকামনা লইয়া তাহার পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে অচিরে হয়তো সে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতাও অর্জন করিতে পারিবে।

পাশে শূন্যই ছিল, উৎসাহে উঠিয়া পালিল। খিঁচ করিল, মাসমাসকে কোন কোন দ্বারা পূর্বের সে আজই সম্ভার পর একবার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিবে। লক্ষ্যে ও সংকেত বিশুদ্ধ দিয়া সে স্পষ্টভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ব্যক্তি তাহার হাতে দিতে তাহার মত আছে কি না। তাহার মত যদি হয়, তাহা হইলে সে দুঃখীয়া শূন্যইয়া বিনয়ের দৃষ্টিকে রাজি করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহা না পারিলে, বিনয়ের মত লইয়া সে যে কোন উপায়ে ব্যক্তি বিবাহ করিবে।

সম্ভার কিছু পূর্বে পরেশ বেড়াইতে বাহির হইল। সকলে যে দিকে গিয়াছিল, তাহার উল্টা দিকে চলিল। গ্রাহশপাড়া পার হইয়া, তালপুকুরের পাশ দিয়া গাঙ্গুলীদের আমবাগানের ধারে গিয়া পৌঁছিল। বাগানের মধ্য দিয়া একটা পথে-চলা গিয়া। বাগানের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত সেই পথ বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। পরেশ রাত্তা হইতে নামিয়া সেই পথ দিয়া বাগান পার হইল। তারপর মাঠের আইল ধরিয়া সামনের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়া ডানাদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে শুরুর করিল। কতকটা অগ্রসর হইতেই বামপাশে পড়িয়া একটা পুকুর—পাড় অত্যন্ত নীচু। চারিদিকের পাড়, জলের দানিয়া পর্যন্ত ছোটকটির গাছে ভর্তি, লম্বা লম্বা ঘাস ও পানফলের পাতায় সমস্ত জল ঢাকিয়া গিয়াছে, শব্দ, মাখখানেনে এক টুকরা কাছা জল ঢকঢক করিতেছে। পুকুরের একটা কোণে মাঠ হইতে কান্নায়া পর্যন্ত চণ্ডা ও গভীর নালা কাটা; বর্ষার পূর্ব জলের অভাব হইলে এখানে দুন্দীয়া সবাইয়া ক্ষেত্রের শরারকার বন্যস্থা হইত। পুকুরটির গাশ দিয়া আরও কতকটা আগুইয়া আর ডানাদিকে মুখ ফিরাইতেই পারেশ স্কুল চোখে পড়িল। এই স্কুলটির অবস্থা আগে ভাল ছিল না। দুইখানা লম্বা টিনের চালওয়াল ঘরে স্কুল বসিত; বিদেশী ছেলেদের থাকবার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। পাশের গ্রামের এক ভদ্রলোক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন; তিনি স্কুলের পরিচালনা অপেক্ষা ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনায় এবং নিজের সমীর ও বিয়া-আশয়ের হৃদয়খনে বেশি অব্যস্ত ছিলেন। কাজেই, তাহার কর্তৃত্বধানে স্কুলটি অচিরে আশ্রমে পরিণত হইল। আশ্রম-বালকগুলির আঁককাংশই সকাল সকাল ভাত খাইয়া আঁসিয়া, দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত স্কুলপুত্রের বন্যবাতাসে আবদ্ধ না থাকিয়া, চারিদিকের পথে-মাঠে ঘাটে, বনে-বাদাড়ে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যা প্রারম্ভবধীর উৎসাহগোধানী জ্ঞানলাভ করিত; মাস্টারগুলিও নিজ নিজ ছাত্র-বিরল ক্রাশরূমে চেয়ারে টেস দিয়া বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া স্মৃতিপালমেঘ গোপাল-মার্শ দুবোধ ছেলেগুলিকে মনে মনে পড়িতে ও অঙ্ক কাটিতে আদেশ দিয়া দিবানিরা উপভোগ করতেন। একবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে পরাজিত হইয়া হেডমাস্টার মহাশয় দুঃখে হাট ফেলি ন। হেডমাস্টারের জন্য খোজ-খোঁজ রব পাড়া গেল; এ তন্ত্রাটের যতগুলি বেকার গ্রাঙ্গুয়েট নিজ নিজ গৃহাবলীর ব্যাখ্যান করিয়া সরাস্ত পাঠাইল, স্কুলের সেক্রেটারি পরাগ গাঙ্গুলীর বাড়িতে হিটাইটি শুরুর করিল, নিজ নিজ গৃহের প্রস্তুত ঘরের ভাঙ ও নিজ নিজ পুঁকুরপীঠে সন্ধ্যাপালিত বৃহৎ বোম্বিৎ মঙ্গা সহযোগে স্কুলের প্রেসিডেন্ট এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। কিন্তু কাহারও কিছুই হইল না। এম ডি ও সাহেব নিজের একজন বেকার ভাইকে আনিয়া হেডমাস্টারের তথ্যে বসাইয়া দিলেন। এ তন্ত্রাটের সকলে মনে মনে গজাইতে লাগিল; কিন্তু দুঃখে টু শব্দটি করিল না। নূতন হেডমাস্টারটি কয়েক যুবক, দেখিতে সুস্ট্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী। তাহা ছাড়া কলিকাতা অঙ্গলের লোক, কাজেই কথায়-বাতায় অত্যন্ত ভদ্রলোক। ফলে, বঙ্গব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সন্তানের মনোহর করিলেন। তাহা ছাড়া, হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকার জন্য তাহাদের সাহায্যে সরকার ও স্থানীয় অবস্থাপন লোকদের কাছ হইতে অনেক টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে, একটি বৃহৎ একতলা স্কুলগৃহ নির্মিত হইল; বিদেশী ছাত্রদের জন্য চিনের চালওয়াল প্রাঙ্গন ঘর দুইটি বোম্বিৎ-গৃহে পরিণত হইল; ভিত্তিষ্ট বোর্ডের অপর সাহায্যে স্কুলের সামনে একটি ছোট পুকুর ভরাট করিয়া ছাত্রদের খেলার মাঠ প্রস্তুত হইল, অর্থাৎ আশ্রমটি আবার স্কুলে পরিণত হইল। হেডমাস্টার মহাশয়ের সতর্ক ও কঠোর তত্ত্বাবধানে ছাত্রগুলিকে স্কুলঘরের বন্যবাতাসে বসিয়া আধায় করিতে হইতে লাগিল এবং মাস্টারগুলিকে দিবানিরা বিসর্জন দিয়া খাড়া চেয়ারে বসিয়া অধ্যাপনা করিতে হইতে লাগিল।



লিলি বিস্কুট

স্বাদে ও গুণে অপরাজেয়

তাজা, মৃচ্ছমৃচ্চে, নোনতা
নবনীত, লোভনীয়

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি

ভারতের শ্রেষ্ঠ পথ্য ও পানীয়

প্রাণ্তি ও ক্রান্তি দূর করিতে
অতুলনীয়

LILY BISCUIT CO.
CALCUTTA BOMBAY
MANUFACTURERS OF THE FAMOUS "LILY BRAND" BARLEY



শুলের কাছাকাছি আসিতেই পরেশ দেখিতে পাইল, খেলার মাঠে হেলেরা খেলা করিতেছে ও জনকয়েক শিক্ষক খেলা দেখিতেছে। এই শিক্ষক-দের সহিত পরেশের বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারা বিদেশী লোক, বোর্ডিং-স্কুলে। পরেশ আবার ডানদিকে মূখ্য ফিরাইয়া চলিতে শুরু করিল এবং বোর্ডিংয়ের পিছন দিয়া কতকটা গিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রথমেই আগরুীপাড়া; রাস্তার দুই ধারে সারি সারি উঁচু দাওয়া-ওয়ালা খড়ের ঘর। পূর্বে আগরুীদেশে প্রায় প্রত্যেকই বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। কিন্তু গ্রামের রহস্য ও কারখানের কূট বৈষয়িক শৃঙ্খল-সঙ্গে আটিয়া উঠিতে না পারিয়া দুর্বলপায়া পড়িয়াছে। পাড়ার মধ্যে শূন্য, যুগল আগরুী বাহারও কাছে হার স্বীকার করে নাই; যতদিন বাঁচিয়া ছিল আঘাতের বদলে আঘাত করিয়া, পাটের বদলে পাচি করিয়া, বিপক্ষ দলকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যুগলকাকাকে পরেশের মনে পড়িল; লম্বা চওড়া দেহ, শক্তমান, তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ। যুগল-কাকা পিছনে না থাকিলে বাবার মৃত্যুর পর অস্বাভাবিকজননের শূভাকাঙ্ক্ষার ধারা সামলাইয়া তাহারা গ্রামে বাস করিতে পারিত না।

একটা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হুঁকায় তামাক শাইতেছিল। পরেশকে দেখিয়া হুঁকাতা মূখ্য হইতে সহায়ীয়া দুই হাতে হুঁকার ভাবটি ধরিয়া, নলটিতে মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, “পেরনাম ডাক্তারবাবু! কেথায় গেছেলেন?” পরেশ মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, “এই দিকে একটু—” লোকটা প্রশ্ন করিল, “হেঁটে যে?” পরেশ চলিতে চলিতে জবাব দিল, “হ্যাঁ।” কতকগুলি মেয়ে কলস কঁখে করিয়া জল আনিতেছিল—পরেশকে দেখিয়া, যেমটা টানিয়া সমস্তমে পাশ কাটিয়া দাঁড়াইল এবং সে পার হইয়া যাইতেই তাহাদের মধ্যে সহাস্য গল্পের শোনা গেল। আরও কতকটা যাইয়া, ডানদিকে ফিরিয়া, ছোট গলি রাস্তা দিয়া গিয়া আর একটি রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি প্রায়গণপাড়া মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় কতকটা যাইতেই শ্রীমতীর সহিত দেখা হইল; নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সখ্যা দেখাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়াই আপায়ন সহকারে কহিল, “এই যে ভাই! কেথায় গিয়েছেন?” পরেশ হাসিয়া জবাব দিল, “এমনই একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।”

শ্রীমতীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ফরসা রঙ; এককালে যে চেহারা ভালই ছিল, বার্ধক্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখিয়াও তাহা আন্দাজ করিতে পারা যায়। শ্রীমতী কুলীনীকৈ কন্যা; রূপ ও যৌবনের দৃড়দৃড় দিয়াও স্বামীকে বশীভূত করিতে পারে নাই। বিবাহের পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বামী আর একটি কুলীন-কন্যার স্বামী হইয়া গেল। শ্রীমতী তারপর আর স্বামীর ঘর কর নাই। ব্যাপার একমুঠ কন্যা; জিম-জায়গা কিছু ছিল। কাজেই মা-বাবার মৃত্যুর পর, সাজা-খাজনা আদায় করিয়া, চাকরা সখ্যা কাটিয়া পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিয়া, তাহার একটি পেট অন্যায়সে চালাইয়া দিল। স্বামীর একবার আসিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া জল জমাটবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীমতী তাহাকে গালগালাই দিয়া, চেনাকট হাতে ভাঙা করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আর শ্রীমতীর জীবনে স্বামী-সম্ভাষণ ঘটে নাই। স্বামীর প্রতি নিন্দাবাদ হইলেও শোনা যায়, শ্রীমতীর হৃদয়ে করুণা ছিল এবং তাহা সাময়িক দুই-চারজন যুবকের (যাহারা এখন বার্ষিক পদার্পণ করিয়া লোক-ঘোঁটা কাটিয়া ধর্মদেবী বনিয়াছে) প্রতি বিনামূল্যেই বিস্তারিত হইত।

শ্রীমতী কোঁচ-পড়া মধ্যে আরও কতগুলো কোঁচ পড়াইয়া মূঢ়কি হাসিয়া কহিল, “কারও সম্মানে ঘরে বেড়াচ্ছ নাকি?”

পরেশ বস্তু বা বসিয়া বোকার মত হাসিল। শ্রীমতী কহিল, “আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি কিছু?” পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, “কার সঙ্গে?” শ্রীমতী কহিল, “যার একটিবার দেখা পাবার জন্যে বেরিয়েছ, তার সঙ্গে—আমাদের কমলার সঙ্গে।” পরেশ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “থাক, দরকার নেই দিদিমা।” শ্রীমতী কহিল, “পেটে ক্ষিদে মূখ্য লাগে কেন হে? মূখ্য বলছ না; কিন্তু তুমার ঠোঁটের হাসি আর চোখের চাহনি বলছে—হ্যাঁ।” হাসিয়া কহিল, “প্রিয়তার সঙ্গে নাই বা দেখা করলে, চন্দ্রাবলীর কুণ্ডে যেতে লোম আছে নাকি?” পরেশ কহিল, “আমার একটু কাজ আছে দিদিমা, চলি।” শ্রীমতী অপর্যাপ্তসংযোগ অবজ্ঞাসূচক হুঁদনি করিয়া কহিল, “কাজ! একদিন সব কাজ ছেড়ে এই দিদিমার ভাড়া ঘরে পড়ে থাকবে, আমি বামুনের মেয়ে হয়ে ভরসংযোগ বলে দিচ্ছি।” অন্তরে করিয়া কহিল, “চল না ভাই! মূঢ়কি শূঁকিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একটা মজা দিয়ে একটু জল

খেয়ে যাও, না হলে—” মূঢ়কি হাসিয়া কহিল, “সারাদিন শূন্যে মূখ্য মনে করে আমার রাগে ঘুম আসবে না।” বলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। পরেশ অগত্যা তাহার অনুসরণ করিল।

দরজায় ঢুকিতেই সামনে বিস্তৃত উদ্যান; ডান দিকে খড়ের ঝাল ওয়ালা মটির কোঠা ঘর। পাশাপাশি দুইটি কুঠরী, সামনে প্রশস্ত দাওয়া; দাওয়া বেশ উঁচু; সিঁড়িতে সিমেট দিয়া বাঁধানো। বাম দিকে একটি একতলা ছোট ও প্রাচীন ঠাকুর দালান; প্রবেশ দ্বারের খাড়া উপরে, সামনের দেওয়ালের মাথার ঠিক মাঝখানে একটি যুগ্মহস্ত নাড়ুগোপালের তল্লাতে উপবিষ্ট গরুড়দেবের প্রতিমূর্তি। নাকট ভাঙিয়া গিয়াছে, মূখ ও বিষমস্তপ্রায়, মাথায় একটি হাত-দুই লম্বা লোহার শিক প্রোথিত। দেবারতলটিকে বস্ত্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়দেবের এই শাসিত। এখন অবশ্য দেবমূর্তি নাই; বাবা-মার মৃত্যুর পর নিতাসেবা চালাইতে না পারিয়া শ্রীমতী শালগ্রাম শিলাকে গণগণত্রে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে এবং দেব-গৃহটিকে ভাঙার-গৃহে পরিবর্তিত করিয়াছে। তথাপি গরুড়-দেবের শঙ্কমূর্তি ঘটে নাই।

শ্রীমতী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় একটি মাদুর পাতিয়া সাদরে কহিল, “এস ভাই, বস।” তারপর প্রদীপ-হস্তে ঠাকুর দালানের ভিতরে গিয়া দেবীর সামনে একটি পিসলুজের উপর প্রদীপটি রাখিল। এবং শূন্য সিংহাসনের সামনে জানু পাতিয়া প্রণাম করিল। তারপর ঘরের এক কোণ হইতে একটি প্রাচীন কাঠের বাহির করিয়া জ্বালিয়া, এ ঘরে অনিয়া পরেশের পাশে রাখিয়া কহিল, “চারটি দুধ চিড়ে মেখে দেব?” পরেশ প্রবল আপত্তি সহকারে কহিল, “না, না; এক গেলস জলই দিন না শূন্য।” শ্রীমতী মূখ্য-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “তা কি হয় ভাই! কত ভাগ্যে কুণ্ডে পদার্পণ করছ—আগে হলে সারারাত্রি ঘরে রাখতাম।” পরেশ মূখ্য টিপিয়া হাসিল। শ্রীমতী ঠাকুর দালানে ঢুকিয়া গেল।

পরেশ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বারান্দার এক পাশে একটি কক্ষের আসন পাতা—তাহার সামনে শ্রীমতীর চরকা, পেঁজা তুলা, নাইট এবং অন্যান্য সূতা কাটিবার সরঞ্জাম। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। উদ্যানের মাঝখানে একটি ইঁটে বাঁধানো তুলনী মণ্ড, তাহাতে একটি তুলনীপত্র; উদ্যানের এক কোণে একটি শাখা প্রশাখানহীন কাগজীশেলুর গাছ। শ্রীমতী লেবু বিক্রয় করিয়াও দুই পরয়া রোজগার করে। উদ্যানের এক মারে একটি গাছের চলা, সেখানে একটি চৌকি বাঁধা। শ্রীমতী নিজে গান গান না, তবে ভানুদীনের খেঁচী ভাড়া দিয়া থাকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের “দিদিমা” ডাক শুনিয়া চমকিয়া সদর দরজার দিকে তাকাইতেই পরেশ দেখিতে পাইল, একটি পনেরো-ষোলো বৎসরের মেয়ে ঘরে ঢুকিতেছে, পরিধানে বাসন্তী রঙের শাড়ি, লুইস কি রঙের ঠাঠর হইল না, মাথা ও পা খালি, মেয়েটি কতকটা আগাইয়া আসিয়া কাঠনের আলোকে পরেশকে দেখিতে পাইয়াই দুই পা পিছাইয়া লজ্জায় জিন-কটিল, তারপর দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলিয়া গেল।

পরেশ হাঁকিল, “দিদিমা!”

শ্রীমতী জবাব দিল, “কি ভাই! একলা ভয় করছে? এই সম্ভাব্যেলায় ভয় কি হে?” পরেশ কহিল, “আপনাকে কে ডাকছে দেখুন।” শ্রীমতী ভাড়াভাড়ি বাহির হইয়া আসিল—হাতে একটি রেকাবি, তাহাতে মূড়কি ও মজা; কাছে আসিয়া কহিল, “কি বলছ?”

পরেশ কহিল, “কে ডাকছে আপনাকে।”

শ্রীমতী দরজার দিকে তাকাইয়া কহিল, “কই?” পরেশ মূখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, “বোস হয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়া আছে।” শ্রীমতী রেকাবিটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া মূঢ়কি হাসিয়া কহিল, “বুকেছ ভাই, আমার নাতনী।” বলিয়া ঘরের দিকে যাইতেই পরেশ কহিল, “উনি বাইরে দাঁড়িয়া থাকেন, ডেকে আনুন।” শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে কহিল, “অত আশ্চর্য হুই কেন ভাই, ডাকছি। আগে আমার হবু নাড়ুজামাইকে সামলাই, তারপর নাতনীকে ডেকে আনব।” অনতিবিলম্বে এক গ্লাস জল আনিয়া পরেশের রেকাবির পাশে নামাইয়া দিয়া কহিল, “খাও। নাতনীকে ডেকে আনি—মিটি খেতে খেতে নাতনীর মিটি মূখখানি দেখবে, তাহলে চিরদিন ওকে মিটি লাগবে।” বলিয়া বার্ষিক-শিথিল দেহে যতখানি তরঙ্গ তোলা সম্ভব তুলিয়া দরজার দিকে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে একজনের স-তর্জন অনুরোধ ও আর একজনের স-স্বকার প্রতিরোধ পরেশের কর্ণগোচর হইল। পরেশ আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—মেয়েটিকে শ্রীমতী হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে। মেয়েটি কৃষ্ণ

টাকা খাটাবার সবচেয়ে নিরাপদ ক্ষেত্র

যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিরাপদ অথচ লাভজনকভাবে টাকা খাটাবার ক্ষেত্র পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন সময়েই হউক না কেন, জমিতে টাকা নিাবনায় খাটান যেতে পারে,—

কারণ

যে নিৰ্ম্মাণোপযোগী অথবা অন্য যে কোন প্রকারের মূল্যবান জমি একটা স্থায়ী সম্ভত্তি ত বটেই, অধিকতর তা থেকে স্থায়ী ভাল আয়েরও ব্যবস্থা হয়।

জমিতে টাকা খাটাতে হলে লিখুন ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

"শেয়ার ডিলার্স' হাউস"
১২, চৌরঙ্গী সেকোয়ার, কলিকাতা।

* আমরা কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান জমি খরিদ করিয়াছি।

* ভারতের প্রতিটি বৃহৎ শিল্পপ্রধান নগরীতে জমি খরিদ করিবার আমাদের যে পরিকল্পনা, তাহা ক্রমশঃ কার্যকরী করা হইতেছে।

* আমরা নিয়মিত উচ্চহারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছি।

আমরা "স্থায়ী আমানত" গ্রহণ করিয়া থাকি; সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ হইতে ৭ পর্য্যন্ত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট লিখুন।

বিবর্তিত সহিত আবগারের সূত্র কহিতেছে, “আঃ, ছাড়ুন না!” শ্রীমতী কহিল, “ছাড়ব কেন লো ছাড়ু?” এতদিন জড়িয়েছিল, আজ এত ছাড়বার জন্যে ছটকটানি কেন?” মেয়েটি অনুন্ময়ের সূত্র কহিল, “সত্য, ছেড়ে দিন। বাড়ি যাই।” শ্রীমতী ধমকাইয়া কহিল, “দেকা! বাড়ি যাবার জন্যেই বাকি এতক্ষণ সড়া না পেয়েও দরজায় দাঁড়িয়েছিল।” পরেশের সামনে টানিয়া কহিল, “ওহে নাগর! শুনো! মশা খাওয়া ছেড়ে একবার মুখ তুলে তাকাও, মস্তার চেয়ে হাজার গুণ মিষ্টি জিনিস এমনিছা।” পরেশ লম্জায় আরও মুখ নত করিল। শ্রীমতী বিজ্ঞার দিয়া কহিল, “ছিঃ! মেয়েমানুষেরও অধম নাকি! নাকের সামনে একটা ডব্বা ছুড়ীকে ধরে দিচ্ছে, তাকিয়ে দেখতে পারছ না!” পরেশ মুখ তুলিল না। শ্রীমতী কহিল, “তাকাও, তাকাও বলছি। না তাকালে আমার মাথা খাও।” পরেশ হাসামুখে মুখ তুলিয়া কহিল, “কি বলছেন! এই নিন তাকাছি আপনার দিকে।” বলিয়া শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু এই অবসরেই আড়চোখে লম্জনাতমুখী মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইল। শ্রীমতী কহিল, “আমার দিকে নয়।” মুখের ইঙ্গিতে কহিল, “এই দিকে—তাকাও বলছি। না হলে ঘাড়ে ধরে, চোখ তেড়ে তাকিয়ে দেবা।” পরেশ এবার পুরাপরিভাবে মেয়েটির দিকে তাকাইল। যে সুকামল শ্যাম-শ্রী বাঙালী মেয়ের বৈশিষ্ট্য, এ মেয়েটির দেহে তাহার জোয়ার আসিয়াছে। লম্জা ও কোঁচক মুখখানি কলমল করিতেছে; দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ দুইটি, দুইটি কৃষ্ণ বক্ষিরেখার অধীনস্থানিত; পাতলা ডু দুইটি যেন চতুর্থীর কালো চাঁদ, ডু দুইটির মাঝখানে কচিপাকার টিপটি যেন ক্ষুদ্র সজ্জ তারা, কানের লাল পাথরের দুল দুইটি যেন দুইটি গোলাপের কুড়ি।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, “কেমন দেখছ হে? পছন্দ হয়?” পরেশ জবাব না দিয়া মূগ্ধ হাসিল।

এই সময় মেয়েটি মুখ কিণ্ঠে তুলিয়া আড়চোখে পরেশকে দেখিবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া শ্রীমতী সতর্কনে কহিল, “তুই খবরদার তাকান না পোড়ামুখী! শব্দদৃষ্টির আগে বরের দিকে তাকাতো নৈই জানাস না বন্ধি?” মেয়েটি গভীরতর লম্জায় মুখ একেবারে বৃকের কাছে নামাইয়া ফেলিল।

শ্রীমতী কহিল, “চল, বসার চল।” বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। মেয়েটি নিসসিস করিয়া বলিতে লাগিল, “না, বাড়ি যাই আমি।” শ্রীমতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “বাড়ি যাওয়া কেন? বস। এমনই তুলে নিয়ে পালানো ভাবছিছ নাকি?” বলিয়া পরেশের কাছ হইতে কতকটা দূরে আসন পাতিয়া মেয়েটিকে বসাইল এবং ঘরের ভিতর হইতে পান সাঁজবার সরঞ্জাম আনিয়া পরেশ ও মেয়েটির মাঝখানে বসিল।

পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া বুঝলে মুখ মুচিতে মুচিতে কহিল, “খাব খাইয়ে দিলেন দিদিমা।” শ্রীমতী কহিল, “তা ভাই, বুড়ী দিদিমার মশা মুচুকি ছাড়া খাওয়াবার তো আর কিছুই নেই।” মুচুকি হাসিয়া কহিল, “হরে ভাল জিনিস খাওয়াবার ব্যবস্থা তাকাইছ—বরের স্খা তার কাছে হার যেনে যাবে।”—বলিয়া পর পর পরেশ ও মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইল। তারপর পান সাঁজিয়া পরেশের হাতে দিয়া আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, “এবার ভাই, সত্যি করে বল নাটনকি আমার পছন্দ হয় কি না।” পরেশ চুপ করিয়া গেল। শ্রীমতী কহিল, “ওহে শূদ্র, সাদা রঙ দেখে ভাল না। আমারও তো সাদা রঙ, কপাল তো দেখেছ—এ জন্মে সোয়ামীর ঘর করতে পেলাম না। রঙ হলেই চলবে না—কপাল চাই। দ্রোণদীর রঙ তো কোনো ছিল—কিন্তু কত ভাগ্যবতী ছিল বল দেখি? পটিজনে পায়ের কাছে পড়ে থেকেও মন পেত না। নাটনীর আমার তেমনই কপাল। ও জন্মবার আগে তো কার্তিক ডাক্তার একরকম ফতুর হয়েই গিয়েছিল; যা কিছু টাকা-কাড়ি ধনদৌলত গয়না-গাটী ছিল, বেয়াই আর বানে মিলে লুটে নিয়োছিল। এখানে যখন এল তখন লক্ষ্মী পাতবার মত এক ছোটক ধান পর্যন্ত ছিল না। ও হবার পর থেকেই আমার শ্রী-বৃদ্ধি শূদ্র হ'ল, তাছাড়া নাটনী কি আমার কপাল? ভাল করে চেয়ে দেখ দেখ—কেমন রঙ, নববুর্দীলশ্যাম তো একেই বলে।” মুচুকি হাসিয়া কহিল, “গায়ের রঙ ফুসো হ'লে গায়ের আব মেজাজের তাপে কাছে যেনেতে পারবে না। ঠিক রকম শ্যামবর্ণ হ'লে মেজাজ হবে মিষ্টি, আর গা হবে শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা।” সুর করিয়া কহিল, “আর্য্যে রজনী যাপিবে হে গুণগণ।” পরেশ মিমমমে শুনিতোছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “উঠি দিদিমা।” খপু করিয়া হাত ধরিয়া শ্রীমতী কহিল, “বা রে! পালানো যে! কথা দিয়ে বাও।” মেয়েটির দিকে

তাকাইতে চোখে চোখ মিলায়া পরেশের বৃকের জিহবটা কাঁপিয়া উঠিল, শিখিলকণ্ঠে কহিল, “শাসনীর কাছে শুনকেন।” শ্রীমতী কহিল, “খাওয়া খবর শুনব না তো?” মেয়েটির জিহবায় কলস্কোমল মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, “খুব সম্ভব না।” শ্রীমতী হাত ছাড়িয়া লইল।

পথে নামিয়া পরেশের মনে হইল, কল্লটা ভাল হইল কি? সে যেন একরকম মত দিয়াই আসিল। মেয়েটির সাক্ষাতে না বলিয়া তাহাকে অপমান করিতে তাহার ভ্রতাজ্ঞানে বাধিল যথেষ্ট হয়। কিন্তু শূদ্র ভ্রতাজ্ঞান অনুযোগেই নয়; মনের মধ্যে ঢুক দিয়া দেখিল, সেই গভীর ডলবেলে একটা নবজাত শৈশাল-শিশুর মত অতি কণীন অতি কদুর আকাশকা জন্ম-লাভ করিয়াছে, এখনও বর্ধিত হয় নাই, এখনও দলের পর বল হেলিয়া সারা মনকে ছইয়া ফেলে নাই। সে আকাশকা—নবোৎপত্তবোবোম ডল্লী, শ্যামলী মেয়েটির সগলাভের, যে চোখের চাহনি বৃকের মধ্যে কাঁপু জাগাইয়াছে, সেই চোখের পরে চোখ রাখিয়া তাহার মনের কথা জানিবার। পরেশ ভাবিল, কি হইবে এই গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া? কি হইবে কোন এক অপরিচিত স্থানে গিয়া নূনভাবে জীবনযাত্রা শূদ্র করিয়া? এ সস্ত্রী মেয়েটিকে গ্রহণ করিলেই তো সব আপনা আপনি ধরা দিবে। ধরা দিবে অর্থ ও প্রতিপত্তি সম্মান ও সম্পত্তি, ধরা দিবে প্রতিবেশীদের স্নেহ সহায়তা সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। কিন্তু বারি? তাহাকেও যে মন পাইতে চায়? কিন্তু আজ পর্যন্ত মন যাহা চাইয়াছে, তাহা কি সব পাইয়াছে? এবং তাহা না পাইয়াও যদি তাহার চলিয়া থাকে, বাকি না পাইলেও তাহার চলিবে বোধ হয়। হয়তো প্রথম-প্রথম মনটা খুঁতখুঁত করবে, অভিমানে গুম হইয়া থাকিবে, তাহরপর এ মেয়েটির সুন্দর সাহচর্য প্রবোধ মানিবে।

বহিদের বাড়ির সামনে পৌঁছিতেই পরেশ দেখিল, বৈঠকখানা অন্ধকার। ভাবিল, পূর্বসংকল্পমত বিনয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করে। তারপরই ভাবিল, থাক, কি হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া? বিনয়ের মত যে আছে, তাহা সে জানে; কিন্তু তাহার শরীর কিছুতেই মত হইবে না। তাহার মত করাইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ, অনুন্ম-বিনয় করিবার আগ্রহ মন হইতে ইহার মধ্যেই বোঝালুম অন্তর্ধান করিয়াছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই পরেশ দেখিতে পাইল, বিনয় টিনের চেয়ারটিতে বসিয়া আছে। সামনে টেবিলের উপর একটি লণ্ডন, খুব সম্ভব বিনয়ই সগল করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পরেশ কহিল, “কাকাবাবু, আপনি? কোন দরকার আছে নাকি?” বিনয় তাহার স্বভাবাস্থি সরল হাসি হাসিয়া কহিল, “এস বাবা পরেশ! বস। দরকার এমন কিছু নেই। কোথায় গিয়েছিল?” পরেশ বসিতে গিয়া টেবিলের উপর ওজন করিবার যন্ত্রটা দেখিয়া সবিচক্ষণ কহিল, “এটা এখানে? নিয়ে এলেন বন্ধি?” বিনয় কাঁচমুচ মুখে ঢোক গিলিয়া কহিল, “হ্যাঁ বাবা! তোমার কাকীমা বললে, ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কে কখন নষ্ট করে দেবে। দামী জিনিস—” পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “দামী জিনিস বটে, তবে কে নষ্ট করবে? তা বেশ! বন্ধিও ওখুঁটাই দিন কয়েক খাওয়ান। তারপর দরজেন বখন টোকাঠাণী হবে, তখন লোকে বন্ধি, কার কতটা বিদ্যে। তা সে তো সময় লাগবে বাবা! কার্তিকের কতদিনের কারবার এখানে; তাকে কোণঠাসা করতে হ'লে তোমাকে একটু ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া কার্তিক ডাক্তার যদি—”

বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “এখনই এত হতাশ হয়ে না বাবা! যাই হোক, বাবসা তো! একবারে জন্মে উঠবে না; ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধবে। দেশের লোক এখন কার্তিককেই জানে, তাহে কলির দলবর্তার। ক্রমে ক্রমে, দু-একটা কেসে দরজেন বখন টোকাঠাণী হবে, তখন লোকে বন্ধি, কার কতটা বিদ্যে। তা সে তো সময় লাগবে বাবা! কার্তিকের কতদিনের কারবার এখানে; তাকে কোণঠাসা করতে হ'লে তোমাকে একটু ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া কার্তিক ডাক্তার যদি—”

পরেশ এতক্ষণ একশেষে বিনয়ের আঁচ্ছা, কাকাবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নয়, তবু উপায় নেই। আশা করি আমাকে নিলম্জ ভাবেবন না—” বিনয় বিন্দয়ের সহিত কহিল, “কি বলবে?” পরেশ ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল, “বাকি আমার হাতে দিতে আপনার আপত্তি আছে?” বিনয় স্নেহের হাসি হাসিয়া কহিল, “আমার মত পরিব মাষ্টারের তোমার মত ছেলের হাতে দেনে দিতে আপত্তি!” খাড় নাড়িয়া কহিল,

গিৰিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত-১৯৩০

হেড্ অফিস-২১এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪৭৩১, ৩২৭৬

টাকাকড়ি নিরাপদে রাখিবার নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

এবং শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত

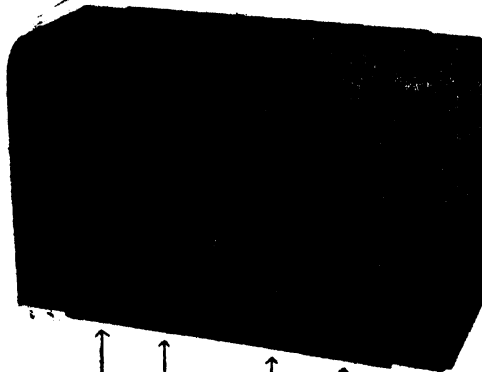
বোর্ড অফ ডিরেক্টরস

চেয়ারম্যান:- রায় জে, এন, মদুখার্জি বাহাদুর, গভর্নমেন্ট স্টাডার ও পাবলিক প্রিন্সিপালিটি, হুগলী।
 মিঃ বীরনারায়ণ চাঁদ, জমিদার ও ব্যাংকার, পুর্ণিয়া।
 মিঃ বি কে নন্দী, মার্চেন্ট, কলিকাতা।
 ঠাকুর কে কে সিংহ, মন্ত্রী, ত্রিপুরা স্টেট।
 মিঃ পঞ্চজকুমার গাঙ্গুলী,
 এডিশনাল পাবলিক প্রিন্সিপালিটি, আলিপুর।
 মিঃ অনিলকিশোর রায়, জমিদার ও ব্যাংকার, মহম্মদসিংহ।
 মিঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ, জমিদার ও ব্যাংকার, খুলনা।
 মিঃ ফকুচাঁদ ভগত,
 মার্চেন্ট ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, কোম্পাগন, হুগলী।
 মিঃ আই এন চ্যাটার্জি, মার্চেন্ট, উত্তরপাড়া।
 মিঃ হরীকেশ মদুখার্জি, ডাইরেক্টর-ইন্ চার্জ।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য সুচারুরূপে তৎপরতার সহিত করা হয়।

বিক্রয় এবং মেরামত করা হয়

সু
দ
ক্ষ



ই
ঞ্জি
নী
য়া
র

এইচ, এম, ভি'র,

RADIO CORPORATION OF BENGAL
HOUSE OF RADIO ENGINEERS

১২৪-২-ডি, রসা রোড

(রাসবিহারী এভেনিউ ক্রসিং)

“আমার কোন আপত্তি নেই বাবা!” পরেশ কহিল, “কিন্তু কাকীমার?” বিনয় কুঠার সহিত কহিল, “হ্যাঁ, ওদের হয়তো আপত্তি আছে। কিন্তু বাবা! ওরা তো আমাদের পাড়াগায়েই হিন্দু সংসারের মেয়েমানুষ—লেখাপড়া শেখেনি, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ কোন দিন পায় নি। মারা পৃথিবী জুড়ে কি যে ভাঙা-গড়া চলছে, তার কোন খবর ওরা রাখে না। নিজেরে ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার, তার চেয়ে কিছু বড় নিজেরে ছোট সমাজ—এই সংকীর্ণ বেড়ের মধ্যে ওরা জন্মায়, বড় হয়, সারা জীবন কাটিয়ে দিয়ে মরে। বেড়ার বাইরে কি আছে, কি ঘটেছে কোন দিন, জানতে পারে না, জানতে চায়ও না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে, নিজের নিজের সংসারটিকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেই ওদের সুখ ও শান্তি—”

পরেশ চুপ করিয়া এতক্ষণ বিনয়ের বক্তা শুনিতোছিল—হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “অর্থাৎ কাকীমা সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চাইবেন না।” বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, “কিন্তু কার্তিক ভাতারের স্ত্রী খুব সম্ভব মেয়েমানুষই।” বিনয় হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, “মেয়েমানুষ বই কি বাবা।” পরেশ কহিল, “আর পাড়াগায়ে আশ্রিত মেয়েমানুষ, কিন্তু তার তো কোন আপত্তি নেই।” বিনয় গম্ভীর হইয়া কহিল, “কি জান বাবা পরেশ। ওরা বড়লোক, গায়ের লোক সব ওদের হাত-ধরা; ওরা যা করতে চাইবে, তাতেই সমাজের সম্মতি হইবে। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। পরমা নেই, প্রতিপত্তি নেই, আমাদের সামান্য একটু বেচাল দেখলেই সারা সমাজে হৈ-ঠেরের জন্ত থাকবে না।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে কার্তিক ভাতারের মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে—গায়ের লোকও এই বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এ অবস্থায় বিবিকে তুমি বিয়ে করলে, আমার আর এ গায়ে বাস করা চলবে না।”

পরেশ কহিল, “যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।” বিনয় মৃদু কণ্ঠে কহিল, “বল।” পরেশ লম্বিত মুখে কহিল, “বিবির যদি আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, মানে যদি—” বিনয় হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর উজ্জ্বলসী সামলাইয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ অপ্রতিত মুখে কহিল, “এত হাসছেন কেন?” বিনয়ের চোখে জন আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুহুঁহুতে মুহুঁহুতে হাসি সামলাইয়া কহিল, “হাসি পাচ্ছে বাবা! হিন্দুঘরের কুমারী মেয়ের ইচ্ছে? বিশেষ করে আমার মত গরিবের মেয়ের? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই;—গর তোমার কাকীমা—দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না, বাবার অসম্মতও নেহাৎ হানি ছিল না, ছোট-খাটো সহরেও জন্মেছিলেন, এবং সেখানে মনের মত ভাল ছেলের অভাব ছিল না। হয় তো, মনে মনে তাদের কার্তিকে পছন্দও করতেন। অথচ পড়লেন তো আমার মত হতভাগা গরিব মাস্টারের হাতে। কিন্তু তখনও তাঁকে কোন আপত্তি করতে শুনিনি, পরেও কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করতে শোঁখিনি। কি জান, বাবা! স্বামীকে ভালবাসা, প্রমাণ করা, হিন্দুঘরের মেয়েদের আজন্মের সংস্কার, সে স্বামী যেই হোক, যেমনই হোক। না হ’লে—ওনেশে শুনি কথার-বার্তার একটু মারামোষ ঘটলেই নাকি স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে দেয়; কিন্তু এদেশে স্ত্রীর আমাদের কত চরিত্র, কত অপরাধ নীরবে সহ্য করে বল দেখি?” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। বিনয় বলিতে লাগিল, “বিবির জন্যে তুমি ভেবনা বাবা! তুমি তাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, সেইজন্যে সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, বড়লোকের মত ভক্তি করে। কিন্তু তোমার স্ত্রী হ’লে—এ দুরাকাঙ্ক্ষা সে কোন দিন করে নি—এ আমি তোমাকে নিশ্চয় ব’লে বলতে পারি।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তুমি কার্তিক ভাতারের মেয়েকেই বিয়ে কর বাবা! এতে তোমার ভাল হবে। আমি আর তোমার কাকীমা এতে বিলম্বমত দৃষ্টি করব না।” পরেশ বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত মুখে বলিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, “আমার সম্পর্কে গায়ের লোক বিবিকে নিয়ে যে নানা কথা—” কথা শেষ করিতে না করিতে বিনয় কহিল, “শুনেছি বাবা, কিন্তু ও তো মিথ্যে—গায়ের লোক ঈর্ষা করে যা-তা রটছে।” পরেশ কহিল, “কিন্তু এর জন্যে যদি বিবির বিয়ে না হয়।” বিনয় চোখ দুইটা কুচকাইয়া মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, “না, তার জন্যে চিন্তা নেই! কার্তিক ভাতারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই গায়ের লোক চুপ করে থাকবে।” মৃদু ও স্থান হাসিয়া

কহিল, “তখন দেখবে, এখন যা যা নিষেধ করছে, তখনই হঠাৎ নিজের বিবির বেকার ও বখাটে আত্মীয়স্বজন সূচনা বিবির বিয়ে দিতে চাইবে।”

(১০)

দিন করেক পরে; বেলা প্রায় দুইটা। বিন বৈঠকখানায় জামালার দাঁড়িয়া ছিল। খুঁকী মেঝেতে বাসিয়া শুদ্ধল কৌতুহল ও নিজের মনে বকিতেছিল। মাঝে মাঝে বিবির উপস্থিতি স্নান করিতেছিল। বিবির কখনও দুই এক কথার প্রশ্নের জবাব দিতোছিল। কখনও বা ইচ্ছা করিয়া থাকিয়া জবাব এড়াইয়া বসিতোছিল। খুঁকী একবার প্রশ্ন করিয়াছিল, “হ্যাঁ দিদি, খুঁকী তো আমার সেরে উঠেছে, এর পর জে-বিরে বেকার উচিত, না?” বিবির শব্দে জবাব দিল, “হ্যাঁ।” কিছুক্ষণ পরে খুঁকী কহিল, “নান্দিদিদির (পাশের বাড়ির মেয়ে) কবির বড় বড় দোকান, সেদিন কখন খাচ্ছিল, এমন দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ দিদি, পরেশদাদার গোফ নেই কেন?” বিবির নিরন্তর রহিল। খুঁকী কহিল, “পরেশদাদা গোফ রাখতে চাইলে মানা করে দিও। গুঁহো লোকগুলোকে আমার ভারি খোশ করে।” বিবির হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল, “পরেশদাদার গোফের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?” খুঁকী দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, “বা রে! সম্পর্ক নেই। আমাদের পরেশ দাদা।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খুঁকী আবার কহিল, “হ্যাঁ দিদি, পরেশদাদা কদিন আসেন নি কেন?” বিবির স্থান কণ্ঠে জবাব দিল, “জানি নে।” আরও কিছুক্ষণ পরে খুঁকী সম্পর্কে নতুন ধরণের প্রশ্ন করিল, “দিদি! তুমি মেম সাহেব দেখেছ?” বিবির জবাব দিল, “না।”

খুঁকী কহিল, “মেম সাহেবদের মোম বাড়ির মত সাদা রঙ, রাতদিন জুতো পরে থাকে—খুব নয়ম পা কিনা।” বিবির জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ পরে আর এক প্রকারের প্রশ্ন হইল, “ও পাড়ার কমলার পরেশ দাদার সঙ্গে বিয়ে হবে, দিদি, তুমি বিয়ে দেখতে বাবে না?” বিবির জবাব দিল না। খুঁকী কহিল, “কমলার জাদী মল্লী ঈশ্বর, শব্দ তখন বাপের বাড়ি পালায়ে যাবে।” বিবির কণী হাসিয়া কহিল, “পরেশ দাদা যেতে দেবেন কেন?” খুঁকী অন্ধার দিয়া কহিল, “কেবু দেবেন না? লোকে গায়ে বিয়ে দেব কিসের জন্যে, শুনি? আমি যে পালিতর খোকার সঙ্গে আমার খুঁকীর বে দেব, যখন ইচ্ছে আনব, দেখব ব’লেই তো।”

বিবির প্রতিবাদ না করিয়া জানালার ভিতর দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ তিনদিন তাহার পরেশ দাদা আসেন নাই, এ রাস্তা দিয়া পথশ্রুত যাওয়া আসা করেন নাই। কমলাকে বিবাহ করিলে তাহাদের বাড়ি আসা বন্ধ করুন, এ রাস্তা দিয়া হাটা পথশ্রুত ছাড়িয়া দিবেন নাকি? পরেশকে একদিন না দেখিলে, একদিন তাহার কথা না শুনিলে, বিবির মনের ভিতরটা কেমন করিতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হয়, কি যেন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় নাই। রাগে বিছানায় শোয়া পথশ্রুত সারাক্ষণ একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা তাহার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া পরেশের পদধ্বনি, পরেশের কণ্ঠস্বর শুনিলার জন্য উদগ্ৰ হইয়া থাকে। বিছানার শোয়ার পর ঘুম আসিতে চাহে না; সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়ে, সে জাগিয়া জাগিয়া পরেশের কথাই ভাবে—কবে সে কেমন করিয়া হাসিয়াছিল, কোন কথা কেমন করিয়া বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিল, একে একে মনে পড়ে। এই সব স্মৃতির টুকরাগুলিকে সে ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করিয়া কোথাও সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই; তাহার নিজেরাই তাহার অন্তরে তাহার মনের কোশে আশ্রয় লইয়াছিল; সত্য, স্বপ্নসংশয়ের তাহার নিদ্রাহীন চক্ষের সম্মুখে একে একে রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার পার হইয়া যায়। একটা চাপা অভ্যস্ত মনের ভিতর গুমরাইতে থাকে, যেন পরেশ তাহাকে কোন মাঝে পাওন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এই সেনা-পাওনার সম্পর্ক যে কোন একটা বিশেষ ক্ষণে, কোন একটা বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া শব্দ হইয়াছে তাহা নহে, তবে এই সাত ঘাস ঈরিয়া দিল্লের পর দিন আলো-আলোচনা-হাল-পরিহাসের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার হৃদয় বন্ধিয়া লইয়াছে, পরেশ তাহার একান্ত আপনায় জন্ম। কোন দিন তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, কোন দিন এমন অবস্থা হইবে তাহার সহিত দেখা হওয়া চলিবে না, কথা বলা চলিবে না, পক্ষ নিরাশ্রয় হইতেও ইহা সে কোনদিন ভাবে নাই।

শ্রোতৃসময়ে দিনে

দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি
এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে
আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে
আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে উঠুক, আর আপনার বাড়িতে
হাস্যকল্যানে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের
পরিবেশে প্রাপময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয়
দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।



ভারতীয় চা

উৎসবে



অতুলনীয়

অঞ্চল তাহাই ঘটিয়া গেল। সেদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, পরেশদাদা তাহার ছাড়া কাহারও হইবেন না। তিনি অবশ্য মুখে কিছু বলেন নাই, তবু তাহার কথাবার্তা, হাসি ও চাহনি, গভীর স্নেহ ও অকৃত্রিম উৎসেগ প্রকাশ তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে জানিত, তাহার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, পরেশদাদার মত শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম ছেলের নায়া দাম নিবারণ ক্ষমতা উদ্বাহ নাই; সে নিজেও শিক্ষার দৃষ্টিতে, বৃত্তি ও গুণে পরেশের যোগ্য নাহে, তবু পরেশদাদা তাহার অন্তরের অকল-আকাঙ্ক্ষার জলে ধরা দিয়াছেন। এই আশ্বাসমণ্ডিত যে করুণার বশে নয়, ইহার পশ্চাতে ভালবাসা আছে, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। তাই সেদিন পরেশের সহিত কমলার বিবাহের কথা শুনিয়া, ইহার অসম্ভাব্যতার কথা ভাবিয়া সে মনে মনে হাসিয়াছিল। এমন কি এই বিবাহের কথা লইয়া সে সেদিন দুপুরবেলা পরেশকে সহজেই ঠাট্টা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্মারান্তরাল হইতে যখন শ্রুতিতে পাইল—পরেশদাদার আসা-যাওয়ার জন্য তাহার নামে গুরুত্বপূর্ণ রটিয়াছে এবং সেইজন্যই মা তাকে বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়া অপমান করিলেন এবং তরপার কাটা ঘায়ে নুনের ডিটার মত বিনাইয়া বিনাইয়া তাহারই জন্য পাত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করিলেন, তখন বাথায়, লজ্জায়, ঘৃণায় ও অশ্রুচোবানায় সে পুরে পুরে নিজের মন্তব্য কামনা করিয়াছিল। ‘ছিঃ ছিঃ, তাই এই জন্য পরেশদাদার এই অপমান? কি অপরাধ হইল? অপরাধ তিনি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া, সেবা করিয়া মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন; অপরাধ—পরম আর্থায়িক স্নেহ করিয়াছেন এবং হঠাৎ তাহার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে ভালবাসিয়াছেন। কি অকৃতজ্ঞতা! রোগের সময় সারারাত্রি বিছানার পাশে বসিয়া সেবা করতেন, এখন হঠাৎ তাহার হাতে সম্পূর্ণরূপে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া নিষ্ঠুরতা ঘোষণা করিলেন! আজ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের কথা শুনিয়া তাহাকে অপমান করিলেন! পরেশদাদা কি ভাবিতেছেন? হয়তো ভাবিতেছেন—বলিকাতায় বড় সুন্দরী শিক্ষিত মেয়ের মায়া-পাশ কাটাইয়া পাড়াগায়ের একটা অশিক্ষিত, অমার্জিত, সামান্য মেয়ের কাছে ধরা দেওয়ার উপায়? শাস্তি হইয়াছে। হয়তো মনে মনে নিজেকে নিজের নিষ্পত্তির জন্য দিক্কা: দিতেছেন এবং রাগ ও অভিমানের আগুন জ্বালাইয়া তাহার জন্য হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ ও ভালবাসা ছিল, সব পুড়িয়া ছাই করিয়া দিতেছেন। সেইদিন সেই নিদারুণ ক্ষণে তাহার মাতা আস দিয়া কিছু কিছু করিয়া ঘনীভূত বিশ্বাস দুর্বলতার মেঘের মত নির্মল হইয়া উঠিয়া গেল।

সেইদিন সারা বিকাল ও রাত্রি তাহার যে ক্রমেন করিয়া কাটিল, তাহা সে জানে, আর তাহার অন্তরীক্সে তাহার। তাহার পরদিনও তেমনই কাটিল। তার পরের দিন সে ঠিক করিল, পরেশদাদা যখন এই রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাইবেন, তখন বাকীকে দিয়া ডাক দেওয়াইবে। পরেশদাদা অভ্যাসমত আশ্রমের নিচয়, না আসন দাঁড়িয়া থকীর সহিত হাসা-পরিহাস করিলেন, সে ডাকলে দাঁড়িয়া তাহাকে একবার দেখিয়া লইবে। সম্মুখে সে কিছতেই যাইবে না। তাহাকে দেখিয়া পরেশদাদা যদি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় মাখ ফিরাইয়া লন, তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। সেদিন বেলা তিনটা পর্যন্ত জোনালয় দাঁড়িয়া থাকিয়াও সে পরেশের দেখা পাইল না। যে পুকুরে তাহার বিকালে গা ধোয়, কাপড় কাচে, পরেশদেবের দিগের সামনের রাস্তা দিয়া একটুখানি ঘুর-পথ হইলেও যাওয়া যায়। সে বাকীকে সঙ্গে লইয়া এই পথ দিয়া পুকুরে গেল, আশা—যদি একবার দেখা হইয়া যায়। উসপেশার সামনে গিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ; ফিরবার সময়ও তাই। সেইদিন রাতে শূঁইবার পর যখন সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়িল, সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পাশে বাকী ঘুমাইতেছিল, তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিল। বাকীর উপর তাহার হিংসা হইতেছিল; পরেশদাদাকে সেও তো ভালবাসে, অঞ্চ পরেশদাদাকে না দেখিয়া বেশ আছে, সারাক্ষণ একবারও নাম করে না, ঘুমেরও একটু বিষয় হয় নাই তাহার। বিনয়ও সারাদিন পরেশদাদার একবার নামও করেন নাই। কেবল সে-ই একা অশ্রুর হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও না দেখিলে যে বৃকের ভিতরটা এমন পাকা ফোঁড়ার মত সারাক্ষণ টন টন করিতে থাকে, তাহা সে ইহার পূর্বে কোনদিন জানিত না। বিনয়ও কতবার কণ্ঠপলকে বিশেষে গিয়াছে, মা-ও একবার তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া এক মাস বাপের বাড়িতে ছিলেন, মন কেমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন করিয়া দিন-রাত সে ছটফট করিত না। এ তাহার কি

হইয়াছে? এমন করিলে সে বাঁচিলে কি করিয়া? দুইদিন পরে কমলার সহিত হয়তো পরেশের বিবাহ হইবে, তখন তাহার কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখা না-রাখা, কথা কওয়া না-কওয়া, কোথাও আসা না-আসা—সব কমলার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে। আর সে নিজেও তো একদিন চিরজীবনের মত এ গ্রাম ছাড়িয়া, অন্য কোন্সায় চলিয়া যাইবে। তখন? তাঁর বেদনাবোধের সঙ্গে সে বাকীকে ‘পরিচয়, বাবা মা-ভাই বোন, সকল প্রিয়জনকে আত্মকম করিয়া পরেশ কখন ফেরন করিলে’ জ্বাহার প্রিয়তমের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদিকে ছাড়িলে সে বাধা পাইবে বটে, কিন্তু জীবন দুর্বল হইয়া উঠিবে না। কিন্তু পরেশকে ঘিরিয়া তাহার মন তাহার জ্ঞাতো এমনইভাবে পাকে-পাকে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে ছাড়িলে যাইবে না, ছাড়িলেও সে বাঁচিবে না। নিজের এই নিদারুণ অবস্থা ভাবিয়া সে ভয়ে শূঁকিয়া উঠিল। ভাবিল, বোন মনের এই নির্বিচার নিবেদন দুঃস্বাদ? বাহা পাইবার আর আশা নাই, তাহার জন্য কেন এই সোভ? ইহার পর সারাজীবন কাষা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না। এই অবোধ, অশালত মন লইয়া কেমন করিয়া সে যে আর একজনের স্ত্রী হইবে, তাহাকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, তাহার সংসার করিবে, ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়া গেল। শেষ রাতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিল মায়ের ডাকে—‘বাবা! ওলো বাবা!’ সে সাড়া দিল, ‘কি, মা?’ ‘কাদিছ কেন?’

সে চোখে হাত দিয়া দেখিল—জল, জল মাছিয়া উত্তর দিল, ‘কই, না!’ মা কহিলেন, ‘না আবার কি? কাদিছিল দুপুরে দুপুরে—স্বপ্ন দেখাছিল বুঝি?’ সে জবাব দিল, ‘কি জানি মা, মনে পড়ছে না!’ মা কহিলেন, ‘ওখানে শাওতে হবে না, আমার কাছে আয়।’ সে মায়ের কোলের কাছে শইল। মেয়ের গায়ে হাত দিয়া মা কহিলেন, ‘ঘুমো দেখি।’ তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে তাহার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিল।

সে যেন পরেশের সঙ্গে এক গভীর জগলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অপ্রশস্ত সূড়ি-পথ—পথের দুই পাশে কাটা গাছের ভিত্তি। দুই হাতে গাছের ডাল ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ চলিতে হইতেছে; গায়ে ও পায়ে কাটা বিধিতছে, পা দুইটা—জটিলভূতে পাখরের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তবু পথ চলার শেষ নাই। হঠাৎ বন শেষ হইয়া তাহারা এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দূরে দেখিতে পাইল—একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, তাহার মামর বর্মজ সে শহরে, সেখানে সে যেমন একটা ব্যারেস্কাপের বাড়ি দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনই দেখিতে। পরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া সেখানে লইয়া গেল। দরজা খোলা, প্রহরী নাই। ভিতরে ঢুকিতেই দেখিল, একটা নাটমন্দির—মোটো মোটো বড় বড় থাম। চাতালে কমলা বসিয়া আছে আর তাহার পাশে বসিয়া শ্রীমতী বাননী চরকা কাটিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কমলা চোখ-মুখ কঠিন করিয়া শ্রীমতীকে কি বলিতেই, শ্রীমতী তাহাকে মারিবার জন্য নাটাইটা তাহার দিকে ছুঁড়িল। কপলে আঘাত পাইয়া সে ‘উঃ’ করিয়া বসিয়া পড়িল। চোখ মেলিতেই দেখিল, পরেশ কমলাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। সে পরেশকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পরেশ তাহার কথা কানে না তুলিয়া কমলার মনের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। রাগে-অভিমানে সে কাদিয়া উঠিতেই শ্রীমতী আসিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সে হাত ছাড়িয়া লইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে লাগিল।

পরদিন সকাল হইতেই বাবর মন পরেশের জন্য উদ্বেগ হইয়া উঠিল। পরেশ আর আসিবে না, দেখা দিবে না, এ জন্মের মত তাহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়া গিয়াছে—মনে মনে বাকীকে চূড়ক-শলাকার মত তাহার মন পরেশের দিকে একাগ্র হইয়া রহিল। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সুখা তাহাকে কহিল, ‘কাল সারারাত্রি তো ঘুমোই নি, চল, আমার সঙ্গে শুব চল।’ ববি সানন্দে কহিল, ‘না মা, ঘুমের বেলায় আমার ঘুম আসবে না; আমি বরং সংসারের পরেই ঘুমোতে যাব।’ সুখা সংসারের স্বপ্নের কহিল, ‘ঘুম আসবে না কেন? চোখ বুজে পড়ো থাকলেই ঘুম আসবে, চল।’ ববির মনের দিকে তাকিয়া দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, ‘রাত জেগে মনের কি রকম ছিন্ন হইছে, আরনতে দেখেই দেখি।’ অশ্রু মনে কহিল, ‘সারারাত না ঘুমিয়ে যা-তা স্বপ্ন দেখা মেয়েমানুষের ভাল নয়।’ হাসিবার চেষ্টা করিয়া ববি কহিল, ‘মা বেশ! না ঘুমোলে আবার স্বপ্ন দেখা যার?’ সুখা ধমকের সুরে

সকল, সেবার এবং নিরাপত্তায়

বেঙ্গল ইউনিয়ন

ব্যাক লিঃ

স্থাপিত-১৯২৬

রেজিস্টার্ড অফিস : চাঁদপুর

সেন্ট্রাল অফিস : ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস : ৫৮নং ব্রাইড স্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস :-

সুন্দরগঞ্জ, প্রিন্সগঞ্জ, লোহজঙ্গা,

দীঘিরপার, তেজপুর ও

সদরঘাট (ঢাকা)

হাটখোলা (২৭৮, আপার চিৎপুর
রোড, কলিকাতা) ও পূর্ণিয়া
শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানোজঃ ভিটেরটর :- এম, চন্দ্রবতী।

ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
বিশ্রাম

“ক্রিমি-নাশিনী”

সর্বপ্রকার ক্রিমিরোগের একমাত্র মহোষধ।

পৃথক জোলাপ লাগে না।

ইহা প্যাকেটে পাওয়া যায়।

ম্যানুফ্যাকচারার :-

মেসার্স এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৪৭, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্বত্র পাওয়া যায়।



কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ : কলিকাতা।



ফটো শিল্পী—জীর্জনাল ঘোষ

ক'হিল, “ওকে আবার ঘুম বলে নাকি? যদি যা-তা দেখতে লাগলাম, কাদলাম-কাটলাম, তা হ'লে ঘুমোবার দরকার ক? আমার কেমন ঘুম বল' দেখি—এক ঘুমে রাত কাবার। কাল থেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে ‘সোনের কাজ-কর্ম’ করবি, তা হ'লে কেমন ঘুম হবে দেখবি।”

সুখদা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিজের পাশে শোয়াইল। বাঁবি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, মা ঘুমাইয়া পড়িতেই উঠিয়া বৈঠকখানার আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে বাসিয়া বুকী পড়তুল খেলিতে খেলিতে অগোল-তগোল বাকিতে লাগিল, কত কি প্রশ্ন করিতে লাগিল; বাঁবি অন্যান্যমতভাবে কখনও দুই-এক কথায় জবাব দিল, কখনও বা দিল না। আজ কয়দিন ধরিয়া যাহা সে পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছে, এখনও তাহাই সে ভাবিতে লাগিল এবং পথের দিকে দুই চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া থাকিয়া সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল—পরেশদাদা! যেন আজ একবার এই পথ দিয়া যান।

হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল, “কি লো বাঁবি? ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার ধোয়ান করছিস লো?” বাঁবি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, শ্রীমতী বামনী তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে; হাতে একটা প্রকাণ্ড থালায় মেঠাই। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার সাগরেদ-গুণী বামনী—বালা-বিধবা, বয়স বিশের ওপারে; তাহার গালে পান; পানের রসে রাঙা টুকটুকে ঠোট দুইটি চাপিয়া, কুঁচকাইয়া পিচ ফেলিয়া কহিল, “বরের জন্য সোয় হয়।” শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, “তা এত ভাবনা কিসের লো! ফুল যখন ফটেবে, তখন বর আপনি এসে হাজির হবে। তা তোর মা কোথায় বস' দেখি?” বলিতে বলিতে শ্রীমতী সশিষ্যা বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁবি খতমত আইয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, “মেঠাই কিসের দিদিমা?” শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “তোরা জানিস না নাকি? আমাদের কমলার যে তোদের পরেশের সপ্নে বিয়ে হবে?” কাল হেলের আশীর্বাদ হয়ে গেছে, আজ মেয়ের আশীর্বাদ হল। তাই গয়ের লোককে মিণ্ডি বিলুনে হচ্ছে। তা তোর মা কি করছে?” বাঁবির বকের ভিতরে দাপাদাপি শব্দ হইয়াছিল, তবু মখে হাসি টানিয়া শব্দসম্ভব

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, “না ঘুমোছে, আসুন।” বাঁবির পাছ, পাছ ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে শ্রীমতী কহিতে লাগিল, “আসছে মাঘের প্রথমেই বিয়ে; কত ধুম-ধাম হবে, দেখবি। ডাক্তার বলেছে, তিনির্জন হাজি চড়তে দেবে না গায়ে।” বাঁবিকে শোবার ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিল, “তোরা মাকে আর উঠিয়ে কাজ নেই; এমনই দেরি হয়ে গেছে; এখনও সারা গা ঘুরতে হবে আমাদিকে। একটা বাটি-টাটি নিয়ে আয় দেখি।” বাটি আনিতেই গুণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ লা, তোর মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল' দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?” শ্রীমতী বাটিতে মিণ্ডি দিতে দিতে গুণীর দিকে তাকাইয়া চোখ মটকাইল। বাঁবি মৃদু ও শূন্যকণ্ঠে জবাব দিল, “মাথা ধরেছে সকাল থেকে।” গুণী কৃত্রিম উৎসাহের সহিত কহিল, “মাথা ধরেছে? আহা! তোর পরেশদাকে ডেকে ওষুধ খাস নি?” শ্রীমতী কহিল, “মাথা ধরার আবার ওষুধ খেতে হয় নাকি? কাউকে দিয়ে হাত বুলো গে যা।” গুণী ফিক' করিয়া হাসিয়া ঘাড় বাকিয়া কহিল, “মাথায় হাত বুলোবার লোক কোথায় পাবে? যে ছিল—” বলিতে বলিতে শ্রীমতীর সতর্কতা-সূচক স্ফুটন দেখিয়া থামিয়া গেল। শ্রীমতী সাধুনার সুরে কহিল, “মাথায় হাত বুলোবার লোক হবে লো! এত লুপ কি বুঝায় বাবে ভাবিছিস।” আশ্চর্যতার সুরে কহিল, “তবে ভাই, আমরা আঁসি। সারা গা ঘুরতে হবে এখনও। তোর মাকে বলবি—আর একদিন এসে সব পরিচর দিয়ে যাব এখন।”—বলিয়া চলিয়া গেল। চোখের আড়াল হইতেই গুণীর কল-হাস্য ও শ্রীমতীর কৃত্রিম তজ্জন-গর্জন কাণে আসিল। বাঁবি বিহবল, বেদনাত' চক্ষু মেলিয়া প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পরক্ষণেই ক্ষতমুখে আয়োজনের মত লজ্জা ও অপমান তাহার সারা মনে যেন আগুন ধরইয়া দিল। ‘ইহারা মনে করিতেছে কি? পরেশ-দাদাকে সে ক্ষদি পাতিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কোনমতে ফাট কাটিয়া পরেশদাদা উড়িয়া পলাইয়া কমলার কোঠরে ঢুকিয়াছেন? কিন্তু সত্য কি তাই? তাহাকে ধরিবার চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই। পরেশদাদা নিজে হইতে ধরা দিয়াছিলেন এবং মা অপমান করিয়া বিদায়

নিজের পরিষ্কার প্রাচীর বার-বরক দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় কী “কাপড়টা ভাঙা ময়লা হয়ে গেছে, আর পরিষ্কার কাপড় নেই?” সু-কটাকে চাইয়া কহিল, “কোথায় হোনা? রাজ-দরবারে যাবে, শুনিনি কবির কবিতা, “হাব না তো কোথাও, তবে হেডমাস্টার রুমের শ-বেড়াতে আসবেন বলেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।” সুখদা চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, “তাই নাকি! সেই মাস্টারগি—বি-এ পা-বিনয় ঘাড় নাড়িয়া ‘হী’ জানাইল।” সুখদা কহিল, “তা আমাদের স-আলাপ করতে আসা কেন? মুন্সী মেয়েমানুষ আমরা।” বিনয় কী “কি জানি? ঢোক গিলিয়া কহিল, “বোধ হয় শিগগির চলে যাবার আগে সকলের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।” ভুসু কুচকাইয়া সু-কহিল, “তা তোমার সাজগোজ করতে হবে কেন? তোমার গলার আর মালা দিতে আসছে না। বিনয় কহিল, “তাই বলছি নাকি? শিগগির মেয়ে, তাদের সামনে এমন ময়লা কাপড় পরে—” বাধা সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “তোমার কাপড় আবার ময়লা কিসের? আমারটাই ময়লা। বদলাতে হলে আমাকেই হবে। কখন আ-বলেছে?”

“সম্পোর পরে।”
“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”
“সম্পোর পরে।”
“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”

“সম্পোর পরে।”
“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”
“সম্পোর পরে।”
“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”

“সম্পোর পরে।”
“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”
“সম্পোর পরে।”
“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”

(১৪)

বিনয় বাড়ি ফিরতেই সুখদা কহিল, “আমি তোমার বাবার মুখ-হাত ধোবার সব ব্যবস্থা করে দিগে, তুই এই ক’খানা রুটি স্নে’কে নে।” বলিয়া রান্নাঘর হইতে চলিয়া আসিল।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া সুখদা দেখিল, বিনয় স্কুলের কাপড়-জামা ছাড়িয়া ঘরে পরিবার কাপড় ও ফতুয়া পরিয়াছে। ডাড়া কাপড়খানা ছলিয়া লুটাইতেছে, জামাটি আলোয় কোণে আটকাইয়া গিয়া ঝুলিতেছে; টানা-টানিতে আলোয় কলোনে অন্যান্য কাপড়-চোপড়গুলির অবস্থা অত্যা-বিশ্বস্ত। সুখদা ঘরে ঢুকিয়া কাপড়খানা তুলিয়া কেঁচাইতে কেঁচাইতে অনুযোগের স্বরে কহিল, “এমন করে শুলেয় লোটায়ে কাপড় আর কাপড় ফস! থাকে বল? মাসে মাসে তোমার জন্যেই ধোপাকে এত পরসাদ দিতে হচ্ছে।” বিনয় বেপরোয়াভাবে কহিল, “তাই নাকি?” সুখদা অংকার তুলিয়া কহিল, “তা নয় তো কি? আমার আর ক’খানা কাপড় ধোবার বাড়ি যায়?” তারপর আলোর দিকে চাইয়া ধমকের সুরে কহিল, “অমন লাঙ লাঙ করে দিলে কেন? এই এমন করে গুছিয়ে দিয়ে গেলাম।” বিনয় ভরে ভরে কহিল, “ফতুয়া ঝুঁজিলাম যে!” অংকার তুলিয়া সুখদা কহিল, “ফতুয়া কি ওখান থেকে যে ঝুঁজিছিলে?” বিনয় কীমামু মুখে কহিল, “ছিল না তো—”

“থাকে না, তা তো জানি।”

মাথা চুলকাইয়া বিনয় কহিল, “ভুলে গিয়েছিলাম।” বিনয়ের কণ্ঠস্বর নকল করিয়া সুখদা কহিল, “ভুলে গিয়েছিলাম!” বলিয়া বিশৃঙ্খল কাপড়-চোপড়গুলি গুছাইতে লব্ধ করিল।

নিজের পরিষ্কার প্রাচীর বার-বরক দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় কী “কাপড়টা ভাঙা ময়লা হয়ে গেছে, আর পরিষ্কার কাপড় নেই?” সু-কটাকে চাইয়া কহিল, “কোথায় হোনা? রাজ-দরবারে যাবে, শুনিনি কবির কবিতা, “হাব না তো কোথাও, তবে হেডমাস্টার রুমের শ-বেড়াতে আসবেন বলেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।” সুখদা চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, “তাই নাকি! সেই মাস্টারগি—বি-এ পা-বিনয় ঘাড় নাড়িয়া ‘হী’ জানাইল।” সুখদা কহিল, “তা আমাদের স-আলাপ করতে আসা কেন? মুন্সী মেয়েমানুষ আমরা।” বিনয় কী “কি জানি? ঢোক গিলিয়া কহিল, “বোধ হয় শিগগির চলে যাবার আগে সকলের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।” ভুসু কুচকাইয়া সু-কহিল, “তা তোমার সাজগোজ করতে হবে কেন? তোমার গলার আর মালা দিতে আসছে না। বিনয় কহিল, “তাই বলছি নাকি? শিগগির মেয়ে, তাদের সামনে এমন ময়লা কাপড় পরে—” বাধা সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “তোমার কাপড় আবার ময়লা কিসের? আমারটাই ময়লা। বদলাতে হলে আমাকেই হবে। কখন আ-বলেছে?”

“সম্পোর পরে।”

“তবে আর দৌর ক’রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না-ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা-টিছানাগুলোও একটু বেড়ে-বুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “তু-আলাপ করতে পারবে তো?”

“সুখদা তাকীকণ্ঠে কহিল, “পারব না কেন।”

“মানে—শিক্ষিত মেয়ে—বি-এ পাস।”

“হ’লই বা—মেয়েমানুষ তো? সে তোমাকে মাথা ঘামাতে হ-না—আমি দেখে নেব। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও দেখি—আমি খা-আনছি।”

রান্নাঘরে আসিয়া সুখদা দেখিল, ববি বিনয়ের বাবার সাজাইয়ে সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, “শিগগির সে ‘কে’ছিস?” ববি ঘাড় নাড়ি ‘হী’ জানাইল। সুখদা কহিল, “হেডমাস্টারের বাড়ি থেকে বেড়াতে আস এখনই—আমি হোর বাবাকে খাটো সব এবন্ট গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি-তুই ভাতটা চাটুয়ে দে।”

বিনয় খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “মিথি কোথায় পেলে সুখদা গম্ভীরমুখে কহিল, “ভাঙ্গরদের বাড়ি থেকে। বলিয়ে গেছে বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা” বলিয়া আবার খাইতে লাগিল। সুখ কহিল, “পরেরা আশীর্বাদ করে এল—তোমাকে একটা খবর দিলে না বিনয় ঘাড় নাড়িল।

“এ পক্ষের হয়ে আশীর্বাদ করলে কে? পরেরের মাসী?”

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, ঘনশ্যাম।” সুখদা সিস্পা কহিল, “বল কি? এত শত্রুতা করেছ এতদিন।” বিনয় কহিল, “এব-তাব হয়ে গেছে। ঘনশ্যাম এখন কেনেঘরের পিসে আর বরখরের মেসো। সুখদা ভুসু কুচকাইয়া কহিল, “পারশও একটা কথা বলে নি তোমাকে? কিনা হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। সুখদা ক্রোভের সহিত কহিল, “এর মধ্যে এ-পর হয়ে গেলাম অমরা যে, এত বড় একটা সামাজিক বাপায়ে একা-নেমস্ত্র পর্যন্ত করলে না?” বিনয় কহিল, “পারেশ কহিয়া, “পারেশ ছেলেমানুষ তো বা করবার ঘনশ্যাম করেছে।” সুখদা কহিল, “তা নয়। পারেশ আম-ওপরে রাগ করেছে।” বিনয় মাথা নাড়িয়া কহিল, “পাগল নাকি! ও-আবার করতে পারে? বুদ্ধিমান ছেলে! সেদিন দুপুর্নবেলা ও-ক-শে নগর পরও রাতে নিজে থেকেই ববির সঙ্গে নিজের বিয়ের কথ-পেড়েছিল।” গভীর বিশ্ময়ের সহিত সুখদা কহিল, “তাই নাকি! কই-আমাকে তো কিছু বল নি।” বিনয় জবাব দিল না। পরম ঠেসস্কে সহিত সুখদা কহিল, “তুমি কি জবাব দিলে?” বিনয় কহিল, “আ-নিষেধ করলাম। বললাম—ও-সব কাজ নেই, তাতে আমাদের কারও ভাব-হবে না। তা ছাড়া এ-বিষয়ে হলে আমরা সুখী হব জানিয়ে দিলাম। ঘায়েলো স্বরে সুখদা কহিল, “তুমি অত কথা বলতে গেলে কেন?” এরা-বিনয়ের বিস্মিত হওয়ার পালা। সে দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, “তা-মানে? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, ও-সঙ্গে কেন সম্পর্ক রাখবে না; তারপর আমার কি বলা উচিত ছিল শুননি?” বলিয়া সুখদার মুখের দিকে তাকাইল। সুখদা বিজ্ঞ গম্ভীর-মুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া অধরে ক্রীড়িতা খুঁকীকে কহিল, “তোমার দিল-কাছে যা।” খুঁকী চলিয়া গেলে ফিস্ফিস করিয়া কহিল, “কাল থেকে

দেখা দেননি কবিতা, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তেজ কবিতা" একটুখানি চুপ করিয়া কবিতা কবিতা, "অন্ততঃ বড়টা বাড়াবাড়ি করছে, ততটা নয়। রান্নাঘরায় কবিতা খেতে খেতেই জন্ম একটু-আটটু পড়েই থাকে—আর তার জন্মে কবিতা পলা জন্মের ভাবস্বরূপ দরকার হয় না।" চোখ দুইটা বজিয়া, মাথাটা উপরে-নীচে সোঁড়িয়া কবিতা, "শব্দেই মেয়ের বসি—বাবা! থই পেতে দেই কবিতা।"

(১৬)

শ্রীমতীর বাড়ির কাছাকাছি বিনয় পরেশের দেখা পাইল। দূর হইতেই ঠাহর করিয়া হাসিল, "পরেশ নাকি হে?" পরেশ থকাকিয়া লজ্জায় শিখর ফাটল চাহিয়া কহিল, "কে? কাকাবাবু।" বিনয় কাছে আসিয়া কহিল, "তোমাকেই খুঁজে বেড়াছি বাবা! ভারী বিপদ।" পরেশ উল্লসিতভাবে কহিল, "কি হয়েছে?" বিনয় কহিল, "বাবির পা পড়ে গেছে।" পরেশ ভীতকণ্ঠে কহিল, "সে কি! কি করে পড়ে? কতটা পড়েছে? চলুন।" বিনয় চলিতে চলিতে কহিল, "ভাতের ফ্যান গালতে গালতে হাত ফসকে হাড়টা পড়ে যায়—পায়ের পাতা দুটো খুব পড়েছে। তোমার কাকিমাকে নারকেল তেল আর চূনের জল মিশিয়ে লাগাতে বলে এসো। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" পরেশ ক্রটিম ভাঙ্ছিলোর সহিত কহিল, "শ্রীমতী দিদিমার বাড়িতে, জল খাবার নেমন্তন্ন করেছিলাম।" বিরক্তির ভান করিয়া কহিল, "এ এক বেশ মুশকিল হয়েছে! বোজ দুবেলা নেমন্তন্ন।"

শ্রীমতী কিন্তু পরেশকে নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করে নাই। পরেশটো বাড়িয়া নিমন্ত্রণ লইয়াছিল। কাল বিকালে শ্রীমতী যখন পরেশদের বাড়িতে গিয়াছিল— পরেশ তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "ভাল করে দিনে একদিনও দেখা হয় নি দিদিমা! একদিন কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে।" শ্রীমতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "শুধু তোমারই এই দশা, তা নয়—আমাদের রাগা তো বলছিল—দেখে সাধ মেটে নি দিদিমা! বেশ তো! আজই ওবেলা আমার ওখানে যেও—মুখোমুখি বসে যত পার প্রাণভরে দেখা দুজন-দুজনকে।"

দেখা আজ হইয়াছিল। দুইজনকে বসাইয়া শ্রীমতী বলিয়াছিল, "তোমরা দুজনে বসে বসে গল্প কর ভাই! আমি এক কলসী জল বুঝে নিয়ে আসি চট্ করো।" তারপর মূর্চক হাসিয়া চোখের সতক'তা-দৃক ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছিল, "কিন্তু বিশ্বাস করে দিয়ে যাচ্ছি ভাই। এখনও মস্ত-পড়া হয় নি—বসে থাকে যেন। আমি বাইরে শেকল-ভাঙ্গা দিয়ে চললাম—কেউ ডাকলে সাড়া দিয়ে বসো না যেন।"—বলিয়া কলস ইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার পাশেই কমলা নতমুখে বসিয়া ছিল—মুখে লজ্জা, হুহু, বোম্ব হুহু, ভগভগ। তাহার মথের দিকে পরেশ কদমুটে তাকাইয়া ছিল; বকের ভিতর তাহার কাঁপিতেছিল—সারা ধরে উপর দিয়া একটি কানামার তরঙ্গ গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সেরের মাত্ৰ বায়বান—তারপর গুটিকয়েক সপ্ত পড়িলেই ঐ দেহের উপর গহার একছত্র অধিকার। এখন পাশাপাশি বসিয়াও স্পর্শ করিবার জো নাই, তখন উহার মাই হইয়াছে মেয়েকে নিজহস্তে সজ্জিত করিয়া নিজে লগে করিয়া তাহার শরনকঙ্কর শ্বারে পেঁচাইয়া দিয়া যাইবে। পরেশ ছিল, "তোমার নাম কি?" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "আপনি বলেন না নাকি?" পরেশ কহিল, "জানি, ভদ্র তোমার মধ্যে শুনতে ছে করছে।" মেয়েটি কহিল, "কমলা।" পরেশ জিজ্ঞাসা কহিল, "আমাকে পছন্দ হয় তোমার?" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মৃদু নামাইয়া ডি়র মঞ্চলপ্রস্থে আঙুলে জড়াইতে লাগিল। পরেশ কহিল, "বল না?" মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। পরেশ কহিল, "বেশ! বাড়ি নেড়ে জানাও।" মেয়েটি বাড়ি নাড়িয়া জানাইল—"হুম—" পরেশ প্রশ্ন করিল, "আমাকে খাতে ডেরাভলে ভূমি? দিদিমা বলছিল।" মেয়েটি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, "জবাব দাও না! লজ্জা কিসের? দুদিন পরে তো কথার ই ফুটবে তোমার?" মেয়েটি মুখ লাল করিয়া কহিল, "আপনিও তো জোঁড়লেন।" পরেশ কহিল, "হুমি চাও নি?" মেয়েটি নীরব। পরেশ কহিল, "আমি সংগ্রাহক, গ্রিসম্যা গারল্ডী লপ করি—আমার কাছে কোন থো লুকালে পাপ হবে তোমার—আর পাপ হলে তোমার বরের অমঙ্গল হবে।" মেয়েটি আড়চোখে চাহিয়া, চোখ ফিরাইয়াই হাসিয়া ফেলিয়াছিল। পরেশ খেদের সহিত কহিল, "চাও নি তো? বেশ!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাতেই মেয়েটি কহিল, "হেঁয়ালিলায়, কাউকে লবনে না কিন্তু!" পরেশ কহিল, "আমাকে ভাল লাগছে তোমার?" মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া কহিল,

"জানি না, বাবু।" পরেশ মেয়েটিকে স্পর্শ করিবার ল্যোভ সামলাই পারিল না। কহিল, "তোমার হাতটা দেখি।" মেয়েটি বিশ্বাসের ম কহিল, "কেন?" পরেশ কহিল, "তুমি জান না বোম্ব হয়—আমি হ দেখতে জানি, হাত দেখে তোমার বরের খবর বলে দেব।" মেয়েটি হ দুইটি কোলের মধ্যে লুকাইল। পরেশ কহিল, "জা রে। হাত লুকে কেন? ওই যে বেলুট থেকে মোটা-মোটা পৈতের গোছা প'রে, পাঁজ-প বগলে করে গণংকরার আসে—তাদের কোনদিন হাত দেখাও নি তু আমাকে তাই ভাব না।"

মেয়েটি মূর্চক হাসিল। পরেশ কহিল, "দেখি করো না লক্ষ্যু এখনই দিদিমা এসে পড়বে। আমারও তো জানা দরকার, খবর স আমার বিয়ে হবে, সে ভাগ্যবতী কিনা।" মেয়েটি ডান হাতটি বাড়াই পরেশ দুই হাতে করতল চাপিয়া ধরিয়া, প্রসারিত করিয়া, করতল্য রে গুলির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রাখিয়া, কোমল-কর-স্পর্শ সমস্ত ত্র দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

মেয়েটি ভয়ে-ভয়ে কহিল, "কি দেখছেন?" পরেশ যেন না পাইয়া কহিল, "ভাল! খুব ভাগ্যবতী তুমি।" হাতটি টিপিয়া ক কিস্ত তোমার হাতটি তো ভারী নরম, কমলা।" কমলা হাতটি ছাড় লইয়া কহিল, "বাবির চেয়েও?" পরেশ কহিল, "বাবির হাত তো কো' দেখি নি, জানব কি করে?" কমলা কহিল, "এতদিন চিকিৎসা করে হাত দেখেন নি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "চিকিৎসকের মত দেহোজ—গণংকরের মত তো দেখি নি।" মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইতেই পরেশ ক "ও কি হচ্ছে?" মেয়েটি মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আমি সব জাি পরেশ সাগর কহিল, "কি জান?"

মেয়েটি মুখ নামাইয়া কহিল, "পরে বলব।" পরেশ অনুমো ক কহিল, "এখনই বল না।"—বলিয়া থপু করিয়া কমলার বাহু-মল চট ধরিল। কমলা চক্ষের কোণ হইতে বিদ্রাব হানিয়া, মৃদু তজ্জবের দি কহিল, "ও কি হচ্ছে? ছাড়ুন।"—বলিয়া সরিয়া বসিয়া কহিল, "ও কিছ জ্ঞানি না।"

এই চকিত চাহান, তীর-জরিত কঠম্বর, সভয়ে সরিয়া বসা, পরো মনে খোঁচা দিয়া তাহান মুখ-চোরা, ভীতু পৌরুষকে বেপরোয়া ক তুলিল; বকের মধ্যে হৃৎকণ্ঠে লোকলোচি শব্দ করিয়া দিল, স্নায়ু শিরার মধ্যে উত্তম্ব বহুপ্রাণ উন্মত্তবগে বহিতে লাগিল, মাথার ভিত কাঁকা করিতে লাগিল, এককথায় সমস্ত দেহ চীৎকার করিয়া "নি অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল। কম্পিতবস্তে রহস্যময় স্বরে সে ক "ভয় কিসের তোমার?" মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ত মাই।" পরেশ কহিল, "দুদিন পরে একই বিদ্রাব আমার কাছ ত শব্দে লজ্জা করবে না তোমার—আজ এত লজ্জা!" মেয়েটি মুখ ক করিয়া উঠানে নামিয়া গেল।

দরজা খোলার শব্দ হইতেই মেয়েটি লেবুগাছের কাছে গিয়া ক দাঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া কাছে আসিয়া ক "কিনো ও কি করছিস? ভাব হতো গেছে নাকি? এরপ্পর শরবত খাওয়া যোগাড় করছিস?" মেয়েটি ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "খা

"আজ্ঞা, আসি, দাঁড়া—" বলিয়া পরেশের কাছে আসিয়া ক বাকাইয়া চাহিয়া শ্রীমতী কহিল, "বেড়ালকে বিশ্বাস করে মাছ গে গিয়েছিলাম, দাঁতটা বসাও নি তো, হে?" পরেশ হাসিতে লাগিল।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই কমলা হঠাৎ কাছে আসিয়া পরেশের দি তাকাইয়া শ্রীমতীর উদ্দেশ্যে কহিল, "চললাম দিদিমা।" শ্রীমতী ক "সে কি লো" কি কথাবার্তা হল আগে বল শুন।" মেয়েটি কহিল, "চললাম।"—বলিয়া মথরণভিতে বাহির হইয়া গেল।

পরেশ চিন্তাবিশৃঙ্খলে চলিতেছিল, হঠাৎ রিনয় কহিল, "বাব কি বাড়ি হয়ে যাবে?" পরেশ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি রাস সংযোগ স্থলে তাহার উপস্থিত হইয়াছে—সোজা রাস্তা দিয়া ববিদের ব যোগ্য বায়, ডানারকের রাস্তাটা তাহাদের বাড়ির সামনে দিয়া গিয়া পরেশ কহিল, "হ্যাঁ, আপনি চলুন। আমি ওষধ-পতুর নিয়ে এ য়াচ্ছি।"

(১৭)

বিনয়ের বাড়িতে আসিয়া পরেশ ডাক দিল, "কাকাবাবু।" নি তাড়াতাড়ি লঠন লইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "এস, বাবাজী।" ফিসা করিয়া কহিল, "হেঁয়ালিষ্টার মশারের শালী বেড়াতে এসেছেন।" পা

কম্বোয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি! কোথায় রয়েছেন?” বিনয় জবাব দিল, “বাঁধর কাছে।” পরেশ কহিল, “তা হলে সরাসরি যাওয়া কি ঠিক হবে?” বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “ভাত্রে কি? শিক্তিতা মেয়ে সকলের সামনেই বেরোন, এস।”

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, বাঁধর খাটের উপর শুইয়া আছে। মাথার দিকে খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া আছে একজন মহিলা, বয়স বাইশ কি তেরশ—র কপা—পান-পাতার ধরনের মুখের ডোল; চোখ দুইটি বড় না হইলেও বৃদ্ধি ও চাতুর্যে উজ্জ্বল; শ্রু দুইটি সুক্ষ্ম ও কেশবিরল; নাকটি টিকলো না হইলেও সুগঠিত ও সুন্দর; পাতলা রাগা রাগা ঠোঁট (লিপস্টিক লাগাইয়াছে কিনা কে জানে); ঠোঁট ও চিবুকের মাঝখানে একটি বঁকা খাঁজ, মাথায় এলোথোঁপা; কাণ দুইটি চলে ঢাকা, কানের পড়ায় হাঁরা বসানো (নকল নিচয়ই) সোনার মল; পাঁখানে কলোপাড়ওয়ালা শাদা শাড়ি, লম্বা হাতা কমিজের মত কলার-ওয়ালা বেগুনী রঙের সাজের রাউন্স; হাতে চারগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। মহিলাটি চেয়ারে বসি পায়ের উপর ডান পা চাপাইয়া জানুর উপর খাড়াভাবে স্থাপিত হাতের প্রসারিত করতলে মুখটি রাখিয়া গম্ভীর বসনে বাঁধর বিছানায় উপবিষ্টা সুখদার কথা শুনিতোছে।

পরেশ ঢুকিতেই সুখদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া কহিল, “এস, বাবা।” মোটাটো পোজ বদলাইয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিনয় বিনীত হাস্য মৌলিক উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, “হিনিই আমাদের—বুকেছ বাবা।” পরেশ মুখহস্তে মহিলাটিকে নমস্কার করিতেই মহিলাটি প্রতিনমস্কার করিল। বিনয় কহিল, “দাঁড়া বাবা! আর একটা বসবার কিছু আনা।” বলিয়া বাঁহরে যাইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “এইটোতে বসুন না।” পরেশ কহিল, “আপনি বসুন, আমি বসছি এখানে।” বলিয়া বাঁধর বিছানায় তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

বাঁধর চিব হইয়া শুইয়া ছিল; পরেশ বসিতেই একটু সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পরেশ কহিল, “থাক যেমন শয়েছিলে তেমনি থাক। দেখ পাটা।” বিনয় লম্ভন লইয়া কাছে আসিল। পায়ের অবস্থা দেখিয়া পরেশ কহিল, “ফেংকা হয়ে গেছে দেখছি। তবে পোড়োটা বিশেষ গভীর নয়—ভয়ের কারণ নেই—” বাঁধর দিকে তাকাইয়া কহিল, “জ্বালা করছে নাকি? বাঁধর পরেশের দিকে তাকাইয়াছিল—চোখে চোখ মিলিতেও চোখ না ফিরাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, “করছে।” পরেশ বিনয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “ওম্বু দিগে ঘাঁজি, বাঁধর কয়েক লাগানেই জ্বালাটা কমে আসবে।”—বিনয় আবার বাঁধর দিকে তাকাইতেই আবার চোখে চোখ মিলিল। বাঁধর দৃষ্টি সম্মুখাঙ্গে শূন্যতার মত স্থির, উজ্জ্বল ও কঠিন। সেই দৃষ্টির সিন্ধু ধারায় পরেশের সারা দেহে যে কামনার অগ্নিশিখা এখনও জ্বলিতছিল, তাহা নিবিয়া গেল, হৃদয়ের জ্বালা জড়াইয়া গেল, অশান্ত মন শান্ত হইল। বাঁধর বিষয়, সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশের মনে হইল, এই মেয়েটি তাহার সিন্ধোজ্জ্বল রূপের প্রভাব তাহার হৃদয়কে আলোকিতই করে আলোচিত করে না।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ মহিলাটির দিকে তাকাইল দেখিল, সে সুখদার সহিত কথা বলিতেছে; আবার মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, “একটা কিছু পাত্র নিয়ে আসুন দেখ।” বলিয়া পকেট হইতে ওম্বু ও তুলার প্যাকট বাঁহর করিল। সুখদা তাড়াহাড়ি একটা মোটা আনিয়া হাজির করিল। তাহারে গুঁথ ঢালিয়া তুলসি ভিজাইয়া পরেশ বাঁধর পায়ে লাগাইয়া দিবার উপক্রম করিতেই বাঁধর কহিল, “আপনি পায়ে হাত দেবেন না। মাকে ডাকুন।” পরেশ আদেশের সূত্রে কহিল, “পা নেড়োনা ফেংকা গলে গেলে যা হয়ে যাবে।” কামল সূত্রে কহিল, “অসুখে দোষ নেই, এরপর না হয় একটা প্রণাম করে নিও।” বলিয়া মুখ তুলিয়া চাইতেই মহিলাটির সহিত দৃষ্টিসংযোগ ঘটিল। মহিলাটি মৃদু হাসিয়া কহিল, “আজ আর উঠে প্রণাম করে কাজ নেই। মনে মনেই প্রণাম কর।” পায়ে ওম্বু লাগাইতে লাগাইতে পরেশ কহিল, “ঠিক বলেছেন—আজ আর ওটা চলবে না; একটা ঘুমের ওম্বু দিয়ে খাঁজি—থেকে নাও এখনই।” বলিয়া সুখদাকে কহিল, “এক গ্লাস জল আনুন দেখি কাকীমা।”

সুখদা জল আনিত করে। পরেশ বাম হাতে পকেট হইতে একটা ওষধের বড়ি বাঁহর করিয়া বিনয়ের হাতে দিল। মহিলাটি কহিল, “ফোংকাটা গলে দিয়ে একটা ব্যাডেজ করে দিন না। রাত্রে যদি গলে যায় তো, যা-তা লেগে বিষিয়ে উঠতে পারে।” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “না গলাই ভাল, যদি গলে যায় তো তাই করতে হবে। তবে খুব সাবধানী মেয়ে, ভাল করেন তা ঠিক ঠিক করে যাবে; সেবার অসুখের সময়ে

দেখাই তো।” বাঁধর উদ্দেশ্য কহিল, “দেখি, পাটা ফোংকার কথা। ফোংকাটা গলে গেলে যা হয়ে যাবে, অনেক দিন বুগতে হবে তা হলে বাঁধর যাড় নাড়িয়া আদেশ পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু হঠাৎ মনে মনে বলিল, “ভাগ্যে হইলেই তো ভাল—ওতদিন আপনাদের কথা পাওক বাইবে। সারিয়া উঠিলে আপনিকও তো সরিয়া যাইবেন, আর মাথা ঠুকিলে দেখা দিবেন না।”

সুখদা এক গ্লাস জল আনিয়া ওষধ খাওয়াইতে আসিতেই পরেশ একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, “খাইয়ে দিন।” সুখদা কাছে যাইতেই বাঁধর উঠিয়া বসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, “পরেশদাদাকে প্রণাম কর, পায়ে হাত দিয়েছেন।” সুখদা মৃদুস্বরে, অবশ্য সকলকে শুনাইয়া কহিল, “থেকে নাও, তারপর করবে।” পরেশ কহিল, “বহালাম যে কাল করবে, আজ নড়া-চড়া না করাই ভাল।” সুখদা কহিল, “সেই ভাল—কালই করো মা!” বাঁধর মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া যাড় নাড়িল।

বাঁধর শুইয়া পড়িলে বিনয় সুখদাকে কহিল, “তুমিই বয়ং ওষধটা লাগিয়ে দাও। পরেশ বাবাজী মিস্ মিস্ট্রের সঙ্গে একটু গল্প-সম্পর্ক কামক।” পরেশকে কহিল, “তুমি উঠে এস বাবা।” ইতিমধ্যে খুকী একটা চেয়ার আনিয়াছিল, পরেশ আসিয়া তাহাতে বসিল; বিনয়ও লম্ভনটা মেঝেতে নামাইয়া তাহার কাছে আসিবার উপক্রম করিতেই সুখদা মৃদু কণ্ঠে কহিল, “তুমিই লাগিয়ে দাও, আমাকে একবার ওদিকে যেতে হবে।”

সুখদা ঘর হইতে বাঁহর হইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি কহিল, “আমার জন্যে হাল্গামা করবেন না কিছু।” পরেশ কহিল, “আমার জন্যে একটু করুন শ্রুধ্ব একটু চা।” বিনয় কহিল, “হাংগামা আবার কিসের! দয়া করে একদিন বাড়িতে পায়ের খুঁটা দিলেন।” মহিলাটি হাসিয়া কহিল, “পানা দিতে দিতে এই বিপত্তি—আর কোথাও যাব না ভাবছি; যা পরমন্ত মেয়ে আমি।” বিনয় অপ্রতিভভাবে কহিল, “সে কি কথা! কত সৌভাগ্য আমাদের!” পরেশ হাসিয়া ফেলিয়াছিল, হাসি চাপিয়া কহিল, “সাঁভা।” মহিলাটিও হাসি চাপিয়া বিনয়ের উদ্দেশ্যে কহিল, “আপনাদের ভাষারাম্ব, কিন্তু আপনাদের কথা সমর্থন করেন না।” বিনয় প্রতিবাদ করিল, “না না, তা আমার হয়। ভারী ভাল ছেলে আমাদের পরেশ।” পরেশ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “আপনাদের দশন পাওয়া সত্যই আমাদের সৌভাগ্য।” মহিলাটি শ্রু দুইটি ঈষৎ কুণ্ডিত করিয়া, দৃষ্টি ঈষৎ ত্রিভু করিয়া কহিল, “সত্য নাকি!” বলিয়া মুখ তিপিয়া হাসিল। পরেশ লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, “ওর দেয় নেই—আমি কতকবার আপনাকে দেখছেন কিনা।” সুখদা আসিয়া কহিল, “আপনাকে একবার একটু উঠতে হবে।” পরেশের দিকে চাইয়া কহিল, “তোমাকেও বাবা।” মহিলাটি কহিল, “আমাকে বাদ দিন, আমার ভো শরীর এমনই ভাল নয়।” সুখদা কহিল, “এমন কিছু নয়, একটু চা আর—” মহিলাটি কহিল, “আর-আর না, শ্রুধ্ব চা একটু—এইখানেই দিন দয়া করে।” বিনয় বলিয়া উঠিল, “সেই ভাল। এখানে একটা টুঙ্গের ওপর—।” সুখদা স্বামীর দিকে বিরক্তসূচক ঈর্ষাক্ষপ করিয়া ধারালো সূত্রে কহিল, “হাত গোবেন না।—” মহিলাটিকে সবিবয়ে কহিল, “তা কি হয়! আপনি একটু উঠে আসুন দয়া করে।” পরেশকে কহিল, “তুমিও হাতটা ধুয়ে ফেল বাবা।” পরেশ হাত ধুইতে গেল; মহিলাটিও অত্যন্ত অনিচ্ছায় সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আচ্ছা, চলুন। কিন্তু ভারী লজ্জিত হচ্ছি আমি। বাড়িতে এই বিপদ, তার ওপর এসে আপনাদের ব্যস্ত করলাম।” সুখদা কহিল, “ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন।” উনি তো পালিয়ে গিয়ে দারো খালস হলেন। একা আমি যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আসতে তবু সাহস পেলাম।”

বাঁহরে বারান্দায় আসন পাতিয়া খাবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরেশ ঘরের ভিতরে আসিয়া কহিল, “আমারটা এখানে আনুন কাকীমা।” সুখদা কহিল, “তা কি হয় বাবা! উনি একা একা থাকেন।” পরেশ কহিল, “বাব! উনি হচ্ছেন আপনাদের মান্য অতিথি—ওর সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিচ্ছেন কেন? তা ছাড়া আমরা পাড়াগোঁয়ে মানুষ—সভা-ডবা হয়ে খাওয়া আমাদের পোষায় না।”

খাওয়ার পরে মেয়েটি ঘরে আসিয়া বসিল। পরেশ চা খাইতেছিল। সুখদা আসিয়া সাক্ষাতে কহিল, “কিছু খেলেন না, সব পড়ে রইল।” মেয়েটি কহিল, “রাত্রে কিছু খাই নে আমি। আপনি নোহা অনুরোধ করলেন তাই।” পরেশ কহিল, “আমার দিকে তাকিয়ে মনোবেদনা দর করুন।” কামল দুখের সহিত কহিল, “শ্রু স্পেটটা আর পেতে উঠি নি।” মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, “আপনাদের স্বাস্থ্য ভাল, স্পেট খেলেও হয়তো হজম হয়ে যাবে। কিন্তু আমার তো জা নয়।”



মাথা ঠাণ্ডা রাখিও ও কেশ রুদ্ধ করিও

আর, মিত্রের
চতুর চাকরী
নারিকেল তৈল
তিল তৈল
ব্যবহার করুন

এজেন্ট
ডি. এন. ভট্টাচার্য ও সঙ্গ লি:
৩৯ ও ৩৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা
সর্বদা পাওয়া যায়



শারদীয় উৎসবের দিনে—

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্প তাঁতের
শাড়ী আপনার ছন্দিত দেহকে
অপরূপ রূপমাধুর্যে লীলায়িত
ক'রে তুলুক।

ত নতু শিল্পা লয়ে র বিপুল
আয়োজন আপনার রুচি
অনুযায়ী শাড়ী নির্বাচনে
সাহায্য করবে।



শারদীয় উৎসব

৮৪, কণওয়ালিস স্ট্রীট
(চিত্রা সিনেমার একই পাশেই)
ফোন-বি.বি. ৪৩০২

বিনয় কহিল, “আপনার স্বাস্থ্যের কিছই উন্নতি হয়নি এখানে?”
মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না। ভাল লাগছে না আর, চলে
যাব শিগগির।”

বিনয় কহিল, “আরও দিন কয়েক দেখুন না, জল হাওয়ার ফল
ফলতেও সময় লাগে, তা ছাড়া—”

“তা-ছাড়া কি?”

“ডাক্তার বলিতে হবে। আমি তো বলছি মাসটার মশায়কে—”

“আর ভাল ডাক্তার কই এখানে?”

বিনয় পরেশের দিকে তাকিয়া কহিল, “কেন? আমাদের পরেশ?”

মেয়েটি আঙুলে পরেশকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, “তা
উনি তো যাবেন না।” বলিয়া টোঁটের দুই প্রান্ত একটু কুঁচকিল।

বিনয় কহিল, “শুদ্ধ বাবা পরেশ, কি বলছেন।” পরেশ চা খাইতে
খাইতে কিসের চিন্তায় অনমনস্ক হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়—বিনয়ের ডাক
শুনিয়া যেন চাকিয়া উঠিয়া কহিল, “কি বলছেন?” বিনয় কহিল, “তুমি
ওংক দেখতে যাও নি বলে উনি রাগ করছেন।”

পরেশ কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার আমেজ লাগিয়া কহিল, “দেখুন—
আমি সত্যি ভাড়া লজ্জিত। কিন্তু যেখানে একজন ডাক্তার দেখছেন, সেখানে
তার অনুরোধ ছাড়া আর কারও ডাকে আমাদের যাওয়া চলে না।” মেয়েটি
কহিল, “সে ডাক্তার যদি আপনাকে ডাকতে না চান, আর, অন্য কারও ডাকে
যদি আপনি যেতে না চান, তা হলে রেণী কি করে বলুন তো?” বলিয়া
দুই উজ্জ্বল চোখ মেসিয়া পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ চোখে চোখ
মিলিতেই মুখ নমাইয়া রহিল। মেয়েটি কহিল, “জবাব দিন।” বিনয়
কহিল, “তুমি কেন ইতস্ততঃ করছ বাবা। একদিন গিয়ে দেখে এস না।
এখন তো কার্তিক ডাক্তার কিছই মনে করবে না—নিজের শব্দর যখন—”

মেয়েটি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “যাচ?”

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “মানে বুঝে পোজা—কার্তিক ডাক্তারের
মেয়ের সঙ্গে পরেশের বিয়ে হবে আসছে বছর মাসে—সব ঠিক হয়ে
গেছে।” মেয়েটি মুচকি হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, “তাই
নাকি!” পরেশ গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিল।

সুখদা আসিয়া কহিল, “আপনাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে।”
মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তা হলে আমি আসি।” লোককে কহিল,
“আপনার মেয়ের জন্যে ভারী চিন্তিত থাকব—কাল দয়া করে খবর দেবেন।”
বিনয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, “নিশ্চয়। খবর দেব বই কি।”
সুখদা স্বামীর দিকে কটাকট হাসিয়া কহিল, “ভর তো সবই মনে থাকবে।
নিজের চোখেই তো দেখলেন কেমন মানুষ।” আমিই বিকে দিয়ে খবর
পাঠিয়ে দেব কাল।” বিনয় কিছুমাত্র মুখে কহিল, “মনে থাকবে বইকি।
পবেশ বাবাজী তো বড়িতে ছিল না—খুঁজে নিয়ে আসতে হ'ল,
না হ'লে—” মেয়েটি ওৎসুকতার স্বরে কহিল, “কোথায় ছিলেন—বন্দুর-
বাড়িতে বন্ধ?” বিনয় কহিল, “ঠিক শব্দ ব্যবহারেই না, যারে পাশেই।”
মেয়েটি মুখে টীপিয়া হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইল; পরেশ লজ্জিতমুখে
দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল, “আচ্ছা, নমস্কার।” সুখদাকে কহিল, “নমস্কার
দিদি। বিপদের দিনে এসে বিরক্ত করে গেলাম।” সুখদা কহিল, “ছি ছি,
সে কি কথা।” মেয়েটি কহিল, “চলি তবে, কাল একটা খবর দেবেন।”—
বলিয়া যাইতে উদ্ভাত হইতই বিনয় পরেশকে কহিল, “তোমারও তো এক
রাস্তা—ওর সঙ্গেই চলে যাব।” মেয়েটি তাকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই
নাকি! আসুন না।” পরেশ কহিল, “আচ্ছা, চলুন।” বিনয়কে কহিল,
“বাব বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘরের শিশিটা খুব সাবধানে রাখবেন—
বিষ; আর ওই পেলটোও ভাল করে খোবার ব্যবস্থা করবেন। কাল সকালে
এসে দেখে যাব।”

রাস্তার চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছনে তাকিয়া মেয়েটি ধর্মকিয়া
দাঁড়াইয়া কহিল, “আপনি এত পিছনে পড়ছেন কেন? আসুন না। এখনই
ধরে নিয়ে যাব না—ভয় নেই।” পরেশ কাছে আসিয়া লজ্জিতমুখে কহিল,
“ধরে নিয়ে যেতে হবে কেন? আদেশ করেন তো কালই যাব।” মেয়েটি
স্ব-ভঙ্গী করিয়া কহিল, “আদেশ! আমার আদেশ করবার অধিকার কি
পরেশবাবু? কিছই মনে করবেন না—নাম ধরেই ডাকলাম। আমার নাম
আরতি, ইচ্ছে হলে আপনিও এই নামে আমাকে ডাকতে পারেন।” দুই-
জনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আরতি পরেশের মুখের
দিকে তাকিয়া কহিল, “কি ভাবছেন বলুন তো?” পরেশ কহিল, “কিছই
না।” আরতি কহিল, “আমি লোকের মনের কথা-বতল দিতে পারি,—

বলব—কি ভাবছেন?” পরেশ কিছু না বলিয়া শব্দ হাসিল। আরতি
কহিল, “আপনি বিনয়বাবুর মেয়েকে মনে মনে গালাগাল দিচ্ছেন।” পরেশ
বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “হেতু?” মেয়েটি হাস্য-তরল কণ্ঠে কহিল, “আপনি
হয়তো খুব একটা ইটোবোঁটা ব্যাপারে লস্কত ছিলেন, মেয়েটা হঠাৎ একটা
ফ্যাসাদ বাঁধলে ততো বাদ সাধল।”

স্বপ্ন পাঠের মেয়েটির এই গায়ে-পড়া খনিষ্ঠতার পরেশের মনটা
সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল; নীরসকণ্ঠে কহিল, “কি এমন ব্যাপার। তা
ছাড়া বাবকে আমি নিজের ছোটবোনের মত স্নেহ করি।” আরতি
অপ্রতিভমুখে কহিল, “সত্যি। নিজের চোখেই তো দেখলেন।” গম্ভীর
হইয়া কহিল, “আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?” পরেশ কহিল, “রাগ
কিসের?” আরতি কহিল, “ভাবলেন, আচ্ছা অল্প মেয়ে তো! এক খণ্টক
আলাপেই লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অনধিকারচা। শব্দ ক'রে
দিচ্ছে।”

পরেশ অবশ্য হুঁহাই ভাবিতেছিল ও মনে মনে বিরক্তিবোধ
বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “না না, তা ভাবব কেন?”
আরতি কহিল, “আমার এই রকমই স্বভাব। সবাই কত বকাঝকা করে,
শোষণাতে পারি না কিছুতেই।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি বলিতে
লাগিল, “দুর্মানিটের আলপেই বন্ধু পাতিয়ে বাস—মবই হয় না নতুন
আলাপ; যদিও বন্ধুতে পার সবাই পছন্দ করে না।” পরেশ কহিল,
“আমাকে দয়া করে সবাইএর দলে ফেলবেন না। আপনার বন্ধু পকে
নিজেকে ধনাই মনে করব।” আরতি ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া পরেশের মুখের
দিকে তাকিয়া কহিল, “সত্যি?” পরেশ কহিল, “সত্যি তো।” আরতি
চোখ ও মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, “বোশ! কাল তা হলে বন্ধুর বাড়িতে
আপনার নৈমন্ত্য—ঠিক বেলা চারটার সময়ে গিয়ে হাজির হবেন।” পরেশ
কহিল, “যাব, নিশ্চয়।”

বাড়ির সামনে আসিয়া থামিতেই মেয়েটিও থামিয়া কহিল, “থামলেন
যে!” পরেশ কহিল, “এই আমাদের বাড়ি।” মেয়েটি কহিল, “তাই নাকি।
একদিন আসব আপনার বাড়ি। আপনি তো আর নৈমন্ত্য করবেন না,
নিজে হতেই আসব।” পরেশ কহিল, “নৈমন্ত্য করব না জানলেন কি
করে?” মুখ টীপিয়া হাসিয়া মেয়েটি কহিল, “জানি।” একটু চুপ করিয়া
থাকিয়া কহিল, “আমাইবাবু, এতবার করে যেতে বললেন—একদিনও
গেলেন না।”—বলিয়া মুখটি স্থান করিয়া তুলিল।

পরেশ কহিল, “দেখুন, ও কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না।
আপনাকে বললাম যে, অন্য ডাক্তারের রেগণিকে তার বিনা অনুমোদনে
দেখতে যেতে আমাদের ডাক্তারি এটিকেই বাধে।” মেয়েটি কহিল, “বৈশ
কাল যাবেন তো?”

“নিশ্চয়। কাল তো আর ডাক্তার হিসেবে যাব না, বন্ধু হিসেবে যাব।”

চোখ দুইটি বড় করিয়া মাথাটি হেলাইয়া মেয়েটি কহিল, “কিন্তু আপনার
ভাবী শ্রামটী আমাদের বন্ধু পছন্দ করবেন তো?” পরেশ মৃদু হাসিয়া
কহিল, “কি করে জানব?”

“কাল সকালে বরং একবার জিজ্ঞেস করবেন।”

“দেখা না হলে জিজ্ঞেস করা কি করে?”

“দেখা হয় না? একবারও না?”

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া জনাইল, “না। মাথার ঝাঁকানি দিয়া
মেয়েটি অবিশ্বাসের স্বরে কহিল, “এক গায়ের ছেলে-মেলে, দেখা হয় না,
বিশ্বাস করব না।”

পরেশ আরতির দিকে তাকিয়া রহিল। উহার সহজ, সরল ও
সংকটচ্যবন ব্যবহার তাহাকে মৃদু করিল। যে নিম্নপ্রণয়ী মেয়েমানুষটি
হাতে লগ্নন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আঁতড়িছিল, সে অন্ধরে হাঁ করিয়া ইহাদের
দিকে তাকিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কহিল, “মাসীয়া! রাত হ'লে যাচ্ছে।”
আরতি একমুহুর্তে গম্ভীর অঙ্গভঙ্গন করিয়া কহিল, “সত্যি। নমস্কার।
চললুম। কাল যাবেন কিন্তু অপেক্ষা করে থাকব।”—বলিয়া চলিয়া গেল।

পরেশও নমস্কার করিয়া অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৮)

পরদিন সকাল আটটার সময়ে ঘনশ্যাম আসিয়া হাজির হইল। গায়ে
ফ্রান্সেলের কড়িয়া ও পশমী আলোয়ান, পায়ে চটি জুতা। বিনয় বৈঠকখানার
বারান্দায় বসিয়া পরেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাত্রি ফোঁকা গলিয়া
গিয়াছে। সকালেই বিনয় পরেশকে খবর দিতে গিয়াছিল। পরেশ এখনই
আসিবে বলিয়াছে।

বেঙ্গল স্ট্রীট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি : ক্রেডিট

স্থাপিত—১৯১৮

ফোন : কলিকাতা ৭০০
(৩টি লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০	টাকা
বিক্রীত	...	৫০,০০,০০০	টাকা
আদায়ীকৃত	...	৩৯,০০,০০০	টাকা
মজুত তহবিল	...	৬,০০,০০০	টাকা

— শাখা —

কলিকাতায়	বাংলায়	বিহারে
টাওয়ার রক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট	রংপুর	হাজারিবাগ
১২৮/১, কণ্ঠওয়ালিস স্ট্রীট	পাবনা	রাঁচী
২৭, বিবেকানন্দ রোড	বগুড়া	কোদরমা
২০৬, বিবেকানন্দ রোড	ঢাকা	গিরিধি
২১১/১এ, বোবাজার স্ট্রীট	নারায়ণগঞ্জ	
১৫৫, রসা রোড	কুমিল্লাগর	
১৬, জি টি রোড, হাওড়া	নবমুন্সীপ	
১৯, হরগঞ্জ রোড, সালকিয়া	বহরমপুর	
	বাঁকুড়া	

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, সি, দাশ

কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ফণ্ডে যে কোনপ্রকার দানই এই ব্যাঙ্কের
হেড অফিসে এবং সকল শাখা অফিসেই সাদরে গৃহীত হইবে।

ঘনশ্যাম আসিয়া বারককে কাসিয়া গলটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “কি হে, কেমন আছে তোমার মেয়ে? পরেশকে পেয়েছিলে কাল?” বিনয় কহিল, “পেয়েছিলাম। বসবে, আসুন।” ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আর বসব না। কাল রাতে যে রকম ছটোছুটি করিছিলে দেখেছিলাম—তাকে কালই খবর নিয়ে যাব ভেবেছিলাম; কিন্তু অনেকটা রাত হয়ে গেল—তা কেমন আছে মেয়ে?” বিনয় বিষমমুখে কহিল, “কাল তো পরেশ বাবাজী লাগাবার ও খাবার দুই ওঘুই ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল; রাতে ঘুমিয়েওছিল। সকালে দেখছি, ফোসকা গলে গেছে, তা ছাড়া জ্বরও হয়েছে মনে হচ্ছে।” ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, “ওতে ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদসে একটু জ্বর হয়েছে। কাল অত ছটোছুটি না করে, সঙ্গে সঙ্গে একটু পোড়া তেল লাগিয়ে দিতে তো কিছু হ’ত না;—তোমার আবার সবই বাড়বাড়ি কিনা!” বিনয় কহিল, “ওঘু তো লাগানো হয়েছিল—নারকেল তেল আর চণের জল, কিন্তু—” ঘনশ্যাম কহিল, “আরে, রেখে দাও তোমার নারকেল তেল আর চণের জল।” প্রসারিত করতল তিখকভাবে নাড়িয়া কহিল, “স্নেহ পোড়া তেল! এমন ওঘু আর নেই।” দ্রুতগামী করিয়া কহিল, “এখনও তাই করলে যাও—ভাঙার-বাঁদা ডাকতে হবে না।”—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বিনয় কহিল, “কোথায় চলেছেন?” ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, “বোনের কাছে।” বিনয় ওৎসুকোর স্বরে কহিল, “আপনার আবার বোনান কে?” ঘনশ্যাম হুঁ নাচাইয়া কহিল, “কেন? আমাদের পরেশের মাসী হে! আমাদের সব বোনান হচ্ছে না? নতুন বোনান—” বিনয় কহিল, “সকালবেলায়?”

“জরুরী দরকার—বিয়েব সব ফর্দ হচ্ছে কিনা? কাল এদিকের সব হয়ে গেছে। এখন গয়নার আর বরাহরলের ফর্দটি তো ওদের মত নিয়ে করতে হবে? সময় তো আর নেই—মাকে একটি মাস; তা পৌষ মাসে তো ও শ্রুতকর্মের কিছু করা চলবে না। যা করতে হবে এই মাসেই।” বলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াই আবার থামিয়া কহিল, “তা ভাঙার যা খরচ করব বলছে, তাতে বিয়ের মত একটা বিয়ে হবে বুটে! বামুন্দের ঘর-ঘর এক-একটা করে গামড়া আর একখানা করে গামছা, গা সূখ লোকের তিনদিন ভোজ, শহর থেকেই ইংরেজ বাজনা। মেয়ে-জামাইকেও দেবে খুব—মেয়ের গা-ভাঁট গয়না, কন্যাসমীপ জোড়, জমেই হইরের অংটি, রূপোর দান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। তা ছাড়া, যা সব দেবার—” চক্ষে ইঙ্গিতময় ভঙ্গী করিয়া কহিল, “তা তো ঢোকেই, অক্ষা দুদিন পরে। আচ্ছা, চল। সময় বড় সংকল্প। অথচ অত বড় একটা ব্যাপারে ভার আমাদের কজনের ঘাড়ে।” গা কয়েক গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম আত্মীয়তার সূরে কহিল, “তোমার মেয়ে যে আমার এ সময় ফাসাদ করে বসল, না হ’লে এই লেনেই গিয়ে ঠিক করে ফেললেই হ’ত। বয়স হয়েছে চের, আর বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।” বিনয় কহিল, “পাত কই?” ঘনশ্যাম কহিল, “পাতের অভাব কি? বেশী ঘাড় না উঠি’লে সমান-সমান ঘর খুঁজে দেখ, পাবে। আচ্ছা, চল।” বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল।

বিনয় ঘরে ফিরিতেই সুখদা কহিল, “কি বলিছিল?” বিনয় কহিল, “পারেশের বিয়ের নাকি ফর্দ হচ্ছে, খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে—অনেক টাকা খরচ করবে ভাঙার।” সুখদা নীরবকণ্ঠে কহিল, “আছে তাই খরচ করবে, আমাদের মত তো নয়।” বিনয় কহিল, “তা পরেশের মত ছেলে, খরচ না করলে চলবে কেন? পাড়াগায়ের ছেলে তাই, না হলে শহরে ও ছেলের দাম দশ হাজার টাকা।” সুখদা মুখে গম্ভীর করিয়া কহিল, “কে ‘না’ বলছে।” ডা. কুঁচকাইয়া কহিল, “পাতের কথা কি বলিছিন না?” বিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, “হ্যাঁ। বলিছিন বিবির জন্যে পাত খুঁজতে বেরতো।” সুখদা দুই চোখের দাঁটে তীক্ষ্ণ করিয়া স্বামীীর নিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “খুব অন্যায় কথা বলিছিন কি?” বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সুখদা কহিল, “সত্যি। বেয়েও এবার, এই তো এক বিপদ হয়েছে; পায়ো পোড়া দাগ হয়ে যাবে, এর জন্যে যে কত ভোগান্তি হবে তার ঠিক নেই।” বিনয় কহিল, “এমন কি পড়েছে যে দাগ হয়ে যাবে? হ’লেও ওঘুদের গলে দাগ মিলিয়ে যাবে।” সুখদা দীর্ঘনিবাস ফেলিয়া কহিল, “মিলিয়ে গেলেই ভাল।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “পারেশ তো এখনও এল না।” অবিশ্বাসের সূরে কহিল, “সত্যি গিচ্ছলে তো?” বিনয় ভ্রোয়ের সহিত কহিল, “না রে! গিচ্ছলাম বই কি! পারেশ বললে এখনই যাচ্ছি। বোধ হয় ঘনশ্যাম আটকে দিয়েছে।”

“ও বুঝি পরেশের কাছেই গেল?”

“ঠিক পরেশের কাছে নয়, ওর মাসীর কাছে; গয়নার ফর্দ করতে: খুব ফপদালালি করছে ঘনশ্যাম, যেন ওরই মেয়ের বিয়ে।”

পরেশের ডাক শোনা গেল, “কাকাবাবু!” বিনয় সাহসে সাড়া দিল, “এস বাবাজী!” বৈঠকখানায় পা দিতেই পরেশের আবির্ভাব ঘটিল—মালকোতা মারিয়া কাপড় পরা, গায়ে শাট ও কোট, পায়ো জুতা; কহিল, “চলুন, দেখিগে। বিব কোথায়?”

পরেশ মূর্খের ইঙ্গিতে জানাইল, “ওই যে ওখানে বসে আছে।” উঠানের মাফখানে বেশ বোয় আসিয়া পড়িয়াছিল; দেখানে মাদুর পাতিয়া খুঁকী পড়িতেছিল; বিব তাহার পাশে শূন্যমুখে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

জুতার শব্দ শুনিয়া বিব মূখ্য নামাইল; খুঁকী বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া থাকাইয়া উঠিয়া সোম্বাসে বলিয়া উঠিল, “এই যে পরেশদাদা এসেছেন।” পরেশ কাছে আসিয়া বিবকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছ?” বিব জবাব দিল না। সুখদা একটা মোড়া আনিয়া দিতেই পরেশ বসিয়া কহিল, “গরম জল কতকটা বরুন দেখ; আর পাককার ছেড়া কাপড় থাকে তো বার করুন; তেলের পাত্রেটা কাল রেখে গেছি, সেটাও আনুন।” সুখদা ও বিনয় দুইজনই চলিয়া গেল।

উঠানের এক পাশে কতকটা জমি বেড়া দিয়া ঘেরিয়া সম্ভীর বাগান করা হইয়াছে। লাউগাছগুলি লতাইয়া লতাইয়া মাচায় উঠিয়াছে—মাচা হইতে দুই চারিটা বড় বড় লাউ ফুলিচ্ছে। বেগুনগাছগুলিতে ফুল আসিয়াছে—কিচ কিচ বেগুনও ধরিয়াছে। শাকের ক্ষেত ডিরিয়া অল্পস্ব স্বল্প ও সবুজ পুনো শাকের চারা। বেড়ার ধারে ধারে সারিবদ্ধ চন্দ্রমল্লিকা ও গাধা গাছগুলিতে বিস্তার ফুল ফুটিয়াছে। সেই দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, “ও, খুব ফুল ফুটেছে তো!” খুঁকীকে কহিল, “খুঁকী! তুমি আমাকে একটা গাধা ফুলের মালা করে দাও দেখা।” খুঁকী বিবের দিকে তাকাইয়া কহিল, “যাব দিদি?” পরেশ কহিল, “আবার অনুমতি চাই নাকি?” খুঁকী কহিল, “বা রে! দিদির গাছ, কাউকে ফুল তুলতে দেয় না—” পরেশ তুমি অভিমানের সহিত কহিল, “থাকগে খুঁকী, কাজ নেই।” বিব খুঁকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, “তুই পারবি না, আমি মালা গেছে দেখ এখন।”

বিনয় তুলার পাত্রেট লইয়া আসিল। পরেশ কহিল, “ফোসকাটা যে রকম গলেছে ওটাকে ব্যাণ্ডেজ করা দরকার।” বিবের দিকে চাইয়া কহিল, “কাল এত করে বলে গেলাম একটু সাবধান হও—” বিব লজ্জিতমুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, “তা ও কি করবে? ঘুমের ওঘু দিয়ে গিয়েছিল, বুঝি ঘুমিয়েছে। ঘুমের ঘোরে কি কিছু খেয়াল থাকে?”

সুখদা গরম জল লইয়া আসিয়া বিনয়কে কহিল, “দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভ করতে পেলো আর কিছু খেয়াল থাকে না, একটা খোয়া পুরোনো কাপড় আনতে হবে না?” বিনয় কহিল, “কি করে আনব। তোমার কাছেই তো চাবি।” কথকর দিয়া সুখদা কহিল, “আমি কি চাবি নিয়ে দেশান্তরিত হইয়াছি নাকি! চেয়ে নিতে পার না?” চাবি লইয়া বিনয় কাপড় আনিতে গেল।

পায়ের ব্যবস্থা করিতে বসিয়া পরেশ খুঁকীকে কহিল, “তুমি মিডেমিড দাঁড়িয়ে না থেকো আমার জন্যে এক কাপ চা করে আন দেখা।” সুখদা কহিল, “ও থাক বাবা! আমিই যাচ্ছি। কাল একজন এক কাপড় করেছেন, আজ আবার উনি কি করে বসছেন, দেখছ তো! কাজকর্ম করগে যাও।” খুঁকী চলিয়া যাইতেই পরেশ মূর্খকণ্ঠে কহিল, “হাত ফসকে হাউ পড়ে গেল—কি ভাবিছিলে?” বিব জবাব দিল না। পরেশ কহিল, “কি, বল না?” বিব মূর্খ বিষমকণ্ঠে কহিল, “কি আবার ভাববে?” পরেশ ক্ষণকালের জন্য মূখ্য ভূমিয়ার দরির মূখের পানে তাকাইয়া কহিল, “এমনই কি কারও হাত ফসকে? নিশ্চয় কিছু ভাবিছিলে?” তারপর আবার মূখ্য নীচু করিয়া নিজের কঁজ করিতে করিতে পলিতে লাগিল, “বোধ হয় নিজের কথা ভাবিছিলে, নয়? কত আলো হবে! কত বাজনা বাজবে। পাখুঁকী চড়ে হিজোর-হিজোর শব্দ করতে করতে বর এসে হাজির হবে—ইয়া লম্বা-চওড়া শরীর, বড় বড় গোফ। কোলে করে নামাবে কে?”

কাঁচি দিয়া ফোসকার নরম চামড়া কাটিতে কাটিতে পরেশ খুঁকীকে কহিল, “তা হলে তুমি নেহাৎ বেকার দাঁড়িয়ে থাকবে খুঁকী। বেয়ে, চা না করতে পার, পান মাজতে পারতো, তাই সেজে রাখগে তো আমার জন্যে। কাকীমা কি রকম রেগে গেছেন, দেখছ তো! কাজকর্ম করগে যাও।” খুঁকী চলিয়া যাইতেই পরেশ মূর্খকণ্ঠে কহিল, “হাত ফসকে হাউ পড়ে গেল—কি ভাবিছিলে?” বিব জবাব দিল না। পরেশ কহিল, “কি, বল না?” বিব মূর্খ বিষমকণ্ঠে কহিল, “কি আবার ভাববে?” পরেশ ক্ষণকালের জন্য মূখ্য ভূমিয়ার দরির মূখের পানে তাকাইয়া কহিল, “এমনই কি কারও হাত ফসকে? নিশ্চয় কিছু ভাবিছিলে?” তারপর আবার মূখ্য নীচু করিয়া নিজের কঁজ করিতে করিতে পলিতে লাগিল, “বোধ হয় নিজের কথা ভাবিছিলে, নয়? কত আলো হবে! কত বাজনা বাজবে। পাখুঁকী চড়ে হিজোর-হিজোর শব্দ করতে করতে বর এসে হাজির হবে—ইয়া লম্বা-চওড়া শরীর, বড় বড় গোফ। কোলে করে নামাবে কে?”

খুব ঠকিয়েছেন কি ?

এখনও সময় আছে সাবধান।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং সন্মান দেখিয়া হিংস্রদের আমাদের নাম জাল করিতেছে। অবশ্য ইহার প্রতিকার করা হইবে। আপনারা যদি আপনারদের রেডিওর প্রকৃত ফ্রি সার্ভিস পাইতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের সহিত সাফাফ করুন বা পি কে ১৫৩২ নং ফোন করুন, আমাদের ফ্রি সার্ভিসের আরও অনেক সুবিধা আছে যাহা আমাদের সদস্যগণ পিচ বৎসর যাবৎ পাইয়া আসিতেছেন।

পুরাতন ও রেজিস্টারীকৃত
আদি প্রতিষ্ঠান

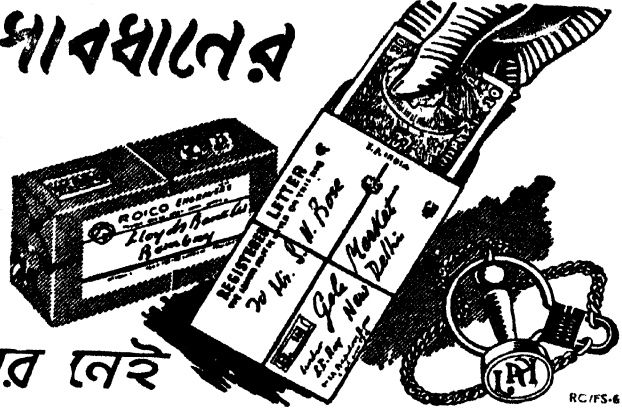
রেডিও এসোসিয়েশন
অফ বেঙ্গল।

৮৭নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমরা এইচ, এম,
ভির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিলার। আমাদের
অন্য কোনও শাখা নাই।

সাবধানের

স্মার নেই



RC/FS-6

চিঠিপত্র সীলমোহর করে পাঠালে ভেতরের কিছু খোলা বাওয়ার ভয় থাকে না। ইন্সিওর বা পার্শেলের ক্ষেত্রে তো সীলমোহর না থাকলে পোস্টাফিসই তা বাতিল করে দেবে। নিজ নামের সীলমোহর হলে একটি নুতনত্বও হয় এবং চিঠিখানিও নির্ভয়ে পৌছাতে পারে। আমাদের ই, পি, এন, এল, সীল এ-কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। স্বক্বেকে চেইন ও রি-এ ফিট করা এখরগের সীলমোহর কামবাই প্রথম প্রস্তুত করি। নাম খোলাই করার ক্ষমতি সমেত অত্যন্ত দাম মাত্র ৫/- টাকা।

বয়কো এনগ্রেডাম
১৩এ বিডন রো : কলিকাতা

=দেশের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান=

কুন্দের ব্যাংক লিমিটেড

হেড অফিস—৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

কলিকাতা
বড়বাজার
শ্যামবাজার
দক্ষিণ কলিকাতা
হাওড়া

ঢাকা
শান্তিপুর
ভারকেশ্বর
রাণাঘাট
কুফনগর
বেঙ্গলু
বাগী

ঝাড়গ্রাম
ভদ্রক
সুতাগড়
বাগেরহাট
বাকুড়া
গিউনী

দার্জিলিং
রাজসাহী
পগড়া
শিলিগুড়ি
কালিম্পং
বালেশ্বর
চন্দনবাজার

অনুমোদিত জামিন রাখিয়া ঋণ ও ওভার ড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

ফোন :
ক্যাল-৬১১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এম, কে, চক্রবর্তী

মিরকাকা তো ভয়ে এটুটু! তখন কনের পরেশদাদা **স্বাক্ষর** কোঁড়ে করে
সর নিয়ে আসলেন।" সব মূখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল ববির দুই
সুখ হইতে অশ্রুধারা নামিয়াছে। বিবাসনের স্মরে পাশ কাইল, "তক!
দুখ কেন? লাগছে নাকি?" ববি নমস্কারে ঠোঁট ঠোঁট চাপিয়া, ঘড়
পড়িয়া 'না' জানাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "তবে?"

বিনয় আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “হ্যাঁ মা, জগছে?” ববি
 ভাড়া নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। ঝড়কিয়া দাড়াইয়া বিনয় কহিল, “হয়ে গেছে,
 মা! অর দেরি নেই, এখনই ভাল হয়ে যাবে।”

পরেণ নীরবে ক্ষতস্থান ধুইয়া ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে
শীগগিল।

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় নারীকণ্ঠ শ্রুত হইল—“বউ হয়েছিল যাক গো?” বিষয় পিছন ফিরায়া তাকাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, “কে?” বিনয় কহিল, “শ্রীমতী বামনী!” পরেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কহিল, “তাই কি?” শ্রীমতী ঘরে ঢুকিবেই বিনয় কহিল, “এস পিসনী!” শ্রীমতী হঠাৎ আসিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া তাঁতবস্ত্রে কহিল, “হয়ছে কি?” বিনয় কহিল, “এই দেখ না পিসী শূকরো বিপদ—কাল রাতে ভাতের হাড়ি ফাটতে গিয়া পা পড়িয়াছে।” স্বখেদাও আসিয়া নড়িয়াছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী কহিল, “এত বড় ভয়—ভাতের হাড়ি ফাটতে পারবে না! মেয়েকে কিছু, শেখাস নি কি না?” দুদিন পরে দশরহাড়ি হাতে হইবে।” স্বখেদা কহিল, “স-ই করতে পারবে তো, কাল কি রকম হয়ে যাবে।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “বিপদ যখন আসে, পিসনী! তখন কি আনন্দি নুড়ীয়া যাবে।” শ্রীমতী ঘাড় নড়িয়া কহিল, “হা বাবু!” একটখানি দাঁড়া হইল হাসিয়া বলতে লাগ দি, “দিবাইয়া চিবায়া কহিল, “তবে কি জাঁসি বউ, কাল যখন বিকেলে এলাম, তখন দেখি তোম মেয়ে ধানো বাসে আছে, সাহসার ভাব কি হইল সত্যে মনে না। অমায়দার প্রাণটি সরণে ছিল, ভিজিয়া কার খোঁসে ত কে, তুমি কিংবা বিবাহে না হয় তো—” মাম খড়্গা চোখ মুসুসিয়া কহিল, “বউ বাসে, এমন সব সখা মনের যত্নেই থাকবে। তোম না ভেবে, এত অকস্মৎ প্রাণের ভাবনা কি সর গুল বসে দেখিবে কিছু, মনে করিস না এই ভ্রমের ভাবের ভুলে বসিছে।” স্বখেদা মুখে কালি করিয়া শূকরকে কহিল “মামি তখন তো কিছু ভুলি নি, পিসনী!” তার কি জ্ঞানের ভুলে এর অভ্যাস—ই-উ-ই পড়ে কিনা একটা সময় খেলার পাখর কড়া তরো।” মাম টিঁপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, “পড়শানা করে যদি পড়ে যাবেই হয় তো সে সব পড়া বন্ধ করা বউ।” অমায়দের দাঁড়ান পেরোদের মনে অত সব ধরকার কি?” বিনয় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “আজকাল যে চরকার হচ্ছে পিসি! পাড়শা জানা মনে না হাল জেগেয়া নিসে বরদে চাচ্ছে না।” অপর ও ওঠে সহযোগে অপরসূচক দুদিন করিয়া শ্রীমতী কহিল, “পছন্দ করতে না। এই যে আমাদের কন্যা, দাঁটা পাল করতে শনিবে। পেরোদ ভগত সখী পড়ে নি বেদন হয়।” তাহারে ইণ্ডিত করিয়া কহিল, “তা তাকে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করনা তোমাদের ওই ভক্তাবলা।”

পরের পর কাজ সারা হইয়া গেল। উঠির দাড়িয়া কহিল, “সামান্য আর জল আনুন কাঁকমা, হাতটা ধুতে হবে।” পরেশ খ্রীমতীর দিকে তাকিয়া কহিল, “কি খবর দাঁদিমা! আজ সকালবেলাতেই এ পাড়ায় শব্দাগমন।” খ্রীমতী মৃচকি হাসিয়া কহিল, “শব্দাগমন কি সাধে হয় ভাই! গরু বড় বোহাই, তোমার মরণে একটা কথা আছে।” পরেশ কহিল, “একটু, দাঁজন, হাতটা ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিই।” খ্রীমতী গম্ভীর হইয়া কহিল, “শব্দ-শব্দ! এত দৌর করা চলবে না। তোমার বোধ হয় দৌর হচ্ছে। একটা কাঁকমা—একবার এদিকে এসে শুনুন বাও।” পরেশ খ্রীমতীর পাছ পাছ বাড়ির বাহারে আসিয়া রহুতা দাড়াইল। খ্রীমতী কহিল, “পরের মেয়েদের পন্থেবো কহছে—ওদিকে আমাদের রাখা বে ছটফট করছ।” পরেশ কহিল, “মানে?” খ্রীমতী কহিল, “মানে আর কি? কল ভূমি কলগে আসবার পন্থই ও আবার ফিরে এল। বিজ্ঞেসা করলাম—কি লো, অবার এলি বে। তখন গরব ক’রে চলে গেলি। শ্যাম আমাদের রাগ ক’রে চলে গেল, অর আসবে না বলেছে। তা শানে কি ভয়, ভাই! মৃশখানি শকির লেলে। তা ভাই অজ বেয়ে, মাথার দিবা দিরে বলে বাছি।” মৃখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “আর দেখ, মেয়েদের পা টিপতে বাঁ দালই লাগে, তো পরের মেয়েরা পা টেপবার দরকার নেই। এক বাটি তেল গরুর ক’রে রাখব, যতক্ষণ দাম চার আমাধের কমদার পা টিপে বাঁবে বসে।” বাইতে বাইতে মৃখ কহিয়া কহিল, “মেয়ে দিল্লি, না দেখে আর ক’র ক’র অ এ হইবে?”

ফিরিয়া আসিতেই বিনয় কহিল, “শিক বলছিল প্রীমডী?” পদে পদে গাভীর মধ্যে ক’হল, “এমনই একটা কথা।” বিনয় চোখ পাকাইয়া কহিল, “ভাীর শপতান মানী! পরের দিষ্ট খোজাই কাজ ওরা।” হাত ধুইয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, “আজ আর বসিক ভাত খেতে দেবেন না। একটু জ্বর হয়েছে—মন হচ্ছে।” সুখা শব্দকথায় দাড়াইমাছিল, ঘাড় নাড়িয়া ক’হা জানাইল। কিছুক্ষণ পরে সুখা ক’হল, “কি সব যা-তা বলে খেল বোবা! আমার ভয় হচ্ছে—এর পর বোধ হয় সরা গায়ে মেয়ের কুৎসা রটাবে। যা ভয় কর তাই হয় বন্ধি-বা; মেয়ের বিয়ে দেওয়া দখল হ’বে আমার।” বলিতে বলিতে সুখার ক’ঠমের অগ্রদ্বন্দ্ব হইয়া আসিল। বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “এত ভয় কিসের? মিথো কুৎসা রটালেই সবাই ওর কথা বিশ্বাস করবে কিনা।” সুখা বন্ধুত্বে গলায় কহিল, “করবে না কেন শূনি? কেউ তোমাকে তোয় কা করে? তুমি হালকা লোক বলেই তো সবাই যা-তা বলতে সাহস করে তোমার মেয়ের নামে। কই, আর কখনও মেয়ের নামে বলুক দেখি? এই যে এত কথা মুখের সামনে বলে গেল, মাঝ কুটে কুটে বলতে পরলে তুমি?” পরেশ দ্বিরবে চা খাইতে লাগিল; বধি নম্রমে কহিয়া মাদুরের উপর আঁতল দাঁতিতে লাগিল।

ববির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সুখা কহিল, “ওই মেয়ের জন্যে আমাকে পাজার দড়ি দিতে হবে বোধ হয়।” ববির উদ্দেশে কহিল, “কাজ কি অত তুই ভাবিছালি না? কিসের হোর জাননা?” পথের প্রতিবার কহিয়া কহিল, “অপনার তনয়, থাকিমা! কে কি বলে গেল, আর তা বিশ্বাস করে আপনি ঠিক ধমক করে শব্দে করেন দিলেন।” সুখা কহিল, “না না। পরশ। এই পানী আর না মানে। কিসে আর আমি শয়ছি না। এদের কারও বৃষ্টি নেই, বিঘেনো নেই, নিজেদের ওজন বোঝে চলা নেই। একা আমি কত সামলাই বসি হো? আর উপর, এই রকম গায়ের লোক,—একটি তলা কথা বললে যদি উপকার হয়, মার বোঝেও কেউ তা বলবে না; কিন্তু নিজের একটি ফিনিকি পোষা পাতাশ দিয়ে দিয়ে আঁকাকাণ্ড করি তুলবো। এত বড় মেয়ের মদ দুদান্য হঠাৎ এত ক্রি করে হবে হেহেহ? দুদান্যের সঙ্গে তোমার মত ছেলেকে পর্যন্ত যখন তখন বাড়িতে আসবে মনো কান্ডোলায়, আমি তো জানো না।” পথের নীরব কহিয়া কহিল, “বিসয় পাড়িয়া পাড়িয়া মতো চুলকাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কহিয়া সুখা বিষয়ক কহিল, “শুভে।” কাগড় আমি মেয়েকে নিয়ে পাজার দড়ি চালা গাই। পোষ পড়ল আর যাওয়া হবে না—এমেয়ের বিয়ে দিতে পারি তাই গাই ফিরব, না হলে অর ফিরবই না।”

(୨୩)

সোমন সরাফান মরিয়া দুইটি প্রবল আক্রমণ পরেই মরকে দুই দিক হইতে টানিতে লাগিল। একদিক কমলার ঘোঁসে মূর্খিত কোমল মঙ্গল দেহের কোণে পুষ্কলিতের আরম্ভণ। আর একদিক এক সঙ্কল্পী, শিখিত, আশ্রমিক ভাষ্যপন তরুণীর সাধনভাষ্যের আক্রমণ। দুই দিকেই তাঁর সমান; কেহ কহায় ও চেয়ে একটি মূর্খ নয়। একবার মনে হইল, কমলার কাছে যাওয়াই ভাল। শ্রীমতী সমাল কথায় বাঁচিয়া, হাসিতে ও চহনিত্তে যাহা জানাইয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কমলা হরতো আজ ধরা দিবে; শ্রীমতী হয়তো আজও অবাদ সাধণ দিবার জন্য ছল আনিবার ভলে বাতির হইয়া বাইবে, তখন সেই নির্গম ঘরে আতরকার সকল কক্ষ সংবরণ করিয়া কমলা হরতো তাহার বালকধর্মের মধ্যে আশ্রমসমর্পণ করিয়া বিবাহের পূর্বে ভাষী ধর্ম সহিত এই নিবিড় সহযোগিতা পাড়াগায়ে হিন্দুস্থানের পক্ষে এমন একটি অভূতপূর্বে সৌভাগ্যভাষ্য হবে, ভাবিতেও পরেশের সারাক্ষেপে বিদ্যাপ্রভাস বহিতে লাগিল ও মূর্কের রক্ত মঙ্গল মত ফেনিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সন্তো সন্তো মনে হইল কাজ নাই। কমলার সহিত তো এক মাস পরেই বিবাহ হইবে, তখন ভো ভাহাকে পরিশূর্ণভাবেই পাওরা হইবে। একে তাহাও ভিত্তি তাহার কুমারী-সুলভ তত্ত্ব-মর্মের প্রতিরোধ-প্রশণভাতিকে নিরস্ত করিয়া লাভ কি? সম্প্রতি বিবেশননী, ন্য-পরিচিতি, সূত্রী মেয়েটির সঙ্গচর্চা করাই বহিঃসংগত। মেয়েটি দুই দিন পরেই এখান হইতে চলিয়া বাইবে বলিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার সহিত আর হরতো কখনও দেখা হইবে না। অথচ মেয়েটির কথায় বাতায় দুখা গিয়াছে যে, সে তাহার বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষের ভাব মনে মনে স্পন্দন করিতেছে; তাহার পরেই সেই অসন্তোষের কলিটি



ডি-ডি মলম

কাপড়ে দাগ লাগেনা এবং স্নিগ্ধকর
খোস পাঁচড়া, ঢুলকানী,
দাদ, হাজা ও একজিমার
অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি কোটা ১০০
—সোল এজেন্ট—

মহাত্মা এণ্ড কোং

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
ফোনঃ—বি বি ৪১০১

জীবন বীমাণত্র

বর্তমান যুদ্ধসংকট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধামত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। একটী জীবন বীমাণত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। 'ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স'কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে সি দাশ, বি, এস্‌সি (ইউ, এস, এ), আর এ,
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দু ফ্যামিলি এন্ড ইটালি ফাণ্ড লিঃ

(প্রাচীনস্মরণীয় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কর্তৃক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

সঞ্চিত ধন—৩৪,৭৭,০০০। এ পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে—২২,০০,০০০।

এক্ষণে প্রতি বৎসর দেওয়া হইতেছে—১,০০,০০০।

এই ফাণ্ডে বৃন্দাবস্থায় নিজের এবং মৃত্যুর পর নিজ স্ত্রী ও আত্মীয় পোষণের ভরণপোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির; শিশুগণের শিক্ষার বৃত্তির এবং বালিকাগণের বিবাহের ব্যবস্থা আছে, এককালীন থেকে টাকা জমা দিয়া পরের মাস হইতে আত্মীয় পেন্সন পাইবার ব্যবস্থা আছে।

মহাত্মা ভারত গবর্ণমেন্ট এই ফাণ্ডের যাবতীয় অর্থাদি রক্ষা করেন এবং ইহাকে কয়েকটি সুবিধা দেন। হিন্দু ফ্যামিলি ফাণ্ডের ভিত্তি এক্ষণে অতি দৃঢ়। ফলতঃ এই ফাণ্ডে যোগদান করা ও নিজ পরিবারের সাহায্যের ভবিষ্যৎ সুবন্দোবস্ত করা একই কথা।

ফাণ্ডের সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন—৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

নানীচহ্নাভায়ে মুন্সিফা ফেলিয়ার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া কাল স্পন্দ-পর্যায়ের মধ্যেই মেয়েটির আলাপ ও আলোচনায় এমন একটি সরস অন্তরঙ্গতা ও তহার আহ্বানের মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার সপলাভের জন্য মন ভিতরে-ভিতরে লোভাতুর ও হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, তাহার কতবা-শ্রুতি তাহাকে তাগিত দিতে লাগিল। সে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত; কেহ যদি কাণ্ডাকের প্রত্যুত্তর, মরিচাধারা চিকিৎসা-প্রণালীতে লুপ্ত না হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে অস্বীকার করিবে কেন? অবশ্য গ্রাম ও গ্রামান্তরের অনেক লোক এই কারণেই তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে (অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে), কিন্তু তাহাতে সে সন্দেহিত হইয়া উঠে না। কিন্তু এই সুন্দরী মেয়েটি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য তাহার সারা অন্তর যুগ্ম যে আগ্রহাশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, বরং তাহার মনে হইতেছে, যদি সে তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা এই মেয়েটির উপর প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে বিদ্যা নিরর্থক। ইহা ছাড়া, আজ সকালে বহির অশ্রুসিক্ত দুখানি দেখিয়া অর্থাৎ তাহার মনের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। একদম সাংসারিক সুখ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া সে তাহার মনকে মুখাইয়া জোর করিয়া কমলার দিকে একপ্রাণ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন হইতে তাহারই জন্য বহির হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা উপলব্ধি করিয়াছে, তখন হইতে তাহার মন লাভ ও ক্ষতির ন্যূনতন করিয়া হিসাব করিতে শুরু করিয়াছে। কাজেই যাহাদের লইয়া তাহার এই অন্তঃসন্দেহ, তাহাদের সাহচর্য অপেক্ষা যে নারীর স্বারা তাহার জীবনে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার সাহচর্যই স্পৃহনীয় মনে হইল।

চারিটা বাজিতে না বাজিতে পরেশ দাড়ি কামাইতে বসিল। কাল সামাইয়াছে, আজ কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু গালে হাত দিয়াই মনটা চুপচুপ করিয়া উঠিল। বহি বা কমলা জীবনে কেবল তাহারই সংগে থাকে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে; তাহা ছাড়া তাহার পঞ্জীগ্রামের নান্য যাক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহার শিক্ষা ও দীক্ষায় এমনই মগ্ন যে, তাহা চোরা না পোষাকের দ্রুত তাহাদের লক্ষ্যই হয় না। কিন্তু এ রোগটি আজন্ম শহরে বাস করিয়াছে, শিক্ষালাভ করিয়াছে, কত শিক্ষিত পাণ্ডিত্য ও স্ত্রী যুবকের সহিত মিশিয়াছে। কাজেই তাহার নসিকা-গুণ এড়াইতে হইলে ফিটফিট হইয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। দাড়ি কামাইয়া, সাবান দিয়া হাতমুখ ধুইয়া, ধোপদস্ত কপড় ও রক্তের পাঞ্জাবি পরিয়া শাল গয়ে দিয়া সে যখন বাহির হইতে উদাত, মন সময়ে মাসীমা কহিলেন, “শ্রীমতী কিজেনো ডেকে গেছে।” তাহাড়া চোখে ডাক্তারের বাড়িতে নেমেও কয়েক ঘণ্টা। অনানন্দকভাবে পরেশ কহিল, “আচ্ছা।” মাসীমা কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকিয়া থাকিয়া কহিলেন, “কোথায় চলেছিস এখন?” পরেশ কহিল, “একটু কাজ আছে।” মাসীমা কহিলেন, “শাবি ঠিক মনে করে, ভুলিস না।” পরেশ জবাব না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্কুলের সম্মুখ দিয়া যে পাকা রাস্তাটি পূর্বদিকে বরাবর চলিয়া গাছে, সেই রাস্তা দিয়া স্কুল পার হইয়াও মাইলখানেক গেলে, রাস্তার মীদিকে একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ির সদর-দুজা রাস্তার উপর নহে। পাকা রাস্তা হইতে একটি অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা বহির হইয়া বাড়িটার দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে; এই রাস্তা দিয়া কয়েক মিনিটেই প্রথমে পাড় বাড়িটার সদর-দুজা, তারপর আরও কতকটা গেলেই বাড়িটার গায়েই একটি ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ি দুইটির ভূতপূর্ব লোক—এ তরাটের একজন মনী বসতি ছিলেন। বসন্তের পনেরো পূর্ণ-মাসি গতস; হইয়াছেন। তাহার সন্তান ব্রজত মাত্র একটি কন্যা ছিল; বীর কলিকাতায় কোন এক মনী পরিবারে বিবাহ হইয়াছে। স্বামী ও মেয়েদেরা পাড়াগাঁয়ে পদার্পণ করা পণ্ডন করে না বলিয়া মেয়েটি এখানে নিতে পারে না। স্থানীয় একজন লোকের উপরে বাড়ি ও জমিদারির দায়িত্ব আছে। একতলা বাড়িতে হেডমাস্টার মহাশয় নমমার ভাড়া বাস করেন। বাড়িটির সম্মুখে বিস্তৃত মানের জা, পিছন দিকে এক ঘর চাষী কৈবর্ত ও বউরী-বাগদীর বাস। ইহারা সকলেই এই মাসের প্রজা।

পরেশ বাইকে চড়িয়া জিচের হেডমাস্টারের বাড়ির সামনে সিয়া উপস্থিত হইল। বারকয়েক ঘণ্টা বাজাইতেই একটি বৎসর ছয়ের ছেলে দরজার আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি বাবা বাড়িতে আছেন, থাকা?” ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলিয়া

চাহিয়া থাকিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িল। পরেশ মুখকিলে পড়িল। “মা আছেন?” বা “মাসী আছেন?”—অন্য করা যুক্তিমূলক হইবে কি না ভাবিতে লাগিল। ছেলেটি কাছে আসিয়া কহিল, “আমাকে অপনয় গাড়িতে একবার চড়িয়ে দিন না।” পরেশ কহিল, “উহু—গাড়ি চড়ানো চলবে না—তোমার মাসীমা বকবেন।” ছেলেটি চোখমুখ ঘুরাইয়া কহিল, “মাসীমা জানবেন কি করে? তিনি তো বাড়ির ভিতরে।” পরেশ কহিল, “জানতে পারলে বকবেন; তুমি তার মত জিজ্ঞেস করে এস।” ছেলেটি কহিল, “কি বলব?”

“বলবে ডাক্তারবাবুর গাড়িতে চড়ব?” ছেলেটি অবিশ্বাসের সুরে কহিল, “আপনি কিসের ডাক্তারবাবু—আপনার দাড়ি নেই।” পরেশ কহিল, “আছে লুকিয়ে রেখেছি। পরে পরব, দেখবে। তুমি যাও না।” ছেলেটি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সংগে সংগে ছেলের মাসী বাহির হইয়া আসিল। পরেশকে দেখিবার্য তাহার চোখ ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; নমস্কার করিয়া কহিল, “এসেছেন? আমি বিশ্বাস করতে পারি নি আসবেন বলে। আসুন আসুন।” সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া পরেশ লজ্জিতমুখে কহিল, “আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, আসব না? আমাকে ভাবেন কি?” মদু হাসিয়া আরতি কহিল, “কি ভাবি, পরে বলব।” বৈঠকখানায় পরেশকে বসাইয়া আরতি কহিল, “বসুন, আসি।”

আরতি আজ আসমানী রঙের ঢাকাই শাড়ি পরিয়াছে; সুপালি সজা দিয়া আধ-ফোটা পদ্ম ফুল তোলা পাড়; গায়ে ফিকে নীল রঙের ব্লাউস; পায়ে চটি; মাথায় লম্বা বেণী দলিতেছে। কাল লঠনের আলোতে বেশ ঠাণ্ডা হয় নাই, আজ দেখিল, বেশ ফর্সা রং, নোহা ছিপছিপে নয়—বেশ কোমল, (অবশ্য আদর্শ) মংস রেহ।

কিছুক্ষণ পরে আরতি ফিরিয়া আসিল; সংগে আর একটি মহিলা—ফর্সা রং, ছিপছিপে গঠন, মুখের চোরা মাঝামাঝি, বরস চিরশের কাছাকাছি। তাহাদের আসিতে দেখিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আরতি কহিল, “আমার দিদি—শ্রীমতী সুনীতি দেখা।” পরেশ নমস্কার করিল। মহিলাটিও নমস্কার করিয়া কহিল, “বাড়িতে রইলেন কেন? বসুন।” পরেশ বসিতেই সুনীতি ও আরতি বসিল। সুনীতি আরতিকে কহিল, “তোর জামাইবাবুকে ডক্টরে পাঠিয়ে দে।” আরতি চলিয়া গেলে সুনীতি কহিল, “উনি কদিন থেকেই আপনার সংগে দেখা করবেন ভাবছেন, সময় করতে পারেন নি। কাল খুদে ভাগ্যে আরতির সংগে আপনার দেখা হয়ে গেছে।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি কহিতে লাগিল, “আরতি কমান ধরেই ভুগছে, যেখানে ছিল সেখানের ডাক্তারদের দেখিয়েছিল—কোন ফল হয় নি। তাই এখানে চলে আসে। এখন কার্তিক ডাক্তার এতদিন দেখাছিলেন; বিশেষ কিছু ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বিনয়বাবুর কাছে আপনার প্রশংসা শুনে আরতির খুব ইচ্ছে আপনাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে। তাহাড়া কাল আপনাকে দেখে ওর নাকি বিশ্বাস হয়েছে আপনার হাতে ও সেরে উঠবে। আপনি যদি দয়া করে—” পরেশ প্রাণ করিল, “কি হয় ওর?”

সুনীতি জবাব দিল, “বুক ধড়ফড় করে, মনের মধ্যে কি রকম বে হয় বুঝতে পারে না, কখনও চোঁচিয়ে কাদতে ইচ্ছে করে—কোন কোন দিন সারাদিন গমে হয়ে থাকে, কারও সংগে কথা বলে না, সেইদিন মজ্জা হয়।” ঢোক চলিয়া কহিল, “আমি সব হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না, আপনি একবার নিজে জিজ্ঞাসা করুন।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “জীবনে কি কোন আঘাত পেয়েছেন?” সুনীতি কহিল, “আঘাত,” ঘাড় নাড়িয়া বিষম কণ্ঠে কহিল, “তা অবশ্য পেয়েছে। অতি অল্প বয়সে মা মারা যান। ওর বাবা আবার বিয়ে করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়পক্ষের দরগ সংসার নিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়েন যে, ওর গৌরব-বর করতে অবসর পাননি। ওর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ও ওর মাসীমা অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে মান্য হতে থাকে, লেখাপড়া শেখা ও যে বৎসর বি-এ পাস করে, সে বৎসর আমার মা মারা যান, তাতে আমাদের চোখে ও বেশি আঘাত পায়। কিন্তু ভারী শত্রু মোর ও; কোন আঘাতই বেশি দিন ওকে কবু করে রাখতে পারে না। ও বি-ট পড়তে শুরু করে থেকে এবং পাস করে এক মহৎস্বল শহরের স্কুলে চাকুরী পেয়ে কলকাতা থেকে চলে আসে। ও যে স্কুলে চাকরি করে, সেটি নতুন স্কুল, মেয়েদের বেড়িং নেই। স্কুলের কাছে একটা বাড়িতে শিক্ষয়িত্রীরা এক সংগে থাকে। ওর সংগে একঘরে আর একটি মেয়ে থাকত, ওরই নীচে কাল কলতা একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ও দেখে মেয়েটি গলায় দড়ি বিরে আত্মহত্যা

করেছে। সেই দেখেই ও মুজ্জিত হয়ে পড়ে, তারপর থেকেই এই রোগের লুপ্তপাত।”

অরতি আসিয়া কহিল, “পাঠিয়ে দিলাম দুখের মাকে।”

“মুশ কতক ভস্ম বস্তু আমি আস একটু” বলিয়া সুনীতি উঠিয়া চলিয়া গেল।

দুইজন দুপ করিয়া বসিয়া কহিল। থোকা আসিয়া কহিল, “আরাত মুখ হাতে দুই খাবারের খালা লইয়া হাজির হইল। একটা বড়ো চাকর আনিল। দুইটা কাচের গ্লাসে করিয়া জল। টোবলে নামাইতেই পরেশ কহিল, “ওরে বাবা। এ কি কাণ্ড করছেন!” অরতি আড়চোখে চাহিয়া মুঠা কহিয়া কহিল, “এমন কিছু সাংঘাতিক নয়—কাল তো প্লেট না খেতে পেতে দুঃখ করছিলেন।” পরেশ হাসিতে লাগিল। চাকর হাত ধুইবার জল আনিয়া হাজির হইল। অরতি কহিল, “উঠুন হাত ধুয়ে আসুন। জামাইবাবুর ক্ষিদেয় পেট চোঁচো করছে—লক্ষ্যের মুখ ঘুটে বলতে পারছেন না।” পরেশ চট করিয়া ভাতিয়া দড়িহায়া কহিল, “তাই নাকি? ভাতি দাড়খত।” বলিয়া হাত ধুইতে গেল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আপন বস্তু যখন না। ধীরেসুস্থে হাত ধোয়।” অরতি হান্যমুখে কহিল, “বারে। আপনার ক্ষিদে পারানই তবে ঘনঘন চোক গিলছেন যে।” হেডমাস্টার মুঠা হাসিয়া কহিলেন, “সকলও পেয়েছে, ভোক্তাও গিলছে, তবে সেটা লোকে নয়—মানসিক—সামনের খাবা খুব লোভনীয় কি না।” বলিয়া অথ সূচক চক্ষের ইঙ্গিত করিতেই লক্ষিত মুখে তজ্জন করিয়া অরতি কহিল, “ইয়ারাক হচ্ছে বীক। দেব দিদিরকে বলে—”

ভোয়ালে দিয়া মুখ দুই হাতে মুজ্জিতে আড়চোখে ইহাদের দিকে তাকিয়া পরেশের মন হেডমাস্টারের প্রাতি প্রবাবিত হইল। উঠিল।

পরেশ আসিয়া বসতেই অরতি কহিল, “এবার খেতে আরম্ভ করুন। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আর আমি?”

“বারে আপনারকে আবার বলতে হবে নাকি?” অত্যন্ত করুণচক্ষে তাকিয়া হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “বলতে হবে না? পূরনো বলে এমনই ফ্যালনা হয়ে গেছে? বেশ, নিজে হতেই খাচ্ছে।” বলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে সুরু করিলেন। অরতি একটা চেয়ারে বসিল। সুনীতি আসিয়া হাজির হইল, দুই হাতে দুই পেয়লা চা। পেয়লা দুইটা টোবলে নামাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়া থাকিয়া কহিল, “ওকি হচ্ছে। একেবারে ঘাড় গুঁজে ধরে চলেছে যে। পরেশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বও।” অরতি হাসিয়া কহিল, “রাগ হয়েছে।” সুনীতি জু, কুঁচকাইয়া কহিল, “কেন?”

“আমি ওকে খেতে বলি নি, অথচ পরেশবাবুকে বলেছি।” সুনীতি কহিল, “ওঃ! তাই ওই হচ্ছে আর কি বড়োবয়সে।” হেডমাস্টার কাঁটতে ঘাড় তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন, “কে বড়ো।” সুনীতি কহিল, “তুমি, আমার কে?” বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “বড়ো বই কি। পরেশবাবুকে জিজ্ঞেস কর দেখি, আমাকে বড়ো বলেন কি না।” পরেশের উদ্দেশ্যে কহিলেন, “হ্যাঁ মহাশয়, বলুন না।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “না। হেডমাস্টার চোখ ঠাণ্ডিয়া কহিলেন, “দেখছ।” বলিয়া টেটি দুইটা চাপিয়া এক দুটো পন্নীর দিকে তাকিয়া রহিলেন।

অরতি কহিল, “আপনার সাক্ষীকে আপনি আস দিয়েছেন। আমি বরাহি—আপনি বড়ো হয়েছেন, আপনার চুলের শতকরা পঞ্চাশটিতে পাক ধরেছে—আমি তো কাল আপনাকে দেখিয়ে দিলাম।” হেডমাস্টার মহাশয় পরেশেরাভে কহিলেন, “ধনু, চুল পাক ধরলেই বয়স হয় না—আমার মন একেবারে কাঁচা স্টেটসে—”

খাওয়া শেষ হইতেই অরতি কহিল, “হাত ধোবেন নাকি?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া ‘হাঁ’ জানাইল।

“চলুন”—বলিয়া সঙ্গে গিয়া অরতি পরেশের হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

আরাতের মুখ পরেশের মুখের পাশেই। তাহার চুল হইতে একটা মসৃণ স্বেদন নাকে আসিতে লাগিল। তাহার চিহ্ন ও মসৃণ গাল, ঘাড়ের পাশটা ও ব্র উসের সীমারেখার উপরে বৃক্কের কতকটা বহুদৃষ্টিতে দেখা বাইতে লাগিল। তাহার পূর্ণবিকশিত নারীদেহের মাদুরতাম সান্নিধ্য পরেশের মনের মধ্যে একটি ফিফা শোভা সঞ্চার করিতে লাগিল।

হাত ধোয়া হইলে অরতি তাহার বামবাহু হইতে বসানো তোরলেট

“আবার?”

“তিনি তো মাঝ আগেই মাঝা গেছেন।”

অরতি মৃদু, বিষম হাসি হাসিয়া কহিল, “আমারও মা মাঝা গেছেন, বাবা থেকেও নেই, মাসীমা বাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম আমি মাসীমাও বহুদর দুই হল চলে গেছেন।” কথাবার্তার বিষয়বস্তু বদলাইয়া দিবর জন্য পরেশ কহিল, “কতদিন চাকরি করছেন?” অরতি জবাব দিল, “এক বৎসরের চেয়ে কিছু বেশি।”

“ছাউ নিয়েছেন বাবু?”

“হ্যাঁ, শরীয়াত খুব খারাপ হতে লাগল। সেক্রেটারী মহাশয় বললেন—ছাউ নিয়ে শরীরা গেরে আসুন। কোথায় আর যাব? মাসীমা নেই—মোশামশায়ের বাড়িতে তো এখন বড়দিদিদের রাজত্ব—কাজেই দিদির কাছে এলাম।”

এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দোঁষের পরন আপনমনের সাহিত কহিলেন, “এই যে ডাক্তার আচার্য। এসেছেন দয়া করে! নমস্কার।”

পরেশও নমস্কার করিল। অরতি উঠিয়া দাড়িহাতেই হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “তুমি উঠলে কেন? বস, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।”

অত্যন্ত বিনীতভাবে পরেশকে কহিলেন, “একটুখানি আস ছা।”

অরতি কহিল, “আমিও যাসছি একটু, ডাক্তার আচার্য।” বলিয়া চলিয়া গেল। কিংবদন্ত পুর হেডমাস্টার মহাশয় আসিলেন; বয়স প্রায় পঞ্চাশ, গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল-শাম, দীর্ঘ দোহারা গঠন; মথার মাখখানে টিক পাড়িতে শব্দ, করিয়াছে, কিন্তু সামনের চুল পিছন দিকে উল্টাইয়া দিয়া টিক পাড়িতে ঢেঁটা করিয়াছেন। পরিচয় দ্বীত, স্ক্যানলের সাট, পায়ে চোটা, মুখের চেহারা ভারিই দরগের, কিন্তু প্রয়োজনমত গুরু, গান্ধী বা হোলকা হাসি দুই ফটাইতে পারেন। বসিয়া কহিলেন, “প্রায়ই ভারি আপনার সঙ্গে হাসাপাশ করে আস, কিন্তু এমনই কজের ভিত্তি যে, সময় হলে উঠতে পার না। কাল আরতি এসে বললে—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে দিনমাসের বাড়িতে। আপনাকে নেমস্তন্ন করে এসেছে। বিনয়বাবুর মেয়েটি কেমন আছে?” পরেশ কহিল “ভালই।”

“বিনয়বাবু, তাই বলাছিলেন—খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার।”

পরেশ কহিল, “আমাকে বরাবরই খুব স্নেহ করেন।”

“শুধু স্নেহ নয়—প্রশংসাও, মহাভক্ত একজন আপনার। মাকে মাকে এই নিয়ে খনখানাবাবুর সঙ্গে হাতাহাতি করে যার।” বলিয়া হেডমাস্টার

আগাইয়া দিল। পরেশ সন্তপণে ভোয়ালেটা তুলিয়া লইল; তারপর মুখ মুছিয়া ভোয়ালেটা ফিরাইয়া দিবার সময় অতিরিক্ত হাতে তাহার হাত ঠেকিল এবং সেই মুহূর্তেই আরক্ত হস্তোৎসর্গ চোখের সাহিত তাহার চোখ মিলিল।

ফিরিয়া আসিয়া চেয়ে বসিয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ স্নানাতিক কহিল, “আমাদের তো খুব খাওয়াছেন; নিজেরা তো কিছু খেয়ে না।”

হেডমাস্টার মশায় আহার সমাপনান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরতির দিকে চাহিয়া কহলেন, “আমার হাতে জল ঢেলে দেবে না?” আরতি বাড় নাড়িয়া কহিল, “না, আপনি নিজে খেন গিয়ে।” স্বর্গার দিকে তাকাইয়া হেডমাস্টার কহিলেন, “দেখ গো! কি রকম একত্রেখামি, এতে রাগ হয় না। তুমিই বল না।” স্নানাতিক কহিল, “নিজেই খাও না বাপু।” হেডমাস্টার কহিলেন, “বেশ। নিজেই খাই। কিন্তু হাত থেকে ঘটি পড়ে গিয়ে যদি পা ছোঁত যায় তো, চুন-হলুদ লাগিয়ে দিতে হবে আরতিকে।” আরতি ঋণাত্মক করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “দায় পড়েছে।” জনতরঙ্গ বাজনার মত কলকলর হাসি শুনিয়া পরেশর ঝুঁকি শিরশিবে করিয়া উঠিল।

স্নানাতিক স্বামীক কহিল, “তোমার চা রইল—আমি আসছি।” আরতিও বাহ্যিক উপস্থিতি হেডমাস্টার কহিলেন, “চল যাক্‌ যো!” আরতি খমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যাশী সহকারী কহিল, “কি করতে হবে?” হেডমাস্টার কহিলেন, “কিছু না, চা খব, বসে বসে একটু দেখবে না।” “দায় পড়েছে” বিনীত মুখের অপসরণ ভঙ্গী করিয়া আরতি চলিয়া গেল।

হেডমাস্টার মশায় চা খাইতে খাইতে কহিলেন, “ছেলেমানুষি দেখে কিছু মনে করবেন না। এককম করলে ওর মনটা ভাল থাকে। না হলে গুন হয়ে বসে বসে কি ভাবনা।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “কাজ যেন অনেকটাই হালকা ভাল দেখাইছে।”

পরেশ কহিল, “সেজ্ঞাতে নিয়ে যান না কেন?” “আমার তো সময় হয় না, আমার স্বর্গারও ভাই। তবে থোকাকে নিয়ে ও কাচা ছি মাঠে একটু ভোয়ালেটা করে।”

পরেশ মশায় হজ ডেলে চলিয়া আসিয়া উপকার হতে পারেন।” হেডমাস্টার চিন্তিতমুখে কহিলেন, “সেই, কাজের ভিড়টা কেটে যাক্—বড়দিনের ছটিতে নিজেই চেষ্টা করব।”

থোকা আসিয়া হাজির হইল। বাবার কানে কানে বলিল অলম্বা পরেশও শুনতে পাইল। “মা বললেন, বেরাতে যাবেন।” থোকায় থাকা কহিলেন, “ভাঙারবারে রসেলেন, ওকি ফেলেন?” পরেশ কহিল, “তাতে কি আর হয়েছে। আমার মিস মিটার সম্বন্ধে যা যা জানা দরকার জেনে নিইছি—একটু ভেবে-চিন্তে শুধরে ব্যবস্থা করে দেব। কাজেই আমি এখন বাড়ি চলে।” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মশায় কহিলেন, “আপনার কি বাড়িতে বিশেষ কাজ আছে?” পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, “না, কাজ আর কি—”

“তা হলে চলুন না—একটু ঘুরে আসা যাক।” “বেশ, চলুন।” বলিয়া পরেশ বসিল।

হেডমাস্টার মশায় থোকাকে কহিলেন, “যাও, বাড়িতে বলগে—উঠার সব ও যাবেন।”

আরতি ও স্নানাতিক বাহির হইয়া আসিল—কেশ-বেশ প্রায় পূর্ববৎ; বাড়তি—গায়ের রঙিন স্কার্ফ ও পায়ে হিল-তোলা জুতা, সকলে বাড়ির বাহির হইল—থোকাকে লইয়া মেসোরা আগে, পরেশ ও হেডমাস্টার পিছনে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া মেসো চলিল। কিছুদূরে গিয়া রাস্তা আরও স্পষ্ট হইয়া আসিল, ডানদিকে সারি-সারি লিশের বাড়ি, বামদিকে গভীর ক্ষেত। আরও কিছুদূরে গিয়া তাহার মাঠের মধ্যে পড়িল; সর, আইলের পথে দুইজন পশাপাশি যাওয়া যায় না। তাহার লম্বা সারি বাধিয়া চলিতে লাগিল। তাহারে জান ও বাম দুইদিকেই সব, গম ও সারিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত—সব ও গমের গাছ শিশু আসিয়াছে, সারিয়ার ক্ষেতে অজস্র সরিয়া-ফলে ফুটিয়াছে; এক-একটা দীরবার ক্ষেত যেন এক-একটা হিরণ্যবর্ণের বিস্তৃত কোম্পট। মাঠ পার হইয়া তাহারা একটা আম-কাঠালের বাগানে গিয়া পেশিছিল; গাছে-গাছে কুলান-প্রভাগত পখীসর কলরবে সারা বাগান মগ্নহিত। বাগানের একধারে একটা পুকুর, চারি পাড় বাবলা গাছের জঙ্গল। পুকুরটার পাশেই একটা চালাঘর; জৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে যখন আম-কাঠালের গাছে ফল ধরে, মালী মাস তিন-চার ধরিয়া ঐ ঘরটিতে বাস করে।

যমুনের বাঘ দিয়া একটি সন্ধ্যা পারের-চল্য পথ বাগান পার হইয়া

ওপারের মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। সেই পথ ধরিয়া সকলে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা বদল হইয় ছিল—হেডমাস্টারকে থোকা টানিয়া লইয়া গিয়া মায়ের সাহিত মিলিয়া দিয়াছিল, আরতি পিছনে পড়িয়া পরেশের পশ্চাবাতনী হইয়াছিল।

আরতি বোধ হয় পাড়াগাঁ অনেকদিন দেখে নাই; অবদারের সুরে হঠক রকমের প্রশ্ন করিয়াছিল—ও গাঘাটা কি? ও ফুলটা ভারী সুন্দর তো! কি ওর নাম? কেমন চমৎকার একটা পাখী উড়ে গেল দেখলেন! কি নাম বলুন দেখি ওর? ইত্যাদি ইত্যাদি। পরেশ যথার্থো প্রশ্নের উত্তর দিতোহল। এই সুন্দরী মেয়েটির সাহচর্য বিস্ম, বিস্ম, রসকরণ করিয়া তাহার হৃদয়-পাথ ভরয়া দিতেছিল।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাহতেছে; সারা আকাশটা আবারের মত সাদা; পূর্ব দিগন্তে ঘন কুহেলিকায় অস্পষ্ট; ভিজা মাটির সম্পর্শ হওয়া কনকনে তাত হইয়া উঠিয়াছে। আরতি সবুজ রঙের স্কার্ফটি ঘনতর করিয়া জড়াইয়া কাঁহল, “শীত করাছে।” হেডমাস্টার ও স্নানাতিক অনেকটা দূরে আগ হরা গিয়াছিল। আরতি পরেশকে কহিল, “জামাইবাংকে জামুন না।” পরেশ কহিল, “ওর পুরা নাম তো জানি না।” সন্ধ্যাে দুই চোখ বড় করিয়া আরতি কহিল, “আজ্ঞা মানুষ তো আপনি! এতক্ষণ আলাপ করলেন, ভাল করে নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া না জানাইল।

“এর আগে বাঁধ আলাপ ছিল না?”

পরেশ লাজতমুখে কহিল—না—

“কিন্তু ডান তো আপনার সব জানেন।”

“তাই তো দেখাছে।” চোক গিয়ায় কহিল, “ওর পুরা নাম কি?” আরতি গম্ভীরমুখে কহিল, “হাবলচন্দ্র বোস—ডাকুন ওই নাম ধরে।” পরেশ হাকিল—“হাবলবাং!” হেডমাস্টার মশায় সাদা দিলেন না। পরেশ কহিল, “সাদা দিচ্ছেন না তো?” আরতি জু দাঁট কিংবৎ তুলিয়া কহিল, “আপনি ডাকতে পারছেন না—বেশ ফালসু পরো ডাকুন দেখা।” পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “সে আবার কি।” আরতি হাস চাপিয়া কহিল, “জানেন না—ডাকার মত ডাকলে সবার ভগবান পথ্যত সাদা দেন—আমাদের হাবলবাং, তো সামান্য মানাখা। আর একবার ডাকুন দেখি বেশ করে।”

পরেশ ভতকতে ডাক দিল, “হাবলবাং—উ—উ—” কোন সাদা মালিল না। আরতি ডাকিল, “দিদা।” স্নানাতিক কহিল, “বালিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল—হেডমাস্টারও দাঁড়াইলেন। আরতি কহিল, “পরেশবাং, যে জামাইবাংকে ডাকলেন, শুনতে পাচ্ছে না?” দুইজনে কহিল। কাছ আসতেই আরতি কহিল, “কত-নিগমীর কি এমন আলাপ হইছিল শুন, যে একজন ভরলোক ডাক দিলেও শুনতে পান না।”

হেডমাস্টার মশায় লাজতমুখে পরেশকে কহিলেন, “ডাকছিলেন নাকি! শুনতে পাই নি—মাাপ করবেন।”

পরেশ কহিল, “তাতে আর কি। চলুন এর পর ফেরা যাক।” আরতি কহিল, “না না, এখনই না—চলুন ওই পুকুরটা দেখিগো।”

হেডমাস্টার কহিলেন, “না না, এখন আর পুকুর দেখতে হবে না—অশ্কার হাচ্ছে—নাড়ি চলা।” আরতি ঠোট ফুলাইয়া কহিল, “বেশ চলুন।” পরেশ কহিল, “তাই একবার চলুন না, হাবলবাং। যখন দেখতেই চাচ্ছেন।” হেড মাটির বিনীত হসো কহিলেন, “দেখুন আমার নাম হাবলবাং নয়, অলম্বা আপনার যদি ওই নামই আমাকে ডাকতে ভাল লাগে তা ডাকতে পারেন।” ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, “তাই নাকি। তবে যে উনি ‘লললল’—হেডমাস্টার ব্যাপারটা বুঝতে পারিরা কহিলেন, “ও ঠিকই বলেছে; ওর নিজের নাম হাবল।” কিনা—সে দিক দিয়ে আমাকে হাবল বলে ডাকাই উচিত, তবে আমার পিতৃদত্ত নাম—সত্যোদ, পদবা যোস।” আরতি ঝংকার দিয়া কহিল, “বা রে। আমার সঙ্গে কি? আমি তো ওকে ঠিক নামই বলেছিলাম। উনি বললেন, ওর চেহারা দেখে অত বড় নাম বলে মনে হচ্ছে না—ওর নাম নিশ্চয় হাবলবাং।”

পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “হই, আমি তো তা বলি নি।” স্নানাতিক কহিল, “ওর কথা ছেড়ে দিন পরেশবাং! ওই রকম।” আরতি আভ্যাসের সুরে কহিল, “বেশ। আমারই সা দেখা।” বলিয়া গট গট করিয়া পুকুরটার দিকে চলিল। স্নানাতিক কহিল, “কোথায় ঘাচ্ছ?” আরতি নীরস কণ্ঠে জাব দিল, “দেখতেই তো পাচ্ছে পুকুরে।” স্নানাতিক কহিল, “না না, আজ আর না।” আরতি চলিতে লাগিল, বাঘা হইয়া সবলে তাহর অনুসরণ করিল। সত্যেনবাবু কহিলেন, “রোহিণীর মত জলেই ডুববে নাকি? অবশ্য গোবিন্দলাল কাছেই হাজির—ফাট এডের

শারদীয় উৎসবে

রূপ-সাধনার

প্রধান অর্ঘ্য



শ্রীকল্যাণ

মহাসুগন্ধি কেশ তৈল

ডেম কেমিক্যাল : কলিকাতা

ফিরিয়া হইবে না।" বমাকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইয়া আরতি তাঁক্ষকণ্ঠে কহিল, "কি বললেন?" ডাক্তারী বিদ্যার সহিত ডাক্তারকে যত্ন করিয়া আরতি বস্ত্রাবর অন্য রকম অর্থ করিয়াছে বাকিয়া সত্যেন্দ্র ভাড়াভাড়ি কহিলেন, "বলছি রোহিণীর চেতনা সত্যের জন্য গোবিন্দলল যা যা প্রক্রিয়া করিয়াছিল—সব ঠিক ঠিক করবার জন্য আম প্রস্তুত।" আরতি মুখ ফিরাইয়া বাড়ির দিকে চলিল।

কৃষ্ণত নীল আকাশ হইতে তরল অন্ধকার করিয়া করিয়া পৃথিবীর বুকে জ্বলিতে শুরুর করিয়াছে। দূরে মাঠের মধ্যে কতগুলো শৃগল ঢাকিয়া উঠিল, পুকুর হইতে কয়েকটা বক সোঁ সোঁ শব্দে উড়িয়া আসিয়া একটা গাছের তলে বসিল; কিংবা পোকার একটানা একতান কানের মধ্যে সূতের মত বিধিত্তে লাগিল।

বাড়ির সামনে আসিয়া পরেশ কহিল, "আমি এবার চলি, নমস্কার।"

সত্যেন্দ্র কহিলেন, "তা কি হয়। এক কাপ চা খেয়ে যান।" পরেশ কহিল, "থাকগে।" আরতি কহিল, "আসুন না।" পরেশ কহিল, "অনেকক্ষণ বিরক্ত বরলান আপনাদের।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "চন্দ্রনন্দন, কোন দরকারী কাজ নেই তো?"

চা খাইয়া আরতির গান শুনিয়া পরেশ যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য উঠিল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কহিলেন, "মাঝে মাঝে আসবেন দয়া করে।" সুনীতি কহিল, "মাঝে মাঝে নয়—কাল নিশ্চয় আসবেন।" পরেশ সাহসে কহিল, "নিশ্চয় আসব—বলতে হবে না।"

আরতি মুখে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার আরতি চোখের চিত্তময় দৃষ্টি নীরব আমন্ত্রণ জানাইল।

(২০)

পরেশ বাইকে উঠিল; পরিচিত পথিক বিরল পথে আলোর প্রয়োজন হইল না। কৃষ্ণপক্ষের ঐ রাত্রি; আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু অজস্র তারা জ্বল জ্বল করিতেছে, তাহাদের সমবেত ক্ষীণ আলোতে কালো ঘন অন্ধকার একটু ফিরাও ও তরল হইয়া উঠিয়াছে। বাম দিকে দিগন্ত বিস্তারিত ঘনের মাঠ; মাঠের উপর পাতলা খোয়ার মত কুয়াসা জমিয়া উঠিয়া দৃষ্টি-থেকে যোধ করিতেছে। বাতাসে ভীষণ শীতলতা। দূর মাঠের মধ্যে আলোয়া দৃষ্টিতে ও নির্বিকারে। স্থান দিকে বাড়িপাড় হইতে একটা বুকুর মাগত চাঁৎকার করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ধরেই একটা শূকরপ্রায় ছোট পুকুর হইতে পচা ঘাস ও পাতার কাশালো গন্ধ অনেক দূর পর্যন্ত পাতাল ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

পরেশের বাহা-হাঁদিরগুলির মধ্যে কিছু বোধশক্তির যোগাযোগ প্রস্তুতি স্থিত হইয়াছিল। কারণ তাহার মন একান্তভাবে আরতির চিন্তায় পন হইয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া সে হাসিয়াছিল, কেমন করিয়া কথা লিখিয়াছিল, কেমন করিয়া চল করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কেমন করিয়া সুনীতি ও সত্যেন্দ্রকে এড়াইয়া তাহাকেই সঙ্গদান করিয়াছিল, তাহা আরতির ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করিয়া সে তাহাদের তাৎপৰ্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার সহিত আরতির মত কয়েক ঘণ্টার পরিচয়, তবু হার মধ্যেই আরতির ব্যবহারে প্রিয়-বান্ধবীর সুর লাগিয়াছে। আরতি গিয়াছে, দেখা হইবামাত্র যাহার-তাহার সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করা তাহার স্বভাব এবং সেই বন্ধুত্ব যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এতখানি রসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আরতির বন্ধুত্ব একতর পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা গণনা করার জন্য রীতিমত আদর্শমারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য তাহার সহিত আরতির ব্যবহার তাহার পাইকারী ব্যবহার হইতে পৃথক ওরই সম্ভব। কারণ আরতি তাহার চিকিৎসাধীনে থাকিতে চায় এবং চিকিৎসকের প্রতি রোগিনীদের ব্যবহারে কিশোর পক্ষপাত্ত থাকেই। নিজের হৃদয়ে নিরাবরণ করিয়া তাহার চক্ষের সামনে ধরিয়া দিতে হয়, তাহার হিত ব্যবহারে চুল-চেরা কায়দা-কানুন বজায় রাখা নেহাৎ গম্ভীর প্রকৃতির হয়েদের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আরতিই মত খালা মেজাজের মেয়ের জ কথাই নাই।

অবশ্য আরতির এখনও সে চিকিৎসা করে নাই। তবু ইহার মধ্যেই তাহার আচার ও আচরণে যে নান্দ্রের আবেশ দেখা দিয়াছে, রীতিমত চিকিৎসা করার পর তাহা যে কত গড় হইয়া উঠিবে ভাবিয়া পরেশের মন লোচক হইয়া উঠিল।

হঠাৎ 'জড়' করিয়া শব্দ হইল, মৃদুতের জন্য পদে পদে সন্ধি মাইল। চেতনা পাইয়া বসিল যে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। ডাক্তারজি উঠিয়া

দাঁড়াইয়া গানের ধলা কাড়িতে কাড়িতে কতকটা অগ্রসর হইতেই দৈবিক, দুইটা বাইক জড়াজড়ি করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে এবং ঠিক ওপাশেই আর এক কাড়ি তাহাই মৃত গানের ধলা কাড়িতেছে। পরেশ কহিল, "মশায়ের কি খবর পেয়েছে?"

উত্তর হইল, "আজ্ঞে না। আপনার?"

"আমারও না। মশায়ের নাম?" লে.কটি দুই হাত কচলাইয়া কহিল, "আমি জগদীশ—কর্তা ডাক্তারের কম্পাউন্ডার।" পরেশ মৃদুপ্রিয়ানার সহিত কহিল, "ও এত অন্ধকার রাত্রে একটা আলো আন নি কেন?" সাইকেল দুইটার হাতল ছাড়াইতে ছাড়াইতে জগদীশ কহিল, "আপনিও তো নেন নি।" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা বটে। তবে আমি বিকেলে বেরিয়াছিলাম কিনা, এত রাতি হবে জানতাম না।" নিজের গাড়ীটি তুলিয়া লইয়া পরেশ কহিল, "কোথায় চলেছ?" জগদীশ কহিল, "আপনার কাছেই। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন।" পরেশ লজ্জিতভাবে কহিল, "এই দেখ, একবারে ভুলে গেছি। আজ তোমাদের ওখানে নেমস্তন্ন ছিল, না?" জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু তাই বলছিলেন—বোধ হয় ভুলে গেছে। তা' এত রাতি পর্যন্ত ওখানে?" পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, "এমনই। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম—আগে তো আলো ছিল না, আজই হ'ল। বেশ লোক—।" জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা বটে। গিয়াঁমা কিন্তু সেই সম্মা থেকে ছটফট করছেন—কতবার যে লোক পাঠালেন আপনাদের ওখানে। আজ ওর মা এসেছেন কিনা—সে নাকি দেখতে চাচ্ছেন। আপনি যে কোথায় গেছেন, তা তো আপনার মাসীমা বলতে পারেন নি। বললেন শূন্য, সেজেগুজে কোথায় বেরিয়ে গেছে। শেষে আমাদের কাল ঘনু বললে যে, আপনি হয়তো হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে গিয়েছেন। তখন ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, জগদীশ! দেখতো বাবা, একবার। আমিও বলবামাত্র এক লাফে—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "তোমারও নেমস্তন্ন অছে বাকি?" জগদীশ কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িতে খাওয়ানো দাওয়ানো হলে আমার একপাত বাধা—"

"তোমার খবর কিদে পেয়েছে বাকি?"

জগদীশ দাঁতি বাহির করিয়া হাসিল, অন্ধকারের একটানা কালো পদীর উপর যেন একটি ছুস্বেত-বিদ্যারণ্যের দেখা গেল। কহিল, "খা বলেছেন। কোন দুপুরবেলা খোয়েছি। তারপর বিকেলে এক কাপ চা ছাড়া তো আর কিছু পেটস্থ হয় নি।"

সাম্বন্ধ্যর সুরে পরেশ কহিল, "তোমাকে মিহেমিহি কণ্ট দিলাম। পাড়গিয়েতে তো কথা বলবার মত লোক পাওয়া যায় না। একজন মনের মত লোক পেলাম, গল্প করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল।" জগদীশ কহিল, "তা হোক, তা হোক। আমাদের ডাক্তারদের কি এত খাই-খাই করলে চলে? কত দিন যে খাড়া উপোস করে কটাতে হয়। এই দেখুন না সেদিন—"

পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "আমি বে হেডমাস্টারের কাছে গিরে-ছিলাম—ঘনশ্যাম ককা জানলেন কি করে?" জগদীশ কহিল, "ও সব জানতে পারে। ওই যে দেখেন ঘাড়টি বাকির বাকিরে চলে, ওর পেটে অনেক বিদ্যা।"

ডাক্তারের বাড়ির সামনে হাজির হইতেই জগদীশ কহিল, "আপনি ডিসপেন্সারিতে যান, আমি বাড়িতে খবর দিইগে।"

ডিসপেন্সারিতে কার্তিক ও ঘনশ্যাম বসিয়াছিল। পরেশকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "এই যে বাবাজি! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জগদীশের সঙ্গে দেখা হল?" পরেশ বসিতে বসিতে কহিল, "দেখা হয়েছে।" ঘনশ্যাম ভুরু নাড়িয়া কহিল, "কোথায় ছিলে বল দেখি?" পরেশ কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে।" ঘনশ্যাম আঁকিয়ারা উঠিয়া কহিল, "এঁা!" বলিয়া মিনিট কয়েক চোখ দুইটা স্থির করিয়া দিয়া মুখটা আধ-হাঁ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, "ওর সঙ্গে আলোচ আছে নাকি?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আগে ছিল না, আজ হল।"

"কি করে?"

"উনি নেমস্তন্ন করেছিলেন।"

বিস্ময়চক্রে জগদীশ কহিল, "নেমস্তন্ন! কেন?" পরেশ জবাব এড়াইয়া বাহিরের ভগ্নীতে কহিল, "কি জানি।" টেটি দুইটা চার্গিয়া ঘনশ্যাম উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "শ্যামকে দেখান নাকি?"

"তখন মানে?"

রূপনারায়ণপুর স্যানাটোরিয়ায়

নিজস্ব একখানি বাড়ী

রূপনারায়ণপুর (ই আই আর)
স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে কোম্পানী
কর্তৃক নামমাত্র ব্যয়ে টিমারী
করাইয়া বাংলা দেশের সুবিধা ও
সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যপ্রদ
আবহাওয়া উপভোগ করুন।

মোট জমির আয়তন প্রায় হাজার
বিঘা—প্রতি বিঘার মূল্য ৩২৫
হইতে ৬০০ টাকা পর্যন্ত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মণিময় প্রামাণিক

ইউনিয়ন ইনভেস্টমেন্ট
লিমিটেড

৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস
১০২, ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কাল ৫৭৭৮

জুয়েলার্স ওয়ার্কস
১৩ ওয়াচ লেন

ফোন-সাঁউথ
১৬৩৯

প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় যেখানে
নতুন নতুন ধরনের জিনিস
তিয়াদী হইতেছে

আপনার মনেরমত জিনিস
পাইতে হইলে আজই সেখানে
যোজ করুন

২০নং
কালীঘাট
রোড
ডুমুরীপুর

শোক্রম :
১৬৯ নং
রাসা রোড

ন্যাশনাল জুয়েলার্স ওয়ার্কস

সুবারবন ব্যাক্স লিমিটেড

হেড অফিস---২২নং ষ্ট্রাও রোড, কলিকাতা।

শাখা অফিস

ঢালা, দমদম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর।

ফোন :—

কাল : ৪৮৬১



ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

মিঃ বি, সি, দাস, এম, এ; বি, এল।

“মানে—ঐর শালীর কি যে আজগবী রোগ হয়েছে শুন।”
পরেণ গম্ভীর হইয়া কহিল, “না।”

চাকর হরি আসিয়া খবর দিল, জামাইবাবুকে বাড়িতে ডাকছেন।
ঘনশ্যাম কহিল, “হাও, বাবা, হাও।” চাকরের পিছনে পিছনে পরেশ
বাড়ির ভিতরে আসিয়া হাজির হইল।

বারান্দার বসিয়াছিলেন একজন বিধবা; কাতিক ডাক্তারের শাশুড়ী;
নয়স ঘাটের উপর, রং ফসী, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছুটি,
মাথায় স্বল্প অবগঠন, আসনপাড় হইয়া বসিয়া আছেন;
হাতে হারিনামের ঝুলি, ট্রেট দুইটি নড়িতেছে। তাঁহার
সামনে খুচি টেস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী। কমলাও
বসিয়াছিল, পরেশকে দেখিবামাত্র দড়দড় করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গাশের
ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরেণকে দেখিয়া শ্রীমতী গালে হাত দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল
“খনি ছেলে ভূমি ভাই! কেথায় গিছলে বল দেখি বুঝাবন আঁহার
করে? আমাদের রাই খনী যে ভেবে ভেবে সারা হ'ল।” পরেশ
লজিত মুখে হাসিতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, “জুতো খলে প্রণাম কর
ক—তোমার দিদিমা।” পরেশ জুতা খুলিয়া প্রণাম করিতেই বৃন্দা
হারিনামের ঝুলি তাঁহার মাথায় ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন, “বোঁটে থাক
ভাই! আমাদের কমলাকে নিয়ে তুমি জন্ম রাজত্ব কর—বস ভাই।”
পরেশ অদূর ঘাটের উপর বাঁসতে বাইবেই শ্রীমতী কহিল, “না হে,
কহেই বস। দজনে আনাশ হোক।” হাকিল, “এই কমলা! একটা
মাদুর পেতে দিয়ে যা না তোরা একট।” কমলা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া
ছিল—মৃদু, তরুণীর সহিত কহিল, “পারব না।” পরক্ষণেই মাদুর
হাতে নতমুখে আসিয়া নতমুখেই মাদুর পাতিয়া দিয়া নতমুখেই চলিয়া
গিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কমলা আর নীলাম্বরী শাড়ি পারিয়াছে—রূপালী পাড়, লতনের
অঁপাকে কমলায় করিতেছে। কালো চুলে পরিপাটি করিয়া কবরী
রচনা করিয়াছে। রূপালী কটিপাকার টিপ পরিয়াছে। কাছে আসিতেই
কণের নীচ ও ঘাড়ের পাশটা দেখা গেল; চুল হইতে একটি মিটগল
নাকে আসিল। আকর্ষণ কথা মনে পড়িল পরেশের।

শ্রীমতী গম্ভীর কমলার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া পরেশের
দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “অভিমান হয়েছে।” পরেশ মৃদুস্বরে কহিল,
“তাই নাকি?” শ্রীমতী চোখ মুখে ঘুরাইয়া কহিল, “হাঁ হে, তাই।
বলেছে—কলো রূপ আর দেখব না, কলো বসন পরব না, কালিন্দীর
কালো জলে আর নাইব না—” দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, “নাভজামাই
কি আমার কলো, যে ও কথা বলেছে? সোনার গোরগেলের মত রূপ—
ওর কলো কমলা! যেন চাঁদে কলক।” শ্রীমতী পরেশের পানে কটাক্ষ
হানিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, “আর বলো না দিদি! এমনই মনে পাওয়া
যায় না, ওই সব কথা শুনলে তো অহংকার আর পা পড়ব না।” পরেশ
কহিল, “সে কি দিদিমা!” শ্রীমতী ধারালো স্বরে কহিল, “হাঁ ভাই,
মিডা কথা! তোমার মত লোকের মনে পাওয়া আমাদের মত পাড়াগায়ে
মুখ্য মেয়ের কর্ম নয়। যারা ন্যাকপড়া জানে, ফেরা দিয়ে কাপড়
পরে, নাচ গান জমেন, মানা গেথে বাস্তু, প্রাণেশ্বর বলে গলায় পরিয়ে
দিতে পারে, তাদেরই আমাদের ভাল লাগে।” পরেশ সন্দেহের স্বরে
কহিল, “কি ব্যাপার বলুন দেখি?”

কণকর দিয়া শ্রীমতী কহিল, “সে অনেক কথা, ভাই! তীক্ষ্ণ-
দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কোথায় গিছলে বল
দেখি?” পরেশ কহিল, “একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম—”

“কোথায়?”

পরেণ বিরক্তি চাপিয়া কহিল, “স্কুলের দিকে, হেডমাষ্টার মশায়ের
সঙ্গে আলোচনা হ'ল, উনি টেনে বাড়ি নিয়ে গেলেন।” মুখ টিপিয়া হাসিয়া
শ্রীমতী কহিল, “টেনে নিয়ে গেলেন বলে কি রাত দশটা পর্যন্ত টেনে
রাখলেন?” পরেশ জবাব দিল না। শ্রীমতী কহিল, “হেডমাষ্টারের
শুনিয়ে একটা ছুঁড়ি শালী আছে, তার সঙ্গে দেখা হ'ল নাকি?” পরেশ
নিরসকণ্ঠে কহিল, “হ'ল বই কি?” মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল,
“যে ভাল লাগল দেখি?” দিদিমা কহিলেন, “তুই বগড়া করছিস কেন
ভাই? দু'দিন পরে যার হবে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে দে। ওলো,
ও কমলা! আর না এখন; এখন থেকে অত লজ্জা করতে হবে না।”

ডাক্তারগৃহিণী আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া গম্ভীর
হইয়া কহিলেন, “এই যে বাবা! এসেছে? এত রাত হ'ল? তোমাকে

দেখবার জন্যে মা কতক্ষণ থেকে ছুটফুট করছেন। কোথায় ছিলে
এতক্ষণ?”

পরেণ কহিল, “হেড মাষ্টার মশায়ের ওখানে।”

ডাক্তারগৃহিণী দু'হুটি কুচকাইয়া কহিলেন, “ওঃ!” শ্রীমতীর
দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “মাসী! কমলা কোথায় গেল?” শ্রীমতী মুখ
ও চোখের ইশ্টিত করিয়া কহিল, “ওই যে ওখানে। মেয়েকে লেখাপড়া
শেখাতনি, টং-টাংও শেখাতনি যে, দেখবামাত্র পুরুষের গায়ে ঢলে পড়বে।
দেখ গিয়ে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”

মাসী-বোনকে চোখে চোখে বাতী বিনিময় হইল। বোনাকি হাকিল,
“ও কমলা! এদিকে আয় দেখি, খাবার সাজাগে যা, আমি কিছু করতে
পারব না বলেছিলাম।” চাকরের উদ্দেশ্যে কহিলেন, “ওরে, কোথায়
গেলি? এখনও এলো না যে! ডেকে নিয়ে আয় গো।” শ্রীমতী
কহিল, “মারেটীতে কি হ'ল আজ?” কাতিকগৃহিণী কহিলেন, “আমাকে
আজ কিছু করতে দেবে না বলেছে, রামা-বামা, খাওয়ানো-দাওয়ানো সব
নিজে করবে। একটু দেখিয়ে দিতে গেলাম তো বললে, না মা, তুমি
কিছুটি বলতে পারো না। সব নিজে রেখেছে আজ, তা পরিবেষণও
নিজেই করুক—আমি কেন করতে যাব?”

কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।
বৃন্দা কহিলেন, “তোকে কেন করতে হবে? ওই করুক—
আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম করুক।” বুলি নাচাইয়া কহিলেন, “মেয়ে-
মনুষ্যের তো ওই হ'ল আসল কাজ—স্বামী-পুত্রকে, আত্মীয়জনকে
নিজের হাতে রেখে খাওয়ানো—নেকাপড়া শিখে শামলা পরে কাহার
যাওয়া তো নয়? আমাদের সময়ে ওসব কোন দিন শুনিনি, আজকালই
হয়েছে—”

শ্রীমতী কহিল, “শয় লেখাপড়া নয়, পাশ করছে, চাকরী করছে।
আমাদের গায়ের হেডমাষ্টারের একটা শালী এসেছে—ছুঁড়ি নাকি বি এ
পাশ, জুতো পরে গটগট করে হাঁটে, ফরফর করে ইফরিজ বলে, আর
পুরুষ দেখলে জোকের মত কানড়ে ধরে।” পরেশের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ
করিয়া ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “কিন্তু আজকালকার ছেলেকের
ওই রকমই পছন্দ! শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েকে ঘনে ধরে না তাদের।”
কণস্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, “কত লোকের মাথা খেয়ে যে জিবে ওদের
চড়া পড়ে গেছে খবর নিলেই চিত্ত চমকায় হয়ে যাবে। তখন বুঝবে
মজাটা!” বলিয়া চোখের কোণে বিদ্রূপ হানিয়া সবগে মুখটা ফিরাইয়া
লাইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শ্রীমতী পরেশকে কহিল, “আমাকে ফেলে কেও
না হে! সঙ্গে করে নিয়ে যেও, বুনলে?”

ঘনশ্যাম ও জগদীশ চলিয়া গেল। পরেশ কাতিক-ডাক্তারের
সহিত গল্প করিতে লাগিল।

কাতিক কহিলেন, “হেড মাষ্টার মশায় শালীর সম্বন্ধে কিছু
বললেন নাকি?”

পরেণ কহিল, “অসুখের কথা বলিছিলেন।”

“পরীক্ষা করে দেখলে নাকি?”

“না।”

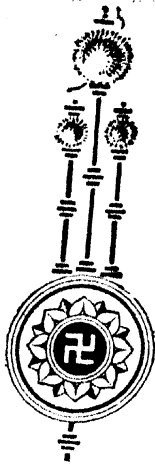
কাতিক কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, “আমার মনে হয়, শরীরের চেয়ে
ও মোমোটির মনের রোগই বেশি। এত বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হয়নি,
দেহের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা ওয় মিটেছে না, তারই এটা
স্বাভাবিক প্রতিফল।”

পরেণ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, “আমাদের সময়ে ব্রাহ্ম খৃষ্টানদের মেয়েরা
অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করত, হিন্দুদের মধ্যে
এ রোগাজ ছিল না। আজকাল শূন্য, হিন্দু মেয়েরাও অনেক বয়স
পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করছে।” পরেশ কহিল, “বিশেষ
করে পূর্ববঙ্গের মেয়েরা, শিক্ষার দিক দিয়ে ওরা খুব উন্নত করেছে।
শুধু বি এ, এম এ পাশ করে মাষ্টার আর প্রফেসরি করছে না—অনেকে
মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হচ্ছে। আমাদের সঙ্গেই একটি
মেয়ে পাশ করেছিল—সে এখন কলকাতার কোন একটা হাসপাতালে বড়
চাকরি করছে।”

“বিয়ে হয়েছে মেরেটস?”

“জানি না।”



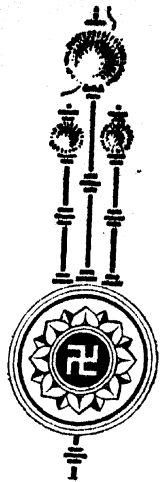
“সুপ্রা”

**ফাউণ্টেন পেনের
কালী**
অতিশয় রাসায়নিক
দ্বারা প্রস্তুত

সর্বপ্রথম ভারতীয় কালি

- ⊗ সুপ্রা কালি যে কোনও কালি অপেক্ষা কলম দ্বিগুণে দ্রুত প্রবাহিত হয়।
- ⊗ কলম বা নিবেব কোনরূপে অক্ষত থাকে না। এই কালিতে কলম পরিষ্কার থাকে।
- ⊗ ইহাতে তলানি (SEDIMENT) পড়ে না। এজন্য নিবেব মুখে কখনও কালি জামিয়া বন্ধ হয় না।
- ⊗ সুপ্রা কালি লিখিবার সময় পাতলা থাকে। এজন্য দ্রুত লেখা হয়। লিখিবার কিছু পরে লেখা গাঢ় কাল হয়। এবং জলে ডিজাইন রাখিলেও মুছিয়া যায় না।

এ.বোস, এস.এস.সি. (ফিলিত রসায়ন) ১৯৩২
সুপ্রা টায়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২ নং আহিরীটোলা ফার্স্ট লেন — কলিকাতা



সুপ্রা প্রসাধন নিয়মিত ব্যবহারে আপনার
খুশি ও লাভণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের
আনন্দও অনেক বাড়িয়ে দেবে।
আধুনিক উন্নত ধরনের
বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত এবং
সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য



সুপ্রা টায়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২ নং আহিরী টোলা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা
প্রোগ্রাম - এ. বোস, এস.এস.সি. (ফিলিত রসায়ন) ১৯৩২

কাঁচকি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “এটা কি ভাল হচ্ছে? কে জানে?” আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “কি জান বাবা! আমরা পুত্রনো আমলের লোক, দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের লোকের; মেয়েরা পুত্রবধূর কপিল ভর করে চলবে, আজন্ম দেখে আসছি—দেখতে ভাল লাগে। মেয়েদের গটগট করে মাথা উচু করে হাটী আমরা বরদাস্ত করতে পারি। তবে যুগ তো বদলাচ্ছে! নতুন নতুন রীতিনীতি কায়দা-কানূনের আমদানী হবেই, আমাদের ভাল-লাগা না লাগার উপর কিছু নির্ভর করবে না।” দুটকুতে কহিলেন, “হুঁ এ তুমি ঠিক জেনো—মেয়েরা যত লেখাপড়া শিখবে, আর বেশী ব্যয় পর্যন্ত আইবুড়ো থাকবে, তত দেখবে হিস্টোরীগ্রন্থ মেয়েমানুষ আর মন্দা মেয়েমানুষের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যাবে। আর খুব সম্ভব তাতে কি সংসার, কি সমাজ—কারও পক্ষে মঙ্গল হবে না।”

শ্রীমতী আসিয়া কহিল, “চল হে।” “চলুন” বলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহির দরজার কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠের ‘দিদিমা’ ডাক শুনিয়া পরেশ খমকিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—একটা মরাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া কমলা—হাতে দুইটি গান। তাহার সহিত চোখা-চোখি হইতেই কমলা মুখ নামাইল। অভিমনের কালো ছায়া মুখ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় নাই। ক্ষান্ত বর্ষা মেঘের মত টুকরা টুকরাভাবে দুই চোখের কালো তারায়, কুণ্ঠিত হ্র, দুইটিতে, স্বৰ্ণ স্ফুরিত অধরে লাগিয়া আছে।

শ্রীমতী কমলাকে কহিল, “নিজে দে না তোরা বরকে।” পরেশকে কহিল, “নাও না হে।” পরেশ হাত বাড়াইল। তাহার হাতে পান দিয়াই পিছন ফিরিয়া কমলা পলাইতে উদাত্ত হইতেই শ্রীমতী কহিল, “ওলো, চুম দিল না?” কমলা খমকিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় বকিয়া তাপা তর্জনি করল, “যা-তা বলছে।” শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, “ভুল করে বলে ফেলেছি লো! চুম দে, চুম তো গিলের পর নিজেই দিদি, তখন কি আমার বলবার অপেক্ষা রাখি?” কমলা আসিয়া ডান হাতেব তর্জনীটি বাড়িয়া দিল। তর্জনির মাথায় চণ লগানো ছিল, পরেশ নিজের তর্জনী দিয়া ধীর-সুস্থে চুম লইতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, “ভাল করে হাতটা জপটে ধর না, লল্লা কিসের?” কমলা হাতটা সরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে মরাইয়ের আড়ালে চলিয়া গেল।

পথে ঘাইতে ঘাইতে শ্রীমতী কহিল, “আজ তোমার উপর আমরা ভারী রাগ করছি।”

পরেশ কহিল, “আমরা—কে কে?”

“আম আর কমলা। আজ এলে না কেন?”

“আসিছিলাম। বেরিয়েছি, এমন সময় হেডমাস্টার মশারের নিমন্তণ চিঠি পেলাম।”

শ্রীমতী কহিল, “নৈমন্তণ তো আমিও করে এসেছিলাম হে। নিজে গিয়ে হাতে খণ্ডে মাথার দাঁবা দিয়ে বলে এসেছিলাম।”

“তা এসেছিলেন—কিন্তু ভুললো—”

ব্যগের সুরে শ্রীমতী কহিল, “ওঃ! আমরা বুদ্ধি অভন্ন?” পরেশ কহিল, “তা কি আমি বলছি। আপনারা আপনার লোক—আশানাদের কাছে দুটি হলেও আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু উনি হলেন অপ রচিত—পর।” শ্রীমতী কহিল, “তা হলেও তোমার একবার দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল। একটা দেরি হলে হেডমাস্টারের শালী উড়ে পালিয়ে যেত না।”

পরেশ কহিল, “ওর শালীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?”

“ওই তো গাড়ের গাছ হে! ওর লোভেই তো গিছলো? মুখ হলেও সব বুদ্ধি।” একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “কমলা আজ কেঁচেছে জান?”

পরেশ কহিল, “কান্না কেন?”

শ্রীমতী খন্ খন্ করিয়া কহিল, “কান্না কেন? একজনকে মনপ্রাণ সাঁপে বসেছে, আর সে যদি অন্যের জন্যে ছুটোছুটি করে, তাকে যদি অন্য মেয়ে মালা গোঁবে পাঠিয়ে দেয়—” পরেশ সন্দেহের সুরে কহিল, “মালা আবার কে পাঠিয়েছে? শ্রীমতী কহিল, “কেন তোমার বিব? গৃপী ধরেছে।” বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, “মানে?”

“মানে—আজ বিকেল বেলায় তোমাকে ডেকে আনবার জন্যে গৃপীকে পাঠিয়েছিলাম। গৃপী রাস্তায় যেতে যেতে শেষে—বিনয়ের ছোট মেয়ে খুকী তোমাদের বাড়ি বাছে—হাতে একটা গালা ফুলের মালা—জিজ্ঞাসা করতই খুকী বললে—পরেম দাদার জন্যে দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে। গৃপী

এসে আমাকে বলল—ওই কথা। কমলা বসেছিল কাছে, সেও শুনল। গৃপী যতক্ষণ ছিল কিছু বলল না, ও যেতেই আমার কোলে মাথা দিয়ে কি কহা।”

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতীর বাড়ির কাছে আসিতেই, শ্রীমতী খপ করিয়া পরেশের হাত ধরিয়া বলিল, “ভাই, তোমাকে হাতে ধরে মিনতি করে বলছি—এখানে লেখানো আনাগোনা ছুড়। কমল তোমাকে মনপ্রাণে স্বামী বলে জেনেছে—এর পর যদি ও তোমাকে না পার তো প্রাণে বাঁচবে না।”

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ দেখিল, শয়নকক্ষে টেবলের উপর একটি গালা ফুলের মালা। মালাটি প্রসারিত দুই করতলে তুলিয়া লইয়া সে তাহার উপরে মুখ রাখিল। মালার সিন্দ-কোমল স্পর্শ, মৃদু সুগন্ধ মালা-রচয়িত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হঠাৎ টেবলের একধারে রঙিন কাগজের বাস্ত্রে মোড়া ঔষধের শিশির দিকে নজর পড়িল, যে ঔষধের শিশিটি সে বাবর ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল। শিশিটা তুলিয়া লইয়া দেখিল—মোড়ক খোলা পর্যন্ত হয় নাই। হাঁকিয়া মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই ঔষধের শিশিটা কে দিয়ে গেল?”

মাসীমা কহিলেন, “বিনয় মাস্টার—”

“কখন?”

“সন্ধ্যার পর।”

“কিছু বলেন নি?”

“বললেন—কাল নাকি ওর স্ত্রী ব্যস্তের বাড়ি যাবেন—টান শেঁইছে দিতে যাবেন—ঔষধটার আর দরকার রহে না।”

পরেশ শিশিটা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ শিশিটার দিকে শ্রদ্ধা দৃষ্টিতে তাকিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনের আকাশে একটি ক্ষুদ্র তারকার উদয় হইয়াছিল; স্পন্দ-ফলের জন্য সিন্দ দীর্ঘত বিবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বোধ করি চিরদিনের জন্য অন্তিমিত হইয়া গেল।

(২১)

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুখদা রাস্তাঘরে কাজ করিতেছিল।

শোবার ঘরের বারান্দায় বাসমা বিব খুকীর জন্য “ভুখি” পুজার আরোজন করিয়া দিতেছিল। একটা মা টের ঢেউ ভোলা কানোওয়ালা খোলা ভুখ দিয়া কানায় কানায় ভর্তি করিয়া তাহার উপরে গালা ফুল থরে থরে সাজাইতেছিল। খুকী উবু হইয়া বাসমা উৎসুক ও উদ্বেল চেখে দিবার সাজানো দেখিতেছিল। খুকী কহিল, “দিদি, আরও ফুল জানব?” বাব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, এতেই হবে।” খুকী কহিল, “মন্দা দিদি পরেশদাদার নামে একটা গান বেধেছে, দিদি।” বিব খুকীর মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, “কি গান?” খুকী সুর করিয়া কহিল, “কিবা বেগুন গাছে গাছে, পরেশ ডাক্তার বিয়ে করছে—তিড়ং তিড়ং নাচে। তিড়ং তিড়ং নাচুক, আমরা তাকেও বর পাই—ও যে অহংকারে পা পড়েন—ঐ জ্বালাতেই মরি—বল ভাই হরি ভাড়রী—” বিব স্পান হাসি হাসিয়া কহিল, “তুইও ওই গান গাইবি? পরেশদাদা তোরা দামা হন না?” খুকী কহিল, “গাইব না কেন? পরেশ দাদার নামে তো আর গান নয়—ওর বউয়ের নামে।”

শ্রীমতী বাড়ি ঢুকিয়া হাক দিল, “বউ রইছিস নাকি গো?” সুখদা কহিল, “আছি, আসুন।” শ্রীমতী বিব ও খুকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি লো তেদের কি হচ্ছে?” খমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বিব বুদ্ধি খেলা করছেন? তোরা পয় কেমন আছে?” বাব কহিল, “ভাল আছে।” শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, “ভাল থাকবে বই কি?” ডাক্তারের চিকিৎসা। বলিয়া মূঢ়াক হাসিয়া রাস্তাঘরে চলিল।

রাস্তাঘরে ঢুকিতেই সুখদা কহিল, “বসুন ওই আসন।” শ্রীমতী গম্ভীর মুখে কহিল, “বসবনা—তোকে একটা কথা বল তোদের ভালবাসি, তাই গোপনে বলে যাচ্ছি। আর চার ক সুখদা বিস্ময় ও ঔৎসুকতার সহিত কহিল, “কি?”—শ্রীমতী আর কেও জানে না—সুখদা আর গৃপী—তা আমাকে? গেলেও কথা বেরবে না, তুইও কাজকে বাস না।” রম্ম করিয়া কহিল, “বলব না, আপনি বলুন।” শ্রীমতী কহিল, “বলছি—কিন্তু বলবার আগে তেঁকে একটা কথা বিনয় না হয় কাছখোলা মানুষ, কিন্তু তুইও কি : দিয়ে ছুতো—সেরে কি করে, কোন খোঁজবর রাখিস

চর্মরোগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে, পি, রায় এইচ-এম-বি

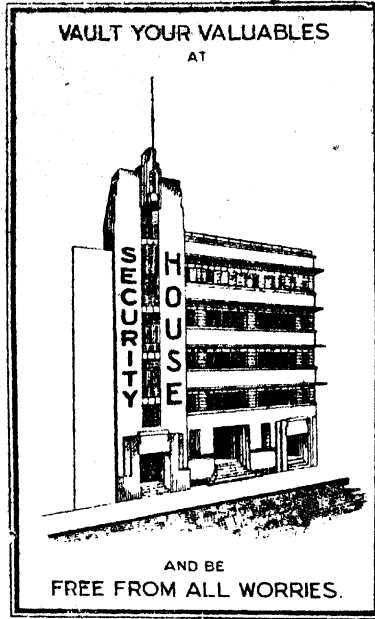
বিনা অস্ত্রে যাবতীয় চর্মরোগ,
আঙ্গুলহাড়া, স্তন পাকা, রক্তদুর্গি
এবং দূরারোগ্য ক্ষত অতি অল্প
সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়া
থাকেন।

হতাশ রোগীরা কনসাল্টেশন করুন
গ্যারান্টি দিয়া চিকিৎসা করা হয়।
সান্ফ্রান্সিস্কো ফার্মেসী
২৪৯নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ),
কলিকাতা।

ফোন বি. বি. ২৭২০

সময়—

প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা, বৈকাল ৫টা হইতে ৯টা



অখণ্ডনীয়

ভলুট্

আপনার মূল্যবান
গোপনীয় ধনসম্পত্তি
ও দলিলপত্রাদির
একমাত্র গোপনীয়
স্থান।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য

ফোন করুন—
কলিকাতা ৬৪৭৭

কলিকাতা সেফ ডিপোজিট কোম্পানী লিমিটেড
১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

Post Box—549

Tele } Gram : Bankenen
Phone : Cal. 1587

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড্ অফিস—১৪নং হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—বিহারশরীফ, রাঁচী, লোহারডাঙ্গা, ডিগবয় ও পুর্নুলিয়া

হুদের হার

চলতি হিসাব	...	২%	প্রতি বৎসর
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	২%	" "
—স্থায়ী আমানত—			
এক বৎসরের জন্য	...	৩%	" "
দুই বৎসরের জন্য	...	৪%	" "

তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট
ক্রয় করুন।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা যায়

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর্স—

সি, গুহ

মিঃ বি, কে, রায়



“কপোত-কপোতী যথা—”

ফোটোশিল্পী—শ্রীশঙ্কর দাস চট্টোপাধ্যায়

বর ঘরে, তার তো এমন অসাবধান হওয়া ভাল নয় বউ।” সুখদা দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “বাবুর কথা বলছেন? কি করেছে সে?” শ্রীমতী ক্রুর হাসি হাসিয়া কহিল, “কি করেছে শূন্য? বিনোয়সুন্দরের বিন্যাসকে ও তার মানিয়েছে তোর মেয়ে—নিজে হাতে মালা গেঁথে পরেশকে পাঠিয়েছে।” ভয়ে সুখদার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, শব্দকবঠে কহিল, “সত্যি!” শ্রীমতী কহিল, “মিথো না সত্যি, তোর খুকীকে জিজ্ঞেস করে দেখ—ওর হাতেই পাঠিয়েছে।” সুখদা ডাকিল, “খুকী!” খুকী সাড়া দিল, “কি মা!”

“এখানে শূনে যা তো!” খুকী আসিতেই সুখদা চাপা স্বরে প্রশ্ন করিল, “পরেশকে মালা দিয়ে এসেছিস?” খুকী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “এসেছি তো!”

“কে দিল দিতে—?”

“কেন, দিদি। পরেশদাদা সকালে চেয়েছিলেন—” সুখদা শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া কহিল, “এই শুনুন পিসিমা! পরেশ নিজে থেকে চেয়েছিল; দাদার মত ভালবাসে, চাইলে—” শ্রীমতী বাধা দিয়া ধারালো কণ্ঠে কহিল, “যা-তা বোঝস নে বউ! একজন সোমও বয়সের ছেলে মালা চাইলেই এত বড় শাড়ী মেয়ে তাকে মালা গেঁথে পাঠাবে? তোদের শহরের নিয়ম কানুন জানিনে, বউ, কিন্তু আমাদের পাড়াগেঁয়ে এসব অসৈরন চলে না। তোদের ভালর জন্যেই বলছি বউ, এখনও মেয়েকে সামলা, না হ'লে পরে পশ্চাৎবি।” সুখদা মুখে কাঁদো করিয়া কহিল, “সত্যি!” উঠিয়া দাঁড়াইয়া জ্বলন্ত কণ্ঠে কহিল, “আপনি আমার সঙ্গে আসুন পিসীমা—আপনার চোখের সামনে ওই মেয়েকে কি শাসিত দি, দেখুন।” বলিয়া একটা ঢেলাকাঠ হাতে করিয়া বাইতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী খপু করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “পাগল হয়েছিস নাকি বউ? অত বড় মেয়েকে মারধর করে? শেষে কি ফাসাদ করবি? আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই, বিষ্-টিষ খেয়ে বসবে, তার চেয়ে এক কাজ করিস তো সবচেয়ে ভাল হয়। মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের কাছে চলে যা। তাকে দিয়ে একটি পাঠ খুঁজিয়ে মেয়ের বিয়ে

দিগে যা। বিনয়ের উপর ভর করে থাকলে মেয়ের তের বিয়ে হবে না।” সুখদা কাঠটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, “তাই করব পিসীমা।” শ্রীমতী কহিল, “আচ্ছা চল বউ! কিছু মনে করিস না। তোদের ভালবাসি, তাই তোদের খায়াপ কিছু শুনলে মনটা করবর করে—তোদের না জানিয়ে থাকতে পারি নে—তোদের পর বলে ভাবলে কি আর আসতাম? গয়ের লোকের মত চুপ করে বসে বসে মজা দেখতাম।” শ্রীমতী চলিয়া গেল। সুখদা প্রস্তুতমতির মত উনানের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় আসিতেই সুখদা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “শোন।” বিনয় কাছে আসিতেই সুখদা জ্বলদগম্ভীর স্বরে কহিল, “তোমার মেয়ে আজ কি করেছে জান?” বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, “কি?”

“পরেশকে মালা গেঁথে পাঠিয়েছে।”

বিনয় বিস্ময়ের সুরে কহিল, “কেন?” সুখদা কহিল, “পরেশ নাকি সকালে চেয়েছিল।” বিনয় নিশ্চল হইয়া কহিল, “ওঃ! তাই! তাতে আর দোষ কি হয়েছে।” স্বামীর মুখের পানে জ্বলন্ত চক্রে চাহিয়া সুখদা তাঁহুকণ্ঠে কহিল, “দোষ হয় নি? কে ফোখায় মালা চাইল বলে—অত বড় মেয়ে দিন-দুপুরে মজা গেঁথে পাঠাবে? পরেশ বাড়িতে এসে দিতে পারত।” বিনয় কহিল, “তা বটে।” সুখদা কহিল, “আমি কিছু জানতাম না, শ্রীমতী এসে বলে গেল।” ক্ষোভের সহিত কহিল, “মেয়ে তোমার বড় হয়েছে কিনা—আজকাল আমার কণ্ঠে সব গোপন করে।” বিনয় কহিল, “শ্রীমতী জানল কি করে?” সুখদা কহিল, “খুকী নিয়ে যাচ্ছিল—গণী বামনী দেখেছে—ও গিয়ে আবার শ্রীমতীকে বলেছে—শ্রীমতী বলল বটে—কেউ আর জানে না, আর কাউকে ওরা বলবে না। কিন্তু ও মিছে কথা—ওরা এতক্ষণ সারা গিয়ে রট্টিয়ে দিয়েছে বোধ হয়, কাল থেকে আর গায়ে মুখ দেখানো যাবে না। আর তোমার ওই মেয়ে খুবজো থাকবে, কেউ ওকে নেবে না—” বিনয় চুপ করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। সুখদা

কহিল, “আমি ছেলেরা নিয়ে দাদার কাছে যাব—তুমি কিন্নরকে ছুটি নিয়ে আমাকে রেখে আসতে পারবে না?” বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “পারবে।” সুখা কহিল, “বেশ, খেয়ে-দেয়ে এখনই সেক্টোরীর কাছে যাব। ছুটির ব্যবস্থা করে এস গিয়ে। কালই আমি যাব।” বিনয় কহিল, “এত ভড়াভাড়ি—” সুখা দৃঢ়মুখে কহিল, “হ্যাঁ, কাল আমি আমি গিয়ে মূখ দেখাতে পারব না—আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে—”

(২২)

পরের দিন দশ-বারো মাইল দূরের এক গ্রাম হইতে পরেশের ডাক আসিয়াছিল। বেলা দশটার সময় সন্মানহার করিয়া পরেশ বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় হেডমাস্টার মহাশয়ের কি—দুঃখের মা—একটা চিঠি আনিয়া হাতে দিল। হেডমাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—“ডাক্তারবাবু—আজ দয়া করে একবার এসে আর্জিকে দেখে একটি ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন।” পরেশ দুঃখের মাকে কহিল, “আজ্ঞা, তুমি যাও। ওই রাস্তা দিয়েই এখনই আমাকে যেতে হবে, যাবার সময় দেখা করে যাব।”

রাস্তার হেডমাস্টারের সাহিত দেখা হইল—খড়া-চুড়া আঁটিয়া স্কুলে ঘাইতেছেন। পরেশকে দেখিবামাত্র একগাল হাসিয়া কহিলেন, “টলেছেন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারলুম না, স্কুলের সময় হয়ে গেছে, আপনি যান তা হলে—”

নাড়ির দরজায় পৌঁছিয়া ঘণ্টা বাজাইতেই থোকা ছুটিয়া আসিল। পিছনে-পিছনে আসিল আরতি। থোকা আসিয়া একেবারে সাইকেলের হ্যাণ্ডল্‌স্‌ ধরিয়া কহিল, “চড়িয়ে দিন না একবার।” পরেশ তাহাকে সিতে চড়াইয়া দিল। থোকা আদেশ দিল, “চালান এবার।” আরতি আসিয়া কড়া গলয় কহিল, “থোকা নামো।” থোকা মাসারি কথায় কান না দিয়া কহিল, “চালিয়ে দিন না।” পরেশ চালাইতে শুরু করিল। আরতি কহিল, “ওকে আদর দেবেন না—ভারী দুষ্ট ছেলে, মাথায় চড়ে বসবে।” পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি, থেকা! এর পর মাথায় চড়াও? তা হলে তো মশাকল।” থোকা সাহস দিয়া কহিল, “কখনও না, আপনি চাচিয়ে দেখুন।” পরেশ কহিল, “বেশ তোমার কথাই বিশ্বাস করা যাক—” বলিয়া এক পাক ঘুরাইয়া আনিয়া কহিল, “এর পর নামো দেখি।” থোকা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, আর একবার।” আরতি হুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, “দেখলেন তো—আমার কথা বিশ্বাস না করার ফল। এর পর খাটর পর ঘণ্টা ঘোড়ান ওকে এই রোদে, ও কি সহজে নামবে ভেবেছেন।” পরেশ কহিল, “থোকা, তোমার মাসীমা কি বলছেন শুনছ।” থোকা কথায় কান না দিয়া বাইকের ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আরতি কহিল, “দেখছেন মজা! কে যেন কাকে বলছে! জোর করে নামিয়ে দিন ওকে।” থোকায় উদ্দেশ্যে কহিল, “থেকা, নামো বলছি, নামবে না তো! ডাক্তারবাবু! আপনার সেই ছুটিটা দিয়ে হাত দুটো ওর কেটে দিন তো।” থেকা ভয়ে চোখ বড় করিয়া কহিল, “আমাকে নামিয়ে দিন—” বলিয়াই নামিবার জন্য বেঁটা শুরু করিল। পরেশ তাহাকে নামাইয়া দিতেই সে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আরতি কহিল, “একেবারে নেয়ে-খেয়ে এসেছেন দেখছি।” পরেশ কহিল, “একটা কলে যাচ্ছি—এখন থেকে দশ-বারো মাইল রাস্তা, কখন ফিরব তার ঠিক নেই।” চোখে ও মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গী করিয়া আরতি কহিল, “এই রোদে এতখানি রাস্তা যাবেন?”

পরেশ কহিল, “শীতকালের রোদ তো, কিছু কষ্ট হবে না। তা ছাড়া ডাক্তারদের কি অত রোদ-জল বাছতে গেলে চলে? যখনই রোগী ডাকে, তখনই যেতে হবে।” আরতি মচকি হাসিয়া কহিল, “সব রোগীর বেলা নয়, আমার তো কাল রাতেই ডেকে রেখেছিলেন। সকালে বোধ হয় জ্বলেই গিয়েছিলেন, চিঠি লিখে মনে না করিয়ে দিলে বোধ হয় আসতেন না।” পরেশ কহিল, “নিশ্চয় আসতাম।” দুই চোখ পরেশের মুখের উপর স্থির করিয়া দিয়া আরতি কহিল, “সত্যি।” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ।”

বেঁটকথানায় বসিয়া পরেশ কহিল, “আপনাকে দেখবার কিছু নেই।” আরতি হাসিয়া কহিল, “একদিন দেখাতেই চুড়িয়ে গেলাম, বলেন কি?” অপ্রতিভভাবে পরেশ কহিল, “না, তা বলি নি। যজ্ঞি, আপনার অগাধিক মানে—খাস্তিক কোন রোগ আছে বলে মনে হয় না।” আরতি কহিল, “বলেন কি? বকের অবস্থা তো ভাল নয়।” পরেশ কহিল, “সে আমি পরে দেখব। তবে মিসেস বোসের কাছে যা শুনছি, তাতে মনে হয় ডক্তরের কার্য কিছু নেই, দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অবশ্য এখনই আপনাকে ফেনে ওখুঁধ খেতে দেব না—আগে দুদিন আপনাকে ওরাক করব, মানে—দেখব।”

“বেশ তো দেখুন না হত হচ্ছে।” আরতি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলতেই পরেশ লালজ্বতমুখে কহিল, “আমি তাই বলছি নাকি আমি বলছি, মানে—” আরতি কহিল, “দুঃখী হক বলছেন—” বলয় উঠিয়া দাঁড়াইতেই পরেশ কহিল, “কোথায় যাচ্ছেন? আরতি কহিল, “বোধ হয় তেঁরা পেয়েছে আপনার, জল নিয়ে আসি।” বলিয়া মরালীর মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। ফিরিল একটা কাচের প্লাসে জল লইয়া। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, “খনি।” টকটক করিয়া সব জলটা গিলিয়া পরেশ কহিল, “সত্যি, ভারী তেঁরা পেয়েছিল, কিন্তু কি করে জানলেন আপনি?” আরতি কহিল, “আপনার মুখ দেখে।” প্লাসটা নামাইতে বাইতেই আরতি হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইল। পরেশ সসেপকোর মত কহিল, “আমার খাওয়া প্লাসটা—” আরতি কহিল, “তাও ছোঁবার যোগ্য নই নাকি।” পরেশ কহিল, “আপনি সব কথা ভারী বাক্যভাবে দেখেন।” আরতি কহিল, “আমার বাক্য চোখে যে, সেজ্ঞা দেখব কি করে?” পরেশ কহিল, “এই দেখুন রাগ কলেন আবার।” আরতি চোখ ভাগর করিয়া কহিল, “রাগ? আপনার ওপর? দয়া করে দেখতে এসেছেন—এই কত ভাগ্য আমার।” সুন্দরীত আসিয়া হাজির হইল, হাতে লেটে করিয়া পান। লেটটা পরেশের সামনে নামাইয়া আরতিকে কহিল, “সব বলছিছ—ওকে?” আরতি কহিল, “উনি তো আমাকে দেখতে আসেন, কোথায় কলে যাচ্ছেন, এমনই—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “শিথো কথা।” দুই চোখে ষাটলক হাসিয়া আরতি কহিল, “মিথো কথা?” পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “না না, তা নয়, মানে—কলে অবশ্য যাচ্ছি, তবে দেখতেও এসছি।” সুন্দরীত কহিল, “এক ব্যবস্থা করছেন?” পরেশ কহিল, “এখন কিছু করব না। ফরাত পথে দেখা করে সব বলে দিয়ে যাব।” সুন্দরীত কহিল, “কখন ফিরবেন?” পরেশ কহিল, “যদি সম্ভব সম্ভার আগে।”

পরেশ যখন ফাঁরল, তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। পশ্চিম আকাশে নির্বাণিতপ্রায় আলোয় আভার মত ফাঁপ গেলোপাী আভা লাগিয়া আছে। পূর্বক্বে গাড় বেগুনী রঙের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। রাস্তার ধারে গাছগালাতে নাড়-প্রভাগত পাখীদের কলরব শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের কাছে আসিতেই পরেশ দূর হইতে দৌঁতে পাইল, আরতি থোকর হাত ধরিয়া রাস্তার ধারে ধারে ধীরে আসিতেছে। থোকর সাহিত আলোপে সে এমনই মনন হইয়া গিয়াছে যে, পরেশ কাছে আসিতেও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। পরেশ ঘণ্টা বাজিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল, ফলে আরতি থোকাকে লইয়া রাস্তার ধারের দিকে আরও একটু সরিয়া গেল; কিন্তু আলোপের স্রু অক্ষর রহল। শুধু তাহার গুপ্তে একটা আত মৃদু হাস যেন ফুটিয়া উঠিল। সামনে আসিয়া সশব্দে নামিয়া পরেশ কহিল, “কোথায় চলেছেন?” আরতি চমকিয়া চাহিয়া কহিল, “ওঃ! আপনি! আমি বল—কে?” হাস চাণিয়া কহিল, “আপনি যে এ-রাস্তায় গেছেন, সম্ভার আগে ফিরবেন, একেবারে ভুলে গিয়াছিলেন।” পরেশ আত কহিল, “আমার কথা মনে রাখবেন—এমন সৌভাগ্য আমার নয়, তবু সে কথা নাই বা জানলেন।” আরতি হাসিয়া কহিল, “রোগীদের সব সময় আপনাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে নাকি?” পরেশও হাসিয়া কহিল, “রোগীদের নয়—রোগিনীদের।” আরতি মুখ লাল করিয়া চোখের কোণে বিদ্রুপ হাসিয়া কহিল, “তাই নাকি!”

তিনজনে গ্রামের দিকে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ একেবারে রাস্তার ডান পাশ ঘেঁসিয়া—তাহার ডান হাতে সাইকেল; আরতি ও থোকা রাস্তার মাঝে। আরতি কহিল, “রাস্তার অত ধারে যাচ্ছেন কেন? যে বড় বড় ঘাস—সাপ থাকতে পারে।” পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, “শীত-কালে সাপ কোথায়?” আরতি কহিল, “আপনি তো সবই জানেন। সেদিন দেখেছি একটা সাপ এই রাস্তাতেই—রাস্তার এ পাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছিল।” আদেশের সুরে কহিল, “আপনি এদিকে সরে আসুন।” পরেশ আদেশ পালন করল।

আরতি কহিল, “যাকে দেখতে গিয়েছিলেন, পুদু, না মেরে?”

“পুদু, না।”

“কি হয়েছে?”

“টাইফয়েড।”

আরতি সজর কহিল, “ওরে বাবা! পাড়াগারেও ওসব রোগ আছে নাকি?” পরেশ হাসিয়া কহিল, “আছে বই কি। না হলে আমাদের চলাবে কেন?” আরতি কহিল, “আপনার মত ডাক্তরের কিন্তু পাড়াগারে পড়ে থাকা ঠিক নয়। কি আর হবে এখন, লোকে তো

হেতে পার না শুন, টাকা সেবে কে? শহরের যে কোন ডাক্তার হাজার কা রোগাগার করে—” পরেশ কহিল, “সবাই করে না, দু’চারজন করে।” রাত উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, “আপনি যে সেই দু’চারজনের একজন, কেন না, তা কে বলবে? বিদ্যে-বুদ্ধি-জ্ঞান আপনার তাদের চেয়ে এক রকম কম নয়।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিতে লাগিল, গাড়াগারে প্রাক্টিসের কত অসুবিধে দেখুন; ইচ্ছা ও সংগতি থাকলেও রাত কিনতে পড়েন না। একটা দূরের ‘কল’ থাকলে সারা দিনটাই টা। তা ছাড়া ভবিষ্যৎও একেবারে সমীপবন্দ; নতুন নতুন লোকের সা-যাওয়া নেই, লোকের আর্থিক উন্নতিরও কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে একই অবস্থার আপনাকে চিরদিন কাটিয়ে তে হবে।” পরেশ কহিল, “সত্যি।”

ইতিমধ্যে থোকা পিছনে পড়িয়াছিল, আরতি আরও কাছে ঘেষিয়া সিয়াছিল, পরেশ সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়া আরতির সমিধা অনুভব করিতেছিল, রাতের সংপরামর্শে তাহার মন ছিল না। হঠাৎ আরতির হাতে হাত লাগিতেই পরেশ যেন মিদ্যাত্তর শব্দ খাইয়া সরিয়া গেল, রাতও ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “থোকা কোথায় গেলে?” থোকা ট্যা আসিয়া সঙ্গ লইল।

হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ কহিল, “আজ : হয়ে গেল, বাড়ি যাই। কাল এসে আপনার ব্যবস্থা করে দেব।” কিয়া দাঁড়াইয়া আরতি পরেশের মস্তকের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাইয়া রহিল; তারপর শব্দ দুইটি ঈষৎ কুণ্ঠিত করিয়া কহিল, “এইজন্যে ক এতটা রাস্তা এগিয়ে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে এলাম।” পরেশ হাসিয়া লগ্না কহিল, “তবে যে তখন বললেন, আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।” টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে আরতি কহিল, “গিছলুমই। কিন্তু দাঁড় দাঁড় ভেলেনি। সারা বিকাল বসে আপনাকে রাগে আগোজ্ঞন করছি।” পরেশ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “তাই ক?” ভারী অনায়াস! মিথোষি আমর জনে—” আরতি কহিল, “আমাকে বলে কি হবে? আমি কিছু জানি না। যা যা বলবার কৈ গিয়ে বলবেন।” পরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আরতি লে, “দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন—কতটা রাস্তা হটিলুম বলুন ও আপনার জনে?” পরেশ কহিল, “সত্যি।” কমলা দিয়া আরতি লে, “সত্যি তো দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?”

এই তরল অঙ্গকারে আরতির দেহের অতি স্নিককট তাহার সহিত মেলখী দাঁড়াইয়া থাকতে পরেশের ভাল লাগিতেছিল; এত শীঘ্র চালনাগা ভাবটিকে হারাতেই তাহার মন চাহিতেছিল না। আরতি মান খন স্বরে কহিল, “যাবেন না তো!” পরেশ কহিল, “চলুন।” যা আরতির সঙ্গে চলিল।

সেদিন রাগি এগারোটার সময়ে পরেশ বাড়ি ফিরিল। মাসীমা ইয়া পড়িয়াছিলেন; হকিডক করিয়া তাহাকে ডুলিতে হইল। মা নিম্নাভিজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত রাত হাস?” পরেশ ল, “রোগের ভারী বাড়াবাড়ি হয়েছিল—রোগী ভাল না সামলানো ত ছাড়তে চাইল না তারা—”

(২৩)

কয়েক দিন পরে। পরেশ সকালে ডিসপেন্সারিতে বসিয়াছিল। কাজ-হাতে কিছু ছিল না। কমলা ও আরতির কথা ভাবিতেছিল। এ নের মধ্যে কমলার সহিত কতকবারই দেখা হইয়াছে, জীমতীর গভায় কথাবার্তাও হইয়াছে। কিন্তু কমলার উপর ইহার মশাই নিন স্বব্ববোধ জামিয়াছে যে, তাহাকে দোঁধার, তাহাকে জানিবার : ও ঔষুক, অনেকটা স্টিমিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই মন কমলার আরতির চিন্তায় বেশি বাগ্পত থাকিতেছে। এ কয়দিন সে নিয়ামত-সম্মা হইতে রাগি দশটা পর্যন্ত আরতিদের ওখানে কাটাইয়ছে; তদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে; আরতিগণ না শুনিয়াও; আরতির সহিত করিয়ছে ও নানা বিষয়ে আলোচ করিয়াছে। তাহার কাছে এই জীবনের স্বকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বাহিরের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে করিয়া কর্মজীবন শুরুর কারার প্রেরণা পাইয়াছে, তাহার শিক্ষিত মার্জিত মনের সৌন্দর্য, মাধব্য ও ঔজ্জ্বল্যে মগ্ন হইয়াছে। সে ত পারিতেছে, তাহার হৃদয় আরতির প্রতি একটি অকর্ণণ অনুভব তছে। সে অকর্ণণ প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার মন একটি মেরের সঙ্গে বিদ্যাহের প্রতিপ্রতিভিতে আবদ্ধ ব্যস্তির পক্ষে

ইহা যে অন্যায়, তাহা সে বলে। প্রতিদিন সম্পর্ক করে—চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া আর কোন কণে আরতিদের বাড়ি বাইবে না। তবু সম্মা হইলেই পূর্ব রাত্রি বিদায় মুহূর্তে—আরতি, যশ ও চোখের আমন্ত্রণ মনে পড়ে—কাল আসবেন তো! আর স্থির থাকা যায় না—যখনসময়ে থিয়া হাজার হয়। এ কয়দিনে আরতি আরও নিকট-বর্তিনী হইয়াছে। তাহার ব্যবহারে সৌজন্যের চেয়ে সৌহার্দ্যের মাত্রা বাড়িয়াছে। প্রিয়বান্ধবীর সুরে প্রিয় আশ্বাসীর সুরে আশিয়াছে। কাল রাত্রির কথা মনে পড়িল—বড় আসিবার সময়ে আরতি ও সত্যেনবাবু তাহার সঙ্গে কতকটা রাস্তা আসিয়াছিলেন। ঠান্ডা বাতাস বাহিতেছিল—তাহার গায়ে চাদর ছিল না। আরতি তাহার নিজের গায়ের শাল তাহাকে দিয়াছিল। সে লইতে চাহে নাই—আরতি জোর করিয়া তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়ছিল। সেই শাল গায়ে লড়াইয়া আরতির দেহের উত্তাপ ও সুরতি সর্বাঙ্গ দিয়া পান করিয়া পরেশের যেন নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। জগদীশ কম্পাউন্ডার আসিয়া কহিল, “ডাক্তারবাবু ডাকছেন আপনাকে।” পরেশ কহিল, “কেন হে?” জগদীশ কহিল, “জানি না। আপনি আসুন।” পরেশ কহিল, “চল, ছাড়ি এখনই।”

ডিসপেন্সারিতে থিয়া পরেশ দেখিল, কার্তিক ডাক্তার অত্যন্ত ব্যস্ত। চারিদিকে ভাড় করিয়া রোগী ও রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের দল — কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বেগিতে বা মটিতে বসিয়া। পরেশ থিয়া বসিতেই কার্তিক মুখ তুলিয়া চাইয়া কহিলেন, “এসেছ? বস।” কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, “সেদিনকার সেই রোগীর বাড়িতে আগার ডেকে পাঠিয়েছি।” পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেনম গ্রাছ সে?” কার্তিক কহিলেন, “ভালই আছে; তবু আর একবার দেখাতে চায়।”

একজন ভিল গ্রামের লোক—বাসসে প্রোট, অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রসন্ন করিল, “হীন কো?” জবাব দিল আর একজন লোক—চ্যাগা, কহিল—কার্তিক-ডাক্তারের একজন দালাল, “আমাদের জামাইবাবু হচ্ছেন হীন, আসছে মাসে বিয়ে হবে—আটকাল কলেজের পাশকরা ডাক্তার।”

প্রোট ব্যক্তিটি বিনয়্যে ও শ্রদ্ধায় অভিভূতপ্রায় হইয়া কহিল, “সত্যি! তা হলে তো আর আমাদের সহরে যেতে হবে না।” চোখ দুইটা বৃজ্জয়া মাথার কানিন দিয়া দালাল কহিল, “না, তাদের চেয়ে কিসে কম আমাদের জামাইবাবুজী! একই কলেজে একই মাস্টারের কাছে একই বৈদ্যুতে বসে পড়া একই দিনে—এই তো সেদিন শালডাংগার টাইফট রোগী সেখে এসেন, ছোঁয়া মাত্র রোগী আশ্রমক আরম্ভ হয়ে গেছে বলে গেল একইমাত্র।” পরেশ জানে, এই লোকটাই এতদিন তাহার বিরুদ্ধে যা-তা কথা বলিয়া গ্রামে নিন্দা প্রচার তাহাে অনেক রোগী ভাঙাইয়াছে। কার্তিক-ডাক্তারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা হওয়া মাত্র ইহাবকই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখে হইতে দেখিয়া সে মনে মনে হাসিল। কে একজন লোক কহিল, “জামাইবাবুকে একটা হাওয়াগাড়ি কিনে দেন ডাক্তারবাবু! আর কোট প্যান্ট করিয়ে দেন, তা হলেই তো সহরের ডাক্তার।” দালাল কহিল, “হবে হে, হবে। সব হবে, তোমরা তোমাদের গায়ের রস্তুগালো লাগাও গে দেখি—একবারে ঘুঘুঘু করে ঘরের দরজা পর্যন্ত গাড়ি চলে যাবে।”

কার্তিক কহিলেন, “এখনই যেতে হবে। পারবে তো?” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ, যিচ্ছি, এখনই” বলিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির পাশ দিয়া একটা সরু গলি আছে, এই গলি দিয়া গেলে নতুন পুকুরের পাশ দিয়া পরেশদের বাড়ি অল্প সময়েই যাওয়া যায়। এই নতুন পুকুরে এ-পাড়ার মেয়েরা স্নান করে। তাহা হইলেও পরেশ এই রাস্তা দিয়া চলিল। মন চিন্তিত—আরতিদের ওখানে শালটি ফিরাইয়া দিবার জন্য যাইতে হইবে; কখন যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। এখন গেলে বেশীক্ষণ বসা যাইবে না। তা ছাড়া সত্যেনবাবু থাকিবেন, সময়ে জমিদারশ্রম বিনীত দখল করিবেন। তাহার চেয়ে ফিরিবার সময়ে যাওয়াই ভাল। সন্দেহিতর বিবেচনা আছে, আরতি আসাপ করিতে আসিলে তিন ভাগ বসন না।


হঠাৎ ভিজা কাপড়ের শব্দ কানে আসিতেই পরেশ দেখিল, “কমলা অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে—মুখ লম্ভায় আরক্তিম। কাছ খাইতেই কমলা একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। পরেশ ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া কমলাকে আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল—ভিজা চুলের রাশ পিঠের উপর লুটাইতেছে, আঁকাবাকা চুলের গাছে গাঢ় কৃষ্ণ সর্পাশ্রিত রক্ত কান ও গালের উপর লতাইয়া রহিয়াছে, নাসিকা ও চিবুকপ্রান্তে জলবিন্দু টলটল করিতেছে, ভিজা কাপড় দেখে আঁচিয়া বসিয়া পরিপূর্ণ বোঁধনকে প্রতিজ্ঞাত

মহাযুদ্ধের প্রধান
অস্ত্র—
“লোন্স”
আর
জীবনযুদ্ধের প্রধান
অস্ত্র
“লীন্স”

প্যালোডিয়াম
এস ও রেন্স
কোং লিঃ

—হেড অফিস—
১১ ভ্যান্স্টাট রো,
কলিকাতা
ফোন—কলিঃ ৯৭২

SWASTI & CO. PHONE CAL. 1035.
ENGINEERS &
SPRING Manufacturers



SPECIALISTS IN
MANUFACTURING: SPRINGS
& SPRING WASHERS
OF EVERY VARIETY

38, STRAND ROAD :: CALCUTTA

সকল প্রকার স্প্রিং ও স্প্রিং ওয়াশারের একমাত্র বিশ্বস্ত ও
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। খরিদদারগণের অভাব ও অসুবিধা
নিরাকরণই আমাদের বিশেষত্ব।

SWASTI & CO.
SWASTI THE BEST
SPRING MANUFACTURERS. 38, STRAND ROAD CAL.



কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

টেলিফোন :—খড়বাড়ার ১৩১৭ অফিস
১৫১২ ক রথানা
৪৬২৭ রোসঃ

টেলিগ্রাম :—“চীনমাটী”

সোপাষ্টোন পাউডার, সিলিকেট সোডা, কষ্টিক সোডা নারিকেল তৈল,
মহুয়া তৈল, রজন, সিল্টোনেলা-অয়েল, রঙ, হাইড্রোমিটার ও
সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলিও সরবরাহ প্রস্তুত থাকে :—

টালু পাউডার, ফ্রেঞ্চ চক, চীনা মাটি, ফায়ার ব্রিক, ফায়ার ক্রে, প্লাস্টার অফ প্যারিস,
ম্যাসানীজ ডাই-অক্সাইড, গ্লাস পাউডার, গ্রাফাইট পাউডার, গুরু ও এলামাটি,
সিলিকা বালি, এসবেজটস কন্সট্রাক্শন ইত্যাদি বহুবিধ খনিজ পদার্থ এবং
নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

দর ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

করিতেছে। গরেশ কহিল, “আর একটু সরে দাঁড়াও, না হ'লে খালে ঠেকাঠেকা হয়ে গেলে আবার স্নান করতে হবে।” কমলা আরও একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখটি আরও নামাইল। পরেশ দেখিতে পাইল—বুকের বসন দলিতেছে, নাকের ডগা ও চোখের সিক্ত পাতা দুইটি কাঁপিতেছে, অধরের প্রান্ত দুইটি ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পরেশ কহিল, “ভয় কিসের? গায়ে হাত স্বে না, পেরিয়ে যাও।” কমলা মৃদু কম্পিত-কণ্ঠ কহিল, “আপনি যান, শ্রীমতী শিদিমা ঘাটে রয়েছেন। এখনি এসে পড়বে, দেখলে কত ঠাট্টা করবে এখন।”

“তাই নাকি! আজ যাব শ্রীমতী শিদির বাড়ি বিকেলে। যেও। যাবে তো?” কমলা ঘাড় নাড়িয়া ‘হ্যাঁ’ জানাইল। পরেশ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। কিছু দূরে আসিয়া পরেশ মুখ ফিরাইল—দেখিল, কমলাও মুখ ফিরাইয়াছে—ধরা পড়িয়া বীটীত মুখ ফিরাইয়া কমলা দ্রুতপদে গলি হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গেল।

নতুন পড়কের ঘাটের সামনেই শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হইল। হাসিয়া কহিল, “দেখা হ'ল নাকি?” পরেশ হাসিয়া কহিল, “হ'ল।”

“কথাবার্তা হ'ল নাকি?”

পরেশ কহিল, “না, যা লাজুক আপনার নাতনীটি। দেখবামাত্র দেওয়ালের সঙ্গে নেকেট গেল।”

শ্রীমতী কহিল, “এ কি তোমাদের লেখাপড়া জানা সহরে মেয়ে ভাই যে, দেখবামাত্র গায়ে কাঁপিয়ে পড়বে? পাড়াগায়ের লাজুক মেয়ে আমাদের, আদর করে আশ্বাস দিয়ে ভয় ভাঙতে হবে।” হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, “আজকাল নাকি রাত দুপুরের আগে বাড়ি ফের না—কোথায় থাক বল দেখি?”

পরেশ কহিল, “কে বলছিল আপনাকে?”

“তোমার মাসীমা।”

পরেশ কহিল, “হেডমাষ্টার মশায়ের বাড়ি যাই। বন্ধুর মত ভাল-বাসেন আমাকে।” মৃচ্ছিক হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, “আর কেউ ভাল-বাসছে না তো?” পরেশ না বোঝার ভান করিয়া কহিল, “কে আর ভালবাসবে?”

“কেন, হেডমাষ্টারের শালী?” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “সহরের শিক্ষিত মেয়েরা এত সন্তা ভেবেছেন নাকি?” শ্রীমতী জ্বাব না দিয়া কহিল, “আচ্ছা চলি ভাই, রাতবারা করতে হবে।” যাইতে যাইতে আবার ঘামিয়া কহিল, “আজ বিকেলে যেও না — অনেক কথা গাছে তোমার সঙ্গে।”

(২৪)

পরেশ যখন গ্রামে ফিরিল, তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হেডমাষ্টারের বাড়ির কাছে করিয়া একপু অসময়ে বাড়িতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এবং কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বেপরোয়াভাবে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়া বৈঠকখানার ব্যারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, “খোকা!” কোন সাড়া মিলিল না, কণ্ঠস্বর উত্তর করিয়া ডাকিল, “খোকা!” মেয়েলি কণ্ঠের সাড়া আসিল, “কে?” আরও কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানার জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া উপকি মারিয়া দেখিয়া আরতি কহিল, “ওমা! আপনি! দাঁড়ান দরজা খুলে দি।” দরজা খুলিয়া আরতি কহিল, “এত বেলায়? কোথাও কল ছিল নাকি?” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ।” গা হইতে শালটা খুলিয়া কহিল, “আপনার শালটা।” আরতি শালটা লইয়া বাগের স্বরে কহিল, “কনবত হ'ল ফোটাজিল বুঝি।” তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। পরেশ অপ্রতিভ মুখে কহিল, “না, না, সে কি, মানে—এই রাস্তা দিয়ে যখন যেতেই হ'ল, ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।” নমস্কার করিয়া কহিল, “আচ্ছা, আসি তা হলে।” আরতি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “সে কি! এই রোদে রোদে এলেন, এখনই রোদে রোদে ফিরে যাবেন!” পরেশ কহিল, “তা হোক, রোদে আমাদের কষ্ট হয় না।” বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আরতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “যাবেন না, বসুন।” পরেশ স্তব্ধরূপে কহিল, “দেখুন, এখন বাই, পরে আসব এখন। আপনারদের এখনও খাওয়া হয়নি বোধ হয়, এমনই দৌর করিয়ে দিলাম—”

আরতি কহিল, “তা হোক। আপনি বসুন। আপনারও তো এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি।” চেয়ারে বসিয়া পরেশ কহিল, “আমরা পাড়াগায়ে মানু—এত সকাল খাওয়া অভ্যাস নেই। আচ্ছা, আমি বসিছি—আপনি খেয়ে নিনে।”

১১

“বেশ! পালিয়ে যাবেন না যেন।” বলিয়া ভ্রূর দীপ্তিতে সজক করিয়া দিয়া আরতি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিল—হাতে একটা থালায় খানকয়েক লুচি ও তরকারি, বাম হাতে জলের প্লাস। দেখবামাত্র পরেশ কহিল, “এসব কি করেছেন! নিজে না খেয়ে—” আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, “এমন কিছু করিনি—সব তৈরি ছিল, গাছিয়ে নিয়ে এলাম মাত্র।” থালাটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া আরতি কহিল, “এই দেখুন। হাত ধোবার জল আনলাম না—আপনি প্লাসের জলেই হাত ধুয়ে আসুন।” পরেশ হাত ধুইয়া আসিয়া বসিল। আরতি কহিল, “খান, আমি জল নিয়ে আসি।” কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জলের প্লাসটি পরেশের টেবিলে রাখিয়া কহিল, “তরকারিটা খেতে কেমন লাগল?” আমি নিজের হাতে রান্না করেছি।” পরেশ দুই চক্ষু বিস্ময়ভরিত করিয়া কহিল, “সত্যি?” উচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে কহিল, “চমৎকার হয়েছে।” আরতি মুচকি হাসিয়া কহিল, “বুঝি, মন রেখে বলছেন।” প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না না, কিছুতেই না—সত্যি বলছি, খুব ভাল হয়েছে। দেহাৎ আপনারদের কম পড়ে যাবে, না হ'লে আরও একটু—” আরতি কহিল, “সত্যি মেবেন?” পরেশ লজ্জিত হইয়া কহিল, “থাকগে।” আরতি কহিল, “থাকগে কেন, নিয়ে আসছি।” বলিয়া পরেশকে আর আপতিত করিবার অবসর না দিয়া চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটা প্লেটে করিয়া কতকটা তরকারি লইয়া ফিরিয়া আসিল। পরেশ কহিল, “একটুখানি দিন।”

খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, “দেখুন আপনার ভাগ সাবাড় করে দিলাম না তো?” আরতি কহিল, “না, আর দিলেও মেয়েরা তাতে ভয় করে নাকি? নিজেরা না খেয়ে আশ্রয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোতেই তো তাদের আনন্দ।”

ইহাদের মধ্যে নিজে কোন দলে পড়িল তাহা ঠিক করিবার জন্য আরতির মুখের পানে তাকাইতেই পরেশ দেখিল, আরতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—দেখিয়া পরেশ প্লামিত হইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে পরেশ কহিল, “আপনি সরস্বতী দেবীকেও হার মানিয়েছেন। সরস্বতী লেখাপড়া গানবাজনার ওস্তাদ ছিলেন শূনি—কিন্তু রান্না-বাগ্মা জানতেন কিনা শাস্ত্রে তার কোন উল্লেখ নেই; কিন্তু আপনি সব বিদ্যাতেই সমান নিপুণ।” আরতি আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিল, “মন খেয়েই গুণ গণিতে শূদ্র করলেন যে! কিন্তু মন তো আমার নয়, যার মন—” পরেশ কহিল, “সত্যি! মিসেস বোসকে দেখছি না!” আরতি গম্ভীর হইয়া কহিল, “সকাল থেকেই দীর্ঘ শরীরটা খারাপ হয়েছে, শূদ্রে আছে—” উৎকণ্ঠার সহিত পরেশ কহিল, “তাই নাকি? কি হয়েছে?” আরতি কহিল, “কি হয়েছে কি করে বলব বলুন। আসছে এখনই, জিজ্ঞাসা করবেন।”

সুনীতি আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখখানি শূন্য, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, কুচা চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। নমস্কার করিয়া বসিয়া ডান হাতে কপালের চুলগুলি সরাইতে লাগিল। আরতি পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ কহিল, “কি হয়েছে আপনার?” সুনীতি ক্রান্তকণ্ঠে কহিল, “ভারী মাথা ধরেছে—গা-হাত-পায়ে বেদনা।” পরেশ কহিল, “জিবটা বার করুন দেখি।” আরতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, “করো না দিদি! বলবামাত্র মা কালীই মত জিব বের করতে হবে—ডাক্তারদের যত সব জলুদু! ” পরেশ কহিল, “আপনার উপর তো কোন জলুদু করিনি।” আরতি কহিল, “করেননি আবার কি। দিবি ওষুধ দিয়েছেন, গিলতে হচ্ছে তো আমাকে।” সুনীতি হীতমধ্যে জিব বাহির করিয়াছিল; দেখিয়া পরেশ কহিল, “একটা পার্গোটিভ নেওয়া দরকার; তৈর করে রেখে দেব; ঝিক পাঠিয়ে দেবেন, নিয়ে আসবে।” আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “আপনি তো সন্ধ্যার সময় আসবেন—তখন নিয়ে আসবেন।” পরেশ তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই দুইজনে চোখাচোখি হইল—আরতি মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ কহিল, “তার আগেই খাওয়া দরকার।”

সুনীতি কহিল, “টান আজ বলছিলেন—পরশবাবু এতদিন ধরে আরতিকে দেখছেন—ওর ফাঁটা দেওয়া হয় নি। আপনার—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “ফাঁটা দিচ্ছেন।” সুনীতি আরতির দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসের স্বরে কহিল, “তুই কি দিয়েছিস নাকি?” আরতি লজ্জাক্ত মুখে কহিল, “দীর্ঘর যেমন কথা। আমি দিলে তোমরা জানবে না?”

নিভাস্ত
প্রয়োজন
না হইলে

ভ্রমণ
করিবেন না

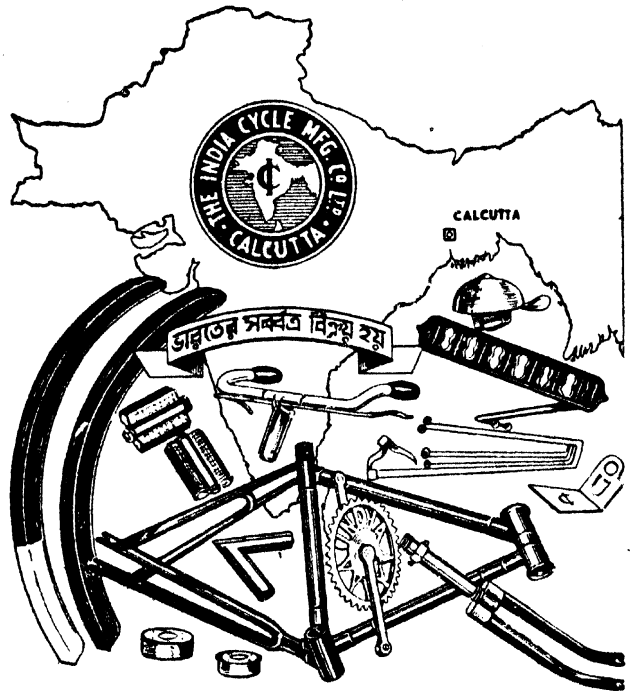
রেলওয়ের

যাত্রী ও মাল বহনের
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং
উহাও যুদ্ধ জ নি ত
অ ত্যা ব শ্য ক প্রয়ো-
জনীয় কার্যে নিযুক্ত।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে

ইণ্ডিয়া সাইকেলের দ্রষ্টব্য

ব্যবহার কারিগর
বাস্তানীর গৌরব
অক্ষুণ্ণ রাখুন



দি ইণ্ডিয়া সাইকেল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
কলিকাতা

পরে শ্রমভ্রম্বে দুই বোনের দিকে তাকাইয়া ছিল, কাঁহল, “আপনারা সবাই মিলেই দিয়েছেন, স্নেহ—প্রাণ!” সুনীতি কাঁহল, “ওঃ! এই! কিন্তু শ্রম স্নেহ আর প্রাণ! নিয়ে তো ডাক্তার করা চলে না পরেশবাবু, তা ছাড়া ওষুধ দিয়েছেন, তার দাম তো তিতে হবে!” পরেশ কাঁহল, “না না, ও কথা বলবেন না। আমার নিজের লোকদের অসুখ হ’লে কি আমি ফাঁ নিই, না ওষুধের দাম নিই—আপনাদের আমি তাইই ভাবি।”

অরতি পরেশের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, পরেশ তহার দিকে মৃৎ ফিরাইতেই মৃৎ নামাইয়া লইল।

(২৫)

সোদন বিকালে পরেশ শ্রীমতীর বাড়িতে গিয়াছিল। শ্রীমতী বসিয়া বসিয়া চরকা কাটিতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বলিয়াছিল, “ক’হে! গম্ব পেয়েছিলে নাকি?” পরেশ ভাল মানুষের ভান করিয়া কাঁহল, “কার?” শ্রীমতী চোখ মৃৎ ঘুন্টাইয়া কাঁহল, “ন্যাকামি করো না। কেন, কমলার!” পরেশ নিরীহের মত কাঁহল, “এসেছে নাকি?” হাসিয়া শ্রীমতী কাঁহল, “না হে। মিছে করে বলছিলাম। তা কি জন্যে এসেছ বল দেখি?” পরেশ ক্ষুর স্বরে কাঁহল, “সে কি দিদিমা—আসতে বলেছিলেন যে।” কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত শ্রীমতী কাঁহল, “বলছিলাম নাকি! ভুলে গেছি, তা বাস ভাই!” বলিয়া চরকা ঘুন্টাইতে লাগিল। পরেশ কাঁহল, “থাকগে আর বসব না। আপনি কাজ করছেন, চাঁল তা হলে।” বলিয়া চলিয়া আসিতে উদাত হইলেই শ্রীমতী কাঁহল, “চলে যাচ্ছ কেন হে। এস না—কমলার নাই বা থাকল, আমার সঙ্গেই না হয় একটু গল্প কর। চরকা আমি বন্ধ করছি।” পরেশ কাঁহল, “না থাক।” বলিয়া কতকটা চলিয়া আসিতেই শ্রীমতী কাঁহল, “খাও তো মাথা খাও আমার, শুনো খাও, কথা আছে।” পরেশ ফিরিয়া আসিয়া কাঁহল, “কি কথা?” শ্রীমতী কাঁহল, “মোড়ার জিন দিয়ে থাকল কি কথা বলা যায়? বাস শ্রির হয়ে।” পরেশ একটা অনন চানিয়া বসিয়া পড়িল। শ্রীমতী চরকা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরাইয়া রাখিয়া পরেশের কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁহল, “কমলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?” পরেশ জবাব না দিয়া মূঢ়াকি হাসিল। শ্রীমতী কাঁহল, “আমি এখনই ডেকে এনে দেখা করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু কাজ করতে হবে। আমি কুলীন বাবুদের মেয়ে—আজন্ম রত্নচাঁটারণী (পরেশ মনে মনে হাসিল), তা ছাড়া তোমার গদুদুজন, আমার পা ছুঁয়ে তোমাকে বলতে হবে যে, এক মাসের মধ্যে তুমি কমলা ছাড়া আর কোন ছুঁড়ীর সঙ্গে মিশবে না।” পরেশ হাসিয়া কাঁহল, “তা হলে তো মাসখানেক আমাকে ডাক্তার বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হবে।” শ্রীমতী তীব্রস্বরে কাঁহল, “কেন! ছুঁড়ীদের চিকিৎসা না করলে বন্ধি ডাক্তার করা যায় না?” পরেশ গম্ভীরমুখে কাঁহল, “ডাক্তার করতে গেলে অত বড়ী ছুঁড়ী বাছলে চলে না। যে ডাকবে তাইই ক’ছে যেতে হবে।” শ্রীমতী কাঁহল, “বেশ, তা ষেও। কিন্তু রাত দুপুরে পর্যন্ত আশ্রা দিও না।” পরেশ বিনয়ের ভান করিয়া কাঁহল, “রাত দুপুর পর্যন্ত কর কাছে আশ্রা দিই আমি? শ্রীমতী কাঁহল, “কেন, ঐ শহুরে ছুঁড়ীটার কাছে, দাও না?” পরেশ কাঁহল, “কে বললে আপনাকে?”

“দুঃখের মা। তোমাদের বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে বাঁচ্ছল সৈনিক—ডকে জিজ্ঞাসা করতেই সব বলে গেল।”

“তা ভুললোক নেমন্তন্ন করে পাঠালে তো না গিয়ে পারি না।” দাঁচাইয়া শ্রীমতী কাঁহল, “কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটার চাল-চলন ভাল নয়, নেনিছ—হয়তো এমন গণ্ডে করবে যে, শেষে বাবুদের কুসুর হয়ে কায়েতের ভীতে মৃৎ দিয়ে বসবে।” পরেশ ধারালো স্বরে কাঁহল, “পাগল হয়েছেন কি?” উপরে ও নীচে মাথা নাড়িয়া শ্রীমতী কাঁহল, “হ্যাঁ। পাগলই তো।” লিয়া দুই ঠোঁট চানিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরেশের মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। হঠাৎ ‘খুঁক’ করিয়া কাসির শব্দ হইতেই পরেশ উৎকর্ণ হইয়া ঠিল, শ্রীমতী রাগত স্বরে কাঁহল, “ছুঁড়ীর আর তর সইছে না।” প্রহরে স্বরে পরেশ কাঁহল, “কমলা রয়েছে বন্ধি?”

“হ্যাঁ হে আছে। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই গেল না।” “কে করেছে ওকে!” হাঁকিয়া ডাকিল, “ওলো কমলার! এখানে আর বেশি, বলবার আছে বল।” কমলা আলিল না। শ্রীমতী কাঁহল, “না হয় মই চলছে। এস দেখি।” বলিয়া পরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া ইয়া গেল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া কমলা দাঁড়িয়া ছিল—বঁধনে কালাপাড় শান্তিপুন্দরী শাড়ি ও সোঁজ, বাধার এলো খোঁসা,

নতমস্তকে ডান পারের বড়ী আঙ্গুলে দিরা মাটি খুঁড়িতেছিল। তাহার সামনে পরেশকে দাঁড় করাইয়া দিয়া শ্রীমতী কাঁহল, “আমার গা ছুঁতে তো ইচ্ছে হ’ল না। বেশ, কমলার গা ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা কর।” পরেশ খপ করিয়া কমলার বাম বাহু চাপিয়া ধরিয়া কাঁহল, “কি বলতে হবে বলুন।” শ্রীমতী কাঁহল, “বল তোমাকে ছাড়া ক’উকে ভালবাসব না, বাঁধ বাসি, যাকে বাসব তার মাথা খাব।” পরেশ হাসিয়া কাঁহল, “আচ্ছা বলছি—তোমাকে ছাড়া ক’উকে ভালবাসব না, হ’লতো?” শ্রীমতী কাঁহল, “বাঁকটুকু বল।” কমলা ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিল, এই শীতের দিনেও তাহার কপালে মৃত্যুবিশ্বর মত স্বেদ বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। পরেশ কোমল নারী সেহে চাপ দিয়া কাঁহল, “বাঁকটুকু মধ্বে আসবে না—মনে মনে বলছ।” শ্রীমতী কমলাকে কাঁহল, “ওলো, তোর কি বলবার আছে বল দেখি।” কমলা শ্রীমতীর দিকে কটাক্ষ করিয়া মৃৎ নামাইল। শ্রীমতী কাঁহল, “বেশ! লক্ষ্য করিস তো আমি না হয় চলে যাচ্ছি।” বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া কাঁহল, “তোমরা বোঝাপড়া কর ভাই, আমি একটু আসছি।”

পরেশ প্রতিজ্ঞা-ভাষণ শেষ হইলেও কমলার হাত ছাড়ে নাই। কমলা ফিস ফিস করিয়া কাঁহল, “হাতটা ছাড়ুন।” পরেশ কাঁহল, “আর কি কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলে ফেল—একেবারে সেরে নিই।” জোর করিয়া হাতটা ছাড়িয়া লইয়া কমলা কাঁহল, “কিছ, প্রতিজ্ঞা করতে হবে না আপনাকে।” ঢোক গিলিয়া গাড় কণ্ঠে কাঁহল, “আমাকে ভাল লাগে না আপনাকে—” পরেশ কাঁহল, “ভাল লাগবে না কেন?”

“আমি কালো, মূখা, তাই—”

পরেশ চুপ করিয়া চাহিয়া রাইল। কমলা ধরা গলায় কাঁহল, “আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, বাবাকে বলে দিন না কেন। মিথ্যে কেন আশা দিচ্ছেন?” বলিয়া পরেশের মুখের দিকে একবার চোখ তুলিয়া আবার নামাইয়া লইল। পরেশ কাঁহল, “তোমাকে আমার ভাল লাগে না—তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই—এ সব কথা জানলে কি করে?” কমলা জবাব না দিয়া পরেশের দিকে পিছন ফিরায়া দেওয়ালে আঙ্গুলে মাঝতে লাগিল। পরেশ কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কাঁহল, “কি এমন করেছি আমি যে, দিদিমা যা-তা বললেন, তুমি রাগ করছে?” কমলা অশ্রু ঘন কণ্ঠে কাঁহল, “পাড়াগেয়ে কালো কুৎসিত মেয়ের আবার রাগ-অভিমান করতে আছে নাকি? আর করলেও কার কি আসে যায়।” এই কিশোরী মেয়েটির অভিমান কাঁচামিঠে আসের মত পরেশের ভাল লাগিতেছিল, ইহাকে চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করবার জন্য পরেশ কাঁহল, “তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের আসে যায় বই কি?” কমলা কাঁহল, “তা হয়তো যায়, কিন্তু আপনাকে?”

“আমারও আসে যায়, তোমার সঙ্গে যখন দুর্দিন পরে বিয়ে হবে আমার।” তব্র চাপা স্বরে কমলা কাঁহল, “আর বিয়ে হয়ে কাজ নেই, যাকে ভাল লাগে না, তাকে বিয়ে করে সারা জীবন নিজে জ্বলবেন, আর তাকেও জ্বলাবেন।”

পরেশ কাঁহল, “বেশ, আমি তা হলে যাই।” মেয়েটি চাঁকতে মৃৎ ফিরাইয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে কাঁহল, “চলে গেলেই তো বড়েন আপনি।” পরেশ কাঁহল, “তা কি করব? তুমি মিছেমিছে রাগ করছ, যা তা বলছ।” কমলা কাঁহল, “কি যা তা বললাম আমি?” পরেশ আহত স্বরে কাঁহল, “যা তা বলনি? আমাকে যে তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, সে আমাকে বলে মাত্ত কি? তোমার না বাবাকে বলে কিংবা শ্রীমতী দিদিমাকে দিয়ে বলিও।” কমলা মৃৎ ফিরায়া দাঁড়িয়া কাঁহল, “কখন আমি ও-কথা বললাম?”

“তা বললে বঁকি! আমাকে বিয়ে করে সারা জীবন জ্বলবে—বল নি তুমি?” কণ্ঠস্বর গাড় করিয়া পরেশ কাঁহল, “বেশ, আমি চিঠি লিখে তোমার বাবাকে সব জানিয়ে দিয়ে ভেঙে দিতে বলব।” বলিয়া দরজার দিকে চলিল। কমলা আগাইয়া আসিয়া কাঁহল, “দেখুন, মিথ্যে যা তা লিখবেন না। আমি যে আপনাকে একথা বলতে পারি, বাবা বিশ্বাস করবেন না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে যে আমার এমনই দেখা হয়, মা ছাড়া আর কেউ জানে না।”

পরেশ কাঁহল, “শ্রীমতী দিদিমাকে সাক্ষী মানব।” কমলা কাঁহল, “শ্রীমতী দিদিমা সাক্ষী দেনেন না।”

“বেশ বা হাতে তোমার নাম দিয়ে চিঠি লিখব।” কমলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কাঁহল, “আমি তো চিঠি লিখতে জানি না।” পরেশ

আপনার আজকের
“সেনকোই”

আপনার ভবিষ্যতের সহায়।

দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দশার
মধ্যেও কিছুর কিছুর সংঘর
করিতে চেষ্টা করুন।

ইউনাইটেড

ব্যাকিং কর্পোরেশন লিঃ

—হেড অফিস—

২০।সি, লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ
বাণ ও ওড়ারডাকট স্ট্রীট
সহিত অন্যান্যমোদির সিনিকটরটির উপর
দেওয়া হয়।

সর্বপ্রকার ব্যাকিং কার্য
করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এন. এল. মুনোজ, বি-এ

মিঃ এস. কে. ভট্টাচার্য, বি-এল

“সেনকো”
ব্যাটারি



মটর গাড়ী
রেডিওতে

ব্যবহার করুন।

ম্যানুঃ ইলেকট্রিক্যাল স্টোরেজ কোং,
পোস্ট বক্স ৬৮৬ টেলি “সেনকোব্যাট”,
কলিকাতা।

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর

অর্ধ শতাব্দিক বৎসর
যাবত

কুষ্ঠ-ব্যাধির
আদি চিকিৎসাকেন্দ্র

কুষ্ঠ, ধবলাদি

লিখিলেই বিস্তৃত
বিবরণাদি সম্বলিত
পুস্তিকা ও অন্যান্য
জ্ঞাতব্যাদি পাঠান হয়।

চর্মরোগ

চিকিৎসায় এই প্রতিষ্ঠানের সুশ্রবণ সর্বজনবিদিত। ধবল বা শ্বেতি, অসাড় ও গলিত
কুষ্ঠ, গাত্রে শিথিল বর্ণের দাগ, অগ্নাদি ফোলা, আগ্নুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা,
সোরাইসিস, প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্মরোগাদি ও দূষিত ক্ষতাদি নির্দেশ নিরাময়ের
ইহাই আপনার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ঠিকানাঃ—হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর
প্রতিষ্ঠাতা—লক্ষপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খরুট, হাওড়া। (ফোন—হাওড়া ৩৫৯)

শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কহিল, “না-ই বা জানলে, পাড়ার কোন মেয়েকে দিয়েও তো লেখাতে পারি!”

কমলা কহিল, “আমাদের বাড়ির বা পাড়ার কোন মেয়ে লিখতে জানে না।” অসহায়ভাবে পরেশ কহিল, “তা হলে কি করব, বল? আমাকে বিয়েও করবে না, অথচ এমনই করে ধমকাবে!”

কমলা কহিল, “আপনাকে ধমকলাম নাকি?”

“ধমকালেই তো! একটীবার ছুঁয়েছিলাম তো এমনই জ্বোরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে যে হাত এখনও ব্যথা করছে।” বলিয়া বাম হাতটি ডান হাতে ব্লাইতে লাগিল। কমলা কাছে আসিয়া কহিল, “কই দেখি আপনার হাত — আমি হাত বলিয়ে দিচ্ছি।” বলিয়া হাত বাড়াইতেই সরিয়া দাঁড়াইয়া পরেশ কহিল, “থাক, থাক, আমাকে ছুঁলে তোমার জাত নষ্ট হবে, আমি হাড়ি-ডোম—” কমলা হাসিয়া ফেলিয়া থপ্ করিয়া পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “এই দেখুন ছুঁয়েছি—হল তো! দেব বলিয়ে হাত?”

পরেশ গাড়কণ্ঠে কহিল, “দাও, কিন্তু আরও একটু কাছে সরে এস না।” ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে কমলা কহিল, “না—পরকণ্ঠেই কহিল, কেন?” পরেশ কণ্ঠ করিয়া হাত বাড়াইয়া কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃক্কের কাছে সজোরে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইল। কমলা দুই হাত পরেশের বৃক্ক দিয়া টেলিতে টেলিতে প্রত্যন্তবরে কহিল, “এখন না, বিয়ের পর। তখন কিছু মানা করব না।” তাহার ভীতা হরিণীর মত ভয়ানক দৃষ্টি, মুখের বিবর্ণ ব্যাকুলতা, কণ্ঠের কর্ণ কাঙ্কিত পরেশের মুহূর্তের আত্মবিশ্মিতিকে তীব্র কশাঘাতে নিরস্ত করিল। ছাড়িয়া দিয়া দলজ্ঞার মূখে কহিল, “কিছু মনে করো না কমলা, মাগ কর আমাকে।” বলিয়া দরদার খালায় বাহির হইতে উদ্যত হইতেই কমলা সানন্দ্যন কণ্ঠে কহিল, “আপনিও কিছু মনে করবেন না—বিয়ের আগে ও-সব ভাল নয়, এতে অমঙ্গল হয়।” পরেশ বাহিরে পা দিচ্ছেই কমলা কহিল, “কোথায় যাচ্ছেন? পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “বাড়ি যাচ্ছি।” কমলা কহিল, “কেন না—নির্মমাকে ভেঙে আনি, গল্প করুন।”

“আর তুমি?”

“আমি একঘারে বসে বসে শুনব।”

“তাতে তোমার লাভ?”

“আমার ভাল লাগে আপনার কথা শুনতে—” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আমার ওপর রাগ করেন নি তো?” পরেশ কহিল, “তুমিও করে না?”

সম্ভার অলংকারে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে পরেশ আজ বিকালের ঘটনা মনে পড়াতে আনন্দিত হইতে লাগিল। আজ সে স্ত্রীমতীর বাড়ি গিয়াছিল, শূন্য কমলার দর্শনলাভের জন্য নহে। সে আশা করিয়াছিল, কমলা হয়তো আজ কিঞ্চিৎ কোমল হইয়া উঠিবে এবং ভাবী বিবাহ বন্ধনের হাঁড়ির বদলে তাহার কাছ হইতে পরিপূর্ণ মূল্য না হোক, বাটা বদ দিয়া আংশিক মূল্য আদায় হইবে। নিজের কক্ষে স্ত্রীমতী যখন তাহাকে কমলার সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং অশ্রুস্রবী কমলা অভ্যন্তরিত বাক্যের দ্বারা তাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তাহার মনের মধ্যে ক্ষুধার্ত কামনা নিশ্চিত থাকার আশা লোভাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর কমলা যখন স্বেচ্ছায় তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রসন্ন দিল, চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আত্মসমর্পণের আভাস করিয়া উঠিল, তখন দুরন্ত কামনা দর্শনবার লোভে কাপাইয়া পড়িল। যদি কমলা তাহাকে বাধা না দিত, যদি তাহার ভদ্রতা, শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া নিজেই ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সে কি করিয়া বসিত বলা যায় না। নিজ হৃদয়ের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল, তখনও পর্যন্ত সেখানে তাহার ক্ষুধার্ত কামনা পিজরাবস্থ ব্যস্তের ন্যায় জরুলন্ত অগ্ন্যগারের মত চোখ লইয়া লালসিদ্ধ জিহ্বা বাহির করিয়া লোভে ও লালসার এ কোণ—ও কোণ করিতেছে।

(২৬)

পরদিন দুই-তিনটা দূর গ্রামের ডাক ছিল। কাজকর্ম সারিয়া বাড়ি ফিরিতে পরেশের তিনটা বাঁজিয়া গেল। স্নানান্যাস সারিয়া একটু-খানি বিশ্রাম করিতে বাইতেছে — এমন সময়ে স্কুলের চাকর আসিয়া একখানি চিঠি লি। ছেড়াশস্যের চিঠি লিখিয়াছেন—“বাড়ি হইতে খবর পাইলাম, আমার স্ত্রীর জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে। স্কুলে নানা কাজে এমনই বাস্তব আছি যে, বাড়ি যাওয়া খবর লইতে পারি নাই এবং গাঢ়

অটটার আগে পাঠের বলিয়া মনে হয় না। আপনি দয়া করিয়া একবার দেখিয়া যাইবেন।”

সম্ভার কিছু পূর্বে পরেশ ছেড়াশস্যের হাশ্বের বাড়িতে হাজির হইল এবং সন্ধান বৈঠকখানার মধ্যে গিয়া বসিয়া হাঁকিল, “থোকা!” আরতি আসিল ও মুখখানি চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়া কহিল, “দিদির জ্বরটা বেশি হয়েছে এবার।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “টম্পারেচার কত?”

“১০২°র উপর।”

“চলুন দেখি।” বলিয়া আরতির পিছনে পিছনে সন্ধানিতর শয়নকক্ষে হাজির হইল। একটা বিস্তৃত খাটে সন্ধানিত শূইয়াছিল—আপাদ-কণ্ঠ লেপে ঢাকা। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছেন?” সন্ধানিত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, “ভাল না। ভাগ্যে আরতি এসেছিল, না হলে কী যে হত!” পরেশ কহিল, “কিছু ভয় নেই—মালেরিয়া জ্বর নিশ্চয়।” রোগী দেখিয়া পরেশ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আমি চলি, ওষুধটা ঠিক করে রাখিবে, আপনারদের ঝিকি এখনই পাঠিয়ে দিন ওষুধটা আনতে।” আরতি অনুয়ের সুরে কহিল, “জামাইবাবু, যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ থাকুন আপনি—আমার ভয় করছে।” কি বরং প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে ওষুধ আনুক।” পরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “বেশ, আমি বসছি।” তাকে কার্তিক ভক্তরের ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা আনতে বলে দিল।” আরতি প্রেসক্রিপশনটা লইয়া চলিয়া গেল। ফিলি মিনিট কুড়ি পরে—ডান হাতে এক কাপ দুমায়িত চা। পরেশ অনামনস্ক-ভাবে মনোমুগ্ধ বসিয়াছিল, আরতি কাছে আসিতেই মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, “ও আবার কি?” আরতি কহিল, “কিছু না, এক কাপ চা শুন।”

চা খাইতে খাইতে পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কি কে পাঠিয়ে দিলেন?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া ‘হ্যাঁ’ জানাইল। পরেশ কহিল, “আজই অন্ততঃ দুই ভোজ খাইয়া দেখেন।” আরতি ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল। তারপর—দুইজনই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরেশ চা খাইতে লাগিল, আরতি হাসিয়া হাসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ আরতি প্রশ্ন করিল, “কার্তিক-ভক্তরের মেয়ের সঙ্গেই আপনার বে হবে, না?” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “কে বললে আপনাকে?”

“কি বলছিল—আসছে মাসে বিয়ে হবে।”

পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “তাই তো শুনছি।” মুখ টিপিয়া হাসিয়া আরতি কহিল, “নিজে বুঝি ভাবেন না! এদিকে মনে মনে দিন গনছেন সারাক্ষণ।” পরেশ জবাব দিল না।

চা খাওয়া শেষ হইলে আরতি কাপ লইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, হাতে প্লেটে করিয়া পান।

পরেশ কহিল, “আপনি দেখছি আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টি রাখবেন না। নিজে সজলেন নাকি?”

আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “সাজতে জানি নে নাকি ভাবছেন? ও-বেলা কার হাতের পান খেয়েছিলেন?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া অর্থনিয়ালিত চক্ষে সংগত কহিল, “ওঃ! তাই!” আরতি ওষুধকের সহিত কহিল, “কি?” ও-বেলা পান খাইয়া পরেশের জিব পুড়িয়াছিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত জিবটা নাড়িতে পারে নাই—দিনের বেলায় খাওয়ার সময়ে পর্যন্ত কণ্ঠ হইয়াছিল; কহিল, “তাই এত ভাল লেগেছিল—গ্রাজুয়েটের হাতের পান।” আরতি বাকা হাসি হাসিয়া কহিল, “ঠাট্টা করছেন বুঝি?” পরেশ কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, প্রশংসা করছি। আপনি আমাকে ‘অচল্য’ করে দিয়েছেন। কল্লেজে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছেন।” প্রশংসা হাসি হাসিয়া আরতি কহিল—“কি ধারণা ছিল আপনার?” পরেশ কহিল, “ধারণা ছিল, কল্লেজে পড়া মেয়েরা সেক্সপীয়র—রবীন্দ্রনাথ পড়ে বুঝতে পারে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে শক্ত শক্ত প্রবন্ধ লিখতে পারে, সভা-সমিতিতে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারে, কমুনিজম বলি আওড়তে পারে; কল্লেজের মাস্টাররাই হয়ে দেশোদ্ধারের প্রেরণা ও উদ্দামতা জোগাতে পারে; কিন্তু তারা যে আবার উল্লং হয়ে বসে ভাত-জাল সেখ করত পারে, হাড়ি প্লেটেতে পারে, পা মেলে বসে পান সাজতে পারে—” আরতি বাধা দিয়া কহিল, “বরোঁজ আপনার ধারণা কল্লেজে-পড়া মেয়েরা কিছুতুচ্ছমাকার জীব, তাদের নিয়ে সংসার করা চলে না।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। আরতি ক্ষুধার হাসি হাসিয়া কহিল, “কিন্তু জানেন পরেশবাবু তারা বিয়েও করে এবং আপনার প্যাড়ায়ের অবলা-সরলাদের চেয়েও সন্মানেরে সুখী করে। রঙিন পাখা মেলে তারা উড়তেও জানে, আবার পাখা গুটিয়ে বাসতে বসে সংসারধর্ম পালন

নিরাপদ x উত্তম
লব্ধির জন্য

স্বায়া আমানতে
বিনিয়োগ করিতে হইলে
ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল

প্রপার্টিজ লিঃ'এ

টাকা রাখুন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :-

বি, রায় এণ্ড কোং
৩ ও ৪নং হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন-কাল ৩৮৩৮

পরিবর্তিত সুদের হার

১ বৎসরের জন্য	৫%
২ বৎসরের জন্য	৫½%
৩ বৎসরের জন্য	৬%
৪ বৎসরের জন্য	৬½%
৫ বৎসরের জন্য	৭%

বিশেষ আমানত সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণাদি
জানিতে হইলে উক্ত ঠিকানায় আবেদন
করুন।

শারদীয়া সবে

প্রিয়জনের রূপ-সজায়

মোলানার

প্রীতিপ্রদ ডিজাইনের সাড়ী

আধুনিক তরুণী ও মহিলাগণের মনোরঞ্জে সমর্থ।

—আমাদের দোকানে—

বেনারসী, জর্জেট, মুর্শিদাবাদ, ঢাকাই, টাঙ্গাইল,
শান্তিপুরী, ছাপান সাড়ী, ধূতি ও মাজমজার
সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে।

মোলানা দি রু সপ

মোলানা ষৌরশ

৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট

১৩৬, ৩৮নং লোয়ার চিৎপদুর রোড

(প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট)।

(ফোন-বি দি ৩২৮৬)

মোলানা ফ্যাশি হাউস, ১৩১নং লোয়ার চিৎপদুর রোড, কলিকাতা।



ইণ্ডিয়ান পারফিউম প্রোডাক্টস

১৩৬-৪. অ পার সার ক্লা র রোড, কলিকাতা

করতেও জানে।" পরেশ চুপ করিয়া বসিল। আরতি কহিল, "আপনার হৃদয় গির্মাটি লেখাপড়া জানেন?" পরেশ কহিল, "কিছু জানেন বললেই ধারণা ছিল এতদিন, কাল শুনলাম—অক্ষর-পরিচয়ও নেই।"

"গান-বাজনা?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল।

"রান্নাঘর জানেন নিশ্চয়।"

পরেশ জবাব দিল, "তা জানেন।"

"পান-লোভা খান?"

পরেশ কহিল, "খান।" আরতি হাসিয়া কহিল, "তা হলে তো আপনার আদর্শ গৃহিণী; ভাগ্যে শহর থেকে পালিয়ে এসেছেন, না হ'লে এতদিনে কেউ ঘাড়ে চেপে বসলে এমন রক্তমাখা আর হয়ে উঠত না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি বসুন একটু, দিবাংকে একবার দেখে আসি।"

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে।" পরেশ কহিল, "ঠিক ঘরে কেউ আছে তো?" আরতি কহিল, "আছে বই কি! থোকা খুন্সের সঙ্গে খেলা করছে।"

চোয়ালে বসিয়া আরতি কহিল, "দিদির জ্বরটা কি সত্যি ম্যালেরিয়া?" পরেশ কহিল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" আরতি কহিল, "শীতকালেও ম্যালেরিয়া হয় নাকি?" পরেশ কহিল, "নতুন করে না হতে পারে, কিন্তু উনি তো বরাবরই এখানে থাকেন।" আরতি কহিল, "আমারও হবে নাকি?" পরেশ কহিল, "না হতেও পারে।" পরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আরতি কহিল, "অর্থাৎ হতেও পারে। তা হলে ভারী দুশ্কিন্দ হবে কিন্তু, আমার এমনই ছুটি কুঁরিয়ে এসেছে।"

পরেশ উদ্বেগে যথাসাধ্য চাপা দিয়া কহিল, "আর কতদিন বাকি আছে ছুটির?" ঘাড় নাড়িয়া আরতি কহিল, "দেখাশুন না।" মুখখানি স্থান করিয়া তুলিয়া কহিল, "অথচ সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারলাম না। আপনি দেখলেন না প্রথম থেকে, ভেবেছিলেন, লেখাপড়া জানা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ একটা মতোই মগলা।" পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "ছি! একথা বলবেন না।" তীব্রকণ্ঠে আরতি কহিল, "কেন বলব না? আপনার তো আমাদের মত মেয়েদের ওপর এই ধরণেরই মনোভাব।" পরেশ কহিল, "আমি তো বললাম আপনাকে, আগে ছিল, আপনি বদলে দিয়েছেন।" আরতি কহিল, "আমাকে আপনি 'আপনি' করেন কেন? 'তুমি' বলতে পারেন না?" পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "মানে আপনার সঙ্গে বেশি দিনের আলাপ নয় তো? মানে—" আরতি কহিল, "নেই বা হ'ল। মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্কের নির্দিষ্টতা কি পারস্পরের দীর্ঘতায় উপর নির্ভর করে? এক মুহূর্তের পরিচয় একজন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, আবার সারাজীবন পাশাপাশি থেকেও একজন অন্যরের অন্তরালেই থেকে যায়।"

বলিয়া দুই চক্ষের দুটি ঘন করিয়া পরেশের মুখের পানে তাকাইল। সেই চোখের সহিত চোখ মিলিতেই পরেশের বকের ভিতরটা দুইলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "সত্যেনাবাবু এখনও এলেন না।" আরতি কহিল, "আসতে দেরি হবে, স্কুল কামিটির মিটিং আছে।"

মুঠকি হাসিয়া কহিল, "আপনি এত ছটকট করছেন কেন? শব্দে বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "না।" মুখ গম্ভীর করিয়া আরতি কহিল, "তা হলে আমার সঙ্গ বুঝি আপনার ভাল লাগছে না? বেশ, আমি না হয় চলেই যাচ্ছি।" বলিয়া উত্তীর্ণের উপক্রম করিতেই পরেশ সাবধানে কহিল, "পাগল হলেন নাকি! উঠবেন না, বসুন।" সঙ্কোচে কহিল, "আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগে না—এই বুঝি এতদিন পরে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা হ'ল! আপনাকে যদি—"

আরতি বসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "আপনাকে?" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমাকে বলতে বাধা-বাধ ঠেকছে।" আরতি কহিল, "বাধা রেখেছেন বললে বাধা-বাধ ঠেকছে, আপনার বলে মনে করতে পারছেন না কিছুতেই। কিন্তু আমি আপনাকে অতি সহজেই 'তুমি' বলতে পারি।" পরেশ কহিল, "তাই বলুন আগে, তা হলে সহস্র হবে আমার।"

আরতি মুঠকি হাসিয়া শাণিত ইঙ্গিতের মত চকচকে চোখে চাহিয়া কহিল, "শুনলে আপনার হৃদয় গির্মা! কিন্তু কুব্ধের বাধিয়ে দেবেন। ভাববেন, কোথাকার কে তাঁর জিনিসে ভাগ বসাতে এসেছে।" পরেশ কহিল, "মানুষ কি কারও একবার জিনিস হতে পারে? সারাজীবন ধরে মত লোকের সম্পর্কে আসে, সকলের মধ্যে নিজেকে তিল তিল করে ভাগ করে দেয়।" আরতি কহিল, "বাকিলে দেয় তার বাচ্ছিক; কিন্তু বাচ্ছিক নিয়ে তো স্বাধী কোন প্রয়োজন নেই। সে চার বাচ্ছিকি এবং পুরোশুধি-

ভাবে, তাতে কাউকে কণামাত্র ভাগ বসাতে দিতে চায় না" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, "অন্তত আমার মত মেয়ে হ'লে—" পরেশ কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিল, "আপনিও ওই দলের নাকি?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়।" কিন্তু আপনি আমার 'আপনি' বলছেন?" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "না না, তুমি।" বিমল হাস্যে মুখ উন্মোচিত করিয়া আরতি কহিল, "গুড্ বয়। কথা শুনলে এত ভাল লাগে। আমার যে ছাত্রীরা আমার খুব কথা শোনে, তাদের আমি খুব ভালবাসি।" বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুইটি পরেশের মুখের উপর নাস্ত করিল। পরেশ সাহসী হইয়া উঠিয়া কহিল, "সত্যি নাকি! আমিও তো তোমার অন্তত আজীবন হয়ে উঠছি।" মুখ লাল করিয়া আরতি কহিল, "যান—আপনি ভারী দুচ্ছাঁ!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চট্টল কণ্ঠে কহিল, "আপনারও ভালবাসা চাই নাকি?"

বদিকে পরেশের মনে পড়িল—শান্ত, নম্র, ধীর, শ্রী ও হী-মতী মেয়েটি, ভালবাসার কণ্ঠধারা বৃকে লইয়া তাহার জীবন হইতে বসিয়া পড়িয়াছে। কমসার মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা মনে পড়িল, 'বসুন না, গল্প করুন, কথা শুনতে ভাল লাগে আপনার—' কমলাও ভালবাসে তাহাকে।

পরেশ কহিল, "তাই বই কি! বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, আমার সঙ্গে যে বন্ধু পাতিয়েছিলে জুলে গেছে নাকি?" আরতি মুখে রক্তাভা মুহূর্ত মধ্যে মিলাইয়া গেল, শূন্যকণ্ঠে কহিল, "ভুলি নি।" আর দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি মৃদু বিরস কণ্ঠে কহিল, "সারা-দিন আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না—হাতটা একবার দেখুন না দয়া করে।" পরেশ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল, "বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার করে 'দেখুন' 'দয়া করে' এই সব কথা?"

আরতি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "কি বলতে হবে?"

পরেশ কহিল, "বন্ধু বা বন্ধকে বলে।"

আরতি কহিল, "পরে বলব" বলিয়া ডান হাতটি বাড়িয়া দিল।

পরেশ ডান হাত দিয়া আরতির মনিবক্ষটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে 'পরে বলব'?"

আরতির নবনীত কোমল শব্দ স্মৃতিতে বাহুটির দিকে তাকাইয়া এই বাহুমোলা একদা যে ভাগ্যবানের কণ্ঠে বিলম্বিত হইলে, তাহার প্রতি পরেশ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নাড়ী দৌঁবিয়া পরেশ কহিল, "কিছু হয়নি তোমার।"

অভিমানের সুরে আরতি কহিল, "আপনার তো ওই কথা কিছু হয়নি।" বলিয়া ঠোঁট ফুলাইল। পরেশ হাসিয়া কহিল, "কিছু না হলেও হয়েছে বলতে হবে।"

পরেশের মুখের পানে একবার নিখর ন্যসে তাকাইয়া মুখ নত করিয়া আরতি কহিল, "আমার ভাল লাগছে না এখানে, দিদি একটু সেরে উঠলেই চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

তীব্রকণ্ঠে আরতি কহিল, "কেন? চলে আসার আছে বলুন যে, যাব সেখানে।" ফিরে যাব আমার স্বপ্নের চাকরিতে।" বলিয়া ডান হাতের তালুনি দিয়া টেবিলের উপর কি লিখিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "আমার ওষুধটা আরও দিন কতক ওয়াল দেওয়া উচিত।"

আরতি কহিল, "থাকগে, কি হবে ভাল হয়ে পরেশবাবু! এই তো জীবন! না নেই, বাবা থেকেও নেই, সত্যিকার আপনার জন বলতে কেউ নেই। শেওলার মত ভেসে ভেসে বেড়াই, এ ঘাটে ও ঘাটে, দাসী-বতি করে জীবিকা অর্জন করি পরের মন জুড়িয়ে। জীবনে মুখ নেই, আনন্দ নেই, কারও কাছে কোন মূল্য নেই।" বলিয়া উঠিয়া বাঁহরে অক্ষরকার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। পরেশও প্রচলন পিছনে গিয়া কান দাঁড়াইল। আরতি তখন জড়িত কণ্ঠে কহিল, "এখন যাবেন না।" পরেশ সর্বিষ্ময়ে কহিল, "তুমি কাদছ নাকি?" ধরা গলায় আরতি কহিল, "না।"

পরেশের কি জানি কেন মন্তব্য ঘটিল—চট্ করিয়া আরতির গালে হাত দিয়া কহিল, "এই যে কাদছ।" সরিয়া দাঁড়াইয়া আরতি কহিল, "ক'য়া পলে কাদব না? এও কি আপনার ডাক্তারী শাস্তে নিষেধ নাকি?"

পরেশ নিজের হঠকারিতার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, কমলার মতই আরতি বিদ্যুৎপটের মত শিহরিয়া উঠবে, দীর্ঘ চক্রে চাহিয়া, তীব্রকণ্ঠে ভৎসনা করিবে। কিন্তু তাহার কিছই হইল না। শিথল বস্ত্রিত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আছে বইকি! কাদলে শরীর আরও খারাপ হবে।" সামনে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আরতি কহিল, "হোক বালাপ, আমার মরণই ভাল।"

বেনারসীর

জন্য

মোহিনীমোহন কাঞ্জীলাল

পূজার রকমারী তাঁতের
ও ফ্যান্সি সাড়ী আমাদের
নীচের শো-রুমে
দেখুন।

কলেজ স্ট্রীট—হ্যারিসন রোড
জংসন
ফোন—বি. বি. ৪৫২০

আপনার আজকের

“সম্পত্তি”

আপনার বার্ষিকের এবং পরিজনবর্গের ভবিষ্যতের সহায়।

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

≡ এসিওরেন্স লিমিটেড ≡
হেড অফিস—দিল্লী।

সেন্ট্রাল অফিস—৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা।

ব্যাংক অব কালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্বত্র
এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যিক।

ফোন—ক্যালঃ ২৭৬৭

গ্রাম—“জনসম্পদ”



Have a Tenor

টেনর সিগারেট লউন

যদি আসল ভার্জিনিয়া তামাক পছন্দ করেন তাঁদের জন্য; এই চড়া দামের দিনেও আপনি ডি লাক্স টেনর সিগারেটের মিল্ট মধুর মৃদুপান করিয়া দশ মিনিটকাল বেশ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। ভার্জিনিয়া তামাকের বাছাইকরা পাতা হইতে এই টেনর সিগারেট প্রস্তুত করা হয়, এই সিগারেটের সুমধুর গন্ধই আজ পৃথিবীর সর্বত্র সৌখীন সমাজে সমাদৃত। আমাদের রেডই সৌখীন মৃদুপায়ীদের নতুন গ্যাংডাড হিসাবে—এমনকি যাহাদের কণ্ঠনালী সহজেই রোগাক্রান্ত হয়, তাঁরাও উহাকেই অত্যাধিকৃষ্ট জিনিষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

Tenor

..is truly
a de Luxe
Cigarette



JAMES CARLTON LTD. LONDON. EASTERN LICENCEES. POST BOX NO. 470 CALCUTTA

“ছিঃ! ওকথা বলো না।”

“আমার মরণ হলেও রোগীর অভাব আপনার হবে না।”

“আমি কি তোমাকে রোগীর মত দেখি?”

“তা ছাড়া আবার কি?”

“কেন! বশুর মত—”

বাক্যের দিয়া আরতি কহিল, “চাইনে আপনার বশুঃ!” পরম বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, “তবে কি চাই?” আরতি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “তা আপনার জেনে কি হবে? সে জিনিস দেবার সাধ আপনার নেই।” বলিয়া নীলাভ কক্ষ আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আরতির অন্তরের এই অকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাঁর বিদ্রোহ বিকাশের মত তাহার হৃদয় ও মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। বিহবলের মত সে আরতির মূর্তির হৃৎ স্পির হেহের পানে তাকাইয়া রহিল।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আরতি কহিল, “জামাইবাবু আসা না পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন, আমি দিদির কাছে যাচ্ছি।” বলিয়া ধীরপদে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে পরেশ সন্ধ্যাতিকে দেখিতে গেল। সত্যেনবাবু চিন্তিত মুখে বসিয়া ছিলেন। পরেশকে দেখিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আসুন।” কিন্তু পরক্ষণেই চিত্তের কলো মেঘ সে হাসিটুকু গ্রাস করিয়া লইল। পরেশ কহিল, “কেনমন আছেন?” সত্যেন কহিল, “ভাল নয়, সকালেই টেপারের ১০২০।” পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “রঙটা পরীক্ষা করতে পারলে হত, কিন্তু এখানে কোন উপায় নেই, তা হলেও আমি একবার কুইনিন দিয়ে দেখব, যদি রেস্পনড করে ভাল, না হয় তো অনাচারে চিকিৎসা করতে হবে।” সত্যেনবাবু শব্দকম্পে কহিলেন, “তা হলে তো টাইফয়েড—”

সাহস দিয়া পরেশ কহিল, “পেরোপুরি টাইফয়েড নাও হতে পারে, পায়া টাইফয়েড—”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সত্যেনবাবু কহিলেন, “সে তো একই।”

সন্ধ্যাতিক মধ্যাহ্নের আরতির দেখা মিলিল, বাসি পশ্চাত্তরের মত শ্লান বিষয় মুখ। আরতি সন্ধ্যাতিক শিরারে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বিচানা হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “খাব মাথার বেদনা নাকি?” আরতি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সন্ধ্যাতিক ঘাড় নাড়িয়া ‘হী’ জানাইল।

“কাল রাতে ঘমা হয়েছিল?”

সত্যেনবাবু জবাব দিলেন, “ভাল হয় নি।”

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আরতি পাশ দিয়া রামাঘরের দিকে বাইতছিল, পরেশ তাহাকে কহিল, “একটু হাত ধরে জল দিতে পার?”

আরতি গম্ভীর বদনে কহিল, “দিচ্ছি পাঠিয়ে।”

বৈঠকখানায় আসিয়া প্রেসক্রিপশান করিয়া দিয়া পরেশ কহিল, “আপনি ওষুধটা কার্তিক-ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে আনিয়া নেবেন। আমি এখন আসি। ও বেলা এসে দেখে যাব।” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সত্যেন কহিলেন, “বসুন একটু, আরতি বোধ হয় চা করতে গেছে।” পরেশ বসিয়া কহিল, “আবার ওষুধ হাস্যামা কেন? একে বাড়িতে অসুখ, তার ওপর ওর একলার উপরেই তো সব কাজ।” সত্যেন কহিলেন, “হ্যাঁ, ভাগে ও এসেছিল, না হলে উপোস দিতে হত আমাদের। আমি তো ওষুধ বিষয়ে একবারে আনাড়ী কিনা!” পরেশ হাসিয়া কহিল, “আমিও তাই। মাসীমা দয়া করে না এসে ভারী বিপদে পড়তে হত। কিন্তু এতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। ইংরেজরা যেমন আমাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে আমাদের রণ-বিমুখ করে রেখেছে, মেয়েরাও ভেমনই আমাদের হাতা-বেড়ী কেড়ে নিয়ে রামা-বিমুখ করে রেখেছে। হাতিয়ার আর হাতা হাতে গেলে—” সত্যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল, বলিয়া উঠিল, “আজ্ঞা, পরেশবাবু, যদি টাইফয়েড বলেই সাব্যস্ত হয়, তা হলে এখানে রাখা ঠিক হবে তো?” পরেশ ব্যস্ত ভাষা তাহার বস্তুতা মাঠে মাঠা গিয়াছে; কহিল, “কেন?”

“ওষুধপত্র পথ্য এখানে পাওয়া যাবে তো?”

“যাবে না কেন? এদেশে কি কারও টাইফয়েড হয় না? না, টাইফয়েড হলে সারে না?” সত্যেনবাবু চিন্তাকুলমুখে কহিলেন, “তা বটে। তবে এখানে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, আমি তো স্কুলের কাজেই সারাদিন ব্যস্ত, আরতির শরীরও ভাল নেই—সেবা করবে কে, সংসারই বা দেখবে কে?”

পরেশ কহিল, “আপনি কি এখান থেকে নিয়ে যেতে চান?” সত্যেন কহিল, “হ্যাঁ সেখানে সবাই স্বপ্ন রয়েছেন—” পরেশ কহিল, “বেশ, আরও একদিন দেখি, যদি সুবিধে না হয় তাই করবেন।”

করণ কণ্ঠে সত্যেন্দ্র কহিলেন, “তখন উপায় থাকবে তো?”

পরেশ কহিল, “তা থাকবে।”

আরতি আসিল না, দুখের মা দুই কাপ চা লইয়া আসিল। সত্যেন কহিল, “তোমার মাসীমা কি করছেন?” দুখের মার বস চীৎস পায় হইয়া গেলেও ভারী লজ্জাবতী, লজ্জায় থসুথসে হইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, “মাসীমা ছ্যান করতে গেইছেন। এখন আসতে পারবেন নিকো।” বলিয়া ঘোমটার আড়াল হইতে পরেশের দিকে এক চোখ চাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

সৈদিন সন্ধ্যার পরও পরেশ আসিল। সত্যেনবাবু বাড়িতেই ছিলেন, আরতি রামাঘরে ছিল। রোগী দেখিয়া গল্প করিয়া চলিয়া আসিল। আরতি একবারও দেখা দিল না।

রাতে খাওয়ার পরে ডাক্তারী বই সামনে লইয়া পরেশ আরতির চিন্তা করিতে লাগিল। একটা দিনের মধ্যেই আরতি যেন আবার অপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছে। কাছে আসে নাই, কাছে গেলে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কথা কহে নাই, কথা কহিতে গেলে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কি তাহার অপরাধ? বশুঃ আরতির বশুঃ হইয়াছে, বশুঃের চেয়ে বড় কিছু তাহার কাছে নয়। তাহা যে কি সে আন্দাজ করিয়াছে। কিন্তু ইহাই আশা করিয়া দি আরতি আহাৰ সাহিত আলাপ করিয়াছিল। তাহারাই হিন্দু, সমাজের ছেলেমেয়ে; তাহাদের জাতি ভিন্ন; একত্রে সামাজিকভাবে তাহাদের মিলন যে অসম্ভব, তাহা তো আরতি বুকে। তাহা ছাড়া তাহার নিজের অবস্থাও অত্যন্ত জটিল। কমলার সাহিত তাহার বিবাহ স্থির এবং যতদূর বুঝা গিয়াছে কমলা এখন হইতেই মনেপ্রাণে পরীক্ষার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এখানে লওয়াই যে লাভ ও লোভনীয় তাহা এ কয় দিনেই প্র্যাক্টিসের সূত্রহাতে বুঝা গিয়াছে। আরতিকে বিবাহ করিয়া অকালে তরী ভাঙাইবার যদি তাহার শক্তি ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তো সে বাকিকেই বিবাহ করিতে পারিত। বাকিকে মনে পড়িল পরেশের মনে পড়িল সৈদিনের তাহার সেই অপ্রসিদ্ধ মুখখানি। বাকি বিয়া লইয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে যদি কোন দিন সে গ্রামে আসে, আর সে এখানে থাকে, হয়তো তাহার সাহিত দেখা হইবে। কিন্তু সৈদিন তাহার সীমন্তে থাকিবে পর্যাধিকারের রক্তপাতাকা, প্রকণ্ঠে লৌহ নিগড়। সৈদিন তাহার দুখের দিকে তাকানো পর্যন্ত চলিবে না, অনাচারীয়ার অরণ্যেই দৃষ্টিপথ রোধ করিবে এবং যে ভালবাসা গেছে রক্তস্রোতের মত নিঃশব্দ-গতিতে তাহার মনের শিরা উপশিয়ার একদা প্রবাহিত হইত, তাহা ততদিনে হয়তো জমাট বাঁধিয়া উঠিবে। কিন্তু গ্রামান্তের ক্ষুদ্র নদীটি হঠাৎ শুকাইয়া গেলে বা গতিপথ পরিবর্তিত করিলে যেমন মন ক্ষুধ হয়, কিন্তু তাঁর বেদনায় আর্ত হইয়া উঠে না, বাকিকে হারাইয়াও পরেশের মনে তেমনই ক্ষণিক ক্ষোভ জন্মিয়াছে, কিন্তু জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির তাঁর বেদনাবোধ জন্মে নাই। কারণ, বাকির ভালবাসা তাহাকে আত্মতৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু আত্মার ক্ষুধা মিটার নাই। যে বস্তু তাহার সমস্ত অন্তরাখা অহরহ ‘গমনা’ করিতেছে, তাহা বাকির ছিল না, কমলারও নাই, তাহা হয় তো আরতির কাছে মিলিতে পারে। অথচ আরতিতে পাওয়ার পথে কত যে অন্তরাখা, তাহা তাহার নিজের বা আরতির কাহারও অবদিত নয়। তবু আরতি যে দিন দিন দূরে সরিয়া বাইবে এবং আঁচরে দৃষ্টিপথী অতিক্রম করিয়া চিরদিনের মত হারাইয়া বাইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মন বাথার নীল হইয়া উঠিল।

(২৮)

দুই দিন পরে। সকাল আটটার দূরের একটা ডাকে হাইবার পথে পরেশ সন্ধ্যাতিকে দেখিবার জন্য হেডমাষ্টারের বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বৈঠকখানা দুখের মা কাঁটি দিতেছিল। পরেশকে দেখিয়া কাঁটা ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া ললল হইয়া উঠিল। পরেশ কহিল, “এরা সব কোথায়?” দুখের মা মিহি গলার কহিল, “মাসীমা শ্বশুরের, রাত জেগেছেন কি না!” পরেশ কহিল, “স্বশুর?” দুখের মা কহিল, “বসুন, ডেকে দিচ্ছি।” সত্যেন্দ্র আসিয়া কহিলেন, “ওই যে ডাক্তারবাবু।” বসিয়া কহিলেন, “কাল সন্ধ্যারত ভারী হটহট করেছেন—ভোরের বেলা শ্বশুরে পড়ে, এখনও জ্বরে।” পরেশ কহিল, “অহলে জগাবাবু দরকার নেই, ওষুধ বা

ফু টি বল— D. G. B. —ফু টি বল

ব্র্যান্ডের সহ	৫নং	৪নং	৩নং
স্পেন্সিয়াল ইংলিশ T.	২২।০	১৮	১৪
ইম প্রভুভ ইংলিশ T.	২০.	১৬।০	১৩।০
বেস্ট ইংলিশ T.	১৮।০	১৫।০	১২.
নিউ স্পেন্সিয়াল T.	১৭।০	১৫.	১২.
ইম প্রভুভ D.G.B. T.	১৫.	১৩.	১০।০
1944 I. F. A. T.	১৩।০	১১।০	৯.
নিউ কহিনুর T. '44'	১২.	১০।০	৮.
বেস্ট স্ট্রুভেট T.	১০.	৮.	৭.
স্পেন্সিয়াল সার্ভিস	১৬।০	১৩।০	১১.
স্পেন্সিয়াল ফেলাব	১৪।০	১২।০	১০।০
স্পেন্সিয়াল ম্যাচ	১৩।০	১২.	৯.
স্কুল ম্যাচ	১০।০	৯.	৭.
বেস্ট স্পোরী	৯।০	৮.	৬।০

২নং ৪, ১নং ৩, ভীল বল—১০.
ফুটবল বট উৎকৃষ্ট ১৬।০, মধ্যম ১০।০

ব্র্যান্ডের—১নং ১৮.০, ২নং ১৬.০, ৩নং ১১.০,
৪নং ৯।০, ৫নং ৯।০। মশলাদি ৮.

ইনফ্রাটর—১নং ১৮.০, ২নং ১৬.০, ৩নং ১১.০,
৪নং ৯.০, ৫নং ৯.০

ফুটবল মোকা—ফুট লেস উৎকৃষ্ট ৫।০, সাধারণ
২৮.০, ফুটহ উৎকৃষ্ট ৭.০, সাধারণ ৩।০।

ব্যাটমিন্টন ব্যাট—প্রত্যেকটি ১নং ১০.০, ২নং ৭।০,
৩নং ৫।০, ৪নং ৪।০, ৫নং ৩।০, ৬নং ২।০,
৭নং ১।০, ৮নং ১.০।



পালকের বল কম্পিটিন—প্রতি ডজন ১নং ১৮.
২নং ১৫, ৩নং ১২.০, প্রাক্টিশ সুপিরিয়র
১নং ১০.০, ২নং ৮.০, ৩নং ৬.০।
জমির সুপিরিয়র ১নং ৫.০, ২নং ৪.০, ৩নং ৩।০
ডজন। চিপ কোয়ালিটি ২।০ ডজন। পালকের
বল ও ব্যাকটের অর্ডার দিবস সময় অন্ততঃ
১. অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

ব্যাটমিন্টন নেট অর্ডিনারী ছোট ৮.০, মাঝারী ১৮.০,
বড় ৮.০। প্রাক্টিশ ১নং ১১.০, ২নং ৩.০, ৪।০।
কম্পিটিন ১নং ৫।০, ২নং ৭।০, ৩নং ১০।০।

ভীলনেট ১নং ২।০, ২নং ৩।০, ৩নং ৫।০।
কম্পিটিন ১০.০ ও ১৫.০।

কাপ—৩" ১৮.০, ৪" ২১.০, ৫" ২৩.০, ৬" ২৬.০,
৮" ৩০.০, ১০" ৩৮.০, ১২" ৪২.০, ১৫" ৫০.০।

মেডেল অর্ডিনারী ৮.০, উত্তম ১নং ১০.
২নং ১৮.০, ৩নং ২০.০।

ছিপ, ব'ড়শী, সূতা, হুইল, ফাতনা
ফোল্ডিং ছিপ তিন ভাগ ৮।০।

পিতল হুইল অর্ডিনারী ১।০, ১।০, ২" ২.
২।০, ২।০, ৩" ৩.০। মধ্যম ২" ৩.০, ২।০, ৩দ, ৩" ৪।০।

উৎকৃষ্ট এলুমিনিয়াম পারফরেটেড ২" ৪.
২।০, ৩" ৬.০, ৩।০ ৮.০, ৪" ১০.
৪।০, ১১.০, ৫" ১২।০।

মগা সূতা—নকল ১, আসল ২, ঐ উত্তম ২।০।
হাতে পাকান একপ্তা স্পেন্সিয়াল ৪।০ প্রতি ভরি।

ব'ড়শী—বর্ষমান ও মনেখালী বড় ১০, মাঝারী ৮.
ছোট ৮.০, জোড়া খটান মজুরী ৮.০ প্রতি জোড়া।

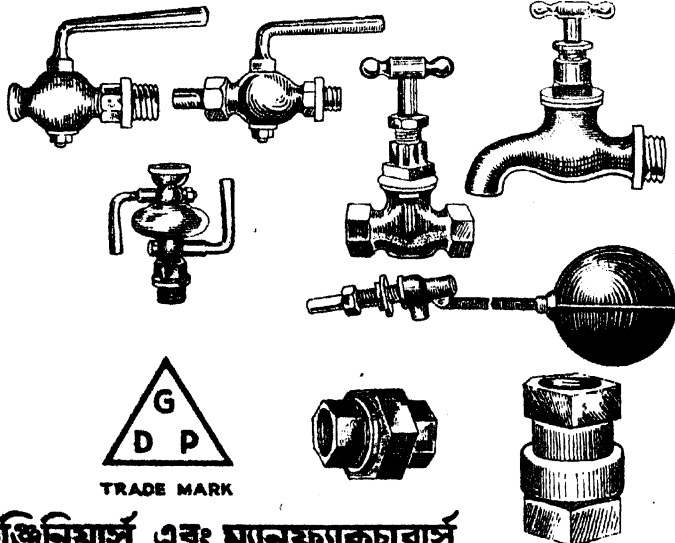
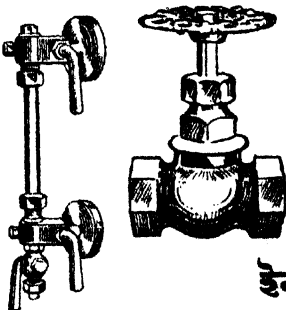
ডি, জি, বি গোল ব'ড়শী ৮.০ জোড়া। বিলাতী
খাচের বা কাতলা ব'ড়শী ১।০ জোড়া।
ঐ দেশী ৮.০ আনা। দেশী লিম রীক হুক (টম-
সনের নায়) (১—২০) ২০, হাজরা। ফাতনা
প্রত্যেকটি ৮.০, চার ৮.০ কোটা।

দশ গুণ্ত বাদাস এণ্ড কোং

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—৭৭।১, হ্যারিসন রোড।

ফোন বি বি ৬৭৪৫

ডালের কল
সংক্রান্ত
যাবতীয় সরঞ্জাম
প্রস্তুত কারক



ইনজিনিয়ার্স এবং ম্যানুফ্যাকচারার্স

গোবরধন দাস পি, এ,

২৮নং ক্রাউড স্ট্রীট, কলিকাতা

সেওরা আছে, তাই খাওয়ারান, আমি ফিরতি-পথে দেখে যাব।" সত্যেন কহিল, "কখন ফিরবেন?" পরেশ কহিল, "ডেইলিভারী কেস, দেরি হবে সম্ভবতঃ; যখনই ফির দেখে যাব নিশ্চয়ই।"

ফিরতি-পথে পরেশ সত্যেনের বাড়িতে নামিল। বেলা প্রায় দুইটা। দরজায় থাক্স দিতেই আরতি দরজা খুলিয়া দিল। পরেশের মূখের দিকে একবার তাকাইয়াই মূখ নামাইয়া লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই পরেশ কহিল, "আপনার দিদি কেমন আছেন?" আরতি জু দুইটিতে কণীণ কুণ্ডনের আভাস জাগাইয়া কহিল, "ভাল নয়, বসুন।" বলিয়া চলিয়া গেল।

থোকা আসিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু আসুন।" থোকায় সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, আরতি নাই। খাটের পাশে চেয়ারে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছেন?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "ভাল না।" পরেশ কহিল, "দেখি একবার হাতটা?" সুনীতি হাত বাড়াইল। জরুরতঃ হাতখানি নিজের হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মূখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সত্যেনবাবু! কুল?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া 'হা' জানাইল। অদূরে একটি টেবিলের উপর একটা কাগজে জরুরের তাপ-মাত্রা-ভালিকা লেখা ছিল। কাগজটি দেখিয়া পরেশ কপাল কঁচকহিল তারপর থোকাকে কহিল, "চল থোকা, বাইরে যাই।" এমন সময়ে আরতি আসিয়া সুনীতির কানে কানে কি বলিতেই সুনীতি কণীণকণ্ঠে কহিল, "আরতি আপনাকে নিয়ে খেয়ে যেতে বলছে।" পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিছ দরকার নেই, আমি বাড়িতে গিয়েই খাব এখন। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, এখনই যেন আনিয়ে নেওয়া হয়।" বলিয়া যাইতে উদ্ভূত হইতেই সুনীতি কহিল, "বেলা অনেক হয়ে গেছে, খেয়েই যান।" পরেশ কহিল, "তা হোক, তা হোক, ব্যস্ত হবেন না, তা ছাড়া বাড়িতে মাসীমা অপেক্ষা করে বসে আছেন।" বলিয়া আরতির দিকে চাহিতেই একটি সুতীক্ষ্ম কটাক্ষাঘাত লাভ করিল। সামলাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "নন্দকার, চল।" বলিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল। একটা কাগজ টানিয়া লইয়া প্রেসক্রিপশন লিখিয়া থোকায় হাতে দিয়া কহিল, "তোমার মাসীমাকে দাওগো।" তারপর বৈঠকখানা হইতে বাইরে হইয়া সদর দরজায় পৌঁছিতেই পিছন হইতে আরতির ভীক্ষ্ম কণ্ঠের ডাক শুনিয়া থোকায় দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, আরতি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টুকটেকে রাজমুখ, শাণিত ছাঁর ফলার মত চোখ, কম্পমান ওষ্ঠাধর—

আরতি মূহূর্তকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চাপাকণ্ঠে কহিল, "আসুন।" পরেশ কাছে আসিয়া কহিল, "মাসীমা অপেক্ষা করছেন যে।" আরতি অশ্রুঘনকণ্ঠে কহিল, "আমিও অপেক্ষা করে আছি, এখনও খাইনি আমি।" পরেশ কহিল, "তাই না??" দেখুন দেখি কি অন্যায়—বাড়িতে অসুখ।" আরতি জবাব না দিয়া চলিয়া গেল, পরেশ আসিয়া চেয়ারে বসিল।

স্নান সারিয়া থাইতে বসিয়া পরেশ কহিল, "আপনিও বসে গেলেন না কেন?" আরতি একটা পাখা হাতে সামনে বসিয়াছিল, জবাব দিল না। ভাতে হাত দিয়া পরেশ আরতির মূখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখনও গরম রয়েছে।" আরতির মূখে একটি অতি কণীণ আভা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, "বসে রইলেন কেন? যান, খেয়ে নিন গে।" আরতি মৃদুস্বরে জবাব দিল, "পরে খাব এখন।"

পরেশ কহিল, "ডাক্তার হিসাবে আমার কথা আপনার শোনা উচিত। এক রোগী নিয়েই সব অস্ত্রের, তার ওপর আপনি পড়ে গেলে সত্যেনবাবুর হাতে লাগা উঠবে যে।" আরতি গম্ভীর মূখে জবাব দিল, "আপনি খেতে দেরি না করলেই আমার দেরি হবে না।"

পরেশ কহিল, "তা বটে। আমার কথা যখন আপনি শুনবেনই না, তখন তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।" বলিয়া থাইতে সুরু করিল। আরতি কহিল, "আপনি আমার আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন।" পরেশ মূখ তুলিয়া কহিল, "তা কি করব? যা সব সময় হেডমাস্টারের মত গোমড়া মূখ করে দেখেছেন, তুমি বলতে সাহস হচ্ছে না।" আরতি ঝিক্কা হাসি হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টার! আপনি আপনার কমলরাণী কমলের মত মূখই বা কোথায় পাব; আর তেমন হাসিই বা কোথায় পাব?"

পরেশ আমত্বে অমৃত্যু করিয়া কহিল, "তা কি আমি বলছি? হাসি কখন কখন ভারী ঝাঁপ করতেন।"

থাইতে থাইতে হঠাৎ মৃদু কণ্ঠস্বর পরেশ কহিল, "আরতি! ডাক্তার—"

দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া উঠি। চোখে চোখে মিলিতেই আরতি কহিল, "ওকি খামলেন যে।" পরেশ কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না?" আরতি কহিল, "কি?"

"আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করিতে গেলেন কেন?"

আরতি জবাব দিল, "আপনি আমাদের জন্যে এত করছেন, তার বদলে এটুকুও করব না?"

পরেশ কহিল, "আর কোন কারণ নেই তো?"

আরতি কহিল, "না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ইবৎ ধারালো স্বরে কহিল, "থাকলেও আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই।"

পরেশ নতমূখে থাইতে প্রবৃত্ত হইল।

সেদিনের আরতির আত্মপ্রকাশের পূর্ব মূহূর্ত পৰ্ব্বত পরেশ আরতির প্রতি তাহার আকর্ষণকে একতরফা বলিয়া জানিত ও ভাবিত, ইহা একজন যুবতী নারীর সাহচর্যে যুক মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহার আশ্রয়, আরতি যতদিন চোখের সম্মুখে থাকিবে ততদিন পৰ্ব্বত, আরতি অন্তর্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাগণের মত উহা মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু আরতিও যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা আশা করিবার মত অস্বাভিমান তাহার ছিল না। তাহা ছাড়া তাহার সামাজিক সংস্কার, সাংসারিক বশিষ্ঠ, বিশেষ করিয়া কমলার সহিত তাহার অবশ্যস্বাভাবী বিবাহ-যোগ্য অবিরত স্ন-সংকেত করিয়া তাহার মনকে নিরস্ত করিত। কিন্তু যখন আরতি তাহার কাছ হইতে ঠুনেকা বশুণ্ডের বদলে মল্লবত কিছ চাহিয়া তাহার প্রতি নিজের আলাভের আভাস দিল এবং তাহার অপরাগতার অভিমান প্রতি মূহূর্তে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন হইতে পরেশ নিজের মনকে নবলব্ধ জ্ঞানের অলোকে নতুন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, আরতির প্রতি তাহার যে আকর্ষণকে সে নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার বলিয়া অবহেলা করিয়াছে, তাহা তাহার অন্তরে তাহার জীবনের গভীর ভিত্তিমূলে নড়া দিয়াছে। সমাজ, সংসার, আত্মীয়স্বজনের প্রীতি, আর্থিক উন্নতির প্রাতি লোভ, কমলার প্রাতি মোহ ও কতাবশিষ্ট, যাহা তাহার মনকে চারিদিক দিয়া এতদিন টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা যেন ক্ষুদ্র শিথিল ও শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, আরতি যদি হৃদয়ের সত্য ভলবাসার জোরে একবার টান দের তবে তাহাঙ্গা যে এক মূহূর্তে টুকরো টুকরো হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে এ সম্বন্ধেও সে ক্ষুদ্র নিশ্চিন্দ হইয়া উঠিল। আজ তাহার জন্য আরতির প্রীতিপ্ৰণোদিত উৎসব, তাহার কণ্ঠস্বরের জন্য ফ্রেস স্বীকার ও ভাষকে চালিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার আশাত্যাগজনিত প্রিয়জনসুলভ রোষ, তাহাকে নিঃসন্দেহভাবে বুকাইয়া দিল যে, আরতি তাহাকে ভালবাসে। যে ছেলে বরাবর টানটানি করিয়া পাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সবপ্রথম হইয়া পাস করার মত তাহার সাধারণ জীবনে ইহা এত অসম্ভব, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব ঘটনা যে, তাহার মন বিস্ময়ে ও পূন্যকে আকৃষ্ট হইয়া উঠিল।

আরতি কহিল, "কি এত ভাবছেন?" পরেশ অনমনসকভাবে কহিল, "কিছ না।"

আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভাবছেন বইকি। না হ'লে খেতে ভুলে যাচ্ছেন কেন?" পরেশ কহিল, "কই না।" আরতি চক্ষের ইশিগতে দুইটা তরকারির বাটী দেখাইয়া কহিল, "ও দুটোতে হাত পৰ্ব্বত দেন নি। অথচ আপনার জন্যই রান্না করা হয়েছে।" পরেশ লাল্জাতমুখে কহিল, "ওঃ! তাই নাকি।" বলিয়া সেই তরকারিগুলি অতান্ত নিষ্ঠুর সহিত থাইতে সুরু করিল।

খাওয়ার পরে পরেশ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, ঘটনাক্রমে পরে আরতি আসিল। পরেশ কহিল, "খাওয়া হ'ল?" আরতি জবাব না দিয়া কহিল, "দুখের মাকে পাঠিয়ে দিলুম ওষুধ আনতে; আপনার মাসীমাকে খবর পাঠিয়ে দিলুম।" কিছুক্ষণ পরে আরতি কহিল, "জমাইবাবু আজ বধমানে চিঠি লিখে দিয়েছেন—ও'র দাদা আছেন সেখানে।" পরেশ কহিল, "কেন?"

"দাদিকে নিয়ে যাবার ব্যাপ্সা করছে।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "তাই নাকি?"

আরতি কহিল, "আমি বললাম লিখতে; ভাল লাগছে না আমার আর এখানে; রকীতটো জীবর জাগের মত ব্যাপ হুছে।" পরেশ সৌম্যসঙ্গে কহিল, "তাই নাকি? ওষুধ আর খাওয়া হ'ল?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া দিদি কহিল।

বিশ্বপদ
নিউরোগ



ওষধী
প্রতিষ্ঠান

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

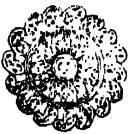


দেশের সেবায়

দেশের সেবা নানান দিক থেকে সম্ভব—এ কথাটা কোনো সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক, দেশসেবক, কবি—সকলেই তাঁদের নিজেদের পথে দেশ-সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু এ কথা অতি-স্পষ্ট যে দেশের শিল্পোন্নতি না হলে সত্যিকারের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আর শিল্পোন্নতির জন্যে অনিবার্য প্রয়োজন ছাঁচ-এর। এ কথা যে কোন শিল্পের পক্ষেই প্রযোজ্য। এস ডি গুপ্ত এবং কোং জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে ছাঁচ প্রস্তুত করার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে।

ডি, এন, রায় এণ্ড ব্রাদার্স

১৫৩।৫ বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

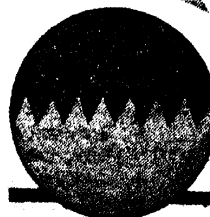


কল্যাণময়ী নারীর রমণীয় দেহশ্রীতে শোভা ও সূক্ষ্ম ফুটিয়ে তুলতে পারে ডি. এন. রায় এণ্ড ব্রাদার্সের সুশীচসম্পন্ন অলংকার। খাঁটি সোনার ও জড়োয়ার গহনা প্রস্তুতে এঁদের ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতাই কারুকার্যের অভিনবত্ব এঁদের করেছে অশ্বিতীয়। সহরে ও মফস্বলে এঁদের ডিজাইন্স সর্বজনপ্রিয়।



ডি. এন. রায় এণ্ড ব্রাদার্স,
১৫৩।৫ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই চিহ্নে ধনে রাখবেন



এস.ডি.গুপ্ত এণ্ড কোং

অশোক পার্ক, বাঁশখালী রোড, কলিকাতা - টালীগঞ্জ

“এমনই। ওষুধ আর খাব না। যা হবার হোক গো।” শেষ দিকটায় ক্রান্তভাবে আঁচ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আপন মনে কহিল, “কাল যদি চিঠি পৌঁছায় পরশু নিশ্চয় শোক আসবে, তারপর দিনই আমরা চলে যাব।” পরেশ চিঠিতত্ত্বের নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি স্থান হাসিয়া কহিল, “দিনকয়েক আপনাকে খুব বিরক্ত করে গেলুম। যাক, এরপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।” ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “জীবনে কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না আর।”

পরেশ এতক্ষণ নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিল, কহিল, “আরতি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করছে?” ভ্রূ দুইটি কিঞ্চিৎ তুলিয়া আরতি কহিল, “রাগ কিসের? কি করেছেন আপনি?” পরেশ কহিল, “অভিমান?” আরতির অধরেষ্ঠে একটি মৃদু হাসির ক্ষীণ আভাস জাগিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল, কহিল, “আপনার ওপর অভিমান করবার আমার কি অধিকার? আমি কি কমলা?”

পরেশ বসিয়া ফেলিল, “তুমি কমলার চেয়ে বেশি।”

আরতি চোখ বড় করিয়া নিদ্রাপের স্বরে কহিল, “বলেন কি? সত্যি!” পরেশ কহিল, “সত্যি! আমি এতদিন কমলার মত, মনের জোর পাইনি, আজ তোমার কাজ থেকেই জোর পেয়েছি। তা ছাড়া নিজের মনের কথা জানতে পেরেছি আজ—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।” আরতি হাসিল, আগের দিনের মত উজ্জ্বল, মধুর ও মদির হাসি—সারাদিন মেঘলার পরে যেন সূর্যের হাসি—পরেশের হৃদয় উল্লসিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আশ্রিত কহিল, “কমলাকে এই সব কথা বলে পাঠাচ্ছি, মজা টের পাবেন এখন।” পরেশ কহিল, “আরতি, তুমি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হও, এর দাত, কমলার গোনে আমার ভয় নেই।” আরতি কহিল, “কি বল চাই আপনার?” পরেশ গাড়কেট কহিল, “তোমাকে চাই।” আরতি পরিহাস-ভরল কণ্ঠে কহিল, “কমলার রাগিনী হিসেবে বুক? আমার হাতের রায়্য খুব ভাল লেগেছে আপনার?” পরেশ সন্মোহিত কহিল, “আরতি, তুমি এখনও ঠাট্টা করছ।” আরতি মৃদুতঃ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, “ওঃ! ঠাট্টা নিষেধ! বেশ গম্ভীর হচ্ছি।” পরেশ কহিল, “আমার কমলা জবাব দাও।” আরতি কহিল, “আপনি বলতে চান কমলাকে নিয়ে আপনি যে সংসার পাতবেন, সেই সংসারে আমারও—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “কমলাকে নিয়ে সংসার কেনা দিন পালন না, আরতি। যদি কোন দিন পাতি, তোমাকে নিজেই পাতব, তুমিই হবে আমার সংসারের লক্ষ্মী।”

কটাক্ষ পরেশের দিকে চাহিয়া আরতি কহিল, “কমলার কি হবে?”

পরেশ কহিল, “কমলার জন্য তোমার ভাবনা নেই। তার কথা তার শঙ্কনখায়ায় ভাববে, তুমি তোমার কথা বল আমাকে।” আরতি মৃদু নামাইয়া মৃদুকেট কহিল, “কি বলতে হবে?”

আরতির ডান হাতটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া

আরতি মূহুরের দিকে দুই চক্ষের বাকুল দৃষ্টি একত্র করিয়া, হৃদয়ের মূক প্রার্থনাকে কণ্ঠস্থের যথাসাধ্য মধুর করিয়া, পরেশ কহিল, “আরতি, তুমি কি আমাকে চাও?”

চাপা হাসিতে মৃদুতঃ উজ্জ্বল করিয়া আরতি পরেশের মূহুরের দিকে তাকাইয়া রহস্যময় কণ্ঠে কহিল, “নাভী দেখে বুঝুন না।”

রাতি আটটায় বাড়ি ফিরিতেই মাসীমা কহিলেন, “হ্যারে, এতক্ষণ কি করছিল ওখানে? বেলা তিনটে পর্যন্ত ও-বেলা তোর জন্যে ভাত নিয়ে বসে রইলাম। ভাগ্যলম—এই আসে—এই আসে, শেষে হেডমাষ্টারের কি এসে জানিয়ে গেল, ভুই খেয়েছিস ওখানে। হায়ে, ওদের বাড়িতে বামুন আছে তো, না ওদের হাতেই খাস?” পরেশ জবাব না দিয়া কহিল, “আমার মরপাতিগুলো লোকটা দিয়ে গেছে তো?” মাসীমা কহিলেন, “সেগুলো তো কখন দিয়ে গেছে। আমি ছুইনি বাপু, উঠেনেই পড়ে ছিল। বউমা সব গুছিয়ে রেখে গেছে।”

পরেশ কোতুহলের সহিত কহিল, “তার মানে?” মাসীমা মূর্খকি হাসিয়া কহিলেন, “তার মানে আবার কি? কেলে পিটে করেছিলাম—বউমাটি পালেই রয়েছে, খাবে না? তাই রয়েছে পাঠিয়েছিলাম। বয়ানটি আমার থেকে ভাল, ডাকবামুদ পাঠিয়ে দিল। সারা বিকালটা বউমা ঘর ছাড় করে ঘরুল আমার সঙ্গে সঙ্গে, কত কাজ করে দিল আমার।”

পরেশ জবাব না দিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিল। মাসীমা বলিষ্ঠে লাগিলেন, “ভারী লক্ষ্মীমত মেয়ে। কোন থেকে ওর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হয়েছে, সেই দিন থেকেই তোর রোজগার বেড়েছে।”

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলো সারিবদ্ধ করিয়া সাজানো হইয়াছে; আলবার কাপড়গুলি গুছানো

হইয়াছে; বিছানার পরিপাটী করিয়া পাতা হইয়াছে; এবং মশারিটি চারিদিকে সমান করিয়া টাঙানো হইয়াছে। মেকের ও ঘরের কোণে যে থালা ও আঁখিজনা অনেক দিন ধরিয়া নিন্দাবাদে জামিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের নির্বাসন-দশা ঘটিয়াছে। তাহার মা ও বাবার ফোটো দুইটি থালা ও বুল মাথিয়া অঙ্গপটপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; তাহার নিজের ফোটোটি এতদিন একটা ট্রাস্কের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল, সেটি দেওয়ালে উঠিয়াছে। কয়েক গ্লোডা জুতা খাটের নীচে জুড়া হইয়াছিল, সেগুলিকে পাট মিলাইয়া সারিবদ্ধ করিয়া সাজানো হইয়াছে।

মাসীমা ঘরে ঢুকিয়াই দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিলেন, “কেমন গুছিয়েছে বল দেখি! যেখানে যেটি সেখানে।” তা ছাড়া এখন কৈকে কত দরদ, কত মমতা, যেন কতদিন ঘর করেছে।” ফাঁচ করিয়া কাদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “দিদি যাদ দেখে যেত।” অগুল দিয়া নাক ও চোখ মুছিয়া কহিলেন, “অনেক ভাগে এমন বৌ মেলে, বাছা! ও এলে এ বাড়ির চেহারা বদলে যাবে, আমি বলে দিচ্ছি।”

পরেশ জবাব না দিয়া জামা কাপড় বদলাইয়া চেয়ারে বসিয়া একটা বই টানিয়া গম্ভীর মুখে পাড়তে শুরুর করিয়া দিল। মাসীমা কহিলেন, “খেতে দেব?” পরেশ কহিল, “দাও।”

খাইতে বসিয়া পরেশ দৌখল, ধালায় ও খালার পাশে নানা প্রকারের পিঠে, পায়স, তিল ও নারিকেলের মিষ্টি। মাসীমা কহিলেন, “মিষ্টিগুলো তোর শব্দস্বাভি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।” পায়সটা খাইয়া পরেশ তারিফ করিতেই মাসীমা কহিলেন, “বউমা নিজের হাতে করেছে।” বাড়ি বাড়িয়া কহিলেন, “অনেক কাজ জানে বাছা। মা শৃঙ্গ আদরই দেখনি, সব শিখিয়েছে। একাই একটা সংসার সামলাবার ক্ষমতা আছে ওর।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “কর্তাশ্রম ভেবেছি যে, অগোছালো মেলে আমার, একটি বেশ ঢালব-চতুর, গোছালো বউ হয় তো ওকে সামলাতে পারবে। তা ভগবান আমার মনের কথা শুনছেন, ওর হাতে সংসার সপে দিয়ে আমি ছুটি নিতে পারব।”

পরেশ কহিল, “তোমার এত ছুটি নেবার ভাড়া কেন?”

মাসীমা কহিলেন, “কি করব বাছা! জমাইটির চাকরি জালিস তো, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন বাইরে কাটতে হয়—মেয়েটার একটা দোসর নেই।” রাতে কমলার রচিত শয্যায় শইয়া পরেশ আরতির চিন্তায় ডুবি গেল।

আজ সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যোদিত আরতিতে জাকিয়া বাঁলায়ছিল, “সো দিনটি খাটাইছ, যা না ভাঙারবাল্লের সঙ্গে একটু ঘুরে আস, দেখের মা তো রইছে।”

দুইজনে বেড়াইতে গিয়াছিল। আরতি সাজগোজ কিছুই করে নাই, পরনে ছিল কালো পাড় সাদা সাধারণ শাড়ি, সাদাসিধে কলোজ, গায়ে একখানা রঙিন শাল, পায়ে স্যান্ডাল। বাগানের পাশের সেই পুকুরটির জলের ধারে বড় বড় ঘাসের উপর তাহার বাঁসায়াছিল। গল্প করিতে করিতে সে ঘাসের উপর হাতে মাথা দিয়া শইয়া পড়িতেই আরতি নিজের কোলের উপর তাহার মাথা টানিয়া লইয়াছিল। আরতির দেহের স্পর্শে ও গন্ধে তাহার সারা দেহে সম্যক্সোত বহিয়াছিল। সন্ধ্যা বিশাল ডানা মেলিয়া ঘনাইয়া আসিল, কালো আকাশের ছায়া বৃক লইয়া পুকুরের জল কালো হইয়া উঠিল, জলচর পাখীর দল একে একে বাঁসা ফিরিয়া গেল—তাহারা দুইজন দুইজনের চোখের পানে তাকাইয়া হাতে হাত রাখিয়া কিংবদন্তির জন্য বাস্তব জগতকে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আকাশে তারা ফুটিল, বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। আরতি কহিল, “চল বাড়ি যাই।” সে কহিল, “আরতি, আজ এমন কিছু দাও, যেন আজকার দিনটিকে চিরদিন আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।” আরতি হাসিয়া কহিল, “কি?” সে মৃদু জবাব না দিয়া চোখের চাহনিতে মনের কথা প্রকাশ করিল। আরতি সন্মের মাথখালি আনত করিয়া তাহার ওষ্ঠে একটি দীর্ঘ ও তপ্ত চূষন মৃদুত করিল।

(২১)

পরদিন বেলা আটটায় সত্যেনের বাড়ি গিয়া পরেশ দেখিল, ঘনশাল করিয়া আছে। পরেশকে দেখিয়া ঘনশাল কহিল, “এই যে বাবাজী, এস।” পরেশ কহিল, “কখন এসেন?” ঘনশাল কহিল, “এসিছি অনেকক্ষণ।” তা তোমার এত দেরি হল?” পরেশ জবাব না দিয়া সত্যেনকে কহিল,



এবার পূজায় বাজে খরচ করিবেন না

পূজা যখন আসে তখন মধ্যবিত্তও নিজেকে লাখপতি মনে করেন। কারণ, যে সব উৎসব বাংলার ঘরে দেখা দেয় তার মধ্যে দুর্গা পূজাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড়। এই সময় মানুষ সারা বছরের সঞ্চয় খরচ করে। কিন্তু এ বছরটা বিশেষ করে খারাপ সময় : দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক অসময়, যুদ্ধ আর মহামারী—এ বছরের দুর্ঘটনার যেন শেষ নাই। পূজায় আনন্দ করুন কিন্তু বাজে খরচ করবেন না। যতটুকু পারেন সঞ্চয় করুন—আগামীকাল কপালে কি আছে তাও আপনি জানেন না। দুর্ঘটনার জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন। সুদিনকে ঘনি়ে আনতে

আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব, তখন বাজে খরচ করা হয়ত সম্ভব হবে। সুদিন আসবে জাতীয় শিল্প-উন্নতির মধ্যে দিয়ে। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলবার জন্যে যতটা পারেন সঞ্চয় করুন।

সঞ্চয় এবং জাতীয় শিল্প গড়ে তোলা, উভয় কাজেই সিভিল্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। উভয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে শ্রীযুত এস্ আর রাহা, বি এল, এর নেতৃত্বে একদল সুযোগ্য কর্মী মেতে উঠেছেন। সুদিন দুর্দিন — সব সময়ই এঁরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ফোন : কলি : ৩২৭৬
গ্রাম : ধলাগার

এ, কে, বোম,
ম্যানেজার

এম, কে, সেন,
অর্গানাইজিং অফিসার

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি:

৩, ম্যাপ্পো লেন - কলিকাতা

“কি ধর বলুন?” সত্যেন কহিলেন, “আজ সকালেই ১০০°, বরষা বোধ হয় আজ ১০৪° ছাড়িয়ে যাবে।” পরেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “চলুন দেখিগে।” সত্যেনের পিছ পিছ পরেশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

বারান্দার অপর প্রান্তে আরতি দাঁড়াইয়াছিল। চোখে চোখ মিলিতেই তাহার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

যোগী দেখবার সময়ে আরতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাল রাতে ঘুম হয়নি তো?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, ভোরের দিকে একটু উন্মাদ মত হয়েছিল।” যোগীর ঘর হইতে বাইর হইয়া পরেশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যেন বৈঠকখানায় চলিয়া গেল।

আরতি আসিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, “এখনই যেও না, চা খেয়ে যেও।” এই অতি-আপনারজননের মত একান্তে আরতির অনুরোধ পরেশের কর্ণে মধুস্বৰ্ণ করিল। মনে মনে কহিল, “তুমি আমেশ দিলে এখন কেন, কখনও যাইব না।” তবু ধমক বাইবার লোভে কহিল, “ধাকগে, চা খেয়ে এসেছি। ভারী জম্বুদী ডাক আছে একটা।” আরতি কালো চোখে ঝিলিক হানিয়া কহিল, “তা হোক, এখন যেতে পারবে না। একটু দৌর-হলে যোগী পালিয়ে যাবে তো তোমার। আর শোন, বিকেলে একবার এসো আজ, দরকারী কথা আছে।”

বৈঠকখানায় আসিতেই পরেশ দেখিল, ঘনশ্যাম চৌবলের উপর দুই কন্দি রাখিয়া উজ্জ্বল হাতের উপর মুখ রাখিয়া সত্যেনের চোখেও স্ফোটা-কুল হইয়া উঠিয়াছে। পরেশকে দেখিয়াই ঘনশ্যাম কহিল, “কেমন দেখলে বাবাজী, যা শুনছি, ব্যাপার তো শক্ত মনে হচ্ছে। একা সামলাতে পারবে, না যত্নেতক ও একবার ডাকবে ভাবছ।”

পরেশ গম্ভীর মুখে প্রেসক্রিপশন লিখিতে লিখিতে কহিল, “প্যারা-টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে। তা একবার ডাকলেও হয়।”

সত্যেন কহিলেন, “আপনি যদি প্রয়োজন মনে না করেন তো দরকার কি? ঘনশ্যাম পোজ বদলাইয়া মুরুশিয়ানা সূরে কহিল, “পরেশ বাবাজী একা পারবে না, তা তো বলছি। তবে বড়ো জীবনে অনেকবার বানচাল নৌকা সামলেছে তো, একবার ডেকে পরামর্শ নেওয়া আর কি।”

পরেশ জবাব দিল না। ঘনশ্যাম সত্যেনকে কহিল, “বাড়িতে তো লোকজন আপনার নেই। সেবা-যত্ন রাখাবামা কে করছে?” সত্যেন কহিলেন, “আরতিই সব করছে।” ঘনশ্যাম প্রথমটা যেন বকিতেই পারিল না—এমনই ভাব করিয়া ছু দুইটি কুণ্ডিত করিল, তারপর কপালটা কুচকাইয়া মাঝটা উপরে ও নীচে নাড়িয়া কহিল, “ওঃ! বুদ্ধি, আপনার শালী তো! তা ভারিও তো শরীর খারাপ—”

সত্যেন কহিলেন, “তা তো খারাপ, পরেশবাবুর চিকিৎসায় ভাল আছে একটু; তবে বেশ দিন হলে পারবে না। তা ছাড়া ওর ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।”

ঘনশ্যাম কপাল কুচকাইয়া ঠোঁটের প্রান্ত দুইটা বুলোইয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা হলে তো মূর্খকল মশায়! টাইফয়েড রোগ, দু চারদিনের মামলা তো নয়—হয়তো এক মাস লেগে যাবে।” সত্যেন চিন্তিত মুখে কহিলেন, “সেই তো।” ঘনশ্যাম কহিল, “আপনার দালা তো কাছেই আছে, সেখানে পাঠায় ব্যবস্থা করলে হয় না? পরেশ বাবাজী কি বল?” পরেশ কহিল, “বেশ তো! সত্যেনবাবুর যদি তাই ভাল মনে হয়, আমার আপত্তি কি?”

ঘনশ্যাম সান্দ্রের সূরে পরেশকে কহিল, “এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি নে, বাবা। আরতি দেবী যদি এখানে থাকতে পারতেন তো কথা ছিল না; কিন্তু তাঁন যে চলে যাচ্ছেন, সেই তো হয়েছে মূর্খকল।” —বলিয়া বিপর্য ও বিষমমুখে পরেশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দুখের মার দুখে দুই কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। তাহাকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, “তুই এখানে চাকরি করিস নাকি?” দুখে এক গাল হাসিয়া কহিল, “আমি কেন করব? মা করে। মা বললেই কানো চকাত বসে আছে, আমি বাব না, তুই দিয়ে আসগে মা, তাই তো। লিখে এসে।” সত্যেন ও পরেশ ওঠে ফুটিয়া-উঠা হাসিকে সবলে চাপিতে লাগিল। ঘনশ্যাম জের করিয়া হাসিয়া কহিল, “বেশ করেছিস, তা তুইও বুদ্ধি জোর মায়ের সঙ্গে রোজ আসিস—এখানে?” চাকের কাপ দুইটি নামাইয়া দিতে দিতে দুখে ঘাড় নাড়িয়া হাঁ জানাইল। সত্যেন কহিলেন, “খোকাকে নিয়ে থাকে, আর কোন সঙ্গী নেই তো।” ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “বেশ, বেশ।” দুখের উল্লেখে কহিল, “ভালভাবে

থাকবি, কিছু নিয়ে-সিঁরে পালাস না বেন।” দুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না।” বলিয়া চলিয়া গেল। সত্যেন সম্ভ্রান্তভাবে কহিলেন, “ও-সব অভ্যাস আছে না কি?” ঘনশ্যাম মুখ কুচকাইয়া চোখ দুইটি অর্ধমুদ্রিত করিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া কহিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ছোটলোকসেরই ওই অভ্যাস। কি ছেলে, কি বড়ো—ভাল জিনিস দেখলে আর লোভ সামলাতে পারে না।”

সত্যেন কহিলেন, “ঘনশ্যামবাবু, চা খান।” ঘনশ্যাম দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, “মাগ করন, সকালে পুজো-আজিক না করে ও-সব খাই না।” পরেশ চা খাইতে শুধু কান্না দিয়াছিল; ঘনশ্যাম তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল, “যে খাবার সে খেতে শুধু করে দিয়েছে, বলতেও হয় নি।” হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আচ্ছা, আমি আসি। ওই ব্যবস্থাই করুন—যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।” বাইতে উন্মাদ হইয়া আবার ধমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া সত্যেনকে কহিল, “কর্তৃত্ব ডাক্তারকে বলব নাকি?” সত্যেন কহিলেন, “আপনাকে বলতে হবে না। দরকার হলে আমিই চিঠি লিখব।”

ঘনশ্যাম বাইতেই সত্যেন কহিলেন, “রোগের বেশ রকম গতি দেখছি, সারতে অনেক দিন লাগবে। আমার এখানে রাখতে সাহস হচ্ছে না—কাল দাদাকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।” পরেশ কহিল, “শুনেছি, আরতি দেবী বলছিলেন।”

সত্যেন কহিলেন, “ওরই পরামর্শ লিখলাম—ও আর সাহস করছে না। তা ছাড়া ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে ওর।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “দাদা যদি একজন কাউকে পাঠিয়ে দেন, তা সে আর আরতি দুজনে মিলে ওকে নিয়ে যেতে পারবে না?” পরেশ গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা পারবেন না কেন?” এই সময়ে দুখে চয়ের কাপ লইতে আসিল, সত্যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা দাঁদিয়া কি করছে?” দুখে কহিল, “ছ্যান করছে।”

“বলগে, স্নান করা হলে এখন যেন একবার আসে, পরেশবাবু ডাকছেন।”

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া পরেশকে কহিল, “কি বলছেন?” পরেশ তাহার সদ্যস্নাত, সুপরিচ্ছন্ন, সুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া মুখ হইয়া গেল। ভিজা চুল পিঠে লটুটিতেছে; সামনের চুলে ঘুরত-হস্তে প্রসাধনের চিহ্ন, কপালের মাঝখানে বড় সিম্পলের ফোটা, পরশে একটি লাল পাড় সামা শাড়ি, সেমিজ ও ব্লাউস, পা খালি।

সত্যেন কহিলেন, “ছোট গিন্নী এসেছে?” আরতি কৃত্রিম জোখে ভ্রু-লগ্নী করিতেই সত্যেন কহিলেন, “বাপ কিসের?” গিন্নী তো তোমাকেই বদলি দিয়ে ছুটি নিয়েছেন।” পরেশ হাসিতেই আরতি কহিল, “দায় পড়েছে আমার আপনার গিন্নীর বদলি হতে।” পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি জনো ডাকছেন?” সত্যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল, “উনি ডাকেন নি, আমি ডাকছিলাম। বস দেখ, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।” আরতি বসিয়া কহিল, “কি পরামর্শ বলুন। আমার অনেক কাজ।”

সত্যেন কহিলেন, “তোমার দিদির বোধ হয় টাইফয়েড—অনেক দিন ভুগতে হবে; তোমার আর বেশিদিন ছুটি নেই বলছ, কাজেই বর্ধমানে রেখেই আসতে হবে। ডাক্তারবাবুর ও তাতে অমত নেই বলছেন। কাল যদি দাদা কোন লোক পাঠিয়ে দেন, তা হলে সে আর তুমি কি তোমার দিদিকে নিয়ে যেতে পারবে?” আরতি চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন বলিতে লাগিলেন, “আমার তো দেখছ—বড়দিনের ছুটির আগে কোথাও যাবার উপায় নেই।” আরতি কহিল, “হাতে তো দুদিন এখনও আছে; অবস্থা কি রকম দাঁড়ায় দেখা যাক। আর যদি তেমনই হয়—” পরেশের দিকে তাকাইয়া “ডাক্তারবাবু একদিনের জন্য সংগে যেতে পারবেন না?” পরেশ সোপাসো কহিল, “খুব পারব।” সত্যেন কৃতজ্ঞতার বিগলিতপ্রায় হইয়া কহিলেন, “পারবেন পরেশবাবু! আপনার কাজের কোন ক্ষতি হবে না?” পরেশ কহিল, “কি আবার ক্ষতি হবে? এক দিনের মামলা বই তো নয়।” সত্যেন কহিলেন, “আপনার এই উপকার আমি কোন দিন ভুলব না পরেশবাবু।” পরেশ কহিল, “উপকার বলবেন না, আমার জন্মের প্রতি কৃতজ্ঞ বলবেন। সুদীর্ঘ দেবীকে আমি আমার দিদির মত মনে করি।” লক্ষ্যভ্রম্যে সত্যেন কহিলেন, “তা আমি জন্ম-প্রেমস্বরূপ।” কব-স্বাপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কল দিন দিন ভারী হয়ে উঠছে।” পরেশ কহিল, “আপনার কল ভারী হয় নি—আমারই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতার কল দিন দিন শোথ হচ্ছে।”

আধুনিক ডিজাইনের জড়ায়।
গহনার অভিনব সমাবেশ!



ইহাই একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
বাস্তব প্রতিষ্ঠান

নভেলটি জুয়েলারী

১৬০/১, বঙ্গবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা: ফোন:বি:বি: ১২৫৩

আরতি হাসিয়া কহিল, “আপনারা দুজন দুজনের পিঠ খাবড়িতে থাকুন, আমি চললাম রান্নাঘরে।” পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, “আবার না খেয়েই চলে যাবেন না যেন, আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

(৩০)

বাড়িতে ফিরিতে বেলা বায়োটো বাজিয়া গেল। মাসীমা কহিলেন, “তোরা শগুনবাড়িতে নৈমন্ত্য আছে।” পরেশ বিরক্তির সহিত কহিল, “আবার এখন এতখানি ছুটেতে হবে? মুশকিল করেছে দেখছি।” মাসীমা কহিলেন, “সকল থেকে দুপুর পর্যন্ত হিজ্জী-দিব্বী করে আসতে পারলি, আর এইটুকু যেতেই তোরা মুশকিল হ’ল? ধনী ছেলে বাছা!” পরেশ কহিল, “রাগিতে নৈমন্ত্য করলেই পারে, সাগাদিনটা নষ্ট।” মাসীমা কহিলেন, “আজ বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা যে; সারা পোষ মাস প্রতি দুঃসপতিবারে বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়; তা না হলে লক্ষ্মীর এত দয়া!” পরেশ জবাব না দিয়া বিরসমুখে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

কাতিক ভাঙারের বাড়ি গিয়া পরেশ দেখিল, ভক্তার বরানন্দায় দাঁড়াইয়া গমছারা হাতদুখ মুছিতেছেন। পরিধানে পটবস্ত্র, গা খালি; শূদ্র উপবীত চওড়া লোমহবল ব্যবের উপর আড়াআড়িভাবে ক্লিষ্টেছে; মাথার ঠিক মাঝখানে নাতিদীর্ঘ শিখাগছে, বাহা সাধারণতঃ চুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, সম্প্রতি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া বুঝা যাইতেছে—ভক্তার এইমত পূজা সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন।

পরেশকে দেখিয়া ভক্তার মুখ ও চোখের ইংগিতে আহ্বান করিলেন। রামাঘরের বরানন্দায় কমলা ও তাহার দুই চারিজন বন্ধু এবং শ্রীমতী গম্প করিতেছিলেন। পরেশকে দেখিয়া তাহাদের গম্পস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। কাতিক কহিলেন, “বস বাবাঙ্কি, আমি আসছি।” বলিয়া উপর কোঠার চলিয়া যাইতেই মেয়েদের মধ্যে মৃদুগঞ্জন ও চাপা হাসি স্রুত হইল। পরেশ খাটিকার উপরে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল।

শ্রীমতী কাছে আসিয়া কহিল, “কিহে, কার কথা ভাবছ?” পরেশ জবাব দিল, “কারও না।”

“তবু পাঁচটার মত মুখ করে কি ভাবছ বল দেখি?”

পরেশ হাসিমর চোটা করিয়া কহিল, “তাও আপনাকে বলতে হবে।”

শ্রীমতী চোখমুখে ঘুরাইয়া কহিল, “হবে না? তোমার মন এখন আমারে বশলীর লাতেরাজ সম্পত্তি, তার খোজখবর করার ভার আমার উপরে।” বলিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া চোখের ইংগিতে নিজেকে নির্দেশ করিল। পরেশ শূন্য হাসি হাসিয়া কহিল, “এর মধ্যেই।” শ্রীমতী কহিল, “তা নর কি? বরদাম চুকছে, বরদামপত্তর হাওয়া গেছে, এখন তো কেবল দিলে লেখাপড়া মাত্র বাকি।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “তবু বাকি তো।” কাতিকের খড়মের শব্দ শোনা গেল—নামিয়া আসিতেছেন; শ্রীমতী রম্মাঘরে চলিয়া গেল।

শোবার ঘরের বরানন্দায় খাইতে দেওয়া হইল। খাইতে বসিয়া কাতিক কহিলেন, “হেডমাস্টারের স্ত্রী কেনন আসছেন?” পরেশ কহিল, “টাইফয়েড পড়েই মনে হচ্ছে।”

পরেশ খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া রামাঘরের বরানন্দার দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, কয়েক জোড়া কালো চোখের দৃষ্টি তাহার উপর একাগ্র হইয়া আছে; একজোড়া কমলার, বাকিগুলি তাহার বন্ধুদের। কমলার বন্ধুগুলি পাড়রাই মেয়ে; কাজেই, পরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই লজ্জারক্ত মুখে তাহারা চোখ ফিরাইয়া লইল। কমলা কিন্তু খিড়কিটোতে তাকাইয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। পরেশ হাসির জবাব না দিয়া মুখে নামাইয়া লইল। কমলার মুখখানি যে সিদ্ধান্তপ্রবাহিমন্ত বিজলীমতির তোরণে মত দেখিতে দেখিতে নিম্নপ্রভ ও বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহা তাহার চোখে পড়িল না, তরপার আবার যখন সে মুখ তুলিল, দেখিল, কমলা ও তাহার সঙ্গিনীরা চলিয়া গিয়াছে।

কমলার জন্য পরেশের মনে বরুণমিষ্রিত বেদনা জাগিল। বেচারী এখনও তাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আছে। সে জানে না, পশ্চিমার প্রান্তের মত ভাগ্যহীনে অলঙ্কো তাহার আয়তনমুখে শিথিল ও শূন্যগর্ভ করিয়া আনিতেছে—সে-কোন মহতেরে ভাঙিয়া, হুসিয়া, গুড়া করিয়া, উন্মত্তবশে কোন এক অজ্ঞাত কলে নৃত্য করিয়া চর চরনা করিবার জন্য বহিয়া লইয়া যাইবে। বরির মত কমলাও দুঃখ পাইবে, বেদনা পাইবে, হয়তো লুকাইয়া গোপনে চোখের জল ফেলিবে; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও সান্নিধ্যের দুই বিশেষ সামগ্রীয়া উঠিয়া আবার আর এক-জলকে ভালবাসিবার জন্য বনকে জৈরার করিবে এবং ভবিষ্যতে বিবাহিত স্নানীর বিধি ও নীতিসঙ্গত আদর্শগান আত্মসমর্পণ করিবার সময়ে একবা

যাঘর উর্দাত, উন্মত্ত, নীতি ও বিধি-বিশুদ্ধ বাহুবল্লনকে প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে স্মরণ করিয়া ‘হৃদয়হীন’ বলিয়া বিচার দিবে।

খাওয়ার পরে কাতিক কহিলেন, “একটু বিশ্রাম করলে তো কর।” বলিয়া হাকিলেন, “ওগো, শুনছা!” পরেশ কহিল, “আচ্ছা, বাড়ি যাই—একটু কাজ আছে।” কাতিক গৃহিণী বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, “কি বলিছলে?” কাতিক কহিলেন, “বাবাজীকে বলছি একটু বিশ্রাম করলে, তো বলছেন—বাড়িতে কাজ আছে।” বলিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া মূবের কথা চোখের ইংগিতে জনাইলেন। গৃহিণী কহিলেন, “এই খেয়ে এত রোদে গিয়ে কাজ নেই—পাশের ঘরে বিছানা করে দিয়েছে, একটু শয়ে যেও।” নিশ্চিতমুখে রোগীর বিশ্বাসপনায় আত্মীয়স্বজনদের কাছে সহায় চিকিৎসক যেমন রুঢ় সত্য প্রকাশ করিতে বিধাবোধ করেন, পরেশ যেমনই কিতক ও তাহার স্ত্রীর কাছে আসল আঘাতের আভাস দিতে বিধাবোধ করিল। এক মহতের ভাবিয়া সে ঘরে গিয়া শইয়া পড়িল।

মেঝেতে বিছানো সত্তরফির উপর পরিপাটী করিয়া শয্যা রচনা করিয়াছে—বোধ হয় কমলা নিজে। অদূরভবিষ্যতে সে নিজে এই শয্যার অংশভাগিনী হইবে ভাবিয়া হয়তো তাহার নারাদেহে পূন্য জাগিয়াছে, বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়াছে, মনের মধ্যে সুখাক্ষর হইয়াছে। খাওয়ার সময়ে চোখোচোখি হইবার কলার হাসি তাহার মনে পড়িল—কামনার বহুতরক নিশ্চিতরূপে করতলগত করিয়া মানুষ যেমন করিয়া হাসে, তেমনই হাসি। যেন তাহাদের দুইজনের জীবনযাত্রাপথ চিরদিনের জন্য এক হইয়া গিয়াছে, আর কোন দিন কোন কারণে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না। প্রভাতে সূর্যের দিকে প্রথম চোখ মেলিয়া কমল যেমন সারাদিনের কথা ভাবিয়া হাসে, কমলাও হয়তো তেমনই তাহার মুখে দিকে তাকাইয়া তাহাদের আগামী মিলিত-জীবনের শত সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হাসিয়াছে।

আরতিও আজ সকালে এমনই হাসি হাসিয়াছিল। সেও নিবিচায়ে, একান্ত নিভরতার সহিত নিজের জীবন-পথকে তাহার পথের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। তাহার অন্তরখাত এই মিলনকে পরম আনন্দ ও প্রণয় আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করিয়াছে। তবু কমলার কথা ভাবিয়া তাহার মনে বাধা বাজিল।

ঘর অন্ধকার; ঘরের এক কোণে মাড়ুসার জালে একটা মাছি বরা পড়িয়া আতর্গঞ্জন করিতেছে; ঘরের বাতাসে একটি মিষ্ট ও সৌম্য গন্ধ। বাহিরে উঠানে কতকগুলো কাক কলরব সহকারে কলহ করিতেছে; রামা-ঘরের বরানন্দায় মেয়েদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতেছে। এই পরিচিত শব্দ-গম্ভময় জীবনের পরিমাণ্ডল একেবারে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া কোন এক অপরিচিত জীবনের মধ্যে যাইতে হইবে ভাবিয়া পরেশের দীর্ঘনিদ্রাবাস পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী রজ্জা খুলিয়া ঢুকিল। মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, “কিহে, কি করছ?” পরেশ চোখ মেলিয়া তাকাইল। শ্রীমতী কহিল, “ঘুমুচ্ছ নাকি?” পরেশ কহিল, “না, ঘুম আসছে না।” শ্রীমতী নাক উচাইয়া কহিল, “কমলার বিছানার শুরে ওর বালিশে মাথা রেখে ঘুম আসছে না কেন? কিসের এত ভাবনা তোমার?” পরেশ হাসিমর চোটা করিয়া কহিল, “কি আর ভাবনা? দিনের বেলায় ঘুমোতে পারি না আমি।” কথাটা উলটাইয়া দিয়া কহিল, “কারও সাড়া পাচ্ছি নে আর, কোথায় গেলেন সব?” শ্রীমতী কহিল, “তোমার শালুড়ী আর দাঁদি শালুড়ী গেল ঘনশ্যামের বাড়ি, তোমার সবও গেছে তাদের সঙ্গে। বললার এক ফরে থাকতে, শুনল না।” চোখ দিলিয়া কহিল, “কমলার মন ভাল ঘেঁই কিনা।” পরেশ কহিল, “কারণ?” শ্রীমতী খনখনে স্বরে কহিল, “কি করে থাকবে? যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সম্মুখে বা-তা কথা কানে আসলে কারও মন ভাল থাকে”, পরেশ উল্লেখকর্তে কহিল, “কার কাছে কি শুনেন?” শ্রীমতী কহিল, “বুকের মন কাছে, ফটকে ছুড়িটির তোমাকে নিয়ে কাজ-কারখানার কথা।” পরেশ শ্রু-বৃষ্টিত করিয়া বিরক্তির সহিত কহিল, “তার মানে?” কমলার দিয়া শ্রীমতী কহিল, “তার মানে তুমিই ভাল জান।” বলিয়া এক মহতের শিখর দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণবশে কহিল, “তোমার জন্যে বেলা দুটো পর্যন্ত না বসে বসে থাকি, বিরেকরা বড়রের মত সাধনে বসে থাকারদে, পরজা বন্ধ করে পাশে বসে হাট, গল্প, রসজ্ঞাপন, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া—” কতকগুলি ভীতিকর করিয়া কহিল, “সব শুনাই হে, শুনতে কিছু বাকি নেই আমার।” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “আপনাদের

চায়ের বাবু



আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত আমাদের চায়ের বাবু ও
সরঞ্জামসমূহ আজ ভারতের সর্বত্র
মহোত্তমের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।
অসংখ্য 'প্ল্যান্টার' ও ব্যবহার-
কারীগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও চা
কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক অনুমোদিত
আমাদের প্রত্যেকটি বাবু গ্যারান্টি
দেওয়া আছে।

দে চাটাজ্জী
এও কোং

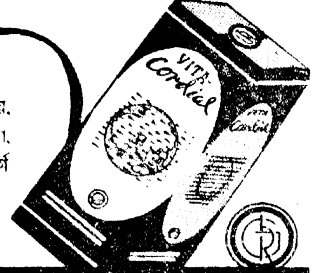
১৩৫, ক্যানিং স্ট্রীট।
ফোন-কলি ৩৮৬



এসময়ের বাবু

ভিটা কর্ডিয়াল

সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগে প্রয়োজনীয়,
যথা—বক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, স্রাবান্নতা,
স্রাবাধিকা, বাধক প্রভৃতি উপসর্গে
কার্যকর। নিয়মিত ব্যবহার করুন।



গ্লোব রিসার্চ ইনস্টিটিউট

৩০৭ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

দিল্লী, ইউ পি এন্ড পাঞ্জাবের প্রথম পরিচালক—

এস, বি, রত্নাকর এন্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক বাবু ও পেস্টস

চর্চান চক্, দিল্লী

“জাতিকে বাঁচাতে হলে চাই শিল্পের প্রসার
শিল্পের প্রসারে --- চাই জাতীয় ব্যাঙ্ক।”

উভয়ের

সে

না

র

প্রতীক্ষার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান কর্মকেন্দ্র- ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

শাখা—কলেজ স্ট্রিট, জামবাজার, গোহাটি, শিলেট, তেজপুর ও বড়পেটা
দিল্লী, আত্রা, লক্ষৌ, ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

গ্রাম : কয়েনস্
ফোন : কালঃ ৫৪৯

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ জে, সি, চক্রবর্তী।

পুতুল-চরটি অনেক বাড়িয়ে বলেছে। দুইয়ের একটা ডাক থেকে ফিরে ঠুঙ্গের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি না খাইয়ে ছাড়লেন না। ওদ শিখি-এ মহিলা উনি, আপনার নাতনীটির মত পুতুলের গয়ের অতি লাগলে গলে যান না, কাজেই সামনে বসেই খাইয়েছিলেন, খাওয়ার পর গল্প করছিলেন, হয়তো হেসেও ছিলেন, কিন্তু তাতে দেখাও কি হয়েছে? "নি!" শ্রীমতী বঙ্গার দিয়া কহিল, "দেখ হয় নি? বাড়িতে একটা পুতুল নেই, ঘরের গিল্পী অসুখে পড়ে, এ অবস্থায় একটা খেড়ে পুতুলকে নিয়ে একটা ধিপ্পী মেয়ের চলাচল করায় দেখা নেই? এই তোমার বুদ্ধি?" পরেশ জবাব দিল না, শ্রীমতী বলিতে লাগিল, "মেয়েটার এত রকম পর্যন্ত বর জোটে নি, তাই কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে বর তার জিনিসে মুখ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তুমি? দুদিন বাদে একটা মেয়ের চান্দন-মরণের ভার নিতে যাচ্ছ, আর সে মেয়ে যা-তা, মার-ভার নয়—তোমার এই কাণ্ড! তাছাড়া বামুনোর ছেলে হয়ে কয়েতের মেয়ের হাতে ভাত খাওয়া! জাত গেছে তোমার। ভাগ্যে কাতিক ডাঙরের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে, তাই কেউ কিছু বলছে না, না হলে ঘাসের লোক একঘরে বসত তোমার।" পরেশ কহিল, "বংশ তো! একঘরে ছিলাম একদিন, আমার হাংলিই বা কী? কী?" চোখ দুইটা কুঁচকায় শ্রীমতী কহিল, "তার মানে?" পরেশ কহিল, "আমার ওপর আপনাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, কি করছি, কোথায় যাচ্ছি দেখবার জন্য পিছনে যদি চার লাগতে হয়, তো বিয়ে বন্ধ করে দিই না। এখনও অনেক সময় আছে, চেষ্টা করলেই মনের মত পার যোগাড় করে ঠিক দিনেই কমলার বিয়ে দিতে পারবো।" শ্রীমতী দুই চোখ বড় করিয়া সবুজে কহিল, "ও সব কি কথা রে?" পরেশ নীরবকণ্ঠে কহিল, "ঠিক কথাই তো বলছি। ডাঙরকে সকলের বাড়িতেই যেতে হয়, সকলের সংগেই মিশতে হয়, সবাই তাকে আরাধনের মত আদর আপ্যায়ন করে, এসব সহ্য করবার মত মনের প্রশুরতা যে মেয়ের না থাকে, তার ডাঙরের স্বামী হওয়া চলে না, হলেও তার বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।"

শ্রীমতী তার তার কহিল "কমলা তো কিছুই বলে নি ভাই। ও বর দুখের মতো-কটকে বলতে মানা করে দিয়েছে।" পরেশ কহিল, "আপনিই তো বলছেন এইমাত্র, ও রকম করছে।"

শ্রীমতী কাজে সরিয়া জীবিয়া কহিল, "আমি মিথ্যা করে বলছিলাম। ও ভেদেই মেয়ে নয়। ওর সে কত বুদ্ধি, তা তুমি যখন শুক নিয়ে ঘর করবে, বুঝতে পারবে। আজ একটু আগে ওকে আমি ডেকে বললাম, 'আমি তো তোমাকে, তোর বরের সঙ্গে কথা বলি চলে, ও কি জবাব দিলে জান, বললে—কাণ্ড করে কি হবে? ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা আমি সন্মোদন করছি, তিনি যদি তা শ্রবণ করেন, তো তাকে আমি পাই, সেও ওর মন ভাঙতে পারবে না। আমি তো ওইটুকু মেয়ের মধ্যে ওই কথা শ্রবণ অবাক।' বলিয়া গালে হাত দিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিল। পরেশ মনে মনে কহিল, এ যদি আপনায় বানানো কথা না হয় তো আমিও অবাক।" প্রকরণ মন্দ হাস্যাসহকারে কহিল, "ভাই নাকি! কিন্তু যদি ভগবান না থাকেন? আর থাকলেও যদি তার কানের দোষ ঘটে থাকে, রাস তো কম নয়।" শ্রীমতী জিব কটিয়া কহিল, "চিৎ! চিৎ! ও সব কথা বলো না, ওতে পাগল হয়।" পরেশ নীরব রহিল। শ্রীমতী কহিল, "কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—এ কথা জুলেও মনে ঠাই দিও না। ও তোমাকে মনে প্রাণে স্বামী বলে ভেবেছে, এখন থেকেই নাম পালতে শব্দ করছে। তোমাকে সারাদিন একঘরে না দেখতে গেলে ডাঙর তোমার মাছের মত ছটফট করে, দেখলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়।"

কমলার মুখখানি পরেশের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান-সংকীর্ণ প্রতিজ্ঞতা; স্বল্প আশা ও স্বল্প সন্তোষ। তাই তাহার মত একজন সাধারণ লোককে ঘেরিয়া মনে মনে সখ-সৌধ রচনা করিয়াছে। যেদিন তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই স্বন-সৌধ স্বপ্নের মতই মিলিয়া যায়, সেদিন যে অপরিসীম বধায় তাহার মুখখানি বিবর্ণ ও বিহবল হয়। উঠবে, তাহার উদ্ভাপ পরেশ যেন নিজের বকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। অথচ উপায় নাই। আর্যতাকে তাহার চাই-ই। আরতির মত দেখে ও মনে সৌন্দর্যমণী নারীকে নিজস্ব ভাবে পাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যে তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মিটেইবার সাধ্য কমলার মত সাদাসিধে পাশ্বে গ্রামা ঞ্জলিকার নাই।

শ্রীমতী কহিল, "কি হে, রাগ পড়ল? শাস্ত দিতে হয় তো

আমাকে দাও ভাই, কমলীর উপর রেগে থেকো না।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "সত্যি বলছি—আমরা দুজন ছাড়া কেউ কিছু জানে না—আর জানবেও না। কিন্তু আমার একটু অনুরোধ রাখতে হবে ভাই। দু বেলা দুবার শব্দ রোগী দেখে আসবে, নাই বা ওই ছুড়িটার সঙ্গে এত মিশলে। আজ না পড়ুক, লোকের চোখে তো পড়বেই একদিন—তখন নানা কথা উঠবে, তখন তোমার শব্দ-শাশুড়ীর কি মনে হবে বল দেখি।" পরেশ মন্দ হাসিয়া কহিল, "হেডমাষ্টার মহাশয়ের স্বীকৃতি নিয়ে উনি তো চলে যাচ্ছেন পরশু।"

শ্রীমতী পরম পূজকের সহিত কহিল, "সত্যি নাকি?" নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক ভাই, ভালয় ভালয়—আমি সতানারায়ণের পূজা দেব একদিন।"

(৩১)

সৌদাম পরেশ যখন সত্যানের বাড়িতে পেশীছিল, তখন সন্ধ্যা হতে বেশ দেরি নাই। ঠেকখানা খোলা ছিল, পরেশ একটা চেয়ার টানিয়া সম্মুখে বসিল। অনতিবিলম্বে আরতি আসিল। মুখ নিবর্তিত্যয় গম্ভীর। তারী গলায় প্রশ্ন করিল, "বিকলে এলে না?" পরেশ মাথা চুলকাইয়া কহিল, "একটা কাজে ছিলাম।" চোখ দুইটি ছোট করিয়া আরতি কহিল, "কল ছিল বুঝি?" পরেশ বাড়ি নাড়িয়া কহিল, "না, নেমন্তন্ন ছিল।"

"কোথায়?"

"কমলার বাড়িতে।"

ওঠের প্রান্তবরা ইয়া কুণ্ঠিত করিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে আরতি কহিল, "কমলার কাছেই ছিলে এতক্ষণ?" পরেশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, কমলার এক দিদিমা গল্প করছিলেন—"

অনিবাসের হাসি হাসিয়া আরতি কহিল, "দিদিমা! জাল।" কমলা কুঁচকায় কাঠশরের শান দিয়া কহিল, "তা আমার কথাটা মনেই ছিল না যোগ হুয়।"

পরেশ জোর দিয়া কহিল, "বা রে! মনে ছিল না! বল কি আরতি?" কাঠশরের ক্ষোভের আমেজ মিশাইয়া কহিল, "কিন্তু এমনই নাহেজবানো মেয়েমানুষ যে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না।"

আরতি গম্ভীর সুরে কহিল, "ঠুঙ্গের কিছু জানিয়েছ?" পরেশ হাসিমুখে চোটা করিয়া কহিল, "পাগল। এখন আমার জানান।" আরতি দুইকণ্ঠে কহিল, "এখনই তো জানানো উচিত, ওরা তা হলে অন্যর চেয়ে করতাম।" পরেশ কহিল, "হাতে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হতো।" তা কুণ্ঠিত করিয়া আরতি কহিল, "তা হলে কি করবে ঠিক করেছ?" পরেশ কহিল, "আমি তো বলছি আরতি, তোমারও যা পথ, আমারও তাই।" আরতি ভীক্ষুস্বরে কহিল, "কিন্তু কমলার পথের মতই তো ছাড়তে পারছ না দেখছি। তবু আমাকে পথে বার করে, আমার সন্তোষমত ফেলে পালায়ে এসে কমলার পিছু নেবে—" পরেশ আরও সুরে কহিল, "আমার সম্মুখে তোমার এই ধারণা আরতি?" বলিয়া ঠাট্টা দাড়িয়েই আরতি কহিল, "উঠছ যে!" পরেশ ক্ষোভের সুরে কহিল, "অনটা খারাপ হয়ে গেল, এখন বাই, ভেতনবাবু এলে আসন।" বলিয়া চানিয়া ঘাইতে উদাত হইতেই আরতি চাপা সুরে ডাকিল, "শোন।" বলিয়া দুই পা আগাইয়া আসিল। পরেশও ফিরিয়া আরতির মুখোবরা দাড়িয়েই আরতি কহিল, "কেন তুমি বিকলে এলে না? আমি সারাক্ষণ—" আরতি কথা শেষ করিতে পারিল না—অভিনানের বাপে কঠোর বৃদ্ধ হইল। পরেশ আরতির চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, "একি অস্বাভাবিক, কীদ নাকি! তুমিও ছেলেমানুষ।" আরতি ফোস করিয়া উঠিয়া জলভরা চোখে বিবৃতির চমক হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যে বাড়িয়ে গেছি তবু নাকি! তোমার কমলাই বুঝি কাটা টসটে।"

দরজার দাঁড়িয়া দুইয়ের মা কহিল, "মাশীমা, উনি ধরে গেছে, চায়ের জল চড়িয়ে দেবে।" পরেশ শব্দবাহিত হইয়া সরিয়া দাড়িল। আরতি মুখ ফিরাইয়া কড়া গলায় কহিল, "ওর জন্যে অনুমতি নিতে হবে নাকি? দাড়িয়ে যাও। আর ময়দাটা ঘেঁষে রাখগে। যাচ্ছি এখনই।" দুইয়ের মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাড়ি নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

পরেশ কহিল, "দুইয়ের মাটা দেখে গেল, সব ওদের বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে—মাগী গোয়েন্দাগিরি করে।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতিবিদ

মহামান্য ভারত সন্মতি স্বর্গে কল্ল কল্ল উচ্চ প্রশংসিত। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাজা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী অন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষাণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লন্ডন); প্রেসিডেন্ট-বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এণ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষীসমূহকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্মুখে ভূরিভূরি স্মরণীয় লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখাযাই বলিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যাহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া মহামান্য সন্মতি প্ৰবণ প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং অতিরঞ্জন স্বাধীন নরপতি উচ্চ দপ্তরে ভূষিত করিয়াছেন।

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষ শিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগকালে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অসংখ্য শক্তি প্রয়োগে ডাক্তার, কবিবাজ পদিতাঙ্ক যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, ভীতিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদ-শ্মরণ, বংশ নশ হইতে রক্ষা, দুরদণ্ডের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তি সম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে ইহাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিঙ্গু হাইনেস্ মহারাজা আটলগু বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মৃত্যু ও বিস্মিত।”

হর্' হাইনেস্ মাননীয় স্বর্গমাতা মহারাজা ত্রিপুরা স্টেট্ বলেন—“তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।”

কালিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার ঘনমথনাথ মথোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্যোমদমনা পিতার উপযুক্ত পুত্রত্বেই সম্ভব।”

সুভোদাধের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার ঘনমথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি কে রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।”

বংশীয় গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কর বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তন্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যিই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।”

কেউমরগু হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীস্বর্গমণি দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।”

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র মহাকবি শ্রীহরিশরণ সিন্ধাস্তবাণীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র ব্যাঙ্গ্য নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।”

উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেমব্লীর মেম্বার মাননীয় শ্রীমতী সরস্বা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দর্শন নাই।”

বিলভের প্রিন্সি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি, মাধব' নায়ার কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।”

চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রূচপল বলেন—“আপনার যিনিটি প্রদেশের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।”

জাপানের অসকা নগর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কণ্ঠে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পুত্রের জন্ম বৎ, পটাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ

উপকার না হইলে মৃত্যু ফেরৎ গারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—কল্যাণ কৃষ্ণর ইহার উপাসক, ধারণ ক্ষমতা ব্যক্তিও রাজত্ব লাভ ইচ্ছা, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, সুখ ও শ্রী লাভ করেন। (১০০০) মূল্য ৩০০। অসংখ্য শক্তিসম্পন্ন ও সর্ব ফলপ্রদ কবচসমূহের বৃহৎ কবচ ২৯৯০। প্রত্যেক গৃহী ও বাসসামগ্রী সম্বন্ধে সাধন কবচ।

বগলামুখী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপলব্ধি মনকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কল্যাণলাভে সহায়ক। মূল্য ১০০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৫০। (এই কবচ ভাওয়াল সম্রাটী কল্যাণ করিয়াছেন।)

সূর্য কবচ—সুখদেবী মনোরোগ রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যসাধন বিধান করিতেছেন সূর্য্যবস্ত্র ধারণ মানব নীরোগ, সুস্থকায় ও দীর্ঘ-জীবী হয়। মহাযোগ প্রমেহ, অশ, বহুমত্র, ভগন্দর, যক্ষ্মা, হিপান প্রভৃতি যে কোন দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি ইহাতে আরোগ্য লাভ করে। মূল্য ৫০০, বৃহৎ সূর্য কবচ মূল্য ১৫০০। সর্ব ফলপ্রদ অসংখ্য শক্তিসম্পন্ন ১৫০০।

অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এণ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নিচিশশীল জ্যোতিষ ও তন্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস:—১০৫ (আ) প্রে স্ট্রীট “বসন্ত নিবাস”, (শ্রীশ্রীনগর ও কালী মন্দির), কালিকাতা।

ফোন: বি. বি. ৬৬৬৫। সন্ধ্যার সময়—প্রাতে ৮টায় হইতে ১১টায়।

রাষ্ট্র অফিস:—৩৭, ধর্মতলা স্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কয়ার মোড়), কলিকাতা। ফোন: কলিকাতা ৫৭৬২। সময়—বৈকাল ৫ই হইতে ৭টায়।

লন্ডন অফিস:—মিঃ এম.এ. কার্টার, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস্ পার্ক, লন্ডন।

আরতি কহিল, “তাই নাকি! আগে জানলে আরও ভাল করে দেখিয়ে দিতুম, তোমার লোকটার পলা শেষ হয়ে যেত।”

বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই আরতি জু নাচাইয়া কহিল, “জামাইবা, আসছেন, আমি যাই, তুমি বস।” আরতি দ্রুতপদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল। পরেশ বসিয়া পড়িল।

সত্যেন্দ্র আসিয়া পরেশকে দেখিয়া কহিলেন, “এই যে ডাক্তারবাবু, কখন এলেন?” পরেশ কহিল, “এইমাত্র।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “বসুন, আমি ধড়-ঢাড়াগুলো ছেড়ে আসি।” বলিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে জামা-কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, সত্যেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “সকালে যা ভয় করছিলুম, তা হয় নি। জরুরী আর বড়ো নি, বরং কমতে শুরু করেছে।” পরেশ আগ্রহের সহিত কহিল, “তাই নাকি! তা হলে হয়তো আজকালের মধ্যে জরুরী রেমিশান হয়ে যেতে পারে।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “জরুরী যদি দু-একদিনে কমেই যায়, তা হলে এত হাঙ্গামা করে বধমান পাঠিয়ে কি হবে?” পরেশ কহিল, “আরতি দেবী থাকতে পারবেন না বেশদিন বলছিলেন যে।” সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “ওর সেক্রেটারী লিখেছে—শরীরের উঠলে বড়দিনের ছুটির আগেই জয়েন করতে। ও যদি লিখে দেয়—ওর শরীর সারে নি—আর আপনি একটা সার্টিফিকেট দেন তো আরও ছুটি পেতে পারে।”

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া হাজির হইল—দুই হাতে খাবারের প্লেট, পিছনে পিছনে আসিল দু'থের মা—দুই হাতে দুই ক্লাস জল।

পরেশ কহিল, “আবার আমার জন্যে নিয়ে এলেন?” আরতি কহিল, “বড়লোক শব্দের বাড়িতে না হয় খেয়েই এসেছেন, তা বলে গরীবের বাড়িতে এক মুঠো খসখসে খেতে দোষ কি?”

পরেশ কহিল, “তা কি আমি বলছি, আমার ক্ষিদে নেই।”

আরতি নীরসকণ্ঠে কহিল, “ক্ষিদে না থাকলে ফেলে রাখবেন, আমি চা নিয়ে আসি।” বলিয়া চলিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র কহিলেন, “মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে দেখছি। আর এতেও না হয়! সন্ধ্যারের ঝড়, তার উপর রোগীর সেবা। আপনার ওষুধটা আশ্চর্য কাজ করেছে তাই, না হলে ওর যদি রোগটা এই সময় চড়া দিয়া উঠত তো মুশকিল হ'ত।” আরতি আসিল, সত্যেন্দ্র হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া বাগের স্বরে কহিল, “আপনারও ক্ষিদে নেই বুঝি?” সত্যেন্দ্র ম্লানমুখে সখেদে কহিলেন, “হিল, উবে গেছে। একজনের একচোখোনি খেলে ক্ষিদে থাকে?” আরতি কৃত্রিম কোপে অপূর্ণ মুখভঙ্গী আঁকিয়া কহিল, “ওই হচ্ছে আর কি? খেয়ে নিন চটপট—আমার অনেক কাজ পড়ে।” পরেশকে কহিল, “খুজেন যে। জোর করে খেয়ে কাজ নেই—শেষে আপনার শব্দশব্দ-শব্দে আমাদের গালাগালি দেবেন।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “পরেশবাবু, থালাশব্দ না খেতে পেরে নাকি কবে দুখ করাছিলেন, আজ আর সে দুখ রেখে কাজ নেই, সব গিলে ফেলুন, না হলে আরতির প্রাণ যাবে না।”

আরতি নতমুখে চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল, “বেশ তো, খান না—ডাক্তার মনুষ্য এমন এক হজমগুণি তৈরি করে খপেন যে, সব হজম হয়ে যাবে।”

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আজ্ঞা আরতি, তোমার কি মতি আর ছুটি নেই?”

আরতি চকিত মুখে তুলিয়া কহিল, “মানে? আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?” সত্যেন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিলেন, “না না, তা বলি নি, মনে—বড়দিনের ছুটিটা কাটিয়ে গেলে চলে না?” আরতি কহিল, “চলবে না কেন? চাকরির মাস ছাড়তে পারলে সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেওয়া চলে।” বলিয়া পরেশের দিকে একবার চাহিয়া আবার নতমুখে চা ঢালিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র হতাশভাবে পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “তা হলে আর কি! নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই বজায় রাখতে হবে।” পরেশ কহিল, “সেই ভাল, স্থান পরিবর্তন অনেক সময় ওষুধের চেয়েও বেশি কাজ করে—এখনই চেষ্টা সেখানে হয়তো উনি আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।”

আরতি রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র ও পরেশ গল্প করিতে লাগিল। স্থির হইল, পরের দিন শেষরাতে পরেশ এবং বে লোকটি আসিবে সে, গরুর গাড়িতে করিয়া নিকটবর্তী স্টেশনে রওয়ানা হইবে;

সকালে আরতি ও সুনীতি পালকী চড়িয়া যাত্রা করিবে। গোমস্তা মহাশয় পালকী ও গাড়ির ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে বাহিরের সারা আকাশ কলো মেঘে ছাইয়া গিয়া বিম্বিম্ব করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল এবং শীতের তীব্র শীতল বাতাস তীব্রতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, “বৃষ্টি শুরু হ'ল যে! বাদলা হবে নাকি?” পরেশ সবজ্ঞাতর মত কহিল, “পোনের মেঘ তো, সকলেই ছেড়ে ধাবে বোধ হয়।”

রাত্রি আটটার সময়ে পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “রাত হ'ল, চাঁদ তা হ'লে।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “পাগল নাকি! এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবেন?”

পরেশ কহিল, “এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না, খুব যেতে পারব।”

সত্যেন্দ্র কহিল, “পারবেন, তা জনি—আপনার মত বয়সে আমিও পারতুম। তা হ'লেও আরতির মতামতটা একটু জেনে আসা দরকার।” বলিয়া সত্যেন্দ্র ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সত্যেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন না, আসিল আরতি, আদেশের সুরে কহিল, “এই বৃষ্টিতে ভিজল বাড়ি যেতে হবে না—এইখানেই থেয়ে নাও, তারপর যদি বৃষ্টি ছাড়ে তো বাড়ি যোগ।” তারপর আকাশে কলো মেঘের বিদ্যুতের এক টুকরা যেন আরতির কালো চোখে চমক দিয়া উঠিল, ঝকঝক দিয়া আরতি কহিল, “এত বাড়ি যাবার তাড়া কেন বল দেখি। কে আছে সেখানে? একটা রাত্রি এখানে থাকলে দোষ কি?”

পরেশ পরম বিস্ময়ের সহিত আরতির মুখের দিকে তাকাইল। দুই দিনেই কণ্ঠস্বরের মালিক-নার সুর লাগিয়াছে, প্রণয়িনী প্রহারিণী হইয়া উঠিয়াছে। তবু নতুন চাকরির মত আরতির এই নতুন কর্তৃত্ব পরেশের ভাল লাগিল। মাথা চুলকিয়া কহিল, “মাসীমা ভাববেন।” আরতি কহিল, “মাসীমা যাতে না ভাবেন, তার ব্যবস্থা করা হবে—দু'থের মা বাড়ি যাবার সময়ে খবর দিয়ে যাবে।” তারপর দুখ ও চোখের ভাবে ব্যাপারটির চূড়ান্ত সীমাসা করিয়া দিয়া কহিল, “আমার রান্নার বোশ দোর নেই। তুমি হাত-মুখ ধোবে তো ধুয়ে নাওগে।” বলিয়া চলিয়া গেল। পরেশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি দশটার পরে বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ আরও বাড়িয়া গেল।

পরেশ সত্যেন্দ্রকে কহিল, “একটা ছাতা দিন, তা হ'লেই যেতে পারব।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “এই ঝড়ে ছাতা নিয়ে যেতে পারবেন কি?” পরেশ কহিল, “খুব পারব।” সত্যেন্দ্র ছাতা আনিতে গেলে আরতি দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া পরেশের মনের পানে তাকাইয়া কহিল, “কই, যাও দেখি।” সত্যেন্দ্র ছাতা আনিতে পরেশ কহিল, “যেতে পারব না বলে মনে হচ্ছে।” সত্যেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, “বললুম যে, পারবেন না—তবু ওল্ড মেনদের কথায় তো আপনার কান দেবেন না।” বলিয়া পরেশের মত পরিবর্তনের আসল করণটির দিকে কটাক্ষ করিলেন।

ঠিকস্থানায় চৌকি পাতিয়া পরেশের বিছানার ব্যবস্থা হইল।

রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সকলে রোগীর ঘরে কাটাইল। সুনীতির জ্বর অনেকটা কমেয়া গিয়াছে, ঘুমের ঔষধের প্রভাবে শান্তভাবে ঘুমাইতেছে।

সত্যেন্দ্র পাশের ঘরে থোকাকে লইয়া শীতে গেল, আরতি রহিল রোগীর ঘরে, পরেশ আসিয়া নিজের বিছানায় শুলিল।

পরেশের ঘুম আসিল না। বাহিরে ঝঝঝ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝোড়ো গতাস পাগলের মত গাছের ডালে নাড়া দিয়া, দরজা-জনালায় ধাক্কা দিয়া কখনও তীব্র আত্নাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বিদ্যুতের আলো দরজা-জনালায় ফক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সারা ঘরটাকে ক্ষণে ক্ষণে উজাসিত করিয়া তুলিতেছে, মেঘের গুরু-গুরু ডাকে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পরেশের মনের মধ্যে বাহিরের এই মাতামতির ছোঁয়াচ লাগিল। গজ্ঞাসংকেচ, আইন-কানুন, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা-শাসনিতা কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটি কোমল, কমনীয়, কবোচ নরীন্দ্রকে দুই সবল বাহু দিয়া বৃকে জড়াইয়া ধীরে ধীরে জন্ম তাহার সমস্ত দেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আজ সন্ধ্যার পর হইতে আরতি তাহাকে কারণ-অকারণে কতবার স্পর্শ দিয়াছে। রাতে খাওয়ার পরে রোগীর ঘরে একটা ছোট টেবল ফেলিয়া বসিয়া তিনজনে তাস খেলিতেছিল। আরতি তাহ'র ঠিক পাশেই বসিয়া ছিল। কতবার হাতে হাত ঠেকিয়াছিল, পায়ে পা ঠেকিয়াছিল, আরতির কানের উপরের কুচা চুলগুলি তাহার গালে ঠেকিয়াছিল। আরতি ইচ্ছা করিয়া কতবার নিজের পায়ের পাতা দিয়া তাহার পায়ের পাতন চাপ দিয়াছিল

মহাজাতি

ব্যাকালিঃ

নিরাপত্তা, সুরক্ষণ ও
সেবাই আমাদের
আদর্শ

৭৫নং রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা।



ডুয়ার্কিন-এন
ফ্রাটিনো হারমোনিয়াম

Dwarkan & Son
LTD.

১২নং এস্প্রানেড্ ইন্সট. কলিকাতা।

ভারতের বৃহত্তম বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা।

ই আই এবং বি এণ্ড এ রেলওয়ে

“রেলের লোকের যুদ্ধ প্রদর্শনীয় নহে; সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ চমকপ্রদ জয়লাভেও ইহা গৌরবান্বিত হয় না; কিন্তু ইহা এরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—যাহার উপর সৈন্যদের যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে; আর এই যুদ্ধের অকৃতকার্যতার ফলে কেবল যে যুদ্ধনিরত ব্যক্তিদেরই জীবন নাশ হয় এমন নহে, পরন্তু ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের অসংখ্য পরিবারে দুঃখ-দুর্দশা আনয়ন করে।”

—মেম্বার ওয়ার ট্রান্সপোর্ট।

অনর্থক মালগাড়ীকে আটকাইয়া না রাখিয়া এবং মালগাড়ীগুলিতে যে পরিমাণ মাল ধরে, ঠিক সেই পরিমাণ মাল বোঝাই করিয়া আপনারাও আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

অনাবশ্যক ভ্রমণ পরিহার করিয়া এবং অত্যাৱশ্যক কার্যোপলক্ষে ভ্রমণ যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

রেল ভ্রমণ পরিহার করুন

একবার পরেশ অনেকক্ষণ আরতি হাতটি নিজের মঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। শব্দেই তাহার ঠিক পূর্বেই (সেতেন অবশ্য কাছে-দূরে ছিলেন না) তাহার গালে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া চোখের দুটো ঘন, কঠোর স্বর গাঢ় করিয়া, ইঙ্গিতময় হাসি হাসিয়া আরতি করিয়াছিল, “যাও, শয়ে শয়ে তোমার কমলার স্থান দেখগে।” উত্তরে পরেশ আরতির গালটি টিপিয়া দিয়াছিল এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অপ্রত্যাখিণীর আরও গুরুতর শাস্তিবিধানের উদ্যোগ করিতেই সেতেনের কণ্ঠের শব্দ শুনিয়া আরতি জু দুইটিতে সতকাতাসচক তরঙ্গ তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা মনে হইল, কে যেন দরজায় মৃদু আঘাত দিতেছে। পরেশ নাক-ইয়া উঠিয়া বিজ্ঞান হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। আরতি আসিয়াছে নাকি? কিবো হাওয়ায় শব্দও হইতে পারে। আবার মৃদু আঘাতের শব্দ। পরেশের কবির ভিতরটা দুলায় উঠিল। দুই লাফে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার শব্দ! চাপাকণ্ঠে পরেশ প্রশ্ন করিল, “কে?” সতর্ক মূককণ্ঠে জবাব আসিল, “আমি—আরতি, দরজা খোল।”

পরেশ দরজা খুলিতেই এক বালক শীতল জোতো হাওয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল আরতি—গায়ে নীল রঙের রূপার, মাথা বেলা, চুল বিশৃঙ্খল, মুখে রহস্যময় হাসি, পাশিশ করা আবলসে কঠোর মত করলো চকচকে চোখ।

উত্তেজনায় পরেশের কণ্ঠ রম্যপ্রায়া হইয়া আসিয়াছিল, কোনমতে বলিল, “ওই একলা ঘরে, মানে সেতেনবাবু!”—আরতি বাবা দিয়া অপশেষের স্বরে কহিল, “দরজা বন্ধ করে দাও না—ঘরে ব্যুটীর ছাউ আসছে কে!” পরেশ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আরতি নিজামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ কাছে আসিতেই কহিল, “সবুজ ঘুমুটিয়েল বাকি,” পরেশ কহিল, “না!” আরতি কহিল, “কতকাল পরে থাকা দিচ্ছি, খোলাই নি কেন?” পরেশ অপরদীর মত বহিন, “সবুজের পাই নি—যা বাবো! আর ব্যুটীর শব্দ—আরতির দিকি কি করছেন জরীয়ে?” আরতি কহিল, “সবুজ ঘুমুটিয়ে। আমার কিছুতেই ঘুম এলো না—সেতেন যেন তার ঘরনে লাগলো।” ভালবাসে, তোমার সঙ্গে একটু, গল্প করিগে, দরজার খোলা তুলে দিগে চলে এসেছি। তা, তোমাকে বোঝ হয় না? দিলাম ঘুম আঁড়িয়ে দিগে!” পরেশের ঠোঁট দুইটি শুকনোয়া গিয়াছিল, জিব দিয়া ভিজাইয়া হাসিমুখের চোখো করিয়া কহিল, “বল কি আরতি! আমারও ঘুম আসে নি—তোমার কথাই ভাবছিলাম!” চোখ দুইটি নাকিয়ায় বড়ো মূরে আরতি কহিল, “সাবো নাকি! আমার ভাবো!”

কঠিনের আঁত মৃদু, আলোকে আলোছায়াতরা ঘর, বাহিরে বর্ষণ-ময় রাত্রি, কাছেপিঠে কেহ কোথাও জাগিয়া নাহি, সামনে দাঁড়াইয়া আরতি। পরেশের মনে হইল, বঙ্গোপস্রায় সমুদ্রের মাঝখানে, নিজের এক পলিগে, প্রাণাধার প্রদোষে, সে ও আরতি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে।

আরতি কহিল, “চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? খোজ, আমি এবং একটা চোয়ার টেনে বসি।” পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, “না না, তুমি নিছানয় বস, আমি চোয়ারে বসছি।” বহিরা ঘরের এক পাশে জড়া করা চোয়ারগুলো হইতে একটা টানিয়া আনিবার জন্য বাইতে উদাত হইতেই থপু করিয়া তাহার হাত ধরিয়া আরতি ভীক্ষাকণ্ঠে কহিল, “কমলার মত কোমল আর কচি না বলে আমার কাছে বসতে ইচ্ছে করে না বাকি?”

আরতির চাহনি, কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ। পরেশের মনে যে আগুন জ্বলিতেছিল, ততোধিক ঘৃণ প্রকৃষ্ট করিল। চাহিতে দাঁড়িয়া আরতির মুখে-মুখি দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া বাহু চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে বাকিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, “করে আরতি, আরও অনেক কিছু ইচ্ছে করে।” আরতির পাতলা ঝাড়া ঠোঁট দুইটি উঠিল নারায়ক মন্দির হাসি। চোখের তারা দুইটি হইয়া উঠিল ভ্রমরের মত চঞ্চল, মুখ লাগ করিয়া মৃদু বস্পিত করে কহিল, “কি?” মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভম আবেগে পরেশ আরতিকে বকে তড়াইয়া ধরিল, নিষ্ঠুর বাহুবল্লভনে তাহাকে নিপীড়িত পরিয়া তাহার মুখে চোখে কপালে কপালে ভ্রূণীর চুম্বন করিতে লাগিল। আরতি নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া কহিল, “ছাড়! তুমি বোধ হয় ভুল করছ, আমি কমলা না—আরতি।”

পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, “জানি, তুমি আমারই আরতি—আমার জীবনে সর্বপ্রথম নারী, যে আমার বাহুবল্লভনে ধরা দিয়েছে।”

আরতিও গভীর আবেগের সজ্জিত কহিল, “তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ—যার হাতে ধরা দিলাম।” বলিয়া নিঃশেষে নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

নিভৃত মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা খিটাইয়া আসিবার পর তাহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া, একই শাল গায়ে জড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। আরতি কহিল, “তুমি কি আমাদের পেরিচ্ছে দিয়ে ফিরে আসবে ভাবছ?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া “হা” জানাইল। আরতি কহিল, “ভারপর?”

“এখানের সব ব্যবস্থা করে তোমার কাছে ফিরে যাব।” আরতি আবদারের সুরে কহিল, “না, যা ব্যবস্থা করতে হবে, কালই করে ফেল, আর আসতে পাবে না তুমি।” পরেশ কহিল, “এত তাড়াতাড়ি!” বাধা দিয়া আরতি কহিল, “তা হোক, কি এমন ব্যবস্থা করতে হবে? বিনয়বাবুকে বলো, করে দেবেন।” পরেশ কহিল, “বিনয় বাবা যে বাড়িতে নেই।” আরতি কহিল, “নাই বা থাকলেন, পরে চিঠি লিখলেও চলবে। মোট কথা, আমি আর ছেড়ে দেব না তোমাকে।” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “তোমাকে বিশ্বাস হয় না নাকি?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, পুরুষকে বিশ্বাস কর না আমি।” পরেশ কহিল, “নেই?” জবাব দিল না আরতি।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—তাহার মাসভূতো ভাইয়ের বন্ধু। তাহাদের বাড়িতে আসিত, তাহাকে পড়াইত, কত উপহার দিত। সুখেন্দু পড়িত স্কটিশচার্চ কলেজে, সে পড়িত বেতন শুলে—একসঙ্গে প্রতিদিন ট্রামে করিয়া পড়িতে বাইত তাহারা, একসঙ্গে বাড়ি ফিরিত। ম্যারিভুলেশন পাস করিয়া সে স্কটিশচার্চে ভর্তি হইল, সুখেন্দু তখন ফোর্চ-ইয়ারের ছাত্র, সেই সময়ে দুইজনে কতদিন কলেজ হইতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গড়ের মাঠে, আনিপুর জুড়ে, বোটানিয়ার গাভেঁনে—আরও কত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আবার যথাসময়ে ভাল ছাত্রভাণ্ডার মত বাড়ি ফিরিত। এমনই করিয়া তাহারা দুইজন দুইজনকে ভালবাসিল, দুইজন দুইজনের মন জানিল, দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া কতদিন রক্তির কত স্বপ্ন দেখিল। বিএ পাস করিয়া সুখেন্দু, ইউনিভার্সিটিতে চলিয়া গেল। সেখানে সহপাঠিনী বিশদীন্দালয়ের নামজাদা ছাত্রী, নামজাদা স্কন্দরী স্মৃতির ফাঁদে ধরা পড়িল। তারপর তাহাদের বাড়ি আসা বন্ধ করিল সে, তাহার সহিত দেখা সাফল্য বন্ধ করিল এবং আচিরে অবলীহারের তাহাকে মন হইতে কাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভালবাসা লজ্জায় অপমানের মনে কোণে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া অনাহারে আত্মহত্যা করিল।

আরতি কহিল, “কেন আবার—এমনই বিশ্বাস কর না। তুমি ফিরে এলে আর হয়তো ফিরবে না, কমলার হাতেই ধরা দেবে।”

পরেশ আরতিকে ঘনতর করিয়া কাছে টানিয়া কহিল, “পাগল নাকি!” আরতি মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমি পাগল হই আর বাই হই, তোমাকে আমার সংগেই যেতে হবে, কালই সব ব্যবস্থা করে ফেল। আমার হাতে যখন ধরা পেড়ে, যতদিন বেঁচে থাকব—জাড়া পাবে বলে ডেব না।”

ঘর হইতে বাইবার আগে আরতি কহিল, “কমলার উপর হয়তো অন্যায় করছি আমি, কিন্তু ভগবান নিজে থেকে আমায় পছন্দ করে। আমি তোমাকে দেন নি, তাই পরের হাত থেকে নিজের প্রার্থিত বস্তু ছেঁঁ মেয়ে কেড়ে নিতে হচ্ছে। কমলা হয়তো দুঃখ পাবে, কিন্তু জানি, তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন আবার তার মূর্তি ভরে দেবে—”

(৩২)

পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরিবার সময়ে পরেশ দৌঁধল, বিনয়ের দৌঁধলানা খোলা। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া হাঁকিল, “বাকাবাবু!” বিনয় সাড়া দিল, “কে? পরেশ? এস বাবা।” পরেশ বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিল, বিনয় ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কাকমা এসেছে না?” বিনয় কহিল, “পাগল! পোষ মাসে আবার আসে? তা ছাড়া, ববির বিয়ে না হলে আসবে না।” একটা চোয়ার দেখাইয়া কহিল, “ওই চেয়ারটায় বস বাবাজী।” পরেশ কহিল, “আক, বসব না। বিব সেসেছে?” বিনয় কহিল, “হ্যাঁ, ঘাটা প্রায় শুরুরি এসেছে।” ঢোক গিলিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “ববির বিয়ে কোথাও ঠিক হ'ল নাকি?” বিনয় কহিল, “ঠিক এমন কিছু হয় নি, তবে আমার শালা চেষ্টা করছে। আমার শালাকে জানো তো—মোজার মানব, কোথাও একটা লাগিয়ে দেবে ঠিক।”

পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় কহিল, “তা বাবাজী, তোমার খবর বল—প্রাক্টিশের কিছু উদীত হয়েছে?” পরেশ কহিল, “তা একটু হয়েছে বইকি!” বিনয় হাসিয়া কহিল, “আমি তো বনেছিলাম বাবাজী, স্মৃতিধে হবে। বিয়ে না হইতেই এই, বিয়ে হবার পরে আরও অনেক সুবিধে হবে।” পরেশ কহিল, “আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি কাল।” বিনয় বিশ্বাসের স্বরে কহিল, “এখন কলকাতা কেন? বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?”



Block by
RISING ART COTTAGE
 BLOCK MAKERS, PHOTO ENGRAVERS, DESIGNERS & FINE ART PRINTERS.
 103, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA.

পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “হাঁ, ওষধ কতগুলো কিনতে হবে। তা ছাড়া আরও কতগুলো দরকারী জিনিসপত্র—”

বাধা দিয়া বিনয় কহিল, “ফিরছ কখন?”

পরেশ কহিল, “দু’চার দিন দেরি হবে। মাসীমা একা থাকবেন—খোঁজখবর নেবেন কহিল—”

বিনয় কহিল, “আমাকে বলতে হবে না বাবা, আমি তো নেবই, তা ছাড়া তোমার ডাক্তার আছে, ঘনশ্যাম আছে, ওরা সবাই নেবে।”

সন্ধ্যার পরে পরেশ একটা বড় ট্রাকে কাপড়জামা, ডাক্তারি বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভরিতেছিল, মাসীমা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, “কলকাতা কি জন্যে যাচ্ছিস?” পরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, “কাজ আছে।” মাসীমা কহিলেন, “কি কাজ শুন?”

“ওষধপত্র কিনতে হবে—জামাকাপড় তৈরি করতে হবে।”

বাধা দিয়া মাসীমা কহিলেন, “তোমার শ্বশুরবাড়িতে বলেছিস?” পরেশ কহিল, “কি দরকার? দু’দিন পরেই ফিরে আসছি তো!” মাসীমা কহিলেন, “তবে, বলা উচিত ছিল, এখন ওরাই হ’ল তোমার সত্যিকার আপনাদ, ওদের না জানিয়ে কোন কাজ করা উচিত নয় তোরা।” পরেশ নীরবে নিজের কাজ করিতে লাগিল। মাসীমা কহিলেন, “তড়াহাড়ি ফিরি বাপু, বিয়ের আর বেশি দেরি নেই—”

(৩০)

দিন দশ পরে বিকাল পাঁচটার সময়ে কাস্তিক ডাক্তারের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গেল। গ্রামের ভরইতর সকল শ্রেণীর আগ্রহ-বৃদ্ধ-বিনীতা কাস্তিক ডাক্তারের উঠানে আসিয়া জড়াই হইল। কাস্তিক ডাক্তার বারান্দার খাটের উপরে খাড়া উপবিষ্ট, কপালে কৃষ্ণরেখাবর্ণী, মাথের কটোর গম্ভীর, রক্তবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি ভূমির উপরে ন্যস্ত। খাটের পাশে একটা মোড়ায় ঘনশ্যাম বসিয়া আছে; জন্মের উপরে স্থাপিত ডান হাতের উপর মূর্খটি তির্যকভাবে রাখিত। তাহার কাস্তিক ও ফোভের মাথা যে কাস্তিকের নরকে আঁতরন করিয়া অনেক দূরে পৌঁছিয়াছে, মাথের ভাবে তাহাই সে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হার ও পরাগ মোড়া সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উঠানেই লক্ষলক্ষ ও হাঁক-জাক শব্দ করিয়া দিয়াছে। কাস্তিকের ঘনশ্যাম পারিষদের বারান্দায় কেহ উকু হইয়া বসিয়া, কেহ খাড়া দাঁড়াইয়া, নীরবে অথবা সর্বদা ফোভ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

রাস্তাঘাটের বারান্দায় কাস্তিক গৃহিণী দেওয়ান সৈস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশেই গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন বীহার মা। উভয়েরই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। তাঁহাদের দুইজনকে ঘেঁরিয়া বসিয়া আছে পাড়ার মেয়ে—ইহারাও নিজ নিজ মাথের যথাসাধ্য সম-দোদার ভাব ফুটিবার চেষ্টাকরত ‘আহা-উহু’ করিতেছে। শ্রীমতী ও বমলা এখনো নাই। ফোভার উপরে, অঙ্গদার ঘরে পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া থালি মেকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁদিয়া ফুঁদিয়া কাঁদিতেছে বমলা।

হার, চীৎকার করিয়া কহিল, “কিছুতেই সহ্য করব না, যারা এর ভেতরে আছে তাদের নখে টিপে টিপে মারব।” বলিয়া বাম হাতের বড়ো আঙুলের নখের উপর ডান হাতের বড়ো আঙুলের নখটি টিপিয়া, দাঁত দাঁত ঘষিয়া, চোখ দুইটা ছোট ও কপাল কৃষ্ণত করিয়া উকুন মারিবার ভঙ্গী করিল।

পরাগ মুখহাত নাড়িয়া কহিল, “হয়েছে, হয়েছে! তখন যে ভোজ খাবার লোভে সব দিশেহারা হয়ে গেলে কিনা! না হলে নয়! নি তখন, মহেশ আচার্য্যর ছেলে, ও বাড়ির বাঁশ সোজা হবার ঠিক; শহরে লেখা-পড়া শিখে এলেও ভাল ক’র দেখেছেন বাজিয়ে তবে সব ঠিক কর? না, তখন বৃক ঠেকে বলা হ’ল—কোন চিন্তা নেই, আমি যখন স্ত্রীতো ধরোঁ, তখন আর গোঁষ খেতে সাহস করবে না! যতই হোক, ছত্র তো! এখন গড়ে, ভড়ির ঠালাটা সামলাও!” বলিয়া ঘনশ্যামের দিকে আশ্রয়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাথাটা ঝাঁকাইয়া দিল। ঘনশ্যাম ঝাঁকড়া প্রু দুইটির মধ্যস্থ সংকীর্ণ ফাঁকিকূ একেবারে বিলম্বত করিয়া দিয়া ভারী গলায় কহিল, “ঠিকই বলেছিলাম, কিছু গোলমাল হ’ত না, তবে পাড়ার লোকে বন্দু চাল দেয় তো কি করব বল!” হার, এতক্ষণ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “তার মানে? কিছু করতে পারব না আমরা? সারা সমাজের গায়ে একটা লোক খোঁচা মারবে হরদম, আর আমরা

চুপচাপ দাড়িয়ে সহ্য করব! তার চেয়ে সব এক সঙ্গে গলায় কলসী বেঁধে নতুন পুত্রেয় জলে ডুবে মরিগে চল।” বলিয়া বোধ করি ভূবিয়া মরিবার জন্যই সদর দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু কেহই তাহার অনুগামী হইল না বা তাহাকে ফিরিতে অনুৰোধ করিল না দেখিয়া কতকটা যাইয়াই ফিরিয়া আসিয়া ডান হাতটা শূন্যে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, “ভূবে মরব কিসের জন্যে? মরদের বাচ্চা, মেয়েমানুষ তো নয়! কেউ না পারে একাই আমি শোধ নেব, কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয়, দেখে নেব।”

পরাগ হাঁকিয়া কহিল, “আর ফটফটানি করতে হবে না। সব বাহাদুরি দেখা আছে। বিয়ে কি করে বন্ধ করবে শুন? ছেলেকেই যখন সন্তানমন থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তখন—”

হার, বাধা দিয়া কহিল, “এই মাথাতে অনেক বৃশ্মি আছে বাবা!” বলিয়া নিজের তালুতে ব্যাককয়ে চাটি মারিয়া কহিল, “তোমাদের মত ভোজটেবল্ মাকী ঘি নয়, আমল গাওয়া ঘি আমার মাথায়।” বলিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া, বাম চোখটি ছোট করিয়া ঘাড়ট বাঁকাইয়া কহিল, “বরের আসন থেকে হাতকড়া দিয়ে বর উঠিয়ে নিয়ে আসব।” বলিয়া বাম হাতের উপর ডান হাতটি চাপিয়া পরানের দিকে বাড়াইয়া দিল।

হার ও পরানের বড়বাড়ি দেখিয়া ঘনশ্যাম মোড়ার উপরে গম্ভীরভাবে আর বসিয়া থাকা বৃশ্মিযুক্ত মনে করিল না। দাঁড়াইয়া কহিল, “তোমরা বাজে বোকা না দেখা! কার যে কত দমত, কত বৃশ্মি সব জানা আছে। ও ছেলের আশা ছেড়ে দাও—টেনে হিঁচড়ে ধরে এনে ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে হবে—এমন ফালনা মেয়ে আমাদের নয়। উপস্থিত পত্র খুঁজে এনে ঠিক দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কার কি ব্যবস্থা করতে হবে, সে এখন মূল্যবান থাক। আসল কাজ শেষ করে সবাই মিলে ভেবেচিন্তে দীর্ঘসম্প্রদায় স্থির করতে হবে।” সমবেত ইতরশ্রেণীর লোক-গলার উদ্দেশ্যে ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, “তোরা সব ঘর যা; কিছু জাবনা নেই তেদের। ঠিক দিনে ভোজ খেতে চলে আসবি সব।” দাঁহাদের উদ্দেশ্যে কহিল, “তোমরা সব বাড়ি যাও, কাজকর্ম করগে, বিয়ে বন্ধ হবে না।” জেনে রেখে—পিপাড়ুর পাখা বেরোলেই পাখী হয় না, পাখা ছিড়ে পিয়ে মাংসবার জন্যে আমরা এখনও বোঁচা আছি গায়ে।” বলিয়া চোখ দুইটা চাড়াইয়া, হাতের মতো দুইটা বন্ধ করিয়া দাঁত দাঁত ঘষিল।

কাস্তিক ও পারিষদবর্গ বাতীত একে একে সকলে চণিয়া গেল। ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, “শ্রীমতীদিদি কোথায় গেলো?” উপর-কোঠা হইতে শ্রীমতী সাড়া দিল, “এই যে এখানে রয়েছি, মাই!”

অনতিবিলম্বে শ্রীমতী আসিতেই কাস্তিক ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করছে?”

শ্রীমতী কহিল, “কাঁদছিল, চুপ করেছে।”

কাস্তিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “হুঁ!”

ঘনশ্যাম ফিস ফিস করিয়া শ্রীমতীকে কহিল, “তুমি একবার বিনয়ের ওখানে যাও দেখ, আসল ব্যাপারটা জেনে এস।” পরেশ ওর মেরেকে বিয়ে করবার জন্যে পাঁচিয়েছে, না সেই কয়েত ছুড়ীটার সঙ্গে গিয়ে জুটেছে।” হার, কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বাধা দিয়া কহিল, “পাগল হয়েছে নাকি! বাবুনের ছেলে—” ঘনশ্যাম সবলের দিকে চোখ বুলাইয়া কহিল, “যেমন বৃশ্মি! যার না বাবুনের মেরে হয়ে আগুরীর হাতে জাত দিগোঁছল, তার ছেলে তো! তা ছাড়া, আজকাল এ রকম বিয়ে আকছার হচ্ছে।” বলিয়া শিবনের হইয়া ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু যে আশ্রয়দৃষ্টি এই বিশ্ফারণ ও বিস্ফারণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মাত্র একবার চিঠি, পরেশের—কাস্তিকের নামে। বেলা দুইটার সময়ে পিয়ন বিলি করিয়া গিয়াছিল, বেলা তিনটার সময়ে দিবানিন্দা সমাপন করিয়া নিরাজড়িত চক্ষু চিঠি পাড়িতে পাড়িতে কাস্তিক ডাক্তারের চোখের ঘূমে এক মুহূর্তে ভূবিয়া গিয়াছিল।

পরেশ লিখিয়াছিল—

কলিকাতা,

প্রমথপসেয়,

সবিনয় নিবেদন মিম্ব, আমি নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিয়া দুই-চারজন সত্যীর্ণ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া আর গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিতেছি, সন্নিধা হইলে এইখানে অথবা অন্য কোন শহরে বাসনা শব্দ করিব। এ অবস্থায়

জনপ্রিয় উন্নতিশীল প্রভিডেন্ট
বীমা প্রতিষ্ঠান।

*
নতুন বীমা আইনের নিয়মানুযায়ী
সুচু ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত

আরবান প্রভিডেন্ট

ইন্সিওরেন্স

সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস :

৩ ও ৪নং হোয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৬১১

*
পলিসিহোল্ডার ও এজেন্টগণের
সর্বস্বার্থ সুরক্ষিত।

*
এজেন্সীর সর্বোদয় সন্তোষজনক

জীবন বীমার জন্য

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল

লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

১০, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।



আমাদের
সবল পৃষ্ঠপোষক
আমরা শুভ শারদীয়ার
সম্ভাষণ জানাই।

Bathgate & Co.



ফোটোশিল্পী—শ্রীনিবাস দাস

মহত্ব আমার সহিত কমলার বিবাহ দিতে আপনি রাজী হইবেন না। কারণ আমি জানি, আপনি আপনার কন্যাটিকে নিজের চেতনের সামনে রাখিতে চান। কাজেই আমি কমলকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। আশা করি, আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সহায্যে এই বয়সদিনের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট দিনে কমলার বিবাহ দিতে পারিবেন। এ কয়দিন আপনার কাছে যে স্নেহ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য ঐরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব। ভবিষ্যতে কর্মজীবনে যদি কোনদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার আপনাদের চরণ দর্শন করিব। আশা করি, তখনও আপনারদের স্নেহ-বর্ষণ হইতে বাঞ্ছিত হইব না। আপনারা আমার কৃত্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহপ্রার্থী পরেশ

(৩৪)

সেইদিন সম্ভার পর বৈঠকখানায় লণ্ঠন জ্বালিয়া বিনয় পড়িতেছিল, হঠাৎ শ্রীমতী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বিনয় রয়েছে নাকি?” বিনয় কহিল, “কৈ? শ্রীমতী পিসি? এস, বস।” শ্রীমতী ঢাকিয়া মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, “মহেশ আচার্য্যার বাড়ি গিছলাম, জনিস তো পরেশ কি কাজ করছে!” বিনয় সবিষ্টময়ে কহিল, কি?” শ্রীমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনয়ের মুখের উপর নাস্ত করিয়া কণ্ঠস্বরে বাগ্পের স্ফুট আমেজ মিশাইয়া কহিল, “জানিস না?” বিনয় ছাড় নাড়িয়া কহিল,

“না তো!” শ্রীমতী বাকি হাসি হাসিয়া কহিল, “পরেশ আজ চিঠি লিখেছে ডাক্তারকে। জানিয়েছে, গিয়ে আর ফিরবে না, কমলকে বিয়ে করবে না, শহরে ডাক্তারি করবে, আর কোন এক শহরে মেয়েকে বিয়ে করবে। ওর মাসিকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছে, ও যেন ঘর-দোর বন্ধ করে চাবি তোর কাছে দিয়ে মেয়ের কাছে ফিরে যায়।” বিনয় বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, “তাই নাকি?” তারপর বেন কিছু মনে পড়িল, এইভাবে মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, “তাই যদি ঘনশ্যাম ত্যাগাতাড়ি দুল থেকে চলে এল?” শ্রীমতী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিল, “আসবে না। ওরই হাতে গড়া সম্প্রদায়। ও মাঝে না থাকলে মহেশ আচার্য্যির ছেলের সঙ্গে কার্তিক ডাক্তার কি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হত। ঘর মায়ের অমন কীর্তি। ঘনশ্যাম অনেক বাল-কয়ে ডাক্তারকে রাজী করেছিল।” বিনয় চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী বলিতে লাগিল, “শুধু ঘনশ্যাম কেন, সারা গায়ের লোক জেড়া হয়েছিল যে। ডাক্তার-অস্ত্র-প্রাণ সব, আসবে না? শব্দ তোকেই দেখলাম না।” বিনয় লম্বিত মুখে কহিল, “কিছু জানতাম না, স্কুলে ছিলাম কিনা। যাব কাল সকালে; ডাক্তার বুকি মুখে পড়েছেন?”

“তা একটু পড়েছে বইকি। সব আয়োজন হয়ে গেছে, বিয়ে না হলে তো সব পণ্ড। তা ছাড়া, পাকাপাকি হয়ে বিয়ে ভেঙে যাওয়া মেয়ের পক্ষে ভারী খারাপ, এই লগ্নে যেমন করে হোক বিয়ে দিতে না পারলে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই দায় হবে।” কিছুদ্ধ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তোকে কোন চিঠি বের মি পরেশ?” বিনয় প্রবলবেগে ছাড়

দি চট্টাগা
সেন্ট্রাল ব্যাংকিং
কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :
৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন : ক্যালঃ ৩৪৬৭
স্থাপিত ইং ১৯৩০

আজিমগজ আখা

বিখ্যাত জমিদার ও ব্যাংকার মিঃ
ভূপত সিং দত্তগরের শৌর্যহিত্যে
গত ২৮শে জুলাই আজিমগজ
শাখা খোলা হইয়াছে।

আমানতের হার ও সর্গাদি
সুবিধাজনক

আবেদন দেবতোষ দাশগুপ্ত,
করুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের
অশান্তির মধ্যে “মা আনন্দময়ী”
আসিতেছেন। কিন্তু মানুষের
মনে শান্তি ও আনন্দ কোথায় ?
সেই শান্তি ও আনন্দ দেবে :—

ক্লারিটা
মিউজিক স্যালুন

গ্রামোফোন, রেডিও, হারমোনিয়াম
ও সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।
১০/সি, আশুতোষ মার্কার্জি রোড,
কলিকাতা।

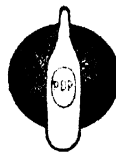
আমরা সেরামতের কাজ সুন্দররূপে
করিয়া থাকি।

আজও

মা' আজও জ্বলে



যে সব মানব মানবীকে অবলম্বন
ক'রে গল্প পর্যন্ত গ'ড়ে উঠেছে,
ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগল্ সেই দুর্লভদের
মধ্যে একজন। তার কারণ তাঁর অপূর্ব
সেবারত, ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। তিনি
যে আলো জ্বালিয়েছিলেন তা আজও আমাদের
পথ দেখায়। আজ যখন আমাদের দেশের লক্ষ
লক্ষ লোক ওষুধের অভাবে অকথা কষ্ট পাচ্ছে,
তাঁর আদর্শ আমাদের কাছে আসে জীবন্ত প্রেরণার
মত। এই অভাব দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা
করব ব'লে আমরা পণ করছি। পথে বিঘের
শেষ ছিল না; কিন্তু আজ সানন্দে বলতে পারি
সে বাধা আমরা অতিক্রম করেছি। আজ তাই
নিঃসংকোচে দেশবাসীর হাতে আমাদের তৈরী
ওষুধ তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছি।



ওষুধ ও
ইনজেক্ট্যুল
প্রস্তুতকারক

নিওর ড্রাগস্ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ কোম্পানী

নাড়িয়া কহিল, “না তো।” শ্রীমতী অব্যবসারের সুরে কহিল, “তোরা কাছে তো একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল তার, তাকে এত ভক্তি করে, হিংসার করে, তোর কাছেই ঘরের চাবি রাখতে বলেছে।” বিনয় বিরক্তি চাপিয়া কহিল, “তা নিশ্চয়ই করে, চিরদিন তাকে স্নেহ করছি, তার মঙ্গল কামনা করছি, ভক্তি করব না।” দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমতী কহিল, “কে মানা করছে রে? যত ইচ্ছে ভক্তি করুক, তাই বলে কি পরের ভয়ভূঁবি করে দিতে হবে?” বিনয় তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “কি বলতে চান তুমি?” শ্রীমতীও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও উচ্চ করিয়া কহিল, “কি আর বলব? সবাই বলছে—পরের নাকি যাবার আগে তাকে সব জানিয়ে দিতে হইল।” বিনয় প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “মিথো কথা! আমার সঙ্গে দেখা করেছিল বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে একেবারে চলে যাচ্ছে, এ কথা ঘণাক্ষরেও জানায় নি। বলাইক—কলকাতা যাচ্ছি, দুর্ভাগ্যবশত পরে ফিরব, ওর মাসীরা বেনে খোজ-খবর নিই।” শ্রীমতী এতক্ষণ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতোছিল, টোঁট দুইটি চাপিয়া, উপরে নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ওই তো জানাবো হ’ল।” হঠাৎ কণ্ঠস্বর প্রখর করিয়া কহিল, “কার্তিক ভক্তার তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে রে?” বিনয় নীরবে বসিয়া রহিল। শ্রীমতী কহিতে লাগিল, “তোরা উচিত ছিল সেদিন তখনই ভক্তারকে খবর দেওয়া, তা হলে গজের মুখস্থদের ডেকে সমান সামানি খোলাখুলি কথাবাতা হয়ে যেত। ছোঁড়া যদি বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই বলত, তা হ’লেও উত্তর তার ঘাড়ের মেয়ে চাপিয়ে দিতে চাইত, এমন ফালনা মেয়ে তার নয়। এমন গাংলামি করাও তার কোঠিতে লোকনি। তার পরসার অভাব নেই, মেয়েরও রূপ-গুণের অভাব নেই যে লোকের বৈষ্যম্যে দগ্ধ করত হ’ল।” কণ্ঠস্বর প্রখরতর করিয়া কহিল, “আর তোর যদি পরশকে জামাই করবার ইচ্ছা ছিল, কার্তিক ভক্তারকে আগে বললেই পারতাম। তা হলে ভক্তার ওদিকে আর হাত বাড়াত না, এবং এমন মানুষ যে, হয়তো নিজের দুর্ভাগ্য থেকে বিয়ে দিয়ে দিত।” দম লইয়া কহিল, “এত চাল চালতেও হ’ত না, গাঁ থেকে পালতেও হ’ত না। আর যদি চুপ করেই ভীলি তো শেষ পর্যন্ত চুপ করেই থাকলে হ’ত, ইচ্ছামিচ্ছা এতবড় একটা মানুষের মাথা হেঁট করাল, একটা নিদারুণ মেয়ের মনে কষ্ট দিল—” বিনয় হতবাক্যের মত নির্বাকভাবে শ্রীমতীর কথা শুনিতোছিল। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, “তা হলে তোমাদের সকলের ধারণা, আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে আমারই পরামর্শে পরেশ এখান থেকে পালিয়েছে?”

কক্ষর দিয়া শ্রীমতী কহিল, “আমি কিছু জানি না বাবা, সবাই বলছে।”

বিনয় কহিল, “সবাইকে বলো, আমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। আমি গরিব বটে, তবু পরের জিনিসে লোভ করবার মত নাচি নাই।” শ্রীমতী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “তাই নাকি? কোথায় হ’ল? কবে খবর পেলি?” বিনয় কহিল, “অজুই চিঠি এসেছে। দেখতে চাও তো আনছি।” বলিয়া বিনয় বাড়ির ভিতরে গিয়া একটা পোস্টকার্ড লইয়া আসিল। শ্রীমতী কহিল, “পাড়ে শোনা দেখি।”

বিনয়ের স্ত্রী লিখিতেছে—দাদা এখানে খবর জন্য একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পাঠটি শ্রীমতীসমক্ষে; বয়স কিছু বেশি বটে, কিন্তু পলিসে চাকরি করে, মাসে মোটা উপার্জন। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র ছেলে ও মেয়ে আছে। আমি মত দিয়াছি, আমাদের মত গরিবের মেয়ের ইহার চেয়ে কি ভাল বর জুটবে? দাদা তোমার কথা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমার ইচ্ছা মত দিয়াছি। ভাগ্যে থাকিলে মেয়ে এখানেই সুখী হইবে। আগামী এই মাঘ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি পরশটা ছুটি লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।

শ্রীমতী মৃদু কালো করিয়া কহিল, “পুত্রী সর চাকরি! তবে তো অনেক টাকা রোজগার!” দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “ভারী সুখী হলাম শূনে। তাই তো বলেছিলাম বউমাকে—ভাইয়ের কাছে মেয়েকে নিয়ে যা, তারা শহরের লোক—অনেক রকম জানে-শোনে; ধরাধরি করে মেয়ের তোর গতি করে দেবে।” মাথা নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “না হ’লে গিয়ে যা দর্শনই উঠেছিল, ও মেয়ে পর কব্জা শক্ত হ’ত। আমি উঠি বাবা! সবাইকে বলি গিয়ে।” বলিয়া ঘাইতে উদ্যত হইয়া কহিল, “এক কাজ কর, চিঠিটা আমাকে দে, কাগজে-কালিতে দেখলে কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।”

(৩৬)

এই মাঘ। রাতি একটা।

বহুজার স্ট্রীটের একটা ছোট দোতলা বাড়ির ছাদের এক কোণে আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া আরতি ও পরেশ। এই বাড়ির দোতলায় দুইখানা ঘর তাহারা ভাড়া লইয়াছে। আজ আরতির বন্ধু করপোরেশন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শোভনা দাস ও তাহার স্বামী প্রীতীন দাসের বাড়িতে ও তাহাদের চোড়ায় পরেশের সহিত আরতির হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রাতি এগারোটায় পর চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার মৃদু নিন্দা আলো, প্রশংসনীয় কন্যার প্রতি দরিদ্র পিতার স্নেহোপহারের মত আলোকময়ী নগরীর উপর কুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হইতেছিল। সেই জ্যেষ্ঠবার এক টুকরা চাঁদারপেকর উচ্চ বাড়িগুলোর মাথা ডিঙাইয়া কোনমতে আরতিদের ছাদের এক কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-চক্রণ নীলাত ধূসর আকাশের পানে হানাইয়া আরতি ও পরেশ স্বপ্ন দেখিতেছিল—আগামী অজ্ঞাত ভবিষ্যতের নয়, পশ্চাতে ফেলিয়া আসা অতি পরিচিত অতীতের।

পরেশের মনে পড়িল, ববির কথা, কমলার কথা। ববির অশ্রুসজল মুখখানি, বম্ভার সেদিনের সেই হাসোজ্বল চোখ দুইটি মনে পড়িল। জীবনের বাকি বাকি কে কোথায় হারাইয়া গেল, আর কোনদিন তাহাদের সহিত হয়তো দেখা হইবে না।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—ধবধবে ফস্কা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা, খাড়া নাক, বিস্কৃত কপাল, চোখে দৃঢ় দৃষ্টি। আরতি একলা ভালবাসিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু সে ভালবাসা মরিয়া, গলিয়া, ধূলা হইয়া মনের এক কোণে জ্বালার মত জুড়া হইয়া আছে। তবু এখনও কোন কোন দিন আরতি স্বপ্নে সুখেন্দুকে দেখে—সেই আগের দিনের মস্ত কলেজ পলাইয়া তাহার সঙ্গে সারা কলিকাতা শহরে টো-টো- করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দুইজনের স্থাব্যবট আনন্দোজ্বল মনের মধ্যে একটি স্ফুট করণ সুর বাজিয়া উঠিল, দুইজনেরই দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। আরতি আরও কাছে ঘেষিয়া আসিয়া কহিল, “কি ভাবছ গো।” পরেশ কহিল, “তুমি?”

এই মাঘ। রাতি একটা।

কোন এক মহৎবল শহরে মোক্তার-মামার বাড়িতে ববির বিবাহের প্রথম পর্ব অর্থাৎ কন্যাদান ও শ্রুতদণ্ডি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর—এই শহরের পলিসের দারোগা, বয়স চল্লিশের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। বয়সরথানেক আগে বিপত্নীক হইয়াছে। প্রথম পক্ষের দুই বৎসর দৈবের একটি ছেলে ও বৎসর পটের একটি মেয়ে আছে। কাজেই বিবাহ না করিয়া কোন রকমে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু একটানা এক বৎসর বহুচর্চা সাধন করিবার পর মনটা তাহার ঘাড় বাকিয়া দাঁড়াইল। উপরন্তু অন্যের বৃন্দা পিসিয়া, বাহিরে বন্ধু-বান্ধবের দল পল্লীহীন জীবনের পরিণাম সম্মুখে তাহার চোখের সামনে এমনই ভয়াবহ চিত্র আঁকিতে শুরু করিল যে, শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিতে রাজী হইয়া পড়িল। এবং লোক মোক্তার বন্ধু (ববির মামা) তাহার ভাগিনেয়ারী সংগে বিবাহের প্রস্তাব করিলে প্রথমতঃ বয়সের ভারতমোর দরুণ একটু হুঁতবুঁত করিল বটে, কিন্তু মেয়েকে স্বচক্ষে দেখিবার পর আপত্তি তো করিলই না বরং অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়া উঠিল। বরের বয়স, লম্বা-চওড়া মেদবহুল, লেহাস দেহ ও মেটে রং দেখিয়া সুখদা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দাদার কাছে ধমক খাইয়া, তাহা ছাড়া সম্ভার কাম সাধন হইবে ভাবিয়াও রাজী হইয়া গেল।

বাসর-ঘরে কন্য ও বর বসিয়া আছে। বাড়ির মেয়েরা বরের বয়স ও পদনর্ব্বালা স্মরণ করিয়া কেহ কাছে ঘেষিতে সাহস করে নাই, জানালা ও দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া মৃদু গঞ্জন করিতেছে। বর একটা গড়গড়া হইতে লম্বা সটকার তাম্বাক টানিতেছে। পাশে লাল ঢেলীতে সর্বাপাণ্ডা মুড়িয়া আবদ্ধ ঘোমটা টানিয়া ববি বসিয়া আছে। সুখদা একবার ঘরে ঢুকিয়া শ্বিবা-কাপ্তান পদে কাছে আসিয়া ববির বাম হাতটি বরের জন হাতে চাপাইয়া দিয়া, মৃদুস্বপ্ন-পড়া বলার মত, ফিস ফিস করিয়া

লজেন্স, চকোলেটে, টফী ইত্যাদি এবং জ্যাম্, জেলী,
চাটনী ইত্যাদি এইখানে খাঁজ করুন—

জেম্‌স্‌ লর্ড এণ্ড সন্স

৯নং কমান্ডার্সেন বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা।

আমরা এই সমস্ত

‘টাইগার মার্কা’



মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করি

বয়েল্ড ড্রপস্‌

ফ্যান্সী বন্স্‌

পিপারমিষ্ট

কম্বিকট গুডস্‌

টফী

ইত্যাদি

আমরা প্রস্তুত করি

‘পলেন্‌’ মার্কা



এই সমস্ত সামগ্রী

আনারসের জ্যাম্

গুজবেরী জ্যাম্

পেয়ারার জেলী

আমের চাটনী

টমেটো সস্‌

লিমন স্কোয়াস্‌

অরেঞ্জ স্কোয়াস্‌

লাইমজুস্‌

কর্ডিয়েল

মিক্সড পিকল্‌

জিঞ্জার বীয়ার

ইংলিস ভিনিগার

টয়লেট পেপার

কিনাইল

ইত্যাদি

সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত

টেলিগ্রাম—“সিডার”

ফোন-ক্যাল ৪০৬২ এবং

বি বি ৫৮০৮

কহিল, “তোমার হাতে সপে দিলাম, বাবা।” নেহাৎ ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। বোঝে দৃষ্টি হলে কমা ক’রে।” বর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বরির কোমল-কম্পমান হাতটি নিজের বাঘের থালার মত প্রকাশ্যে কড়া-পড়া হাতে মৃদতির মধ্যে ঢাপিয়া বাজখাই গলায় কহিল, “কিছু ভাবনা নেই অপসার। ছেলে-ছোকরা তো নয় যে বাকিরে বলতে হবে। মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।” সূখদা কম্পিত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বর বরির সঙ্গোল, সঙ্গতিত, কটা সেনার মত রঙের হাতে পাতলা, হাস্কা সৌন্দর্য চুড়িগুলির দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে আড়ালে-আড়ালে দণ্ডায়মানা রমণীবৃন্দের উদ্দেশ্যে কহিল, “আ। এ যে তোর মত সর্ব দেখছি, বেশ ভারী ভারী চুড়ি গড়িয়ে দেব এখন।” বলিয়া হাতটি পদম লোভের সহিত টিপিতে লাগিল। বাব হাতটি সরাইয়া লইবার জন্য টান দিতেই বর কহিল, “লাগছে নাকি?” ববি নীরব। বর কহিল, “কথা কওনা যে, ঘুম পেয়েছে নাকি? পেয়েছে তো হাত-পা মেল শূন্যে গড়া। আমিও একটু গড়ব তব্বিছ, যা ধকল গেছে সারাদিন। এ ব্যসে কি ও সব সয়?” বলিয়া হাতটি ছাড়িয়া দিতেই ববি হাতটি টানিয়া লইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া ঘোমটা আরও আব হাত টানিয়া দিল।

বর শালমুড়ি দিয়া শইয়া পড়িল। বর দুই এপাশ-ওপাশ করিয়া বরিকে কহিল, “বসে রইলে কেন? শোও না।” বলিয়া বোঝ করি প্রথম পক্ষের স্মারি কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ববি তেমনি বাঁসরা রইল।

বাহিরে মেয়েরা একে একে সরিয়া পড়িয়া শয্যাপ্রায় গ্রহণ করিল, বড়ির অন্যান্য লোকজন যে যেখানে পরিণ চাদর মুড়ি দিয়া শইয়া পড়িল। লগ্নিতে দেখিতে সারা বাড়িটা দিনান্তে হাটতলর মত খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। শুমু, ভবির বরের নাসিকাধূনি, শীতের তীক্ষ্ণ-শীতল ভাবসে বড়ির পাশে অশ্বখসারের আন্দোলিত পাতাবল্লভের সরস শব্দ, কলি রাঙিতর পাখীর একটিনা ডাক, বড়ির সদর দরজার সামনে সতৃপ্তিকৃত রঙীপাতার চারিদিকে সমবেত বুকবুকলার কলহের শব্দ—নিবৃত্ত প্রবহন জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে লাগিল। বর ঘুমাইয়া গড়িতেই ববি মাথর ঘোমটা খাটো করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর পা ঠপসা টিপিয়া খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে মোমলালকিত পৃথিবী দিকে তাকাইয়া রইল। তাহার মন এক হঠাৎ তাহার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করিয়া তবির জীবনের মধ্যে ফিরিয়া গেল। সেখানে তাহর পরশশব্দকে ঘেরিয়া তি আশা ও আনন্দ, কত হাসি ও কান্না, ভারীজীবনের কত সুপ্ন দেখা ও কম্পনের তুলিতে কত ছবি আঁকা। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল; গোথায় আসিলা সে, কোথায় গেল পরশশব্দ—জীবনে কোন দিন বর কোথায় দেখা হইবে না। সেদিন যদি শুমু, বা না পড়িয়া তাহার বিচিত্র পড়িয়া থাকে হইয়া যাইত, যদি পরশশব্দে চোখের সামনে বর চোখে জল দেখিয়া সে মরিত পারিত, তাহা হইলে যাহাকে সে কোন দিন চাহে নাই, তাহারই চাইনা মিটাইবার জন্য তাহাকে অজ দেখে-নি সঁপিয়া দিতে হইত না।

ববির দুই চেখ হইতে জল পড়িতে লাগিল।

ওই মাঝ রাত্রি একটা।

কাতিক-কন্যা কমলারও বিবাহের প্রথম পর্ব শেষ হইয়াছে; বর ৩ কন্যা বাসরে গিয়া বসিয়াছে। কাতিক ও কাতিক-গৃহিণী খুঁতখুঁত

করিলেও, পাঠটি ভালই। বরস বেশ নয়—পাঠশ কি ছাঁবিশ। বাবা-মা বাঁচিয়া নাই, জেঠাইমা মনুষ্য করিয়াছেন। জেঠা-জেঠাইমরও নিজেরে একঘর ছোট-বড় ছেলেমেয়ে—কাজেই, কাতিক ঘরজামাই রাগিতে চাইলে তাঁদের আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ছেলেটি শিক্ষিত ও উপাভ্যাসকম; ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়া কোন এক কোলিয়ারিতে গদ্য-মহাবীর কাজ করে। দেখিতে চাঙা, কাহিল; রং ফর্সা হইলে, তবে কলাখাদের কড়া জল-হাওয়াতে কালচে রং ধরিয়ছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘনশাম যে এমন ভাল পাত্র জটাইয়াছে, এইজন্য পাড়ার লোক ঘনশামকে ঘনা ঘনা করিতেছে।

বাসরঘরে বর ও কন্যাকে ঘেরিয়া পাড়ার মেয়েরা জটলা করিতেছে। শ্রীমতী বরের সামনে বসিয়া কহিল, “কিহ, পছন্দ হয়েছে?” বর হাসিয়া কহিল, “কি করে বলব বলুন? ভাল করে একটিবারও তো দেখতে পেলাম না।” মেয়েরা মোলাল করিয়া উঠিল; একজন কহিল, “দেখা এত শপথ নাকি? সমানে হাটগেড়ে বাস, গলায় কাপড় দিয়ে, হাত জোড় করে বিনয় বিনয় বল দেখি—বদন ভাল, ঘোমটা খোল চন্দ্রমুখী।” শ্রীমতী ধমক দিয়া কহিল, “তোরা সব চুপ কর দেখি।” কমলার কাছে গিয়া কহিল, “বাসরঘরে বরের সামনে এত ঘোমটা দিতে হয় না, খোল দেখি।” বলিয়া ঘোমটাটি সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেই কমলা শ্রীমতীর হাতটি সরাইয়া দিয়া তীক্ষ্ণ চাপাশব্দে কহিল, “যাও।” শ্রীমতী বোধ করি কমলার মনের কথা বুঝিল, বরকে কহিল, “ও ভাই, আমাদের সামনে ঘোমটা খুলবে না বলছে—আমরা গেলে বুঝিয়া সঁপিয়ে খুলিও এখন।” বর হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই হবে।”

সে কোলিয়ারিতে চাকরি করে, মেয়েদের ঘোমটা-খোলা বিদ্যা তাহার লান আছে। তাহাদের খাদের টাইমবদর খিচতীয়পক্ষের স্মারি কথা মনে পড়িল তাহার। ভারি লাজকে মেয়েটি, দৌধমাত্র একহাত ঘোমটা টানিত। উদ্ভিদ-দেবর সম্পর্কের জোরে মাস দুই আনাগোনা করিয়া হাতের জল ও পান খইয়া মেয়েটিকে ঘোমটা খোলাইয়াছিল সে। মেয়েটি শুমু ঘোমটা খলে নাই—চিরদিনের মত ঘোমটার বালাই তুলিয়া দিয়াছে শেষে। স্বামীর ঘর ছাড়িয়া, হাতের পর হাত বদলাইয়া এখন সে বর্ণীগজে স্বাধীন বাস্যা করিতেছে।

প্রচুর গান, গল্প ও রসিকতার পর মেয়েরা একে একে বিদায় লইল। সকলের শেষে উঠিয়া শ্রীমতী কহিল, “গান হে দুজনে। চললাম।” বায়ায়া মর্চকি হাসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঘর নিজের হইতেই বর কমলার কাছে ঘোঁষিয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই কমলা একটু সরিয়া বসিল। বর দুই হাত দিয়া কমলাকে কোপটাইয়া ধরিয়া কাছে টানিার চেষ্টা করিতেই কমলা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়িয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অশ্রুদর্শন করিয়া তীক্ষ্ণবাক্য কহিল, “এমন করনে আমি চল যাব বলছি।” বর ঘাড়ুড়িয়া গিয়া কহিল, “ওরে বাবা! এ যে আমাদের মায়েরজর সাহেলের মত মেজাজ দেখছি। থাক, আর চলে গিয়ে কাজ নেই, কাছেই বাস, তবে ঘোমটাটা খুলে রাখা দয়া করে—মুখ দেখেই প্রণটা ঠাড়া কার এখন।” তারপর চোখের ভগ্নী করিয়া কহিল, “একদিন তো ধরা দিতে হবেই।” কমলা বরের দিকে পিছন ফিরায়া আনন্দ ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রইল।

এক হৃদয়হীন পান্যবের কথা ভাবিয়া তাহার মুখ অশ্রুস্রোত অজ বাধা মার্জিল না।



এম্পায়া র

অন্

ইণ্ডিয়া

লাইফ এসুরেন্স
কোং লিঃ

স্থাপিত-১৮৯৭

৪৭তম বার্ষিক রিপোর্টের
কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ
মোট আয়—

১৭,৫৭,০০০,

চলতি বীমার পরিমাণ—

১৬,৪১,৮৮,০০০,

সম্পত্তির পরিমাণ—

৬,৩০,৪৬,০০০,

ডি, এম, দাশ এন্ড সন্স, লিঃ,

চীফ এজেন্টস্ :-

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম,
২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ক্যালকাটা ষ্টোর্ড

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত-১৯৩০

হেড অফিস-৩০৯নং বহুবাজার স্ট্রীট,

(ডালহৌসী স্কোয়ার রোড)

—কলিকাতা—

শাখাসমূহ—রায়গড়, চম্পা, বিলাসপুত্র, নাগপুত্র সিটি, নাগপুত্র
সদর, ছিন্দোয়ারা, সোঁগর, চন্দা, বেতুল, ভাটাপাড়া (সি পি), বোম্বাই,
পুত্রদুলিয়া, চিরকুন্ডা (বরাকর), মেদিনীপুর।

এজেন্সীঃ—পূণা, আমেদাবাদ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, দিল্লী।

হাজারীবাগ এবং খৈরাগড় শাখা

শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার—

এস্, এম, বসু।

দি ক্যালকাটা মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লি

হেড অফিস : ৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন

বিল্লীত মূলধন

আদায়ীকৃত মূলধন

১০ লক্ষ টাকা

১২ লক্ষ টাকার উপর

১ লক্ষ টাকার উপর

কারেন্ট একাউন্ট :

১০০ টাকা দিয়া একাউন্ট খোলা যায়। দৈনিক ১০০
ব্যালেন্স এর উপর বৎসরে শতকরা ১০ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

সেভিংস্ একাউন্ট :

৫ টাকা দিয়া একাউন্ট খোলা যায়। সংগ্রহে দুইবার টাকা
খোলা যায়। ২৫ টাকা ব্যালেন্সের উপর চেক-বই দেওয়া হয়।
বৎসরে শতকরা ৩ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

স্থায়ী আমানত :

সুবিধজনক সর্বো ৬ মাস, ১ বৎসর, ২ বৎসর ও ৩ বৎসরের
গ্রহণ করা হয়।

৩ বৎসরের ক্যালসার্টফিক্ট :

প্রতি ৮দশ আনায় ৩ বৎসর পর ১০ টাকা দেওয়া হয়।

প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিপোজিট :

প্রতি মাসে ৫ হিসাবে জমা দিলে ১২ বৎসর পর ১০৬০০০০
দেওয়া হয়। ২ হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়।

টেলিফোন : কলিকাতা ৫০৫৪

টেলিগ্রাম : কলিকাতা "টাকাব্যাঙ্ক"

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

হারিসন রোড, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা :

কলকগর, বেলডাংগা, কালনা, শান্তিপুর বেলদা (কন্টাই রোড)

মেদিনীপুর।

নতুন শাখা :

হাওড়া, শেওড়াকুলী, এলাহাবাদ, বেনারস ও কটক

শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমোদিত জামিনে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সুবিধা-
জনক সর্বো বিল কলেকশন্স ও বিল ডিস্কাউন্ট এবং
সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

ইউ, আর, ঘোষ,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লৌহিত্যপূর্ব ভূখণ্ডের প্রব্রঞ্ছন ডক্টর শ্রীললিতা ভট্টাচার্য

১। ময়নামতী পাহাড়ের ভূতত্ত্ব

আসাম-বেংগল রেলপথের লালমাই স্টেশন হইতে ত্রিপুরা জেলার সদর স্টেশন কুমিল্লা সহর পর্যন্ত বিস্তৃত দশ মাইল রেলপথের সমান্তরালে, দক্ষিণাংশে রেলপথ হইতে ৪ মাইল এবং উত্তরাংশে তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত ময়নামতী-লালমাই পাহাড়টি এ পথে ভ্রমণকারী যাত্রারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এগার মাইল দীর্ঘ, প্রস্থে উত্তরাংশে অধিকাংশ স্থানেই মাইলখানিক মাত্র। দক্ষিণার্ধে প্রশস্ততর, কোন কোন স্থানে দেড় মাইল, পোনে দুই মাইল হইবে। পাহাড়ের অনেকগুলি মড়া বা শিখর, সর্বোচ্চ শিখর প্রায় একশত ফুট উচ্চ। ঢাকা-চট্টগ্রাম সংযোজনকারী বাদশাহী রাস্তা বা ট্রান্স রোড চার্টার হইতে সোজা উত্তরে কুমিল্লা পর্যন্ত আসিয়া কুমিল্লা হইতে সোজা পূর্বে দাউদকান্দি পর্যন্ত গিয়া মেঘনা তীরবর্তী হইয়াছে। দাউদকান্দি নামক বিখ্যাত বন্দরটি প্রকৃতপক্ষে গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত, কিন্তু মেঘনা নদের এক শাখার সহিত এই স্থানে গোমতীর মিলন হইয়াছে। তাই দাউদকান্দিতেও গোমতীর এক মুখ বটে, কিন্তু গোমতীর প্রকৃত মুখ মতলববাজার নামক স্থান হইয়া দাউদকান্দির প্রায় ষোল মাইল দক্ষিণে।

এই কুমিল্লা-দাউদকান্দিগামী বাদশাহী রাস্তা ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত ভেদ করিয়া গিয়াছে। সংগীম মানচিত্র দেখিলেই সমস্ত স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পাহাড়ের উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর পাহাড়, দক্ষিণাংশের নাম লালমাইর পাহাড়। দক্ষিণ প্রান্তের অদূরে অবস্থিত রেলওয়ে স্টেশনটি তদনুসারে লালমাই নাম পাইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে, চারিদিকে সমতল হিমির মধ্যে দৈব-বৈদ্যের মত স্থিত এই ক্ষুদ্রকায় পাহাড়টি ত্রিপুরার পর্বতমালায়ই

পশ্চিমতম তরঙ্গ। ভূপৃষ্ঠের ক্রমসংকোচনের ফলে ভূমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক প্রাকৃতিক লিখোভ উপস্থিত হয়। সেই নটরাজের ভাঙনে সমুদ্রবক্ষে পর্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং পর্বত মিলাইয়া গিয়া সেই স্থানে সাগর গড়িয়া উঠে। পৃথিবীর জন্ম-দিন হইতে উহার যুগে অনবরত এই প্রকার ভাঙগাড়া চলিতেছে, সুপরিচিত ভূমিকম্পগুলি সেই ভয়াবহ প্রলয় নৃত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমনি এক প্রলয়ংকর বিক্ষোভের ফলে এক যুগে ভূপৃষ্ঠে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। এখন যেখানে হিমালয় পর্বতমালা, সেই যুগে সেইখানে প্রশান্ত মহাসাগরের এক শাখা ছিল। সেই সাগরশাখার তলদেশ ভূতরঙ্গশীর্ষে উৎক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয় পর্বতরূপে উন্নীত হইল। হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে এশিয়া মহাদেশের বৃহৎ জড়িয়া ভূতরঙ্গরূপে পর্বতমালা জাগিল। এই তরঙ্গ সমূহের গতি ছিল উত্তর-দক্ষিণ। হিমালয়ের পূর্বে প্রান্তের দক্ষিণভাগে ভূতরঙ্গগুলির গতি হইয়াছিল পূর্ব-পশ্চিম; উহারই ফলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া ভূপৃষ্ঠে কণ্ঠিত হইয়া, নাগা পাহাড়; কাছাড়-ত্রিপুরা-মণিপুর-পার্বত্যচট্টগ্রামের পাহাড়গুলি; ব্রহ্মদেশ ও মলয় উপদ্বীপের পাহাড়গুলির জন্মদান করিল। এই তরঙ্গেরই পশ্চিমতম তরঙ্গ ময়নামতী-লালমাই পাহাড় এবং বীচি-বিভাগ ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়াল-মধুপুরের উচ্চভূমি ও টিলাসমূহ। উত্তর-দক্ষিণগামী ভূতরঙ্গ এবং পূর্ব-পশ্চিমগামী ভূতরঙ্গের সংঘাত্রে বাঙলা দেশের নিম্ন ভূমির সৃষ্টি,—উহার নিম্নতম অংশগুলিই প্রকান্ড প্রকান্ড বিলে পরিণত হইয়াছিল। এই বাঙলা দেশের নিম্নভূমি বা গর্তকে, উহার তিন দিকের পর্বতমালা হইতে নিঃসৃত নদী-সমূহ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পলি মাটি দ্বারা ভরিয়া বাঙলার সমতল প্রান্তর,—

বাংলার সূজলা পুফলা শস্যায়মলা ভূমি-লক্ষ্মীকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড় তাই ভূতত্ত্ব আলোচনায় আনন্দদায়কগণের পরম শিক্ষাপ্রদ বিচরণ ক্ষেত্র। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণতম প্রান্তের শিখরদেশের নাম চণ্ডীমড়া। উহার উপরে নাতিবহুৎ একটি চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। জনপ্রবাদ এই যে, চণ্ডীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ এই স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই মড়ার অনেক স্থানে প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নমুনা ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে, কলিকাতায় বড় যাদুঘরেও নিশ্চয়ই আছে। স্থানীয় লোকে এই প্রস্তরখণ্ডসমূহকে বলে অসুরের অস্থি এবং এগুলির অস্তিত্বকেই চণ্ডীর সহিত এইস্থানে অসুরের যুদ্ধের অকাটা প্রমাণরূপে উপস্থিত করে। এই প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডগুলি দেখিতে অবিকল এক টুকরা লাকড়ীর মত,—কাঠের আঁশগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। হাতে লইলেই শব্দ বুঝা যায়, এ গুলি কাঠ নহে, পাথর। এই অসুরের অস্থি বা ফসিল অনেক পাহাড়েই পাওয়া যায়, একমাত্র লালমাই পাহাড়েরই ইহা বিশেষ্য নহে।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের আর এক ভূতাত্ত্বিক বিশেষ্য অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কিনা জানি না। ত্রিপুরা মহারাজার বাঙলা ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, ইহার পরেই পাহাড় শেষ। শেষ বটে, এবং ইহার উত্তরেই সমতল-ভূমির আরম্ভও বটে, কিন্তু শেষ হইয়াও শেষ হয় নাই। ইহার উত্তরেও অনেক দূর পর্যন্ত, সোজা এক লাইন ধরিয়া ক্রমহ্রাসমান ক্ষুদ্রতর টিলাসমূহ ধানক্ষেতের মধ্য হইতে কিছু দূরে দূরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ময়নামতী লালমাই পাহাড় প্রভৃতির যেন ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের ডিম্বাকার মালা গাঁথিয়া তীত হয় নাই, আবার দুই প্রান্তে দুইটি টিলার ফুল-ঝড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছেন। উত্তর প্রান্তের ফুলঝড়িটি আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, দক্ষিণ প্রান্তেও এমনি ফুলঝড়ি থাকবার কথা, কিন্তু আমি নিজ চোখে দেখি নাই।

ময়নামতী পাহাড়ে বা উহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতেই যে মানুষের বাস আরম্ভ হইয়াছিল, চট্টগ্রাম পাহাড় হইতে তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তর যুগে মানুষ প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিত,

ভারতীয় ব্যাংকসমূহ আজ
জাতীয় বাণিজ্য প্রসারের
বিশেষভাবে নিয়োজিত।
যুদ্ধান্তর পরে দেশের শিল্প
গঠনে যে বিশেষ সূচ্যোগ
আসিবে তাহাও জাতীয়
ব্যাংকের সহায়তায় সাফল্য-
মণ্ডিত করিতে হইবে।
সমাগত ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ
সূচ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত এখন
হইতেই জাতীয় ব্যাংকের
সহযোগিতায় আপনার কর্ম-
পন্থা স্থির করুন।

জালিং ব্যাংক

লিমিটেড

১৭-১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলিকাতা।

গ্র্যান্ড ২-৭২ বি, আ শ্রু তো ব
মুখার্জী রোড ও নারায়ণগঞ্জ।

ম্যানেজিং. এস. এন. সরকার

ডায়াপেপ্সিন

অজীর্ণ রোগে আশু ফলপ্রসূ ঔষধ। সুনির্বাচিত
উপাদানে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগমুক্তির
পর বা অন্য কোনও কারণে পরিপাকের বিকল
অবস্থায় ইহা গ্রহণযোগ্য। ডায়াপেপ্সিন সেবনে
পৃষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের শক্তি ফিরিয়া আসে।
স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা অচিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়)

ইউনিয়ন ড্রাগ কোং লিঃ

২৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Some serve the Country
with Swords
Some with Brain.
We serve the Countries
and Nations
With our Linseed Oil.

WITH the Convoy—there moves in the waves—an essen-
tial commodity—the famous “Lion Brand” Linseed Oil
—of our own manufacture—moves far into the battle fronts,
in the factories and in every department of the Government
—Railways and Ordnance Depots for the prosecution of the
war to its victorious finish. The Allies will have the supplies
of Linseed Oil from us for all time to come.

It is not a Self Advertisement.

It stands above Truth.

Government and Railway Contractors and Exporters.
Manufacturers of Pure Mowah Oil, Groundnut Oil,
Kapoo Oil, Castor Oil, Oil Cakes and Oil Refiners.

MOHIN & CO., LTD.

44, Beadon Row, CALCUTTA.



MOHIN & CO. LTD.
44, BEADON ROW, CALCUTTA

“Purelinoil” Cal.
Telephones:

Telegram: {Office: B. B. 525
Works: Howrah 135.

প্রাতিষ্ঠিত শ্বেচ্ছ রাজা বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই ইহার পূর্ববর্তী কালের আর্য সভ্যতা সংশ্লিষ্ট কোন প্রাচীনদশ্যনের আবিষ্কার হ্রিপুরা জেলা হইতে বড় সম্ভবপর নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাও সম্ভব হইয়াছে, এবং প্রচুর না হইলেও, এই অল্পজন হইতে প্রাক-ঐন্দ্র যুগের অন্ততঃ দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীনদশ্যনের আবিষ্কারের বার্তা আসিয়া গানি।



সে স্থানে প্রাচীন লৌহিত্য হইতে লক্ষ্য
নদী বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানের নাম
লাখপুর। এই স্থানে বানার বা প্রাচীন বান-
হার নদ আসিয়া লৌহিত্যে পড়িয়াছে, এবং
তাহাই পরে শতিলক্ষ্য নাম ধারণ করিয়া
দক্ষিণে বহিয়া গিয়া নারায়ণগঞ্জ সহরের দক্ষিণে
ধলেশ্বরী নদীতে পড়িয়াছে। বানাহার নদের
নাম লক্ষ্যপুর সেনের ভাওয়াল তান্ত্রাসনে
উল্লিখিত আছে। এই তান্ত্রাসনখানি ১৭৯০
খ্রীষ্টাব্দে লাখপুরের পশ্চিম-উত্তরস্থ, বানারের
পশ্চিমে পরে অবস্থিত কাপাসিয়া নামক
বিখ্যাত গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে রাজবাড়ী

চা

ইণ্ডিয়া টি ট্রেডার্স

প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত
চা ব্যবসায়ী১, চান্দনী চক্ শ্রীট
(অন গণেশচন্দ্র এডিনউ)
কলিকাতা।মফঃস্বল বিক্রেতাদের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।ব্রাণ্ড :—রাজপুরবাজার
২৪ পরগণা।ম্যানেজার—
পরেশনাথ মিত্র।কুমিল্লা ইউনিয়ন
ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯২২

প্রথম প্রেরণীর যে কোন ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের জন্য কোন দৃঢ়বিনা নাই,
আজিকার এই অনিশ্চয়তার দিনে এই কথাটা মনে রাখবেন।ডিপজিট ... ৭,৫০,০০,০০০, উর্ধ্ব
কার্যকরী তহবিল ... ৮,৫০,০০,০০০, উর্ধ্ব

কলিকাতা অফিস :—

২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : : ১১৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
১০৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর।

অপর শাখাসমূহ :

১। বরিশাল	৫। চট্টগ্রাম	১০। জোড়হাট	১৫। পাবনা
২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬। মাকা	১১। ময়মনসিংহ	১৬। পূরীষাণবাজার
৩। ভৈরববাজার	৭। ডিউগাড	১২। নারায়ণগঞ্জ	১৭। রাজশাহী
৪। চাঁদপুর	৮। ধুবড়ী	১৩। নিতাইগঞ্জ	১৮। তিনসুকিয়া
	৯। গোহাটী	১৪। নওগাঁও	১৯। পাটনা
			২০। পাটনা সিটি

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি
আমেরিকান এজেন্টস্—গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
লন্ডন এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ডি (ইকন) লন্ডন, ব্যারিস্টার এট-ল।

পূজা উপলক্ষে

আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি—

বেঙ্গল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

২৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা
হয়।অনুমোদিত সিকিউরিটি, বিল ও
সোনা ইত্যাদি রাখিয়া ধার পাওয়া
যায়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—জে সি সাহা

ফোন ক্যাল : ৭১৭৫

গ্রামে পাওয়া যায়। (J.A.S.B., 1942, P. 1 ff. দৃষ্টব্য)।

বানার নদ ব্রহ্মপুত্রের বান হরণ করিয়া জমালপুত্রের কিছু নীচে জমগ্রহণ করিয়া, মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম দিয়া বহিয়া, বহু দূর পশ্চিম ঢাকা ময়মনসিংহ জেলার সীমানারূপে পশ্চিম হইতে পূর্বে বহিয়া, ত্রিমোহিনী নামক স্থানে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, লাখপুরে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। শীতললক্ষ্মা নদী বর্তমানে ইহারই দক্ষিণাভিমুখী সম্প্রসারণ মাত্র। বানারের ত্রিমোহিনী-লাখপুর অংশের পূর্ব ও পশ্চিম ধারে ভাওয়ালের টিলাময় অঞ্চলগুলি অবস্থিত। প্রাচীনকালে লিখিত বা ব্রহ্মপুত্র নদ এই টিলাময় স্থান ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইত। ময়নামতী-লালমাই পাহাড় যখন ক্রমবর্ধমান, ভাওয়ালের টিলাগুলি তেমন ক্রমবর্ধমান হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যে এই টিলাগুলি ভেদ করিয়া, নোজা দক্ষিণে না নামিয়া ক্রমশঃ এই অঞ্চলের উত্তর প্রান্তবাহী ও পূর্বাভিমুখী হইয়া ভৈরব-বাজারে মেঘনা নদের সহিত মিলিতে বাধ্য হইয়াছে, এই ব্যাপারও টিলাগুলির অতি ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধনেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

বানারের ত্রিমোহিনী-লাখপুর অংশের পূর্বে আরও দুইটি স্বাভাবিক জলপ্রবাহ দেখা যায়। প্রথমটির নাম পাহাড়িয়া নদী। দ্বিতীয়টির নাম আড়িয়ল খাঁ। ভাওয়াল-টিরার ক্রমবর্ধনের ফলে ব্রহ্মপুত্র পূর্বদিকে সরিয়া বাহিতে আরম্ভ করিলে, সম্ভবতঃ এই পাহাড়িয়া নদী ও আড়িয়ল খাঁ নদীই ক্রমান্বয়ে উহার প্রধান খাতে পরিণত হয়। ভৈরববাজারগামী খাতে জন্ম হয় ইহারও পরে। সকলেই জানেন, ভৈরববাজারগামী খাতও বর্তমানে শুষ্কপ্রায়, ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে মধুপুর-ভাওয়াল অঞ্চলের পশ্চিম দিয়া যখন খাতে প্রবাহিত।

ভাওয়াল-মধুপুর অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিকগণ বলেন Older alluvium বা প্রাচীনতর পলি গঠিত অঞ্চল। সুপ্রাচীন কালে বর্ষা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত এবং নিম্নবর্ণের সমস্ত স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইত, তখন ভাওয়াল অঞ্চল জলের উপরে থাকিত। প্রধানতঃ এই গুলেই পূর্বভারতে আৰ্য সভ্যতা প্রসারের অতি প্রাচীন যুগ হইতে এই লৌহিত্য, পাহাড়িয়া ও আড়িয়ল খাঁর পারে পারে জন-বসতি আরম্ভ হইয়াছিল। আড়িয়ল খাঁর তীর-বর্তী মরজাল গ্রাম হইতে কয়েক বৎসর আগে মোর্ষ যুগের বহুতর রৌপ্য মুদ্রা বা কাষাণ আবিষ্কৃত হয়। আমি বহু চেষ্টায় উহার ১০টি ঢাকা বাদ্যয়ের জন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই স্থান লাখপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্বে এবং এই স্থানে মোর্ষ যুগের মুদ্রার আবিষ্কার হইতে বন্ধা যায়, কত প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে আৰ্য সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। লৌহিত্যকে আমরা

সমতটের পশ্চিম সীমানা ধরিয়াছি, কাজেই এই স্থানকে সমতটের অন্তর্গত ধরিতে হইবে।

লৌহিত্যের পূর্ব পারে অবস্থিত এগার-সিন্ধু নামক স্থানটির নামাধা মনোযোগ সহকারে বোধিতব্য। এই স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পারে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সমতটের অন্তর্গত ধরিতে হইবে। এই স্থানে একা-দশটি নদী একত্র মিলিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছিল এগার-সিন্ধু। নদী অর্থে সিন্ধু শব্দটির ব্যবহার বৈদিক যুগেই হইত, কাজেই এই নামটি এই স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য। আড়িয়ল খাঁর তীরবাসিগণ মোর্ষ যুগে যখন কাষাণ ব্যবহার করিত, প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের সমগ্র নৌ-বাণিজ্য যখন বিশাল লৌহিত্যের বক্ষ বাহিয়া সমুদ্রে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চলাচল করিত, সেই সময়েই এগারটি মোহনার উপরে অবস্থিত এই লক্ষ্যমিন্ত স্থানটি এই নাম পাইয়া থাকিবে। এই নামটি এবং এই অঞ্চলের গ্রামের নামের মধ্যে সিংহী, বসুদ্রী ইত্যাদি নাম দেখিয়া এই অঞ্চলে আৰ্য সভ্যতা বিস্তারের বয়স অনুমান করা যায়। প্রাচীন লৌহিত্য ও আড়িয়ল খাঁ নদের মধ্যবর্তী পাহাড়িয়া অঞ্চল শুধু ভূতাত্ত্বিকেরই বিশুদ্ধ অনুসন্ধান ক্ষেত্র নহে, মরজালে কাষাণ আবিষ্কার হইতে বন্ধা যায় যে, ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকেরও অতি লোভনীয় অনুসন্ধান ক্ষেত্র। অথচ বলিতে গেলে এই অঞ্চলে অদ্যাবধি কোন অনুসন্ধানই হয় নাই।

খ। শিল্পায় ২য় খণ্ড: পূর্ব-র লিপি আবিষ্কার

সমতটে প্রাক্‌ গুপ্ত যুগের দ্বিতীয় নিদর্শনটি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। নোয়াখালি জেলার ছাগলনাইয়া থানাটির আকৃতি ভারি চমৎকার। সমগ্র নোয়াখালি জেলার আর কোথাও পাহাড় নাই, কিন্তু এই স্থানে পার্বত্য ত্রিপুরার পর্বতমালা হইতে নাহির হইয়া দুইটি শৈলপ্রণী যেন কুমীরের দীর্ঘ ও দন্তবহুল দুইটি ঠোঁটের মত ছাগল-নাইয়া থানাটিকে মুখে পুরিয়া অবস্থান করিতেছে। কাজেই সহজেই বোধগম্য যে, দুই ধারে পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত এই স্থানটী বেশ প্রাচীন স্থান। সমগ্র নোয়াখালী জেলা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ডাকাতিয়া ফেনী বাহিত পলি দ্বারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবার পূর্বেও, এই পর্বতমালাবোঁড়িত স্থানটিতে লোক-বসতি হইবার কথা। আৰ্য সভ্যতা প্রসারের আদি যুগেও এই স্থানেই হয়ত প্রথম উহা প্রসৃত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অনুমানের সমর্থক প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণও মিলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ফেনী বলিয়া পরিচিত আধুনিক মহকুমা সহরটির মাইল তিনেক পূর্বে ছাগলনাইয়া থানার সীমানার মধ্যে, শিল্পা নামে একটি বিস্তৃত স্থান আছে। উত্তর শিল্পা, মধ্য শিল্পা, দক্ষিণ শিল্পা ইত্যাদি নামে এই

প্রাক্‌ গ্রামটি বিভক্ত। এই গ্রামে ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের ভূতপূর্ব সর্বাধক্ষ্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় খণ্ডিত পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দির লিপি যুক্ত একটি মূর্তির পাদপাঠ আবিষ্কৃত করেন। এই আবিষ্কার স্থানটি বর্তমানে আইন অনুসারে সংরক্ষিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু যুগ্মের জন্য এই স্থানে খননাদি আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। দূর্ভাগ্যক্রমে, প্রত্নবিভাগ এই আবিষ্কারের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা নাভীত, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্বন্ধে এপর্যন্ত আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। এমন কি লিপিটি যে সভ্য দ্বিতীয় খণ্ডিত পূর্বাব্দকের সেই সম্বন্ধে কোন প্রমাণও অদ্যাবধি প্রকাশিত করেন নাই। তাই এই আবিষ্কার সন্দেহ-সমাকুল হইয়া রহিলেও, ফেনী অঞ্চলের বিশুদ্ধজনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য ইহার বার্তা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

৩। পরবর্তীকালের প্রত্ননিদর্শনসমূহ

ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার-গুলির কালপর্যায় অনুসারে সজ্জিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। মহারাজাধিরাজ বৈদ্যনাথের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনখানি বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই তাম্রশাসনখানির আবিষ্কর্তা। ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুণাইঘর গ্রামে ১৯২৫ সনে এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩০ সনের Indian Historical Quarterly পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রকাশিত করেন। তাম্রশাসনখানি গুপ্তাব্দের ১৮৮ সনে অথবা ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসন দ্বারা মহারাজা বৈদ্যনাথ গুপ্ত সামন্ত মহারাজা রুদ্র দত্ত প্রাতিষ্ঠিত এক বৌদ্ধবিহারে এগার পাটক অথবা ৪৪০ দ্রোণ ভূমি দান করেন। প্রদত্ত ভূমির এক সীমানায় গণিকাগ্রহাণ গ্রামের উল্লেখ আছে। ইহাই যে বর্তমান গুণাইঘর গ্রাম, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য এই যে, সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকালে যে সমতট রাজ্য প্রত্যুত রাজ্য ছিল, তাহা এখন মহারাজাধিরাজ বৈদ্যনাথের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সামন্ত মহারাজ রুদ্র দত্তের বিহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া জানা যায়, তিনিই এই সময় এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্তের ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ভূমি দানের ৪০৮২ বৎসরের মধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়, এবং পূর্ব ভারত হইতে গুপ্ত শাসন লোপ পায়। সেই স্থানে ক্রমান্বয়ে আমরা ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক মহারাজাধিরাজ উপাধি-

ম্যানেরিয়া ও

পুরাতন জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া যেসব রোগী
জীবনের আশা ছাড়িয়াছেন

একবার—

গোবিন্দ সুধা

সেবন করুন

পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না
সর্বত্রই পাওয়া যাইতেছে

★ মাহারা ঠিকিষ্ট হইতে ইচ্ছুক আবেদন করুন

++গোবিন্দ সুধা কোং++

৩৬৫, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

ধার্মী তিনজন সম্রাটপদাভিমানে রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। লৌহিত্যের পূর্ব প্রান্তে ইহাদের শাসন সীমা প্রসৃত ছিল, এমন কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। লৌহিত্যের পূর্বোন্মিত ভূখণ্ডে তখন প্রাগ্-জ্যোতিষ্মৎবরগণের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ তৎকাল বর্মার নিধনপুত্র (পঞ্চখণ্ড) শাসনে দেখা যায়, পঞ্চখণ্ড পরগণায় তিন শতেরও অধিক গ্রাহুগণ ভাস্করের পঞ্চম পুত্রপুরুষ ভূতি বর্মা স্থাপিত করেন। সেই তাম্রশাসন নষ্ট হইয়া যাওয়ায় 'কর্ণসুবর্ণ' রাজধানীতে থাকিয়া ভাস্কর বর্মা পুনরায় তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়া গ্রাহুগণের অধিকার স্বীকার করেন। ভূতি বর্মার পিতামহ মহেন্দ্র বর্মা দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ভূতি বর্মা নিজেও একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐহট্ট জেলায় ভূতিবর্মার স্মৃতিস্মৃতিত অধিকার দেখিয়া বুঝা যায়, ত্রিপুরা নোয়াখালীও বাকী ছিল না, এবং সমগ্র সম্রাট প্রদেশেই প্রাগ্-জ্যোতিষ্মৎবরগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 'শাসনের পুত্র' বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রশাসনীয় প্রোগ্রামিংসম্পন্ন শ্রীমন্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় কিছুদিন পূর্বে ভূতি বর্মার একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। ইহার পাঠ আমি আয়াফ, ১৩৪৮-এর "ভারতবর্ষ" পত্রে প্রকাশিত করি। ইহার তারিখ ৫৫৪ খৃষ্টাব্দ। ভূতি বর্মার পিতামহ মহেন্দ্র বর্মার দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বাহ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মনে হয়, ভূতি বর্মার পিতামহের আমলেই সম্রাট অধিকৃত হইয়া থাকিবে এবং বৈদ্যগুরুগণের ৫০৮ খৃষ্টাব্দে গণোইখরের সলেনে গ্রামে ভূমি দানের পরে, রমণীঃমানসিক গুরুত্ব রাজগণের শাসন লৌহিত্যের পূর্ব প্রান্তে প্রসৃত হইয়াছিল।

ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র-সম্রাটের দেবের শাসন গুরুত্ব হইলে পূর্ব ভারতে শশাংকের অভ্যুদয়। শশাংক বেশ প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ভারতের সম্রাট পদবী বাচাই হইয়াছিলেন। গাঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা ও বিহার তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। শশাংকের অনেক সর্বমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা হইতে তাঁহার দুইখানা তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শশাংকের সহিত ব্যুৎ করিতে আসিয়া উত্তরাপথের সম্রাট হর্ষবর্ধন বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শশাংকের মৃত্যুর পরে ভাস্কর বর্মার নাগলা দেশ অধিকার করেন এবং 'কর্ণসুবর্ণ' হইতে তাম্রশাসন প্রচার করেন। সম্রাটের আগে হইতেই প্রাগ্-জ্যোতিষ্মৎবরগণের অধিকার ছিল, এইবার বাঙ্গলা দেশেও তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হইল।

হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মার মৃত্যুর পরে পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত

হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশে জয়নাগ নামক একজন রাজার অসিতেশ্বর পরিচায়ক তাম্রশাসন ও সর্বমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে জয়নাগ শশাংকের পূর্ববর্তী রাজা।

এই সময়ের অবদাহিত পরে, পর গুরুত্ব বংশের আদিভা সেন যখন মগধে রাজা, তখন সম্রাটের এক নতুন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাই খজা বংশ।

২। দেবখণ্ডের তাম্রশাসনসম্বন্ধে
প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত লাখপুত্র নামক স্থানটির পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। লাখপুত্র হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্বে আশ্রুপুত্র গ্রামটি অবস্থিত। এই স্থানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাচীন মন্দির নির্মাণ কাটিতে এই তাম্রশাসন দুইখানা এবং কয়েকটি ধাতুময় ছোট টোতা পাওয়া যায়। একখানি তাম্রশাসনের পাঠ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উদ্ধার করেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির স্মারিকা পত্রিকার (Memoir) প্রথম খণ্ডে, ১৯০৫ সনে, অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান প্রত্নতাত্ত্বিক গঙ্গামোহন লস্কর মহোদয় দুইখানি তাম্রশাসনেরই পাঠ প্রকাশিত করেন। তাম্রশাসন দুইখানি দ্বারা মহারাজাধিরাজ দেবখজা স্থানীয় লৌশি হিয়ারে ভূমি দান করেন। প্রথম তাম্রশাসনখানিতে মহারাণী প্রভাবতী ও রাজপুত্র রাজরাজ ভট্টের উল্লেখ আছে। দুইখানি তাম্রশাসনই জয়কামিনী বাসক হইতে প্রদত্ত। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধে এই স্থানকে আমি বর্তমান বড়কামতা বা চান্দিনা বলিয়া অনুমান করি। সম্প্রতি দেখিতে পাইলাম, লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়কামিনী নামে একটি গ্রাম আছে। এই স্থানে কোন প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আছে কি না অনুসন্ধান। এই তাম্রশাসনদ্বয়ের সহিত দেবখজা মহিষী মহারাণী প্রভাবতীর লিপিপত্রও বিবেচ্য।

৩। দেউলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত মহারাণী প্রভাবতীর লিপিমুদ্রা সর্বগণী মূর্তি
কুমিল্লা সহরের ১৪ মাইল দক্ষিণে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার উপর দেউলবাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে অনেক বৎসর আগে এই মূর্তিখানি আবিষ্কৃত হয়। ১৯২০ সনে এই মূর্তিখানি কুমিল্লার আনীত হইলে ইহার পাদপীঠের লিপি অনুসন্ধানস্বর্ণগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত গবর্ণমেন্ট প্রচারিত এপিগ্রাফিয়াইণ্ডিকা পত্রিকার সপ্তদশ খণ্ডে ৩৫৭-৩৫৯ পৃষ্ঠায় এই মূর্তির বিবরণ ও লিপির পাঠ আমি প্রকাশিত করিয়াছি। লিপিতে দুইটি শ্লোকমাত্র। প্রথম শ্লোকের মর্মার্থ এই যে, খজোদাম নামে একজন নৃপাধিরাজ ছিলেন, তাঁহার পুত্র জাতখজা, জাতখজার পুত্র দেবখজা। তাঁহার রাজ্ঞী মহিষী মহাদেবী

শ্রীপ্রভাবতী, ভক্তিহসকরে সর্বগণী প্রতিমাকে সোনা দিয়া মূর্তি দিয়াছিলেন। সর্বগণী অশ্রুভূজা ও দণ্ডায়মান, প্রায় হাত খানিক উঠ, নীচে বাহন সিংহ। দুই ধারে দুই অনুচরী। প্রতিমার গায়ে স্থানে স্থানে সোনা লাগিয়া ছিল। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ চণ্ডীমন্দির মন্দিরে লইয়া মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তথা হইতে মূর্তিখানি চুরি যায়। কিছুদিন আগে শূন্য হইতে পাইয়াছিল, মূর্তিখানি নাকি আবার পাওয়া গিয়াছে।

সম্রাট রাজার দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রাপ্ত খজা বংশের এই তিনখানি লিপি হইতে খজা রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। চীন দেশীয় পরিভাষক হিউএন সঙ ৬৫০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সম্রাট আসিয়াছিলেন। হিউএন সঙ পরিভাষক ৬৭০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সম্রাট আসিয়া উহার সিংহাসনে রাজত্বকে দেখিতে পান। কাজেই হিউএন সঙ দেবখণ্ডের বা তাহার পিতার সময়ে সম্রাট আসিয়াছিলেন। দেবখণ্ডের তাম্রশাসনে এক "বৃহৎ পরমেশ্বর" প্রদত্ত ভূমির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি প্রাগ্-জ্যোতিষ্মৎবর ভাস্কর বর্মার ইহারই সম্প্রদায়। কারণ এই সময়ের অনেক পূর্ব হইতেই এই অঞ্চল প্রাগ্-জ্যোতিষ্মৎবরগণের পূর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

৪। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন

সম্রাটের দক্ষিণার্ধে অর্থাৎ বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালী জেলা ভূভূমি যখন খজা বংশের রাজত্ব চলিতেছিল, তখন (৭ম শতাব্দী) উহার উত্তরার্ধে শ্রীহট্ট কাছাড় জেলায় যে ভিন্ন বংশ রাজত্ব করিতেছিল, তাহার কিছু প্রমাণ রমণেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বা নিউকবর্তী কালে ত্রিপুরা মহারাজার জমিদারী টেটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Mr. MacMum একখানি তাম্রশাসন বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পর-লোকগত 'গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিবার জন্য শাসনখানি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ধরে লইয়াছিলেন। তাহার অকালমৃত্যুর পরে তাহার পিতা শাসনখানি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিরকে কিছুদিনের জন্য ধরে দেন। অধ্যাপক ভট্টর শ্রীমন্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় তখন ইহার পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার পঞ্চদশ খণ্ডে সেই পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসনখানি সপ্তম শতাব্দের কুটিলাক্ষরে লিখিত। এই শাসন হইতে আমরা লোকনাথ নামক একজন সামন্ত নরপতির পরিচয় জানিতে পারি। লোকনাথ শাসনে পিতার নাম করেন নাই। মাতার নাম গোত্র দেবী। গোত্র-দেবীর পিতা কেশব গ্রাহুগণ পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান, জাতিতে পারশব বলিয়া উল্লিখিত।

শাশনাল এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২৭ সন-

হেড অফিস :

৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

সর্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে

বার্ষিকের সুবিধা ও সুযোগ আমাদের
গ্রাহকবর্গ সমাক্ষ অবগত আছেন।
আমরা হয় ত আপনারও প্রয়োজন
মিটাইতে পারিব।

বি, এন্, চ্যাটার্জি, এম, এ,
এফ, আর, জি, এস (লন্ডন),
এফ, আর, এস, এ (লন্ডন),
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টি, আর, বসু, এম, এ,
জেনারেল ম্যানেজার।

‘লক্ষ্মী’র কথা

প্রতি বৎসর শারদীয়া সংখ্যায় আমরা ‘লক্ষ্মী’র কথা প্রচার করি। কাগজ
নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য বর্তমান বৎসরে প্রত্যেক পত্রিকাতেই স্থানাভাব। সুতরাং
এইবার আমাদের ‘কথা’ সংক্ষেপেই সারিতে হইল।

দারুণ দুঃসময় সত্ত্বেও গত বৎসরে ‘লক্ষ্মী’র নতুন বীমার পরিমাণ হইয়াছিল
দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। সঞ্চিত বীমা তহবিলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া
হইল দুই কোটি শিশ লক্ষ টাকার উপর। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, অভিশেষবাসীর
উপর ‘লক্ষ্মী’র প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন
ভারতের প্রতি গৃহে ‘লক্ষ্মী’র বীমাপত্রের কল্যাণে চণ্ডলা লক্ষ্মীদেবী অটলা হইয়া
থাকিবেন। অলমতিবিস্তরেন।

দি লক্ষ্মী ইনশিওর্যান্স কোং লিঃ

হেড অফিস—লাহোর

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—শ্রীশচীন বাগচী

হুস নুন্যে স্পেশাল পূজা ক্লীয়ারেন্স সেল

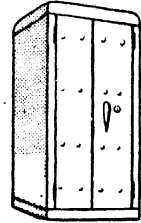
(১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে)

নিম্নে বর্ণিত সর্বরকম ইস্পাতের ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য
অনুগ্রহপূর্বক এই ঠিকানায় খোঁজ করুন বা ফোন করুন :

বি, ব্রায় এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স, ৩ ও ৪নং হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা
কারখানা—১নং ইন্টালী মার্কেট ও ২নং আমহার্ট স্ট্রীট।

গদাম—(১) শশিভূষণ দে স্ট্রীট (২) পাইকপাড়া রোড



ইস্পাতের স্প্রিংয়ের খাট ৬'০"০"২'-৩"

(ভাজ করিয়া রাখার ব্যবস্থা সম্বলিত)

(ফটকে ৭৫টি আছে)

প্রত্যেকটি ৭৫ টাকা

ইস্পাতের ক্যাবিনেট ৬'০"০"১৫" (ফটকে

১৫টি আছে)

২৬০ টাকা

ইস্পাতের ক্যাবিনেট ৬'০"০"১৮" (ফটকে

৫০টি আছে)

২৮০ টাকা

ইস্পাতের টেবিল ৪'০"২" (ফটকে ১৫টি

আছে)

৭০ টাকা

ইস্পাতের টেবিল ৫'০"০" একপাশে

লকার সহ

১৭০ টাকা

ইস্পাতের রাক্ ৬'০"০"১৮" সাইড-

গালি বন্ধ (ফটকে ২৫টি আছে)

১০০ টাকা

ইস্পাতের রাক্ ৬'০"০"১১" সাইডগালি

বন্ধ

১৫ টাকা

বিভিন্ন আকারের লোহার সিঁদুক—

উচ্চতা ২৪"×৫৬" ১৮"×২৫"

১৬" — দুইটি চাবি সহ—ওজন

অনুমান ২৫ মণ হইতে ৩ মণ

২৯০ টাকা

উচ্চতা ২৭"×২০"×১৮" বেধ

দুইটি চাবি সহ—ওজন ৪ মণের

কাছাকাছি

৩৫০ টাকা

৩০"×২৪"×২৪" বেধ—দুইটি

চাবি সহ—ওজন ৪৫ মণের

কাছাকাছি

৪৫০ টাকা

ইলেকট্রিক হিটার (অটোমেটিক সুইচ)

অফ-এর ব্যবস্থা সহ

৭০ টাকা

ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী এবং বাড়ী ও অফিসের বিভিন্ন রকমের প্রথম শ্রেণীর

সেগুন কাঠের ফার্ণিচার এবং রবারের সামগ্রী বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

এই পারশবের দৌহিৎ লোকনাথের একজন গ্রাহ্যগ মহাসামন্ত ছিলেন প্রদোষ শর্ম। তিনি সুবংশ বা সুবংশ বিষয়ে “কৃতাক্তা-বিশ্ব-আটবি ভূখণ্ডে” যেখানে—“মৃগ-মিষ্ণ-বরাহ-বাঘ-সারস্পাদি” নিজেদের বাড়ী ঘর করিয়া সুখে যিচ্ছ বাস করিতেছে সেইখানে, তখন নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দৃতক করিয়া অবেশন করিলে লোকনাথ এই মন্দিরের জন্য এবং সেই স্থানবাসী গ্রাহ্যগণের জন্য প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড দান করেন। সাম্মবিগ্রহিক প্রশান্ত-দেব এই দানকর্ম দ্বিল সম্পাদনায় দ্বারা সুবংশের কানিয়া দেন। গ্রাহ্যগণের নাম ও কে কত ভূমি পাইবে তাহা শাসনে উল্লিখিত আছে। মোট ভূমির পরিমাণ বহু শত ব্রোণ এবং বর্তমান মাপের দুই তিন বর্গ মাইল জুড়িয়া উহা অবস্থিত ছিল।

লোকনাথ সম্বন্ধে নিম্ন তথ্যগুলি অবগত হওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে বীর্যবান ও সাহসী ছিলেন, তাহার অনেক অশ্বসাদী সৈন্য ছিল। পরমেশ্বরের অর্থাৎ সাবভৌম নরপতি, যিনি লোকনাথের অধিরাজ ছিলেন, তিনি লোকনাথের সহিত সম্বন্ধে অনেকবার সৈনিক ক্ষয় করিয়াছেন, কিন্তু লোকনাথকে অধিকারচ্যুত করিতে পারেন নাই। জয়তুঙ্গবর্ষ নামক স্থানের দুর্লভ্য যুদ্ধে লোকনাথের আগ্রহ সংজ্ঞার যুদ্ধে কাঁপাইয়া পড়া দেখিয়া এবং লোকনাথের নানারূপ প্রশংসা শুনিয়া জীবদারগ নামক নরপতি মন্ত্রিগণের পরামর্শে লোকনাথের সৈন্য এবং বিষয় কোনটাই হাত দিলেন না।

এই শাসন প্রদত্ত ভূমি কোথায়, সুবংশ এবং জয়তুঙ্গবর্ষ কোথায় তাহা প্রায় বিশ বছর ধরিয়া অনুসন্ধান করিতেছি, বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের পণ্ডিতগণও কাঁপিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। এত দিনে যেন উহার সম্ভাবন পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাচীন আমলে মহাযানী বৌদ্ধদের প্রধান প্রাণপ্রাণ অষ্ট সাহস্রিকা প্রজাপারমিতা পৃথি বৌদ্ধ গৃহস্থের ঘরে ঘরে এবং বৌদ্ধ বিহার-সমূহে রক্ষিত হইত। এই গ্রন্থের বহু হাতের কথা পৃথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহারের এক-যান কেন্দ্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, উহা ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের নকল। আর একখানা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বর্তমান কালের কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের শিব, গোহাটীর নিকটস্থ কামাক্ষা দেবী, সন্দ্রনাথের শিব ইত্যাদির মত সেই আমলেও বিখ্যাত বিখ্যাত দেবস্থান ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠা ছিল। ঐ প্রজাপারমিতার পৃথি দুই-তিনটিতে স্থানের নামসহ ঐ সমস্ত দেবদেবীর দিব দেওয়া আছে। ফরাসী পণ্ডিত ফঁসে উহার বৌদ্ধ-মূর্তি তত্ত্ব পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই সমস্ত লেবেলযুক্ত দেবদেবীর ছবি

তালিকা দিয়াছেন, কতগুলির ছবিও দিয়াছেন। মদীয় মূর্তি তত্ত্বের পুস্তকেও পূর্ব-বঙ্গের কয়েকটি মূর্তির বর্ণনা ও ছবি দেওয়া আছে। এই তালিকায় দেখা যায়, সমস্ত জয়তুঙ্গ নামক স্থানে একটি বিখ্যাত লোকনাথ মূর্তি ও মন্দির ছিল। ত্রিপুরা শাসনের জয়তুঙ্গবর্ষ এবং এই লোকনাথের মন্দিরের অধিষ্ঠানভূমি জয়তুঙ্গ নামক স্থান যে এক স্থান নহে, এমন কোন প্রমাণ নাই। এই জয়তুঙ্গবর্ষ লোকনাথের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়। লোকনাথের শাসনের অক্ষর এবং দেবখঞ্জের শাসনের অক্ষর একই সময়ের, কাজেই ইহার দুইজনে সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। খজ্রদের অধিকৃত সমস্তের অংশ ত্রিপুরা নোয়াখালি জুড়িয়া ছিল। কাজেই লোকনাথের রাজ্য সমস্তের অপর অংশ শ্রীহট্ট কাছাড় হইবার সম্ভাবনা। এই যুক্তিপূর্ণতায় অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া নজর পড়িল, শীলচরের ১৪ মাইল উত্তরে দুর্দু নদীর এক শাখার নাম সুবংশ গাঙ্গ। শীলচর সহরটি বরাক নদীর উপরে অবস্থিত। এই সহরের ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জাটিগা নদী উত্তর হইতে আসিয়া বরাকে পড়িয়াছে। এই মিলন স্থানের আড়াই মাইল উত্তর-পূর্বে দুর্দু বা সুবংশ গাঙ্গ আসিয়া জাটিগাতে পড়িয়াছে। শীলচরের আট মাইল উত্তরে আবগা নামে স্থান, ১১ মাইল উত্তরে জাটিগা নামক স্থান। আবগের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বামনীপাড়া নামক স্থান, প্রাচীন গ্রাহ্যগ বসতির স্মারক। জাটিগাই জয়তুঙ্গ এবং স্থানের নামে নদীর নাম হওয়ার সম্ভাবনায় সুবংশ নামটি সুবংশ বিখ্যের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চিত হইবার পূর্বে ইহার বেশী আর জোর করিয়া বলা চলে না।

ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্য ভাগে প্রাগজ্যোতিষ সম্রাট ভূতি বর্মী শ্রীহট্টের পশ্চিম-পূর্ব তিন শতাব্দিক গ্রাহ্যগ বসাইয়া তথায় আর্থ সভ্যতার এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার শত বৎসর পরে, খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দের মধ্য ভাগে দেখিতে পাই, সামন্তরাজ লোকনাথ পশ্চিম-পূর্ব ৩০ মাইল পূর্বে জাটিগা দুর্দু-সুবংশ গাঙ্গের উপত্যকায় অনন্ত নারায়ণের মন্দিরে এবং গ্রাহ্যগ পালনের জন্য ভূমি দান করিয়া সেই আর্থ সভ্যতা প্রসারের সহায়তাই করিয়া চলিয়াছেন। এই অপূর্ব হিন্দু মিশনের কার্য এতদিন পরে বর্ণিত পাইয়া আমরা আর্থ সভ্যতার পূর্বাভিমুখী প্রসারের গতি লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। শীলচরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সুবংশায়ত তীর্থ ভুবন পাহাড়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি এবং অশ্বভূতনামণি সুদীর্ঘ পর্বতগুহা ও সুদৃশ্য কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহাও বর্ণিতে পারিতেছি। লোকনাথের অধিরাজ জীবনধারণ নৃপের

অন্য কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ তিনি কামর,পরাজ ভাস্কর বর্মের বংশীয় ছিলেন, ভাস্কর বর্মের পুত্র বা ভ্রাতৃপুত্র হওয়া অসম্ভব নহে।

খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দে কাছাড় হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালি পর্যন্ত ভূভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইলাম। কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জয়তুঙ্গ বা বর্তমান জাটিগা উপত্যকা পর্যন্ত যে সমস্ত দেশ বিস্তৃত ছিল, তাহারও একটা আভাস পাওয়া গেল। পূর্বে ভারতের বাকী অংশ অর্থাৎ চট্টগ্রাম জেলার প্রাচীন নাম ছিল হরিকেল মণ্ডল। চীনা পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে কয়েকবার হরিকেল নামে এই দেশের উল্লেখ আমরা পাই। উত্তর সমস্তে যখন লোকনাথের বংশ, দক্ষিণ সমস্তে যখন খল্ল বংশ রাজত্ব করিতেছিল, তখন বা তাহার অদ্যাবধি পরে হরিকেল মণ্ডলে কান্তিদেব নামক একজন রাজার অস্তিত্বের কথা আমরা জানিতে পারি।

৫। কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন
চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ শিকদার মহাশয় চট্টগ্রাম সহরের বড় আখড়া নামক মন্দিরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই শাসনখানি আবিষ্কার করেন। ১৯২৩ সনে ইহা ঢাকা মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত হয়। ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসের মার্ভারি রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই শাসনখানির একটি চিত্র সম্বলিত পাঠ প্রকাশিত করেন। ইহা একখানি অসমাপ্ত তাম্রশাসন, ইহাতে রাজবংশাবলি অংশ আছে কিন্তু দামাংশ নাই। বর্তমানপূর নামক রাজধানী হইতে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব এই শাসনখানি প্রচার করিতেছেন। বর্তমানপূর কোথায় ছিল অদ্যাবধি জানা যায় নাই। ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গবেষণার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি Indian Historical Quarterly পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই শাসনখানির প্রাপ্তিস্থান এবং হরিকেল দেশের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কান্তিদেব হরিকেল মণ্ডলের ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, অথচ তিনি নিজেকে মহারাজাধিরাজ বলিয়া ঘোষণা করিতে স্পষ্ট করেন নাই। সমস্তের দেবখঞ্জও মহারাজাধিরাজ! এই যুগের পরেই একশত বৎসর বা তাহারও অধিককাল ধরিয়া পূর্ব ভারতে রাজকর্তা চলিয়াছিল। কামরূপ রাজগণ দুর্লভ হইয়া

* লোকনাথের পরে কাছাড় শ্রীহট্ট অঞ্চলের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টের বিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে জানা যায় ১১শ-১২শ শতাব্দে এই অঞ্চল গোবিন্দ-বংশের দেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১৯শ খণ্ড।

কুইনোমল

(Quinomal)

কুইনাইন সংযোগে প্রস্তুত নতুন বা পুরাতন ম্যালেরিয়া, পালজার প্রভৃতির মাহৌষধ। ইহা সেবনে লিভার ও প্লীহা সঞ্চর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্বর ফিরিয়া হয় না। উপাদানভাগে লৌহ, আর্সেনিক, নাক্স ভায়কা ও যকৃত-সার থাকায় ইহা ম্যালেরিয়াজনিত রক্তাকপতা ও শোথ দূর করিয়া নতুন স্বাস্থ্য গঠন করে।

ভিটাতোন "ডি"

(Vitatone—"D")

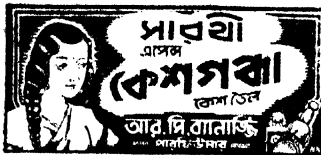
হাট-সার, লোমথিন, লৌহ, ষ্ট্রিকানিন প্রভৃতি এবং ভিটামিন 'এ' 'বি' ও 'ডি' সংযোগে প্রস্তুত টোনিক। ইহা নেহে ও মনে নতুন শক্তির সঞ্চার করে এবং স্নায়ু-মণ্ডলীকে সতেজ করে।

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ

লেবরেটরী লঃ

১৬নং বেলগাঁছা রোড
কলিকাতা

সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী
সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী
সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী
সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী
সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী
সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী
সারথী সারথী সারথী সারথী সারথী



কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা কেশগঙ্গা
জিফস :--১১১, দুর্গা পীড়ুরী লেন, কলিকাতা

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মাসী

শত বর্ষ পরে প্রস্তুত

মৃতসঞ্জীবনী সুধা

অদ্বিতীয় টনিক ওয়াইন

তুরে
দৌর্বল্যে
সুতিকায়
রাতে



ঢাকা
আয়ুর্বেদীয়
ফার্মাসী
লিঃ

৫২ অফিস
ঢাকা

গবর্ণমেন্ট লাইসেন্স
প্রাপ্ত প্রথম প্রস্তুতকারক



ঢাকা আয়ুর্বেদীয়
ফার্মাসী লিঃ

স্মরণশক্তি
= বৃদ্ধি করে =
মস্তিষ্ক ও স্নায়ু
শক্তির সাথে

পাণ্ডাছিলেন। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে কামরূপে ভাস্কর বর্মের বংশের শাসন লুপ্ত হয় এবং সেনাধ্বজাধারী শালস্তম্ভ কামরূপ আধিকার করেন। ফলে পূর্ব ভারতে অরাজকতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আর অবধি রহিল না। অবশেষে ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বৎসরে বাঙ্গলার উত্তম জনসাধারণ গোপালকে রাজা নির্বাচিত করিয়া পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিলে পূর্ব ভারতের এই ভয়ানক অবস্থা দূর হয়। লোহিতের পূর্বে পাল বংশের শাসন প্রসৃত হইয়াছিল কি না জানিবার কোন উপকরণ অব্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। হইয়াছিল বলিয়াই বর্তমানে ধরয়া লইতে হইবে। কারণ ৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রতিহার সম্রাট মহেন্দ্র পাল যখন প্রবল হইয়া বাঙ্গলা-বিহারব্যাপী পাল রাজা অধিকার করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে লোহিতের পূর্বে পারেও ভাির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর হইতে মহেন্দ্র পালের ৫ম বৎসরের লিপি পাওয়া গিয়াছে এবং মহেন্দ্র পাল-পুত্র মহাপালের দুইখানি লিপি ত্রিপুরা জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৬। মহাপালের বাঘাউড়া লিপি

মহাপালের লিপিবদ্ধ একখানি বিষ্ণু মূর্তি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ত্রিপুরা জেলার রাহুলগোড়িয়া মহকুমার বাঘাউড়া গ্রামে একটি পুন্ডরান পুকুর হইতে মাটি ভুলিতে আবিষ্কৃত হয়। ঢাকার প্রফেসর সাহসম্পন্ন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি-টি মহোদয়ের চেষ্টায় ১৯১৪ সনে ঢাকায় উহার ফটোগ্রাফ আনীত হয় এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত রাখাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় মূর্তির পাদপটীকায় লিপির এক পাঠ প্রকাশিত করেন। পরের মাসে আনি এক সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করি। পরে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার সন্তদশ খণ্ডে আমার এই পাঠ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লিপির মর্ম এই যে, মহাপালের তৃতীয় রাজাসম্বতে সম্রাট বিলকিন্দক গ্রামনিবাসী বসুদন্ত পুত্র বণিক লোকদন্ত মাতা, পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশোবর্ষি কামনায় এই নারায়ণভট্টারক নামক কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই লিপির সহিত মহাপালের অপর লিপিস্থানও বিবেচ্য।

৭। মহাপালের নারায়ণপুর শিলালিপি

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মংলখানার অধীন নারায়ণপুর গ্রামে পুরানো পুকুর কালাইতে একখানি লিপিবদ্ধ গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার ১৩৫০, শ্রাবণের প্রবাসীতে এই লিপির পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। লিপিস্থান মহাপালের চতুর্থ রাজাসম্বতে অর্থাৎ ৯৯২

খ্রীষ্টাব্দের। সম্রাটের বিলকিন্দক গ্রামনিবাসী জন্মল মিত্রের পুত্র বণিক বসু মিত্র মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রথম লিপির বিলকিন্দক এবং দ্বিতীয় লিপির বিলকিন্দক নাম সাদৃশ্যে এক গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। রাহুলগোড়িয়ার কিছু পশ্চিমে রেল লাইনের ধারে বিলকিন্দয়া বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রাম ধনী বণিকগণের আবাসস্থল ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। কোন প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে কি না অনুসন্ধান। সম্ভবতঃ এই গ্রামেরই দুইজন ধনী বণিকের কীর্তি এই দুইখানি লিপিবদ্ধ মূর্তি। এই লিপি দুইখানি সম্রাটের অবস্থান নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইরকম আরও কত লিপি যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কে জানে? ত্রিপুরা জেলায় যোগ্য ব্যক্তি নৈরুদ্বে পূর্ব ও পশ্চিমী প্রমাণসম্বন্ধে চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই। পরলোকগত অনন্সকুলচন্দ্র রায় মহাশয় এই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। কুমিল্লায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, গ্রীকাইলে সম্প্রতি আর একটি কলেজ হইয়াছে। হাইস্কুলের তে অভাবই নাই। কিন্তু প্রয়ে দরদ কোথাও দেখিতেছি না।

এই দুইখানি লিপি হইতে জানা গেল, খ্রীষ্টাব্দের ৯৯১ এবং ৯৯২তে ত্রিপুরা জেলায় প্রতিহার মহাপালের উত্তর ভারতব্যাপী প্রকাশিত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ পাল রাজ্যের অন্তর্গত রূপেই, পাল রাজ্য প্রতিহার সম্রাটের পদনত হওয়ায় পাল রাজ্যের এই অংশও প্রতিহার অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। অবশ্য, তাহা নাও হইতে পারে। লোহিতের পশ্চিম পার পশ্চত অধিকার করিয়া প্রবল প্রভা প্রতাহার সম্রাট লোহিতের পূর্ব পারস্ব পূর্ব ভারতের বাক অংশটুকুও অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন।

প্রতিহার সম্রাটের এই আঘাত হইতে পাল রাজ্য উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ধর্মপাল দেবপালের দিন আর ফিরিয়া আসে নাই। পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ববঙ্গে তাহাদের প্রভাব একেবারে কমিয়া গেল। ভারেন্দ্রা গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তি লিপি হইতে জানা যায়, প্রতিহার শাসন লোপের পরেই চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণের অধিকার ত্রিপুরা জেলায় বসুমূল হইয়াছিল। বঙ্গেও বিক্রমপুরকে রাজধানী করিয়া, এই যুগেই শ্রীচন্দ্রের বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। লয়চন্দ্রের তারেন্দ্রা নটেশ্বর মূর্তিলিপি

এই লিপিস্থানি আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়। ত্রিপুরা জেলার প্রাচ্যসম্পদ উন্মারে বৈকুণ্ঠাবাদ অদ্যাপি অক্ষর উলোহসম্পন্ন। ১৯১১ সনে আমি কুমিল্লা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া যাই, তখন বৈকুণ্ঠনাথ এই লিপির ছাপ

আনিয়া আমার হস্তে দেন। ইহা প্রতিষ্ঠা পত্রিকায় এবং ১৯১৪ সনের বঙ্গীয় এনায়টিক সোসাইটির পত্রিকায় A Forgotten Kingdom of East Bengal নামক মনীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ১৯১৫ সনে আমার সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হয়। পরে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার সন্তদশ খণ্ডে ইহা আবার প্রকাশিত হয়।

এই লিপির মর্ম এই যে, শ্রীমন্ত্ররহস্য দেবের অষ্টাদশ সম্বৎসরে কীর্তপাল গ্রীকসুম দেবের পুত্র ভাবু দেব কৃষ্ণচন্দ্রশী তিথিতে পুণ্য নক্রে বৃহস্পতিবারে এই নটেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অক্ষয় তত্ত্বের বিচারে এই লিপি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের যুগের। জ্যোতিষিক বিচারে যে সমস্ত বৎসরে এই সমস্ত তিথি নকত্র বারের মিলন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দই এই লিপি সম্পাদন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার বৎসর বলিয়া সম্ভবপর মনে হয়।

সমসাময়িক যুগে বঙ্গে বিক্রমপুর রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচন্দ্র নামক নরপতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। শ্রীচন্দ্রের অব্যাবধি চারিখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, দুইখানা ফরিদপুর জেলায় ইদিলপুরে এবং কোদারপুরে। দুইখানা ঢাকা জেলায়, রামপালে এবং ধুমা নামক গ্রামে। বংশধারা এইরূপে—পুণ্ড্রচন্দ্র, তাহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, তাহার পুত্র চৌলোকাচন্দ্র। চৌলোকাচন্দ্র ছিলেন—“আধারো হরিকেলরাজককুসুমচরিত্তানায় প্রিয়াম্”—হরিকেল রাজের রাজচিহ্ন। যে ছত্র তাহা যে লক্ষ্মী স্নিতহাস্যে উন্মাসিত করিতেন, তাহার আধারস্বরূপ ছিলেন। এবং দিল্লীপের মত তিনি চন্দ্ররূপে রাজ্য হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্র রাজ্য হইয়া পৃথিবী একাতপত্র করিয়াছিলেন।

ইহার পরে বঙ্গের আর একজন রাজার সংবাদ আমরা জানিতে পারি। ইহার নাম গোবিন্দচন্দ্র। চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল পূর্ব ভারত জয়ে আসিয়া ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দের এখানে শুধারে ইহার রাজত্বকাল। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত লিপিবদ্ধ দুইখানি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একখানি সূর্যমূর্তি, হাতত্যা কি সোনাবীণে আবিষ্কৃত, বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত। এইখানি গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সম্বৎসরে। অপরখানি বিষ্ণুমূর্তি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণায় বেতকা গ্রামে আবিষ্কৃত, বর্তমানে আউটসাহী গ্রামে রক্ষিত। এইখানি গোবিন্দচন্দ্রের ২৩ সম্বৎসরে প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দচন্দ্র ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী বৎসরে রাজত্ব আরম্ভ করিয়া ছিলেন বলিয়া ধরিলে তাহার পূর্ববর্তী

A New Home for an Old Quest

IT has always been a Goodyear working principle that nothing is good enough which can be made better.

And it has been Goodyear experience that the source of betterment is less often the materials used than what is done with them.

On this premise Goodyear since its earliest days has pursued research to advance the usefulness and value of its industrial rubber products and printing supplies.

It was this unrelenting quest for improvement which fathered the first cord-bodied transmission belt, the first vulcanized belt-splice, the first mile-long conveyor belt, the first asbestos cord steam hose, the first high-capacity dredging sleeves plus a host of other Goodyear advances.

During this past year Goodyear dedicated a new home for its scientific resources — what is believed to be in personnel, facilities and equipment

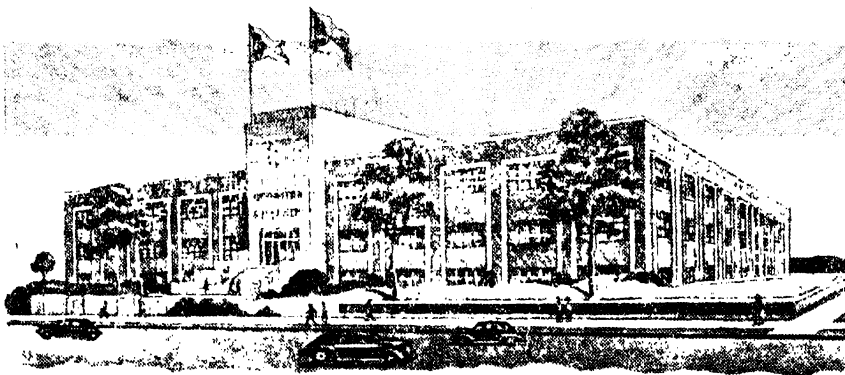
the finest laboratory for its purpose in the world.

Its bold and various activities now are concentrated on war products, but the lessons learned will inevitably insure greater service to industry when applied to the products of peace.

From the developments spurred by war, such possibilities are foreseeable as steel cable transmission belts, plastic glass, feather-light insulating materials, hundred-mile conveyor belt systems, plastic water pipes burstproof against freezing, metal wood laminations for plane and car bodies, mildew-proof tents and awnings, synthetic latex cushioning, crashproof fuel tanks, and many like wonders on which we now are at work.

Firm in its purpose to stand forth always as "science headquarters" of the rubber industry, Goodyear aims to fulfil the promise "the best is yet to come."

PRODUCTS OF GOODYEAR RESEARCH



GOOD YEAR
THE GREATEST NAME IN RUBBER

রাজা শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরের সিংহাসনে ১৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আরোহণ করেন।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখা যায়, চন্দ্র চন্দ্রদিগ্ধারিগণের "রোহিতাগিরিভূজাং বংশঃ" বংশের আদি পুরুষ পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রোহিতাগিরি লালমাই পাহাড় বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, লালমাই পাহাড়ের মালিক চন্দ্র উপাধিধারী এক রাজবংশ প্রায় ১০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চলে রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। লয়হচন্দ্র এই বংশেরই একজন ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অষ্টাদশ সম্বৎসর হইলে, তিনি ১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রোহিতাগিরির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং এই বংশেরই এক শাখার বংশধর প্রায় সমকালেই বঙ্গে বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। পাহাড়শ্রেণীর মাঝামাঝি স্থানের কিষ্কিণ্ডে উত্তরে, বড়ুরাগামী রাস্তা যেখানে পাহাড় পার হইয়াছে তথায়, পর্বতের উপরে বেশ বিস্তৃত সমতল স্থান আছে। তথায় কোটবাড়ী বলিয়া পরিচিত সমচতুষ্কোণ ধ্বংসস্থলের শ্রেণী আছে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে একথানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। রাস্তা প্রস্তুতকালে এই ধ্বংসস্থলের মধ্য হইতে অনেকগুলি পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। এই স্থানেই কিছুদিন পূর্বে ইটের জন্য খুঁড়িতে যাইয়া সামরিক পুত্রবিভাগের ঠিকাদারগণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং বহু ধাতব মূর্তি ও আরাকানী মুদ্রা এবং পট্টকেরা নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কার করে। উহাদের মধ্য হইতে একখানি ধ্যানীবৃন্দ মূর্তি ঢাকা মিউজিয়মে সংগ্রহীত হইয়াছে। এই স্থানে পর্বতশীর্ষে দুর্গাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছোটখাটো একটি সহর যে ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাহাড়ের সমস্ত পশ্চিম প্রান্ত জড়িয়া ৮১০ মাইল পর্যন্ত পাটিকারা পরগণা বর্তমান। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, পর্বতশীর্ষে এই ধ্বংসস্থল ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে বিখ্যাত প্রাচীন পট্টকেরা নগরীর। ফুসে সাহেব ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা যে অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পৃথি হইতে সেই আমলের প্রসিদ্ধ বোধ দেবদেবীর তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে

"পট্টকের চুল্লবরভবনে চুন্দা" দেবীর উল্লেখ এবং ছবি দেওয়া আছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানাও পট্টকেরা নগরের উল্লেখ আছে।

৯। রণবৎকমল শ্রীহরিকাল দেবের তাম্রশাসন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ময়নামতী পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ারি করারকালে ইহা পাওয়া যায় এবং হ্রিপদার মাজিষ্ট্রেট মিঃ ইলিয়ট উহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব ১৮০৭ সনে ইহার পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৯২৯ সনে মদীয় Iconography পুস্তকে আমি দেখাই যে, এই শাসনে পট্টকেরা নগরীর উল্লেখ আছে, কোলব্রুক পড়ার ভুলে উহা ধরিতে পারেন নাই। ১৯৩০ সালের ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়ার্টারলি পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই শাসনখানির সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শাসনখানি দ্বারা রাজা রণবৎকমল শ্রীহরিকাল দেবের সম্ভবতঃ সম্বৎসরে ১১৪১ শকাব্দে তাহার মন্ত্রী ধাড়ি-এর পট্টকেরা নগরে দুর্গোত্তারা মন্দিরে বেজবাড় গ্রাম হইতে ২০ প্রাণ ভূমি দান করেন। ১১৪১ শক=১২১৯-১২২০ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই হরিকাল দেব ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে পট্টকেরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দেই পট্টকেরার চুন্দাদেবী বিখ্যাত হইয়াছিলেন দেখিয়া ঐ সময় হইতেই বা তাহারও পূর্বে আমরা পট্টকেরা নগরের অস্তিত্ব জানিতে পারি। সম্ভবতঃ রোহিতা গিরিভোগকারী চন্দ্ররাজগণ পট্টকেরাতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পট্টকেরা রাজ্যের করণ ও রৌদ্রসপর্ণ ইতিহাস এই যুগের ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সহিত যুক্ত।

রংরাজ ক্যানজিউটার (১০৮৪-১১১২ খৃঃ) পরমাসুন্দরী একমাত্র কন্যার নাম ছিল ন্যোয়ে-এণ্ড-থি। পট্টকেরা রাজকুমারের সহিত তাহার প্রণয়ের ফলে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তিনিই ব্রহ্মদেশের বিখ্যাততম রাজা অলংশিশু (১১১২-১১৮৭ খৃঃ)। অলংশিশু পট্টকেরা রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতেন এবং স্বয়ং এক পট্টকেরা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃন্দ বয়সে অলংশিশু পুত্র নরধু (১১৮৪-১১৯১ খৃঃ) দ্বারা নিহত হন। নরধু ব্রহ্মদেশে বিমাতা পট্টকেরা রাজকুমারীকে

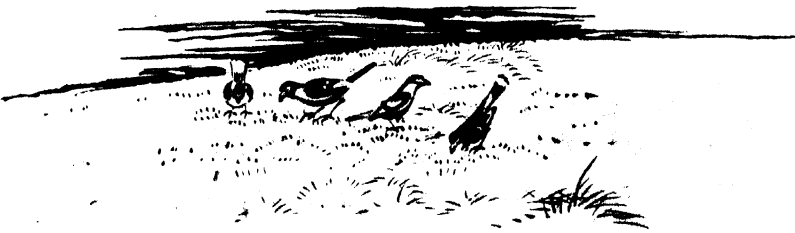
বধ করেন। মর্মাহত পট্টকেরারাজ প্রেরিত দুঃসাহসী আটজন বীরের হস্তে নরধু নিহত হন এবং হরিকাল দেবের রাজ্য প্রাপ্তির মাত্র দশ বৎসর পূর্বে পট্টকেরা বীরগণ এই অশ্রুত প্রতিহিংসা গ্রহণ কার্য সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মরাজধানী পেগানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সামরিক পুত্র বিভাগের খননের ফলে ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের শিখরে শিখরে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন পট্টকেরা নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন মূর্তি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্ন বিভাগ কর্তৃক এই সমস্তের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইলে পট্টকেরার প্রাচীন ইতিহাস নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠবে, সন্দেহ নাই।

পট্টকেরার দক্ষিণে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে এই সময় আর একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১০। দামোদর দেবের তাম্রশাসন।

অদ্যাবধি দামোদর দেবের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথমখানি পাওয়া যায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম সহরের নিকট নসিরাবাদ গ্রামে। ইহার তারিখ ১১৬৫ শকাব্দ বা ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। বংশধারা এইরূপঃ—পুত্রযোতম, মহুসুন্দন, বাসুদেব, দামোদর। দ্বিতীয় শাসনখানি পাওয়া যায় হ্রিপদা জেলার মেহার গ্রামে। উহা দ্বারা সমস্ত মন্ডলে মেহার গ্রামে ভূমিদান করা হইয়াছে। উহার তারিখ ১১৫৬ শকাব্দ, রাজ্যের চতুর্থ সম্বৎসরে প্রদত্ত। কাজেই দামোদর ১১৫০ শকাব্দ বা ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। মেহার পর্যন্ত ইহার অধিকার বিস্তৃত দেখিয়া মনে হয়, এই সময় সম্ভবতঃ পট্টকেরা রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছিল কারণ, মেহার হইতে পাটিকারা অল্পই দূরে। দামোদর দেবের উপাধি ছিল অরিরাজ-চান্দ-মাধব ইহার অল্প পরেই আমরা সম্ভবতঃ এই বংশেরই অরিরাজ দনুজমাধব উপাধিধারী দশরথ দেবকে বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপনিষ্ঠ দেখিতে পাই। এই সময়ের পূর্বে লৌহিত্যের পশ্চিম পার হইতে সেন বংশের শাসন লুপ্ত হইয়াছিল। দশরথ দেব লৌহিত্যের দুই পারের সমস্ত ভূমি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ,—মিলাইয়া একটি বেশ প্রবল প্রতাপ রাজা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত

কৃষ্ণেশ্বরী কবচ

পূরুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশাস্ত্র ও চর্যাদেশের অপূর্ণ সম্মিলন। ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রপূত কবচ ধারণে মোক্ষদায়ক জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শাস্তি সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত করা, কলহেরা, বসন্ত, শ্বেলগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। বন্দ্যমানারী পুত্রবর্তী হয়, ভৃত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও অশ্বিনভয় হইতে রক্ষা পাইবার রহস্যময়রূপ ইহা ধারণে কৃপিত গ্রহ সূত্রসম হয় এবং অতি দয়িত্ব ও ধনবান হইয়া থাকেন। পর লিখিলেই ধারণের নিয়মাবলী পাঠান হয়।

পূরুষকার—ও দৈবী শক্তির অধীন বলিয়া সকলেরই ইহা ধারণ করা কর্তব্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার মন্দির
বেদনাধার ধাম, কুন্ডা পোতা, (এস পি)।

অবফ্যানের

চা

স্বাদে - তৃপ্তি দেয়
গন্ধে - আনন্দ দেয়
দোহে - লাভ্য ফোটায়ে



অবফ্যান টি কোং

টি মার্কেটে ১৩ কমিশন এজেন্ট

১৮, রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১০৩, আগুতার মুখাঙ্গী রোড কলিকাতা
১০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা
২০/১, নানবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

দিন-
আগত ঐ

জাতির দুঃখ দৈনন্দিন দিন শেষ হ'য়ে
এল, তাঁকে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে আর
থাকতে হবে না : দিন আগত ঐ !
শিল্পে বানিজ্যে সব দিকেই দেশ চলেছে
এগিয়ে, উন্নতির সাধা পড়েছে
চৌদিকে : এ চলার পথে জাতীয়
বান্ধবের প্রয়োজন কিন্তু সঙ্কটে,
কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লি: জাতীয়
আদর্শ গঠিত ও পরিচালিত, আপনার
নগরহুতি কামনার দাবী সে করে—

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড
ব্যাঙ্ক লি:

১৫৬ অফিস :—২৯, ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

আমানতের হার ও সর্বদা সর্বাধিকারক
ব্যবসায়ীদিগকে সকল প্রকার সর্বাধিকার দেওয়া হয়।

Gram :—Jatiadhan

::

স্থাপিত : ইং ১৯৩৬

শাখা সমূহ

বাংলা

কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, চর-
মুগদুরিয়া, বেরহামগঞ্জ,
গোপালগঞ্জ, বড়বাজার
(কলিঃ), উল্টাডাঙ্গা
(কলিঃ), বরিশাল, ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ

বিহার

পাটনা, আরা, ছাপরা
ও মঞ্জঃ ফর পদুর,
বেনারস (ইউ, পি)

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসায়িক শাখা খোলা হইতেছে।

ডাঃ জে সি চক্রবর্তী—চেয়ারম্যান

কনকভূষণ মদ্যার্জি—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ, ওয়েস্টার্ন সার্কেল

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী

ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তোদবিণী

প্রেমাক্ষুর আত্মী

ভা ৫ মাসের এক পঙ্কত বেসায় খাল-ধার দিয়ে বাড়ি ফিরে ছিলুম। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের জন্য শহরবাসীদের ওপর দিয়ে তাপসহনশীলতার যে পরীক্ষা লান তয়ই একটি মহলা চলেছিল। ঘাম আর খাল-ধারের মেটে স্তার ধুলায় অঙ্গটি পচা ভাদ্রের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ হয়ে গেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হয়ে গেল। বরষতে দৃষ্ণ আছে ভেদে দৌড়ে হাটা শুরু করলুম, কিন্তু বাধা চেষ্টা! কিছুদূর যেতে না যেতে মঘলধারে বৃষ্টি থমে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম



ভিখারিণী আবার বসে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আরও দু-চার জন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় খোলার চালের বাড়ি, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর খোলা—তারই নিচে মাথা গুঁজে আশ্রয়স্থল চেষ্টা করতে লাগলুম। মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাঁটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগল আর মাঝে মাঝে দম্কা বাতাস আত্মসম্ভ্রমের ওপরে বলবৎকার শুরু করে দিলে।

অন্যন্যপায় হোয়ে কাক-ভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাঁট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশে-পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একে একে সরে পড়তে লাগল। আমার বাড়ি অনেক দূরে—বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না থামলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশে-পাশের চারদিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ হোলো। গলিটা বেশ চওড়া—দুখানা গরুর গাড়ি পাশা-পাশি যেতে পারে। গলির দুধারেই খোলার বাড়ি, একেবারে শেষ অবধি।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ির গা ঘেঁষে এক ভিখারী বসে অবিশ্রান্ত চোঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথায় লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চাঁচাচ্ছিল—সে আক্ষপের মধ্যে আত্মা ও খোদার বাহুল্য শূন্য মনে হোলো সে ব্যক্তি মসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে; বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সারনের সেই অন্ধ ভিখারীও অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এ পারে দাঁড়িয়ে ভিত্তে ভিত্তে লোকটির কৃচ্ছ্রসাধনা দেখছি আর মনে মনে গায়েণ্ডা করছি, আত্মা ওরফে খোদা হিন্দুস্থানী ভাষা বঝতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগল। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হয়ে পড়ল। বৃষ্টিধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চোপ আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল-সমাধিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়া প্রয়াস এই রকম একটা সংকল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার কাণের কাছে করুণ কণ্ঠে আমাদের জাতীয় সংগীত ধ্বনিত হোলো—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে চেয়ে দেখি একটি মেয়ে! বয়স তার বাইশ-তেইশ বছর হবে, রংটি ফিকে মোহর মত মালো। একখানা ছোঁড়া শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। শাড়িখানা ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপেটে গিয়েছে, তার ছিন্ন অবকাশ দিয়ে উত্তমাপ্রের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিণীর মত কুশ নয় বেশ সুপুষ্ট—বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমই তা ধরা পড়ে। সমস্ত দেহে এমন কর্মনীয়তা ও লাভণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিণী আবার বলল—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দেখলুম সে থর থর করে কঁপছে।

বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করব কিনা তাবুঁছি এমন সময় আবার সে বসে উঠল একটি পরস্যা ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখে চোখ পড়ল। চোখ দুটি এমন কিছু সম্পন্ন নয়; কিন্তু কি অশ্রুত চাহনি সে চোখে! এমন করুণ দৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। হস্তশ্রী মালপের এক কোণে জপাল পরিবর্তিত নিজস্ব স্বচ্ছ পৃষ্কারিণীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ধরণীর যে মর্মব্যথা সেই কালো জলের বৃকে ফুটে উঠতে দেখা যায়,

যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য

যুদ্ধান্তে ভারতের সর্ববিধ শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যথেষ্ট সুযোগ আসিবে। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই দেশীয় শিল্প উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতেই এদিক হইতে জাতির অর্থনৈতিক জীবন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইবে।

যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য গঠনে মূলধন সংগ্রহের জন্য এখন হইতেই দূরদর্শিতার আবশ্যিক। 'সিটি ব্যাংক' এযাবত বহুসংখ্যক জাতীয় শিল্পের মূলধন যোগাইয়া আসিতেছে এবং সুদক্ষ পরিচালনাধীন যুদ্ধোত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনপত্রাদি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছে।

সিটি ব্যাংক লিমিটেড

৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট : কলিকাতা।

চেয়ারম্যানঃ যোগেশ চন্দ্র সরকার

ম্যানেজারঃ শিশির কুমার বিশ্বাস

তার চোখ দুটিতে যেন সেই বাধা স্থির হয়ে আছে। কোনো প্রশ্ন না করে একটা পরস্য পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিলুম।

ওপরে সেই অশ্ব বৃন্দ তখনো তারপরে খেদাকে আবেদন জানাচ্ছে, ব্যক্তিধারা সামনে চলেছে; মেঘমন্ডিত স্মৃতিমিত সূর্যালোক আমার চারদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চলে গিয়েছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে গেল। তারপরে হঠাৎ ব্যক্তি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অশ্ব বৃন্দের হাতে পরস্যাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। মনে হোতে লাগল, ঐ মেয়েটা বোধ হয় ঐ বাড়িরই কেউ হবে, চারদিক থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে এসে বাড়ির কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়িটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে চুকেছে—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ব্যক্তি সামনে চলেছে। ওর মধ্যে কখনো চেপে আসে কখনো বা প্রায় খেমে যায়। মধ্যে হোয়ে এলেও মধ্যে কেটে যাওয়ায় কখনো একটু আলো আছে। বাস্তব ভিত্তির চীৎকার একটু মন্দা পড়ছে, বোধ হয় সারাদিন চোঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম একটি স্ত্রীলোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজার ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বসল। চারদিকের মতন কোনো আর রোগা, দগ্ধপন সাদা একখানা চওড়া শাড়ি পরা চুল বাঁধার বাঁধার দেখেই বুঝতে পারলুম কে সে কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বসল। আমি যে বাড়িটার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখলুম সেখানকার বজাতেও দু-চার জন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছিল। অশ্বকার ঘোর ঘোর আগ্নেই তারা বেসানি বুকে বসল দেখলুম ওপরের সেই অশ্ব বৃন্দও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ছুঁতে ঠুকেতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেন তা যেতেই দেখলুম আমার সেই দরমায়ী ভিত্তিয়ারণী পরিষ্কার কাপড় পরে সেই দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ব্যক্তিও একবারে থ থ মেরে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যারা চোখ দিয়ে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতিসাধারণ হয়ে ওঠে, তবুও এই ভিত্তিয়ারণীর ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আমি স্থির করলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খলে নিড়ে কাঁধে ফেলেছিলাম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হোয়ে ভিত্তিয়ারণীর কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে একবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাবও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দোষ না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অনাট পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম তোমার নাম কি?

—আদরিণী, আদরিণী বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিটমারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পল্টেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রশ্ন শুনেই আদরিণী হাসতে আরম্ভ করে দিলে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে—আঁহা কত চমকেই জান! আজ কি নেশা করা হয়েছে শূনি?

এই বলেই সে ভিজ্জে জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বললে—দাঁড়াও উল্লসের ঘরে এটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আমি—একদৃষ্ট

শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কি জানি বেপোটা জায়গায় এসে আজ জামাটাই দ্বিধা আক্কেল সেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখনই সে ফিরে এসে বললে—একদৃষ্ট শুকিয়ে যাবে।

তারপরে আমার ধৃতিতাতে হাত দিয়ে বললে—এঃ ধৃতিও যে ভিজ্জে গিয়েছে। একখানা শাড়ি পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ি নিয়ে এসে বললে—নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ধৃতিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বললুম—ও এখানি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হোয়ে বোসো তো, তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি!

শাড়িখানা ছুড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না?

—তুমি তো মেডের ঐ বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে ধৃতিখনার এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না—বললুম—ছেলেবেলা থেকে বাঁশের সংগ ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজ এসেছি। গোটাকতক কথা ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোন মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দোষ ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমার চোখে গা ঘেঁষে বসেছিল, বেশ বুঝতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি কি পল্লিশের লোক? বাবা আমি কোনো দোষ করি নি, আমার ওপর কোনো অভ্যাস করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষে করুন।

এই বলে সে আমার পা দুটো চেপে ধরল।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কেন সে আদরিণী অত্যাধি বাড়িবাড়ি করলে, তা বুঝতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সাশ্রনা দিয়ে বললুম—আমি মোটেই পল্লিশের লোক নই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড় ভাল মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচয় পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরল। বললে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললে—বাবার বয়েস কত? —তেইশ বছর।

আদরিণী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—বেশা হোসা—বাপ আর মেয়ে একই বয়সী। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে কণ্ঠস্বর দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মস্করা হচ্ছে! কে এসেছে?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে উঠল—তোমার বর এসেছে। রাস্তা থেকে তোমার বর নিয়ে এয়েচি—আর না ভেতরে।

দরজা খাড়া দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে

শারদোৎসবে

ছেলেমেয়েদের সন্তুষ্ট করিতে
বড়ুয়া কেক, পাউরুটী
ও বিস্কুটই
শ্রেষ্ঠ।



দেখিয়া লইবেন।

বড়ুয়া বেকারী

অফিস ও ফ্যাক্টরী:

১২৩নং ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা।

এ

ই ক্রমোন্নতি ও তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে যদি কৃতকার্য হইতে চান, তবে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে হইবে, হেলাছলে করিলে চলিবে না। আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট হইতে হইবে। বিজয়মালা একমাত্র কৃতীরই প্রাপ্য। উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে হইলে আপনাকে সাধারণের উপরে উঠিতে হইবে। সেইরূপ এই ব্যাংকও ইহার অত্যুৎকৃষ্ট কর্মক্ষমতা, পরিচালনা সম্পর্কে নিজস্ব নীতি এবং পুণ্ড্রপোষক-বর্গের সাহিত সৌহার্দপূর্ণ আচরণ দ্বারা সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে।

ব্যাংক অব্ কমাস লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

১২নং ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহঃ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর,
বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর ও ঢাকা।



কুসুমপেলব কুন্তলরাজি। আপনার সৌন্দর্য
বৃদ্ধি ও অক্ষয় রাখার জন্য অবশ্যই কিনিতে
চলিবেন না—

কামিনীয়া অয়েল

(রোজিঃ)

খাঁটি বনজ গাছগাছড়া সহযোগে প্রস্তুতবিধায়
উহা সর্বপ্রকার শিরঃরোগের মহৌষধ। ইহা
কেশমূলের পুষ্টিসাধন করে, চুলপড়া বন্ধ
করে এবং উহার সুদৃষ্ট গন্ধে মন প্রফুল্ল
পাকে।

নারী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ গৌর

কামিনীয়া অয়েল

ইহা অত্যুৎকৃষ্টবিধায় দেশের সর্বত্র সমাদৃত,
শত শত প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট অব্
মেরিটস্ এবং স্বর্ণপদকাদি পাইয়াছে।



সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে গ্রীণ— অটো দিলবাহার

উহা একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়াই
পৃথিবীর সর্বত্র উহা সমাদৃত হইতেছে।
আপনার রুমালে মাত্র কয়েক ফোটা দিলেই
ভেইজীং জুইফলের স্থায়ী গন্ধে আপনার
মন-প্রাণ মাতোয়ারা হইবে। চারি আনার ডাক-
টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান
হয়।

কামিনীয়া স্নো

সুসমামণ্ডিত মুখশ্রী

লাভ করা যায় একমাত্র
স্বকের যথাযথ যত্ন দ্বারা

ভারতবর্ষে সকলেরই মুখমণ্ডলকে তীক্ষ্ণ
রোদ্র, ধূলিবাণ, উত্তপ্ত বায়ু, প্রচণ্ড বাতাস
ইত্যাদির সম্মুখীন হইতে হয়, এজন্যই স্বকের
যত্ন লওয়া অত্যাবশ্যক। কামিনীয়া স্নো
রোদ্রদংশ স্বক, রূপ, মেচেতা ও অন্যান্য সর্ব-
প্রকার স্বকের সৌন্দর্যনাশক উপসর্গাদি দূরে
করিতে অস্বীকার্য। আপনার স্বকের সৌন্দর্য



নিখুঁত রাখিতে
হইলে, বাহির
হওয়ার পূর্বে
ও বাহির হইতে
আসিয়া কয়েক-
বার উহা
মাশিশ করা
উচিত।

সর্বত্র পাওয়া
যায়।

সোল এজেন্টস্—

এংলো-ইন্ডিয়ান ড্রাগ এন্ড কেমিক্যাল কোং, বোম্বাই ২।

হালো দীনবন্ধু! মিস্ত্রের 'জগদম্বা' বুঝি নাটক থেকে উঠে
এল।

আদরিণী বলে—দেখ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে
এসেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয়?

—মধ্যে আগুন! দিনে দিনে কত রঙই হচ্ছে! নে নে
আনখোতা রেখে শীগগির কর। আবার লোক আসবে—
এই বলে স্বামীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে
বাকলুম।

আদরিণী হাসত হাসতে বলে—কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে
আমার মাকে?

জিজ্ঞাসা করলুম—উটি কি তোমার মা নাকি?

আদরিণী অন্যদিকে মূখ্য করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর
থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল।

বেলুন আমার ধপধপে

মাদা সিল্ক টাইলের

সাঁট ধোয়ায় প্রায় কাল

হয়ে গিয়েছে আর তা

থেকে মাছের খোল আর

ধোয়ায় মিলিয়ে এমন

একটা বিকট গন্ধ

বেরুচ্ছে যে, গায়ে

দেওয়া দূরের কথা,

চোঁকে কাছে রাখলে

বমি তৈলে আসে।

জামাটাকে গুঁড়ি রে

পাশে রেখে বসলুম—

চিসিকতা তো খুব

হোলো, এবার আমার

কথার জবাব দাও

দিকন।

—কি বল?

—আমার কাছ থেকে

একটা পরসা চেয়ে নিয়ে

ঐ যে অম্ব বুড়োটাকে

দিলে, ও তোমার কে

হয়?

আদরিণী কি ছু ফণ

অবাক হয়ে আমার

মুখের দিকে চেয়ে

থেকে বলে—ও তুমিই

বুঝি এখানে দাঁড়িয়েছিলে! এতক্ষণে

বুঝিছ!

—কে হয় ও বুড়োটা তোমার?

—কে আবার হবে! ও তো মোচোলমান।

—তবে?

আদরিণী কোনো কথা বলে না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে

বসে রইল।

বলুন—তোমার তো অভাব কিছুই দেখছি না, তবে তুমি

ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন? আর কার জন্যেই বা কর?

আদরিণী চট করে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের

দিকে কি দেখে ফিরে এসে বলে—বাবা, আজ তুমি বাড়ী যাও, বস

দেঁরি হয়ে গিয়েছে—বলুন—তোমাকে আমার সব কথা বলুন, কিন্তু

আজ নয়—কবে আসবে বল?

—আবার আসতে হবে?

—নিশ্চয় আসতে হবে। জুলা না, আমি তোমার মেয়ে।

তোমরা কি জাত?

—জাতটাত আমি জানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের
রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

—কি গোস্তর?

—ভরম্বাজ।

—তোমার ভরম্বাজের দিবা রইল—পরশ এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাকুড়ার কোন এক গ্রামে
তাদের বাড়ি ছিল। কলকাতায় সে রসুইয়ে বামনের কাজ করত।
লোকের বাড়ি পূজো ও বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে কাজ করে সে বেশ
দু-পরসা উপার্জন করত। পরিবার থাকত দেশে, কিন্তু আদরিণীর
যখন সাত বছর বয়স, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতার
নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুলে। বছরখানেক যেতে না যেতে তার এক
ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সপ্তে আগে
থাকতেই বাড়িটির প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলাখুলিভাবেই
ঐ মেয়েমানুষটির সপ্তে ঘর করতে লাগল। আট বছরের আদরিণী



অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বলে—বাবা তোমাকে একটা কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বাড়ি ছেড়ে দিতে চাই।

কাজ করতে, আর বাড়ি ফিরত রাতি দশটা এগারোটার সময়—সেখানেই
দু-বেলা খেতে পেত। দু-টাকা তার মাইনে ছিল বটে; কিন্তু সে
টাকা সে পেত না। তার নতুন মা ঠিক সময়ে গিয়ে বাবুদের কাছে
গিয়ে তার মাইনেটা নিয়ে আসত—ছেলেমানুষ হারিয়ে ফেলতে
পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বালিক মনের
অভিমান। নন্দর জামা-কাপড় কোনো কিছুই খরচই নতুন মা দেয়
না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বাবুদের বাড়ি থেকে নন্দকে
নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষা করতে। দু-চার পরসা যা পায়,
তাই জমিয়ে জমিয়ে ভাইকে জামা-কাপড় কিনে দেয়। মমো মমো
বাবুদের বাড়ির ছোট ছেলেরদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসে
সমসার পাতবে, দাঁদর দুঃখ খোঁচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সূখ।
এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করে। আরও কষ্ট
সহ্য করতে রাজী।

ম্যালেরিয়া ও সর্বজনীন মাত্র ৩ মাত্রায় বন্ধ হইবেই

কুইনাইনের সমতুল্য প্রচণ্ড শক্তিশালী
ক্যালিসিয়ামযুক্ত নতুন রক্ত কণিকা
উৎপাদক, আয়ুর্বেদীয় ভেষজসংযোগে
বহু গবেষণায় প্রস্তুত — সুপরিষ্কৃত
জরের যম—“জ্বরকরঞ্জ”—গভঃ রেজিঃ

ইহা সেবনে নতুন পুরাতন ম্যালেরিয়া,
পালাজ্জ্বর, লিভারপ্লীহাসংযুক্ত ঘস-
ঘসে জ্বর ইত্যাদি মাত্র ৩/৪ মাত্রায় বন্ধ
হইয়া ১ শিশিতে নিদোষ আরোগ্য
হইবে। জীর্ণশীর্ণ পেট মোটা
শিশুদের ক্রিমি, লিভারপ্লীহা
সংযুক্ত ঘস-ঘসে জ্বর আরোগ্য হইয়া
দেহ সতেজ ও ওজন বৃদ্ধি পাইবে।
মূল্যাদিঃ—২০ পিল পূর্ব শিশি ১০,
৬ শিশি ৪৫০, ১৮ শিশি ১৩০০,
অগ্রিম টাকা পাঠাইলে মাল্য লাগে না।

বিনামূল্যে

১ শিশি “জ্বরকরঞ্জ” এজেন্সী গ্রহণেচ্ছ
চিকিৎসক ও ঔষধ বিক্রেতাগণকে ডাক-
খরচাদি ১ পাঠাইলেই প্রেরিত হইবে।
পরীক্ষান্তে অব্যর্থ প্রমাণে এজেন্সী
লউন। মফঃস্বলস্থ চিকিৎসক মহো-
দয়গণ “জ্বরকরঞ্জ” ব্যবহার করিলে
চিকিৎসার সুসময় বৃদ্ধি পাইবে।

লিখন—

বহু বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ ম্যালেরিয়া চিকিৎসক

বৈদ্যরাজ এস্. ভিষ্ণু রত্ন,

অধ্যক্ষঃ—মেথায়ন লেবরেটরী

১৩, বারানসী বোম্ব ২য় লেন, কলিঃ ও সর্বত্র প্রাপ্তব্য

ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি
নির্ভর করে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-
গুলির আর্থিক সাহায্যের উপর—

ভারতীয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির
অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

বাণিজ্য
ব্যাঙ্কিং কার্য
করা হয়।

হেড অফিস

২১-এ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা অফিসঃ—

ঢাকুরিয়া, দক্ষিণ কলিকাতা,

ওরঙ্গাবাদ, জগদীপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ ডি, এন্, চাটার্জী বি, এ

CORRUGNATE

THE KING OF
ANTI-CORROSIVE PAINTS
USED ALL OVER INDIA
SINCE 1898

The STANDARD PAINT WORKS LTD.
PAINT HOUSE 44, BEADON ROW, CALCUTTA

নন্দর ছ-বছর বয়স হোলে। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইস্কুলে পাঠাবে। তার জামা-কাপড়, ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছই দিতে চায় না। নন্দকে ইস্কুলে পাঠাবার জন্য বেশী জেদাজেদ আরম্ভ করায় নতুন মা বলে—জামি এত পরমা কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার তুই পরমা রোজগার করে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দর সঙ্গে সঙ্গে তারও বয়স বেড়েছে—বিনা সুপারিসে সে নিজেই পরমা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মতন করে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশাবশিষ্ট তো দূরের কথা, প্রাপ্ত পৰ্ব্বান্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজেগুজে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়। আর তারই খরচ জোগাবার জন্য আদরিণী সেখানে সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রতি রাতে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে—তোদের মানুষ করবার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা উঠে গেলে তোর পরমা। তুই রাখিস—তার আগে একটি পরমাও পাবি নে।

আদরিণীর কোনো দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে করে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোনো কষ্টই কম নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেলে নন্দ আর ইস্কুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে সিঁদ্বি বাড়ি খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—ইস্কুলের মাইনে এতই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেলে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন করিস নি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হোলে আমার দুঃখ ঘুচেবে।

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার ভাল লাগে না, লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মা-ও তার সঙ্গে সায় দিলে। বজ্র—এতগুলাে করে টাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—খদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায় দায় হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি আসে না। বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ি আসে—চুল উসেকাখসেকা, চোখ রাঙা।

নতুন মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোর আর খেতে দিতে পারব না—বোরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

আদরিণী তাকে বোঝায়, নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সম্মান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা করে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কি নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন-মা তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিলে। আদরিণী তাকে কত মানা করলে। বজ্র—বাস্দ্মি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কি বইল। দুদিন থাক, দেনাটা শোধ হোয়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব।

নন্দ শুনলে না, চলে গেল।

আদরিণীর সংসার শূন্য হোয়ে গেল। ভাইকে মানুষ করে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পরমা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে কোরে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল, এই তার লক্ষ্য ছিল। এই জন্য ভেবে। বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালা মেঘ এসে তার মানস-উদ্যান ছেয়ে ফেলে, তার জীবন অন্ধকার হোয়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচেছিল সে-ই অতি রুঢ় আঘাত দিয়ে তার সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুদ্ধ চুল, মনে হয় কতদিন নাওয়া-

খাওয়া হয় নি। সে পরমা চায়। কিন্তু আদরিণী পরমা কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেঁচে লাগল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু-তিন ঘুরে বেশ রোজগার হোতে লাগল। ভিক্ষার পরমা জমিয়ে জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার তার মনে রঙীন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে—তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময়ে আদরিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিনে নয়, তার ঘরে চৌদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু দেখে কিছু শুনে একটু একটু করে জানতে পারলাম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন-যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়দায় কাজকর্ম করে অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাহিরের সংসারের সঙ্গে স্পর্শ চলেছে। যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানস জীবন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোনো সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরূচি ও কল্পনা দিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি করে সেখানে বাস করে। হয়ত বাস্তব জীবনে সে রাস্তায় মূটে, মানস জীবনে সে বিস্তার রাজ্য। এই কর্মজীবনের সঙ্গে মানস জীবনের যে যত বেশী আপোষ করতে পারে সেই তত বেশী কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তব জীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবনী হোলেও আমি দেখতে পেতুম মানস জীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বৃহৎ সংসারের কঠী সে সেখানে—স্বামী, পুত্র পরিজন ও আশ্রিতজন ভরা তার গৃহ। বাস্তব জীবনে সে নিঃশব্দ কিন্তু মানস জীবনে তার দান ধানের অস্ত নাই—দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরম-কারুণিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাতি স্পিপ্রহর অবধি দেহ বিজ্ঞর করা তার উপজীবিকা কিন্তু মনে হয় সে সার্বভৌম। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বলে—বাবা আমি আর সহ্য করতে পারছি নে। যে ভাইকে মানুষ করবার জন্য স্নেহচ্ছয় এই বর্ষিত বরণ করেছিলুম সে তো বদমাইস হোয়ে গেল। আর কেন! তুমি আমার নিয়ে চল তোমার বাড়িতে।

বল্লম—আমার বাড়িতে গিয়ে কি করবে? সে বলে—তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কিয়ের কাজ করব। আমায় মাইনে দিতে হবে না—দুবেলা দুটী খেতে দেবে।

সমানবয়সী মেয়ে নিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হোলে আমার পিতৃদেহে সে কেউ বিশ্বাস করবে না সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সংকোচ হোলে। বল্লম—আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে দেখব।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠানে একটা ছোড়া দাঁড়িয়ে আছে আর সে তার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোড়াটা চলে গেল। দেখলুম আদরিণীর ডানদিকের ভুরুর পাশে রগটা একটু ফোলা আর তার চারিদিকে অনেকখানি জায়গা কাল্‌শিরে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে, কি করে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বলে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা করে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিন দশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ

ষষ্ঠীর দিনে —



দুর্গাপূজার প্রারম্ভে, ষষ্ঠীর দিনে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে মায়াদের উপবাস করা হিন্দুর প্রচলিত রীতি। কিন্তু মায়াদের জানা উচিত, কেবল উপবাসে বিশেষ কিছু লাভ হয় না, কেননা “স্বর্গের করুণা শূন্য তাঁরই মেলে যিনি নিজেও চেষ্টা করেন।” ষষ্ঠীর দিনে তাই সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা আর একটু ভেবে দেখতে হবে। শিশুর স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে খাদ্যের উপর। শিশুর পক্ষে কোন খাদ্য শ্রেষ্ঠ? মাতৃদুগ্ধ?—কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির আশ্রয় ব্যবস্থা। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে তার জন্যে সব চেয়ে উপযোগী খাদ্য

বর্তমান। কিন্তু কোন কারণে যদি স্তন্যদান সম্ভব না হয়? তাহলে? গরুর দুগ্ধ? কখনো না। শিশুর পক্ষে গরুর দুগ্ধ বড় বেশী গুরুপাক, সেজন্যে বমি, যকৃৎপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি জন্মায়। ডাক্তাররা তাই মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ গৃহযুক্ত গুড়া দুগ্ধ (Humanised Dried Milk) দিতে বলেন। আবার তা কিন্তু টাটকা হওয়া চাই। বিদেশী দুগ্ধ এদেশে আমদানী হতে যে সময় নেয়, তারই মধ্যে বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। অপর পক্ষে ভিটামিনিক পাওয়া যায় টাটকা তাজা অবস্থাতেই।



ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস লিমিটেড, কলিকাতা

মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকার দৃশ্যে বেলা ভিকার বেহুতে পারে নি। নন্দ সে কথা মানলে না। শেষকালে রোগে গিয়ে সে তাকে মেয়ে অজ্ঞান করে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে—একি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলব না তো আর কি বলব!

সেদিন সে আশ্চর্য রকমে গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার কি হোলো একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশংকা করছিলাম এবার বোধ হয় সে কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বললে—বাবা তোমাকে একটা কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

খুব ভাল। কি করবে?

—আমি বিয়ে করে চলে যাব এখন থেকে।

সে তো ভাল কথা। কাকে বিয়ে করবে?

—হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বল্লভ—সম্প্রদান করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

—ঐ যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

ও কাদের ছেলে?

হাড়ীদের! ! !

আদরিণীদের বস্তির একটু দূরেই একটা বড় মাঠ পড়েছিল। বড় মানে শহরের হিসাবে বড়। এই মাঠের একদিকে কয়েকখর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড় বড় চোটেই পেতে টিকে দিত এই জন্য এই মাঠকে ও অঞ্চলের লোকেরা টিকে পাড়ার মাঠ বলত। সে সময় কলকাতার অনেক যায়গায় এই রকম টিকেপাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকেপাড়ার মাঠের আর এককোণে ছিল ত্রিশ পরশিষ ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শূরোর পুষত আর সেই শূরোরের দল মাঝে মাঝে বোরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চোটেইয়ের আশ শুকনো টিকে চটকে দিত বলে টিকেওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

হাড়ীদের মধ্যেও বড়লোক, মেজেলোক ও ছোটলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়লোকের মেয়েরা মেথরাণীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেড়া জামাকাপড়ের বন্দলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুঞ্জো-পার্বণে লোকের বাড়ীতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চাঁচাচার দিয়ে ঝড়ি, চোটেই, দমি ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড় বড় পুতুল তৈরী করত। মেজেলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ী মেথরাণীর কাজ কন্ন আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটলোকদের স্ত্রীপুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে। তাদের বাড়ীর কেউ মেথর মেথরাণীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মার নাম ছিল নিস্তারিণী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাদ করত। এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হতো। এই মেয়েশুলী তাকে নিস্তার মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলাম—ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়িতে কতগুলো খালিঘর ছিল। সেগুলোকে সে ষষ্ঠী হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে কলা হোজে খোজে আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন বিলকুলা। কুঠির

যে কোনো স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টার দু-আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোন্ডের কথা তখনকার দিনের গৃহীলোক মাঠেরই জানা ছিল।

হাড়িপাড়ার মেয়েদের দেহসৌন্দর্যের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দুপাড়ির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে বসতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেককেই ফাদার নিস্তারের খোন্ডেতে দেখা যেত। মাঝে মাঝে সেখানে শাশুড়ী বোয়ে, মায়ে বিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি হোয়ে গিয়ে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হতো। এইখানকারই এক বয়স্কা হাড়ী গিন্নীর সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোন্ডেতে আসত মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোকটি খোন্ডেতে আসত তার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাখে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে দু-দিকে ঘোঁটা বাঁধিয়ে তুলে। এই ঘোঁটা যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভাল লাগল না। বিয়েতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগল।

আদরিণী আমায় বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা তুমি কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে করে কি তার চেয়ে ভাল থাকবে?

আদরিণী বললে—এখন আমি কিছুই ভাল নেই, বিয়ে করলে হয়ত এর চেয়ে ভাল থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলাম, নইলে লোকের বাড়ি গতির খেটে আমার ভাত-কাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়ত একটা ভাল লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুম সে হোলো একটা অমানুষ—আমার দুঃখ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বললুম—আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার কন্ডেবস্ত করি দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোনো একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভুললোককে বিয়ে করবে—না হয় এমনই ভুলভাবে থাকবে—এমন তো অনেক মেয়ে আছে।

আমার কথা শুনে আদরিণীর মুখখানা খুঁশিতে ভরে উঠল। সে বললে—আমার লেখাপড়া হবে বাবা? বয়েস যে অনেক হয়েছে গিয়েছে তোমার মেয়ের!

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি? মন দিলে সব বয়সেই লেখাপড়া শেখা যায়।

—সেই ভাল বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর—বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতে। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষায়ত্নীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের টাকাকড়ি কিছু ছিল না, চারদিক থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরব্বী ছিলেন। আশ্রম অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে করেকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হতো। আমি সাহস করে একদিন আশ্রমের কঠী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বললুম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চোপে গিয়েছিলুম। তার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার মিলিয়ে বেশ একটি কল্প কাহিনী রচনা করে তাঁকে শোনালুম।

এইট ও ক্লক শেভিং ব্রাশই লইবেন

ইহা ব্যবহারে রণ, ফদুকুড়ি
প্রভৃতি হয় না

এই শেভিংস ব্রাশের ক্যাঁচগুলি রবার-
যোগে মজুত করিয়া দৃঢ়রূপে বসানো।
খুব স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় এবং দক্ষ
কোয়ালিটি ও চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে
ইহা প্রস্তুত।

সর্বতোভাবেই নিরাপদ

দি

ভেনাস এণ্ড কোং

কালীঘাট, কলিকাতা।

১২১/১/১, মনোহরপুর রোড।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৬৭নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম-বিশ্বজ্যোতিষ

স্থাপিত-১৯৩৩

ফোন-পি কে ৩০২০ ও ১৯৬

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০, টাকা
বিক্রয়ার্থ	"	১০,০০,০০০, "
বিক্রীত	"	৯,৫৫,৩০০, "
আদায়ীকৃত	"	৫,৫৬,০১০, "

কেবলমাত্র স্থায়ী আমানতই গ্রহণ করা হয়। স্থায়ী আমানতের
সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়। সুদ গ্রেমারিসক দেয়।

জমি বিক্রয় :

কলিকাতার দক্ষিণাংশে বিভিন্ন মূল্যের জমি বিক্রয় আছে।

গভীর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার

কুইন'টন, এমিটিন
প্লাস্টিক, ক্যা-ল-
সিয়াম উইথ লিভার
এক স্ট্রো ক্যা-ল-
প্রভৃতির এমপাল
ও নানা প্রকার
ট্যাবলেট প্রস্তুত-
কারক।

কুইনোব্রিন ম্যালেরিয়ায়
ব্যবহৃত ফলপ্রসূ
গ্যাস্মনলে অল্পও অজীর্ণতা
নাশ করে-
বোটোন দুর্বলজন্য শক
ম্যাক্সিমাম টিক

বহুবিধ নিরাপদ ও
এলোপ্যাথিক ঔষধ
এবং পেটেন্ট ঔষধ
প্রস্তুতকারক। বিস্তা-
রিত বিবরণের জন্য
পত্র লিখুন।



এমিয়ার্টিক ড্রাগ হাউস

কলিকাতা

সব শূন্যে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—তার সংগে আমার কি সম্বন্ধ? কেথায় আলাপ হোলো?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টাটুকু জেরা করে তিনি আমায় বললেন—আপাততঃ প্রবন্ধ ফণ্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শূন্য তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ভারকামী নুতনী আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী— এই শব্দ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়িতে জার্নিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সংগে একই সরকারী দপ্তরে এক ভদ্রলোক কারি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিমিত। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বাবাও মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতেন। কলকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ শিশু বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কি করে একটা আশ্রম খালা যায়, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হোতা। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ির কাছেই সম্ভার একখানা ভাড়া বাড়ি গড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি গড় সুরুর করে দিলেন। সম্ভার সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড় একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি দুর্গিষ্ট ভিক্ষায় বসতেন। বেশ প্রায় বারোটা নাগাদ আধ মণটক চাল ও কিছু প্রকার নিয়ে বাড়ি ফিরে রাস্তা চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোলো। সাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি সৈদিকে আকৃষ্ট হোলো—দেশজোড়া তাঁর নামডাক হোলো, তাঁর মনসকামনা সিদ্ধ হোলো। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ আছে। বৃন্দবনসে বদনামের শব্দ মাথায় নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে যেতে হোলো।

সে কথা থাক, আমি একদিন সম্ভার সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে দুঃখের কাহিনী আমি তাঁর করেছিলুম, তা শুন্যে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। কি করে তার সংগে আমার পরিচয় হোলো, তার সংগে আমার কি সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোনো প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন—দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোনো মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তুমি ছেলেমানুষ তখন আমার চম্বিশ বছর বয়স, এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই বলে, ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠেই তিনি বলেন—তাইত হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? তুমি যে রকম বললে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভাল আশ্রয় না পায় তা হোলো বিপথগামিনী হোতে পারে।

—অজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে! তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরেও এসেছে। তার ভালমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ হোতে হোতে পারছি না। কি বল?

আমি আর কি বলব। চূপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বলেন—এক কাজ করা যাক। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপাততঃ তাকে আমার ভাই কিংবা বেনের বাড়িতে রেখে-দেব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ডগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বললুম—তোমার সব ব্যবস্থা

ঠিক করে ফেলেছি। ভাল গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—থবে ভাল লোক তুরা।

আদরিণী একেবারে লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি আমার সত্যিকার বাবা। গেল জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম, ফাদার নিস্তার এ কয়দিন উঠতে বলতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাঁকে সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে, কিন্তু হেমাঁ কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বলে—আহা আমি চলে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে—বড় ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড় গড় করে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। আমি বললুম—আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কি নেবার গুছিয়ে নাও—এইবেলা বেরিয়ে পড়।

আদরিণী বলে—এখনকার কোনো জিনিস নেব না বাবা—এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকবে না। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। এতদিন আমার জীবন যেভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়। এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই—কেউ কোনদিন ছিল না। আমি যেন একদল জন্মিয়েছি—যারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বললুম—তবুও একটা দুটো শাড়ি-গামছা ইত্যাদি নাও, কি জানি সেখানে গিয়ে তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজী হয়ে আদরিণী আলমারি থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পেটীলা বাঁধতে বাঁধতে সে বলে—এবার বাবা আমি মস্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু—

বললুম—বেশ!

আদরিণী জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত তারা?

—কারা?

—যেখানে যাছি।

—তারা ক্রীশ্চান, জাতটুকু মানে না।

—এঁরা! ক্রীশ্চান! গরু খায়?

আদরিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পেটীলাটাকে তাচ্ছিল্যের সংগে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বললুম—ক্রীশ্চান হোলেই কি গরু খেতে হবে নাকি? তারা বোধ হয় মাছ-মাংসও খায় না।

আদরিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কঠিন সুরে বলে—না বাবা, জীবন ভোর অনেক পাপ করেছে, আর ক্রীশ্চানের অন্ন খাব না। বরং তা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে আমি।

কথাগুলো শুন্যে আমার রাগ হোলো। প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের কাছে দেহ বিক্রী করে যে হিন্দু অন্ধ থাকে, ক্রীশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দু যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সেকথা মানতে রাজী হোলো না। শেষকালে সে কান্দতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাজাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এর মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি হোলো? দিনরাত অমন করে মরজ কেন?

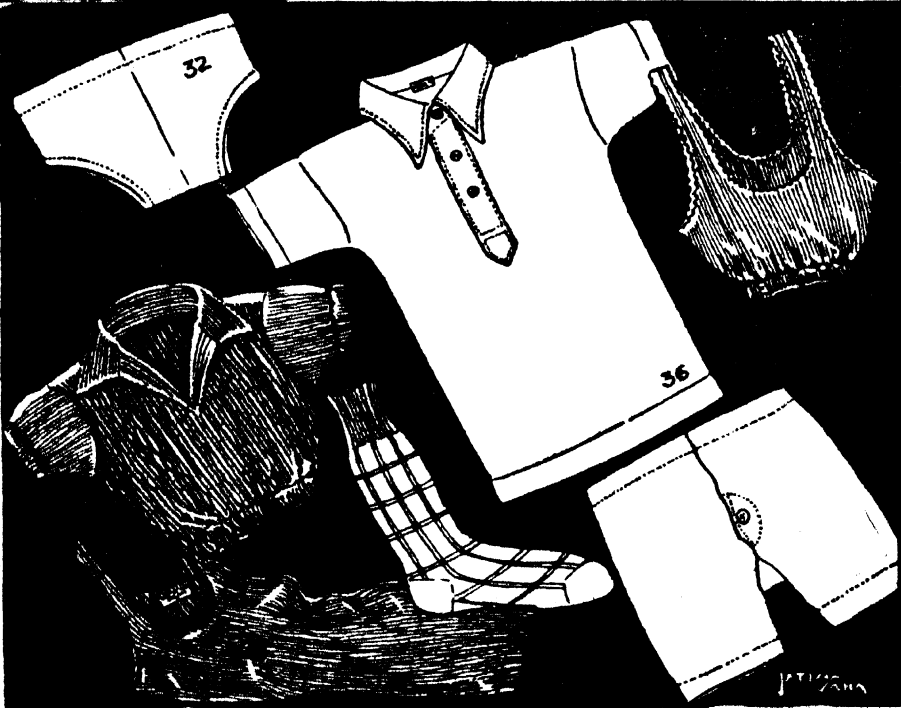
আদরিণী কিছু না বলে নীরবে কান্দতে লাগল। নিস্তারিণী আমার দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁ গা ভালমানুষের বাছা! ওর মাথায় এ সব কি বৃন্দ পিছ? এতে কি তোমার ভাল হবে, না ওরই ভাল হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচনাচি সুরু করছে—বলি কেন? কিসের জন্য শূন্য?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?



ব্যবহারে

উৎকর্ষে—



মিলান এণ্ড কোম্পানী

সর্বোত্তম বোম্বাইয়ী প্রদত্ত প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক

১০৯-১১০ খোংরা পট্টী স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৪০৭৩

টেলিগ্রাম—MILCOHOSRY, Cal.

—বলে চলে যাব, বিয়ে করব—নেথাপড়া শিখব। যা দিকিন্,

হুই—

আদরিণী এবার গজ্ঞে উঠল—আলবৎ স্বাধ।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহবিহ্বলে আদরিণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে প্ররম্ভ করলে। আদরিণী কোনো বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগল—মার মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে ব্যব।

ফাদার নিস্তারের চীৎকারে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদরিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটা ঘটি টেনে নিয়ে তাই দিয়ে আদরিণীর মাথা ও মুখ বেংলাতে আরম্ভ করে দিলে।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে কেঁদে। বাড়ির মধ্যে তখন বাইরেরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে জমা হয়েছে, তারা সকলেই পাড়ায় লোক, সকলেই আংরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত নিস্তারিণী গজ্ঞে উঠল—ভাল হবে না বলছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়িউলি—আমায় চেনো না?

আমার মাথার তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলাম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বললাম—আমি একে পুলিশে দোব—তোমরা সবাই দেখেছ, এ আংরীকে কি রকম মেরেছে।

পুলিশের নাম শুনেই ভিড়ের পুরুষ দশকরা একে একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদের পাড়ার এক পাল স্ত্রী-পুরুষ দোড়ো বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কে কাকে মেরে! আংরী—আংরী কোথায়?

একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক করে দাওয়ার উঠে ঘরের মধ্যে উর্কি দিয়ে আদরিণীকে দেখে বলল—ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে! কে মেরে? বল কে মেরে?

আদরিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা। এ ওর মূখর দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটি ফাটি করছে, এমন সময় হেমা বলল—চ আংরী আমাদের ঘরকে চ—কাল লগননা আছে—

আদরিণী মাটি থেকে উঠে টলতে টলতে বলল—চ।

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপায়ের মতন ভোস্ ভোস্ করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম করে কিছু ক্রান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদরিণীকে অগ্রসর হোতে দেখে সে গজ্ঞে উঠে বলল—খবদার আংরী, বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ কি

খসে করে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হোতে না হোতে আদরিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া উপরে একেবারে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাদি নং। দুই কাণের ওপর থেকে ডিম অবধি সারি করে মাকড়ী—এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নং ও এক কাণের দু-তিনটে মাকড়ী ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তাক্ত ছুটেতে লাগল।

—ওয়ে বাবা, এত রক্ত—বলে নিস্তারিণী ভেঁা ঘুরে মাটিতে পড়ল, ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আদরিণীর মাথায় যেন খুস চেপে গেল। সে তারই ওপরে তার পেটে দমামদম লাথি মারতে আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ির অন্য মেয়েরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগল। আদরিণীকে গিয়ে ধরব না শ্লাঘন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিরে তাকে ধরে ফেলল।

আদরিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—চ হেমা।

আমি গুটি গুটি দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলাম। আদরিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বলল—বাবা ব্যক্তি মেরের কীতি দেখে সরে পড়িছিলে?

আমরা রাস্তার বেরিয়ে পড়লাম। মাঠের কাছে পৌঁছে আমি বললাম—আচ্ছা এবার আমি চললাম।

আদরিণী বলল—চলে বাবা! আচ্ছা তাহলে কাল নিশচর এস—কাল আমার বিয়ে।

বললাম—ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু-এক দিনের মধ্যে আসব।

—না না কাল আসতেই হবে।

তারপর একটু হেসে বলল—তোমার ভ্রম্মবাজের দিবা রইল।

তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভ্রম্মবাজের দিবা রাখতে পারি নি। বোধ হয়, সংস্হাখানেক পরে একদিন বিকেলে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলাম তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে করে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হোতে লাগল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই খুশিতে ভগমগ হোয়ে আদরিণী বলল—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি শিচমে। আমাদের দুজনেরই রেলের চাকরি হোচ্ছে—সেখর ও মেথরাণীর কাজ। ও পাশ আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব—



কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত ১৯১৪ ইং

হেড অফিস :---কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস :---৪নং ক্লাইভঘাট স্ট্রট

নিরাপদ সংস্থানার্থ এই ব্যাঙ্ক এক বিশিষ্ট স্থান
অধিকার করিয়াছে।

সারা ভারতে ও ভারতের বাহরে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

মূলধন এবং রিজার্ভ তহবিল

সন	বিক্রয়ীকৃত	আদায়ীকৃত	রিজার্ভ
১৯৪২ ...	৩৯,৩৬,৬০০,	২২,২০,০৫৫,	৯,৪০,০০০,
১৯৪৩ ...	৫৫,৮৬,৮৬০,	৩০,৪৭,৭২১,	১৪,০০,০০০,
১৯৪৪ ...	৮০,০০,০০০,	৪০,০০,০০০,	২০,০০,০০০,

আয়, লাভ এবং গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি

সন	আয়	নীট লাভ	গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি
১৯৪২ ...	১১,৬২,২৮১,	২,১৭,৭৫৫,	১,০৯,৫৩,১০০,
১৯৪৩ ...	১৬,৪৭,৪৫৭,	৩,৬১,২৩৬,	২,০৯,০০,০০০,
১৯৪৪ ...	১০,৮৩,২২৮, (জুন পর্যন্ত)	৩,৭৯,২০৯, (জুন পর্যন্ত)	২,৭৫,০০,০০০, (আগষ্ট পর্যন্ত)

এজেন্সী ও শাখা অফিস সমস্ত পৃথিবীতে

লণ্ডন এজেন্ট :---ওয়েস্টমিনস্টার ব্যাঙ্ক লিঃ

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :---গ্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অস্ট্রেলেশিয়া

এমেরিকান এজেন্ট :---ব্যাঙ্কাস ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এন, টস, দত্ত এম, এল, সি।



রবীন্দ্রনাথের নাট্যনাট

প্রথম নাথ বিলী

যে সব নাটকে আমরা নৃত্যনাট্য বলিতেছি সেগুলি কবির শেষ জীবনে লিখিত। আবার ঋতু নাট্যগুলিও শেষ জীবনের রচনা। স্থলে বিচারে এই দুই শ্রেণীর নাটকে এক জাতীয় মনে হইতে পারে কিন্তু স্ফুট দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। এই দুই শ্রেণীর নাটকেই সংগীত ও নৃত্য প্রদান হইলেও নৃত্যনাট্যে নৃত্যই ভাবের একমাত্র বাহন অর্থাৎ যে কথাটি কবি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নৃত্যের সাহায্য ছাড়া তাহা কখনই সৌভাগ্যে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ, ঋতু নাট্যের নৃত্যকে সম্বলুলের আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য বহুলের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। রাজপুত্রীতে উৎসব, সেই সাধারণ উৎসবের আনন্দকে পুরবাসীরা নাচের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজ সভায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, সেই উৎসবের সমষ্টির উল্লাসকে নর্তকীর দল রূপ দিতেছে।

কিন্তু নৃত্য নাট্যগুলির নৃত্যের সঙ্গে বহুলের মনোভাবের কোন যোগ নাই; তাহা এককের সুখদুঃখকে, এককের আশাআনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে সংগীত যেমন তাহার প্রতিভার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নাট্যপ্রবাহের আলোচনা করিলেও তেমন দেখা যাইবে যে শেষ জীবনের নাটকের মধ্যেও গানের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য দ্বারা কবি তাহার নাট্য জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—ঋতু নাট্য ও নৃত্য নাট্যের গানের দ্বারাই সে জীবনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রথম জীবনের গীতি নাট্যে ও শেষ জীবনের এই শ্রেণীর নাটকে কত প্রভেদ।

ঋতু নাট্যে ও নৃত্য নাট্যে চারিটি বস্তুই সম্মিলন ঘটিয়াছে। কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও চিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় চৈতন্যের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে। এই চারিটির মধ্যে কাব্যের স্বাদ যে-কোন পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই পাইতে পারেন। সুরের স্বাদ পাওয়াও দুর্ব্ভ নয়, স্বরলিপি আছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন; কিন্তু অপর দুটির স্বাদ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাহাদের এই সব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা সেই নৃত্যের ছন্দ সৌন্দর্য জানেন; রঙ্গমঞ্চ সংজ্ঞা আলোক ও বেশভূষায়, অভিনেত্রীদের অঙ্গভঙ্গিতে যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিত তাহা দর্শকের স্মৃতিতে থাকিলেও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেই পরিণত হইয়াছে। সে সব হয়তো আর পুনরুৎপাদন করা যাইবে না, কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই হয়তো তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে তাহার শেষ জীবনের এই দুই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত মহিমা নির্ভর করিতেছে, কাব্য, সুর, নৃত্য ও চিত্রের চতুরঙ্গ রীতির সান্নিধ্য সমাবেশের উপরে। কেবল গ্রন্থের দ্বারা বিচার করিলে ইহার কাব্যংশই প্রকট হইবে অথচ প্রচ্ছন্ন অন্য তিনটি অঙ্গ অন্ততঃ রূপনাতেও না দেখিতে পারিলে ইহাদের প্রতি অবিচার করিবার আশঙ্কাই সমীচীন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরোত্তর তাহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একখানা নাটকে যখন পরবর্তী কালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণ ভেদেও এষ্ট একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একটু,

করিয়া গদ্য বা পাশপাত্রীর উক্তি। গ্রীক নাটকে মূলে যেমন গীতি-সর্বস্ব ছিল, কালক্রমে তাহাতে সংগীতের প্রাধান্য কমিয়া নাটকীয় অংশ বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায়। গদ্য বা পদ্য নাটকীয় উক্তি ক্রমে সংকীর্ণতর হইতে হইতে শেষবয়সে একেবারে সংগীতকে আসর ছাড়িয়া দিয়া তাহারা নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

এমন যে হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। জীবন-পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সংগীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়। সেইজন্য শেষ জীবনে সংগীত তাহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়াও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ামূর্তী বস্তুর প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার মূর্ত্ত প্রকাশের জন্য ততই সুরের সারথ্য অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল সুরও যেন আর তাহাকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে-আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের চন্দ্রমায় ব্যঞ্জনা সেই অনগ্ন আকৃতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নৃত্য নৃত্য বাহনের সম্মান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সম্মানের ফলে তিনি ক্রমে কথা হইতে সুরে, সুর হইতে নৃত্যে, এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে শাপমোচন, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা যথার্থ

পাড়িবার মতন নভেল

শশধর দত্তের	
রক্তাক্ত ধরণী	২১০
স্বর্গাদিপি গরীয়সী	২১
আগুন ও মেয়ে	২১
সব্যসাচারী প্রত্যাভর্তন	২১০
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর	
স্বপ্নের প্রদীপ	২১
নীড় ও বিহঙ্গ	২১
ধূলার ধরণী	২১
চেউয়ের দোলা	২১
মাটির মায়া	১১০
দীপের আলো	১১০
পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের	
পতিতা ধীরতী	১১০
সৌরীন্দ্রমোহন মুনোপাধ্যায়ের	
রাহুগ্রস্ত শশী	২১
নব-নায়িকা	২১
যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের	
সাধের কাজল	২১
পথের বাণী	২১০
জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর	
খেয়ালী তরুণী	১১০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
অপরিচিতা	২১০
মুক্তিমন্ডপ	২১
আশালতা সিংহের	
সহরের মোহ	১১০
শৈলজ্ঞানন্দ মুনোপাধ্যায়ের	
অন্যথ আশ্রম	২১
হোমানল	২১
শৈলবালা ঘোষজ্যার	
বিনির্দয়	১১০
অরু	১১০
গঙ্গাপুত্র	১১০

প্রফুল্লময়ী দেবীর	
চাষা	১১০
পূর্ণিমা	১০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
দেউলিয়ার জমা খরচ	১০
বিরের ফুল (২য় সং)	১১০
প্রোতের ফুল (২য় সং)	২১
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
জীবনের জটিলতা	১১০
ধরাবাঁধা জীবন	১১
অমরেন্দ্রনাথ মুনোপাধ্যায়ের	
বিয়েগাস্ত	১১০
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
পূরনারী	১০
বিদ্যায়ক ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্যের একাঙ্ক নাটক	
পুনর্মুখিকোভব	১০
কেশবচন্দ্র গুপ্তের	
গণ্ডগোল	২১

নবকথা সিরিজ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুনোপাধ্যায় প্রণীত
নতন ধরণের ম্যাড্‌ভেগার

- ১। অর্থমন্ডল
 - ২। আরাধ্যা
 - ৩। ইরাবতী ও উপা
 - ৪। কপা ৭। কবি-মশাই
 - ৫। উপকণ্ঠ ৬। "১"কার
- বিস্ময়কর গ্রন্থ।
অভিনব রচনাকৌশল।
ক্রাইম নভেল নতুনতম
ঘটনার সমাবেশ।
প্রত্যেক উপন্যাস—মূল্য ১১০

রহস্যরোমাঞ্চ ম্যাড্‌ভেগার

সিরিজ

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস
প্রত্যেক উপন্যাসের
মূল্য ১১ টাকা।

- ১। মৃত্যুচক্র (২য় সং)
- ২। রক্ত-পিপাসা ()
- ৩। রহস্য-বিভীষিকা ()
- ৪। গদ্য-চক্রান্ত ()
- ৫। সময়তান-সংগিনী ()
- ৬। রোজার ঘাড়ে বোঝা
- ৭। মৃত্যু-প্রহেলিকা (২য়)
- ৮। মরণের মায়াজাল ()
- ৯। শত্রু-সংঘর্ষ
- ১০। মৃত্যু-বড়লুট
- ১১। খুনের-জের
- ১২। রক্ত-ভান্ডার
- ১৩। মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী
- ১৪। পিশাচ ব্যাধের জাল
- ১৫। চীনা দস্যুর ইন্দ্রজাল (২য় সং)
- ১৬। জীবন্ত-কংকাল
- ১৭। পরীর পাহাড়
- ১৮। দস্যু-মায়াবী
- ১৯। খুনের নেশা
- ২০। রক্ত-লোলুপ
- ২১। মৃত্যুরণ
- ২২। নীল সাগরে রক্ত-লীলা (২য়)
- ২৩। ত্রিমূর্তির চক্রান্ত
- ২৪। ফিশ্ব কলাম (২য় সং)
- ২৫। মৃতের প্রতিশোধ
- ২৬। মরণজয়ী
- ২৭। খুন ডাকাতি গদ্য
- ২৮। পিশাচিনী
- ২৯। দস্যুরাজ

প্রকাশক--ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ৬০নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।



(୧) ନୃତ୍ୟାଳୟ "ସାମା", (୨) ନୃତ୍ୟାଳୟ "ବିଜ୍ଞାନିକା", (୩) ନୃତ୍ୟାଳୟ "ପିତାମହ" ଏବଂ (୪) "ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ"ର ଏକ ଏକାମ୍ର ନୃତ୍ୟ।
 (ସମସ୍ତ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତାବଳୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ।)

নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা। এই নাটকখানিতে নৃত্য যে কেবল প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়—নটীর চরম নৃত্যই ইহার প্রাণবস্তু। ওই নৃত্যটি ছাড়া নাটকের বক্তব্য কিছুতেই প্রকাশ করা যাইত না; নৃত্যটিকে বাদ দিলে নাটক অনার্য্য ধারণ করিবে। নৃত্যই এই পর্যায়ের নাটকের বাহন আগে বলিয়াছি—এবারে তাহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নাটকের সমস্ত গতি গোড়া হইতে এই চরম পারিঘামের দিকে ধাবিত এবং শেষে মুহূর্তে কেবল শ্রীমতী নয় সমগ্র নাটকখানি আত্মসংসর্গের নৃত্যের মধ্য দিয়া শান্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে নটীর পূজার অলোচনার ক্ষেত্র ইহা না হইলেও এখানে এই তথ্যটি উল্লেখ করা আবশ্যিক।

জীবনপরিঘামের সংগে সংগে রবীন্দ্রনাথের শিল্প গতি ও নৃত্যরসের দিকে অধিকতর আগ্রহের সংগে মোড় ঘুরিতেছিল একথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র এই ভিতরের তাগিদেই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে এমন মনে করার কারণ নাই। ভিতরের তাগিদ যতই প্রবল হোক ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যনাট্যের কোন সজীব আদর্শ নাই; যে-নৃত্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের রচিকর নয়, আর কতক তো তাহার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইহা তো কেবল নৃত্য মাত্র নয়, ইহা নৃত্যনাট্য; অর্থাৎ একটা জটিল কাহিনীর আদ্যন্ত হেতুর ব্যঞ্জনা স্বরূপ প্রকাশ। চোখের সম্মুখে এই সজীব আদর্শের অভাবই তাহার প্রতিভাকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে ১৯২৭-এ তিনি জাভা ও বালিশীপ ভ্রমণে যান। সেখানে নৃত্যনাট্য এখনো সজীব। সেই সজীব আদর্শই তাহার প্রতিভার শেষ বাহকে দূর করিয়া দিল। নৃত্যনাট্যের একটা আদর্শ দ্বীপীয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিয়া নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিলেন। এই পর্যায়ের চারখানি নাটকই ১৯২৭-এর অনেক পরে লিখিত।

নটীর পূজা অবশ্য ১৯২৬-এ লিখিত, কিন্তু তাহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয়, যে নৃত্যনাট্য রচনার আকর্ষিত তাহার মনে কাজ করিতেছিল, কিন্তু আদর্শের অভাবেই আকর্ষিত রূপ লাভ করিতে পারিতেছিল না।

এখানে যে-সব পত্র উদ্ধৃত করিতেছি তাহার সমস্তই 'জাভা যাত্রীর পত্র' হইতে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ পত্রই ওদেশের নৃত্যনাট্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে বর্ণিত পারা যায় জাভার এই প্রাণ-বস্তুটিই কবিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই সংগে তাহার অগোচর মনের মধ্যে যেন একটা সজীব নৃত্যনাট্যের আদর্শ গড়িয়া ফুটিতেছিল।

"ওদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসম্ভারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায়, তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায় ফেরায়, যুগ্মে বিগ্রহে, ভালো-বাসার প্রকাশে, এমন কি ভাড়ামতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিক মতো জানে তারা বেশ হয় গম্ভীর ধারাটা ঠিক মতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখেছিলাম। খানিকবাদে শোনা গেল এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।" যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

জাভার নৃত্যঅভিনয় হইতে কবি যে তাহার নৃত্য নাট্যের আদর্শ পাইয়া থাকিলেন—ইহার পরে আর সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু জাভার নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করবার সময়ে তিনি তাহাতে একটি বড় রকমের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। জাভার বাণীহীন নৃত্যের সংগে তিনি বাণীর যোগ করিয়া দিয়াছেন; জাভার যাত্রা ছিল কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সংগীতসনাথ নৃত্যনাট্যিকায় পরিণত হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন "এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।" জাভার "নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে, তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।" আর "বাঙলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসম্ভারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।" জাভার নৃত্যআদর্শের সংগে বাঙলার আত্মপ্রকাশের পন্থা সংগীতের যোগ সাধনই তাহার কৃতিত্ব—এবং সেই জন্যই হয়তো তাহার নৃত্যনাট্য জাভার নৃত্যঅভিনয়ের চেয়ে পুণ্ডিত।

স্বতন্ত্রীয়ত, কবি বলিতেছেন, "এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।" রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে দুটি ধারাই লক্ষিত হয়। 'শাপ মোচনে' ঘটনা নাই বলিলেই হয়, কেবলই বিশুদ্ধ ভাবের আবেগের প্রকাশ—নৃত্যে এবং সংগীতে। কিন্তু চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামাতে ঘটনার ধারা স্ফীত হইলেও তাহা বর্তমান—এবং ঘটনা ও ভাবনা বৃগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে—নৃত্যে এবং সংগীতে।

"আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা—আমি একটি নাচের-বান্ধবা করেছিলাম।"

মেয়ে দু'জনে পুরুষের ভূমিকা নিয়োজিত। অজুন আর সুবলের বান্ধা। * * * খানিকটা কথাবার্তার পরে দু'জনের লড়াই। * * *

"নটীরা যে মেয়ে সেটা বস্তুতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্ন সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ যারা নাচছে, তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গোণ, নাচটা কি সেইটাই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অস্বস্তি সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনিয়তার আধারে বীররসের উজ্জলতা।" যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও কবি মেয়েকেই পুরুষের ভূমিকা দিতেন। বাঙালী বালিকার অজুনের ও বজ্রসেনের ভূমিকা গ্রহণে ওই একই রসের উদ্ভব হইত—কমনিয়তার আধারে বীররসের উজ্জলতা।

"কাল রাতে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্ব রাতে যে-দুইজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সত্ত্বের মতোস পুরে সত্ত্বের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবের ভঙ্গিতে গলার আওয়াজে পুরো মাত্রায় বিদ্যুৎকণা করে গেল। পুরুষের মতোযের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসঙ্গতা হোলো না। বেশ-ভূয়ার সৌন্দর্যেও একটু মাত্র বাতায় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিফুত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিম্বের রস এমন করে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য টেকেলো। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়-ভাব বাস্তব করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ভন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকে বিরপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।" যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র।

এই বিদ্রূপ-নৃত্যের কিছু আভাস যেন 'তাদের দেশ' নাটকে আছে। সে দেশের তাদের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সংগীতে এই বিদ্রূপ-নৃত্যের ভঙ্গী।

"সেই সম্ভাবনাতাই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলাম, মুখোষ-পরা নটদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোষ এনেছিলাম, তার থেকে বেশ বোঝা যায়—মুখোষ-তীর একপ্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণগণ্য চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন বাস্তবত তেমনি প্রতীকিত বিশেষ্য আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁচ এক এক রকম প্রণী নির্দেশ করে। মুখোষ-তীর যে গুণী করে সে সেই প্রণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেশ দেয়। সেই বিশেষ প্রণীর মুখের ভাব-বৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁচে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ পরে এলে আমরা তখন দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক প্রণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব-অনুসারে অগভ্রগুণী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেশে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অগভ্রগুণী করা। মূলে ধরোটা তারা বাধ্য, এমন করে তাল দিতে হবে যাতে, প্রত্যেক মুকে সেই ধরোটার ব্যাখ্যা হয়। কিছু অসংগত

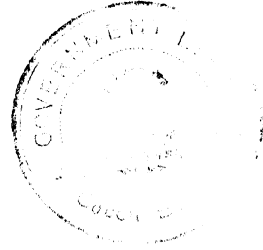
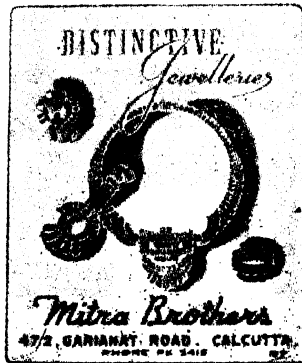
না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখানুম।" বতী; রত্নমণ্ডারী পদ।

মুখোষ-নৃত্য রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জাতীয় নাটক রচনায় তিনি মনোযোগ দেন নাই। মুখোষ-নৃত্য রচনা করিয়া গেলে বাঙলা সাহিত্য আর একটা দিকে যে কেবল সমৃদ্ধতর হইত তাহা নয়, রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভারও একটা নতুনতর পরিচয় পাওয়া যাইত। আমার তো মনে হয় মুখোষ-নাট্য তাহার প্রতিভার বিশেষ অনুকূল ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণীর বিকাশেই অধিকতর দক্ষ ছিলেন। নাটকে ব্যক্তির মনে যে দ্রুত লগ্নে ঘন ঘন ভাববর্তন ও পটপরিবর্তন ঘটে, শ্রেণীর মনে সে রকমটি ঠিক ঘটে না; শ্রেণী-মনের ভাব ও পট পরিবর্তনটিমে তালে ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্র-নাথের নাটকের একটি প্রধান চরিত্র এই যে, ঘটনার তাল ও ব্যক্তির ভাবনার তাল এক সঙ্গের চলিতে পারে না; অর্থাৎ নাটকে যে রকম আত্মসমীক্ষা, অপ্রত্যাশিত ও মুহূর্মুহু ভাব বিপর্যয় দর্শকে আশা করে, তাহাতে ঠিক যেমনটি নাই। অভিনেতার মুখে অবিরাম ভাব-বলাকার সম্ভরণ না ঘটতে মুখটা অনেক পরিমাণে অবিচলিত মুখোষের সঙ্গের হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্যে অভিনেতা যে পরিমাণে ব্যক্তি তাহার চেয়ে বেশি করিয়া যেন

সে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। অভিনেতার মুখের উপরে একটা মুখোষ তুলিয়া দিলে মুখের এই মৌলিক চরিত্র ঢাকা পড়িয়া গিয়া যেন একটা গুণে পরিণত হইতে পারিত। বিশেষ করিয়া তাহার 'ভাসের দেশ' একান্তভাবে মুখোষ-নৃত্যের উপযোগী। এই নাটকের ভাসের জনতায় স্বতন্ত্র ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণী-ব্যক্তি অধিকতর। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ব্যক্তি, কিন্তু তাস ও তাসানীগণ শ্রেণীস্বরূপ। এক্ষেত্রে তাহাদের মুখে মুখোষের ব্যবস্থা হইলে অভিনয়ের অঙ্গ হানি না হইয়া, শ্রেণীরূপটি স্পষ্ট হইয়া ওঠাতে রস-বর্ধন হইত বলিয়াই মনে হয়।

এইযে নৃত্যনাট্যের কথা বলিলাম—ইহার মূলের তত্ত্বটি কি? আগেই বলিয়াছি যে জীবন-দর্শনের পরিণতির সঙ্গের তাল রাখিয়া তাহার আটে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল—এবং এই পরিবর্তনের তাগিদেই তিনি প্রথম বয়সের গীতিনাট্য হইতে গতানুগতিক কমেডি, ট্রাজেডি ও তত্ত্বনাট্যের ভিতর দিয়া শেষ বয়সের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথম বয়সের গীতিনাট্যে নিজস্ব ঘটনার ও আবেগের মাত্র প্রকাশ; তাহার মূলে কোন সচেতন তত্ত্বরূপ নাই। শেষ বয়সের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মূলে একটি সচেতন তত্ত্ব নিহিত আছে। কবির দীর্ঘ

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে এই তত্ত্বের দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অতি সংক্ষেপে এই তত্ত্বকে বলা যাইতে পারে নটরাজ শিবের আইডিয়া। যে শিল্পী নটরাজ মূর্তি পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন বিশ্বের কারণ-স্বরূপ মূল আবেদন ছন্দে লীলায়িত হইয়া জীবনে ও জগতে এক রহস্যময় বিচিত্র দিব্য-শক্তির লীলা চলিতেছে; তাহারই নৃত্যছন্দে পদপ্রান্তে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে; বীভৎসতা ও সৌন্দর্য, ভীষণতা ও মাধুর্য, নিঃস্বভাৱ ও পরিপূর্ণতা তাহার নৃত্য চঞ্চল দুই চরণের যেন দুই বিরুদ্ধ গুণ। যে-হৃতভাগা খণ্ডশঃ দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছে তাহার চোখে ইহা রিজ, ভীষণ, বীভৎস, ভাঙন-মুখী ও অসম্পূর্ণ; সে কেবল তান্ডবের চন্দ্র সূর্য্য তারা খসিয়া-পড়া জ্ঞান বিশ্ব-অট্টালিকা-টাই দেখিতে পাইল; কিন্তু যে-সৌভাগ্যবানের দৃষ্টি পরিপূর্ণ, সে নটরাজের দুই চরণের লীলা-ই প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া জীবন ও জগৎ তাহার কাছে সুন্দর, মধুর এবং চির পরিপূর্ণ; সে দেখিতে পায় চন্দ্র সূর্য্য তারা খসিয়া লইয়া নৃত্যনতর বিশ্ববর্ষা গড়িয়া উঠিতেছে; সে দেখিতে পায় সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর উপাদান জািন্মা মহত্তর জীবন গঠনের লীলা হইতেছে, তাহার চোখে জীবন ও জগৎ



আপনার প্রসাধন সামগ্রী

গুলিকে সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত
করিবারা যাবতীয় সেন্ট ও
এরোম্যাটিক্ কেমিক্যাল যথা-
সম্ভব সুলভে সরবরাহ
করিয়া থাকি।

পূজা স্পেশাল কম্পাউন্ড } প্রতি পাঃ
কোকোনাট অয়েল কম্পাঃ } ৬০,
তিল অয়েল কম্পাউন্ড ... ৬০,
আমলা কম্পাউন্ড ... ৪০,
আয়ুর্বেদিক অয়েল কম্পাঃ
(Free from Synthetic) ... ৪০,
স্নো কম্পাঃ (Rose Smell) ৮০,
হ্যান্ডকার্টিফ সেন্ট কম্পাঃ ... ৮০,

এই সব দ্রব্যাদির অন্যান্য এসেন্স ও
এরোম্যাটিক্ কেমিক্যালের দর ও
ক্যাটালগ পত্র লিখিলে পাঠাইয়া থাকি।

মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত
সরবরাহ করা হয়।

এসেন্স এ্যাণ্ড বোতল সাপ্লাই
এজেন্সি

১৪নং রাধাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের
শূলসুধা

রেজিস্টার্ড নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, অম্লপিত্ত, কোষ্ঠ-
কাঠিন্য ইত্যাদি যাবতীয় শূলরোগের
অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান—

শূলসুধা ঔষধালয়

—ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর—

ডাঃ জালালউদ্দীন আহমদ, এস, এ, এস।

রাশ—

৫৭নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

—হেড অফিস—

ঢাকা

ব্যাংকং ভারতের প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রণী

---শাখা অফিস---

—কলিকাতায়—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর,
বড়বাজার, শ্যামবাজার।

বাহিরে

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ,
নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী,
চাঁদপুর, পূরানবাজার, ফেণী, কৃষ্ণ-
নগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী,
বর্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ,
পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, বেনারস,
রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর,
লক্ষ্মী ও আগ্রা।

নোয়াখালী
ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ

রিজার্ভ ব্যাংকের সিডিউলভুক্ত

হেড অফিসঃ---১০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

---কার্যকরী তহবিল---

১,৫০,০০,০০০

প্রায় দেড় কোটি

আধুনিক ব্যাংকের যাবতীয় সুবিধা
দেওয়া হইয়া থাকে।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এসু. সি. পাল

বিপ্লব এবং সুন্দর। খণ্ড-দৃষ্ট নটরাজের পাহিরের পদাখানা মাত্র দেখিয়াই ইহাই বাস্তব, আর বাস্তব বীভৎস এবং মৃত্যু। পরিপূর্ণ দৃষ্টবান রংগমণ্ডের পদাখানা উঠাইয়া নটরাজের নৃত্যলীলা দেখিয়া লেখক মিলিয়া কি সুন্দর, আর বিপ্লব!

এখন জীবনের সাধনায় এই পরিপূর্ণতার পূর্নের অধিকারী কবি হইয়াছেন বলিয়াই তাঁর আর পদাখানা মাত্র দেখিয়া হতাশ হইতে পারেন নটরাজের নৃত্য দেখিয়া বৃদ্ধিতে পরিণত হইয়া ভাঙন নতুন গড়নের ভূমিকা হইতে মুক্ত জীবনেরই অঙ্গ; বিরহ নিবিড়তর লেনেরই সূচনা—আর সবসুন্দর মিলিয়া জগৎ জীবন স্বকীয় মহিমায় পরিপূর্ণ, কেম্বিওত।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের নিকটে এই তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাকে সত্য বলিয়া মানি পাইয়াছেন। প্রকৃতির ঋতুরংগশালায়, কবির অনুপমমাধুর্য বিবর্তনে, (নটরাজ ঋতুরংগশালা); মানুষ্যের জীবনের বিরহ মল্লের লীলায়, (শাপ মোচন); রূপ ও প্রকৃতির সত্তার স্বদেশ (নৃত্যনাট্য স্যাপনা); প্রেম ও দেহের বিপরীত দাবীর

সংগ্রামে (নৃত্যনাট্য 'চ'জালিকা' ও 'শ্যামা'); অর্থাৎ এই তত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্ব মাত্র থাকে নাই, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একার্থক হইয়া উঠিয়া ইহা নতুন মহিমা লাভ করিয়াছে; ইহা তাহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণতাকেই বোঝেন।

এক্ষণে তাহার রচনা হইতেই এই তত্ত্ব-রূপটি প্রকাশের চেষ্টা করা যাক।

'নটরাজের' তাৎপ্রে তাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে বপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকাশের সেই বিরাট নৃত্যক্ষেপে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলায় উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়। নটরাজ পালা গানের ইহাই মর্ম।' নটরাজ ঋতুরংগশালা।

আমরা যাহাকে জগৎ বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'বহিরাকাশে রূপলোক,' আর আমরা যাহাকে জীবন বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'অন্তরাকাশে রসলোক।' যে-সৌভাগ্যবান নটরাজের লীলায় যোগ বিয়া তাহার নটসংগী হইতে পারিয়াছে, তাহার মন 'বন্ধন-মুক্ত' হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহারাই সম্যাসী, ইহাই সম্যাস। সংসারত্যাগী গতানুগতিক সম্যাসীরা কেবল নটরাজের

ভাঙন-মুখী চরণখানাই দেখিতে পাইয়াছে, তাই তাহার কাছে তাহাদের কোন গুরুত্ব নাই। 'নটরাজ ঋতুরংগশালা' নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত না হইলেও এক্ষণে তাহার আলোচনা অসম্ভব নয়, কারণ কবির নৃত্যতত্ত্বটি অত্যন্ত সচেতনভাবে ইহাতে প্রকট।


জগৎ ও জীবন মিলিয়া যে বিশ্বব্যাপার তাহার মধ্যে কবি নটরাজের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
হুতাও সকল বন্ধ হে।
সুস্থিত ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মৃত্যু স্রবের ছন্দ হে।"

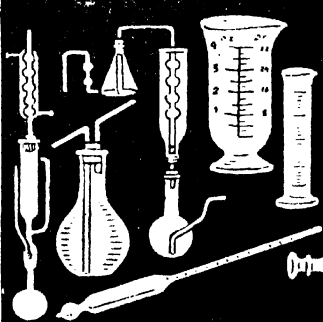
নটরাজের নৃত্যের তালেই কবির রসলোক হইতে সুস্থিত নিকরীণী স্বপ্ন ভাঙিয়া জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়ে।

"নৃত্যে তোমার মস্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মল্লা।
বিশ্ব তনুতে অণুতে অণুতে
কিছে নৃত্যের ছায়া"
"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজল চন্দ্র-ভানু।"

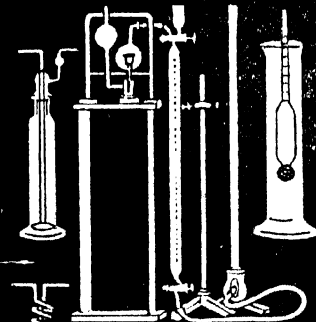
নটরাজের এক পদক্ষেপ কবির রসলোকে আর এক পদক্ষেপে বহিলোকে; বহিলোকের পদপাতে অনুপমমাধুর্য যে কেবল উন্মথিত




মিঃ কে. এল. সাহা
পতিকার্যনাট্য ও জলবিদ্যা



"নিউট্রল"
সর্বোৎকৃষ্ট এলকালিবিহীন
গ্লাস



ভারতের লেবরেটরী গ্লাস
প্রস্তুতের আদি প্রতিষ্ঠান।



SGW

সাইন্টিফিক গ্লাস ও সার্কস

৫৪নং কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা।

৫৫নং গোপাল চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দ্রব্য মঞ্জর

কলডিনা
টুথপেস্টশ্রীনাথ কেমিক্যাল
কলিকাতা

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড্ অফিস :

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২১২৫ ও ৬৪৮০

বিক্রীত মূলধন	১০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৪,৫৫,৮৬১ টাকা
অমানত জমা	৫০,০৯৪৯৩ টাকা

শাখাসমূহ

সাউথ ক্যালকাটা, শ্যামবাজার, নিউ মার্কেট, নৈহাটী,
ডাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রঙপুর,
নীলফামারী, সৈয়দপুর, হিলি, বালুরঘাট, দুবরাজপুর,
কুচবিহার, এলাহাবাদ, বেনারস, জলপাইগুড়ি।

বাঁকুড়া ও সিউড়ী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ফোন—ক্যাল ৩৮৯৪

গ্রাম—Interested

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শতকরা ৭১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

শাখাসমূহ :

অজমিরগঞ্জ
এলাহাবাদ
অমরবতী
বেনারস
ভৈরব
কাণপুর
চাকুলিয়া
ছাপরা
দাজিলিং

ফরাসাবাদ
বালেশ্বর
মীর্জাপুর
গয়া
ঘাটল
গোপালগঞ্জ
জৈনপুর
ঝালকাঠি
ঝাড়গ্রাম

জম্বলপুর
কাটরা (এলাহাবাদ)
খালপুর
লক্ষ্মী
মৌদীনীপুর
মহারাজগঞ্জ
নাগপুর
উত্তর কলিকাতা

রায়পুর (সি পি)
রাণাঘাট
সৈয়দপুর
শ্যামবাজার
শ্রীহট্ট
উনাও
জামশেদপুর
শিলিগুড়ি

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : এস, কে, গঙ্গোপাধ্যায়।

হুইতেছে তাহা নয়, বিশ্রোহী বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছে।

“তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিবশ জাগে চেতনায়,

সুখে দুখে হয় তরুণময়
তোমার পরমানন্দ হে।

জীবন-মরণ নাচের ভঙ্গ,
বাজাও জলদমস্ত হে।”

সুখদুঃখ সেই নৃত্যছন্দের তরুণের
তাপড়া এবং জীবন-মৃত্যুর আক্ষেপ ও
উল্লাসে সেই নৃত্যের ডম্বরুর ধ্বনি।

এ হেন নটরাজের কবিশিষ্য তিনি।

“নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুষ্টি মন্দ লখা।”

“প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অপি'ব চরণ-তলে, তুমি মোর গুরু;”

“অবসাদে যেন অনামনে
তাল ভগ্ন নাহি কর,”

নটরাজের কবিশিষ্যের ইহাই সম্যাস, কারণ গুরুর সঙ্গে বিশ্বনৃত্যে যোগ দেওয়াতে তাহার মন বন্দন-মুগ্ধ। এই বিশ্বনৃত্যে তাল ভগ্ন হইলেই নটরাজের অভিশম্পাত বর্ষিত হয়, তখন আবার দীঘ সাধনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় (শাপমোচন)।

“এই পশ্চত কাল লিখোঁছ এমন সময় ডাক
পড়ল। মেয়েরা স্বত্বরূপ অভিনয় করবে আজ
দুঃখা খেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা
সম্প্রতিগণ্যের লতানে রেখা দিয়ে গানের সুবের
উপর নকশা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি
এর অর্থটা কী! আমাদের প্রতিদিনটা দাণ-ধরা,
ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকাটিতে ভরা। তার মধ্যে এর
সংগতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ
সম্প্রদায়ী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখদৈন্য
শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের
অবতারণা কেন। তারা জানে দারিদ্রনারায়ণ' তো
নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবল
চটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা
এই কথাটা ভুলে যায় যে, দারিদ্র শিবের আনন্দ
নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হোত
তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো
লাগতো না, এটাকে পাগলামি বলতুম।

“দারিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে
হবে, তাকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখতে না। আমাদের
পুরোণ শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দারিদ্রবেশ
অসম্পূর্ণ। তার ঈশ্বর্য, বিবেক এই দুইয়ের
মিলনেই সত্য। সাধু এ এই মিলনকে যখন স্বীকার
করতে চান না, তখন কবিদের সঙ্গে তাদের বিবাদ
বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দাহাই
পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সবল অনুভূতাদের
নামদেয় আহ্বান করবো যারা ‘বাগধারীবিশ
সম্পূর্ণ।’ হৃদয়ের মধ্যে অভাব ও অভাবের
স্বর্ণতার লীলা।” পথে ও পথেরপ্রান্তে; পদ
৪৭

কবি বাঁহাদের লোকহিত ব্রতপরায়ণ

লক্ষ্মীসী বর্ষায়েছেন জঁহার নটরাজের
ভাঙন-ধরণী চরণখানার লীলাই দেখিতে পান,
কাজেই তাহার দেখেন, বাস্তব সংসারে
দুঃখদৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই। কিন্তু কবির
দৃষ্টি পূর্ণতর, তিনি নটরাজের নৃত্যের সবটাই
দেখিতে পান, কাজেই তাহার কাছে সবদুঃখ
মিলিয়া বিশ্বব্যাপার সুন্দর—বাস্তবের ময়লা
ছেঁড়া পদাধিনাই একান্ত নয়। আর এই
বাস্তবের অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ পদাধিনা অপসারিত
করিয়া দিবার উপায় নৃত্য, শিল্প। নৃত্যের
আনন্দের অভিঘাতে পদাধিনা সরিয়া গেলে
দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তবের লক্ষ্মীছাড়া
দারিদ্রনারায়ণই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীসিনাথ নারায়ণ।

এই পথখণ্ডে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার
মতো। কবি ‘দারিদ্র নারায়ণের’ রূপক লইয়া
আরম্ভ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া
শিবের রূপে বারংবার ফিরিয়া আসিয়াছেন—
নটরাজ যে শিবের অন্যতম রূপ।

উপরিউদ্ধৃত অংশগুলির সাহায্যে কবির
নৃত্যতত্ত্ব হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিতে
পারা যাইবে। এবারে তাহার নৃত্যনাট্য
চারখানি লইয়া আলোচনা করা যাক।

‘শাপমোচন’

‘শাপমোচনকেই’ যথার্থভাবে নৃত্যনাট্য
বলা চলে—কারণ শাপমোচনের শাপের হেতু
গম্ভীর সৌরসেনের সংগীতকলায় তালভগ্ন।
নটরাজ জন্মমৃত্যু, ভাঙা গড়ার মধ্যে তাল
রক্ষা করিয়া বিশ্বনৃত্য করিতেছেন, যে-
হতভাগ্য তাহার তালের সঙ্গে তাল রক্ষা
করিয়া না চলিতে পারিতেছে জীবনে তাহাকে
দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এই রকম এক
তাল ভগ্নের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে
‘শাপমোচন’ নৃত্যনাট্যের উদ্ভব।

কিন্তু আর এক হিসাবে ‘শাপ মোচনের’
চর্যে পরবর্তী তিনখানি নাটক সম্পূর্ণতর;
প্রথমখানিতে কেবল ভাবাবেগের প্রকাশ;
দ্বিতীয় তিনখানিতে ভাবাবেগের সঙ্গে ঘটনার
বেগও আছে।

‘গম্ভীর’ সৌরসেন সুরলোকের সংগীত সভায়
কলানায়কদের অগ্রণী। সৌরসেন তার প্রেমসী মধুশ্রী
গোড়ে সুমেরুশিখরে সূর্য প্রদক্ষিণে। সৌরসেনের
মন ছিল উদাসী। তাই অবস্থানে তার মূদগে তাল
গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শব্দে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উল্লস রাজ্য হ'য়ে। স্থলিতছন্দ
সুরসভার অভিশাপে গম্ভীরের দেহশ্রী বিকৃত হ'য়ে
গেল, অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল গাম্ভীর
রাজগৃহে।”

এইরূপে সৌরসেনের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের
সূত্রপাত আরম্ভ।

আবার এদিকে—

“মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে
রইলো, বসলে, বিচ্ছেদ ছটিওনা, দেবী একই
লোকে আমাদের গতি হোক, একই দুঃখ ভোগে,
একই অবমাননায়।” শচী সঙ্করণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের
পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন—তথাস্তু, হে
মতৌ, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই

দুঃখে ইন্দ্রপাতল অপরাধের কর।” মধুশ্রী জন্ম
নিল মদ্ররাজকুলে—নাম নিল কমলিকা।”

সৌরসেন তাল ভগ্নের অপরাধে বিকৃত
সৌন্দর্য অরুণেশ্বর হইল। তাহার কারণ
নটরাজের দুই চরণের লীলা-সামঞ্জস্য যে
দেখিতে না পার জগৎ তাহার কাছে অসুন্দর।
মদ্ররাজ কন্যা কমলিকার সঙ্গে
অরুণেশ্বরের বিবাহ স্থির হইল।

‘রাজহস্তীর’ পুঠে রঙ্গাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অম্বক বিহারী
বীণা। স্তম্ভ সংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে
কন্যার বিবাহ। যথাকালে রাজহস্তী এল পতিগৃহে।”

এবারে কমলিকার প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষা
আরম্ভ হইল—কারণ জন্মতাল স্বামীর
অধীগণনী বলিয়া দুঃখের অধঃভাগও যে
তাহার।

‘নির্বানদীপ অম্বকার ঘরেই প্রতিরাতে স্বামীর
কাছে বধু সমাগম। কমলিকা বলে—‘প্রভু তোমাকে
দেখবার জন্য আমার দিন আমার রাতি উৎসুক।
আমাকে দেখা দাও।’.....

‘রাজা বললেন—প্রিয়ে, না-লেখার নিবিড়
মিলনকে নষ্ট করো না, এই মিনতি।”

মহিষীকে দৃষ্টিগত দেখিয়া রাজা বললেন,
কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিনে নাগকেশবের বনে
সখাদের সঙ্গে তাহার নৃত্যের দিন। রাণী
তখন যেন তাহাকে দেখিয়া লয়। চৈত্র
সংক্রান্তির রাতে আবার মিলন। রাণী বললেন
নাচতো দেখিলাম কিন্তু সেই দলের মধ্যে
একজন কুশ্রী কেন?

‘রাজা স্তম্ভ হয়ে রইল। কিন্তু গুরে বললে,
ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লম্বাজকে সাম্বনা দিতেই স্বর্গরশ্মি
তার ললাটে পড়ায় ইন্দ্রধনু, মরুনেত্রস কালো মর্শের
অভিশাপের উপর স্বর্গের কন্যা যখন নামে
তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে
সেই বর্ণনাই কি তোমার হৃদয়কে কাল যদু
করেনি।”

‘সম-বিকৃতির পীড়া সহিতে পারিনে’—এই বলে
মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল। রাজা তার হাত
ধরে বললে, ‘একদিন সহিতে পারবে আপনাই
আন্তরিক রসের দীক্ষণো। কুশ্রীর আত্মত্যাগে
সুন্দরের সার্থকতা।”

রাণী সূর্যোদয়ের মহাত্মে রাজাকে
দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

‘রাজা বললে—‘তাই হোক, ভীড়তা যাক’
কেটে।’ দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার।
‘বী অনাম্য, কী নিষ্ঠুর বস্তুনা’—বলতে বলতে
কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পারিয়ে গেল।”

কমলিকা রাজগৃহ হইতে দূরে আত্ম-
নির্বাসন করিল। রাণীর দুঃখের কারণ—
সুন্দর ও কুশ্রী, আনন্দ ও দুঃখ মিলাইয়াই যে
জগতের পরিপূর্ণরূপ—এ তত্ত্ব সে বোঝে
নাই। অসুন্দর-ভাটী জগৎকে, দুঃখ-ছাটী
জীবনকেই সে একান্ত ভাবিয়াছিল, কাজেই
প্রিয়তমও তাহার চোখে কুশ্রী। বিরহের
তপস্যায় এই পূর্ণতার বোধ তাহার মনে
উদিত হইল—তখন চোখের দৃষ্টির উপরে

জাতীয় শিল্পের সংগঠন
প্রচেষ্টায় আমরা আপনাদের
সহযোগিতা কামনা করি

প্রবর্তক ব্যাংক লিঃ

হেড অফিস :—৬১, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

স্থাপিত : ১৯২৯

শাখা

চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী ও সিরাজগঞ্জ।
সান্তাহার ও নৈমিসিংহ শাখা শীঘ্রই
খোলা হইবে।

সুদ :—সেভিংস ২%, কারেন্ট ৫%।
ফিক্সড ডিপজিট, ক্যাস সার্টিফিকেট,
প্রভিডেন্ট ফান্ড, লোন ও ওভার-
ড্রাফট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই
জানান হয়।

সুবিধাজনক সত্বে শেয়ার ও
কোম্পানীর বণগজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায়

(প্রবর্তক সম্ব-প্রতিষ্ঠাতা)
ফোন বি বি ৪১৮

---যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনবে---

ব্রহ্মোবিংশতিতম ত্রৈবার্ষিক হিসাবনিকাশে দেখা যায়

উন্নততর মৃত্যুর হার—

এবং ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৩ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর দেয়াপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য
তিন বৎসরে নিট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২ টাকা। তন্ম্বারা বীমাকারীদের
তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস | আজীবন বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২১০ টাকা
ঘোষণা | মেয়াদী বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০ টাকা

ও রি য়ে টা ল

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

স্থাপিত :

১৮৭৪ সাল

রাষ্ট্র অফিস—ওরিয়েন্টাল
এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

হেড অফিস :

বোম্বাই

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৫০০

“কী ছাঁদে তেরী তেঁও নেবে আজ...?”

যখন অতিক্রম হুতল নারীর সৌরভ এবং বিস্তৃত
নারিকেল তৈলই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাদান।
বিশুদ্ধতা এবং গন্ধের অভিনব সৌকর্য্যের
জন্ম “রস্কোর” প্রখ্যাত নারিকেল তৈল
সত্যই অতুলনীয়।

রস্কোর মুখ্যসিও
নারিকেল তৈল
বিশুদ্ধ ও রমণীয়

ফ্রান্স রস এও কোং লিঃ - কলিকাতা



এজেন্ট :—বেনলন এন্ড কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ, ১২নং ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিঃ।

আর তাহার ভয়সা রহিল না, তখনই সে প্রিয়তমকে অপূর্ণ সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিল।

রাণীর নিবাসনের বনের প্রান্তে রাণীর পরে রাণী রাজার বৈশাখদ্বীপ ও নৃত্য চলিতে থাকে। এমন করিয়া কিছুদিন যায়।

“রাজ মহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ আমি যাবো। আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।”

“বীণা থাম্‌লো। মহিষী তাকে দাঁড়ালো। রাজা বললে—ভয় কোনো না প্রিয়ে, ভয় কোনো না.....

“আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই ভয় হ’ল— এই বলে” মহিষী আঁচলের আঁড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে ভুলে রাজার মূখের কাছে। কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একী সুন্দর রূপ তোমার। কখন দুইজনেরই অগোচরে বিরহ বেদনার তাপে ইন্দের শাপ স্থানিত হয়ে পড়ে গেছে।”

রাণীর যে দৃষ্টিতে রাজাকে কুন্তী মনে হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ, এখন যে দৃষ্টিতে রাজাকে সুন্দর মনে হইল তাহা পূর্ণ। এই পূর্ণতা লাভের জন্য তপস্যার প্রয়োজন—এক্ষেত্রে বিরহের দুঃখই সেই তপস্যার ভাপ। রাজাও বিরহের দ্বারা, দুঃখের গ্লানির দ্বারা ছন্দঃস্থলনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্যকে ফিরায়া পাইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

শাপমোচন ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তত্ত্ব অনুসরণ। প্রেমের মোহ ও প্রেমের মূর্ত্তি মিলিয়াই প্রেমের পূর্ণতা। প্রেমে দুই-ই আছে, কিন্তু কোনটাই একান্ত নহে। যে কোন একটিকে একান্ত করিয়া দেখিলেই ছন্দঃপতন ঘটে—এবং দুঃখের দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দুজনেই প্রেমের মোহটাকেই একান্ত বলিয়া মানিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিতর হইতে আঘাত পাইয়া প্রেমের মূর্ত্তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রেমের সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার রঙ্গমণ্ডের পুণ্ডিতকার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে। এই ছায়াভিনয়ের প্রসঙ্গে বলা যাইবে খুব সম্ভবতঃ এই ধারণাটিকে কবি জ্ঞাত হইতে পাইয়াছেন। জাভাযাত্রী পত্রে একাধিকবার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে।

“সেখানে মহাভারতের বিরট পর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, জুতএব বাকি বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে, তার দুই ধারে পাতলা চামড়ার আঁকা

মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাত পাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যার এমনভাবে গাথা। এই ছবিগুলো এক একটা লম্বা কাঠিতে বঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসার ছবিগুলোকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নড়তে দোলাতে চলাতে থাকে। ভাবের সংগে সঙ্গতি রেখে গামলান বাজে।” যাত্রীঃ জাভাযাত্রীর পত্র।

চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা সুপরিচিত গ্রন্থ, কাজেই তাহাদের কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

কমলিকা ও চিত্রাঙ্গদা দুজনেই একই ভুল করিয়াছিল। খণ্ডদৃষ্টিবশতঃ প্রকৃত সৌন্দর্য কাহাকে বলে তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কমলিকার চোখে রাজা কুন্তী, আবার অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গদা বুঝিতে পারিল নারীর লীলাত সৌন্দর্য তাহাতে নাই। বিরহের তপস্যাতেই দুই জনের পূর্ণ দৃষ্টি-লাভ ঘটিল। স্বামী বিরহিতা তাপিতা কমলিকা পূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিয়া স্বামীকে দিয়া সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিতে পাইল। আর চিত্রাঙ্গদার বিরহ আত্মসংকটে। দেবদত্ত সৌন্দর্যময়ী নারী প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে আড়ালে রাখিয়া সব সুখ যেন ভোগ করিতেছে—এই দুঃখই চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বলদান করিল; তখনই সে অনায়াসে দেবদত্ত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বরূপ সৌন্দর্য অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সাহস সঞ্চয় করিল।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রকৃতি দুইজনেই প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; মদনের বর ও মাতার নাগপাশ মন্ত্র। অলৌকিক উপায়েই দুইজনে সিদ্ধিলাভ হইল। ইহাতে প্রেমের মোহের পরিচয়।

কিন্তু আবার দুজনেই মোহ ভঙ্গের সাহস অর্জন করিয়া অলৌকিকতার পাশ নুত করিয়া প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রেমের পূর্ণতার প্রাচুর্যেই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে কীর্তির পথে ছাড়িয়া দিল; প্রকৃতি আনন্দকে ছাড়িয়া দিল তাহার ধর্ম সাধনার পথে। একজনের বীর্য সাধনা, অপরের ধর্ম সাধনা নষ্ট করিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে খর্ব না করিবার ইচ্ছা। এমন যে করিতে পারিল তাহার কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে মিলন ও বিরহ মিলাইয়াই প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ।

নাগপাশ মন্তব্যম্ব যে আনন্দকে প্রকৃতি পাইবার মুখে ছিল, সে তো তুষ্কার জগপ্রার্থী সাধন-সমুজ্জ্বল সিবামূর্ত্তি নয়; প্রকৃতি দৌর্ভাগ মস্তাহত এই পরিমলান পুরুষ আগেকার মূর্তির ভাঙ্গাংশ মাত্র। হস্তগত প্রণয়্যাস্পদের

ভাঙ্গাংশের চেয়ে ছাড়া-পাওয়া পূর্ণ মূর্ত্তিকে প্রকৃতি কাম্যতর মনে করিল; তাই সে অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিল। চিত্রাঙ্গদাও যে অনায়াসে অর্জুনকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার ভয় ছিল পাছে তাহার মূন্দ-সৌন্দর্যের লীলা তরঙ্গিত হইতে বীরকীর্তি বিসর্জন দিয়া বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পূর্বতন অস্তিত্বের খণ্ডাংশে পরিণত হয়।

শ্যামার সমস্যা, নিদারুণ, এবং তাহার পরিণামের মধ্যে সাম্বন্ধ্য লেশ মাত্র নাই। কমলিকা, চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির তাগের মধ্যেই তাহার তৃপ্তি আছে। কিন্তু শ্যামার ভাগ্যে নিদারুণ অভিলাষনা ছাড়া আর কি জুটিল? উত্তায়ের মৃত্যুর পাপের জন্য বোধ করি এইরূপ পরিণামের প্রয়োজন ছিল। পাপের দ্বারা লব্ধ প্রেম ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাহার হইল না।

অরুণেশ্বর, অর্জুন ও আনন্দ শেষ পর্যন্ত সার্থকতার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বন্ধ-সেনের ট্রাজেডি এই যে শ্যামাকে সে সত্যই ভালবাসে কিন্তু পাপবোধের চেতনা তাহাকে গ্রহণ করিবার পথের অন্তরায়। তাহার অর্ধেক শ্যামাকে চাহে, অপরাধ সেই তুষ্কার ভূগার হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। সে জানে বিধাতা পাপকে ক্ষমা করেন কিন্তু তাহার ক্ষমাহীনতার জন্য তাহার ক্ষমা নাই।

“জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে

চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা।”

নৃত্যনাট্য কথ্যখানির বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইহাদের ভাঙ্গা সংগে ভাব প্রকাশের বাহনের কি নিগূঢ় যোগ! যে-কোন ঘটনাকে নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করিলে চলবে না, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। জাভার নৃত্যনাট্যগুলিতে ভাব ও ভাব প্রকাশের বাহনের মধ্যে এমন দেহাঙ্গ যোগ আছে—এমন মনে করা চলে না। ভাব ও তাহার বাহনের মধ্যে অনিবার্য যোগ সাধনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। এই নৃত্যনাট্যগুলিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি পুরাতন সত্য; তাহার যৌবনের রচনাতেই তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই ভাবকে নৃত্য বাহনের হাতে সমর্পণ করিবার দৃষ্টান্ত নৃত্যনাট্যগুলি। জাভাতে নৃত্যনাট্যের সজীব আদর্শ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আংশিক স্বপ্নী; তাহার পূর্ণদর্শন আমরা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে দেখিতে পাইলাম বলিয়া আমাদের স্বপ্ন কবির কাছে পূর্ণতর।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের

অমৃত সালসা

৪৬ বৎসরের আবিষ্কৃত

স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয় এবং ক্ষীণ ও দুর্বল দেহ সবল ও পুষ্ট হয়। অনন্তমূল ও ভোগাচিন প্রভৃতি ৮০ প্রকার শৈথিল্য শোধক ও বলকারক উপাদান এবং স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত এই অমৃত সালসা সকল ক্ষতুভেদ ও সকল বয়সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ। যে কোন কারণে শরীরের রক্ত দূষিত হউক না কেন, সর্বাগ্রে তাহা সংশোধন করাই প্রধান কর্তব্য। এই শৌণিত সংশোধন কয়ে অমৃত সালসাই সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। বাত, খোস, পিচিড়া, চুলকানি, শরীরে ঢাকা দাগ, দূষিত ক্ষত ও রক্তদূষিতজনিত শারীরিক বিকৃতি এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য অমৃত সালসা সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। অমৃত সালসার আরও একটি অদ্ভুত ক্ষমতা—ইহা সর্বপ্রকার স্ত্রী-ব্যাধির মহৌষধ। ইহা সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও অমৃত সালসা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গৃহের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্বে একবার আপনার দেহ ওজন করিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, সেহের ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সপ্তে সপ্তে নতুন বলের সঞ্চার হইতেছে।

মূল্য ১ শিশি—১০, ডাক মাসুল—৫০ আনা। ৩ শিশি—২৫০, ডাক মাসুল—১০০ আনা।

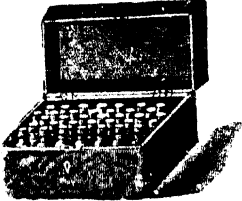
মহাশ্বাসারিষ্ট

শ্বাস, কল ও হাঁপানীর একমাত্র মহৌষধ।

শ্বাস ও হাঁপানীর মত যন্ত্রণাদায়ক ও প্রাণহতকর রোগ আর নাই। শ্বাসরোগ যেমনই কঠিন আমাদের মহাশ্বাসারিষ্ট তেমনই অসমী ক্ষমতা সম্পন্ন মহৌষধ। ইহার ২১০ দাগ সেবনে শ্বাসের প্রবল টান বন্ধ হয়। নিয়মিত সেবনে চিরন্তন শ্বাস ও হাঁপানীরোগ আরোগ্য হয়। ইহার শক্তি কখনও বিফল হয় নাই। মহাশ্বাসারিষ্ট হাঁপানী রোগীর পরম বন্ধু। মূল্য প্রতি শিশি ১১০, মাসুলোদ ১৫০ আনা।

গৃহ চিকিৎসা সার বাক্স

মূল্য ১০, ৫০ টাকা, ডাক মাসুল ১১০ আনা।



সুলভে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রচার ও সর্বসাধারণের উপকারের জন্য বহু মূল্যবান ২৬ প্রকার ঔষধ সম্বলিত এই গৃহ-চিকিৎসার বাক্স বর্তমান দুর্দিনের বাজারে নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। এইরূপ একটি বাক্স প্রতি গৃহে থাকা একান্ত প্রয়োজন। চিকিৎসকগণও ইহার সহায়ে প্রভুত লাভবান হইবেন।

এই বাক্সের সহিত ১ একখানা “ব্যবস্থাপত্র” ও “কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা” নামক ১ খানা পুস্তকক অতিরিক্ত উপহার দিয়া থাকি। এই বাক্সের ২৬ প্রকার ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ পৃথক লাইলে প্রতি কোটার মূল্য ১, পাণ্ডায়ে। প্রত্যেক প্রকার ঔষধ ও সপ্তাহ করিয়া থাকে।



আরোগ্য করিবে। মূল্য এক শিশি ১, এক টাকা, ডাক মাসুল ৫০ আনা; তিন শিশি ২৫০ আনা, ডাক মাসুল ১০০ আনা।

বিশুদ্ধ পশ্মমধু ব্যবহারীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। নানাবিধ চিকিৎসায় যে সকল চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় নাই এবং ছানি না কাটাইলে যে চক্ষুরোগ আরোগ্য হইবে না বলিয়া ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, সেই চক্ষুরোগ আমাদের পশ্মমধু আশ্চর্যরূপে

শিবশক্তি বটিকা

মালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের যম

অর কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। মালেরিয়া, কালাজ্বর, নতুন ও পুরাতন জ্বর, পলীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর ও বিষমজ্বরের প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বরে আমাদের বহু গবেষণালব্ধ শিবশক্তি বটিকার শক্তি অসাধারণ। সর্ব সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ কৃতজ্ঞ ইহা পরীক্ষিত ও

প্রশংসিত। আর জ্বরের জন্য ভাবিতে হইবে না। বহু চিকিৎসক পরিভ্রম্য রোগী শিবশক্তি বটিকা ব্যবহারে নির্দোষরূপে আরোগ্য হইয়াছেন। মূল্য ১নং ১ কোটা ১০০ আনা, ২নং ১ কোটা ১০০ আনা, ৩নং ১ কোটা ৫০ আনা। ডাক মাসুল ৫০ আনা।

মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—৫,
৩০ মাত্রা ১১০ টাকা।
মকরধ্বজজরিত মকরধ্বজ
প্রতি তোলা—২০,
৩০ মাত্রা ২১০ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—৩০,
৩০ মাত্রা ৪, ৮ টাকা।
ডাক মাসুল ৫০ আনা।

কবিরাজ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের

মহৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪১নং আপার টিংপুর রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ

১ শিশি—২০, ডাক মাসুল—৫০

সুগনাভি

আসামের—১ তোলা—
৫০, টাকা।
নেপালের—১ তোলা—
৪০, টাকা।

স্বর্ণভস্ম

১ তোলা—১২৫, টাকা।

বুদ্ধ ও মান্নিবা

শ্রী খতীন্দ্রমোহন বাগচী

চম্পানগরে 'সুবসন্তক'—বসন্ত উৎসব;
পথে উপবনে ভবনে-ভবনে উঠে তারই কলরব।
নগরীর নটী শ্রেষ্ঠ রূপসী গৃহবাত্যনে একাকিনী বসি'
মুক্ত আকাশে মেলি' দিয়া তার ক্ষুদ্র নয়ন-মন,
জ্যোৎস্নাধারায় ভাসায় নীরবে বেদনার আবেদন!

সারা নগরীর বরসুন্দরী মল্লিকা নাম তার,
কৃষ্টিকলার শ্রেষ্ঠপ্রতিমা, মূর্তি সে প্রতিভার;
কত রস-রুচি শিল্প যতনে বাঁধে বাসা তার ঐ দেহমনে,
নৃত্য চিত্রে, সুবস বাণীতে তুলনা তাহার নাই;
যত জ্ঞানী গুণী নিশি নিশি আসি' সঙ্গীপায়সী তাই!

চম্পারাজে যুগ-রীতি,—যে-বা রূপসী কণ্ঠহার—
অনুভা যুবতী,— প্রকৃতিরই মতো ভোগ্যা সে সবাকার!
জ্যোৎস্না যেমন স্পর্শ-উদার, মলয়া যেমন মৃৎ-দুয়ার,
সেবা-অধিকার তেমনই তাহার সবার অনুক্ষণ;
সৌরভসম অকুণ্ঠ তার রূপ-রস-যৌবন!

—সেই মল্লিকা, কত না জনার কামা যে কামনার,
ক'র কামনায় আজি সে কাটায় বাঁজত নিশি তার?
যে পূর-গোষ্ঠী তার পাশে আসে নিতি সাক্ষে সুখসঙ্গিপ্যাসে,
কোন বেদনায় দৃষ্টি তাহার ক'র আজি পরিহার,
পর্বযামিনী যাপে একাকিনী একান্তে আপনার!



সারা নগরীর সেরা যৌবন প্রণয়-ভিখারী তার;
একখানি মুখ শুধু তারই মাঝে মনে পড়ে বারবার;—
নগরপালের তরুণ কুমার নয়ন-মনের আনন্দ তার,—
আনন্দ নাম,—এ তেনে সন্ধ্যা মিলন-বন্দ্য্য করি'
নবসাজ পরি' চোখেরই উপরি গেছে তারে পরিহার!

কাব্যরসের দোসর যেজন, সঙ্গীত-সহকারী,
নৃত্যকলার ছন্দে বশে অভিজ্ঞ অধিকারী;
তারে ছাড়ি' আজি নিষ্ফল রাত, নিঃপ্রভ চোখে চন্দের বাতি,
নমের সখা মমের সাথী সে ছাড়া নাই যে কেহ;
নিজরূপে তাই লাগে ধিক্কার, নিজগুণে সন্দেহ।

অদূরে কোথায় ডাকিছে কপোতী,—নিশি যায়, নিশি যায়;
জ্যোৎস্না-বিভোল মন্ত মলয়া থেকে থেকে শিহরায়!
মধু-মালতীর মদির সুবাস অধীর উজ্জ্বলে ফেঁদে নিশ্বাস;
পূর্ববাসী যবে মধু-উৎসবে ভরিছে রঙের ঝারি,
তারি মাঝে কাদে পিঁড়ি মায়া-ফাদে বসন্ত-রাণী নারী!

চতুর্দশীর চন্দ্র লুকায় দূর দিগন্তপারে;
বাথাতুরা নারী তেমনই জাগিয়া বসি' বাতায়ন-থারে;
কত-না চিন্তা, কল্পনা নানা বিহবগ সম ব্যাপটিছে জানা,—
আহত বাথায় পথ নাহি পায় বন্দ খাঁচার স্বারে,
সহসা ঘেন-বা টুটিল স্বপ্ন মনের অশ্বধার!



—মনে হ'ল যেন পুষ্পবনের নিখিল গন্ধ হারি
আকাশ ছাড়িয়া নামিল চন্দ্র আনন্দ-রূপ ধরি;
ধীরে ধীরে তার মুখে দিয়া চুমা, বলে নিশিভোর, ঘুমা সখি, ঘুমা,
অমনি ভাঁঙল তন্দ্রাজড়িমা, ফিরে এল সম্মুখে,
বাতায়ন-পথে প্রভাতের বায়ু শশিলা আর্চিবত!

মনে পড়ে গেল, গত বসন্তে হেন প্রভাতের কথা,—
প্রমোদবনের হিম্মালে সেই চঞ্চল ব্যাকুলতা;—
ফুল-রাশি ছিড়ি ভাগ্যের হাতে যেদিন সহসা আনন্দসাথে
অঘটনমুখে সেই বৃকে-বৃকে চাকিতের পরশন,—
সুখা-বিয়োগ-দেহা সেই সুখদেহা, শব্দিত শিহরণ!

জাগ্রত চোখে পড়ে যেন সেই ফণিক স্বর্গবাস,—
কোমার ভাঙা সেই লাজে-রাঙা যৌবন উচ্ছ্বাস;
প্রেম-বোধ হীন গত জীবনের নব জাগরণ দেহ ও মনের—
মন্দির-অধীর সেই দুজনের চঞ্চল চোখের চাওয়া,—
সেই বিহ্বল পলকের মাঝে আপনা হারিয়ে-যাওয়া!

তারপরে,—সেই নৃত্যসভার উন্মদ মধু-নিশি,—
রক্তের সাথে স্মৃতির স্মৃতি আজও আছে যেন মিশি!
সেই দুজনের সুখ-সংগতি ছন্দ ও তাল, বন্ধ ও যতি,
সুরভরঙ্গে নন্দিত গতি নন্দন-সভাপথে,
সারা নগরের গুণী-রসিকের বন্দিত মনোহরে!

সুকৃতি-অশেষ ভাগ্যের মতো, হায়রে, ঘটিল কি যে—
সুখ-সংগতে কেটে গেল তাল-কেমনে সে বর্ষদিন যে!
আনন্দ যেন আনন্দ নয়, কোথা গেল সেই প্রীতি-পরিচয়,
মল্লিকা মনে মনে বিস্ময়, কি যে তার অপরাধ,—
প্রণয়ের পথে যাছে জীবনের ফুরাইল সুখসাধ!

—কত অভিমান—ভেঙ্গে গেল সব, সে মনে না পেয়ে সাজা
সেতারের তার কেটে যেন তার, বেদনায় সুরহারা!
এই কি সে প্রেম, এই ভালবাসা! এই কি নারীর প্রাণান্ত আশা,—
এরি লাগি এত প্রাণের পিপাসা করেছে সে পরিহার,
হায়রে প্রণয়, নারীর ভাগ্য! হায়, তার অধিকার!

রূপজীবনী সে—নগরপালের গ্রহণ-যোগ্য নয়,—
বন্দুর মুখে ইঙ্গিতে শব্দ পেয়েছে সে পরিচয়!
প্রেমবন্ধন—তারও জাতিকুল! সমাজধর্ম—সেই নিভুল?
প্রাণের ধর্ম করে নিম্নলিখিত নিষেধের মানা,—
মানুষের গড়া আচার—সে দিবে দেবতার দ্বারে হান্না!

প্রাণের মন্ত্র অপৌরুষেয়,—বেদের উপরে স্থান,—
সাক্ষী তাহার অন্তরবাসী মানুষের ভগবান।
সংহিতা আর শাস্ত্রের বুলি চিত্ত তাহার তুলিল ব্যাকুলি,
তৃতীয় দৃষ্টি গেল যেন খুলি সহসা তাহার ভাল,
ব্রহ্ম বাঘিনী জাগিয়া উঠিল মনের অন্তরালে!

—লইল শপথ—করিবে না কমা, জীবন থাকিতে তার,
দৃষ্ট ছাড়িয়া অদৃষ্ট-হাতে অসহ অত্যাচার!
যেথা প্রাণ, সেথা শ্রম তাহার, তুচ্ছ আচার করি পরিহার,
বিচারের বলে প্রাণের ধর্ম মানিবে সে শব্দ আছ,
নিষেধের স্তর নাই গণি, অপরাধে নাই লাজ।

বিদ্রোহ তার অন্তরে জ্বলে, বিদ্রোহ বাণীমাঝে,
দৃষ্টি চোখে তার বিদ্রোহ-জ্বালা বহিঃশিখায় সাজে!
অতীতের রূপ—কোথা গেল আজ, নয়ন-ভোলান' প্রসাধন-সাজ
করিবে না আর,—সে যে বড় লাজ—প্রণয়ের অপমান;
বিদ্রোহে তার জাগিল নারীর মূর্ছিত সম্মান!

—শব্দ এক বাথা,—আনন্দ লাগি' প্রাণ করে হায়, হায়!
প্রেম-অঙ্কুরে অমর যে তরু, আনন্দে সে কি যায়?
মৃগাল-দন্ড—যদি ভাঙ তাহে, অন্তরে তার সূত্র না ছাড়ে
মমতা-ফণ্ড—বালির বেলায় সে কি কভু বাধা পড়ে?
গোপন-বাহিনী আপনা লুকায়ে শতধারে সে যে করে!



(২)

রাজপুত্রীবারে জাগিল প্রহরী, প্রভাতী উঠিল বাজি,
পূর্ব আকাশে উদিল অরুণ বাসন্তী রঙে সাজি;—
সহসা ডংকা পড়ে চারিভিতে— আজই প্রাতে এই চম্পাপুত্রীতে
উদবেন আসি' পুণ্যটিথিতে পূর্ণচন্দ্রসম—
প্রভু ভগবান সঙ্গত বৃন্দ চিরপুদ্গমোত্তম।

অমাত্যগণসঙ্গে নৃপতি অমনি পদব্রজে
নগর-ভোরগে বারিতে চলিল বৃন্দে পদব্রজে।
পৌরবৃন্দ চলে সাথে-সাথে যার যা' সাধা, উপায়ন হাতে,—
আবালবৃন্দ লজিতে প্রভুর দুল্লভ দরশন;
উৎসব ছুঁলি' নব উৎসাহে মাতিল সবার মন।

রাজপুরীমাঝে সঙ্কীর্ণ সভা মর্মর চক্রে,
যতেক স্তম্ভে চন্দ্রাতপের শব্দ বিতান ধরে।

কার প্রজ্জ্বল চারু শিলাতলে চিঠিখনি-শ্বেত শতদলে,
মুস্তার মালা ঝুলিছে ঝালরে অজস্র অগণন;
একান্তে তারই তথাগততরে স্বর্ণ-সিংহাসন।

সহস্রদল পদ্ম যেন সে ফুটিল কনক-সরে;
শুকতার সম আয়ত নয়নে দীপ্ত করুণা ধরে!
মুণ্ডিতশির সন্ন্যাসীদল গৈরিক যেন গঙ্গার জল;
ঢালে শ্রাবণের বন্যার ধারা জনসমুদ্রমাঝে;
গদগদনাদী গোমুখী যেন-বা মানবকণ্ঠে বাজে!

স্বাগতম্! সুস্বাগতম্! দেব, অমিতাভ ভগবান!
'শরণং গচ্ছামি' বলি' সবে বিকায় মনঃপ্রাণ।
চারিপাশে যেন ভিক্ষুকদল, ভিক্ষু হইতে বাসনা প্রবল,
পরিশি' প্রভুর চরণকমল গাহে সঙ্গীত-গান—
জয় জয় জয় শাক্যনয়, স্বাগত অধিষ্ঠান!

বন্দনাশেষে বুদ্ধ তাঁহার তুলিয়া পদ্মপাণি
আশিস সবারে ধীরগম্ভীরে বিলান অমৃতবাণী:—
জীবন-নাট্যের যবনিকা তুলি' মম'দৃশ্য দেখাইল ঝুলি'
দুঃখ-শোকের বিয়োগান্তক যত'কিছু অভিনয়:—
মিথ্যা জীবন, মরণের হাতে নিতি যার পরাজয়!

রূপ যৌবন মিথ্যা সকলই, মৃত্যু সত্য-সার;
প্রজ্ঞা সমাধি শাসনে কেবল পায় জীব উদ্ধার;
দুঃখশোকের শান্তি লাভিতে সিদ্ধি সাধনা চাই সমাধিতে,
বাসনার বীজ পাকিতে নরের নাহিক মোক্ষ-আশা,
ভোগের তৃষ্ণা ভুলাইতে নারে দুঃখের দুর্বাশা!

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি চলিল তত্ত্বকথা:—
সব সভাজন একমনে যেন পান করে সে বারতা!
নূতন দৃষ্টি লাভ' আজ সবে দীন যেন ফিরে' পায় বৈভবে,
সুখের আলো যেন-বা পাঁড়ল অন্ধনিশির বৃক্ষে,—
মুষ্টি-তরণী মিলিল সহসা বুদ্ধ-কারার মূণে!



সারাদিন ধরি' শুনিল সকলে, অসীম ভাণ্য মানি',
মানবমনের মুক্তি-নিধান বৈরাগ্যের বাণী;
ভিক্ষুদলের গেরুয়াবর্ণে চম্পাবাসীর মানসপর্ণে
ঘনতর হয়ে ঘনাইল ধং গৈরিকরাঙা বাসে;
বুদ্ধচরণে যতেক যাত্রী মিলিল মোক্ষ-আশে।

অমৃতকণ্ঠে বৈরাগ্যের উঠে জস-জয়নাদ;
পাণিমাচাড় করে শব্দে হেসে জ্বলন্ত প্রতিবাদ!
দলে-দলে লোক লাড়িয়া দীক্ষা করে বুদ্ধের করুণা ভিক্ষা,
শিষ্যপ্রধান আনন্দ শব্দে প্রভুর চরণতলে
ভিক্ষা জানায় জুড়ি' দুই পাণি, তিতিয়া নয়নজলে।

"জানি, দেব, তব অহেতুকী কৃপা এ অধমে সর্বদা,
তবু কেন দীনে মিলিলনা আজও তব 'উপসম্পদা'?
বৈরাগ্যের গৈরিকবাস পায়নি শব্দে এ অক্ষম দাস,
সবার অঙ্গে তব পবিত্র পতাকা দৌঁধতে পাই,
শ্রীচরণে মোরে ঠাই দিলে প্রভু, তবু তা যে মিলে নাই!"

(৩)

বিরল বসনে বিরল ভূষণে হেনকালে মালিকা—
অধিষ্-কোণে চাপা অগ্রুর আড়ে দু'টি প্রদীপ্ত শিখা!—
বুদ্ধচরণে নমি' বারবার জানায় কাতরে নিবেদন তার,
"তব নব বাণী শুনিয়াছি স্বামি,—সে শব্দে কথার মোহ,
অসত্য সেই তত্ত্বের মোর উত্তর,—বিদ্রোহ।



বিধির বিধানে বিশ্বের বুকে তুমি আদি-বিদ্রোহী;
তোমার বাণীর বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ-কেতু বহি।

ভিক্ষুতে তব ভিষে জগৎ বৃন্দ হবে এ সৃষ্টির পথ,
কিন্তু তোমার বিশ্বনাথের বিরুদ্ধপথগামী—
তোমার সত্য আমার মিথ্যা, তাই বিদ্রোহী আমি।”

শান্ত্যবসানে চাই' তার পানে রহিয়া কতক্ষণ,
অরুণ হইল বৃন্দের আঁখি, করুণ হইল মন।
শ্রীকরপদে আঁত ধীরে ধীরে পরখটি তার বুলাইয়া শিরে—
স্বপ্ন হইয়া প্রভু ভগবান রহিল নিরন্তর,—
তুয়া গণিয়া করি' পড়ে যেন করুণার নিষ্কর!

কণপরে ধীরে কহে মল্লিকা কটাহিয়া অবসাদ,
“ক্ষমাবিত প্রভু, অথবা জনার অবিনয়-অপরাধ।
দুঃখ-সুখের নূতন তত্ত্ব, যেমন করেই বল সে তথা,
মোর কাছে শুধু নয় অবোধা, অসত্য অভিযয়;
জরা ও মরণই সত্য যদি সে—যৌবন কেন নয়?

ফুলের গন্ধ ফুলের সুসমা মিথ্যা তোমার কাছে—
বর্ণ গন্ধ সবই যদি মায়া,—সে কি ফিরে' মরিয়াছে?
পুণি-মা-চাঁদ হোকা-মায়া-ফাদি আধার-কায়র সে যে প্রতিবাদ!
ভাগের অর্থ কোথা থাকে যদি ভাগের কেহ না মানে?
প্রকৃতিরই তারা যমজ-পুত্র সৃষ্টির উপাদানে!

যে কামনা মোর রক্তে নাচিছে, সেই তো জীবন মোর;
প্রাণতরঙ্গে মৃত্যু-ধারা যা' সে কি বন্ধনডোর?
বাসনাই মোর সৃষ্টির মূল, তারে বল' প্রভু, দৃষ্টির ভুল?
আলোক-বাতাস সার্থক কিসে? আমারই তো ইচ্ছা,—
মোরই কামনায় মূলরস পেয়ে তবে তারা প্রাণ পায়।

হিংসার কথা তুলিও না প্রভু, হিংসায় বাঁচে প্রাণ,—
একটো রাখিতে শতকে মারেন স্রাটে যে ভগবান!
এই জীবলোকে সজনে-বিজনে গিরি অরণ্যে গহে তপোবনে,
বিশ্ব ভরিয়া নিতানিয়াত যে সৃষ্টিলালা চলে,
হিংসাই তার প্রধান মন্ত্র-উগ্ৰীত পলে পলে।”

সুস্মিত মুখে বৃন্দ তথাপি রহিল বাকহীন;
যুক্ত যে তার ক্ষুরধার, বৃকি, বৃকে তাহা উদাসীন!
আশিস-হস্ত রাখি' তার শিরে স্নেহের আদর বুলায় সে ধীরে,
শুভ্রজপাটে চিত্তার রেখা বৃকি-বা ফুটিয়া উঠে—
পুষ্পের বুকে পিপীলিকাসম পূজার পটপটে!

(৪)

চম্পানগরে আজ বৃন্দের এল বিদায়ের পালা,
বিজয়ার ছায়া শ্রীহীন করেছে বিজয়োৎসবশালা!
রাজের লোক নূতন ধর্মে ছোপায়ে বসন মনের মর্মে
প্রভুর কৃপায় ভিক্ষু-দীক্ষা লয়ে যায় দলে-দলে;
নানা উপদেশে স্তবে আরাধনে রাত্রি বাড়িয়া চলে।

বৃন্দ আদেশে আনন্দ আসি' শূভদীক্ষার তরে
নতজানু হয়ে প্রভুর সম্মুখে বাসিল ভক্তিভরে।
‘উপসম্পদা’ সবে সূর্য হই— মল্লিকা আসি' এ হেন সময়
বন্যার মত ভাঙিয়া পড়িল বৃন্দের রাজ্য পায়—
অনুচ্চারিত রহিল মন্ত্র,—বিশ্বদে, বেদনায়।

কুন্তলভার ধূলায় এলায় প্রভুর চরণ-চাকি';—
পশ্ম বেড়িয়া লুটে যেন বাণ-বিশ্ব বনের পাখী! •
কার্দী কহে, “দেব, বড় দয়া শুনি, মোরে করি' লহ তব ভিক্ষুণী
আজ হাতে তব অপার কৃপার সঙ্গ না যাব ছাড়ি',
সুখহারা এই শূন্য জীবন আর তো সহিতে নারি।”

উত্তরে শুধু কাঁহা বৃন্দ করুণাসিক্ত স্বরে,
“মল্লিকা, শোন উপদেশ মোর ফিরে' যাও তুমি ঘরে;
চম্পায় যবে ফিরিব আবার, সিন্ধু হইবে বাসনা তোমার,—
এত বল প্রভু বাতার লাগি' ভারতে দাঁড়ায়ে উঠে;
মল্লিকামুখে, কি ভাবি, না জানি, আনন্দালোক ফুটে!

চম্পা হইতে সেই যাত্রাই হইল তাহার শেষ;
সুভাষিতামতে ধর্মবাণীতে ভরি' দিয়া দিক্‌দেশ,
হিরণ্যবতী নদীর ওপারে কুশীনগরের অরণ্যধারে
ভিক্ষুপ্রয়াসী আনন্দ কোলে মাথাটি রাখিয়া তার—
শেষ-লিঙ্গবাসে রক্ষিলা প্রভু নম্বর দেহ-ভার।



(৫)

কয় বৎসর গেছে তারপর, তথাগত কথাক্ষেপ;
বৃন্দ-কিরণ সম্পাতে ধীরে উজ্জ্বল, উঠে দেশ।
সংঘের কাজ লয়ে নিজ হাতে আনন্দ নব উৎসাহে মাতে,
কর্মের ভার বাঁহ' চলে তার শূঁখিতে প্রভুর ঋণ;—
কস্তুরীমৃগ আপন গন্ধে ছুটে যেন নিশিদিন!

উদয় হইতে অস্ত অবধি বিশ্রাম নাই জানে;
যেথায় রাত্রি, পথের বাহাি দেহ চলে সেইখানে।
কোথা নালন্দা, বিদিশা, কোশল, কোথায় মথুরা, পারা, পিঙ্গল
নূতন ধর্ম প্রচারের লাগি' উদ্যম অনিবার,—
আর্যাবর্ত জুড়ি' বৃন্দে পড়ে জয়-জয়কার।

—চম্পায় সেই মধু-পুণিমা, গত সে তো কতদিন,
জ্যোৎস্নায় মেধা কত স্মৃতিশ্রুতি সেই হাতে স্মৃতিলালিন;
কত দীক্ষা-বারু-বসন্ত ফুলবাস হয়ে হয়েছে অস্ত,
যৌবন-বনে কত বিহঙ্গ দিয়া গেছে সুখসাদা,—
প্রভুর কৃপায় আনন্দ কাছে সবই আজ সুরহারা!

—একখানি মৃৎ তবু থেকে থেকে চোখে ভেসে উঠে তার,—
কামনা-গড়া সেই মায়াভরা মূর্তি মল্লিকার!
প্রভুর স্নেহের প্রত্যাধিকারী বাকবৈভব অপূর্ব নারী,
ভিক্ষু-দীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে যার লাগি বারেকার,
বৃদ্ধ আদেশে সঙ্গ যাহার করেছে সে পরিহার!

নীতি, উপদেশ, আচার, ধর্ম, দশশীল ব্যাখ্যান—
গুরুদর মা-কিছু গ্রন্থে গাঁথবে—এই আজ তার ধ্যান।
মীমাংসা ভারী করিবারে স্থির অহংসাতে যতক স্থাবির—
সম্মিলিত মহাসংগীতি করেছে সংগঠন—
রাজগৃহে আজই সন্তপণী গৃহায় সে আয়োজন।

উঠে কলরব, শূভ উৎসব—সময় প্রভাতকাল;
গেরুয়া-ছটায় রৌদ্রের আলো রাঙিয়া হয়েছে লাল!
দিক্দেশ হ'তে সভার জনা মিলিয়াছে আসি জন-অরণ্য,—
কত উপাসক, কত দর্শক, কত না ভক্তজন—
বারাণসী হ'তে শ্রাবস্তী সীমা-অপূর্ব সে মিলন!

শোভাযাত্রায় চলে আনন্দ স্থাবির দলের মাঝে,
বৃদ্ধদেবের জয়গান সাথে তৃষ্ণা-উজ্জ্বল বাজে।
পুষ্প ও লাজে ভরে ওঠে ঠাই, লোকারণ্যের সীমালেশ্য নাই;
বিরাট জনতা বিশ্বা-বিভিন্ন ধীরে দেয় পথ ছাড়ি,
—এ হেন সময় বৃদ্ধবাসে কেবা আসে ঐ নারী!

(৬)

মল্লিকা আসি হৃদয় ধরিতে বসনপ্রান্তখানি,
চমকি 'খমকি' থামে আনন্দ, মুখে নাই তার বাণী!
প্রভুর আদেশ করিয়া স্মরণ চকিতে টানিয়া লয় সে বসন,—
সবল মূর্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি নাই তবু,
ডাকে মনে মনে, "অশরণ জনে উদ্ধার কর, প্রভু!"

বৃদ্ধকণ্ঠে কহে মল্লিকা,—"জানি তব পরিচয়,
আনন্দ মোর, বৃদ্ধ আমার, তুমি তো ভিক্ষু নয়।"
বৃদ্ধ প্রেমের দীপ্ত গরিমা ক্ষুধ প্রাপ্তের দীপ্ত মহিমা
সৌন্দর্যের নাই বৃদ্ধ সীমা আজ সে মল্লিকার;
শতজন্মের বাসনার শিখা ঢেকে জ্বলিছে তার!



প্রচণ্ড বলে আনন্দ তার বসন লইল টানি,—
সে শক্তি কিসে ব্যর্থ করিবে অবলার ক্ষীণ পাণি?
সেই গুরুবেগে পড়ে সে ধরায়, শিলা-সংঘাতে চেতনা হারায়!
কুণ্ঠাবিহীন চলে আনন্দ না করিয়া দুঃপাত,
দ্রুততর পদে, ছাড়িয়ে যেন-বা মোহন মারের হাত!

গিরিগৃহাতলে মহাসংঘের নৈষ্ঠিক প্রথামত
সিম্পাতের মস্তণা লাগি মাতে অহং যত।
পথ বল ও সন্ত আচার, সঙ্কটভুক্ত, বিনয়, বিচার,
অহংসা, শূচি, ঋণ ও রুচি, সমাধি ও নিবাণ;
তর্কে, আলাপে, মন্ত্রে ও শ্লোকে কেটে যায় দিনমান।

আগত গোথলি,—কাটিল না তবু মূচ্ছা মল্লিকার;
ভক্তের ভাবে—ভক্তির কিবা শক্তি চমৎকার!
এই তো প্রভুর সমাধি-সাধিকা, এই তো বৃদ্ধি ধর্মোপাসিকা,
আনন্দ শূদ্ধ উন্মাদা হ'য়ে চাহে দিগন্তপানে,—
দিনান্ত-চিত্তা যেথা হ'তে তার রক্ত নয়ন হানে!

সম্ভাপরণে চেতনা লভিয়া ধীরে উঠে বসে নারী—
উৎসর্গে পাশে স্থবিতীয় উৎস,—নয়নে উৎস-বারি!
সভা-শেষে যবে জন-অরণ্য শতমুখে গাহি ধনা ধনা,
এই পথ দিয়ে যবে ফিরে—গাহি বৃদ্ধের জয়গান,—
তার পাশে বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠে দুঃখীর ভগবান!

(৭)

রাজগৃহে আজ ধূসাবশেষ,—কেবা করে কার নাম?
কোথা বৈভার, সন্তপণী, কোথায় তপোদারাম!
কোথা অহংসা, কোথায় শান্তি? চিরমানবের মনের দ্রাবি
ভেমনই চলিছে—সেই আগে-পিছে জরা-মরণের পথ,—
দুঃখ-সুখের যুগ্মাবে চলে বিশ্বনাথের রথ!



সুখ-দুঃখের অসীত জীবন গড়িতে নতন করি
ত্যাগের ভিত্তি রচনার আশা ভোগেরই রাজ্য ভরি!

—কোথা গেল সেই পুণ্যকীর্তি? কোথায় বা সেই ত্যাগের ভিত্তি?
যেমন মানুষ তেমনি চলিছে প্রকৃতির নিরেশে,—
বাসনা হরণে আমুষ হো আর পাথর হ'ল না শেষে?

কামনার হাতে নিষ্কৃতি পেতে, পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
জড় লাগি' তপস্যা যে-বা, চাহি' মোক্ষের মুখ,—

কৃচ্ছকঠিন সেই যে সাধনা— যদি বলি, সেও নতুন কামনা,
সহজ মার্গ এড়ায়ে সে শুধু অন্য ভিন্ন পথ,—
সম্যাসী বাহে খর জেড়ে যায় মরু-দরি-পর্বত!

দিনরাত্রির আধারে-আলোকে চলেছে কালের চাকা,
বাহি' বিচিত্র সৃষ্টির লীলা—বিভিন্ন রঙে আঁকা!

প্রকৃতির চির-নৃত্য-সভায় জয় স্বস্তি নাচে ধরা-আড়িনায়,
শ্যামল-স্বর্ণে বিবিধ বর্ণে' বারে-বারে ঘুরে-ফিরে;
চলিয়াছে চির-আরাতি-নৃত্য নটরাজ-অম্বরে।

বৈরাগ্যের গৈরিকে নাহি ষাধ বস্ত্রের রাঙা!

ধরণী ভাসায় যে অশ্রু,—সে কি ছাড়ে বৈরাগী-ডাঙা?

ভগবান এসে বলে যায় ভুল, সে ভুল কাটে না তবু একচুল!
বাসনা-কামনা তেমনই চলিছে মানবের সুখে-দুখে,
প্রণয়ের শিখা তেমনই জ্বলিছে প্রেমিকের বৃকে-বৃকে!

রাজগিরি-বৃকে আজও হেরি' সেই উষ্ণ-প্রস্রবণ,
মনে হয়, বৃক্ষি—মল্লিকারই সে অনন্ত ক্রন্দন!

কত-না বিহার, পত্ন নবরূপে পরিণত আজি ধ্বংসের স্তূপে;
বিরহের চোখে অশ্রুধারাতে নিভে না সে প্রেম-শিখা;
—তাই ভাবি, ঐকি! কারে ফিরে' দেখি—বৃক্ষ, না মল্লিকা?

যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তির উপর বর্তমান গাথা-
কাব্যটির রচনা সম্ভবপর হইয়াছে, দিল্লীর সুপরিচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
সুকুমার দত্ত মহাশয়ের 'মল্লিকা' আখ্যানটি তাহার অন্যতম। ভারতের
শিচারসহ ইতিহাস নাই; তাই, বৃক্ষদেবসংক্রান্ত আড়াই হাজার বৎসর
পুর্বেকার ইতিবৃত্তের উপাদানের উপর লিখিত বর্তমান প্রেমমূলক
কাব্যখ্যানির সৌকর্যার্থ অনেকখানি কল্পনার রং চড়াইতে সাহস
করিয়াছি। কারণ কাব্য কাব্যই, ইতিহাস নহে।—লেখক।





১
বাথখুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।
শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী
প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছি মিছি আমায় এত
ভাবিয়েছিলে। কত রকম 'হয়তো' যে এসে
আমায় চিন্তিত করে তুলেছিল তার আর ঠিক
নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না?
কত বড়? ক'হাত লম্বা ক'হাত চওড়া চিঠি
তা? শেলী রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয়



তুমি আমার মনের কত নিকটে

কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটন' ফরমাস করে
বসছ কেন, পর তো দুল হঠাৎ 'পাইজোর'
চাইছ কেন বুঝতে পারছি না। শাক্—চেণ্টা
করব তবু।

রাগ করেছি কি না? তুমি এ অবস্থায় কি
করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী
হয়েছিল কিন্তু। আমার গা বেঁসে আশংকাও
থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই

তোমার চিঠি আশী করছি। দু'একদিন পোস্টা-
ফিস পর্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই
খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাসি এখনও সারছে
কেন বলত? কাসি একেবারে না সারা পূর
গান গেলো না। সেরে গেলেই গাইতে
কিন্তু। তুমি লিখেছ, "ভগবান বোধহয়
করে" বিয়ের সময়টুকু পর্যন্ত গানের
একেবারে নষ্ট করে দেন নি। ভগবানের
দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গান
কি দরকার....."

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে
প্রভু যা যা করবার তা'তো করেইছ, এ
করে তোমার দয়াটুকু ফেরত নাও, আ
গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কিছু
দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবান
আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আমি
সিঁমুর জন্যে অনুরোধ করতাম একটা
বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি।
জনো ভাবছ কেন? তোমার টিউটারে
আমি যেমন করে হোক পাঠাব। লিখে
শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে
যেটা পরে শিখব বলে ফেলে রেখেছি
শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো
অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই, অ
আরম্ভ কর সেতার।

.....এখন রাগি অনেক। রাস্তায়
চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে
বোধ হয়। বোধ হয় বলছি তার কা
প্রোট 'টাইম পুঁসিটি' কেন জমি
সাতটা এগারো মিনিটে থেমে
যেন একটা তম্বুর ভাব। পঞ্চা
যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হ
হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের

ঘন্টা উঠেছে। আমার কিন্তু
ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল
হিন্দী প্রাণ উনমাদনী—
চেয়েও—

পাত মোদিত
মাতিয়া

ডাহুকী
তিয়া

ন লাগে আমার।
ন মুখের তুলনা
প্রিয়া ছিল না,
ও লাগে নি।
দর কোন-
একটুও
চাঁদের
দুরই।
নয়ে
ছ

পাছি তুমি শূন্যে ঘুমুচ্ছ...এলোমেলো কয়েকটা
চুল কাপছে কপালের উপর...কান দুটি চুল
দিয়ে ঢাকা...চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা
রেখে ঘুমুচ্ছ.....

২

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

একি শূন্য কথাই? মনের কথা নয়? কি
জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে
মাঝে। বিয়ের পূর্বে এ'র সম্বন্ধে যা শুন-
ছিলাম, বিয়ে করে' দেখলাম ঠিক সে-রকমটি
নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ গোছের!
সর্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর
করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশঃ কতদিন
কাটল। ক্রমশঃ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন
মনে হচ্ছে ঠিক চিনতে পারি নি। অথচ এক-
সঙ্গে কুড়ি বছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস
করেছি। এক বিছানায় শুলেছি। এ'রই সাতটি
সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-
স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি
ছিলাম। কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি,
আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে জগতেব
লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ
করতাম। চিঠিতে ঠুর কান্ত-কোমল রূপ
টে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক
নন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া
জর লোক ছিলেন। পান থেকে চূর্ণ
উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া
থাকতেন এবং নিজ'নে থাকতে ভাল-
না। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও
হতেন। বকতেন, এমনকি মারধোরও
। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি
ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে।
লে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে
'কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ঠুরও
নেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন
ীবনই উনি এমনভাবে কাটিয়েছেন।
র ঠুর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে
তন জানি না। মোট কথা, আমি
রিনি ঠুরকে। একটা জিনিস কিন্তু
কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে
ধান অকর্তব্য করেন নি। আমাদের
তক কোন অসুবিধা ঘটতে দেন নি।
'চে ছিলেন, আমাদের কোন কষ্ট ছিল
র পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের
রে' গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে
শহরে পাকা বাড়ি করে' গেছেন, লাইফ
ওরেন্স করে' গেছেন। সেদিক দিয়ে
র কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সংগীকে
একটা অভাব বোধ করছি বই কি।
কথা। তিনি ম'খে যদিও বলেন নি
(চিঠিতে অন্ত কথা লিখতেন,
তেন না কিছু) তবু এটা আমি
ব'বে, তিনি আমাকে ভাল-
বনের সে ঘটনাটা ভুলব না

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, "চিকিৎসা
জন্মে নয়—দেখা করবার জন্মে, ত্রেণে
পাঠিয়েছি। চল্লুম—"

"কোথায়?"

"কোথায় আবার। হুকুম এসেছে—"

"ওসব কথা বলছেন কেন। কোন কষ্ট

হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু

নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও—"

"কোনটা গাইব।"

"যেটা খুশি।"

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, গান না।"

ধরলাম—"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে..."

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-
চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অশ্রুত
ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাশ্রা ভর করে।



একবারেই চিনতে পারছো না—না?

যে কোন লোকের প্রেতাশ্রা সে নাকি আনতে
পারে। সেদিন বকুল মাসীকে আনিয়েছিল
নাকি। বকুল মাসীর গলার স্মরণ নাকি অবিকল
শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

৩

নীলিমার চোখমুখ হঠাৎ কেমন যেন
বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল
যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে
আমার দিকে চেয়ে আছে!

"আমাকে ডেকেছ কেন?"

অবিকল তাঁরই গলার স্মরণ।

একটু ইতস্ততঃ করে' বললাম, "আমাকে
চিনতে পারছ না?"

"না।"

"একবারেই চিনতে পারছ না?"

"না।"

"আমাদের মনে পড়ে না তোমার?"

"না।"

"একটুও না?"

"না।"



‘চৈতে কুয়া, ভাদরে বান,—নরমুন্ড গড়াগড়ি যান।’ খনার বচনে আছে। তেরশো পঞ্চাশ সালের কার্ডিক মাস, লোকে ওই কথাটা নিয়েই আলোচনা করে প্রায় সারাদিন। গত চৈত্র মাসে কুয়াসা হয়েছিল কিনা—একথায় কেউ বলে—ওরেঃ বাপরে! একবারে কাঁচা কয়লার খোঁয়ার মত চারিদিক ঢেকে গিয়েছিল; মনে নাই? কেউ বলে—হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনে পড়েছে। কেউ ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ ঘাড় নাড়ে যার অর্থ হ্যাঁ অথবা না দুই হাতে পারে। কেউ বলে—উংহু! নাঃ; তা’ ছাড়া চৈত্রে কুয়াসার সঙ্গে নরমুন্ড গড়াগড়ি যাওয়ার সম্বন্ধটা যে কোথায় তা’ ঠিক ধরাও যায় না।

মিহির মুখুজ্জের কাঁচা বয়েস, তাজা রক্ত, তার ওপর ডাক্তার মানুষ, সে ঠেঁটি বোঁকিয়ে হেসে বলে—যে দেশে আকাশে অমাবস্যা লাগলে পায়ে বাত টাটায়, সেই দেশেই চৈতে কুয়াসা হলে আট মাস পরে নরমুন্ড গড়াগড়ি যায়। মধ্যে মধ্যে চটেও ওঠে—বলে—মা চণ্ডী আছেন, শনি-সতানারায়ণ আছেন, বিপত্তারিণী আছেন তোমাদের—তাদের কাছে যাও না। রাত দুপুরে অমায় জ্বালাতে এস কেন? চরণোদক খাওয়াও গে রুগীকে—ওষুধ দেব না আমি। যা তোদের ওই চণ্ডীমায়ের পাণ্ডা ভট্টাচার্য্যর কাছে; যা—ভাগ—ভাগ এখান থেকে।

মিহির ডাক্তারের তয়ানক রাগ ওই ভট্টাচার্য্যর ওপর। হ্রিপদ্রা ভট্টাচার্য্য—চণ্ডীমায়ের পূজক প্রবীণ মানুষ—অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আচারে আচরণে অতটুকু ফাঁকি নাই, চণ্ডীমায়ের সেবা করেন প্রাণ ঢেলে, চোখ বৃঞ্জে ধ্যান করতে বসে—চোখের কোন থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মায়ের নাম করতে আবেগে প্রৌঢ়ের ঠোঁট দুটি কাঁপে—লোকে বলে—গভীর রাতে নিজনে মায়ের সঙ্গে হ্রিপদ্রা ভট্টাচার্য্যর কথাবার্তা হয়। পাথরের মূর্তি থেকে মা না কি বেরিয়ে এসে

ভট্টাচার্য্যর মাথায় হাত বুলায়ে দেন। অশ্রুত স্বাস্থ্য তাঁর—আজও পর্যন্ত কখনও ওষুধ খান নাই। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা—গারে কখনও জামা কি চাদর কিম্বা আলোয়ান কিছুর দেন না, মাথায় ছাতা নেন না, পায়ে জুতোর কথা এর পর বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ গায়ের লোক—যারা অপর জায়গায় গিয়ে ভট্টাচার্য্যর গল্প করে—তারা অশ্রুতঃ প্রয়োজন বোধ করে না। ভট্টাচার্য্য হাসেন ডাক্তারের কথা শুনে। বলেন—উই পোকার পক্ষোপাশমের আশ্ফালন। দু-জনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা লড়াই চলে আসছে।

এই ঝগড়া চলে আসছে নৈপথ্য স্বন্দ্রের মত। দু-চারবার মুখোমুখি ঝগড়াও হয়েছে। সেবার হঠাৎ একদিন মিহির ডাক্তারকে ডাকতে এল হ্রিপদ্রা ভট্টাচার্য্যর ছেলে। তার ছেলের অর্থাৎ ভট্টাচার্য্যর নাতির জ্বর হয়েছে; সাতদিন কেটে গেছে, কিন্তু জ্বর কোন-ক্রমেই বাগ মানেন নাই, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, পেটে বেদনা, মাথায় ব্যস্তগা, জ্বর একবারের জায়গায় দিনে দুবার বাড়ছে, প্রবল জ্বরের সময় দু-চারটে জ্বলও বকছে রোগী। ভট্টাচার্য্যর ছেলে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধরে বলেছিল—ডাক্তার বাবু, খোকাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিল—হ্রিপদ্রা ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে একটু রহস্য করবে কি না; কিন্তু অকস্মাৎ ভট্টাচার্য্যর ছেলের আকৃতিতে সে সশস্ত্র হয়ে উঠল—তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চমকে গেল। ভদ্রলোকের দু-চোখের কোল থেকে জলের দৃষ্টি ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে দরদী পরমাখ্যায়ের মত বললে—এ কি? তার জন্মে আপনি কাদছেন কেন? জ্বর আর কার না হয়! চলুন এখন আমি যাচ্ছি, ভয় কি! আমি বলছি ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্য্যর ছেলের নাম মিহিরজা; গিরিজা চোখের জল মুছে একটা গভীর শীঘ্র নিশ্বাস ফেলে বললে,— বাবা বলছেন ডাক্তার

বাবু—। আর সে বলতে পারলে না, বৃকের ভিতর থেকে কামা চলে উঠে তার গলার ভেতরটা ঘেন চেপে ধরলে, শব্দে তেঁট দৃষ্টি ধর ধর করে কাঁপতে লাগল। বড়ো হাওয়ার তাড়নার অম্বখের পাজার মত।

—কি বলছেন আপনার বাবা? রাগে বিরক্তিতে ডাক্তারের কপালের মশ্ণ চামড়া কুঁচকে উঠল, গলার স্বর রুঢ় হরে উঠল।

অনেক কণ্টে গিরিজা আত্মসম্বরণ করে বললে—বাবা বলছেন—ডাক্তার ডাকি ডাক, কিন্তু মায়ের ইচ্ছের ওপর কারু হাত নাই।

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বললে—মা তো পাথরের, তার আবার ইচ্ছে আনিচ্ছে কি?

গিরিজা শিউরে উঠল, কিন্তু প্রতিবাদ করে ডাক্তারকে চটাতে সে সাহস করলে না।

মায়ের ইচ্ছের কথা হ্রিপূরা ভটচায় নিজেই বললেন ডাক্তারকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে ডাক্তার চিন্তিত মুখেই বাইরে এসে কল বন্ধ থেকে ওষুধ বের করে নিজে হাতে মিকশচার তৈরী করে দিলে, ইনজেকশন দিলে, একখানা কাগজে যথা সম্ভব সরল ভাষায় কখন কি করতে হবে লিখে দিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত হ্রিপূরা ভটচায় একটি কথাও বলেন নি। এবার অশ্রুত একটু হাসি হেসে বললেন—দেখলেন?

—দেখলাম। টাইফয়েড। দেখাতে একটু দেবী হয়ে গেছে।

হ্রিপূরা ভটচায় নীরবে আবার একটু হাসলেন। ডাক্তার বললে—রোগ অনেকটা বেড়ে গেছে। তা থাক। ভর নেই সেরে যাবে।

ভটচায় ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থ তার সুস্পষ্ট।

ডাক্তার এবার ফেটে পড়ল। বললে—আপনি কি মানুষ?

ভটচায় বললেন—মানুষ বড় অসহায় ডাক্তারবাবু, তার কোন হাত নাই।

—কি বলছেন আপনি?

—ও ছেলে বাঁচবে না।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভটচায় বললেন—সে কথা গিরিজাকে আমি বলেছি। তবে বাপের মন, যা করতে চায় করুক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু—

কথা অসমাপ্ত রেখে হ্রিপূরা ভটচায় আবার হাসলেন।

ডাক্তার অত্যন্ত রুঢ় ভাষায় কঠিন কণ্ঠে বললে—আপনি এসব বলবেন না ওদের কাছে। ওরা নাভীস হলে সেবা স্বর ঠিক মত হবে না, রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হবে।

হ্রিপূরা ভটচায় বললেন—মা আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ডাক্তার-বাবু, ও রোগ সহজও নয়, কঠিনও নয়—ও রোগ মৃত্যু রোগ।

শব্দে একদিন নয়, আটটা দিন পর্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে ঘেঁ-মানুষে টানাটানি চলল; এই আটটা দিনের প্রথম সাত দিন বাদ দিয়ে একশ দিনই হ্রিপূরা ভটচায় ওই একই কথা বলেছেন—একই হাসি হেসেছেন, একই স্থির শান্তভাবে বাইরের দাওয়াটির উপর বসে ডাক্তারের রোগী দেখে বসিয়ে আসার অপেক্ষা করেছেন। ডাক্তারেরও যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, সে ফিজের কথা বলে নাই ওষুধের দরমর হিসেব রাখে নাই, নিজে থেকে প্রত্যাহ দূরার করে নিয়মিত রোগী দেখেছে, দরকার বুঝলে রাতে পর্যন্ত থেকেছে; আটত্রো দিনের রাতে, একশ দিনের রাতে, আটটা দিনের রাতে সে সমস্ত রাত্রি রোগীর বিছানার পাশে ঠায় জেগে বসে থেকেছে। আটটা দিনের রাতে তিনটার পর মিহির বেরিয়ে এল রোগীর ঘর থেকে।

হ্রিপূরা ভটচায় হাওয়ার উপর বসেছিলেন, ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বললেন—ভায়া মা! তারপর সুস্পষ্ট একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—“সকাল ভোমারই ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী ভায়া ভূমি।”

ডাক্তার রুঢ় স্বরে বললে—না। আপনার ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। অজ্ঞের ভাইসি কেটে গেছে।

ভটচায় আজ চমকে উঠল।

ডাক্তার বললে—কাল থেকে রোগীর অবস্থা ভালোয় দি চলবে মনে হচ্ছে। সবিস্ময়ে ভটচায় ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল।

ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা হ'ল না, ছেলেটি এরপর ধীরে ধীরেই উঠল। প'য়তাল্লিশ দিনের পর সে অল্পখা করলে।

আরও একবার হয়েছিল এমনি প্রত্যাক সংঘর্ষ।

গ্রামের ধনী জমিদারের মাড়হীন দৌহিত্র, মাতামহ মাতামহ যাকে বলে চক্কর মণি; দূরন্ত ছেলে চুরি ক'রে একটা সুদেশ ম' দিয়ে মেকের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; তারপর ক্রমশঃ প্রচণ্ড আঁপের সঙ্গে ধনুকের মত বোঁকতে আরম্ভ করলে। মিহির ডাক্তার ল' দেখে অনেক অনুসন্ধান আবিষ্কার করলে ঘোড়ার আস্তাব খেলতে গিয়ে হুঁচট খেয়েছে, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠে গেছে কথটা অনেক দিনের, তখন গত মহাযুদ্ধের আমল, ওষুধ এ দে



সবিস্ময়ে ভটচায় ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তখন তেমন তৈরী হ'ত না, ভারত মহাসাগরে 'এমডেনের' দৌরায়ে বিদেশ থেকেও মাল আসত না; মিহির ডাক্তারের যে ওষুড়ির দরকার ছিল সে কোনক্রমেই পাওয়া গেল না। বড়লোকের বাড়ী, মিহির ডাক্তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে স্পষ্টই বললে—ওষুধ নেই—আমার কোন হাত নেই।

ওষুধের অভাবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এলেন; দেব-মন্দিরে পূজা গেল, স্বস্তায়ন আরম্ভ হল। কলকাতার ডাক্তার মিহির ডাক্তারের কথাই সমর্থন করলেন—কোন আশা নেই।

মাতামহী মাঝে মাঝে পাথরের মেশের উপর মাথা কুঁতে আরম্ভ করলেন; তার সে বৃকফাটা কামার বাড়ীটা ভরে গেল শ্বাসরোধী শোকের আবেগে। ছেলেটি বিছানার উপর পড়ে আছে—নিখর নিস্তম্ভ। শ্বাস প্রস্রাব পড়ছে বলে পাজরের উপরটা শব্দ নড়ছে; মধ্যে মধ্যে এক একটা আকোপ আসছে আর সমস্ত লোক শ্বাস ধুঁষ করে স্থির দাঁড়িয়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকছে—হয় তো হঠাৎ এখনি সব স্থির হয়ে যাবে।

সামান্য এক টুকরো ঐ তুলো জুড়ালিরে সুচটাকে পরিশোধন করে নেয়।
ডাক্তারখানার বাইরের পাওয়ার বসে শশী ডোম বলে—ডাক্তার বাবু!

—কে? শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি? কুইনিন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোগীতে কুইনিন পাচ্ছে না, তাকে কোথেকে দেব রে?

শশী বললে—আজ্ঞে, তা হলে ষ্ঠে আমি মরে যাব বাবু।

রোগ ধরলে—। শশী চুপ করে যায়। ডাক্তার একটু হাসে।
বলে—কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে? এই ধান চালের বাজার তার
ওপর তোর আবার রাত্রের কাজ! কি রে? ডাক্তার এবার হা-হা
করে হাসে।

শশী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে। সেও
মুচকে মুচকে হাসে। এবং সে হাসিটুকু অপরের কাছে লুকোবার
জেনেই সে মুখ নামায়।

(দৃষ্ট)

শশী ডোম এ অঞ্চলে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। সরকারী মহল
থেকে ভাষারী-নির্ধার, এমন কি এখানকার কুকুরগুলো পর্যন্ত
তাকে চেনে। সে হিসেবে শশীর খ্যাতিকে অস্বীকার করা চলে
না; তবে বিখ্যাত নয় কথ্যাত শশী এখানকার পাকা দাগী চোর।
শশী ম্যালেরিয়ার সময়টায় কুইনিন খায়। শব্দ এবার এই নরমুণ্ড
গড়াগড়ি খাবার বছরেই নয়—বরাবরই সে খায়। “কান্তিকের সাত
সন্ধ্যারের আট, ভাতার পুতকে যতনে রাখ, হাঁড়ি তুলে শূধাবি ভাত।”
এ সময়টার পেটপুড়ে খেতে দিতে পর্যন্ত বারণ আছে। শশী
সেও পালন করে। কুইনিন খাওয়ার উপকারিতা সে বন্ধে এসেছে
জ্বলে। সে অনেক দিন আগে—শশীর তখন কাটা বয়েস, জেল

বোধ হয় দ্বিতীয়বারের জেল, বর্ধমান জেলে করেদীদের মধ্যে
কম্প জুর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সম্ভাহে দুদিন কি তিনদিন
করেদীদের ফাইল বন্দী অর্থাৎ সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে জেল ডাক্তার
প্রত্যেকের হাতে দিত এক একটা কুইনিনের বাড়ি; তারপর জমাদার
হাঁকত—স—র কা—র!

করেদীরা সেলাম দিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিত কুইনিনের বাড়ি।
এর ফলে শশী ওই কম্পজুরের লক্ষ্যকাণ্ডের মধ্যেও মহাবীরের মত
অকম্পিত শরীরে দিন দিন উত্তরোত্তর শক্তি সামর্থ্য লাভ করেছিল;
সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল ‘কুনিয়ানের’ উপকারিতা। অবশ্য
আরও একটা বল তার ছিল—গিপুড়া ভট্টাচারের দেওয়া ‘মা-চণ্ডীর’
আশীর্বাদী দিয়ে তৈরী করা মাদুলী; কুনিয়ান খাওয়ার সঙ্গে
মাদুলীটা ধুয়েও সে নিয়মিত জল খেত। ডাক্তারেরা বলেন,
গ্রাণ্ড সহযোগে কুইনিনের কার্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর
ধারণা ভট্টাচারের মা চণ্ডীর মাদুলী খোয়া জল সহযোগে ডাক্তারী
‘কুনিয়ান’ অব্যর্থ। “মালোয়ারীর বাবারও সাধা নাই যে কাছে
আসে।” শশী তার সহচর অনুচরদের বহুবার এ কথা বলেছে।
কিন্তু তারা তেতো বলে আর কাণ ভেঁ ভেঁ করে বলে কুনিয়ান
কিছুতেই বরপাস্ত করে উঠতে পারে না।

শশী মিহির ডাক্তারের দোকান থেকে ম্যালেরিয়ার সময় নিয়মিত
কুইনিন কিনে খায়, চণ্ডীতলায় যায় কোনদিন দুটো কলা, কোনদিন
দুটো শশা, কোনদিন বা গাড়াখানেক উচ্ছে মায়ের উঠানে ঢেলে দিয়ে
প্রগাম করে, ভট্টাচার মশায়কে বলে—একটুকুন চণামেতা দেবেন বাবা!

ভট্টাচার প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, শশীর হাতে চরণা-
মত দিয়ে বলেন—তোর ভক্তিতো অগাধ রে শশী—কিন্তু মা তাকে
সুন্নতি কেন দেন না সেইটে বুঝি না!

শশী চরণামৃতটুকু সুদৃশ্য করে মুখে টেনে নিয়ে হাতখানি
মাথায় বুলাতে বুলাতে দাঁত মেলে হাসে।

হিন্দুস্থান

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিসঃ ৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট
কলিকাতা।

শাখাসমূহ

বড়গড় (উড়িষ্যা), বদরগঞ্জ,
ভবানীপুর, চক্ৰধরপুর (বিহার),
ঢাকা, কাটোয়া।

বেনারস, বড়বাজার শাখা

শ্রীমতী খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ

সমর চৌধুরী।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জঃ

শান্তি গুহ।

জন স্বাস্থ্য কল্যাণে



বিজন'ম
তাল মিছরী

শিশুর খাদ্য ও বোণিব গথ্য

মোন ডিষ্ট্রিবিউটর :-

প্রসিদ্ধ মিছরী বিক্রেতা = ভুত নাথ গবাই
১৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা

করে তুলুন ভারতকে এক মহাশক্তিমান দেশ



দি ইণ্ডিয়ান
মেসিন টুল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

দি
ইণ্ডিয়ান কাটলারী
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

★ যুদ্ধ করছেন আজ
ভারতমাতা অতীতের
সেই বশত্রহরণধারিণী
শ্রীদুর্গার মত অস্ত্রধার
হাত হাতে পৃথিবীকে
যুদ্ধ করবার জন্য।
যাকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে
সাজিয়ে নিয়ে পূজা
করুন।

ইতিহাসে অকুলনীর এই মহাবুদ্ধ সত্যি-
কারের কোথায় চ'লছে জানেন কি ? জলে
নয়, স্থলে নয়, আকাশেও নয়, এই
মহাবুদ্ধ চ'লছে পৃথিবীর বজ্রশিখরের
কারখানাগুলিতে।

সৈনিকার বুদ্ধিশক্তিদের হাত হইতে যে
কল্যাণময় বস্তুচক্র আজ পৃথিবীর শান্তি,
সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার
করিতেছে - জানেন কি যে সেই
বস্তুচক্র নির্মাণের কারখানাগুলিতে
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন কাঁচিবার
বজ্রগুলির বাহা না হইলে
সবস্ত বস্তুচক্রই অসম্পূর্ণ ?

ম্যানোজিং এজেন্টস
ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার্স
২, রয়েল এক্টেজ প্লেস, কলিকাতা

ফোন - কলি: ১৮১৭

একমাত্র স্বত্বাধিকারী - প্রাইভেট লিমিটেড

টেলিগ্রাম - ইটিস, কলি:

মিহির ডাক্তারের কুইনিন এবং ভটচাঁয় মশায়ের চরণামৃতের বলে কল্যাণ হয়ে সে গভীর রাতে বর্ষার ঝিগ-ঝিগ জলে ভিজে—হিমেল বাতাস গায়ে লাগিয়ে চুরি করে বেড়ায়।

মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভটচাঁয় দুজনেরই উপর সমান ভক্তিমান শশী। ডাক্তার এবং ভটচাঁয় দুজনেই এই নিকতার জন্য চার শশীকে না ভালবেসে পারেন না।

ডাক্তারের কথা শুনে শশী একটু চিন্তিত হ'ল। ডাক্তার জ্বলেন—সত্যিই কুইনিন আজ পাবি নে? শশীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'কুইনিন পাওয়া যাবে না?'

দূরে আকাশে কোথায় গৌঁ গৌঁ শব্দ উঠছে। রাস্তার লোকজন মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলোর হাড়-পজিয়া দল অবস্থা: কেউ দুদিন কেউবা চারদিন মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, এর অবস্থাতেও সব জুটে বোরিয়ে আসছে দর থেকে। 'উড়ো যাত্রা! উড়ো জাহাজ!'

শশী একবার আকাশের দিকে তাকালে, উড়ো জাহাজটা এখনও তার পড়বার মত কাছে আসে নাই, দেখা যাচ্ছে না। দেরিতেও পাড় হয় না। এক তো দেখে দেখে আরুটি ধরেছে প্রায়। সকাল দিকে রাত্রি দুপহর তিন পহর পর্যন্ত ও গুলোর খাওয়া আসার সময় নাই; গোঙতে গোঙাতে যাচ্ছে আসছে আসছে যাচ্ছে। যেন একখানা, কখন দুখানা—চারখানা, এক সন্ধ্যা মধ্যে মধ্যে জ্বার দশ দিশখানা পাখীর দলের মত নীরবে উড়ে যায়। এর ওপর ওগুলোর ওপর শশীর ভয়ানক রাগ। তার ধারণা, ওইগুলোর প্রজা লাগাতেই এবার বর্ষার মেঘ চিরন্তনে গিয়ে এমন ধারার সর্বনাশ হল চলেছে—বাতাই ভাদ্রে এমন প্রলয় বান হয়েছিল।

ওগুলো নাকি যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধ! কখনো মনে করে শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এখানকার লোক বলে কাল যুদ্ধ! শে টাকা—পর্যদিশ টাকা মগ চাল! দশ টাকা বিশ টাকা জোড়া ঘণ্ড, চিনি নাই, কেরাসিন তেল অনিতে হয় ইউনিয়ন মোটর টকিট দেখিয়ে, সাগুর সের চার টাকা—ও সব ধরনের কথা—ভাঙা রজা মেরামত করবার জন্যে একটা পেরেকের দরকার হয়েছিল শশীর—একটা পেরেকের দাম নিয়েছে চার পয়সা!

শশী দোকানীর উপর ভয়ানক চটে গিয়েছিল—একটা পেরেকের দাম চার পয়সা?!

দোকানী হেসে বলেছিল—এর পরে চার আনা দিলেও আর গাবি না।

পেরেকটা নিয়ে আমার বুকে ঠেকে বসিয়ে দাও, আরও চারটে পয়সা দেব। বলে রাগ করে শশী একটা আনি ফেলে নিয়ে পেরেকটা নিয়ে এসেছিল। এবং সেই দিন রাতেই দোকানীর ঘোলা থেকে দুটি সত্যি বান চুরি করে এর শেষ দিয়েছিল। শোধ দলা চলে না, রাজা দিয়েছিল বলতে হয়—কারণ দুটো লস্কার মন্তত একমণ হসেবে দু'মণ ধানের দাম আঠারো টাকা দকে ভরিশ টাকা। শশী সবথ পেয়েছে পনেরো টাকা। চার পয়সার বদলে পনেরো টাকা—বুকের বদলে নাকের চেয়েও বেশী।

ধান চালের দরের দিক দিয়ে হিসেব করলে শশীর এখন রম সুময়। এবং সত্যিই শশীর আর্থিক অবস্থা এখন ভাল। যো তার স্ত্রী একদিন একখানা পাঁচ টাকার নোট একটাকার নোট ম করে—হাটে বাজার করতে বের করেছিল, খোদ দারোগা হাটে ছিল—সে পর্যন্ত দেখেছে। কিন্তু তবু শশী ধান চালের এই বাজারের ধনা হয় হায় করে। বৈশাখের শেষ থেকে ধান চালের অভাবে মানুষের সে হাহাকার, না খেতে পেয়ে মানুষের মরনের কথা মনে লে আজও শশী মনের মুখে বলে—ভগমান—কানে কালা করে দাও, চাখে কাণা করে দাও। না হয় তো একবারে জানে মেরে দাও মা।

নরমুন্ড গড়াগড়ি যাবার সেই গৌরচন্দ্রিকা—অর্থাৎ আনন্দ। আঘাত প্রাণে লোকে খেতে পেলে না, তারপর ভাদ্রে হল বান।

আকালের পর বান—বানের পর মড়ক। নরমুন্ড গড়াগড়ি কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, সত্যসত্য গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রামে কাক নাই—কুকুর নাই—অহরহীন গ্রাম থেকে নরমাসে লোভে তারা মশানে গিয়ে পড়েছে। গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মশানা;—ও দিকটার আকাশে প্রায় অহরহই শব্দের পাল—পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে দেখা যায়। শরীর শিউরে ওঠে। মশানে মড়া পোড়াতে গেলে পাঁচটা দশটা মড়ার মাথা বাঁধ দিয়ে গড়িয়ে নদীতে না ফেলে চিতা সাজানো যায় না।

শশী সেদিন তার জাতি ভাইকে পোড়াতে মশানে গিয়েছিল। কাটা বাস, শর বীরের মত চেহারা, বুকের ছাতিখানা দেখে মনে হত যেন পাকা ভালগাছের গোড়া। আকালের বাজারে খেতে না পেয়ে হাড় পাঁজরা বোঁরয়ে হয়েছিল যেন শব্দকো বেজুর গাছ। তারপর বদল জ্বরে, জ্বরের পরই হাত-পা ফুলতে শুরু হল। দিন পরে পর ঘরের চালের মড়কায় তলপাতা দিয়ে ঢাকতে উঠে হঠাৎ কি হ'ল বলে চাল থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই কাটা গাছের মত মাটির উপর তাড়ু খেয়ে পড়ে গেল। তাকে পোড়াতে গিয়ে শশী খানিকটা দূরে বদল। শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারদিকে মড়ার মাথা তার হাড়। ভাইপোর চিতা সাহায্যে চার চারটে মড়ার মাথা জুড়ে ফেলতে হল নবায় জলো। হরন অর্থাৎ হরেন্দ্র চিতা সাজাচ্ছিল—সেই কলমে উটা তাঁতী বউয়ের মাথা উটা হল ঘোষেদের ছোটকার আর উটা লাগছে যেন মিটিঙাদের ফিউজী মনেটোর।

হরো তার আর আশ্চর্য চিতা হরেন্দ্র এ বাজারে মড়া পোড়বার কষ্ট কেটে দেওয়ার কাজ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় প্রতি মড়ার সঙ্গেই সে মশানে আসে।

একজন বলেছিল—বাকী দলে ন?

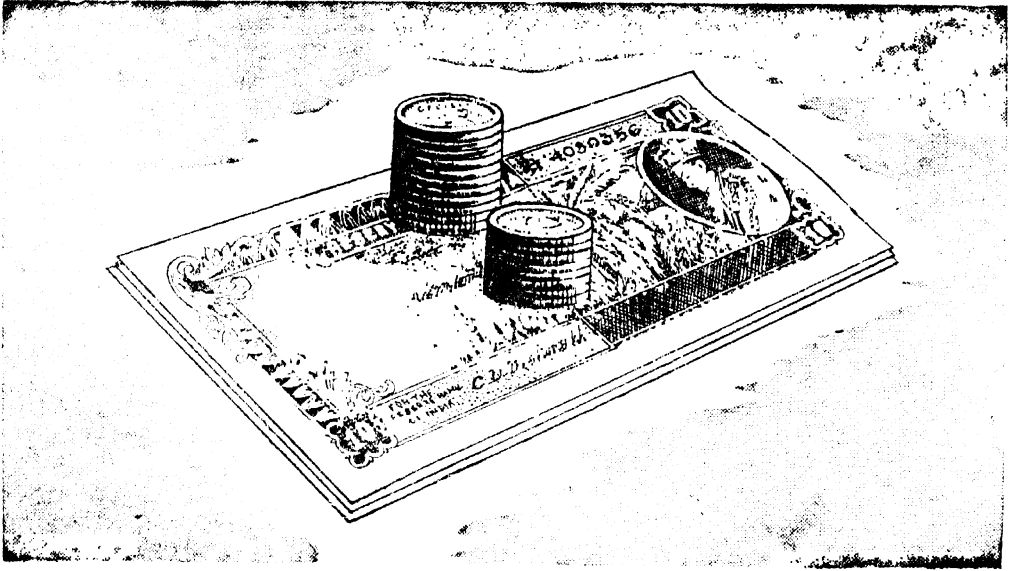
হরেন্দ্র এবার চুপ করে গিয়েছিল। চারদিকেই মড়ার মাথা চোখ নাকে শব্দগাহর—দু'পাতি প্রকট দাঁত বের করে সমস্ত মাথাগুলো এবই বদল বইতল চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে; জোর বাতাস নিলে গাড়িয়ে কোনটা কার জায়গায় গিয়ে ঠেকে কে তার হিসেব রাখে? মড়ার মাথার আচ্ছন্ন কিছু নাই, কেবল মরণ হয়েছে আশ্চর্য। প্রদমে জ্বর, তারপর হাত পা মুখ ফোলা, তারপর হঠাৎ কারুর মরুর হুড়ে বদলর মত তেঁদে বদল তেঁদেই শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারুর আর একটা পাগটা জ্বর; অধিকাংশ লোকের কিছু মরণ আচম্বিতে, ভেদ-বদল জ্বর এসব কিছুই না—আচম্বিতে মরছে। যে মরছে সেও জানতে পারছে না, অন্য লোকেও বুঝতে পারছে না—কখন কি হ'ল।

শশী সে দিন অনেক ভেবে চিন্তে বলেছিল—ভার মাসের পাকা ভাল পড়ছে যেন! শশীর উপমাটি হাসির অথবা গ্রাম্য হালোও যারা ভাদ্র মাসে পাকা ভাল পড়া দেখেছে তাদের কাছে ওর মূল্য আছে।

তাঁতী বউয়ের মাথার কথা হরেন্দ্র বলছিল! তাঁতী বউয়ের জ্বর হয়ে হাত পা ফুলেছিল, সামান্য বেশী নয়। সে দিন সে সকালে উঠেছে, ঘরের কাজকর্ম করেছে, হাটবার ডিল স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছে—নিশেষ করে বলে দিয়েছে—হিন্দুধানী আসবৎ আচার-ওলালরা যদি আসে তবে একটুকুন আমসৎ নিয়ে এস। দাম অর্থাৎ ত্রিশুবার মশায় হাট থেকে ফিরে এসে দেখে দাওয়ার উপর আয়না চিরুণী, সিম্‌লর কোটো, জেলের বাটি রেখে বউ শূন্যে আছে পাশেই। শূন্যে নয়, মরে পড়ে আছে।

দস্তদের সেজ দত্ত রাতে খেয়ে দেয়ে শূন্যে সকালে আর উঠল না। নিলা ঘুমন্তের মতই শূন্যে আছে, দেহ কাঠের মত শুষ্ক, বরফের মত ঠান্ডা, মুখের পাশে খানিকটা গেল'জা জমে আছে আর তারই চারিপাশে চোগেছে অজস্র কাঁঠ-পিপ'পড়ে।

মিহিরী নামে মিশ্র বাড়ীর আট দশ জন লোকের মধ্যে থাকল শব্দ দেউজন—একটা বউ আর ছোট একটা ছেলে, সেটিকে ধরতে



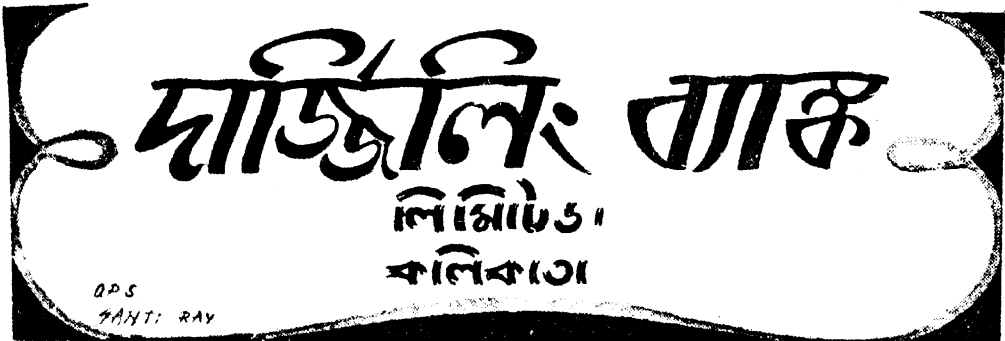
সমগ্রায়ে বেঁচে কারও নয়!

দুর্দিনে গড়ে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে—কারণ তখন টাকাপয়সা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কিছুই অভাব হয় না, কিন্তু দুর্দিনে সবাই যায় দূরে সরে—তখন অশান্তি এবং কষ্টভোগের হয় পরাক্রাণী। দুর্দিনের এই কবালি গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ব্যাংক।

ব্যাংক একান্ত বন্ধু হলে আপনার সততাব সহিত সাহায্য করিলে যদি সুসময়ে আপনি কিছু কিছু সময় করিয়া ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাংকের সঞ্চিত টাকায় শবে, আপনার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করিবে তাহা নয়;—পরোক্ষ দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সাহায্য করিয়া জাতীয় কল্যাণে পালন করিলে।

জাতীয় উন্নতির মূল—আর্থিক উন্নতি

দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর। এদের বাঁচিয়ে রাখতে ও উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে একমাত্র বিপুল অর্থসম্পত্তিসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাংক।



OPS
SAINT: RAY

হলে আধখানার বেশী ধর চলে না। আট দশ জনের মরণ ঠিক ওই জন্মাসের পাকা তাল পড়ার মত। মাস খানেকের মধ্যে বাড়ীটা ফাঁক হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের বড় ভাই গাজা খেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল, হঠাৎ একেবারে হঠাৎ একবার আঁ শব্দ করেই জুপ করে পড়ল মাটিতে মূখ গড়জে। মেজ জন গিয়েছিল কুটুম্ব বাড়ী। কালী পূজার দিন—বেচারি কুটুম্ব বাড়ীর পুজোয় মাংস খাবার লাভে যাচ্ছিল। কি যে হয়েছিল—কেমন ভাবে যে মরল সে কেউ দেখে নি—তবে দেখা গেল পথের ধারে একটা গাছ তলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মরবে পাড়ে আছে। ছোটজন অবশ্য মাসখানেক ভুগে মরেছে। ছোট জনকে গুঁড়িয়ে এসে শ্মশান বন্ধুরা হাঁকলে—গুঁড়ি কই, নিমপাতা কই? একটুও ঠিক করে রাখতে পার নি বাপদু? সামনের ঘরের দরজার সামনে একপাটি কপাটে মাথা রেখে মিশ্রগামী তিন সন্তানের শোকে কাঁদর হয়ে বসেছিল। উত্তর দিতে পারলে না সে।

রক্তস্রবের শ্মশান বন্ধুদের একজন বললে, আমরা তোমাদের ঢাকর নই। আমাদেরও মরণের ভয় আছে। ছেলে মরেছে—শোক হয়েছে জানি, সইতে না পার আমরা মরুঁড়ি নিমপাতা দাও, দিয়ে বরং পারতো গলার দড়ি দিয়ে, জল আছে ডুবে মরো, যা বদশী করো।

মিশ্রগামী তবু নড়ল না। এবার একজন এগিয়ে এসে গা চেলে বললে—শুনছ গো!—অ—। তার মুখের কথা সে শেষ করতে পারলে না, চোখ বিস্ফারিত করে বললে—একি—এ যে—এ যে—। ততক্ষণে তার হাতের নাড়া হেটুকু পেয়েছিল—তারই ফলে মিশ্রগামীর দেহখানা শক্ত কাঠের মত গড়িয়ে পাড়ে গেল।

কদিন পরেই মরল মিশ্রদের ঝিগুড়ি মেয়েটা। সেও মরে পড়েছিল, হাতের কাছে তেঁতুলের আচারের একটা পাতা—হাতে মুখে আচারের দাগ লোভ হয় খেতে খেতেই মরেছে।

রজনী সন্ধ্যার পরে বউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল, একটু ভাড়াভাড়ি উঠছিল, হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় বৃকে হাত দিয়ে বলে পড়ল—তারপর গড়তে গড়তে এসে পড়ল একেবারে নীচে।

মানুষের মরণের ব্যাপার মনে করতে করতে শশীর হাত-পা কেন হিম হয়ে আসে। শরীর আনমন করে ওঠে। শশী অস্থির হয়ে নিজেই নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুইনিং না হলে তার চলবে কি করে? জন্ম যদি হয় তারপর যদি হাত-পা ফোলে? রাগে ধান বোকাই বসতা মথাম করে চলবার সময় কি পথের উপর পড়ে মরে থাকবে?

—কুনিয়ান আমার চাই জন্মের বাবু, দাম যা লেন—দোব আমি। কুনিয়ান আমার চাই। শশীর রক্ত কণ্টম্বর ও কথার ভঙ্গীতে জন্মের চমকে উঠল।

মিহির জন্মের বড় রোখা লোক। সে অন্যায় চোখ রাঙানী কারুর সহ্য করে না, সে রাজা রাজজাই চোক আর শেঠ মহাজনই হোক কিম্বা দারোগা জমাদারই হোক। জন্মের জু কুটাকে ঝিৎ গাড বেরিয়ে তাকিয়ে বললে—না। তারপর আপনাব কাছ করতে আরম্ভ করলে; একটু পর আবার বললে—যারা রোগে ভুগছে তাদের না দিয়ে ও ওষুধ তোকে দিতে পারব না। তার বেশী দাম নিয়ে ওষুধ আমি বেরি চ।

শশী দমে গেল। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর এক উপায় আছে। জন্মের কন্ডাউন্ডার। সে দিতে পারে। বেশী দাম নেয় বলেই শশী আজও তার কাছে কুইনিং কেনে নাই। এইবার তাকেই ধরতে হবে। শশী রাসবার উপর নেমে এসে দাঁড়াল। জন্মের সামনে কন্ডাউন্ডারকে কুইনিংর জন্য বলা যে উচিত নয় এ জ্ঞান শশীর টনটনে। জন্মের পাশের ঘরে কন্ডাউন্ডার চিনে-মাটির সাদা থলটায় খট খট করে ওষুধ মাড়ছে। এ দিকে তাকালেই শশী সুট করে তাকে দৃষ্টি আঙুলের নাড়া দিয়ে ডাকবে।

কন্ডাউন্ডার তাকিয়েছে; শশী হাত তুললে, কিন্তু ডাকা হল না। সে, কন্ডাউন্ডার, জন্মের, অন্য রোগী যারা ছিল—তার সবাই চকিত হয়ে উঠল। থানার সামনে রাসতাতী দেখানে পশিম মূখ থেকে

বেঁক একেবারে দক্ষিণ মূখ ফিরেছে সেইখান থেকে রোল উঠল বল—হু—রি—, হরি—বো—ল!

কেউ গেল আর কি?

কে? জন্মের ভেবে দেখাছিল—কক হতে পারে? কিন্তু জন্মেরও ভেবে ঠিক করতে পারে না! চণ্ডীদাস দত্ত? হাফিজ সেখ? নিশী ময়রার পরিবার? মহাদেবের মা? আরও অনেক নাম মনে পড়ল। যে কেউ হতে পারে। যে কেউ। হঠাৎ মনে হল—হতে পারে না কেবল হাফিজ সেখ। ওটা তার ভুল হয়েছে। হরিবোল তুলে হাফিজের যাবার কথা নয়।

মরণের আশ্চর্য কিছু নাই, এ বাজারে বাঁচাই আশ্চর্য—কিন্তু তবুও সবাই রাস্তার ওইদিকটার উপর চেয়ে রইল। শশীও চেয়ে রইল। চারটে লোক অতি কষ্টে মড়া বয়ে আনছে; মাথা মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে দুটি মেয়ে! একটি বড় মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এতখানি ঘোমটা!

ব—ল হ—রি—

—কে? কে মারা গেল? জন্মের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দারোগার উপর দাঁড়াল।

—আনু, আনু, আনু, ঠাকুর। ওই যে কেউ দীঘির পাড়ে থাকত।

—আমার অনিরুদ্ধ, জন্মের বাবু, আমার সোনার অনিরুদ্ধ বাবা! চাঁৎকার করে উঠল একটি প্রৌঢ়া বিষণ্ণ—অনিরুদ্ধের মা।—ওরে বাবা আনু রে—; বলে সে সেই পথের ধুলোর উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছনে একটি অবগুণ্টনবতী মেয়ে। কোলে একটি বহর দুয়েকের ছেলে। ছেলেটিকে জড়িয়ে বেরিয়ে আছে দু'খানি হাত, আর মাটির উপর দেখা যাচ্ছে দু'খানি পায়ের পাতা। সমস্ত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিলম্ব হল আপনা থেকে; কাঁচা সোনার মত রঙ; কোমল লাগণ যেন করে পড়ছে ওই হাত দু'খানি থেকে। দু'গাছি রঙ চটা শাদা শাঁখা ছাড়া কোন গয়না ছিল না। কিন্তু ওতই কি শোভা হয়েছে সে হাতের! আহা—হা।

শশীও চেয়ে দেখাছিল ওই হাত দু'খানি। আনুর মা বৃক ফটিয়ে আত্মনাদ করছিল—কিন্তু সমস্ত লোকগণী সন্ধ্যার অন্তরে আক্ষেপ করে ভাবাছিল—ওই সোনার প্রতিমার মত মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা!

জন্মের দুমাল দিয়ে চোখ মুছলে।

—আহ! হায়—হায়—হায়। মা! এ কি করলি মা! বস্তার কণ্টম্বর শুনে সকলে কিন্তু এবার সোনার প্রতিমার দিক থেকে চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। পূজার ফুলের সাজ হাতে নিয়ে কখন সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুত্র ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে। চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসছে; বেনদাকাতির নিম্পলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন ওই বয়টির দিকে।

ভট্টাচার্যের চোখের জল দেখে অকস্মাৎ শশীর চোখ দুটিও কর-কর করে উঠল। শশীও কেঁদে ফেললে। আয়—হায়—হায়—হায়! হে ভগবান! কয়েক মূহুর্ত পরেই সে কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল। আনু ঠাকুর মরেছে তাতে তো তার কাদবার কথা নয়। শবট বহন করে তখন বাহকেরা যানিকটা এগিয়ে গেছে। শশী চোখের জল মুছে ফেললে। তার অন্তরের মাথা প্রতিশোধমূলক আক্রোশ জ্বলে উঠল। আনু, ঠাকুর পুলিশের গুস্তচর। সাক্ষাৎ সত্যতান। বদমাশ—পাজীর একশেষ ছিল আনু ঠাকুর। কিন্তু আনুর খউ এত সুন্দর! শশী আশ্চর্য হয়ে যায়।

(তিন)

আনু, ঠাকুর সত্যিই পুলিশের চর ছিল। এখানকার লোক সে নয়, পুলিশের দারোগাই তাকে এনে এখানে রেখেছিল। আনুর গ্রাম থেকে আনুর সমবয়সী জনককে ছেলে ধরা পড়েছিল—একটা রাজনৈতিক যড়যন্ত্রের নামলায়। আনুর সমবয়সী হলেও আনুর



প্রতিচ্ছবি

মনের মুকুরে সৌভাগ্য লক্ষ্যের
প্রতীক অবলোকন করুন।
ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক আপনার
সৌভাগ্যদাতা, আপনার শক্তি, আপনার
নিজস্ব সৃষ্টি।



শাখাসমূহ

বারাকপুর, খিদিরপুর, বগুড়া, বেনারস, নাগপুর,
নাগপুর সিটি, মোনাথভজন (ইউ, পি), যোমল
(বেরার), বারহাজ (জিলা গোরক্ষপুর) ও ম্বারভাঙ্গা।

ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক লিঃ
১৪/৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বন্দু কোন কালেই তারা ছিল না। তারা ছিল কলেক্টরের ছাত্র, আনন্দ ছিল গ্রাম্য ঠাকুর অর্থাৎ ভুল সংস্কৃত মহা আড়িপে পূজো করে বেড়াতে। সেই মামলায় সে নিজেরা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে পুলিশের সন্মুখের পড়ে। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আনন্দ নিজের গ্রামে মার্বভেয়া অফিসের জন্য এমন ক্রিয়াবল্যপ অনেক করেছিল—যার ফলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। সর্বশেষে আনন্দ নিজের একখানা গেলাল ঘরে নিজে আগুন দিয়ে পুলিশকে জানালে গ্রামের লোককে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। পুলিশ সংস্কৃত বুদ্ধি অনুকে গোপনে শাসিয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আনন্দ এ ভাবের অন্যায়কে তারা সমর্থন করতে পারবে না। ভবিষ্যতে বাধ্য হয়ে তাকে সাজা দিতে হবে। এবং সংপরমর্শ হিবেবে দারোগা তাকে জানালে, এ গ্রাম ছেড়ে ফুল্লরাপুর্নে গিয়ে বাস করাই তার উচিত। বাজারপ্রধান যায়গা। কাজকর্ম জটিল। থানার গোপন কাজকর্ম করলে তাতেও কিছু কিছু উপার্জন হবে। আর এখানে থাকলে আনন্দর বিপদ অনিবার্য। আনন্দ সেই এসে এখানে বাস করেছিল। আনন্দর মা লোকের বাড়ীতে দেবসেবার ভোগ রান্না করত, আনন্দ পূজো করত। অন্য সময়ে আনন্দ এখানে ওখানে ঘুরে যে সব খবর সংগ্রহ করত, জানিয়ে আনন্দ থানায়। আনন্দর জনেই শশী ধরা পড়েছে—তিনবার। আনন্দর জনেই ডাক্তারের ফেরারী এক খড়্গত ভাই ধরা পড়ল সেদিন। গত আগস্ট মুন্ডভেন্টের সময় থেকে ডাক্তারের ভাইকে পুলিশ খুঁজছিল।

শুধু শশীই নয়, ডাক্তারই নয়, ত্রিপুড়া ভট্টাচার্য ও আনন্দর উপর দৃষ্টি পড়েছিল। চণ্ডী মায়ের ঐ পূজক পদটির প্রতি আনন্দর সৌন্দর্য দৃষ্টি পড়েছিল। ভট্টাচার্যের পূজাপদ্ধতিয় ভুল, অবলো প্রভৃতির প্রতি চতুর চরসন্মত দৃষ্টি সজাগ রেখে চোরাক্ষেরা সে অনেক করেছে; না পেয়ে, ভট্টাচার্যের নামে রটনা আরম্ভ করেছিল—“ত্রিপুড়া ভট্টাচার্য চণ্ডী হলো লুটে খাচ্ছে। হাতে নাতে প্রমাণ বাধা, সম্ভার সন্ময় ভট্টাচার্য যখন বাড়ী যায় তখন তার পোটলাটা দেখো!”

চণ্ডী মাকে যে যা পূজো দেয়—তার একটা অংশ ভট্টাচার্যের বিধিমত পাওনা। দেবস্থানের অংশটা ভট্টাচার্য মশাই ভাগ করে দেবভাণ্ডারে জমা রাখেন। আনন্দ বলত—বেড়ালে মাছ ভাগ করলে গেরস্তুতে কি পায়? এখানকার লোকেরা কানা—কানা—কানা!

তাতেও যখন কিছু হল না তখন আনন্দ দারোগাকে বলছিল, চণ্ডীভলায় ফেরারী আসামীরা সমস্যা সাজে আসে। আমি নিজে দেখেছি, অল্প বয়েস, গাভা খায় না, ইংরেজী বই পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একজন অল্পবয়সী লেখাপড়া জানা সম্যাসী এসেছিলেন চণ্ডীভলায়; বৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ভারী ভাল লেগেছিল সম্যাসীটিকে। যন্ত্র করে তিনি খাওয়াতেন—যেতে চাইলে আরও দু’দিন থেকে যেতে অনুরোধ করতেন। দারোগা একদিন এসে সম্যাসীকে জেরা আরম্ভ করলেন। —আপনার নাম কি? বাড়ী কাথায়?

সম্যাসী হেসে বলছিল—সে বলব না, বলবার নিয়ম নয়।

দারোগা তন্মাস করলে সম্যাসীর জিনিষপত্র। কয়েকখানা চিঠিপত্র পড়েই দারোগা থতমত খেয়ে গেল। রিটার্ড ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর কেন্দার গাঙ্গুলীর চিঠি। প্রাণাধিকর, My dear son বলে পাঠ—ঘরে ফিরে সংসারী হবার জন্য অনুরোধ মিনতি! দারোগার বর্ষিষ্য বতাই বাঁকা হোক এক্ষেত্রে সোজা জিনিষটা বুঝতে তার বিলম্ব হ’ল না। সে ক্ষণ চেয়ে বললে—যখন যা অসুবিধে হবে আমাকে জানাবেন। মানে—যা দরকার হবে আপনার। মানে প্রয়োজন হলেই জানাবেন আপনি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারিপাশ ঘুরে দেখে—কাকে বললেন জানি না—হারামজানা বামন কোথায় গেল? আনন্দ—সেই আনুটা?

সেই আনু ভট্টাচার্য অজ্ঞ মরল।

বারা আনন্দর শব্দধারা দেখে নাই—তাদের প্রতিটি জন বললে একটা আপদ গেল। আনন্দ উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না।

শশী এসে আপনার দাওয়ার উপর বসল, বারবার ভাবতে চেষ্টা করলে—আনন্দ মরেছে বেশ হয়েছে। কিন্তু বারবারই তার মনে হ’ল নরম সোনায়ে গড়া সুডোল দু’খানি হাতের কথা। রঙ উঠে যাওয়া সাদা দু’গাছি শাখায় সে হাত দু’খানি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল—সেই হাত দু’খানিকে নিরাভরণ কল্পনা করতে গিয়ে বারবারই তার চোখে জল এল।

শশীর স্ত্রী ঘরের ভিতর কাজ করছিল। শশীর পায়ের শব্দ সে চেনে। গভীর রাতে শশী যখন দ্রুত এবং প্রায় শব্দহীন পাঁকেপে বাড়ী ফেরে—তখন সে জেগে কাণ পেতে বসে থাকে এবং শশীর পদক্ষেপ প্রায় শব্দহীন হলেও ওই অতিক্ষীণ শব্দের মধ্য থেকে বুঝতে পারে যে শশী ফিরছে। সে দরজা খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। শশীর পায়ের শব্দ শুনেই সে জল পরিপূর্ণ ঝকঝকে তক্তকে একটি কানার বাটী এনে তার পাশে নামিয়ে দিলে। শশী কুনিয়ান খেয়েছে—এইবার মাদুলী খোয়া জল খাবে। বাটীটার দিকে একবার চেয়ে দেখে শশী চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বউ বললে—খাও।

শশী তার দিকে ফিরে চেয়ে বললে—উ?

—মায়ের মাদুলী খুয়ে জল খাও। ওই দেখ জল দিয়েছি।

হুঁ।

বউ চলে যাচ্ছিল। শশী ডেকে বললে—বোতলটা দে তো।

বোতল? শশীর বউ আশ্চর্য হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আবার শশী বউয়ের দিকে ফিরে চাইলে। বউ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো; এই ফিরে চাওয়ার মানেই হ’ল, শশী এইবার গা বাড়া দিয়ে উঠে এসে তার চুলের মুঠিতে ধরে মাটির উপর আঁড়ে ফেলে দৃষ্টি লাগি মেরে বলবে—হ্যাঁ, বোতল। শুনতে পাও না হারামজাদা! শশী উঠল। বউটা ভয়ে চোখ বুজে ঘাড় পিঠ সংকুচিত করে হাত দৃষ্টি মাথার উপরে তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শশী কিন্তু বউকে মারলে না—সে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বোতলটা বার করে খানিকটা নিজেরা মদ খেয়ে বাড়ি থেকে বোঁরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মনে হল বুদ্ধির ভেতরটা যেন হু হু করছে—মাথার তালু থেকে সমস্ত কপালটা কেমন কিম কিম করছে। গায়ে যেন বল নাই, পা যেন উলছে। এতটুকু মদে এতখানি নেশা শশীর কখনও হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়াল ‘লা-ঘাটার’ ঘাটে। সামনে নদী দেখে তার খেয়াল হ’ল। ঘাটের পূর্ব দিকে শ্মশান। সে নিজেই চমকে উঠল। শ্মশানে তিনটে চিতা জ্বলছে। শশীর দেহ থেকে বল যেন নিঃশেষে চলে গিয়েছে, তার হাত পা নাড়বারও যেন ক্ষমতা নাই—তার মুখটা পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল—হাঁ করে সে চেয়ে রইল ওই তিনটে জ্বলন্ত চিতার দিকে। মরণকে শশীর বড় ভয়।

ওপার থেকে খেয়া ডোঙাটা এসে এপারে লাগল। যাত্রী নাই। অকারণেই ডোঙাটা নিয়ে এসে এপার লাগালে নোটন মূচি—ডোঙার খেয়া মাঝি। চারিদিকে রোগ—রোগ আর রোগ—লোকের পথ হাটবার শক্তি কোথায়? যাবার আসবার মত মনের উৎসাহ কোথায়? তবু নোটন বসে থাকে ডোঙা নিয়ে; পেটের দায়, বিশ টাকা মণ চাল—সে চাল আসবে কোথা থেকে? যে দু’চারজন দশজন আসে—ভাদের পার করলেও কুড়ি পরসাই হবে। সে ডোঙার ওপর বসে থাকে, আর শ্মশানের চিতার সংখ্যা গণনা করে যায়। ওতে নোটনের সময় কাটে। শশী নোটনের একজন বড় মজেল। বন্নার সময় দু’একদিন রাতে শশী নোটনকে ডাকে। নোটন তাকে পার করে দেয়। তার জন্য শশী যা দেয়—আজকালকার রোজকারের অনুপাতে সে নোটনের দশ বিশ দিনের রোজকার।

—শশী?

এ্যা? নিতান্ত বোকার মত শশী উত্তর দিলে।

—কিছু বলাইস না কি? মৃদুস্বরে নোটন প্রশ্ন করলে।

আজ রাতে ডোঙা চাই নাকি?

শারদোৎসবে

প্রিয় পরিজনদের সংগে মিলনের অর্থশত
আনন্দকে সার্থক করে তুলুন—পারিবারিক
জীবনের এই সুখশান্তিকে ভবিষ্যৎ
জীবনেও স্প্রতিষ্ঠিত করুন। আর্থিক
সচ্ছন্দতাই এই সুখশান্তির অন্যতম
উপাদান। আপনার ও আপনার পরিজনদের
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও আর্থিক সচ্ছন্দতার
ভার ইস্ট এন্ড ওয়েস্টের হাতে সমর্পণ
করিয়া নিশ্চিন্ত হউন।

ইষ্ট এন্ড ওয়েস্ট

হান্স ওরেন্স কোং লিঃ
হেড অফিস—বোম্বাই।

চীফ এজেন্টস
মোষ এন্ড চৌধুরী
১০নং কাইড রো, কলিকাতা।



সান বার্লী

পাল পাউডার

শিশু ও রুগ্নের জন্য
সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য-পানীয় এখন
জনপ্রিয় আকারসমূহে পাওয়া
যাইতেছে।

চিকিৎসকগণ কতৃক পরীক্ষিত
ও অনুমোদিত

দি নিউ স্ট্যান্ডার্ড বার্লী প্রাইভেট লিমিটেড কোঃ
১০৫, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা

বিহারের এজেন্টস—ওরিয়েন্টাল সাফল্যার্স, বেগমপুর, পাটনা সিটি।
কলিকাতার চীফ টেকিট—বেঙ্গল সাফল্যার্স, ৩১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
আসামের এজেন্টস—শচীন্দ্রকুমার পাল, ৩৯, বীজুন স্ট্রীট, কলিকাতা।



SURYANIDHI DUSADHALAYA LTD. PEELKHANA, Dacca
Dr. P. SHEBEAN'S DRUG & CHEMICAL WORKS. Mg. Agr. MADHUSUDAN SAHA B.Sc. (Pharm.)

মকরঞ্জ ও চ্যবনপ্রাশ

ভাসব, অরিন্ট, চূর্ণ, বটী, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ
অর্ধ শতাব্দীর উপর হইতে প্রচলিত

মাখন মলম

প্রাথমিক চিকিৎসা, কাটা, পোড়া ঘা, কণ্ডু, ক্ষত ও চর্মরোগের ঔষধ।

চন্দন সাবান ও নিম্ন সাবান

বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈলের প্লিসারিনমুক্ত ও প্রীতিগন্ধময়,
প্রতিবেদক প্রসাধন।

স্বর্ণ ও রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত, সুধীজনের প্রশংসিত

জনপ্রিয় ও সুলভতম

মেডিকেটেড ক্যাক্টর আয়েল

আমলা, তিল, বাদাম, নারিকেল তৈল ও প্রসাধন দ্রব্যাদি বিশুদ্ধতায়, পরিমিত গন্ধমাত্রায় এবং আয়ুর্বেদীয় ভেষজের সংমিশ্রণের
উৎকর্ষতায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

—রাষ্ট্র—

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কালীর বাজার,

২৬নং শিবতলা লেন, বড়বাজার—কলিকাতা,

হাওড়া ও চট্টগ্রাম।

সূর্যনিধি ঔষধালয় লিঃ,

ডাঃ পি. শৌভিনের

ড্রাগ অ্যান্ড কেমিকেল ওয়ার্কস

মাঃ এঃ মধুসূদন শাহ এন্ড সন্স লিঃ,

পিলখানা, ঢাকা।

শশী উদাস কণ্ঠে বলল—আনন্দ ঠাকুর আজ মলো।

নোটন অবাক হয়ে গেল। আনন্দ মরেছে—তাতে শশী এমন নামস্রা হয়ে গেল কেন? শশী বললে—পোড়াতে এসেছে আনন্দকে।

নোটন কথাটা জানে, সে এই ঘাটেরই বসে আছে—ডোঙার উপর বসে চোখ মিটিমিট করে দেখছে—কে কে এসে মশানে। এই ভো এখন তার একমাত্র কাজ হয়েছে। আজ সকাল থেকে এসেছে আটজন। ভোরবেলায় একদল তার আসবার আগেই চলে গেছে। তারপর সকাল থেকে আটজনের মধ্যে আকুনিয়া গ্রামের দুজন, কৃষ্ণপুরের একজন, ক্ষুদ্রাঙ্গার পটুজন—জিনেম বাউড়ীর বউ, হরিশের নাতি, কণ্ঠর মা, গোবুল ডোম—সব শেষে এসেছে আনন্দ ঠাকুর।

নোটন বললে—হ্যাঁ। ওই সব চান করে উঠছে ঘাট থেকে।

শশী ব্যগ্র দৃষ্টিতে মশানের ঘাটের দিকে তাকালে। নোটন নদীর বুকে ডোঙার উপর বসে আছে—সে দেখতে পাচ্ছে—কিন্তু ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে শশী কিছু দেখতে পেলো না। নদীর খাড়া উঁচু পাড় এবং পাড়ের উপরে কান্দা-জামের ঝাঁকড়া গাছগুলোতে ঘাট আড়াল পড়েছে।

শশী এক পা—এক পা করে এগিয়ে চলল।

নোটন আশ্চর্য হয়ে গেল। মরুক শশীর বড় ভয়, নেহাত লাগে না পড়লে সে মশানে আসে না। সে ডাকলে—শশী!

শশী এগিয়ে গেল—কথার উত্তর দিলে না।

আবার মেয়েটি তো নয়—সত্যিই নদীর পুতুল।

স্নান করে উঠে যা মোড়া হয় নি, কাপড় নিঙড়ে ফেলাতে পারে নি, ভিজে কাপড় সর্বাঙ্গে বেটে লেগে গেছে। ভিজে মাল্য কাপড়খানায় উপরও গায়ের চাঁপফুলের মত রঙ ফুটে পেরিয়েছে। কাল চামরের মত কসবসে কাল বৃষ্টি তুলের রাশির প্রস্রাভাগটা কাপড়ের প্রসার ছাড়িয়ে বালু পড়েছে। চুলের উগাগুলি বেয়ে জল পড়ছে—বোনের হঠাৎ টলমলে মস্তার মত চোপা চোপা জল বিন্দু। শশী দেখতে চেয়েছিল—সেই সুন্দর হাত দুখানি। শাখা দুগাছা জেড়ে দিয়েছে, লোহা খালে ফেলে বিস্ময়—নদীতে গড়া সেই সুন্দর হাত দুখানিকে খালি নিরাভরণ দেখে মনে সে দুঃখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার হাত দুখানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা পড়েছে। সে ডাকলে পারের দিকে। ইঠে মধ্যে আলতার দাগ তুলে দিয়েছে—পা দুখানি দেখে শশীর কান্না পেলো।—আহ—আহ—হায়—হায় রে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই লেব হল বউটির হাত দুখানি। আনন্দের মাগের কোলে ছিল দু বছরের খোকা। নিরাভরণ হাত দুখানি বের করে বউটি ছেলটিকে নিজের কোলে নিতে চাইলে।

আনন্দের মা বলে উঠল—খাক—খাক, আমার কোলেই থাক। কিন্তু মেয়েটি শুনেল না, মানলে না, জোর করে টেনে ছেলটিকে নিয়ে আপনার বুকে ফেলে ভাঁড়িয়ে ধরলে।

শশী দেখেছিল—সেই শূন্য দুখানি হাত।

নদী দিয়ে গড়া চাঁপার বরষ হাত দুখানিকে আগের চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে: খাঁ—খাঁ করছে হাত দুখানি, ওই হাত দুখানির দিকে চেয়ে শশীর মন খাঁ-খাঁ করছে। বউটির আশপাশ—চারিদিকের মাঠ ঘাট—সমস্ত খাঁ-খাঁ করছে—যেন বউটি তার ওই খাঁ-খাঁ করা খালি হাত দুখানিতে ধরেছে সমস্ত দিছার উপর।

ব—লো—হ—রি—হরি—বোল—ল! মশানবধূরা শূন্য দিয়ে উঠল।

সামনেই চণ্ডীতলা। সকলে গিয়ে উঠল চণ্ডীতলায়। গ্রন্থানকার নিয়ম ওই। মশান থেকে ফিরবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম করে তবে গ্রামে প্রবেশ করে। মাগের আশীর্বাদী পুষ্প নেয়, চরণোদক খায়, চণ্ডীতলার মৃতিকা গায়ে মাখে। মশানের অকল্যাণ ঘরে যায়। শশীও গিয়ে ঢুকল চণ্ডীতলায়।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আনন্দের মা কেঁদে উঠল—চণ্ডীমাগের উঠানে সে মাথা কুটতে আরম্ভ করলে—কি করলে মা—গো? কি দোষ করিয়েছলাম গো!?

ভট্টাচার্য বললেন—কেঁদো না—কেঁদো না। ওঠ! ওঠ! ভট্টাচার্যের কথা বলার ভঙ্গি সেই চিরকালে আশ্চর্য ভঙ্গি। সুখও নাই—দুঃখও নাই—অশ্রুত! বললেন—নাও চরণোদক নাও! পুষ্প নাও।

আনন্দের মা উঠল। ভট্টাচার্যের কথা বলার এই ভঙ্গির এমনই গুণ। শূন্য আনন্দের মা নয়, সব মানুষকেই উঠতে হয়, চোখ মুছতে মুছতে চরণোদক-পুষ্প নিতে হয়। যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ সে আর কাঁদতে পারে না। ভট্টাচার্য হাসেন—যে হাসি তিনি পোড়ের অশ্রুতে হেসেছিলেন, বাবার বৌহঁতের শিয়রে বসে হেসেছিলেন—বলেন—মাকে নিষ্ঠুর বল না মা। সংসারে কত দুঃখ—কত কষ্ট—কত পাপ। তা থেকে মুক্তি দিয়ে থলো কেড়ে তিনি তাকে আপন বুকে তুলে নিয়েছেন। এ তো মুক্তি! নিজের মুক্তি কামনা কর।—মারা শোনে তারা উদাস হয়ে চেয়ে থাকে, চোখের জল যেন ধমক যায়।

আনন্দের মা চোখ মুছে চারিদিক চেয়ে বললে, বউমা কোথায় গেল? বউমা!—অ বউমা! আর কি বিপদেই আমি পড়েছি মা!

বউটি দাঁড়িয়েছিল নাটমন্দিরের একটি পায়ের আড়ালে। এদিক এদিক দেখে আনন্দের মা তাকে টেনে নিয়ে এল।—দিন থাথা, কথাকাকে চরণোদক-পুষ্প দিন। ওই বৃন্দ-কুড়োতুই আমার সন্দেশ—আমার আনন্দ—

কণ্ঠস্বর তার বৃদ্ধ হয়ে এল। অচিরের বউ নিয়ে চোখ মুছে আনন্দের মা বউয়ের ঘোমটার ফাঁকে মুখ রেখে বললে—হাত পাত চরণোদক নাও, পুষ্প নাও, খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পাত।

বউর মুখ তুললে—মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে সে চাইলে শাস্ত্রভীর দিকে।

আনন্দের মা বললে—বিরক্ত হয়েই উচ্চবস্ত্রে বললে—আমার মাথা পেয়ে হাত পাত। চরণোদক নাও। খোকাকে দাও—নিজে খাও। হাত—পা—তা!

এবার সে হাত বাড়ালে। তারপরে অপরূপ লাবণ্যভরা সুগৌরব সুখোঁজ দুখানি হাত বৈশ্বকো নিরাভরণ দীনতায় কাঁড়াল হয়ে গেছে। আনন্দের দেহ যখন নিয়ে যায়, তখনও হাত দুখানিতে হুঙটা পুরানো শাল শাখা দুগাছিতে যে শোভা ছিল, সে শোভা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দেখেছিলেন। চরণোদক দিতে দিতে তিনি বলে উঠলেন—তারা—তারা—মা!

এরা নাম ভট্টাচার্য প্রায়ই উচ্চারণ করেন। নাম উচ্চারণের জন্য তার কণ্ঠস্বরের জন্য সবলেই ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। সবলেই তার মুখের দিকে তাকালে। তাকালে না শূন্য মেয়েটি। ছেলটিকে এক হাতে কোলে চেপে ধরে একটি হাত বাড়িয়ে সে তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভট্টাচার্যের চোখের জোড় দুটি অস্বাভাবিক চাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, নীচের চোঁট উপরের চোঁটের উপর গেলে উঠেছে; যেন মৃদু দ্রুত কম্পনে কাঁপছে মনে হয়।

ভট্টাচার্যের বুকের ভিতর সত্যি একটা আবেগ জেগে উঠেছিল। বহুকাল—বোধ হয় গ্রিষ বৎসর পূর্বে তাঁর একমাত্র কন্যা চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিল, তার মনে পড়ে গেল সেই স্মৃতি। কিন্তু তাঁর কন্যার নিরাভরণ হাত দুখানিতে এমন কাঁড়াল ভাব ফুটে ওঠে নাই। প্রাণপণে আশ্রয়স্বরূপ করে ভট্টাচার্য বললেন—আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার ছেলে শতাব্দু হবে। জন্মের মত মানদ্ব হবে। ওই তোমার দুঃখ মোচাবে।

আনন্দের মা আবার হাট হাট করে উঠল। শূন্য আনন্দের মা নয়, মশানবধূরা সকলেই চোখ মুছে। ঠিকই অশ্রুতনাবাড়া

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯২৯)

ভারতে অন্যতম বিশ্বস্ত
প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—

৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখাসমূহ

হাওড়া, বালাগঞ্জ, কদমতলা, পাবনা,
মোদনাপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও
শ্যামবাজার।

খিদিরপুর, চাঁপড়াগা ও দক্ষিণ কলিকাতা
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুনঃ

মিঃ এ, রায় চৌধুরী,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



নামের অনুকরণই গুণের অনুসরণ নয়,

সামান্য নামান্তরে যেন প্রবঞ্চিত হবেন না—

* কণ্ডুদাবানল—চর্মরোগের জগন্বিখ্যাত মলম।

* সর্বজ্বরগজসিংহ—সকলপ্রকার জ্বরে স্থায়ী ফলপ্রদ।

* সর্বদ্রুহতাশন—সকল প্রকার দাদের প্রেষ্ট মলম।

* শূলগুণ—সকল প্রকার
বেদনার মহৌষধ।



সাবধান!

কিনবার সময় ঠিকভাবে খাটী জিনিষ
দেখিয়া লইবেন।

এল, এম, শাহ * জুনিথি

= এণ্ড কোং লিঃ =

হেড অফিস—ঢাকা।

গ্রাণ্ড—৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ন্যাশনাল সিটি ইনাসুরেন্স লিঃ

১৩৫নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ—ক্যালঃ ২৭৮

সুলভ খরচে সর্বাধিক নিরাপদের সহিত জীবন-বীমা
করার আদর্শ পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৩ সাল আর একটি রেকর্ড স্থাপনকারী বছর

নূতন বীমা

৮,৫০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জীবন বীমা তহবিল

১,১০,০০০ " "

প্রিমিয়মের আয়

১,০০,০০০ " "

সম্পত্তি

২,৭০,০০০ " "

কে, সি, দালান
ম্যানেজার



গাঁহন গাভের নাইয়া

ফোটোশিল্পী—শ্রীঅনিল ঘোষ

ওই মেয়েটির কোন স্পন্দন চিহ্ন বৃদ্ধা গেল না। ভিজ় কাপড় তখনও প্রায় গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে লেগেছিল, তবুও কিছু বৃদ্ধা গেল না।

চরণোদক দিয়ে ভটচায় তাড়াহাড়ি ঘাটের দিকে চলে গেলেন। ঘাটে কে বসে রয়েছে! উপু হয়ে বসে হাতের ছাঁদের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল শশী। ভটচায় বিরক্ত হয়েই বললেন—কে?

শশী মূখ তুললে। সে বসে বসে কাঁদছিল।

কি রে শশী, কাঁদছিস কেন?

শশী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বললে—আঃ বাবাঠাকুর আমার মরণ কেনে হয় না?

—কি হ'ল তোর?

আঃ—ওই সব কাঁচ কাঁচ মেয়ে বিধবা হচ্ছে বাবাঠাকুর, কত লোক মরে যেছে, এ যে আর দেখতে পারছি বাবা!

অশ্রুচর্য ঘটনা ঘটে গেল। ভটচায় অকস্মাৎ বরষার করে কেঁদে ফেললেন।

আনুর মা পৃথিবীতে অনেক কাল এসেছে। কোপার ঘা খেয়ে ছাদ যখন জমে যায়, তখন মুষলধারার বর্ষণেও যেমন গলে না— তেমনি ভাবেই আনুর মাগের বৃকের ভিতটা জমে গেছে। সংসারের নিষ্ঠুর অভাব অনটনের বর্ষণের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা বজ্রাঘাত হয়—তাতে ছাদের মত জমাট বৃকটায় এক একটা চিড় খায়—সে ফাটল দিয়ে অঙ্গস্বল্প জল ভেতরে যায়, কিন্তু অধিকাংশই পিছলে বেরিয়ে যায়। সে চন্ডীতলাতেই বসেছিল চারটি প্রসাদের জন্য। ভটচায়ের টোঁটের কম্পন তার চোখ এড়ায় নাই। সে সেই সুযোগ সন্ধান করে। একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে সে ঢলছিল।

হঠাৎ বউটি তার হাত ধরে টানলে।

—আঃ ছাড়। কি?

উত্তর না দিয়ে বউটি তবু টানছে। আনুর মা অভ্যাসমত বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে—কি? আমার মাথা খাও তুমি! কি হল, কি?

বউ তার হাতখানা টেনে কোলের ঘুমন্ত ছেলোটির কপালের উপর রাখলে।

আনুর মা এবার দ্বিগুণ চণ্ডল হল, ভাল করে নিজে ছেলোটির কপালের উপর হাত দিয়ে দেখে বললে—ছাকিছাকি করছে যেন মনে হচ্ছে। হুঁ। তারপর সে বললে—ও তোমার কিছু নয়। রোদ লেগেছে। রোদ থেকে সরে বস। কথাটা বলে যেন তার তৃপ্তি হ'ল না, বউয়ের হাত ধরে টেনে সরিয়ে এনে বললে—“সরে—ব—স—”।

শশী উপু হয়ে বসেছিল তার আর সহ্য হ'ল না, সে রুচ-স্বরে বললে—কি রকম মানুষ তুমি ঠাকরুণ? যেমন বেটা ছিল তোমার, তেমনি তুমি? এইখানেই তুমি নড়া ধরে হিঁচড়ে টানছ, ধরে গিয়ে তা হ'লে তো মায়াবা তুমি ধরে!

শশী জাতিতে ডোম, ও অঞ্চলে ছোটলোক বলে, কিন্তু সে দাগী চোর, সেই কারণে লোকে তাকে ভয় করে। আনুর মা তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্মরণ করে বললে—ছেলেটার গা ছাকি ছাকি করছে বাবা, তাই বলছি রোদ্দুর থেকে সরে বস। তা কাপের মাথা খেয়ে কথা কাণে নেয় না আবাগী—তাই সরিয়ে দিলাম টেনে। আমারও ত বাবা মানুষের শরীর।

শশী এত সব কথা শুনছিল না, সে দেখছিল—বউটি ওই নদীর মত হাত দু'খান দিয়ে ছেলোটির গলা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের কপাল নিজের গালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ অনুভব করছে।

শশী বললে—জ্বর হয়েছে? ঠাকরুণ দেবী কর না। ডাক্তার দেখাও আজই।

—অজ্ঞার?

শক্তি মিশ্র রসায়ন

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অনিয়মিত আচার ও বিহারের দ্বারা শরীরের সার বস্তু ক্ষয়জনিত সর্বপ্রকার দুর্বলতায় শক্তি মিশ্র রসায়ন অমৃত স্বরূপ। ইহা শরীরের সন্ত শাউকে (রক্ত, মাংস, মেদ, রস, অস্থি, মজ্জা ও শক্ত) সংশোধিত করিয়া শরীরকে তেজোবান, মাংসপেশী ও স্নায়ুশ্রেণী সূক্ষ্ম এবং সজীবিত করতঃ জীবনীশক্তি, মস্তিস্কের ক্ষমতা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা স্বাস্থ্য, বলবীৰ্য ও জীবনী-শক্তিবর্ধক বহু প্রকার তেজস্কর ঔষধের সারাংশের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এক মাত্রা সেবনেই ইহার আশ্চর্য শক্তি অনুভব করিতে পারিবেন। ইহা সেবনে স্নায়বিক দৌর্বল্য, বহুশ্রম, মূত্রাশয় ও প্রস্রাবের সর্বপ্রকার গোলযোগ প্রভৃতি আচীর নিদোষরূপে আরোগ্য হইবে। প্রসবের ২১ মাস পূর্বে এবং প্রসবের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে কুললক্ষ্মীগণের গর্ভাবস্থায় কোন রোগ, প্রসবজনিত অবসাদ ও দুর্বলতা বা কোন প্রকার সূতিকারোগের আশঙ্কা থাকে না। কঠিন রোগ ভোগের পরবর্তী শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ও অবসাদ দূর করিতে ইহা অশ্বতীয়। সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শিশু, বালক, বৃদ্ধ, বগিতা ও পুণ্ড্র সকলেই সকল ঋতুতে ইহা সেবন করিতে পারেন। শক্তিমিশ্র রসায়ন নিয়মিত সেবনে সর্বরোগ বিনষ্ট হইবে, শরীরের কাস্তি, পুষ্ট, বলবীৰ্য বৃদ্ধি হইবে এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইয়া নব জীবন লাভ হইবে। ইহার প্রতি কৌটাই অমৃতত্ব। মূল্য ১ শিশি—২ টাকা, মাশুলদি ১০০ আনা। ৩ শিশি—৫১০ টাকা, মাশুলদি ২৫০ আনা।

মহাশক্তি সূধা

মহাশক্তি সূধা দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের যম। আর কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত এই মহাশক্তি সূধা সেবনে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগা ও যক্ষ্ম সংযুক্ত জ্বর ও সর্বাধিক নতুন ও পুরাতন জ্বরে মহাশক্তির ন্যায় কার্য করে। ইহা প্রতি গৃহে রাখিলে আর জ্বরের জন্য ভাবিতে হইবে না বা কোন চিকিৎসকের সাহায্য দরকার হইবে না। মূল্য ১ কোটী ১০ আনা, মাশুলদি ৫০ আনা। ৩ কোটী ১০ আনা, মাশুলদি ৫০ আনা।

শ্বাসকাসারিষ্ট

ইহা সর্বপ্রকার দুঃসাধ্য হাঁপানী। শ্বাস ও কাসের মহৌষধ। শ্বাসকাসারিষ্ট উক্ত রোগের অসহ্য যন্ত্রণা উপশম ও স্থায়ী আরোগ্য সম্পাদনে অশ্বতীয়। কিছুদিন নিয়মিত সেবনে রোগের মূল কারণ দূরীভূত করিয়া ইহা ভবিষ্যতের আক্রমণ নিবারণ করে। শ্বাসকাসে জীবনমত রোগী ইহা সেবনে নবজীবন লাভ করিবেন। মূল্য ১ শিশি ১১০, মাশুলদি ১৫০, ৩ শিশি ৪ টাকা, মাশুলদি ২৫০ আনা।



আমাদের এই বিশুদ্ধ পদ্মমধু সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে চক্ষু হইতে জলপড়া, চক্ষুর নানাবিধ হস্তগা, চক্ষুক্ষত, বাসনা দৃষ্টি ও ছানিপড়া ও রাতকণা প্রভৃতি রোগ সত্ত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ১ টাকা, ৩ শিশি ২৫০ আনা, মাশুলদি ৫০ আনা।

বঙ্গদেশবাসিন্দারিত সিন্ধ
মকরমুখ

১ তোলা ১২ টাকা
৭ মাত্রা ৫০ আনা
১০ মাত্রা ২১০ টাকা
বঙ্গদেশবাসিন্দারিত
১ তোলা ৫ টাকা
৭ মাত্রা ১৫০ আনা
১০ মাত্রা ১১০ টাকা
মাশুলদি ৫০ আনা।

নবশক্তি ঔষধালয়

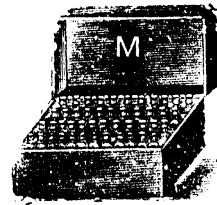
কবিরাজ

শ্রীশিশিরকুমার সেন গুপ্ত

কবিরাজ

২৯৬ এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

গৃহ চিকিৎসার বাক্স



মূল্য এক বাস ১০ টাকা, ডাঃ মার ১০০ আনা।

এই প্রথম হিতকর গৃহ-চিকিৎসার বাস প্রত্যেক প্রকারের ঔষধ ৫ সংগ্রহ ৩৫ বটলী করিয়া ২৬ প্রকার ঔষধ আছে। পরিবারস্থ সকলেই ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী ও ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া সুন্দর চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এই বাসের যে কোন ঔষধ পৃথক লইলে প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা লাগিবে।

মহা সোমেশ্বর রসায়ন

ইহা স্মৃতিশক্তি, মেধা, বলবীৰ্য বর্ধক ও মস্তিস্কের দুর্বলতা-নাশক পরম মহৌষধ। স্মৃতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম ও অতিরিক্ত অধ্যয়নজনিত অবসাদ ইহা সত্ত্বর নিরাময় করে। ছাত্র, চিন্তাশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তিগণের ইহাই একমাত্র বন্ধু। স্মৃতিশক্তি-হীন ও অল্প মেধা বিশিষ্টের পক্ষে ইহা অমৃতস্বরূপ। ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতানাশক মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি ২ টাকা, মাশুলদি ৫০ আনা। ৩ শিশি ৫ টাকা, মাশুলদি ১১০ আনা।

স্বর্ণ ভস্ম

১ তোলা ১২৫ টাকা

মৃগনাভি

আসামের—১ তোলা ৫০ টাকা
নেপালের—১ তোলা ৪০ টাকা

চ্যবনপ্রাশ

১ শিশি ১১০ টাকা
মাশুলদি ৫০ আনা।

—হ্যাঁ। আর বাবাঠাকুর যে পুস্প দিলেন—গলায় বেঁধে দাও।
আনন্দের মা হাসলে: বললে—ভাত্তার দেখাবার পরমা কোথা
শাব খল?

—যাও কেনে ভাত্তার বাবুর কাছে। ভাত্তার বাবু তো মানুষ
বটে—না—পাথর? ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, মামা হবে না
ভাত্তারের?

আনন্দের মা শশীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইল। সে
চাঁটনির সম্মুখে শশী যেন কেমন অপোয়ান্তি অনুভব করলে।
ভাকিয়ে আছে দেখে দোঁধি? ঠায় একদৃষ্টে—পলক পড়ে না।

আনন্দের মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সক্রমে কণ্ঠে বললে—
ওই কচি বউ—কোলে দুধের ছেলে—আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা
শশী? আমার পোড়া পেটের কথা ছেড়েই দিলাম—ওদের আমি
বচোব কি করে? আর—আমার সোনার পুতুল বউ!

শশীর চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ হল।

(চার)

পরদিন সকাল বেলা। ভাত্তারের ভাত্তারখানায় রোগীরা এসে
বসে আছে। সংখ্যায় ষাট জনের কম হবে না, কক্ষালসার শরীর
—পুলো ফুলো মুখ—হাত পাও ফুলেছে, হলদু চোখ, রক্ত গায়ের
কাপড় চোপড়ের গন্ধে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের
নম্রো কম্পাউন্ডার চিনে মাটির বড় খলটায় খট খট শব্দে ওয়ধ
নাড়ছে। ভাত্তার নাই। ফলে বোরিয়েছে। টাকা দিয়ে যারা ভাত্তারকে
জরক—ভাত্তার তাদের বাড়ীগুলো প্রগমেই সেরে আসে।

রোগে যারা বেশী কাতর তারা কাতরাজেছে।

যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা আলোচনা বরছে কে কে মরেছে
গত রাতে। যদি দস্তর বউ মহাদেব দেব সদ্দা বিবাহিতা কন্যা।

ঘোষদের মেয়ে সরলা। সত্যরাম বাড়ীড়ী মরেছে মাঠে; আউশ ধান
কাটতে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে। বিকেল পর্যন্ত ফিরল না দেখে
খোঁজ করে সত্যরামকে ধানের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখতে
পেয়েছে।

ভাত্তারের ডিসপেন্সারীর পাশেই ধুজু সিংয়ের দোকান।
ধুজুর আড়তের সঙ্গে কণ্ট্রোলার দোকান আছে, কেরোসিন তেল,
চিনি বিক্রী হয়। তারও সঙ্গে আছে সরকারী ভিক্সে দেওয়ার
বাদস্থা। ওখানে একটা জনতা জমে গেছে। চাল ফুরিয়ে গেছে—
বিালি হচ্ছে ঘাসের বীজের মত এক রকম জিনিষ—নাম বলছে—
বাজরা। তাই নিতেই ভিড়ের অন্ত নাই। নিচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে
অভিযোগও করছে।

আনন্দের মাও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বাজরা নিয়ে সেগুলি
নেড়ে চেড়ে বললে—এ কি করে খাবে মানুষে?

ধুজু বললে—এও আর বড় জোর আসছে সন্তাহ। তার পরই
ফুরবে—আর নাই।

একটি লোক হেসে বললে—আজ্ঞে তা চলবে।

—চলবে? ওই দেখ—কটা কস্তা আর পুঁজি। আর লোক
দেখাচ্ছিল তো?

আজ্ঞে—এ খেলে সাত দিনেই লোক অনেক পাতলা পড়ে
যাবে।

আনন্দের মা ভাবছিল নাতিকে আর বউটিকে এই একটু বেশী
করে খেতে দেবে। তা হলেই সে খালাস। বাড়ী হাত পা। পরক্ষণেই
সে শিউরে উঠল। বউটাই তো—তার ভরসা। কালই সে কথা আনন্দের
মা খুব ভাল ভাবে বুকে নিয়েছে।

ভট্টচাম কেঁদেছে সে দেখেছে, এবং সে যে ওই বউটার প্রতি
মমতায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শূদ্র কামাই নয়, কাল

সত্যই বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় সৃষ্টি! আগড়পাড়া কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানের

গণ্ডার নান্দী

গেঞ্জী ও ইজের

তা ছাড়া অগাথ পোষাকিয় দ্রব্য।

সুন্দর, সৌখীন, অথচ টেকসুই।

একবার ব্যবহার করিলে আপনিও বুঝিতে পারিবেন, এর শূদ্রতা ও স্থায়িত্বের প্রচ্ছন্নতা।

শুধু বাংলায় নয়, এমন কি বাংলার বাহিরে
যেখানেই বাঙ্গালী — সেইখানেই এর সমাদর।

কারখানা ও হেড অফিস :- আগড়পাড়া, বি এন্ড এ আর, ২৪ পরগণা।

পরিচালক :- শ্রীদুর্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রাঞ্চ :- ১০নং অপার সার্কুলার রোড, দ্বিতলে রুম নং ৩২, শিয়ালদহ, কলিকাতা

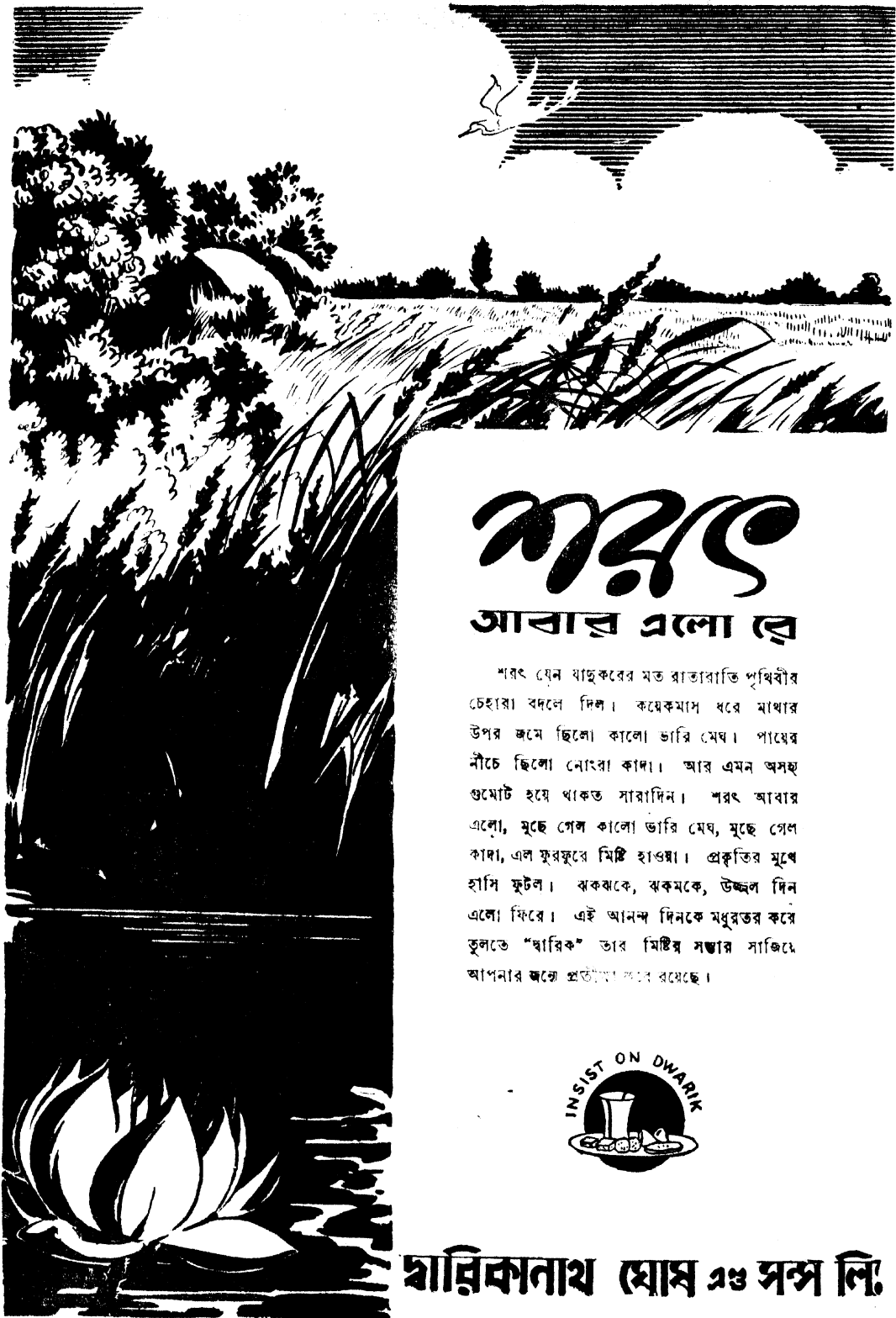
হাওড়া—চাঁদমারী ঘাট, (হাওড়া স্টেশনের সম্মুখে)

নৈহাটী—অরবিন্দ রোড (২৪ পরগণা)

বর্ধমান—রাণীগঞ্জ বাজার (বর্ধমান)

টাটানগর—সাকচী বাজার

বারাসত—বারাসতের স্টেশনের সম্মুখে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে।



শরৎ

আবার এলো রে

শরৎ যেন বাছুরের মত রাতারাতি পৃথিবীর
চেহারা বদলে দিল। কয়েকমাস ধরে মাথার
উপর জমে ছিলো কালো ভারি মেঘ। পাখের
নীচে ছিলো নোংরা কাহা। আর এমন অসহ্য
গুমোট হয়ে থাকত সারাদিন। শরৎ আবার
এলো, মুছে গেল কালো ভারি মেঘ, মুছে গেল
কাহা, এল ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। প্রকৃতির মুখে
হাসি ফুটল। ঝকঝকে, ঝকমকে, উজ্জল দিন
এলো ফিরে। এই আনন্দ দিনকে মধুরতর করে
তুলতে “দ্বারিক” তার মিষ্টি সন্টার সাজিয়ে
আপনার আগে প্রতীক্ষা করে রয়েছে।



দ্বারিকানাথ মোস্ট এণ্ড সন্স লি.

চটাই তাদের যে পরিমাণে প্রসাদ দিয়েছে সে আনন্দের মা আশাই করে নি। শরীর কামাও তার মনে পড়ল—সেও ওই বউটার উপর মমতায়। শরীরী তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যে বলেছিল ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে—ডাক্তারের মায়া হবে না!

শেউতলা থেকে বাড়ী ফিরবার পথে শরীরী কথাটা আনন্দের মা পরখ করেও দেখেছে। শরীরী কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ডাক্তারের মায়া হয়েছিল। দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে ডাক্তার কারুর নয়, ওই সময়টায় সে খানিকটা বিশ্রাম করে। লাখ টাকা দিলে ওঠে না। ডাক্তার হয়েছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনন্দের মা ভাবছিল—ডাক্তারকে ডাকবে কি না! ছেলেটার জ্বর সত্যিই বেশী। বোশেখ মাসের দুপুরের কচি লতার মত নোঁতে পড়েছিল। জানালাটা খানিকটা ফাঁক হয়েছিল—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে আনন্দের মা বার দুয়েক চেয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ডাক্তার দেখা দিলে—কে? কি?

আনন্দের মা সভয়ে বলেছিল—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বউমার খোকটির বড় জ্বর। হতভানী আজই হাতের শাখা ভাঙ্গলে—সিপের সিঁদুর মুছেল, আবার ওই ছেলেটুকু—তার—। আনন্দের মায়ের চোখ ফেটে হু হু করে জল বোঁরয়ে আসছিল—তার আন—আঃ তার সেমনা থানু! কিন্তু তার জন্যে সে কান্দিলে লোকে তাকে মায়া করবে না। আনন্দের মা দাঁতে দাঁত টিপে বারবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল।

ডাক্তার বোঁরয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল হুঁ। এ যে অনেকখানি জ্বর। কখন জ্বর এল?

কখন থেকেই বোধ হয়।

ডাক্তার ঘর করে দেখে ওষুধ দিয়েছে। পয়সার কথা মনেও আসে নাই। বউ বাড়ীর ভিতর থেকে একটা পুরিয়া করে খানিকটা সাগুদানা হলে নিয়ে বলেছিল—এই সাগু করে দিয়ে। সাগুদানা বাজারের মাথা থাকলেও চারটাকা দের।

আনন্দের মা সাগুর পুরিয়াটা নিজে হাতে নেয় নাই। অবগুণতনহী বউয়ের কাগের কাছে থেকে বলেছিল—নাও বউমা—সাগুর পুরিয়াটা নাও। ওগো—হাত—পাত। আঃ—কি আবার চেয়ে গো ভূমি! হাত হাত! হাত পা—ত—!

ডাক্তার বলেছিল—বকবেন না ঠেকে। ছেলে মানুষ। তার ওপর এত বড় একটা আঘাত—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ডাক্তার।

আনন্দের মায়ের মখে ফুটে উঠেছিল—আঁত ক্ষীণ—কিন্তু অতিবক একটি হাসির রেখা। কিন্তু তার শীর্ণ রেখাঙ্কিত মুখের অজস্র রেখার মধ্যে সে হাসি চোখে পড়বার মত নয়।

ধেজু সিংয়ের দোকানে সরকারী ভিক্ষা আড়াই সের বাজরা আঁচলে নিয়ে আনন্দের মা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর সামনে। ছেলেটার আবার ওষুধ চাই। সমস্ত রাত ছেলেটা জ্বরে ধুঁকেছে। ডাক্তার সাগুদানা দিয়েছিল—সে সাগুদানা তেমনিই আছে। মায়ের দুখই খেতে চায় নাই তো সাগুর জল!

ডিসপেন্সারীর দিকে পা বাড়াতে কিন্তু আনন্দের মায়ের বিশ্বা হেঁজল। ভাবছিল ডাক্তারের সামনে সে গিয়ে দাঁড়াবে—কিন্তু ডাক্তার যদি বলে ওষুধের দাম এনেছ? তার চেয়ে বাঙ্গী বুড়ীকে সঙ্গে দিয়ে বউটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই ন্যাসাদের মধ্যে আর আনন্দের মাকে পড়তে হবে না। আজ সে বলে দেবে বউটাকে—যাকে বলে কাগে কিল মেরে বলে দেবে এতখানি ঘোমটার আদিকোত্তর কাজ নাই। ঘোমটাটা একটুখানি কম করো। মুখের দিকে চাইলে মানুষের মায়া হবে। মনে মনে এত সব ভেবেও কিন্তু আনন্দের মা গলা বাড়িয়ে ডিসপেন্সারীর ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে। নাঃ—ডাক্তার নাই।

রতন হাড়ি বললে—শেষটা পরে ঠাকরুণ, দশটার পরে।

কম্পান্ডার বাবা বলেছে দশ বাড়ীতে ডাক আছে। তা ছাড়া আমার সব আগাম এসে বসে আছি।

‘আগাম এসেছি—তোরা সব আগাম মর’, মনে মনে এই অভিসম্পাত দিয়ে আনন্দের মা খুসী হয়ে বাড়ীর পথ ধরলে। শূধু গাল দিয়ে নয়, ডাক্তারের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতার দাস থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বলেই সে খুসী হয়েছে বেশী।

প্রতিদিনের মত আকাশে উড়ো জাহাজের দল আসছে। গোঙানী শোনা যাচ্ছে। আনন্দের মা আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলছিল। শূধু সে নয়, সব লোক—সবাই চেয়ে আছে।

—এই যে আপনি!

আনন্দের মা চমকে উঠল। ডাক্তার! ডাক্তার তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আনন্দের মা ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আঁচলের বাজরা হাতে দিয়ে নেড়ে বলতে গেল—পোড়া পেটের—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে—চলুন আপনার নাটকে দেখে যাই। আনন্দের মা অবাক হল না। ডাক্তার নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়ে বললে—এই এসের বাড়ীতে ডাক ছিল—আপনার বাড়ীর পাশে এসে মনে হ’ল ছেলেটির কথা। তা’ বাড়ীতে কেউ নাই। বউটি ছেলেমানুষ ঘোমটা টেনে বসে আছে—কথা বলে না—

আনন্দের মা হাউ হাউ করে উঠল—কপাল—আমার পোড়া কপাল বাবা, কি বলব লজ্জার কথা বল? ও মানুষ নয় বাবা—ও মানুষ নয়—গরু ভেড়ার সঙ্গে কোন তফাৎ নাই। শূধু ওই চেহারা। বলতে বলতেই আনন্দের মা প্রায় ছুঁটো ছল, ডাক্তারের অন্ত্রাহে সে যে কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেছে তাই প্রকাশের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে কৃতকৃতার্থতা এতখানি যে তার ঘা-খাওয়া শক্তমনের অতি বাস্তব সচেতনতাও এই সময়টিতে সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার পর্যন্ত একটু বাস্তু এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল আনন্দের মায়ের আচরণে। সে বললে, থাক—থাক—এতখানি বাস্তু হবেন না। এতখানি—। আর ডাক্তারের মুখে দিয়ে কথা বের হল না—এই মুহূর্তে আনন্দের মা যা করলে—তাতে ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল। আনন্দের মা পুস্তবধুর মাথার ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে বললে—দেখ বাবা দেখ, এই হতভাগীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—আর আমার বুক হু-হু করে জ্বলে ওঠে। এর ওপর যদি ছেলোটার কিছু হয়!—আনন্দের মা বর বর করে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তারেরও চোখ ফেটে জল এল।

অপূর্ব সুন্দর মুখ। রুদ্ধ ঘন চুল। অশ্রুত বড় দুটি চোখ—হ্যাঁ অশ্রুত—এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোন ভাষা নাই; ডাক্তার বুকতে পারলে না তার অর্থ; বিস্ময় অথবা ভয়! ফ্যাল ফ্যাল করে সে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। নারীসুলভ লজ্জাতেও সে দৃষ্টি নত হয় না। ডাক্তারের স্নায়ুশৃঙ্খলাতে একটা প্রবাহ বয়ে গেল—মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রবল মমতার আবেগ। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এর ওই শিশুটির যদি কিছু হয়—তবে সত্যি মেয়েটির অবস্থা কি যে হবে সে কম্পনা করা যায় না। মেয়েটির যা হবে হবে—ডাক্তারেরই যে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

মিহিরবাবু তবুও ডাক্তার। আত্মসম্বরণ করে সে বললে, ভয় কি? কিছু ভয় করবেন না, ছেলে সেয়ে যাবে। মেয়েটিরও এতক্ষণে সম্ভব হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ঘোমটা টেনে দিলে।

পিছনে কে বলে উঠল—তারা! তারা!

ডাক্তার, আনন্দের মা মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন রিপুদ্রা ভট্টাচার্য, হাতে অকিসী আর ফলের সাজ। মিহির ডাক্তার বলে মনে অভ্যন্তর রূঢ় হয়ে উঠল। ভট্টাচার্যকে সে জানে। মনে পড়ল ভট্টাচার্যের নিজের পোতের অসুখের কথা;

দ্বি-মাসিক

উৎকৃষ্ট
গাছ ও বীজের
সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান



কলেজস্ট্রীট মার্কেট (কলিকাতা)

শাখা

শাখা

১০ নং লিওনে স্ট্রীট শিয়ালদহ স্টেশন মেন
(লিউ মার্কেট) ৫ নং প্লাটফর্ম
কলিকাতা

বিশেষ প্রস্তুতি : ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কম্পোন দরে বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

নিষ্ঠুরতম কথা বলতে ভট্টাচার্যের বাধে না। জুঁ ফুটিত করে ডাক্তার ভট্টাচার্যের দিকে চাইলে। কিন্তু ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন রুদ্র শিশু এবং তার মায়ের দিকে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি ভট্টাচার্যের চোখে। ডাক্তারের ভয় হ'ল। ভট্টাচার্যের করুণার অর্থ অতি বিচলিত।

ভট্টাচার্য কিন্তু বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ঠিক রলেছেন, কোন ভয় নেই।

আনুর মা বললে, বলুন বাবা—তাই বলুন—আশীর্বাদ করুন।

ভট্টাচার্য বললেন, আশীর্বাদ তো কালই করেছি মা। তোমরা চলে এলে, দেখলাম খোকার জ্বর এলো, মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সমস্ত দিন মনের মধ্যে ওই কথাই ঘুরল আর ফিরল। সম্ভবত জপে বসলাম—মনে মনে বললাম, মা, আমার এ কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে বল—তার আগে আমি মরি, ম'রে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার হাতের পুজো যদি নিস—তবে বল, আশীর্বাদী দে—যাতে দুর্গাখনির ধনের কল্যাণ হয়, রোগ ভাল হয়—দীর্ঘজীবী হয়ে সে বঁচে থাকে। বল কি মা! ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের মাথা থেকে খসে পড়ল এই জবাব।

ডাক্তারের শরীর পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আনুর মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছিল। কিন্তু অশ্রুত ওই তরুণী মা-টি, স্থির হয়ে বসে আছে পাথরের মত।

ভট্টাচার্য বলছিলেন, কাল রাতেই ভাবলাম—যদি দিয়ে আসি মায়ের আশীর্বাদী, তা' বড়ো মানুষ—চোখের নজর তো আর ভাল নেই। আর বেরতে পারলাম না। নাও, ধর আশীর্বাদী।

আশীর্বাদী দিয়েও ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার অভ্যস্ত ধীরভাবে হেলটিকে পরীক্ষা করে দেখাচ্ছিল। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ইনজেকশনের সরঞ্জাম পের করলেন। আনুর মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, ডাক্তারবাবু!

বাগ থেকে দেখে দেখে একটি ইনজেকশনের ওষুধের গ্র্যাম্পিউল বার করে ডাক্তার বললে, ভয় নাই। ম্যালেরিয়া জ্বর—

—তবে? ইনজেকশন দেবেন কেন? রোগ কঠিন না হলে—

—কঠিনে যাতে না দাঁড়ায়—তারই ব্যবস্থা করছি। কুইনিন ইনজেকশন দেব। গ্র্যাম্পিউলটির মাথায় তুলো জড়িয়ে সুকৌশলে আঙুলের চাপে মটু করে মাথার দিকটা ভেঙ্গে ফেলে ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিলে ওষুধটুকু। তারপর আনুর মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই দেখুন—আপনি মুখে দিয়ে দেখুন না এক ফোটা—কুইনিন, কি আর কিছু। বলে সে গ্র্যাম্পিউলটি উপড় করে ধরলে আনুর মায়ের হাতের উপর। প্রায় আধ ফোটারানেক ওষুধ খরে পড়ল। ডাক্তার হেসে বললে, দেখুন না!

আনুর মা জিভ দিয়ে চেটে বিস্মিতভাবে মুখ নেড়ে কয়েকবার আশ্বাসন অনুভব করবার চেষ্টা করে বললে, কুইন্যান তো তেতো ডাক্তারবাবু।

চকিতে বিস্ময় ফটে উঠল ডাক্তারের দৃষ্টিতে। আনুর মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ, তেতেই তো।

—কিন্তু এ তো তেতো নয়।



ডি.এন.বসু

ক্যালি-নীট গ্রু-সার্ট
কালার-সার্ট, স্কাপ্তো
পোলি-সার্ট
শো-ওয়েল, সিলকট
সেটী-ডেট

চণ্ড ও পদ্ম মার্কা
গেজী

D.N. BOSE'S
HOSIERY FACTORY
36/1A, SARKAR LANE, CALCUTTA

PHONE: 88 6557

রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স : ওয়ানমেমার্স
ক্রীমেন হাউস
৪ ডালহৌসী স্ট্রোয়া, কলিকাতা
ফোন-কলি: ৪২৮২ গ্রাম-আলহাঙ্গী

প্রথম বৎসরেই
অসাধারণ সাফল্য

দি

পিয়ারলেস লাইফ
এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিসঃ—

৮, লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

শ্রমচর হার—

মাত্র শতকরা ৬৮.৯ টাকা

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ চীফ এজেন্ট
এবং অর্গানাইজার চাই।

✽

ফোন :

আর, রায়, বি-এ,

ক্যাল ৪১০১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে :—

মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নর-নারীর মনে যেরূপ আবেগ ও আনন্দের
হিলোল এনে দেয় সেইরূপ “শান্তি কেমিক্যালের” দ্রব্য সম্ভারই আপনাদের মনে শান্তি
ও আনন্দ এনে দেবে।

“শান্তি স্নো”

“শান্তি ফেস্ পাউডার”

ব্যবহারে মুখাবয়বে লাভণ্য ফুটে উঠে
ও স্বক মসৃণ হয়।

“শান্তি কোকোনাট অয়েল”

“শান্তি আমলা”

কেশচর্চায় অম্বিতীয়।
কেশবর্ধক ও বায়ুনাশক।

সোল ডিস্ট্রিবিউটর :— শান্তি স্টোর্স

৫নং প্রসন্নতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

তেতো নয়! ডাক্তার ভাংগা এ্যাম্পিউলটা তুলে
বের দেখল, তারপর সিরিঞ্জ থেকে এক ফোঁটা নিজের হাতে নিয়ে
চোখে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শব্দ শ্রুতির গম্ভীরতা
খানিকটা জ্বল। ডাক্তার সতর্ক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর
সিরিঞ্জের ওষুধটুকু পিণ্ডন ঠেলে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে বললে—
যাক, ও-বেলা এসে আমি ইনজেকশন দিয়ে যাব। এ-বেলা ওষুধ
দেব একটা। কেউ গিয়ে—

আনন্দের মা বললে, আমি যাব বাবা।

ডাক্তার উঠে আবার বললে, কোন ভয় নেই। দরকার হবে
না, তবে দরকার হলে তখনই খবর দেবেন আমাকে।

ভটচাঁয় দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, শুনলে মা, ডাক্তার
বললেন, কোন ভয় নেই। বলছি যে, আমার মা বলেছেন।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

ডাক্তারের সঙ্গেই তিনি বোরিয়ে এলেন। পথে দুজনে এক-
সঙ্গেই চলছিলেন। ঘটনাটা নতুন। কিছুক্ষণ পর ভটচাঁয়
জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ভয় নাই বলেই মনে হয়—কি বলেন
ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বললেন, আপাততঃ ভয় তো কিছু দেখলাম না।
তবে—ম্যালিংগা-ম্যালােরিয়া যদি হয়—ডাক্তার চূপ করলেন।
ভটচাঁয় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার নীরবেই পথ চলতে লাগল। ডাক্তারের নীরবতায়
উৎকণ্ঠিত হয়ে ভটচাঁয় উদাস কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, তারা—তারা—
না।

ডাক্তার ডিমপেন্সারীতে এসে কুইনিনের এ্যাম্পিউলগুলি
প্রত্যেকটি ভেগে নিজে আবাদ করে দেখে ফেলে দিলে। নিজের
মনেই বললে—স্কাউন্ডেল। আনন্দের মা এ্যাম্পিউলের ভিতরের
তরল পদার্থের আবাদ নিয়ে বলছিলেন তেতো নয়। সে তার ভ্রম
নয়, এ্যাম্পিউলের ভিতরে কুইনিন নাই। শব্দ জল।

(পাঁচ)

শশী এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের বিরক্তির আর সীমা রইল
না। রুক্ষস্বরেই সে বললে, তোকে না আমি কাল বলে দিয়েছি শশী
—কুইনিন রোগীতে পাচ্ছে না—তোকে দিতে আমি পারব না।
শিউলীর পাতা ছেঁচে খেগে—বেলপাতা ছেঁচে খেগে—ছাত্তিরের ছাল
সেধ করে খেগে যা।

—আজ্ঞে না। সে জনো নয়; ওই—ওই আন ঠাকুরের—
অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বললে, কি? কি? আন ঠাকুরের
ছেলে কেমন আছে? এই তো দেখে আসছি আমি।

—আজ্ঞে তেমনি আছে ছেলে। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।
ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেল। আনন্দের জন্যে শশী তিনবার
ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আর সেই শশী এসেছে—।

ডাক্তারের বিস্মিত দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট—শশী মাথা নীচু করে
ঈষৎ লজ্জিতভাবেই বললে—ওই পানে আসছিলাম—তা আন ঠাকুরের
মা বললে—আমার নাতির ওষুধটা যদি এনে দাও বাবা শশী।

কথাটা বলেও তার মনে হ'ল বলাটা তার সম্পূর্ণ হয় নাই,
ডাক্তারের সর্বস্বয় প্রশ্নের জবাবও এ নয়। তাই সে আবার বললে,
কাল শ্রমশান থেকে এল মশায়, ওই কচি বউটিকে দেখে বড় মায়ী হ'ল।
আ—হা—হা—রশায়—ভগমগের—। শশীর চোঁট কাঁপতে লাগল। সে
চূপ করে গেল।

ডাক্তারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বস। দিচ্ছি
ওষুধ। ডাক্তার নিজেই উঠল ওষুধ তৈরী করতে। কম্পাউন্ডারি
তাঁর পাকা—কিন্তু গড়ে কুইনিনের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সে
কুইনিন সিরিয়ে ফেলে।

শশী আপন মনেই বললে, কাল সারারাত ঘুমুই নাই ডাক্তার-
বাবু। এক একবার মনে হচ্ছিল—আন ঠাকুর মরেছে—বেশ হয়েছে।

কিন্তু—ওই বউটির কথা মনে হয়েছে, আর হায় হায় করেছে। শশী
চূপ করলে।

নিবিষ্ট মনে ডাক্তার নিক্তির দিকে তাকিয়ে ওষুধ ওজন
করাছিল—সেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। শশীর কথাগুলির
সঙ্গে তার মনের তার এক সুর বাজছে। এর মধ্যে এতটুকু কিছ
অসঙ্গত দেখতে পেলে না।

বাইরে রোগীরা কাতর হচ্ছে।

কম্পাউন্ডার একটা বড় বোতল থেকে শিশিতে ওষুধ ঢেলে
দিচ্ছে।

শশীর প্রাণ যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে এদের মধ্যে বসে।
মানুষের মরণ দেখে তার বড় ভয় হয়। কিন্তু কুইনিন রোগী
মানুষকে দেখে তার মন নাড়া খেতে না। এক একজনের
কাতরানি দেখে তার হাসি পেত। মজারামা শুনে তার রাগ হতো।
আপন মনেই সে বলত—আদিখোতা। হোর কি এরা মারেরে রে
বাপু? কিন্তু কাল সম্ভাবনা থেকে তার সব যেন ওলোটপালট
হয়ে গেছে। বউটির বৈধব্য দেখে তার মন সেই রে হায় হায় করতে
সুরু করেছে, সে হায় হায়-এর আর বিদায় নাই। রোগী মানুষের
কাতরানি শুনে তার বুকে কেমন করে উঠেছে, শোকাবুর। মানুষের
কামা শুনে সে মনে মনে হায় হায় করে সারা করেছে। এমন কি
কাল রত্রে চুরি করতে বোরিয়ে খোচনের কানায় গলি গিয়ে যাবার
সময় ঘোষবুড়ীর গুণ শুনে তার সর্বাঙ্গ খর খর
কোঁপে উঠেছিল। মাথার বসতাটা পড়ে মাথার উপকম হয়েছিল।
ঘোষবুড়ীর মেয়ে সরলা কাল মরেছে। নিস্তাপ রাত্রি, সবাই
ঘুমিয়েছে—বুড়ী কেঁদে চলছে। আগের দিন হলও শশীর
মনে হ'ত, এই বসতাটা বুড়ীর বুকে চাপিয়ে দেয়। বুড়ীর ওই
বিনিয় বিনিয় কামা চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেয় যে পথে
গিয়েছে তার সরলা—সেই পথেই বুড়ীকে রক্তা করে দেয়। কিন্তু
আর তা মনে হয় নাই। দাঁতে দাঁত টিপে সে কোন মতে গলি
থেকে বোরিয়ে যখন আনন্দের মায়ের বাড়ীর কানায় এসে দাঁড়িয়েছিল,
তখন তার বুকে যেন ফেটে যাবার উপকম হয়েছিল। পরিশ্রমের
হাঁপানীর সঙ্গে একটা শোকাবুর আগে তার ফুৎফুৎ ফেটে যেতে
চাচ্ছিল যেন। আনন্দের মায়ের ভাঙা বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুক
বাড়ীর একটা নিরলা কোনে ফুৎফুৎকার জগলের মধ্যে বসতাটা
ন্যামিয়ে দিয়ে সেইখানেই সে বকে হা হ দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস বসেছিল।

চণ্ডীতলায় আনন্দের মা যে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে
বলেছিল—ওই কচি বউ, কোলে দুপুরে ছেলে, আমি ওদের মুখে
কি দাব বাবা শশী?

সে কথাটা শশী ভুলতে পার নাই। আনন্দের মায়ের দুপুরের
জন্য নয়। ওই কচি বউ আর তার কোলের দুপুরে ছেলেটার জন্য—
সেও ছেলে সারা হয়েছে সমস্ত দিন। সবই তো কি খাবে ওরা?

না-খেতে পেয়ে শূকরকে ছেলেটা পাকড়ির মত হয়ে যাবে—
পাখীর ছানার মত চি-চি করে চোঁচালে। বউটির ওই সোনার মত
রঙের উপর ময়লার ছাপ পড়বে, ছোঁকা কাপড়ে তার মাথার শব্দ
চুলের অর্ধেকটা বোরিয়ে পড়বে, পিঠের পেটোটা হইতো পোষা বাঘে—
একটা মাটির খোলা হাতে করে ফিরবে—। শশীর বুকের ভিতরটা
অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বোরিয়ে পড়েছিল বসতা হাতে। তার স'ই
বলেছিল, আজ আবার কি করতে যাবা? এই তো পরশ,

বাধা দিয়ে শশী হিংস্রভাবে তর্জন করে উঠেছিল।

শশীর স্ত্রী আর কিছু করতে সাহস করে নাই।

সমস্ত সকালটা শশী আনন্দের মায়ের বাড়ীর পরে মরেছে।
আনন্দের মা যখন বাজার আনতে এসেছিল, তখন থেকে শুরুতে।
কিন্তু, বউটি অশ্রুত দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল মাটির পাতালের মত,
তার ওই মুখের দিকে চেয়ে বাড়ীতে সে কিছই চুপে পায়
নাই। সে একটা খোপের আড়ালে বসে বাঘের ডাঁটি তুলে তার
নরম দিকটা চিবিয়েছে, আর বউটির মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে।

বাণেরহাট মিলস্

(বাণেরহাট কো-অপারেটিভ
উইভিং ইউনিয়ন লিঃ)

১৯৩৯ সাল হইতে লভ্যাংশ
দিয়া আসিতেছে।

এখনও শেয়ার পাওয়া যায়
এজেন্সী ও শেয়ারের জন্য আবেদন করুন।

কলিকাতা অফিস-৭৭-৯, হ্যারিসন রোড,
ফোনঃ বি. বি. ৬২৯৬



বীমা আইন মতে
সর্বোচ্চ জমানত
৫০,০০০, টাকা
সরকারের নিকট আছে

“হারিয়ে ফেলা জাতীয় বিশেষজ্ঞের
বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে-
দরিদ্র ও পতিত জাতকে তুলতে হবে।”
—বিবেকানন্দ

আমাদেরও তাই চেটো, যাতে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০, টাকার একটি
বীমাপত্র গ্রহণ করে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করতে শেখেন।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল

প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিমিটেড
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

এজেন্সী গ্রহণ করিয়া দেশের সেবা ও আয় বৃদ্ধি করুন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কলিকাতা

ফোন : কাল ৩২৫৩
(৩টি লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০, টাকা
বিলকৃত মূলধন	...	৪০,০০,০০০, টাকা
বিলকৃত মূলধন	...	৪০,০০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৩২,০০,০০০, টাকার উদ্দেশ্য
মজুত তহবিল	...	৬,২৫,০০০, টাকার উদ্দেশ্য

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা সার্কেলঃ—শ্যামবাজার, হ্যারিসন রোড, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, হাওড়া, বড়বাজার,
বহুবাজার, হাটখোলা, লেক মার্কেট।

বেঙ্গল সার্কেলঃ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চৌমুহনী, কুষ্টিয়া।

বিহার সার্কেলঃ—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাক্‌চী, চাইবাসা, ঝরিয়া।

ইউ পি সার্কেলঃ—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মেটন রোড (কানপুর)।

আসাম সার্কেলঃ—শিলং, গোহাটী, তেজপুর, ধুবড়ী, নগাঁও।

কে, এন, দালাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

তারপর এল আনন্দের মা—সঙ্গে ডাক্তার, একটু পরেই এল ভট্টাচার্য মহাশয়। ভট্টাচার্য, ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর শশী বাড়ী ঢুকেছিল। ধানের বস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আনন্দের মা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বউটি কিন্তু একটি কথাও বলে নাই। সেই তেমনভাবে বসেছিল। আনন্দের মা বলেছিল, তুমি একটু বসবে বাবা শশী, আমি তা হলে দশ সের ধান বেচে দুটী চাল ভাল নিয়ে আসি।

শশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু আনন্দের মা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল। ঘোমটা দিয়ে বউটি বসে আছে একভাবে সেই পুতুলের মত; খালি হাত দুখানি বেরিয়ে আছে, কোলের কাছে ছেলেটা শুয়ে আছে নিশ্চেষ্ট হয়ে। চুপ করে বসে শশীর মনে হয়েছিল—তার টুটিটা সেন কে চেপে ধরেছে, বৃকের ওপর একটা পাখর চাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে অনেকবার পুঁলিশে তাকে হাজতে পুরে রেখেছে—অম্বকার ঘাটে ছোট ঘরটায় সে একা বসে থেকেছে, শিকঘেরা দরজার ওপাশে কনঠেপল ঘরেছে—তার চলন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শশীর রাত কাটাতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজকের এই বসে থাকার উপেক্ষাজনক কণ্টকর অনুভূতি কখনও সে ভোগ করে নাই। তাই দোকান থেকে ফিরে এসে আনন্দের মা যখন তাকে বলেছিল—আর একটু যদি বসে করে বস বাবা শশী, তবে আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে আসি, শশী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তুমি বস ঠাকরুণ, তুমি বস। আমি যেছি।

ডাক্তারের এখানে এই রোগা লোকগুলির মধ্যে বসে তাদের কাতরানী শুনে তার প্রাণ আবার হাঁপিয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে—উঠে ছুটে পালিয়ে যায় সে, কিন্তু সেই হাতখানি তাকে যেন

ডাকছে—কই আমার থোকার ওষুধ?

* * * * *

আট দিন পর।

ডাক্তার চুপ করে বসেছিল তার ডিসপেন্সারীর সামনের খোলা দাওয়ার উপর। রাতি আটটা বাজে। কাস্তিক মাসের শেষ, এবার এই মধ্যে কনকনে ঠান্ডা বোধ হচ্ছে। ডাক্তার বন্য়ার জলের ঠান্ডা উঠছে মাটি থেকে। গ্রামখানার এই দিকটাকেই বলে বাজারপাড়া। এ পাড়ায় মানুষের সাড়া সাড়ে দশটা এগারটার কমে কখন স্তব্ধ হয় না। দোকানে দোকানে আলো জ্বলে, লটকোনের দোকানে খাতা মেলায়—তহবিলের টাকা গুণিত হয়। ময়রাদের দোকানে ভিনেচন চলে, বাতাসা কাটে—কদমা কাটে; রসের সন্দেশ পাক করে—সারা রাত রসে ভিজতে পায়। কাটা কাপড়ের দোকানে খটো-খটো শব্দ করে কল চলে। কাপড়ের দোকানে—কাপড়ের নম্বর দেখে থাকে—থাকে সাজানো চলতে থাকে। দু পাকের দোকানের মাঝখান দিয়ে যে পাকা রাস্তাটা চলে গেছে একদিকে মুরাশদাবাদ অন্যদিকে বেহার—সেই পথে কাঁ-কাঁ শব্দ তুলে গরুর গাড়ী যায় আসে;—বেহারের দিক থেকে আসে শালকাঠ, শালপাতা; মুরাশদাবাদের দিক হ'তে আসে কলাই, কুমড়া, পেঁয়াজ, লঙ্কা; নিকটবর্তী অঞ্চল হ'তে আসে ধান। ওদিক থেকে সাঁওতালোরা আসে মজুরীর সম্বন্ধে; এদিক থেকে আসে স্থানীয় লোকজন, পূর্বের অঞ্চলের সাত আট ক্রোশের মধ্যের গ্রামগুলির এইটিই নিকটস্থ রেল স্টেশন। এবার কিন্তু এই মধ্যে সব স্তব্ধ অম্বকার। দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। ডাক্তার পথের দিকে চেয়ে বসেছিল।

ডাক্তারের মেয়ে ডেকে বললে—বাবা ঘরে এসে বসুন, মা বলছেন—ইম পড়ছে যে।

এ, বোস এণ্ড কোং

৫২নং ডাব্লু, সি, বনার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

“ডেকরেটার”

বিবাহে, শ্রুভকার্যে, জনসমাগমে মিলনবাসরকে আনন্দে রঙীন করে তুলতে হ'লে—

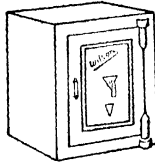
বি, বি—৭৭৬—এ ফোন করুন।

মফঃস্বলের কাজেও এঁদের বিশেষত্ব।

এ, বোস এণ্ড কোং

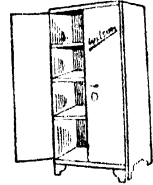
বিবাহ-বাসরের সাজ-সরঞ্জাম, দরবার—সা মি য়া না, গ্রেট জু প্রভৃতির জন্য সুপ্রসংসিত।

উইলসনের ফায়ারপ্রুফ সিন্দুক



গুণে শ্রেষ্ঠ

উইলসনের ইম্পাভের আলমারী



ইণ্ডিয়ান মেটাল এণ্ড স্টীল প্রোডাক্টস্

শো-রুম—(১) ১২, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।
(২) ৯৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শাখা—চাঁদনী চক, দিল্লী। (ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে)

সবর উৎকৃষ্টরূপে আপনার রেডিও মেরামত করিতে হইলে আমাদের নিকট দিন। সবপ্রকার রেডিও ও গ্রামোফোনফায়ার আমাদের নিকট সবদাই মজুত থাকে।
রে ডি ও রি সা চ' কর্ণার

ম্যানেজিং এজেন্টস্—গ্যাণ্ডিন এণ্ড কোং

২০/১, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাগ্যবিপর্যয়ের দূরবস্থা
ও অর্থভাবের কষ্ট থেকে
পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে

বাসন্তী প্রভিডেন্ট

ইন্সি ওরেন্স

(কোম্পানী লি.ম্যাটেড)

এ আজই জীবনবীমা করুন।

—হেড্ অফিস—

৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
ডবলদেও, কলিকাতা।

এজেন্সীর সর্তাবলী
সুনিয়ন্ত্রিত।

বি. মুখার্জী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাফ—“Rainbow”, Calcutta.
Phone : P. K. 2681.

দি

শিলং ব্যাঙ্কিং
—কর্পোরেশন লি:—

হেড্ অফিস...শিলং।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ—গ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

*

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার
সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান ॥

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

শ্রীসুদর্শন দত্ত, বি-কমঃ
আর-এ, এফ-আই-এস-এ,
এফ-আর-ই-এস (লন্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ন্যাশনাল চেম্বারস ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত ১৯২৮ সাল)

হেড্ অফিস—গোহাটী

সেন্ট্রাল অফিস—৫০।১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা

গোহাটী নগর (আসাম) ও ঢাকা

নিম্ন স্থানে শীঘ্রই শাখা খোলা হইতেছে

পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ

ও

করাচী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

দেবাংশু সেনগুপ্ত, এম, এ (কম)।

—মাছি।

—খাবার করবেন, মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। শশী ফিরবে মতিপুর গেছে। তারপর ইনজেকশন দিয়ে এসে খাব।

শশী গেছে মতিপুরের বাজার। মতিপুরের বাজার এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাজার, বিশেষ করে ওষধের এমন ষ্টক—জেলার সদর শহরেও নাই। ‘প্রোটোসিল’ আর কয়েকটা ইনজেকশন আনতে গেছে শশী। ইনজেকশনের চেয়েও জরুরী দরকার প্রোটোসিল পিলের। পাওয়া না গেলে—সে কথা ভাবতে ডাক্তার অধীর চণ্ডল হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠাকুরের ছেলেটির ম্যালিংগন্যাট ম্যালেরিয়া হয় নাই, হয়েছে মেনিন্‌জাইটিস্‌। ম্যালেরিয়া, বোরবোর, টাইফয়েড, এগুলোর আনুষঙ্গিক হিসেবে এতদিন ছিল শূদ্ধ নিউমোনিয়া—এবার মেনিন্‌জাইটিস্‌ও এসে জুটল। কলোরাও চলছে—এখানে ওখানে। কেনটা কলোরা কেনটা ম্যালিংগন্যাট ম্যালেরিয়া—কেনটা বোরবোর সব সময়ে বুঝতে পারা যায় না। মানুষ মরছে।

আকাশের নৈখত কোণে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে। ডাক্তার সেই দিকে তাকালে। লাল-নীল-সাদা তিনটে আলোক বিন্দু—উষ্ণকর মত দ্রুত বেগে চলেছে। গ্লেন যাচ্ছে। দিন রাত্রি—কোন সময়েই বিরাম নাই। আকাশে গ্লেন চলছে, পথের ওপর আজকাল দিনের বেলা যায় মিলিটারী লরী; গ্রামের পায়ে চলা পথ ধরে চলছে মড়া কাঁধে রোগা মানুষ। আট দিনে ডাক্তারের হাতের রোগীর মধ্যে সর্বাধিকটা রোগী মরেছে। আজ রাতেই বোধ হয় আরও চারটে মারা। মিহির ডাক্তার বরাবরই ধীর চিকিৎসক; ধীরতার সংগে সে চিকিৎসা করে, ভাল মন্দ দুইই সে গ্রহণও করে ধীরতার সংগে। হাত রোগীর হাতখানি ধীরে ধীরে তার বুকের উপর অথবা পাশে নামিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে উঠে আসে। বুঝতে পারলে আগে কেবেই রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তভাবে সহৃদয়তার সংগে বলেও দেয় সে কথা। এবার তার শান্ত ধীরতা—এই হিমালী শীতল মৃত্যু খড়ের স্পর্শে জলের মত জমে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চারটে হয় তো আজই যাবে—তা’ ছাড়া আজ ফোর কাল হোক, দু দিন চার দিন পরে হোক—যাবেই, মৃত্যু নিশ্চিত—এমন রোগী—নসরামের স্ত্রী, ব্যোমকেশ মুখোজে, হরিধনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরণের ভাই—পচিজন। পচিজন কেন—প্রোটোসিল আর ইনজেকশনগুলো না পেলে—; শীতপ্রধান দেশের নদীর ওপরের কঠিন বরফের স্তরের তলদেশের জল চণ্ডল হয়ে উঠল যেন; ডাক্তারের মন ঈষৎ চণ্ডল হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা। অচণ্ডল মত মেয়েটিকে সেই প্রথম দিন থেকেই একভাবেই দেখে আসছে। অবগুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে একপাশে বনে থাকে—দেখা যায় শূদ্ধ দুখানি নিরাভরণতায় সঙ্কর স্ফোমল লাগণভরা হাত—এই হাত দুখানি দেখলেই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন কাঁপাল হয়ে গিয়েছে। আর দেখা যায় অতি শূদ্ধ দুখানি পা; মধ্যে মধ্যে কদাচিত্‌ চোখে পড়ে তার মুখ তাতে সেই এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ ডাক্তার আজও বুঝতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের সম্ভ্রম হয়, মেয়েটি বোধ হয় পাগল অথবা— ডাক্তারের মন অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরল—একটা সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাণ কিছু তার মনকে অতর্কিতে স্পর্শ করেছে।

কাষার রোল উঠছে। বেশী দূর নয়। নসরামের বাড়ী থেকে উঠছে। নসরাম স্ত্রীই মারা গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার একটু হাসলে। আজই মরবে এমন কথা ডাক্তার ভাবে নাই। মরেছে—তাতেও সে বিস্মিত হয় নাই। হঠাৎ হৃদযন্ত্র স্তম্ভ হয়ে গেল।

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আমি।

ডাক্তার টাটা জ্বাললে। গ্রিপ্সুরা ভটচাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ডাক্তার উঠে এগিয়ে এল। —আপনি কি ওখান থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। একবার চলুন আপনি।

ডাক্তারের পায়ের নখের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উৎকীর্ণত অনুভূতি বিদ্যুৎ বেগে খেলে গেল। গিয়ে কি করবে সে? কি করতে পারে? মিনিটখানেক সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

—ডাক্তারবাবু।

দুট সঙ্কল্পের একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তাই-ই করবে সে। লাম্বার পাংচারই করবে। তার বিদ্যার দুঃসাহসিক চেষ্টাই সে করবে। লাম্বার পাংচার পল্লী গ্রামে দুঃসাহসিক চেষ্টা। কলেজে সে দেখেছে, সেখানে বোধ হয় চার পাঁচটা কেস নিজে হাতে করেছে—কিন্তু তারপর আর করে নাই। তা হোক। এ ছাড়া উপায় নাই।

সে সময়ে পরীক্ষা করে দেখে সূচ বেছে নিয়ে বাগ হাতে বোঁড়িয়ে পড়ল।

গ্রিপ্সুরা ভটচাঁয়—আনুর মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিল ডাক্তারের কার্যকলাপ। থর থর করে কাঁপছিল তারা।

মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে ডাক্তার সূচটা সময়ে বার করে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেললে। এতক্ষণ তার অনাদিকে তাকাবার অবকাশ হল। সামনেই লণ্ঠন জ্বলছে। ওপারে মেয়েটি বসে আছে। তার মুখের অবগুণ্ঠন খসে গেছে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ডাক্তারের সূচটির দিকে। ডাক্তারের হাত থেকে সিরিজটা খসে পড়ে গেল। সে কেপে উঠেছে।

চাঁকত হয়ে ভটচাঁয় প্রশ্ন করলে—ডাক্তারবাবু:

আনুর মা কঁদুকে পড়ল রক্ত নাতির উপর, অনুভব করে দেখছে সে।

ডাক্তার শান্তস্বরে বললে—রোগী ঘুমচ্ছে।

ভটচাঁয় বললে—মায়ের চরণোদক একটু—

ডাক্তার বললে—দিন।

ও-পাশে বাইরের দরজার মূখে দীর্ঘাঙ্কিত কে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললে—কে, শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলে কেমন আছে? ক’তস্বরে তার অপরিসীম উদ্বেগ।

—এখন একটু ভাল। কিন্তু তুই ওষুধ পেয়েছিস?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বার বার ঘাড় নেড়ে শশী বললে—আজ্ঞে না।

ডাক্তার সময়ে ডাঙা সিরিজের কাঁচামূলি কুড়িয়ে নিয়ে উঠল। আনুর মাকে ডেকে বললে,—দেখুন!

আনুর মা কিছুক্ষণ তার মূখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—ডাক্তারবাবু?!

ভটচাঁয় এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। শশীও এগিয়ে এল। ডাক্তার বললে, দেখুন আমার—। বলেই সে ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

আনুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে বলে উঠল—আপনি বলুন ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা—বোবা।

সকলের মূখে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি—বিস্ময়—করুণা—হয়তো কিছুখানি তাচ্ছিল্যও আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মূখে তার প্রকাশ সব চেয়ে কম। এ সম্ভ্রম তার হয়েছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললে—আমার শেষ চেষ্টা আমি করলাম। যদি ভাল থাকে কাল সকালে খবর দেবেন।

ডাক্তার মাথা নত করে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হ’ল আপনার বাড়ীর দিকে।

ভারতবাসী হিসাবে আপনি
নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করিবেন

তুলেখা কার্ল

উৎকৃষ্ট বিদেশী ফাউন্টেনপেন
কার্লের সহিত সাফল্যের সহিত
প্রতিযোগিতা করিতেছে।

মৈত্র ব্রাদার্স এণ্ড
কোং লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা :

কম্বা রোড, পোঃ ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

উৎসবের—
শ্রেষ্ঠ সুন্দর উপহার—
সকল মহিলাদের প্রিয়।



সুগন্ধি
নীহার
আমলা

যন্ত্রিষ্ক সীতল
রাখে ও বেশ
ফ্রুটি করে



গ্ল্যাক্স কোসমিকেল ওয়ার্কস

১৭, আর, জি, কর রোড, কলিকাতা।

সত্যশ-কবিরাজের

শ্বাসারি

হাঁপানি কাশির যম

১ দাগে হাঁপ কমে, ১ শিশিতে উপশম

১ দাগ শ্বাসারি সেবনেই জমাট কফ তরল হইয়া উঠিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস যন্ত্রণার নিবর্তি হয়। শ্বাসারি শ্বাসনালীর দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে এবং হৃদযন্ত্রকে সবল করে দলিয়া ইহা ব্যবহারে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।

লক্ষ লক্ষ রোগী তাঁহারা শ্বাসারি ব্যবহারে
নির্দোষরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা
বলেন—“শ্বাসারি”তে থায়ী উপকার পাওয়া যায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসকগণ ইহার
উচ্চপ্রশংসা করেন ও রোগীদের ব্যবস্থা দেন।

প্রথম দাগ সেবনেই ইহার অসীম শক্তির পরিচয় পাইবেন।

হাঁপ কাশি, বস্কাইটিস্ প্রভৃতিতে
প্রথম হইতে “শ্বাসারি” সেবন করিলে
রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

মূল্য—প্রতি শিশি ১১০, ডাকমাশুল—১৮০

সত্যশ-কবিরাজের অবলাবল

অম্প বা অধিক রক্তস্রাব, বিলম্ব রক্তস্রাব, শ্বেত, কৃষ্ণ বা বিবিধ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত
রক্তস্রাব, কণ্টরজ বা ক্ষতকালে বেদনা বা জ্বালা, তলপেট ভর, তলপেটের বাম বা দক্ষিণ-
ভাগে বেদনা প্রভৃতি রক্তঃ সম্বন্ধীয় রোগ ও তাহাদের উপশম “অবলাবল” সেবনে
নির্দোষরূপে ভাল হয়।

নিয়মিত ৩ শিশি সেবনে বাধকদোষ দূর হয়।

মূল্য প্রতি শিশি—১, ডাকমাশুল—১৮০, একট্রে ৩ শিশি—২৫০, মাশুল—১০

সর্বত্র বড় বড় দোকানে ও ঔষধালায়ে পাওয়া যায়।

কবিরাজ এস, সি, শর্মা এণ্ড সন্স

আনুভূতীয়া ঔষধালয়
সাহাপুর, পোঃ বেহালা, কলিকাতা

ভট্টাচার্য ও ডাক্তারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। উদাস দূরেতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে পথ চলাইছিলেন ভট্টাচার্য। শশী এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই দিকে চেয়ে; লনের আলোর ও-পাশে মেয়েটির দিকে চেয়ে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিক্ষাতির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে কাঁপছে। আনন্দের মায়ের কথা কণ্ঠের মধ্যে সে যেন গভীর আতঙ্কের কিছুই সম্মান পেরেছে।

(ছয়)

বোবা মেয়ে কাঁদছিল। রাতি প্রায় তিনটে। ছেলেটি মারা গেছে। শশী আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল আনন্দের বাড়ী থেকে।

কালো বোবা বউটি—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনন্দের মা নাতির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে গসেছিল। মধ্যরাতি থেকে আবার তার আক্ষেপ সূর্য হয়েছিল: চাঁৎকার করে উঠছিল সে আগের মত। কালো বউটির সেসব কিছুই কিন্তু কাণে যায় নাই। ছেলেকে ঘুমতে দেখে সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। একে কালো—তার উপর ঘুমন্ত অবস্থা—চাঁৎকার তাকে স্পর্শই করে নাই।

শশী কিন্তু সেই সম্মা থেকেই ছিল, যায় নাই। কেউ অনুরোধ করে নাই—তবু সে গভীর উৎকণ্ঠা বৃকে নিয়ে বসেছিল। গলাব ভিতর কিছু যেন মধ্যে মধ্যে আটকে যাচ্ছে: মনে হয়েছে কাঁধের উপর থেকে আঙুলের ডগা পশ্চত একটা মৃদু অথচ অভ্যন্ত অসামান্যিক বশণা অনুভব করছে; বৃকের ভিতরে ঢেঁকির আঘাত পড়ছে এমনভাবে হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে, তবু সে যেতে পারে নাই। ভগবানকে ডাকে নাই।—ডাক্তারের ওই সূচ ফাটিয়ে দিয়ে যাবে এই প্রতীক্ষা করে। এক একবার ছেলেটা নড়েছে—আর শশী চমকে উঠেছে। সংগে সংগে মনে হয়েছে তার টুকুটা কে চেপে ধরলে যেন। যখনই চোখ দিয়ে তার ভাল পড়েছে বহুবার।

আনন্দের মা ব্যস্ত হয়ে উঠল—বৃকে পড়ল নাতির উপর। শশী উপর হয়েই জানোয়ারের মত এগিয়ে গেল খানিকটা।

চাঁৎকার করে কেঁদে আনন্দের মা শিশুটির বৃকের উপর আছড়ে পড়ল। শশী কাঁপতে আরম্ভ করলে—মনে হল তার দম বৃদ্ধি বধ হয়ে গেল। বউটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। মুখের ঘোমটা বসে গেছে। শশী অকস্মাৎ চাঁৎকার করে কেঁদে উঠল—ওঃ—ওঃ—ওঃ! ওই চাঁৎকারে জগল বউটি। তার বাঁধর কাণের নিদ্রাস্তম্ভ স্নায়ুতন্ত্রীতেও যা দিয়েছে শশীর চাঁৎকার। বউটি বিক্ষাতির দৃষ্টিতে দেখলে—শাশুড়ী শিশুর উপর উপড়ে হয়ে পড়েছে। কৃৎসিত শশীর কায়াম ভাঙা বিকৃত মুখ তার চোখে পড়ল: কাণেও যাচ্ছিল এই চাঁৎকারের স্পর্শ—অন্ধকার গভীর গহীর মধ্যে গৃহামুখের শব্দধরনের মত। সেও উপড়ে হয়ে পড়ল ছেলের উপর, হাত দিয়ে নেড়ে স্পর্শে মাথায়ে বৃকলে—স্থির দৃষ্টিতে ছেলের নিম্পন্দ দেহের দিকে, মুখের দিকে চেয়ে বৃকলে—ভারপর—ছেলের দেহটা ছিঁনিয়ে নিলে একটা চাঁৎকার করে। বোবার শোকাত চাঁৎকার; তার মধ্যে কথা নাই—শব্দ একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি, হ্যাঁ—একখানি কণ্ঠস্বর—। কার্তিক মাসের আকাশে উল্কাপাত হয় বেশী; শশীব মনে পড়ল সেই তারা খসে পড়ার কথা—হঠাৎ আকাশ পুরে ছুটে যায় নীল আলো, কিছুদূর গিয়ে নিড়ে যায়। চোখ সইতে পারে না—মন প্রাণ কেমন করে ওঠে—কিন্তু এমন আলোর ছটা আর হয় না। ঠিক তেমন! এমন কায়াম আর হয় না। সে কখনও শোনেনি।

শশীর আর সহ্য হল না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণকঙ্কর রাতি। অমাবস্যার কাছাকাছি বোধ হয়। রাস্তার দুপাশে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিরুচ্চ মাটির চাঁবির মত। হঠাৎ চোখে পড়ল সরু লম্বা এক টুকরো

আলো। জানালার মুখের ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বেরিয়ে আসছে। শশী দাঁড়াল। ডাকল—ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারেরই বাড়ী; শশীর ভুল হয় নাই। জানালা খুলে গেল—কে? শশী? ডাক্তারের চিনতে ভুল হয় নাই। অনেক রোগীরই মরবার আশংকা আছে, তাবেরও আপনাব্যক্তনের আসতে পারে—কিন্তু ডাক্তার এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা করে বিন্দ্র হয়ে বসে ছিল। আরও সে জানত শশীই আসবে ডাকতে।

—একবার আসুন। মরে গেছে জেনেও শশী ডাকলে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। শশীকে প্রশ্ন করলে না—কেমন অবস্থা।

শশী বললে—আপনি যান—আমি ভট্টাচার্য মশায়ের কাছ থেকে মায়ের পুংপ নিয়ে আসি।

ডাক্তার বললে—যা—ছুটে যা।

শশী আবার ছুটল।

ভট্টাচার্য বাড়ীতে নাই। মায়ের মন্দির হতে ফেরেন নাই আজ। শশী আবার ছুটল। চারপাশে ঘন জংল—থমথম করছে চারিদিক, চি—চি—ঝি—ঝি করে ডাকছে—ঝি ঝি পোকা আরও কত কাঁটপতঙ্গ—চাঁ—চাঁ শব্দে ডাকছে পেঁচা। রাতি তিন পহর হয়ে গেল। শশী ঢুকল চাণ্ডীতলায়। মন্দিরের অন্ধকার পারান্দায় ভট্টাচার্য বসে আছেন স্থির হয়ে। শশী ডাকলে—ভট্টাচার্য মশায়। ঠাকুর মশায়।

—তারা—তারা মা! ভট্টাচার্য চণ্ডল হয়ে উঠলেন—কে?

শশী?

—আজ মায়ের পুংপ নিয়ে চলুন একবার।

ভট্টাচার্য উঠলেন। পুংপ নিলেন। তাঁর বৃকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। জীবনে বোধ হয় এমন কণ্ঠ কখনও হয় নাই। তবু বলতে চাইলেন—ভয় কি? কোন ভয় নাই! কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা বের হল না। অন্ধকার ঘুমন্ত পঞ্জীর মধ্য দিয়ে চারখানি পায়ের শব্দ দ্রুততালে বেজে এগিয়ে চলল। আরও একটি করে শব্দ দু'জনেরই কাণে আসছিল—বৃকের ভিতরে ধক—ধক—শব্দ উঠেছে।

* * * * *

বোবা মেয়ে কাঁদছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। ভট্টাচার্য বেরিয়ে এলেন। শশীও বেরিয়ে এল। আনন্দের মা—ডাক্তারকে কিছু বললে না, ভট্টাচার্যকে ডাকলে না—ডাকলে, বাবা শশী!

তিনজনেই দাঁড়াল।

আনন্দের মা বললে—খোকার গতির কি হবে বাবা? ভূমি—

শশী পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার বললে—তুই যা শশী—তা ভিন্ন—।

ভট্টাচার্যের গলা দিয়ে বের হল—অদ্ভুত একটা স্বর।

এদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুকে দাখ করে না—মাটির মধ্যে পুতে দেয়।

আনন্দের মা বললে—নিয়ে আমি যাব। কিন্তু গর্ত করতে আমি তো পারব না।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন—এগিয়ে চললেন—দ্রুতপদে। ঘাড় হেঁট করে যেতে যেতে হাতের মঠোর মধ্যে তিনি কটলে পিষ্ট করছিলেন একটা জবাব—দু—তিনটে পেলপাতা।

ডাক্তার ডাকলে—দাঁড়ান ভট্টাচার্য মশায়। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন না। ডাক্তার গতি দ্রুততর করলে।

রাতি শেষে হিমভীক্ষা বাতাস বইতে সূর্য করছে। পাশেই একটা বাড়ীতে কেউ বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কাঁদছে। ঘুম ভেঙে গেছে, সপ্তিমহান অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়েছে মৃত প্রিয়জনকে। দূরে কোথাও কতকগুলো কুকুর একসঙ্গে চাঁৎকার করে কাঁদছে।

আনান্দসবে—

প্রেম ও প্রীতির নৈবেদ্য
রাজনতী জন্ম ও মাস্ক কিমাম
মুদ্, মাদকতা ও সাদে গবেষে অভুলনীয়।



দি টোব্যাকো ট্রেডার্স

৫৪, বেঙ্গলগাছিয়া রোড, কলিকাতা
ফোন : বি বি, ৩৯৭৯

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লি.

হেড অফিস-১৪৯/২৩ ব্রীচ বালিশা। কোল-ক্যাল, ৫১৮৯

ব্রাঞ্চ—বড়বাজার জামবাজার, ভবানীপুর
বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা।

সদদের হার

কারেন্ট—৩%

সেভিংস্—১১%

ফিক্সড ডিপজিট

২১% হইতে ৪%

স্বাধীনতা সত্তে গবর্ণমেন্ট ও মিলিটারী দিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়
এবং সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

১৯৪২—৪৩ সালে শতকরা ৫, টাকা হারে লভ্যাংশ (ই কান ট্যাক্স বর্জিত)
দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম ডি।

“ইণ্ডিয়ান হারবাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট”

এর কয়েকটি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ

ম্যালেরিয়ার জন্য—এ্যান্টি-টারসিয়ান ট্যাবলেট (ANTI-TERTIAN TABLET)

বেরিবেরিতে—কুকুভিন (KOKUVIN)

ফাইলেরিয়ার জন্য—ক্যালোফিল (CALOFIL)

কাসি এবং ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিতে—সিরাপ তালিশ

(SYRUP TALISH ET VASAK COMP.)

কলিকাতা ও হাওড়ার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যা রু তি ড্রা গ সি ণ্ডি কে ট

সোল ডিস্ট্রিবিউটরস্

রুম নং ডি-২৭।২৮

৮৪৩, ক্লাইভ স্ট্রীট—কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৫৭৮৯

লাল হৈছে। কুসুর কাদে। ডাক্তার আরও দ্রুত চলতে চেষ্টা করলে। এগুলো তাকে তত পীড়িত করছে না—কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে ওই বোবা মেয়ের কান্না।

ভট্টাচার্য পিছন থেকে ডাকলে—দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। যুবক ডাক্তার—ভট্টাচার্যকে অতিক্রম করে গেছে। ডাক্তার দাঁড়ালে না।

সে অস্থিরভাবে টানছিল—স্টেথিসকোপের রবাবের নল দুটো। একটা নল ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে। কি হবে ডাক্তারী করে? বোবা মেয়ের কান্না এখনও শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী—যে যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর কান্না। ডাক্তারের মনে হল—ও কান্না যেন এখনও থামবে না—চারিদিকে কান্না। মানুষ মরছে! মরবে! আর বোধ হয় তাদের নিষ্কৃতি নাই। এই তেরশো পঞ্চাশেই সব ধুয়ে নুড়ে যাবে। চাঁৎকার করতে হচ্ছে হাল ডাক্তারের—ভূয়ো—ভূয়ো সব ভূয়ো! সে ছুটে গিয়ে উঠল আপনাব ডিসপেনসারীর দাওয়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অস্থকারের মধ্যেই সে চেয়ারে বসে পড়ল। চমকে উঠল ডাক্তার। বোবা মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের কোণ চিরে আসছে সে কান্না।

কান্না নয়—ঝাঁঝের ডাক।

ডাক্তার টচ জ্বাললে; পোকাটা দেখা যায় না। আলোর ছটাও গিয়ে দেওয়ালে পড়ছে না, পড়েছে আলমারীর উপর। Poison! বিয়! সাবধান!

ডাক্তার অগ্রসর হ'ল আলমারীর দিকে।

—ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য ডাকছেন রাস্তা থেকে। ডাক্তার উত্তর দিলে না। টচটা নিভিয়ে দিলে।

ভট্টাচার্য আবার ডাকলেন। কিন্তু উত্তর এলো না। ভট্টাচার্য একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন চণ্ডীতলায় পথে।

দরজা খুলে দেবীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন কিছুদ্ধণ ভেবে, নেড়ে দেখলেন দেবী প্রতিমা। শীতাত শেষ রাত্রিতে মর্ত থেকে হিম বের হচ্ছে। কঠিন। মানুষের শবও এত কঠিন হয় না।

ভট্টাচার্য যেন পাগল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ হচ্ছে হ'ল বলির খাড়াখানা নিয়ে—। শিউরে উঠলেন ভট্টাচার্য। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে খাড়াখানা আরও শক্ত করে ধরলেন—নিজের গলাতেই—

* * * * *

পরদিন সকাল বেলা।

ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলে। উঃ কি রাত্রিই গেছে কাল। এখনও বিষের আলমারীর দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রোগী অনেকে এসে বসে আছে। অনেকে আসছে। প্রতিদিনের মত আজও গত রাত্রে কে কে মরেছে তারই হিসেব হচ্ছে। তিনজন মরেছে গত রাত্রে। নসুদামের স্ত্রী, পঞ্চু বাউড়ী, গোবিন্দ বৈরাগী।

—আনু! ঠাকুরের ছেলেটিও মরেছে কাল। একজন বললে।

ডাক্তার আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাত্রি জাগরণের অবসর অবসর ডাক্তারের কাণের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে এখনও যেন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে বোবা মেয়ের কান্না। সপ্তে সপ্তে অবসর দৃষ্টির সম্মুখে মনের উদাসীনতার সুযোগ—ভেসে উঠছে সেই ছবি।

—ডাক্তারবাবু!

বোমকেশ বাবুর ভাইপো। কুড়িটি টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে সে বললে—ওষুদের দাম। আর—

ডাক্তার অবসর দৃষ্টি ভুলে চাইলে তার দিকে।

—এবেলা যাবেন বারোটার পর।

—বারোটার পর?

—হ্যাঁ। আজ স্বস্তায়ন করাচ্ছি। হয়ে যাক স্বস্তায়নটা।

—বেশ।

বোমকেশ বাবুর ভাইপো মৃদুস্বরে বললে—চণ্ডীতলায় পুজো দিলাম, বলি দিলাম, খানিকটা প্রসাদী মাংস আছে। বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই?

—দিব।

বোমকেশের ভাইপো বললে—ভট্টাচার্য মশায় কেমন হয়ে গেছেন। কি যে নম নম করে পুজো করলেন! বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়লেন—আমার মনে হল যা—তা বলছেন। মধ্যে মধ্যে থু-থু করে হাসছেন।

গোঁ গোঁ শব্দ উঠল।

ছেলোরা চাঁৎকার করে উঠল—ওরে বাবারে—কতরে! কতরে!

বোমকেশের ভাইপোর কথাটা জমল না। সে উঠল, বললে—

এবেলাতেই দেখে ওষুদ দেবেন।

ডাক্তারের মুখেও পিচিট হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে সে প্রেসক্রিপশন লিখতে আরম্ভ করলে।

এরোপ্লেনের ঝাঁক এগিয়ে আসছে। গজ'ন বাড়ছে। সে শব্দ ছাপিয়ে উঠল কান্নার শব্দ। তারস্বরে কাদিতে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠের কান্না।

কে? —কে রে? কে গেল? বাইরে রোগীরা গবেষণা করছে।

ডাক্তার লিখেই চলেছে। ও কান্না তাকে বিচলিত করে না।

যে কান্না কাল রাত্রে শুনিয়েছে—তারপর—?

কান্না এগিয়ে আসছে।

—কে? কে? শশীর বউ? শশী ডোমের বউ? —কি হ'ল রে? অ-ডোম বউ?

—ওগো!—আমার মরব—

—কে—শশী?

—হ্যাঁ গো! গাঁয়ের বাইরে গাছের ডালে—গলায় দড়ি লাগিয়ে—থানায় খবর দিতে যাচ্ছি গো!—

শশীর স্ত্রীও থেমে গেল—আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে। একদল—বিশ পঁচশখানা উড়ো জাহাজ চলেছে।

ডাক্তারের কলম থেমে গেছে।

শশী আত্মহত্যা করেছে?!! এরোপ্লেনের শব্দের মধ্যে বোবা মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে ডাক্তার।



হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

বিশুদ্ধ না হইলে ফল পাওয়া যায় না

কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিক লেবরেটরীতে ইহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার উপায়
অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ ঔষধ পাওয়ার একমাত্র
উপায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ঔষধ সংগ্রহ করা।

অত্যাৱশ্যক কয়েকখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক

তুলনামূলক মেটেরিয়া মেডিকা

(থেরা পিউটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল)
ঔষধের পরিচয়, প্রস্তুত প্রক্রিয়া,
ক্রিয়াস্থল ও কোন কোন উপসর্গে
ব্যবহৃত হয়, রোগীর মানসিক
অবস্থা এবং ঐ মানসিক অবস্থা-
সম্পন্ন লক্ষণবিশিষ্ট সমস্তরের
কোনও ঔষধ থাকিলে তাহার
বৈশিষ্ট্যমূলক তুলনা ইত্যাদি
যথাসম্ভব দেওয়া হইয়াছে।

২২৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ টাকা মাত্র।

পারিবারিক চিকিৎসা

কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় লক্ষ লক্ষ
পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।
পঞ্চদশ সংস্করণে “নব-পর্যায়”
নাম দিয়া “রক্তের চাপ (Blood
Pressure)” ও “বিমান আক্রমণে
বিপত্তি” সম্বন্ধে চিকিৎসা প্রণালী
সংযোজিত হইয়াছে।

১১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪ টাকা মাত্র।

THE PHARMACUTIST'S MANUAL

The Pharmacopoeia of Homoeo-
pathic Medicines (10th Edi.) in-
corporates fully the direction of
the latest official Homoeopathic
Pharmacopoeia of the U. S. A. to-
gether with those of the A. H. P.
& G. H. P. and includes about 70
Indian Drugs and all Resinoids.

Price Rs. 5/- only.

MANUAL OF MATERIA MEDICA

With Allen's Clinicals;
also contains quotations from
'Hahnemann,' 'Hering,' 'Clarke',
etc., etc.

Over 2,000 pages in 2 Vols.

Price Rs. 10/- only.

পঞ্চাশ বৎসরের উদ্ধৃকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক
প্রতিষ্ঠান

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

ইকনমিক কান্সেলারী

৮৪, ব্রাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

ঐশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিজ্যোতির নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেশ কাব্যের রচয়িতা ঐশানচন্দ্রের নামের সহিত বাঙালী পাঠক নিত্যমত অপরিচিত নহেন। তিনি কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখের জন্ম হয়।

ঐশানচন্দ্রের জীবনকথা আমরা বিশেষ কিছুই জানি না; এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, তিনি অনেক দিন হাংগলী কলেজীতে এবং সেখানে জীবনে হাইস্কোলে কর্ম করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ঐশানচন্দ্র কবি-শক্তির অধিকারী ছিলেন। সে যেরূপে প্রায় সকল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। চিত্ত-মুকুর। (পদ্য গ্রন্থ) সন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। পৃঃ ১৪৭।

পুস্তকের আখ্যাপ্তে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও উৎসর্গপত্রের এই অংশ হইতে দেখা যায় যে, ইহা ঐশানচন্দ্রের লিখিতঃ—
“পূজাপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় মহাশয়!...অগ্রজ বলিয়া ‘চিত্ত-মুকুর’ আপনাই অর্চনার উপকরণ...কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি আছে.....”

গ্রন্থকারের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশঃ—“ইহার অনেকগুলি কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ইতিপূর্বে এডুকেশন গেজেট ও বাম্‌থ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।...চিত্তমুকুর তাহার প্রথম উদ্যম।”

২। বাসন্তী। (গীতিকাব্য) ইং ১৮৮০। পৃঃ ১৬২।

পুস্তকের আখ্যাপ্তে গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রকাশক বিনোদবিহারী মল্লোপাধ্যায় “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেনঃ—“গ্রন্থকারের যে সকল কবিতা ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন, বাম্‌থ ও আর্থদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি ও কতগুলি অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া বাসন্তী প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট নিত্যমত অপরিচিত না হইতেও পারেন। তাহার ‘চিত্ত-মুকুর’ ও পূর্বোক্ত সাময়িকপত্র সমস্ত কবিতাদলি বোধ হয় সাধারণের নিকট নিত্যমত

অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। বসন্তকালে প্রকাশ করিবার মানস ছিল বলিয়া বাসন্তী নাম দেওয়া হয়, কিন্তু কার্যগতিকে বিলম্ব হইয়া পড়িল।... পাইকপাড়া ১০ই শ্রাবণ ১২৮৭।”

৩। যোগেশ কাব্য। ইং ১৮৮১। পৃঃ ১৪২।

গ্রন্থখানি “সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়”কে উৎসর্গীকৃত।



ঐশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৫৬—১৮৭৭

উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিতেছেনঃ—“যোগেশ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা তোমায় বলিয়া দিই। যোগেশ কাব্যনিক উপন্যাস নহে; যোগেশ জীবিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ—আমার সংসারের সান্নিধ্য—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কথো সহায় ছিলেন।...যোগেশ অমিতাকর ছন্দ লিখিলাম, জীবন না তোমার কিরূপ লাগিলে, কিন্তু তুমি আমার ‘চিত্ত-মুকুর’ ও ‘বাসন্তী’ আদরের সহিত পাঠ করিয়াছিলে। পদ্মপুত্র, খিদিরপুর। ২৫এ ফাল্গুন ১২৮৭ সাল।

৪। চিন্তা। (গীতিকাব্য) ইং ১৮৮৭। পৃঃ ১৭২।

পুস্তকের “আনুষঙ্গিক কথা” প্রকাশঃ—
“চিন্তার প্রায় সকল কবিতাই পূর্বে বঙ্গদর্শন, আর্থদর্শন, বাম্‌থ, ভারতী, নবজীবন, প্রচার, পাণ্ডিত্য সমালোচক, কম্পনা, সাধারণী, সময় প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত

হইয়াছিল। অপ্রকাশিত দুই একটি কবিতাও ইহাতে আছে। সকল কবিতারই কিছু কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়াছি।...হংগলী, চৈত্র ১২৯০।”

নির্বাচিত কাব্য সংগ্রহ
ঐশানচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ হইতে নির্বাচিত করিয়া যাহা কাব্য-সম্পদে গ্রাহ্য বিবেচিত হইয়াছে, এরূপ একটি রচনা-সংগ্রহ ‘বাংলার কবি ও কাব্য’ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ্রকাশিত রচনা

১৩১৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ শ্রীবিনোদবিহারী বিনোদবিহারী “কবি ঐশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ঐশানচন্দ্রের কতগুলি অপ্রকাশিত রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

“কবি ঐশানচন্দ্রের তিনখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থের আমরা সংগ্রহ পাইয়াছি। একখানির নাম ‘অনন্ত’, একখানির নাম ‘দেবীতীর্থ’ এবং একখানি কতগুলি কবিতার সমষ্টি।.....

১। অনন্ত—‘অনন্ত’ [নয় সর্গে সমাপ্ত] একখানি খণ্ড কাব্য এবং ইহার নামের নাম ‘অনন্ত’। কল্প-ফল-পরিভূত জীবের যাতনা দেখিয়া অনন্তের মহাপ্রাণ কামিয়া উঠিল। অনন্ত দেখিলেন, বিশ্বের বর্তমান বস্তুধার দৃশ্য, কট, যাতনা অবশ্যাকারী। তাই জীবকুলের শাস্তির জন্য অনন্তের প্রাণ ‘ব্রাহ্মী’র জয়ে বিশ্বব্রহ্মের মত নতন জগৎ নির্মাণ করিতে চাহিল।...

২। দেবীতীর্থ—‘গ্রন্থখানি দশ সর্গে সম্পূর্ণ’। ‘অনন্তের’ সর্গের মত ইহার সর্গগুলি ছোট ছোট নয়। এখানি একখানি মহা-কাব্যেরই মত এবং ইহার বর্ণনায় বিষয়ও মনোহর-দৃশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ বিশেষণে কবির উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক। কবি যোগেশের অনুব্রূণ করিয়াই এ কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু কবি ইহাতে ‘যোগেশ’ অপেক্ষা এক সোপান অগ্রসর হইয়াছেন। যোগেশ কল্প-ব্যাক্তব্যে ‘অনন্ত’ সম্পদ উপেক্ষা করিয়া উদ্ভব হৃদয়-স্রোতে পৃষ্ঠা নিজের হৃদয়-বাস্তি অনুব্রূণ করিয়া জকলে ডালিয়াছে, ইহাতে কবি দ্বাৰাইতে

লক্ষ্য হওবার মহোষধি



১৬ দিন মধ্যে ১ হইতে ৪ ইঞ্চি লক্ষ্য
হইবেন..... গ্যারান্টি দেওয়া।

আপনার দেহের বৃদ্ধিসাধক ২০০ গ্রাম
নিম্নায় থাকার ফলেই আপনি খর্বাকৃতি
হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত
টলস্পাইন আপনার দেহের বৃদ্ধিসাধক
নিম্নায় গ্রন্থিসমূহকে সজীব ও সক্রিয়
করিবে এবং ১৬ দিন মধ্যে আপনার উচ্চতা
বৃদ্ধি পাইবে।

ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত ল্যাবরেটরীতে
টলস্পাইন ট্যাবলেট প্রস্তুত হয়। ইহার
ফর্মুলা চিকিৎসকমণ্ডলী দেখিতে পারেন।
প্রত্যহ দুইটি করিয়া ট্যাবলেট ১৬ দিন
সেবন করিলেই দেখিবেন আপনার উচ্চতা
কয়েক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছে। বহু ব্যক্তি
এই অভ্যাসের স্মারক ফুড বাথারে
সুফল পাইয়াছেন।

টলস্পাইন প্যান্ড ফুডের প্রত্যেক
মোড়কের মধ্যে গ্যারান্টি দেওয়া থাকে।

সম্ভায় নকল জিনিষ লইবেন না—
টলস্পাইন লেখা আছে কিনা দেখিয়া
লইবেন।

মূল্য প্রতি প্যাকেট ৫১০ টাকা, প্যাকিং
ও ডাকমাশুল বাদ ১/- স্বতন্ত্র।

পূনরায় মাল পাঠাইবার অভ্যাস
প্রত্যহ বহু অস্বাভাবিক প্রশংসাপত্র
আসিতেছে।

MADE IN ENGLAND
TALSPINE
GLAND FOOD TABLETS

ডিস্ট্রিবিউটর:

দি ব্রিটিশ ট্রেডিং কোং

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফার্মাসিউটিক্যাল ডীলারস
এবং ম্যানুফ্যাকচারারস,
নবাব বিল্ডিং, টমাস কুক এন্ড সন্স লিমিটেড
বিশ্বরীতি মিলে,
ডিসার্ভ শি সি, ৩২৪, হুদখী রোড, বোম্বাই।

আমাদের—

গোঞ্জি, মোজা, ব্লাউজ,
সর্বপ্রকার স্পোর্টিং সার্ট,
ড্রসার, জামিনা
প্রভৃতি

আধুনিক হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেরই আদরণীয়।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

টেলিগ্রাম—টেক্সটাইল, কলি:



ফোন—বড়বাজার ১৮৫৮

হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও পাইকারী বিক্রেতা

টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ
৮৭ ওস্ত চানাবাজার স্ট্রীট, কলি:

সর্বদা 'রাণীর' পেটেন্ট ঔষধই চাহিবেন

পিক-আপ—সাধারণ ভ্রমস্বাস্থ্য, স্নায়ুদৌর্বল্য, দুর্বলতা ও অনিদ্রার জন্য।

চারকোটাব—অম্ল, অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, উদরাময় ও আমাশয়ের প্রথমাবস্থায়।

বার্থল—ভেষজ উপাদানে প্রস্তুত জন্মবধের নিশ্চিত ফলপ্রসূ সেবনীয় ঔষধ।

ভীমা ২নং—(নিম্ন সহযোগে) চর্মরোগে অম্বিতীয়।

ভীমা ৩নং—(চালমোগরা সহযোগে) খোস, পিচড়া ও সোরিয়াসিস ইত্যাদির মহোষধি।

হারবার্টোন—ডরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়ায় অব্যর্থ।

হিপ্যাটোন—যকৃতের গোলযোগে। লীভারের ক্রিয়া উত্তেজিত করে, পিত্ত নিষ্কাশন
বৃদ্ধি এবং হজমশক্তি পরিবর্ধিত করে। শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত
উপযোগী।

ইউটেরল—জরায়ুদোষের অব্যর্থ প্রতিকার।

অনুপন্ন প্রশংসন -

সতী পাউডার—কমনীয় মুখের কোমল প্রসাধন। শিশুর কোমল চর্মের
পরম উপযোগী।

বিউটি লোসন—চর্মের শ্যামলতা দূর করিয়া গৌরবর্ণ দান করে।

ভুগুরাজ কেশ তৈল—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

ফ্যাক্টরী:— **রাণী এণ্ড কোং লিঃ**

রাজানগর,
ঢাকা।

রাজারদেউলি, ঢাকা।

"রাণীকো"
টোলঃ
ঢাকা।

নাহিরাজেন, 'স্বাভাবিক জ্ঞান নাই।' বৃদ্ধাইতে চাহিয়াছেন—
"কতবাই জীবনব্যয় অকর্তব্য্য পাপ।"

(৩) কবিতাবলী—ইহাতে চতুর্বিংশতিটি কবিতা সম্মিলিত।

১। পূর্ণিমা, ২। মালভের আক্ষেপ, ৩। কোরক-গীতি, ৪। জগত, ৫। আমি তোর এত কি সুন্দর? ৬। দুইখানি ছবি, ৭। গান, ৮। তিনখানি ছবি, ৯। বিজা, ১০। তুমি কি রমণী?, ১১। প্রতিমা, ১২। পিণ্ডিত ইন্সপেক্টর বিদ্যা-নাগের স্বর্গরোহণ, ১৩। বন্ধুসম্প্রদ, ১৪। কণের দিব বন্ধু, ৫। ভালবাসা, ১৫। আবাহন, ১৬। গৌরগীতি, ১৭। বিশ্বাস, ১৮। সত্যমগ্ন, ১৯। দিশেছায়া, ২০। বর্ষশেষে, ২১। মৃত-পতির কক্ষস্থল ও বন্ধুদর্শনে, ২২। তরুণী-বকে, ২৩। মহামাশু, ২৪। ক্রিয়ামিত্র ও পরশুরাম।"

‘পূর্ণিমা’ প্রকাশ

১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে ইশানচন্দ্রেরই ‘উৎসাহে ও উদ্যোগে’ হুগলী বর্ষাবোধিয়া হইতে ‘পূর্ণিমা’ নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ‘সূচনা’য় ইশানচন্দ্র লিখিয়াছিলেনঃ—

সকলের জীবনে এমন অবসর অনেক থাকে যা অতিবাহিত করিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। নাশকে খেলা করে, প্রোঁতে শাস্ত্র আলোচনা করেন, বন্ধে হরিনাম করেন, কিন্তু ঘুমায়ে কি করিবেন ভাবিতে হয়। উপন্যাস বা নভেল পাঠ যুবকের পক্ষে সুখকর বটে; সাধারণে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ইংরাজী ভাষায়। দেশীয় ভাষায় সুখপাঠ উপন্যাস অতি অল্প, নভেল নাই বলিলেই হয়। ইংরাজীতে এরূপ পুস্তক বিস্তার আছে—এত আছে যে সমস্ত জীবন পাঠ করিলেও নভেল বা উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হয় না। ইংরাজের নভেল বা উপন্যাস পাঠে ইংরাজের সামাজিক গার্হস্থ্য ও বাহ্যিক জীবনের বাধ্য-মণ্ডের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের স্বজাতির এ সকল কথাও ত অবশ্য জ্ঞাতব্য; তাহার আলোচনার উপায় কি? পূর্বেণে অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও অতি সুন্দর আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকের চক্ষে সে সকল অস্বাভাবিক অলৌকিক “আজগৃবি” ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাহার শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থা হয় না, সুতরাং সে সকল পাঠে প্ৰসংহা হয় না। যদি বা কখন প্ৰসংহা হয়, তবে গ্রন্থার অভাবে তাহার যথোচিত মর্মগ্রহ হয় না। এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরা অগত্যা হয়, অবসর অপব্যয় করেন, নই ইংরাজী নভেল বা উপন্যাস পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। স্বদেশের জাতব্য কথা তাহাদের নিকট অপরি-জ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাহাদের গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা কেহ কেহ ইংরাজী ভাষার সাময়িক পত্রিকাদি বা বিজ্ঞান

দর্শন পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতেও সময়ের সন্ধ্যায় হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেবূপ কঠিন অধ্যয়নে কয়জনের অনুরাগ দেখা যায়? পাঠ্যবস্তুর মূহনবিগের স্বাধীন চিন্তা বা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার অবসর থাকে না। কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাহারা অর্থোপা-ক্ষনের জন্য যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন তাহাতে সখ করিয়া বা ভালোপাঞ্জনের জন্য গুরুতর অধ্যয়নে তাহারা মনোনিবেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ কলেজের সংকীর্ণ শিক্ষা-বস্তুত দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ দূরে থাকুক, Nineteenth Century, Fort-nineteenth বা Saturday Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত গুরুতর বিষয়গুলি সম্পূর্ণ হৃদয়গম্য করিতে তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি কুলাইয়া উঠে না। আমরা অবশ্য সকল শিক্ষিত যুবকের কথা বলিতেছি না। সাধারণের কথাই বলিতেছি।

যাহাদের প্রতিভা আছে তাহারা অল্প বয়সেই বিস্তারিত গুরুতর কার্য করিয়া থাকেন। প্রতিভা; কিন্তু বৃত্তি বিরল। আমাদের পাঠক-বর্গের মধ্যে যদি প্রতিভাসম্পন্ন কোন যুবক থাকেন, তাহাদের উপরোক্ত কথায় অভিমান করি-বার কারণ নাই। আমরা সাধারণের একজন—সাধারণের কথাই বলিতেছি। বস্তুতঃ শিক্ষিত সাধারণ যুবকবর্গের জন্যই দেশীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রচার হওয়া আবশ্যিক। পত্রিকার উদ্দেশ্য যে কেবল শিক্ষা প্রদান তাহা নহে। লেখক মাঝেই কিছু এমন বিষয়াদৃশিসম্পন্ন নহেন যে তিনি পাঠক মাঝেই গুরুত্বান্বিত হইবার উপস্থিত পাত। লেখক তাহার নিজের মনোমত ভাব প্রকাশ করিবেন, পাঠক তাহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে গ্রহণ করিবেন, ভুলমাত্রি থাকে তাহার আলোচনা করিবেন। অধিকন্তু যদি পাঠক সহৃদয় হইলে তবে লেখকের সে ভুল মাত্রি সশোধন করিয়া দিবেন। ফলতঃ আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য তাহাই। আমরা সকল বিষয়েরই অনশ্লিষ্ট করিব, সে অনশ্লিষ্ট লেখকের আত্মপ্রোচিত ত আছেই, পক্ষান্তরে যদি অন্যের সেরূপ অনশ্লিষ্ট বৃত্তি তাহার দ্বারায় ক্রিষ্ট-শ্রান্ত ও পরিচালিত হয় তাহাতেও বাস্তবিক ও সমাজগত মঙ্গল আছে। আমরা জানি এবং যাহারা বঙ্গভাষার বর্তমান পরিপুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহারাও জানেন যে প্রবেশচণ্ডীগ্রাম হইতে আধুনিক নব্য-ভারত ও সাহিত্য পর্যন্ত পত্রিকার প্রচারে কতশত ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও বঙ্গভাষার প্রতি মতি গতি ঘিরিয়াছে—বাংলা গ্রন্থ পাঠে প্ৰসংহা হইতেছে—বঙ্গভাষায় রচনা করিতে সাহ হইতেছে—সর্বাধিক সুখের কথা—বঙ্গভাষাকে প্রীতির চক্রে লেঁচিতে অভ্যাস হইতেছে। পত্রিকার সৌভাগ্য হত হউক না হউক, বঙ্গভাষায় প্রচুর মণ্ডল সঞ্চিত হইতেছে সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল নই আর কি বলিব। ইহার হেঁচু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে পূর্ণিমা পত্রিকার সম্পাদকেরা কিছু আর লোকের হাতে ধরিয়া তাহাদের মতিগতি পরিবর্তন করেন নাই বা তাহাদের হাত ধরিয়া তাহাদের লেখক করিয়া দেন

নাই। সম্পাদকেরা আমাদের বিলাসবৃন্দ ও যত্নে যত্নস্বরূপ ভাষার উন্নতিপক্ষে উঠেছেন হইয়াছিলেন, নতী ডাল কথা—নতী ডাল উঠেছেন বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা দেখিয়া শিক্ষিত লোকের দুটি বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকে বুঝিল যে চেষ্টা করিলে নিজীব অসার বঙ্গভাষায়ও, মহৎ চিন্তা বা মধুর ভাব প্রকাশ করা যায়। মাঝেমাঝেই বঙ্গভাষার প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইংরাজী ভাষায় যত বড় পিণ্ডিত হউন না কেন, পরভাষা অপেক্ষা আপন ভাষায় হৃদয়ের ভাবগূঢ় প্রকাশ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ করেন। তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষার ক্ষুত্রিত অভাবেই লোকে ইংরাজিতে মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং এরূপ ঘনায় বঙ্গভাষায় তাহাদের অনুরাগ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? দিন দিন মহৎ ভাবগূঢ় দেশীয় ভাষায় সঞ্জিত হইয়া পরিচিত হইতে পাঠকের চক্ষে পতিত হওয়ায়, ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও পৌরাণিক কথা শিক্ষিত যুবকেরা আর পূর্বের ন্যায় জটিল ও অপ্রাণ্য বলিয়া জবহেলা না করিয়া সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলেন। বিষয়গুলি ইংরাজী ধরণে পরিলাভিত পরিচালিত ও পরিবর্তিত হওয়ায় দেশীয় মতি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন হইতে যারূপ করিলেও, ইংরাজীশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহা-দের মূল অবয়ব নিত্যমত অপরিচিত থাকিল না। তখন পাঠক স্বদেশের ও স্বজাতির মহত্ব হৃদয়গম্য করিতে উৎসুক হইলেন। এইরূপে ভাষার বর্তমান উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ইহাতে কতদূর শূদ্র ফল ফলিয়াছে তাহা পরলোকগত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বসুপাখ্যায়ের বাগলা রচনার মধ্যে আধুনিক রচনার একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়গম্য হইবে। অপর দেশের ভাষার ইতিহাস পর্যবেক্ষণে করিবার প্রয়োজন হইবে না, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা প্রচারে যেরূপ শূদ্র ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের এই চেষ্টা কলমবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও লিপিশক্তি সকলই অপ্রচুর। আমরা কার্বে রতী হইলাম তাহার দ্বাৰা উদ্দেশ্য কতক অবসর ক্লেপন করা, কতক বা স্বাধীন চিন্তার চাটনা করা এবং গোপন উদ্দেশ্য দ্বারা আভাষা কালোজ গোরা তাহাদের মাঝেমাঝে দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা উন্নত হৃদয়ে বলিতেছি যে, এরূপ কালোজ গোরাবাদের নিকটেই আমাদের আশা ভরসা বিস্তার। তাহাদের যে বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অধ্যায়ন আছে, তাহার পরিচয় তাহারা সেনেট গৃহে বারম্বার দিয়াছেন। বঙ্গদেশের বর্তমান অস্থায়ী তাহাদিগকেই চিহ্নিত বা (Covenanted) ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেন্টের গুরুতর রাজকা্যের ভার যেরূপ চিহ্নিত (Covenanted) কর্মচারীর দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে—আমাদের ভাষার গুরুতর কার্য সেইরূপ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকবর্গের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমাদের আশা ভরসা। এক্ষণে তাহাদিগকে এ কার্যচিহ্নিত দোঁখান লেনারপে (Volunteer) পরিণত করিতে পারিলেই আমাদের আশা কলমবতী হয়। আমরা তাহাদের কৃপাশ্রুতি আকর্ষণ করিবার জন্য বলালিয়া ও বলালকব চেষ্টা ও যত্ন করিতে দৃষ্টি করিব না। এক্ষণে তাহাদের নিকট আমাদের

*এই সকল কবিতার অধিকাংশই ইশানচন্দ্র জীবনস্মারক ‘পূর্ণিমা’তে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—ব্র না ব



ADHYAKSHA
MATHUR BABU

BLOOD-VITA

contains all the needed correctly balanced vital principles necessary for the maintenance of health and growth.



BLOOD-VITA

is synonymous with vitality, energy and good health which means resistance to disease and infections, such as, Malaria, Kalazar, Typhoid & Tuberculosis etc.



BLOOD-VITA

NURSES UP THE HUMAN PLANT PROMOTING THE EVENTFUL GROWTH, AS STRONG & STURDY AS THE

Seasoned MIGHTY OAK

EVERY DOSE ENRICHES THE BLOOD AND INCREASES VITALITY.

ADHYAKSHA MATHUR BABU'S
MEDICAL RESEARCH LABORATORY
P-23, CENTRAL AVENUE, CALCUTTA

ব্লাড-ভিটা।

দুর্বলতা ও ক্ষয়জনিত যে কোন রোগে আদর্শ টনিক ও রক্ত পরিশোধক।

ইহা অধুনিকতম পরীক্ষাগারে বিশেষজ্ঞদের বহু বর্ষব্যাপী পরীক্ষার ফল। স্বাভাবিক নিষিদ্ধে যে কোন দ্রব্যে ও যে কোনও ক্ষত্রে ব্যবহার করা যায়। নিয়মিত সেবনে ইহা অকালবার্ধক্য দূরীভূত করিয়া শরীরে যুৎসনোচিত কর্মশক্তি আনয়ন করে।

জাতীয় সোভাগ্যের

জীবন্ত প্রতীক



বাঙালীর জাতীয় জীবনে দাশ ব্যাঙ্কের অভূতপূর্ব ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতেরই অনিবার্য বিধান।

বৈজ্ঞানিক সংগঠন-পদ্ধতি এবং স্বচ্ছ স্বচ্ছ সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ।

বাঙালীর যুদ্ধবাহিনী ব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক সর্বল, সফল এবং সার্থক।

বিশ্বব্যাপী বিশ্ববৈরী সাধ্য নাই যে জগত বাঙালীর জাতীয় সোভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ এই অপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির প্রগতির পথ প্রত্যাহার করে।

বস্তুতঃ দেশবাসীমাত্রেই বিশ্বাসভাজন কর্মবীর আল্যামোহন দাশের সিন্ধুস্রবত পরিচালনার গুণে, সুদৃঢ়, কর্তব্যপ্রাণ কর্মবৃন্দের একান্তিক পরিপ্রদ ও সেবাপরায়ণতার ফলে এবং আপনার অটল বিশ্বাস ও অধারিত সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ব্যাপক জগত বাঙালীর ব্যক্তি, অধিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত, সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

--দাশ ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয়--

বৎসর	আদায়ী মূলধন	ডিপোজিট
এপ্রিল (উন্মোচন মাস) ১৯৪০	০,০২,০০০, টাকার	১,০৫০, টাকার
ডিসেম্বর, ১৯৪০	৫,৭২,০০০, ..	৩,১৯,০০০, ..
ডিসেম্বর, ১৯৪১	৮,১৮,০০০, ..	২৪,৮২,০০০, ..
ডিসেম্বর, ১৯৪২	৯,৪৭,০০০, ..	৪০,০০,০০০, ..
ডিসেম্বর, ১৯৪৩	১০,০০,০০০, ..	১,১০,০০,০০০, ..
জুন, ১৯৪৪ (হিসাব সাপেক্ষে)	১০,০০,০০০, ..	১,৫১,০০,০০০, ..

ডাইরেক্টর বোর্ড :

কর্মবীর আল্যামোহন দাশ,
চেয়ারম্যান;
মি: শ্রীপতি মল্লিক,
ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ;
মি: নরসিং পাল;
মি: বিমলাপতি মল্লিক;
মি: শিবকুমার দাশ।

দেশবাসী মাত্রেই

-বিশ্বাসভাজন-

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯-এ ব্লাইভ স্ট্রিট :: কলিকাতা

এই প্রার্থনা ত্যাগা যেন আমাদিগকে “দেশীয়” বলিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করেন।

পূর্ণিমায় সকল বিষয়েরই অশোচনা হইবে।

যে কোন বিষয়ের রচনা উপদেশ হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে। তবে সাধারণের অন্তর্ভুক্ত ও অর্থচিন্তন বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হইবে না। রচনাদি নির্বাচনের জন্য ইহার সমিতি গঠিত হইয়াছে সেই সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া প্রকাশিত প্রকাশিত হইবে। খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সমিতি কর্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হইবে। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণিমায় প্রকাশ পরিবার জন্য রচনাদি প্রেরণ করিলে সমিতির আভ্যন্তর ও উদ্যম সকল সফল হইবে।

“পূর্ণিমার প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই

ঈশানচন্দ্রের লিখিত “পূর্ণিমা” নামে একটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

পূর্ণিমা

১

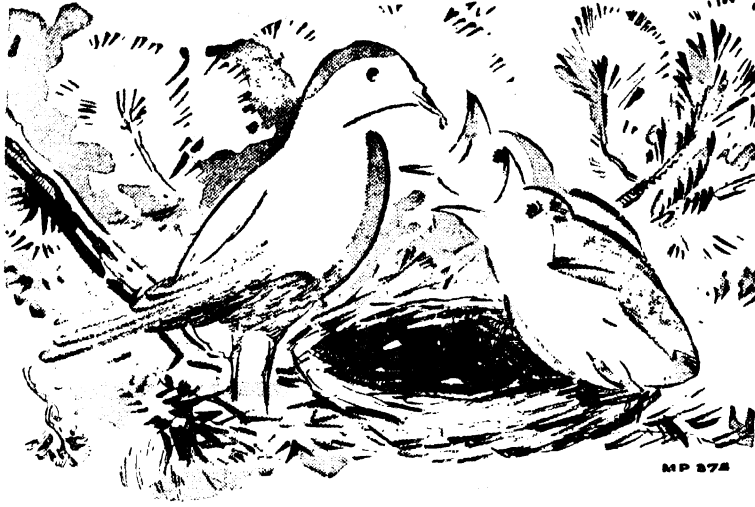
(আমি) পারি না বহিতে, এ যুগের ভার,
(আমার) আকুল হইল হে।
(আমি) ব্যক্তিগত জেদেই, প্রগম্ভী আমার,
দেখা যে দিল না কেহ।
(আমার) যুগের ভিতর, সুখের পাথরে,
জুটিছে প্রেমের দান।
(আমি) দুঃ ক্লান্ত ভাষায়, উঠিছে উথলি,
আমার আকুল প্রাণ।
(আমি) বলি বলি করি, বলি যে গেল না,
সাপের মতো কথা।
(আমি) পারি না ভাবিতে, এ রূপ রাশিতে,
লইয়া সুখের বাধা।
(আমি) ভেসে ভেসে যাই, অলস নাহি পাই,
তুং যে হাল না দেখা।
(আমি) এমন করিয়া, অকালে পড়িয়া,
ভাবিতে পারি না একা।

২

(আমি) কে তাহ ভাবন, প্রগম্ভী তেমন,
এর যে হার দান।
(আমার) যুগের সাধের মণিত করিয়া,
করা যে পীড়ন পান।
(আমি) নরম ভাষায়, যৌবন চাঞ্চল্য,
চলিবে যুগের দান।
(আমি) শ্রবণ ভারি, চালিবে সংগীত,
জয় ভরিয়া প্রাণ।
(আমি) জগত ঘুরিয়া, হৃদয় ভরিয়া
রেখিছে প্রকৃতি শোভা।
নিতি নব নব, সুখের দেখাব
প্রেমিক-মানস-শোভা।
নিশির নিঃশব্দে, বিশ্ব কার সনে,
কহে কি নিগড়ে কথা।
(আমি) পেরিয়ে কখন, হৃদয়ে করিয়া,
লইয়া বাইব তথা।

৩

(আমি) আপনার তরে আপনা সঁপিব,
চাহি না হে প্রতিদান।



Feed them properly

শিল্প ও বাণিজ্য ভারতমাতার দুইটি অসহায় সন্তান। তাদের লালনপালন করে আত্মরক্ষা করতে বলীয়ান করে তুলুন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখান।

একটু শক্ত সমর্থ হলেই ভারতমাতা এদের পাখীর মতো স্বাধীন ভাবে উড়তে শেখাতে পারেন এবং জীবনের রথ-চক্র চালিয়ে দিতে পারেন পূর্ণ গতিতে। তাদের সাহায্যে তিনি আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সারা জগতে, কারণ এরাই যে তাঁর শক্তি, —এরাই যে তাঁর সব।



হাজারাদী ব্যাংক ও তার সমস্ত শক্তি খাটিয়ে এবং সেভিংস ব্যাংক স্কীম, প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম ইত্যাদি দিয়ে ভারতের শিল্প বাণিজ্যরূপী যুগল সন্তানকে শক্তিশালী করে তুলছে পরাধীন ভারতের আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে।

আসুন, সকলে মিলে এদের পরিপূর্ণতার ব্যবস্থা করি।

হাজারাদী ব্যাংক লিঃ

হেড অফিস—৮০, ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বালো, বিহার, আসাম
ও ইউ. পি. এর সর্বত্র।



কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

৮৮) জোহাতে মজিরা, জোহাতে ভবিষ্যৎ,
জুড়াবে আমার প্রাণ।

৮৯) বলিবে কেবলি, সুখেই কলম,
সরায়ে মনের বাধ।

৯০) নয়নে বদনে, হৃদয়ে পাড়িয়া,
মিটার মনের সাধ।

৯১) নাহি মিটে ক্ষুধা, বলিবে সে কথা,
ফেঁদ না রাখিবে বকে।

৯২) গলিয়া গলিয়া, বাইব মিশিয়া,
তোমার সাধের সুখে।

এ রূপ যৌবন, এই দেহ মন,
প্রণয় পূরিত প্রাণ।

এস প্রাণবদ্ধ হৃদয়ে ধরিয়া
কর হে বারেক চাপ।

৪

দিসের কাষে, সাজে নানা সাজে,
বিচিত্র মানব মতি।

মি। চিনিতে পারিলে, হৃদয় তাহার
দিসের কুটিল গতি।

নিরঞ্জন বকে, প্রাণ একা থাকে,
স্বরূপ দেখিতে পাই।

এই মিশি হৃদয়ে, আসি ধীরে ধীরে
প্রণয়ী ঝঞ্জিয়া বাই।

মনের মতন, মেলে না যে জন।

অগোচরে সব প্রাণ।

এ রূপ যৌবন এত আকর্ষণ,

তাঁহে কি ফুলার স্থান।

(আমি) আধ আধ সাধ, পারি না মিটে
ঝঞ্জিয়া বেড়াই ভরা।

ওহে পরিপূর্ণ, লুকারে কোথায়,
আইস নিকটে ঘরা।

‘পূর্ণিমা’র ঈশানচন্দ্রের অনেকগুলি
গদ্য-পদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।
দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার কয়েকটি গদ্য
রচনার উল্লেখ করিতেছি :—

১। সমলব্ধ নির্ণয়	১৩০০ সাল
২। কুবুদ্ধি (সমালোচনা)	১৩০০-০১ সাল
৩। শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী	১৩০০ সাল
৪। বীক্ষকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩০১ সাল
৫। বোম্বাই প্রমণ	১৩০২ সাল
৬। মানব জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি?	১৩০৪ সাল

ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত “সুধাময়ী”
নামে একটি উপন্যাসও ১৩০১, ১৩০২ ও
১৩০৪ সালে আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল।
১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার মৃত্যুর
পরেও তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা
‘পূর্ণিমা’র মুদ্রিত হয়।

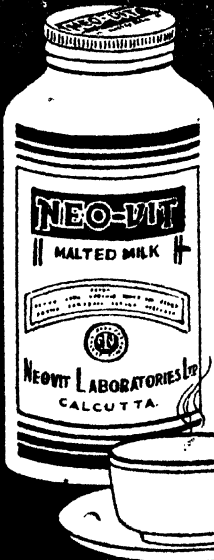
মৃত্যু

ঈশানচন্দ্র ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন
তারিখে বিশ্ব পান করিয়া আত্মহত্যা করেন। মৃত্যু-
কালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার
মৃত্যুতে হৃৎগতী, বাশবোড়বার ‘পূর্ণিমা’
পর এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

“কবির হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি
ঈশানচন্দ্র ইজগতে আর নাই। সেই ভীষণ
ভূমিকম্পের রাতিতে ঈশান ইহলোক পরিত্যাগ
করিয়াছেন। সন ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র,
শুক্লাবার, ঈশান ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার বৈয়াক্ষণ
বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঈশানের অকালমৃত্যুতে
সকলেই দুঃখিত, তাঁহারই উৎসাহে এবং
উদ্যোগে আমাদের পূর্ণিমা প্রকাশিত হয়, তিনি
সেই অবধি পূর্ণিমার প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠ-
পোষক ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার
আকাঙ্ক্ষিক বিষয়ে অবলায়। তাঁহার প্রতিকৃতি
এই সংখ্যার পূর্ণিমার দেওয়া হইল।”—
‘পূর্ণিমা’, আষাঢ় ১৩০৪, পৃ. ১২৪।

ঈশানচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা কাব্য-জগতে যখন হেমচন্দ্র ও
নবীনচন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্ব প্রভাব, ঈশান-
চন্দ্র তখনই সাহিত্যিক সমাজে কবি-খ্যাতি
অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে খ্যাতি এক-
দিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং অন্য দিকে
রবীন্দ্রনাথের চপে স্থায়ী হইবার অবকাশ
পার নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা-সাহিত্যের



চাই স্বাস্থ্য ও শক্তি

নিও-ভিট

মাল্টেড মিল্ক

শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও প্রসূতির
পক্ষে নির্ভরযোগ্য খাদ্য



নিও-ভিট লেবোরেটরীজ লিঃ, কলিকাতা।

—বাঙলা ভাষায়—

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প
প্রেম ও প্রিয়

—মূল্য আড়াই টাকা—

লিওনার্ড ফ্রাঙ্কের

কার্ল ম্যান্ড আমা— ১.

প্রস্‌পার মেরিমর

কান্সমেন— ১.

লিও টলস্টয়ের

রেক্সারেকমান— ২৥০

ম্যাক্স গোর্কির

ছোট গল্প— ২৥০

আইভান টুরগেনিভের

ছোট গল্প— ২৥০

ম্যাক্স গোর্কির

ডায়েরি— ২৥০

—: প্রাপ্তিস্থান :—

এ. আর. ব্যানার্জী ম্যান্ড বাদাস

—৫৪/৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—

ইউ. এন. ধর ম্যান্ড সন্স লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

সভ্য সমাজের পরিবর্তনশীল
কটির সঙ্গে তাল রেখে
চলতে পারে

আমাদের

শাড়ী—ব্লাউজ

পূজার উপহার

শাড়ী—ব্লাউজ

ছেলেমেয়েদের পোষাক



কমলাভাষ্য লিঃ

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট :: কলিকাতা

ফোন বি বি ৬৪২

আধুনিক রুচি সম্পন্ন :-

বিভিন্ন প্রকার শয্যাভবোর বিপুল সমাবেশ

— অনন্তচরণ মাল্লিক এণ্ড কোং —

১৬৭/৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট (চাদনী চক), কলিকাতা।

ফোন : কাল ১৪৩৬

আজ ৬৫ বৎসরের অধিক আপনাদের সেবায় নিযুক্ত

—বিবাহে দেওয়া সৌখীন ও মনোমত—
শয্যাভবোর জন্য আমরাই বিশেষ পরিচিতি

দেবের তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পেশ
করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি হইতেই তাঁহার
প্রতিভা ও কবি-কীর্তি সম্বন্ধে পূর্নবিচার
করা সম্ভব। ঈশানচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর কবি ছিলেন
না। যে কারণে তিনি মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর
কল্পে নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান
করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার যাবতীয় কাব্য-
প্রকাশের মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ
বিবর্তাই, বিশেষ করিয়া 'যোগেশ কাব্য'খানি
একটা অন্তর্গত জ্বালায় জর্জরিত। সক্ষম
কল্পনা বলিয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জ্বালা
ধরিয়া দেয়। সেই বেদনা ও জ্বালা পরিমাণে
অধিক বলিয়াই ঈশানচন্দ্রের কবি-প্রতিভা
সম সাধকতা লাভ করে নাই; যাহারা
হাঁহকে জানিতেন, তাঁহাই মুগ্ধ হইয়াছেন,
তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন নাই।
বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষদগ্রন্থাবলীভুক্ত
বংলায় কবি ও কাব্য গ্রন্থমালায় ঈশান-
চন্দ্রের কবিতার একটি সংকলন বাহির
হইয়াছে, তাহা হইতেই অনুসন্ধানসমূহ পাঠক
তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন।
আমরা এখানে দুই-একটি কবিতার অংশবিশেষ
উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন
বিতোঁচ।

সন্তান দর্শনে

১

এই জীবনের ওই প্রথম বিকাশ!
ওই কাদা ওই হাস, ওই আনন্দের রাশি,
আমিমা মাখান ওই আশ আশ ভাষ,
এ জীবনে একদিন হইত প্রকাশ!
শেষবে সবাই হাস, ওই সন্তানের প্রার
এ ভীষণ জীবনের সুন্দর মঞ্জার!
ভাসে রে কালের তটে আপনা পাসরি!

২

ওই কি জীবন? হায় কতই বিভেদ!
ভাবিলে কাদে রে মন, মানবের কি জীবন,
কোথা ফুটে—কোথা টুটে—কতই প্রভেদ!
কি যে হয় ওই মুখ, কি যে হয় ওই বুক,
কোথা থাকে ওই সুখ যৌবন বিকাশে!
কি লয়ে সংসারে পশি কি থাকে বয়সে!

৩

বৃথা ক্ষোভ! এ সংসারে এমনি জীবন!
প্রকৃত সুখের যাহা, স্বপ্ন কিম্বা মোহ তাহা,
সংসারীর সে কামনা দুখের কারণ।
নিকৃষ্ট অবোধ জন, কিম্বা শ্রেষ্ঠ কপিন

সে কল্পিত সুখ সুখ করে অন্বেষণ!
নহে এ সংসার কিন্তু তাদের কারণ।

৮

সুখশূন্য মরুপ্রায় তবে কি সংসার!
জীবন কি কিছু নয়, সুখ কি যন্ত্রণাময়,
এত ক্লেশ এত শ্রম সব কি মিছার?
এই দেহপিণ্ড লয়ে, এ অনন্ত দুখ সয়ে?
পার্থিব জীবন কি রে বিড়ম্বনা সার?
নরভাগ্যে জীবনে কি নাই পুরস্কার?
(বাসন্তী)

একদিন

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণতলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধূলায় পড়েছে ঢাল,
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥

কাতর বদনখানি
মুদিত নয়ন দুটি
গেছে কিছু খুলে।

দুই প্রান্তে অশ্রুজল
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবীপদমলে॥

দেবীর প্রতিমাখানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাষণ-মূর্তি।

এক করে সুধাভাঙ,
আর করে বরাভয়,
ওষ্ঠে ঝরে প্রীতি॥

সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ইন্দু বশ্চক্রে নত
তাঁহে দুঃখন।

পল্লবে আবৃত আশ,
আশ বিকসিত মৃদু
স্নেহে অচেতন॥

সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে।

পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিশ্রিত, শব্দক
সরসীর নীরে॥

অনাবৃত নেত্র-পথে
পশিমা সে ভাষিত, মম
প্রাণের অন্তরে।

স্বপনের চন্দ্র মাত
উজলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে॥

অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ?

একে তার ক্ষণি দেহ,
তাঁহে ঘোর ভগসায়
সদা নিমগন।

কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের ম্ভার তৈল,
হেরিন্দু গোপনে।

দেখিন্দু নির্মিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে॥

অস্থির হইন্দু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।

'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি,
বিষম কাতর-স্বরে
করিন্দু চীৎকার॥

শিহরি উঠিয়া বাস
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।

শিহরি উঠিল দেবী,
পাষণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল॥ ('চিন্তা')

স্মৃত্ত

দেবি!
আবৃত শরীরে তুমি চক্ষুর কণিকা জালে
বিরাজ আমার।
স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি এই শরীরের স্বকে
সতত প্রচার॥
শব্দ শক্তিরূপে তুমি শ্রবণের মূলে মম
কর অবস্থান।
জ্ঞানরূপে চিন্তে মম ঢালিয়া অন্ত ধারা
তুমি বিদ্যমান॥
দর্পণ বিহীনে যথা আপন আত্মা কিবা,
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেই রূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান॥
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি,
নহি ভিন্নাকার।
তব অপার্থিব রূপে আমরা তপ্তত প্রাণে
করি নমস্কার॥ ('চিন্তা')



‘মহাকালী আশ্রম’ হাতীবগান টোল



হেড অফিস—৮২ (বি), গ্রে স্ট্রীট।

ব্রাঞ্চ—৮০১১২ (বি), গ্রে স্ট্রীট।

শাখা অফিস—পিওবি(কে)সেন্ট্রাল এভেনিউ—গ্রে স্ট্রীট মোড়

পি-এম বাকটির পঞ্জিকার প্রধানতম গণক এবং ভারতবর্ষের তামিল প্রকৃতি বহুবিধ পঞ্জিকা প্রণেতা ৫০ বর্ষের অভিজ্ঞ ও তত্ত্বশাস্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক পণ্ডিত

শ্রীচন্দ্রচরণ স্মৃতি-জ্যোতির্ভূষণ।

আপনি যে কোন স্থানেরই লোক হউন আপনি বা আপনার নিকট বা দূর আত্মীয় পণ্ডিত মহাশয়ের পুণ্যমুখ্য। স্মৃতিভিত্তিক পণ্যমণ্ডিত স্মৃতিপিত শ্রীশ্রীকানীশমশ্বরে পুরুষচরণ সিংহ প্রত্যেক কবচ সদা ফলপ্রসূ, কবচগুলি চুবাবণে ও মন্ত্রপ্রভাবে জীবন্তের ন্যায় কার্য করে। কবচ ধারণ করিবামাত্র অভিনব স্মৃতি ও সাহস আসিবে। প্রত্যেক কবচ বিশ্বাসের সহিত ধারণ করিতে হয়, বিশ্বাস না থাকিলেও চরা ও মন্ত্রশক্তি প্রভাবে নিশ্চয় অতীষ্ট সিংহ হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের পূর্বতন পুরুষগণ ইংরাজ ও মুসলমান রাজত্বের পূর্বে হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষে সিন্ধু পার্বত্যে বসিয়া থাকিত। এই কবচগুলি গ্রহণ সময়ে শনিবার অমাবস্যায়া হাহসপর্শ মহানিশায়া স্নাতবস্ত্রে হোমালন্ত একবর্ণা সত্বনা গাভী দুগ্ধে কুম্ভকুম গোয়োচনা মিশ্রিত মসিযোগে রহস্যদণ্ডী লেখনী দ্বারা হোমগ্নি-শিখালোকে প্রণব বীজ ও মন্ত্রাদি লিখিত হয়।

বিশেষ প্রত্যাঃ—এলোপ্যাথিক কবিরাজী প্রকৃতি ঔষধ সেবনে ফল না পাইলে এই কবচ ধারণে নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন।

কবচ ধারণকারীর নাম, পোত্র এবং উদ্দেশ্য সহ পত্র লিখিবেন। এই মহাশক্তিসম্পন্ন কবচ ধারণে ফল না পাইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন।



শ্রীশ্রীঅনুব্রহ কবচ

সর্ব কার্য সিদ্ধি—চাকুরী প্রাপ্তি, কর্মোন্নতি হয়, মূল্য—২০। মহানবগ্রহ কবচ—২।

সূর্য কবচ

ধারণে মানব সুস্থকর, হাটের দোষ, প্রমেহ, ভগন্দর, আমাশয় হৃৎকম্প প্রকৃতি দুরোগে ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। মূল্য—৪০।

চন্দ্র কবচ

ধারণে যক্ষ্মা, উদরী, সর্দি, হাঁপানি, গজমাল, শ্লেশ্মা ঘটিত পীড়া আরোগ্য হয়। মূল্য—৪০।

মঙ্গল কবচ

ধারণে চর্মরোগ, পিত্তরোগ, রক্তপ্রাব, রক্তামাশয়, অর্শ, শ্বেত-কুষ্ঠ, গণিত কুষ্ঠ ভাল হয়। মূল্য—৪০।

নূন কবচ

সাধারণ বর্ষা হয়। মূল্য—৪০।

ব্রহ্মপতি কবচ

ধারণে বায়ু, রোগ, র্যাদপ্রেশার, শিরঃ-পীড়া, মূত্র ভাল হয়। মূল্য—৪০।

শুক্র কবচ

ধারণে স্ত্রীলোকের নাড়ীর দোষ গর্ভাশয়ের যাবতীয় পীড়া অকালে স্বত বন্ধ হইয়া পেটে বলের মত হওয়া বিনা অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়। মূল্য—৪০।

শনি কবচ

ধারণে কার্যসিদ্ধি, ব্যবসায় উন্নতি। মূল্য—৪০।

ব্রাহ্ম কবচ

ধারণে বাতবাধি, পক্ষাঘাত, শরীর কাম্পন, উন্মাদ (পাগল) রোগ মুক্ত হয়।

মহাযজ্ঞাঙ্কুর কবচ

ধারণে ব্যাধি-গ্রস্ত, চিরমুগ্ধ ব্যক্তি আরোগ্য এবং যে কোন রিষ্ট ফাঁড়া কাটিয়া দীর্ঘায়ুলাভ করিবেন। মূল্য—১০।

ধনদা কবচ

ধারণে সৌভাগ্য বর্ধিত ও ধন-মুখি হয়। মূল্য—১০।

লং শরঙ্গ কবচ

এই কবচ চিরবয়স ৪০ বর্ষ বয়সেও উত্তম দীর্ঘায়ু, পুত্র লাভ করিবেন। মূল্য—৫।

বগলানুগী কবচ

ধারণে যে অভিলাষ করিবেন অচিরে তাহা লাভ করবেন। প্রত্যেক ও পরোক্ষভাবে শত্রু নষ্ট হইবে, মোকদ্দমায় জয় ও চাকুরী পুনঃ প্রাপ্তি, ব্যবসায় উন্নতি হইবে। মূল্য—১০।

মৃতনন্দ সা কবচ

শ্রীলোকের পুত্রঃ পুত্রঃ সন্তান হয় ৫।৬।৭।৮।৯ মাসগর্ভে অভ্যুদয়ে এবং ৫ বর্ষ মধ্যে পুত্রঃ পুত্রঃ সন্তান নষ্ট হয়, এই কবচ ধারণে নিচয়ঃ দীর্ঘায়ু সন্তান হইবে। মূল্য—৭।

সরস্বতী কবচ

স্মৃতিশক্তি বর্ধিত ও পরীক্ষার পাশ এবং দুশ্ট বালক শান্ত প্রকৃতি হইয়া বিদ্যালয় করে। মূল্য—৫।

লশাকরণ কবচ

চিরশয়ঃ পর্যন্ত বশীভূত হয়, দশর কমে প্রমথন হয়—মূল্য—৫। বহু বশীকরণ কবচ—৫।

রাম কবচ

প্রত্যেক গর্ভবতীর ধারণ কঠিন। ভৌতিক দোষ নষ্ট হয়, মূল্য—১০।

বাস্তু বিচার

বাস্তু হতে ২২ হাত নিম্নে মাটি এক ছটক পাঠাইলে ভূগর্ভে ধনরত্ন ও দুষ্ট আশি থাকিলে তাহা নিজে গিয়া তুলিয়া দিব গগনর বায়ু—৫।

নিম্নোক্ত ভাস্করগণ নিজে ও স্ত্রী পুত্রকে কবচ ধারণ করাইয়া রোগ মুক্ত হইয়াছেন—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর একেম্পনাথ দোষ, এম এস সি এম ডি এস সি এফ জেড এস এফ আর সি এস।

ডাঃ জে এন মৈত্র, এম ডি প্রফেসর ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের প্যাথিলাজিকেল ডিপার্টমেন্ট।

সিডিল সার্জেন রাকেন্দ্রনাথ কুন্ডু, সিউডি, বীরভূম।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র, এম এ এম বি।

পট্টাদি উপরোক্ত ঠিকানার অথবা শ্রীচন্দ্রচরণ স্মৃতি-জ্যোতির্ভূষণের নিকট দিবেন।

সহকারী পণ্ডিত ও আশ্রমের কর্মচারী শ্রীশক্তিধর জ্যোতির্জ্ঞান, শ্রীবিদ্যুতিভূষণ স্মৃতি জ্যোতির্জ্ঞানশাস্ত্রী ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র জ্যোতির্বিদ্যোদয়, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী।



বিপদ এর কাকে বলে!

দেখানো বাতিক তাহার কামিনিকালেও ছিল না
—বাহ্যকে বলে “দশচক্র।”

শিরিষ সিকদার নামে যে ছোকরা কাস্ ডিপার্ট-মেন্টে নতুন ভর্তি হইয়াছে—কথায় কথায় হঠাৎ জানা গেল ছোকরা নাকি পামিস্ট। আর যায় কোথা? ঘরশুদ্ধ লোক তাহাকে ছাঁকিয়া ধরে আর কি। টিফিনে অনেকের খাওয়াই হয় নাই আজ।

জিনিসটা এমন মজার—এক মৃহুতে পয়ষাট টাকা ওজনের দেহাৎ কেরাণীটি একেবারে ত্রিকা-লজ্জ মহাপদুপতির পর্যায়ভুক্ত

হইয়া পড়িল। ইহার জ্ঞানচক্র সাহায্যে সহজেই একবার আপন আপন অ-দৃষ্টের উপর চিত্রিত দৃষ্টিপাত করিয়া লইতে চায়।

পশুপতি অবশ্য দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে-ছিল—এই সব ধোয়াস ব্যাপারে কোনকালেই তাহার আস্পা নাই, কিন্তু মূটি করিল শিরিষ নিজে। ‘খপ’ করিয়া পশুপতির হাতবান্য টানিয়া লইয়া কহিল—দেখি গুস্ত মশাই আপনার লাকটা? এখন তো আপনার পোয়াবাবো, এই তো সেদিন কুড়টা টাকা ইনকুইমেন্ট হয়ে গেল।

শ্রী জ্ঞানপূর্ণা দেবী

কিন্তু হাত দেখার পর যাহা বলিল, সেটা তিক সৌভাগ্যের পরিচয় নয়। বার বার উল্টাইয়া পাশ্টাইয়া দেখিয়া সন্নিবন্ধবরে কহিল—তাইতো—মুস্কল করলে দেখি—

খুব ভাঁওতা দিচ্ছেন বে? মুস্কল আবার কি মশাই?

—মুস্কল এই—একটা পাগুরের দৃষ্টি এসে পড়ছে—শিরিষই কোনো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে—আচ্ছা, লম্বা ফর্সা বেশ

হাসিখসি—মানে—বাইরে থেকে দেখতে যাকে বলে প্রকৃত স্বভাবা কোনো স্ত্রীলোককে চেনেন?

—কেন বলন তো? সান্দ্রস্থ স্বরে প্রতি-প্রশ্ন করে পশুপতি।

বর্ণনা শুনিয়া চট করিয়া অনিলার কথাই মনে পড়িয়া যায়, তবে কি তাহারই কোনো বিপদ? ইদানীং তাহার শরীরটাও যেন তেমনি ভাল নাই। এই তো কবে একদিন যেন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া রত্রে ভাতই খাইল না। যদিও পশুপতির এ সব হাত দেখা-দোঁষতে বিশ্বাস নাই—তবু খামোকা অনিলার কথাই বা বলিল কেন শিরিষ?

শিরিষ কিন্তু বলিল অন্য কথা। বলিল—এই ধরনের কোনো স্ত্রীলোক আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে।

—ক্ষতি?

—ক্ষতি বা প্রতারণা শাই বলুন। মনে আর কি পরম আত্মীয় সেজে তলে তলে ধীরে ধীরে অনিষ্ট চিন্তা করছে। এই সবই তো বিপদ কি না।

শ্রুত যদি বন্ধুর চক্ষুদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা করতে থাকে—তাকে এড়ানো সহজ নয়। বাই হোক আপনাদের পরিচিত যদি কেউ এ রকম থাকে—থাকে কেন আছেই তার থেকে সাবধানে থাকবেন।

পশুপতি যেন সকল সমুদ্রে পড়িয়াছে—আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বন্ধব পরিচিত জন-সমুদ্রের ভিতর এলোপাথাড়ি হাথড়বু খাইয়াও কাহাকেও খুঁজিয়া মেলে না যে?

ছোট খুঁড়ি আছেন বাটে লম্বা ফর্সা—কিন্তু জীবনে কি তাহাকে হাসিতে দেখিয়াছে পশুপতি? রাজা মাসী ফর্সা বটে কিন্তু বাননের পরবর্তী স্টেজ মাত্র। মাসী পিসি খুঁড়ি জোঁট, দাঁদি খোঁদি কহাশেও ঠিক ধরা যায় না। কহারও সাহিত কালে ভদ্রে দেখা হর কহারও সাহিত হয় না। তবে? অনিষ্টা তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে? অনিষ্টা তাহাকে প্রতারণা করিবে? অসম্ভব! ভুল। অনেক কয়ে গলা ভিজাইয়া বলে—কি রকম অনিষ্ট?

—ডেফিনিটলি কি করে বলি এত জ্ঞান সময়ের মধ্যে? শারীরিক মানসিক আর্থিক যে কোনো—মানে কান্দ খুঁজছে সে।

পশুপতি বাড়ি ফিরিতেছে। রাজাই ফেরে—পাচটা পুরতালিশে তাহার ছটি হয়, তিন তলার অফিস, সিঁড়ি ভাঙতেই লাগে পাঁচ মিনিট। ঘাম মুছিয়া ভিড় ঠৌলতে ঠৌলতে ট্রাম লাইনটুকু অসিতও প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া যায়, অবশেষে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে কোন প্রকারে নিজেকে ঠৌলিয়া দিয়া ট্রামের ভিতর মাত্র একখনি পা রাখিবার মত স্থান সংগ্রহ করা। বাস্ আর কিছুর করিবার নাই। পাঁচ সাতখানা ট্রাম জড়িয়া দিয়াও মোটের মাথায় সাতটর মধ্যে সে নিজের রাজবে আসিয়া পৌছাইতে পারে।

স্বাধীন সমাজ। হাসানুখী স্ত্রী, বাধ্য জেলেমেয়ে, পশুপতি নিজে ক্ষুধিতবাজ লোক—সুখের সংসার পশুপতির। কিন্তু আজ আর পশুপতির মনে সুখ নাই। সাতটর মধ্যে বাড়ি ফিরিবার তাগদাও নাই। স্ল্যাক আউটের রাস্তার মত মুখ করিয়া—ঝড় গাঝাই গরুর গাড়ির গতিতত্ত্বগীতে এসল্যানেড হইতে হাটা মারিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

লড়াই করিয়া ইণ্ডি কয়েক জায়গা দখলের পশুপতি আজ তাহার নাই। আজ তাহার মন খারাপ।

অবশ্য সব কবের মত—পশুপতির মন খারাপেরও একটা কারণ আছে, কারণটা এই যে, পশুপতি আজ হাত দেখাইয়াছে। হাত

চন্দ্রনাথ দাঁ

প্রোপ্রাইটার।

১। বেঙ্গল টোব্যাকো ম্যানুফ্যাক্টরী
৯নং উত্তর চৌধুরী রোড, উল্টাডাঙ্গা,
কলিকাতা।

২। ক্যালকাটা মোলাসেস্
সাপ্লাই কোং
৬৭।৪৭, প্রিন্স বাস্ক রোড,
কলিকাতা।

৩। সুভদ্রাগনপাণী সীতারাম
২২নং রাজার চক, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সকল প্রকার মিঠাকড়া ও
সুগন্ধি মাখা তামাক, চিটা-
গুড়, আলফা তরা পাওয়া যায়।

৪। চন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ
৩১নং জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।
গ্লাস, এনামেল ও পোরসিলেন ওয়ার
বিক্রেতা।

টকিগট-সেন্ট্রাল গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ
লিঃ ও হিন্দুস্থান পটারি
ফোন : বি. বি. ৫২৬১ ও বি. বি. ১৯৬৩
টেলিগ্রাম :- বেনচোমাকো

হাঁওয়া সিকিউরিটি বান্ধ লিমিটেড



৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

রক্ত ! রক্ত !!

চলাচলের উপর নজর রাখুন।

শরীরের রক্ত দূষিত হইলে যে কোনও
প্রকার রোগের আক্রমণে অচল হইয়া
পড়িবেন। এই অনিবার্য কলঙ্ক হইতে মুক্তি
পাইতে হইলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ
আর. এন. চক্রবর্তী

রক্ত সঞ্জীবনী

আয়ুর্বেদোক্ত বহুবিধ ভেষজ ও তেজস্কর
রাসায়নিক সংমিশ্রণে বিজ্ঞানসম্মত
প্রণালীতে প্রস্তুত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন
রক্তপরিশোধক জ্যেষ্ঠ টনিক ব্যবহারে
দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়।

রক্তদুষ্টিজনিত সব প্রকার ব্যাধি-বাত,
চর্মরোগ, চুলকানি, রক্তশূন্যতা, রক্তের
চাপ বৃদ্ধি এবং পাকশয় ও অন্ত্রপ্রদেশের
উপর ইহার প্রিয়া আশ্চর্যজনক।

শ্রী-পুষ্কর সকলেই সকল অবস্থাতে ব্যবহার
করিতে পারিবেন। মূল্য-২, মাঃ ৫/০।

হরিশ্রর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়

২৪, দেবেশ্বর ঘোষ রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা। ফোন : সাউথ ৩০৮

শ্রীঃ রাইমার এন্ড কোং ও এম্. ভট্টাচার্য।

আনন্দ-উৎসবে অপরিহার্য

সকল ঋতুতে প্রমত্ত হৃদয় ও স্নিগ্ধ

স্নো-ভিউ

দার্ডিউলিন্স



সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স :

কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

ধর্মতলা : : : কলিকাতা

শ্রীমতী প্রসন্ন করিবার সাহস হয় নাই পশুপতির। শব্দ সেই থেকে ভাবনা হ্রাস করিয়াছে। অনিলা—হ্যাঁ অনিলা ভিন্ন আর কে? তাহার ক্ষতি করিবার ফাঁদ বুজিতেছে?

কি করিবে? স্ত্রীরা স্বামীর কী ক্ষতি করিতে পারে? কোন ধরনের অনিষ্ট? কিরূপ প্রভাষণ? সংসারের টাকা লইয়া যাপনের বাড়ি পাঠাইয়া দিবে? কিন্তু কেন? তাহাদের অবস্থা যে পশুপতির চাইতে দশ গুণ ভালো। তবে? পশুপতিকে লুকাইয়া—আর কাহাকেও? ছিঃ এই আট বছর ঘর করার পর? অসম্ভব কি? হয় তো বরাবরই—পশুপতি মর্খ, সন্দনরী স্ত্রীর প্রেমে গদ গদ।

যৌক কেন? এটা তো ভালো নয়। সার্জ-গোজটাও একটু যেন বেশী বেশী না? এই যে পশুপতির দিদিরা—কখনো শাড়ির সঙ্গে এক-খানা সেমিজ ব্যবহার করেন কি না সন্দেহ। আর অনিলা? ক্লাউস পেটিকোট সেমিজ বিডস। শাড়িরই বা বাহার কত। সেনা সাবানও মাসের মাস কম খরচ হয় না।

এই সব খরচ জোগায় পশুপতি আর অনিলা হয়তো তাহার অনপস্থিতিতে—

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ চমক ভাঙিল। নিজের দরজা ছাড়িয়া বিপিনবাবুর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়া লাভই বা কি?

—সুবিধেই করে দিলাম—বলিয়া গম্ভীর ভাবে উপরে উঠিয়া যায় পশুপতি।

কথটার গভীর তাৎপর্য হৃদয়গম করিবার কথা নয়—অনিলা সরল মনে উপরে উঠিয়া আসিয়া বলে—হ্যাঁ গা দেরি হল কেন বললে না? সেই থেকে ভেবে মরিছি—

আর থাক যথেষ্ট হয়েছে—খুব দরদ দেখিয়েছ। তবু যদি না—বলিয়া পশুপতি গজ্জ গজ্জ করিতে করিতে সাবান তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

অনিলা অন্যাক। ব্যাপার কি লোকটার? চাকরি গিয়াছে না কি? না সাহেবের বাড়ি খাইয়া আসিয়াছে? থাক মন ভালো হইলে আপনিই কথা বলিবে, বেশী প্রভেদ কাজ নাই।

পশুপতি ভাবে—দেখেছ অগ্রাহ্য? অম্লান বদনে আপনার কাজ করা হচ্ছে। স্বামী গুরুজন—রাগ দেখিয়া ভয়ের লেশ নাই। অথচ কথা না কহিয়া পশুপতির পেট ফাঁপিতেছে। কাজেই দেওয়ালকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে হয়—“ভেবে মরিছলাম—” ভাবনার বহর কত! আস্তার চোটে মোড়ের মাথা থেকে তো কাপ পাতা দায় হয়ে ওঠে। বিপনের শ্যালার দিন রাত্তির এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

—ও আবার কি? দিদির চেলে মশু না? চিনতে পারলে না?

—মশু? দিদির থেকে উড়ে এল হঠাৎ?

উড়ে আসবে কেন রৈলে চড়েই এসেছে। দিদির জামাইবাবুকে দিঙ্গীতে নিয়ে যাবে বলে চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। তাই বলে দিলাম—কাল সকলে এখানে থেকে খাওয়া দাওয়া করে যাবে।

পশুপতি ঈষৎ সন্দেহ সুরে বলে—কই আগে তো আসবার কথা শুনিনি?

—তবে আমি মিছে কথা বলেছি। মরণ আর কি! কুসংসারী সঙ্গে জটে নেশা ভাঙ করে এলে না কি? বলিয়া বিরক্তি ভরে উঠিয়া যায় অনিলা।

পশুপতির গা জোল হইয়া আসে। এই যো—সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়? পাছদেশে তাহার মরণ টাঁকিয়া গেল অনিলা? কই এত বছর বিবাহ হইয়াছে কোনদিন অনিহার মুখে এ সব কথা শোনা গিয়াছে? ভাল মানুষি করিয়া থাকে—আজ ধরা পড়িয়া বেপারোয়া হইয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, মশু না ঘন্টা, নিখাত সেই বিপনের শ্যালার—হয়তো সিনেমায় খাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেল! তোর ‘পাশ’ আছে তোর গোষ্ঠীবর্গকে লইয়া না না বাপু? পরের ঘোরের জন্য এত মাথা বাথা কিসের? আচ্ছা খুকীটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তো সন্দেহ মেটে।

হিয়ারই কিছুক্ষণ পরে—অনিলা পশুপতি জন্ম গরম লুচি ভাজিতেছে। খুকী আসিয়া প্রদান করিল—হ্যাঁ না, বিকেল বেলা মশুনা এসেছিল না? বাবা বলে কি, ও বাড়ির শ্যামল মামা—আমাকে বললে—“মিথোবাদী



.....বিপনের শ্যালার দিনরাত্তর

আচ্ছা এ ধরনের স্ত্রীরা তো স্বামীকে বিন খাওয়াইতেও পচাচপদ হয় না? কতই তো দৃষ্টান্ত আছে।

দূরে ছাই ও সব হাত দেখা ফেলা স’ বাজে, কিছু নয়। কিন্তু নয়ই বা কেন? সকলের বিষয়ই তো ঠিক ঠিক বলিয়াছে ছোকরা।

অনিলায় ব্যবহারটাও সব সময়ই কিছু আর পতিততার মত নয়।

এই তো সৌন্দ পশুপতিকে না বলিয়া—বিপিন বাবুর শ্যালার সঙ্গে সিনেমায় গেল—অবশ্য বিপিনের স্ত্রীও সঙ্গে ছিল। কিন্তু খাইবার দরকারটাই বা কি? অত সিনেমায়

এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

গৃহ তো তাহার সম্পূর্ণ গৃহের সঙ্গে তুলনীয়। তবু বাড়ি ভিন্ন যখন পথ নাই—ইতস্ততঃ করিতেছে কড়া নাড়িবে কিনা, দরজা আপনিই খুলিয়া গেল। কে একজন বাহির হইতেছে—অশ্বকরে ভালো ঠাইর হয় না।

পশুপতি সন্দেহভাবে সরিয়া দাঁড়াইল—ভিতর হইতে অনিলায় গলা—কথা থাকলো কিন্তু? ঠিক তো? জুলে যাবে না?

এবং কপাটটা ভেজাইবার উপক্রম করিতে না করিতে পশুপতি নাটকীয় ভঙ্গিতে সশব্দ প্রবেশে প্রথমত খাইয়া বলে—তুমি? কখন এসে? এত দেরি করলে যে?

ফোন :
৮৮ ৩৮২০

বাংলার ভবিষ্যৎ জাতির
স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি

বিধ্বনাথ ঘৃত

— প্রসিদ্ধানীকারক —

পঞ্চানন আশ

এও কোং

২৮ নং, রাসবুন্দার রাসফল লেন

বজ্রবাজার — চিত্রপটী

— কলিকাতা —

বীরভোগ্য। বসুন্ধরা।



লিফ্টার এটি সেপটিক
কলিকাতা



শারদীয় অভিনন্দন!

দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন উহার কিয়দংশ সাহায্য করিয়া আমরা আজ জাতীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের এই শুভপ্রচেষ্টায় মাথাবাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য পাইতেছি তাহার আমরা শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

একটি প্রগতিশীল নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস : ৩১, ম্যাগে লেন, কলিকাতা। ফোন : কাল ২৬৯২

লগতান"—এমন কান মলে দিয়েছে—উঃ জুলালা করছে।

অনিলা কিছুক্ষণ মেয়েরই দিকে সাধু ভাষায় যাহাকে 'রোষ কষায়িত নেত্র' বলে সেই দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—বলেছে এই কথা? মেয়েছে তোকে? বটে? রোসো।

পশুপতি ছাদে বেড়াইতেছে—মাথার রঙটা কেমন চাঁড়িয়া গাছে। মেয়েটাকে না মারিলেই হইত—যদি বলিয়া দেয়? অনিলা? হাতে নাতে ধরা পড়িয়া বাদি ভয়ংকর কিছু প্রতিহিংসা লইতে চায়? অনিলার হাতেই তো পশুপতির 'মরণ কাঠি জীবন কাঠি'—আচ্ছা তাই কি সম্ভব? পশুপতির কি মাথা খারাপ হইয়াছে? দিবা লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে—পেটের মধ্যে তাগাদাও আসিতেছে দিবা—সকালেই না অনিলা বলিয়াছিল আজ মাংস রাঁধবে? লুচি আর মাংস?

অজ্ঞতসরে পশুপতি রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়? কিন্তু ও কি? ভগবানই যে পশুপতিকে পাগল করিবার ভার লইয়াছেন—অনিলা পশুপতির দৃষ্টির বাটিতে কি মিশাইতেছে? সাদা সাদা গুড়া? হায় ঈশ্বর!

কিন্ধা ধনা ঈশ্বর! এই তো পশুপতির জীবন সীলা শেষ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উঃ নারী জাতিকে কি বিধাতা এমন করিয়া গড়িয়াছেন? অমতে গরল—মিছরি ছুরি? ছেলেবেলায় পড়া গিরিশ ঘোষের নাটকের ভাষা পশুপতির মনের মধ্যে 'কিলবিল' করিয়া ওঠে।

বজ্রনির্ঘোষে ভয়ানক একটা কিছ্র বলিতে ইচ্ছা করিলেও গলার স্বর সহজে বাহির হয় না, কণ্ঠভঙ্গ্য সব শূন্য হইয়া গিয়াছে যেন। অনেক কষ্টে যাহা বাহির হয় তাহা এই—দ্রবে কি মেশানো হচ্ছে?

অনিলা চাকিতে পিছন পানে চাহিয়া মিশ্রির গড়ার শিশিটা ঠুকিয়া মাটিতে বসাইয়া কহিল—বিষ।

বলা বহুলা দ্রবে না মেশাক উজ্জ বস্তুটি কণ্ঠস্বরে মিশাইতে কাপণ্য করে নাই।

—হুঁ।

ক্ষণে পেরে জুলায়া যাইতেছে। পশুপতি কড়িবরগার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বিছানায় পড়িয়া। ঘুম আসে নাই—আসিবার কথাও নয়—পেট রীতিমত বন্ধ সরু করিয়াছে।

অথচ অনিলা মূখের কথাটি মাত্র না শোইয়া নিজে খাইয়া দাইয়া পশের ঘরে মেয়েছেলেদের কাছে শইয়া পড়িল।

বিছানায় পড়িয়া থাকিলেও আন্দাজী বোকা গেল নিবারণ খাওয়া সারিয়া রান্নাঘর ধোওয়া সরু করিয়াছে।

পেটের অগ্নির প্রকাপে মনের আগুন ঈষৎ যেন কমিয়া আসিতেছিল—হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া স্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। অজ্ঞ পশুপতি কেন সত্য সত্যি স্বামী উপবাসের ব্যস্ততা করিয়া অক্লেশে ধমায়? অথচ এই বিষধর সর্প লইয়া পশুপতি নিঃশঙ্কচিত্তে

এতকাল কাটাওয়া আসিল?

যাক নিদ্দা সর্ব সন্তাপহারিণী, এক সময় দেখা দিবেনই।

—হয়তো দেয়ালের কাছে, পিতলের ঢাকা চাপা দেওয়া অনিলার পুরিপাটি হাতের গুহাইয়া রাখা আহার্য বস্তুগুলো চোখে পড়িলে ইতিহাস অনাদ্য হইত। কিন্তু রঙিন শেড দেওয়া আলোর কল্যাণে ঘরের মধ্যস্থানটা ছাড়া সহজে কিছু দৃষ্টিগত হয় না।

সকলে ঘুম ভাঙতেই পশুপতির কানে গেল অনিলা নিবারণকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছে—বটে সব পড়ে আছে? হাত দেওয়া হয়নি? আচ্ছা। যা জিগেস করে আর বাড়ির ভাত রুচবে—না বাজারের খাবার এনে সেবা হবে?

নিবারণকে অবশ্য প্রশ্ন করিতে হইল না—আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না—বলিয়া সদা নিদ্রোখিত পশুপতি চটিটা পায়ে গলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পড়িবা তো পড় সামনেই বিপনের শ্যালা শ্যামল।

—এই যে পশুপতিবাবু, ভালই হল, অনিলাদিকে বলে দেবেন—দিদি বলেছেন—

হঠাৎ পশুপতি মারমুখ হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া ভাঙচাইয়া ওঠে—অনিলাদিকে বলে যেন—'ভারী আমার সাতকালের দিদি পেয়েছেন—চিন্তা ঘণ্টা আমার বাড়িতে তোমার কি দরকার হ্যাঁ ছোকরা? যাও যাও—

শ্যামল অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ত কাইয়া চলিয়া গেল, বোধ করি ভাবিল পশুপতি হঠাৎ গজা ধরিয়াছে। সে দিদির বাড়ি থাকিয়া এম এস-সি পড়ে, বরাবর আসা যওয়া আছে—ভাল ছেলে—পশুপতিও তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসে—হঠাৎ এ কি?

অসম্মত অভূত পশুপতিকে দেখিয়া অফিসের অনেকেই বিস্মিত হইয়া কুশল প্রশ্ন করিল। পশুপতি কহাকেও একটা নাজে ভাবা দিল; কহাকেও দিল না। শিরিষ সিকদারকে আর একবার নিরলার লইয়া বসিতে হইবে। ধর—অনিলাকে বশে আনিতে কোনো রকম ধারণ বা কবচ টবচ—কত কি তো ছই পাশ থাকে।

টিফনের সময়টা আসিলে হয়।

কিন্তু পশুপতির আজ নিতান্তই অদৃষ্ট খারাপ, উঠি উঠি করিতেছে—উপরওয়ালার তলব আসিল। না আসিবে কেন তাহাকে যে এখন শনিতে ঘিরিয়াছে। শিরিষ সিকদারকে নিরলার পাওয়ার আশা ঘটিল।

টিফন রুমে আসিবার অবসর মিলিতে এবিবে আশা ঘোরলো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পশুপতির নাম লইয়া হাস-হাস হইতেছে মনে?

শিরিষ সিকদার—ইয়ার ছোকরাটা বলে কি?—দেখেছেন আজ পশুপতিবাবুর মুখ-খানি? 'আষাঢ়া প্রথম দিবস' একেবারে। যাকে বলে প্রীমুখমণ্ডল। খুব গ্রাফ দিয়ে দিরাছি কাল। আপনার মধ্যে ওনার দাঁড়ি

বর্ণনা শুনে দিলাম তাকে এক লম্বা—আহা মুখ শকিয়ে আসিস। উনি আবার সৈনিক বলছিলেন—আমি মশাই কারুর ভাওতার ভুল না—সেই যে সৈনিক ইনসপেক্টর সেই ভুললোক এসেছিলেন? এবিবে তো এক কথা—

অমলা বোস কহিল—আরে মশাই আপনি একেবারে যে মোক্ষম কথা বলে বসলেন—

—নির্ঘাত গিমির সঙ্গে কৌদল হয়েছে। —তা' একটু হওয়া ভালো, প্রেম গাড় হয়। এখন তখন গিমির বড়াই—আর কি কথার এমন ভাব দেখাতে চান—ওনার এই বয়সেও যে রকম নিবিড় প্রেম, এমন আর একালের নব দম্পতির মধ্যেও নেই।

—আজ তো কই টিফন করতে এলো না ভুললোক?

—বাড়ি থেকে ভাতও খেয়ে আসেনি বোধ হয়। যাক গে মশাই রহস্যটা ভেঙে দেবেন—একদিনেই রোগা হয়ে গেছে ভুললোক।

পশুপতি স্তম্ভিত। মাটিতে শিকড় গাড়িয়া গেছে তাহার, শিরিষ সিকদারের উপর রাগ করিবার মত জোরালো অবস্থাও নাই মনের।

শুধু—অনিলাকে কি বলিয়া শান্ত করা যাইবে—শ্যামলকে মুখ দেখানো যাইবে কেমন করিয়া, এই দৃষ্টিশক্তিতে যেন মাথা হইতে সর্ব-শরীরে পক দিতে থাকে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক মনোবিদ্যা করিয়া সন্ধির মন্ত্র রচনা করিতে হয়। ধরো—এখনও তো বলা যায় পশুপতি কাল একটা অভিনয় পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু এমনি বোকা অনিলা—ভালো কথা—ব্রাউসের জন্য ছাটের কাপড়ের কথা বলিতেছিল না সৈনিক? সেনা সাবানও যেন অনেকদিন কেনা হয় নাই। কপালের চুল পাতলা হইয়া আসিতেছে বলিয়া সৈনিক অক্লেপ করিতেছিল না অনিলা? কি নেওয়া যায়? বাথগেটের ক্যান্ডির অয়েল? জবাবসূচ্য? লক্ষ্মীবীলাস? মহাভূষণাঙ্ক?

কিন্তু এত করিবার আর প্রয়োজন ছিল না। পিচ সাতটা প্যাকেট হাতে বেরহাতি অবস্থায় কড়ানড়ার পরিবর্তে জুতার আগা দিয়া সঙ্গে রে ধাক্কা দিতে নিবারণ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং একটি গাল হাসিয়া কহিল—আপনি এখন এসেন বাবু? না এই মাস্তুর চলে গেলেন।

—চলে গেলেন? কোথায়?

—অজ্ঞে, কেন? দিল্লীতে। টেরেন ফেল হবার ভয়ে টেরিখানাকে বা উম্মশাসে দৌড় করিয়েছে—এতক্ষণে হাওড়া ইন্টিশান শোঁছে গেল। বাবার কি কথা ছিল না বাবু?

জুতার কাছে মান খোওয়ানোর ভয়ে পশুপতি কষ্টে শ্বাস লইয়া সহজভাবে বলে—কথা ছিল—ঠিক, কথা ছিল। তবে আজই—কার সঙ্গে গেল।

মাসীমা মেসোমশাই মণ্টু দাদাবাবু এখানেই সব খাওয়া দাওয়া করলেন কি না।

ব্যক্তির সম্পদেই

দেশের সম্পদ!

এই সম্পদ গড়ে তোলে একমাত্র
বিশ্বদল আর্থিক সংগতিসম্পন্ন
সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত
ব্যাংক

ইন্ডিয়ান

ন্যাশন্যাল ব্যাংক

—লিমিটেড—

হেড অফিসঃ—৮, লায়ন্স রোড
কলিকাতা।

একটি সুপরিচালিত এবং
সুপ্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

—ব্রাঞ্চ—

বম্বে, বিহার, সি পি ও বাংগালুর সর্বত্র।
লিকিউরিটি অনুসারে ব্যবসায়ীদের
সুবিধাজনক সত্তে টাকা ধার
দেওয়া হয়।

আর, রায়, বি-এ.

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোনঃ কলিঃ ৪১০১ টেলিঃ ইন্ডিয়ান, কলিকাতা।

ট্রান্সফার শেয়ার এখনও কিছু আছে

বঙ্কশ্রী হোসিয়ারী

—এও উইডিং মিলস্ লিঃ—

এই কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।
ইহা একটি লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

শতকরা ১০ লভ্যাংশ

(ঘোষণা করা হইয়াছে (৩১/৩/৪৪ ইং)।

অধিবর্তী লভ্যাংশ

১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বরের কাজের উপর
পুনরায় ভাল লভ্যাংশ আশা করা যায়।

সমমূল্যে কিছু ট্রান্সফার শেয়ার

আবিলম্বে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

আবেদন করুনঃ—

সার্ভেটস্ ইউনিয়ন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কাল ২০৭৩

টেলি—“ব্যাংক” কলিকাতা

বেঙ্ক ল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

—মূলধন—

অধিকৃত—	২৫,০০,০০০, টাকা
বিলকৃত ও গৃহীত—	১২,৫০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত—	৭,০০,০০০, টাকার অধিক

কার্যকরী তহবিল—১,৮৫,০০,০০০, লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে শতকরা ১০ হারে ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে। এ পর্যন্ত প্রদত্ত ডিভিডেন্ডের
পরিমাণ অংশীদারদের অর্ধের শতকরা একশত টাকা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরঃ—এল, এম, মুখার্জি

এম, এসসিঃ এ, সি, আই, এস (লন্ডন); চার্টার্ড সেক্রেটারী।



গৃহস্থালী

ফটোশিল্পী—শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

আমার তো ওবেলার ভাত তরকারি আছে, এতেই চলে যাবে—আপনি কি খাবেন বাবু? পাউরুটি এনে দেব?

—দরকার নেই বেরো। আমার খাওয়া নাওয়ার কথা কিছু বলে যায়নি তো?

—আজ্ঞে, তাতো কিছু বললেন না—শুধু এই গল্পটুকু দিয়ে গেলেন।

নিশ্চয় গল্পটুকুতে আছে কি?

বন্ধু পাগলের সঙ্গে ঘর করা না কি সহজ মানুষের কর্ম নয়, অনিলার তো নয়ই, এতে তাকে জেলেই দাও আর ফাঁসি দাও।

নাও ঠালা। বিপদ আর কাকে বলে? পশুপতিরই যে গলায় ফাঁসি লাগাইতে সাধ বাইতেছে। শিরিষ আর তামাসা করিল কই?

গণনাটা তো নিতুলই এইমাত্র দেখা বাইতেছে।

এই যে—হাওড়া স্টেশনে গিয়া টিকিট জোগাড় করা—সোজা বিপদ সেটা? আর ছুটির জোগাড়? সেই বা সহজ কিসে? তা'ছাড়া—সরকারী 'ভ্রমণ কমাও' নীতির অবমাননা তো আছেই।

এত বিপদে ফেলিল কে?

জ্যাম, জেলী, চাটনী, আচার, মসলা
ইত্যাদির প্রয়োজন হইলে একমাত্র
ঈষ্টার্নের প্রস্তুত অত্যুৎকৃষ্ট
জিনিষগুলিই লইবেন



জ্যাম,
জেলী,
আমের
চাটনী,
কারি
পাউডার,
টমেটো সস
ও কেচাপ
মিক্সিওটক
আচার এবং
মসলা
ইত্যাদি

ম্যানুফ্যাকচারার :-

ঈষ্টার্ন কণ্ডিমেণ্টস কোং,

ফোন-ক্যাল ৬১৭৪, পোঃ বক্স ২১১৭
টেলী-“মার্ম্যালাভ”



কামিক্যাল কিনিবার
বেলায় “ষ্টাণ্ডার্ড” মার্ক
দেখিয়া অবশ্য কিনিবেন

আমরা নিম্নোক্ত কেমিক্যাল দ্রব্যাদি নির্দেশভাবে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

- ০ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড।
- ০ পটাশ এসিটাস্।
- ০ পটাশ সাইট্রাস্।
- ০ সোডি সাইট্রাস্।
- ০ সল্ভার নাইট্রেট।
- ০ ফেরিয়েট এমন সাইট্রাস্।
- ০ মাকুরিয়াস্ নাইট্রেট।
- ০ লেডসার এসিটেট।

ফোনঃ বি.বি. ৪০১০

গ্রামঃ “সাইট্রাস” ক্যাল

ষ্টাণ্ডার্ড কেমিক্যাল

এন্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়াক'স্ লিঃ, কলিকাতা

স্থাপিত-১৯২৪



সকল উৎসবেই প্রয়োজন

না যে কে র চা

গন্ধে অতুলনীয়

স্বাদে অনুপম

বর্ণে অনবদ্য

নায়েক জী মার্ক

২৭, পশ্চিমবঙ্গ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

— ম্যানোজিং এজেন্টস —

চণ্ডীচরণ নায়েক

প্রদীপ হং, সিমেন্ট ও লোহ বাবসারী
১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

আধুনিক সমাজ ও চিত্রকলা

শ্রীঅবানী চরন লাহা

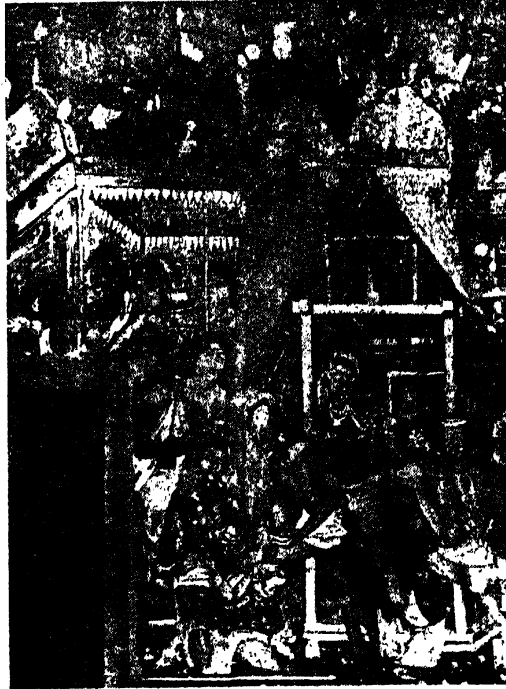
দু'হাজার বছরেরও বেশী যে অতীতের পরিমাপ ভারতের সেই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রথা ও রীতি-নীতি ভারতীয় চিত্রকলায় মধ্যে যতখানি প্রতিভা হলে তার তুলনা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বিরল। কেবল চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলা সম্ভব না হলেও গুরুত্ব যুগ থেকে সুদূর পরবর্তী কালের সমাজজীবনের ছবি সমসাময়িক সাহিত্য ও কলাশিল্পের সমবেত শটগুনিকার প্রায় সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে বলা যায়।

প্রাক্ মোহেনজোদারো

ইতিহাসের জন্ম হবার হুঁ পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থল চিত্রকলার সাহায্যে আমরা সুদূর অতীতের আদিম সমাজ-পদ্ধতির মূল তথ্য মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারি। চিত্রগুলি স্থল পদ্ধতিতে আঁকা হলেও কোন কোনটির জীবন্তভাব সত্যি বিস্ময় উদ্ভূত করে। রায়গড় জেলার অন্তর্গত সিংগনপুরের পাথরে আঁকা চিত্র এবং মিজাপুর ও হোসেনগাবাদ জেলার গুহাগায়ে অঙ্কিত অনুরূপ চিত্র থেকে—যেগুলির তারিখ সম্বন্ধে বিস্ময়কর মতভেদ দেখা যায়—আমরা জানতে পারি যে তখন খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় ছিল শিকার এবং নৃত্যকলা, সম্ভবতঃ ধর্মসংক্রান্ত ও আনন্দানুকূল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল। শিকার ও নৃত্যনৃচান উভয়ের মধ্যেই সম্ভবতঃ জীবনব্যাপনের নির্দেশ মেলে।

ভারতের আমরা এলাম ইতিহাসের সূচনাকালীন

সিঁধু তীরের সভ্যতার যুগে। মোহেন-জোদারো এবং অন্যান্য স্থানে জামিতক ধাঁচে অথবা প্রাকৃতিক আকর্ষণে চিত্রিত যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেগুলির অঙ্কন কার্য কে করেছে জানবার উপায় নেই, তবে এই সুন্দর শিল্পকায়ে মেয়েদের হাত ছিল ধরে নিলে বিশেষ ভুল করা হবে না। মনে রাখতে হবে যে আলংকারিক চিত্রাঙ্কণ প্রধানতঃ মেয়েদেরই একচেটিয়া ব্যাপার। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাটা আরো বেশী ঘাটে, উদাহরণস্বরূপ এদেশের আল্পনার উল্লেখ করা যায়।



দায়র নারায়ণ তোলন

অজস্তা

সেরগুজা প্লেটের রামগড় পাহাড়ের ঘোঁগ-মারা গুহার প্রাচীরচিত্রের ঞ্চনাংশগুলি ভাং ব্লক খুঁ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু স্যার জন স্মার্টলের মতে ওগুলি খুঁ পুঃ প্রথম শতাব্দীর অন্তর্গত। এই ঞ্চনাংশগুলির কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক আমলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে সব চিত্রের অস্তিত্ব আছে আমরা তার সন্ধান পাই অজস্তায়।

অজস্তায় সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রাচীর-চিত্রগুলি আছে ১নং ও ১০নং গুহার, এগুলি

আঁকা সুদূর হয় খুঁ পুঃ দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে। সাত আট শতাব্দী ধরে আঁকা অজস্তায় প্রাচীরচিত্রগুলিতে সমসাময়িক সভ্যতার বহু বিচিত্র বিবরণ অজস্তা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে ১, ২, ১৬ এবং ১৭নং গুহার গুরুত্ব যুগে অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রগুলি সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। এই সব চিত্র তৎকালীন সমাজ-জীবন ও আচার ব্যবহারের অপূর্ব নিদর্শন। চিত্রগুলি ধর্ম বিষয়ক এবং বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের জীবনকথা ও জাতকে বর্ণিত তার পূর্বজন্মগুলির কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত, কিন্তু চিত্রের সংঘটিত সম্পর্কে শিল্পীদের উপলব্ধি ছিল অসাধারণ এবং কল্পনায় সাহায্যে সমসাময়িক জীবনের ছবি তারা এই পবিত্র কাহিনীতে ঢুকিয়ে খাপ খাইয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তরের জীবন

উৎসবে



বাজে খরচ কম করুন !!

যুগ যুগান্তর ধরে—

মায়েস কাছে প্রার্থনা করেছেন

“ধনং দেহি—”

তিনি শুনছেন—পূরণ করেছেন
আপনার প্রার্থনা।

আপনার কাছে

—পরিবারের প্রার্থনা—

পেয়েছেন যে ধন

তার অপব্যয় না করে
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন।

✽

তিন বৎসরের ক্যাশ
সার্টিফিকেট ক্রয় করুন।

স্থায়ী আমানতে সুবিধাজনক সত্রে
উদ্ভূত তহবিল গচ্ছিত রাখুন

এবং

চলতি হিসাব খুলুন।

✽

আধুনিক সব প্রকার ব্যাঙ্কিং
কাজকারবারের জন্য

দি প্রোভাপুর ব্যাঙ্ক লি.

টেলিগ্রাম—মোচাক ♦ স্থাপিত—১৩২১

—হেড অফিস—

১৬, ম্যাগেগো লেন, কলিকাতা।

—ব্রাঞ্চ—

উল্হাড়িয়া : : আমতা

মিঃ জে. সি. চক্রবর্তী,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ অরবিন্দ রায়,

ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পিতল
বাঁসার



খাগড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মোকামের উচ্চশ্রেণীর বাসন,
এলমনিয়াম ও দশকর্মের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রোতা।



পাল এণ্ড কোং

১৫৬, বহুবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা

GERMLINE

The Great Fever-Germ-Killer

জ্বরমলিন

জ্বরের ঝম

একদিনে জ্বর ছাড়ে
পণ্ডের বিচার নাই

SOLD EVERYWHERE সর্বত্র প্রাপ্য

জার্মলীন লিমিটেড,

৪৭, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই চিত্রগুলিতে নিখুঁতভাবে প্রতি-
নিশ্চিত হয়েছে। তোরণ-স্বার সমন্বিত
নগরী ও পল্লী অংশ, রাজপ্রাসাদ ও দায়িত্ব
পল্লীবাঁসীর কুটীর সমভাবে চিত্রে স্থান
পেয়েছে। এমনভাবেই আঁকা হয়েছে নগর
গ্রামাঙ্গীবনের চিত্র। রাজা ও রাণীর আঁকা
য়েছে রাজসভার জাঁকজমক ও সমারোহ
ভর্তি আনুষঙ্গিক সমস্ত গোরবের সঙ্গে।
রাজার অভিব্যক্তি, প্রজাদের কাছে রাজার
শ্রদ্ধা, বয়স্কদের সঙ্গে পরামর্শ অথবা
চরকা' পরিচালনা, সহচরীপরিবৃত্তা রাণী
দ্বারা রাজা ও রাণী উভয়ে, নিজ নিজ কর্মে
বহুত্ব ভূতাবগ, প্রসাধন দৃশ্য, নিভৃত
গিরবারিক জীবনের ছবি, নাগরিকের জীবন-
দ্রা, পল্লীজীবন, গো-মহিষাদির সঙ্গে মাঠে
থবা কুটীরে রন্ধনরত কৃষক-সমস্তই চিত্রে

রূপ প্রকাশ করে বেশী; নারী এবং
পুরুষদেরও মুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তরাদির বহু
ও বিচিত্র অলংকার ধারণের মধ্যে যে অলংকার-
প্রীতি দেখা যায় তাও এই সৌন্দর্যবোধের
পরিচায়ক। নর্তকীদের পরিধানে প্রলম্বিত
রঙীন বেশ থেকে রঙীন ড্রেস কাপড়ের প্রতি
অনুরাগের প্রমাণ মেলে। পুরুষের পরিচ্ছদ
দেখা যায় ধৃতি,
স হ্যা সী র
আ ল খা হ্রা
জাতীয় ঢোলা
জামা এবং
বি দে শী দে র
নিজ নিজ
বিশিষ্ট পরি-
চ্ছদ।

ধরার ব্যবস্থা এবং সংগীতযন্ত্র ও বাসন
পত্রাদির ছবিও দেখা যায়। শান্তির সময়ের
চিত্রের প্রাধান্য থাকলেও বিরাতভাবে শ্বল-
যুদ্ধ এবং সমস্ত যুদ্ধের চিত্রও আঁকা হয়েছে।
মানুষের সর্বপ্রকার মনোবৃত্তি, মহত্তম থেকে
হীনতম—প্রেম ভীতি দয়া মারাম কাঁদ ক্রোধ লোভ
শোক চুরি-ডাকাতির স্পৃহা এবং লুণ্ঠিতরাজের



সংগীত ও নৃত্যোৎসব

স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিরাত শোভাযাত্রা এবং
নৃত্যগীত সমন্বিত আনন্দোৎসবের চিত্রও
আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও বাদ পড়েন না।
সে-যুগের তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধের পরিচয়
পাওয়া যায় রাজ-রাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের
সিল্ক অথবা মসলিনের অঙ্গলশ্রীকৃত সূক্ষ্ম
শাড়ী এবং ওড়নায় গোপন করার চেয়ে যা

যেরকম যত্ন ও মমতার সঙ্গে শিল্পীরা
তরলতা এবং প্রাণীদের চিত্র এঁকেছেন তার
মধ্যে পশুপাখী ও প্রকৃতির প্রতি সেকালের
পুরুষ ও নারীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া
যায়।
চলাচলের জন্য ব্যবহৃত রথ, নৌকা, হাতী,
ঘোড়া ইত্যাদি যান-বাহন, এই সকল পশু

করে স্বহস্তে আঁকিত চিত্র হাতে দুঃশ্রুত—
কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের এই দৃশ্য
মানসপটে কল্পনার তুলিতে কে না একেছে?
সংস্কৃত সাহিত্য থেকে—বিখ্যাত গ্রন্থগুলির
মধ্যে শকুন্তলা, রথবংশ ও রজাবলীর নাম
করলেই যথেষ্ট হবে, আমরা জানতে পারি
যে রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ ও



রাজার নগর পরিদর্শন

উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহের প্রবৃত্তি ইত্যাদি চিত্রগুলিতে যেভাবে
রূপায়িত করা হয়েছে পরবর্তীকালের ভারতীয় চিত্রকলায়
আর কোনদিন তা হয় নি।

সাহিত্যে চিত্রকলার কথা

প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা সমসাময়িক সমাজে কিরূপ
ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছে দেখানো হল। সংস্কৃত
সাহিত্যেও চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ
থেকে জোবালো প্রমাণ মেলে যে প্রাচীন যুগে সমাজের
সঙ্গে চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আমাদের বর্তমান
যুগে যার কোন অস্তিত্ব নেই। কবির আশ্রয়স্থল আশ্র-
কননে প্রেমসী শব্দতলায় স্থাপিত অবলম্বন
করে স্বহস্তে আঁকিত চিত্র হাতে দুঃশ্রুত—
কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের এই দৃশ্য
মানসপটে কল্পনার তুলিতে কে না একেছে?
সংস্কৃত সাহিত্য থেকে—বিখ্যাত গ্রন্থগুলির
মধ্যে শকুন্তলা, রথবংশ ও রজাবলীর নাম
করলেই যথেষ্ট হবে, আমরা জানতে পারি
যে রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ ও

প্রিমিয়ার থ্রাসওয়াস থ্রোস

P 48 Sch. No. XLV, C.I.T.
রাধাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

সর্বপ্রকার কাঁচের জিনিষ
ও
কর্কের
ফুকিফ ও সাপ্রায়ার

মফঃস্বল জড়ার সরবরাহ
করা হয়।

প্রিমিয়ার থ্রাসওয়াস থ্রোস

শরৎ লক্ষ্মীর আগমনে

বাংলার ঘরে ঘরে আবার কল্যাণ-
প্রীতে ভরিয়া উঠুক, সকল দুঃখ-
দৈন্য দূর হউক—ইহাই আমাদের
একমাত্র কামনা।

বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের সময়
বাজারে প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া
যায় না—তাই জনসাধারণের শ্রুভঙ্কার
ও সহযোগিতার বিনিময়ে আমরা
স্বাভাবিক দ্রুতপাণ্য প্রয়োজনীয়
জিনিষ সরাসরি আমদানী করিয়া

সামান্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা
করিয়াছি।

মাল চলাচলের সুব্যবস্থা না
থাকায় মাল প্রেরণে বিলম্ব
হইলেও মফঃস্বল গ্রাহকবর্গের
সুবিধা ও স্বার্থবক্ষার্থে আমরা
সকল সময়ই সচেষ্ট রহিয়াছি।



আপনাদের সেবা ও সন্তুষ্ট করাই
আমাদের চরম লক্ষ্য।

শারদীয়া থ্রোস

কমিশন এজেন্টস এবং জেনারেল জর্ডার
সংশ্লিষ্টরাপ

৫৭, ক্রাইস্ট স্ট্রীট (রাজকাটরা), কলিকাতা।



আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

হাঁপানির কষ্ট যখন বাড়ে, তখন রাত কাটে একটা
দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। এ্যাজমলীন এই রকম
কষ্টের সময় অদ্ভুত কাজ করে। ভারতের এক
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অর্বাধি লক্ষ লক্ষ লোক
এ্যাজমলীন খেয়ে চিরদিনের মত রোগমুক্ত হয়েছেন।
হাঁপানি ছাড়া যে কোন রকম কাস, ব্রঙ্কাইটিস্
প্রভৃতি কঠিন অসুখও এ্যাজমলীন সম্পূর্ণভাবে
সারিয়ে দেয়। এই ঔষধ ব্যবহার করে নিজেকে
আজই রোগমুক্ত করুন।

বিনামূল্যে—আপনি ইচ্ছা করিলে প্রস্তুতকারকের নিকট ডাক খরচা
বাবদ ৭০ স্টাম্প পাঠাইয়া বিনামূল্যে পরীক্ষার জন্য নমুনা নিতে পারেন।

সর্বত্র পাওয়া যায়।

এ্যাজমলীন

প্রস্তুতকারক : জি, ডি এণ্ড কোং

৮৮, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার এজেন্ট—রাইমার এণ্ড কোং

১১৪, আশুতোষ মদ্যার্জি রোড, কলিকাতা।

নারী মূর্তিচিত্র অঙ্কন করতেন। এইসব চিত্রে প্রায়শঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থান পেত। সেখানে চিত্রকলায় দক্ষতা উদ্ভবের অভিলষিত গুণ বলে পরিগণিত হত এবং সমাজের সকল স্তরের পুরুষ ও নারী চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার চর্চা করতেন। স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে উষা তার প্রতি অনুরাগিনী হলে তার সহচরী চিত্রলেখা কল্পনা থেকে অনিরুদ্ধের মূর্তি এঁকেছিল। নরনারীর কাহিনী গড়ে তুলবার উপায় হিসাবে চিত্রকে কাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার এই ধরনের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বিরহী ও বিরহিণীকে সাঙ্ক্ষ্য দেবার এবং তরুণ তরুণীর মনে প্রেম সঞ্চার করবার উপায় হিসাবে মূর্তিচিত্রকে কাজে লাগানো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ভাসের স্বপ্ন-বাসবদত্তায় উদয়ন ও বাসবদত্তার অনুপস্থিতিতেই তাদের মাতাপিতা দুজনের চিত্রের পরিণয় সম্পন্ন করেছিলেন।

বাংসায়নের কামসূত্রে চোষটি কলার মধ্যে সংগীত ও নৃত্যকলার সংগে চিত্রকলাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকের এই কলায় দখল থাকা প্রয়োজন। বাংসায়নের নাগরিক হল ফ্যাসন দূরস্ত মানুষ অর্থাৎ সহরের সভ্য লোক, বিশেষতঃ ঘমামাজা গিস্টিকরা যুবক। এই রকম একটি যুবকের ঘরে কি কি দ্রব্য থাকা উচিত তার বর্ণনায় রং, তুলি ও অঙ্কনের জন্য একটি

কাঠ ফলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের কলাবোধ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুরুষ ও নারী কেবল নিজের আনন্দের জন্যই চিত্রকলার চর্চা করতেন (বিনোদ), অপরপক্ষে গণিকারা, যাদের বাংসায়ন এবং অন্যান্য কামদর্শী গ্রন্থকার চোষটি কলা আয়ত্ত করার উপদেশ দিয়েছেন, দামোদর গুপ্তের মন্তব্য অনুসারে তারা নিছক পুরুষের মন ভূলাবার জন্য নৃত্যগীত প্রভৃতি অন্যান্য কলায় পারদর্শিতা দেখাবার মত একই উদ্দেশ্যে চিত্রকলা শিক্ষা করত।

চিত্রশালা

সেকালের সমাজে চিত্রশালা অথবা ছবির গ্যালারির স্থান কি ছিল এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগের চিত্রশালার উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে, লঙ্কা নগরীর বর্ণনায় রাবণের চিত্রশালার কথা আছে। পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে জানা যায় যে রাজার এবং রাণীদেরও নিজ নিজ চিত্রশালা থাকত। ধনী নগরবাসীরাও নিজস্ব চিত্রশালা রাখতেন। মাছকটিকে বারবণিতাদের ঐশ্বর্য ও প্রাসাদোপম হর্ম্যের বর্ণনা আছে। চিত্রকলায় এদের দক্ষতার কথা আগেই বলা হয়েছে। এরাও নিজস্ব চিত্রশালা রাখা গর্বের বিষয় মনে করত। বিশেষ বারহরের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষেও চিত্রশালা থাকার কথা সংস্কৃত সাহিত্যে

পাওয়া যায়, যেমন, শয়ন-চিত্রশালা এবং জল-মন্ডপের চিত্রশালা।

জনসাধারণের জন্য নির্মিত চিত্রশালাগুলি পুরুষ ও নারী উভয়েরই বিরামস্থান ছিল। অভিসারিকারা এবং সম্ভবতঃ বারবণিতারাও সেখানে যাতায়াত করত। অপরহাে চিত্রশালা খোলা হলে নাগরিকেরা সপরিবারে সেখানে বেড়াতে যেতেন—এজন্য, শরৎকাল ছিল প্রশস্ত সময়। চিত্রশালার মনোময় পরিবেশে আত্মীয়স্বজনদের সংগে দর্শকদের সুস্বী আবেগটনিত্তে সাজানো সুন্দর সুন্দর চিত্র-দর্শনের আনন্দ গন্ধধূপের সুবাস ভেসে এসে জর ও বাড়িয়ে দিত।

চিত্রশালায় নানারকম চিত্র থাকত। শৃংগার রসের চিত্র, জলকীড়া অথবা রাসলীলা ইত্যাদি ঐতীহ্যকৌতুকের চিত্র, শিকার দৃশ্য, দেবতা ও উপদেবতা, রাজা ও রাণী, বীর ও বীরসংগনাদের জীবনের দৃশ্য, পশুপাখী এবং সুদর্শন গভাপাতা ও ফুলের চিত্রে চিত্রশালার দেয়াল সজ্জিত থাকত। বাসগৃহে যশ বা হত্যালীলার চিত্র বিক্ষুব্ধমস্তের নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু এসব চিত্র সাধারণ চিত্রশালা, সভাগৃহ এবং মন্দিরের দেয়ালে আঁকা চলত।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে চিত্রশালা-ভবনের অর্থাৎ চিত্রশালা যে গৃহে অবস্থিত সেই গৃহের বর্ণনা পাওয়া যায়। নারদশিষ্যশাস্ত্র নামক দৃষ্টান্ত গ্রন্থে চিত্রশালা ভবনের বিবরণ পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে চিত্রশালার জন্যই সুন্দর স্বতন্ত্র গৃহ থাকত। চিত্রশালা ভবনের বাইরেটা হত বিমান অথবা মন্দিরের মত, বিশাল স্তম্ভ ও বিস্তীর্ণ চত্বর থাকত এবং সমস্ত অংশ কলা ও অন্যান্য আলংকারিক চিত্রে সজ্জিত করা হত। একটি বহুং বহিঃ-কক্ষ বা প্রবেশ-কক্ষের মধ্য দিয়ে ভিতরের চিত্রশালায় প্রবেশ করতে হত। ভগ্নভূতি থেকে জানা যায় চিত্রশালা কক্ষে বাতায়ন থাকত। ভগ্নভূতি তাঁর উত্তরামচারিতের একটি স্মরণীয় দৃশ্যে চিত্রশালাকে অমর করে গিয়েছেন। রাম ও সীতা একান্ত আগ্রহের সঙ্গে চিত্রশালার দেয়ালে অঙ্কিত নিজেদেরই জীবনের চিত্র দর্শন করছেন। রাম নিখুঁতভাবে প্রতিটি চিত্র দৃশ্য বর্ণনা করছেন। চিত্রদর্শন শেষ হবার পর সীতা ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাম তাকে সাদরে অনন্যেয় জানালেন বাতায়নের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করতে, যেখানে মৃদু বাতাস তাঁর গায়ে লাগবে।

চিত্রকলার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে যতই জানবার চেষ্টা করা যায় ভারতের সেই গৌরবময় অতীতে কলাশিল্প সম্পর্কে উল্লেখ ও উদ্ভিপনার পরিচয় পেয়ে আমরা তত বেশী শ্রদ্ধা অনুভব করি এবং সেই সঙ্গে এই ভেবে ক্ষোভও বেড়ে যায় যে একদিন যে সমাজে উচ্চকলার প্রতি সার্বজনীন অনুরাগ দেখা যেত সেই সমাজের এতদূর অবনতি ঘটেছে যে ও বিষয়ে প্রায় কারুরই কিছুমাত্র দরদ দেখা যায় না।

মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়

আমার জ্যোতিষীন
বান্ধবপিত শাস্ত্রের নির্দেশমত আসল প্রহর
(নিম্নলিখিত মূল্য ফেরৎ লইবার চুক্তিতে) ধারণ কন।
কোন রকম ধারণে আপনাব জীৱিত সিদ্ধ হইবে
জানিতে হইলে আপনাব জন্মপত্রিকা
জন্ম তারিখ সহ অগ্রিম ১ পঠাইয়া বান্ধবপিত লইবে
আমার বান্ধবপিতা বান্ধব ধারণ কনিলে
নিশ্চয়ই আপনাব সুফল লাভ হইবে।
রকম ধারণ কনিলিয়া যদি আপন
কোন ফল না পান তবে রকম বান্ধবপিত
১৫ দিনের মধ্যে রকম ফেরত দিলে মূল্য ফেরৎ দিব
এবং গণ্যমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী কৃত
ক. এন. নিহোগী মালিকান
পোঃ আলম বাজার কাউন্সিল কলিকাতা।
শাখা ২৩৩ নং অপার টিওপ্লুর রোড।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ—আমরা সকলপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের সোনা, রূপার অলংকারাদি প্রস্তুত করিয়া থাকি। প্রতিমার গহনা প্রস্তুত করা আমাদের বিশেষত্ব। বাজার অপেক্ষা মজুরী অনেক সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

— অফ এশিয়া লিঃ —

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পৃষ্ঠ-
পোষকতা করিতেন।

কেন ?

যেহেতু—

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে
তিনি প্রাণের সহিত
ভাল বাসিতেন এবং
ইহা তাদেরই একটি
প্রচেষ্টা;

যেহেতু—

তিনি জানিতেন ইহাতে
নাস্ত তাদের অর্থ
সম্পূর্ণ নিরাপদ ;

যেহেতু—

তিনি জানিতেন যে,
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জাগ্রত
হইলেই জাতীয় শিল্প
বিস্তার সহজে সম্ভব।



ইহাতে যোগদান উপলক্ষে
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
বাণী :-

“একথা আমি দৃঢ়তার
সহিত বলিতে পারি যে,
বাংলাদেশে এরূপ ব্যাঙ্ক
খুব কমই আছে, যাহারা
তাদের দৃঃসময়ে.....একটি
অর্থশালী ও প্রতিপত্তি-
শালী পরিবারের উপর
নির্ভর করিতে পারেন।”

“ইহাদের পরিচালনায়
এই ব্যাঙ্কের সাফল্য
সুনিশ্চিত।”

গ্রাণ্ড :-

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়কাদিম,
লৌহজঙ্গা, চরমুগুদিয়া, মানারী-
পুর, গোপালদী (ঢাকা), সুনামগঞ্জ
(আসাম), শিলং (আসাম),
বুলাবন (মণ্ডুয়া)।

কলিকাতা শাখা :

১৩নং রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা।

হেড্ অফিস—১২, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা

ফোন :- ক্যাল, ৫৮৯০

মনোরঞ্জন পাল, এম, এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



লম্বা কালো চেহারার মানুষটা। নাক দুটো একটু চাপা বলে গলার স্বর যানকটা অনানুসঙ্গিক হয়ে বেরিয়ে আসে। সমস্ত বরষার বাড়াতি কিছু নেই, যেন রাশি রাশি পেশীর সমাপ্তি। পূর্ব বাংলাতেও আজকাল অসম্ভব ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কচুরিপানার হুমকির বিধাত্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। তাই বয়স বহুর বয়সেই জীর্ণতা দেখা দিয়েছে শীতলের দেহে। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে লজ্জায় শীতলের মাথা নত হয়ে আসে। বায়ান্তর বছরেও কী চেহারা ছিল তার, আর কী শক্তি। ভোলায় ঝড়ে যদি সে খা চাপা পড়ে না মরত তা হলে আরো দশ বরষা বছর সে যে আরো বে-ওজর বেঁচে থাকত পারত তাতে আর সন্দেহ কী।

নৌকার হাল ধরে এলোমেলোভাবে কত কী ভেবে চলে শীতল। আড়িয়াল খাঁর শাদা জলে পশ্চিমের রাশি রাশি বাতাস বুণ্ডি-বিস্তুর মতো জলের কণা উড়িয়ে দিচ্ছে—যেন দৃষ্টি হয়েছে স্পর্শ আর ধূনির একটা বিচিত্র ধ্বনিপাক। হালকা একটুকরো মেখে নদীর এদিকটায় ছায়া পড়েছে, বাকের ওপারে থর রোড়ে বলমল করছে জল, খালের মুখে কচুরিপানার সবুজ ছোপ—নদীটা যেন বহুদূরপা। পাল-মাটির জমিতে বৈশাখী মেঘের রঙ ধরা পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে জোয়ারের জল খেলা করে বেজাচ্ছে।

এই পথ—কতদিনের চেনা পথ। ফরিদপুর থেকে, মাদারীপুর থেকে কতবার সে সোয়ারী নিয়ে গেছে এই পথ দিয়ে। কতবার বৈশাখী ঝড় আর জলের রাক্ষস উল্লাস তার নৌকা-খানকে নাচিয়েছে খেলার খেলালে। চোখের সামনে স্তিমারের ডেউ লেগে নৌকা ডুবে গেছে, ধূনেছে দু'র অশ্বকারে ডাকাতের অক্রমণে অসহায় নৌকাযাত্রীর আত্মনাদ। তবু, কী উৎসাহের গেছে সে দিনগুলো। পূজার সময় পরদেশীরা ঘরে ফিরেছে, হাসি আর গানে মুখের হয়ে উঠেছে নদীর জল, বাঁশীতে ভাটিয়ালীর সুর মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। বাইচের নৌকার ক্রমবন করে করতাল বেজেছে—

উঠেছে উদ্‌গম চীৎকার। গ্রামের হরিসভা থেকে কীতনের সুর এসেছে, গটিজড়া বাঁধা বরকনে নিয়ে আনন্দিত মুখে গাঁয়ের মেয়েরা 'জলসই' করতে এসেছে গাঙের ঘাটে। কিন্তু এই তিন বছরে কোথা থেকে কী হয়ে গেল সমস্ত।

—ও মাঝি, আর কয় বাক?

ঘুম থেকে উঠে একটা বিড়ি ধারিয়েছে সোয়ারী তারাপদ। উৎসুক ব্যাকুল চোখ বাইরে নদীর দিকে মেলে দিয়ে বলছে, সন্ধ্যার আগে পেঁছে দিতে হবে যে।

মেঘের ছায়াটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে—যেন একটা বিরাট পাখী সূর্যের ওপর থেকে ডানার আড়াল সরিয়ে নিয়ে ভেসে গেল দিগন্তের দিকে। শীতলের পাকধরা চুল-গুলো চিকচিক করে উঠল, ধর্মসিদ্ধ চওড়া কপাল জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে।

ভাটায় বড় জোর টান দিয়েছে বাবু। পালের ওপর ভো চলাই। বাতাস ঠিক থাকলে সন্ধ্যার মধ্যে পেঁছে দিতে পারব। কথায় মন মানতে চায় না, পথ কি সোজা নাকি। নইলে গাশ টেনে চলনা বাবু। —তারাপদ অধৈর্য হয়ে উঠেছে: সাঁঝের ভেতর না পেঁছলে আমার চলবে না।

—গাশ টানার এখন দরকার হবে না বাবু।— শীতল হাসল।—বাতাস পড়ে গেলে টানব তখন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

কিন্তু স্থির হয়ে বসবার জো কোথায় তারাপদ। মনটা যদি পাখী হত তা হলে

কখন হাওজার আগে উড়ে যেত সে। মানুষ না হতে পারলে দেশে ফিরব না—উত্তেজিত তারাপদ নাটকীয় ধরণে আশ্ফালন করে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তাই বলে সম্পূর্ণ নাটকীয় নয়, অতিমান এবং অপমান-বিশ্ব অবস্থায় সে দিন আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তার।

ভয়াত ব্যাকুল কণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে?

চলোয়।

—বালাই যাটযাট। কবে আসবে?

—তোমরা মরলে।

এবার আর যাট যাট বলনি অরুণা। হয় তো নিজেই মৃত্যুই কামনা করেছিল, এ অপমান আর লাঞ্ছনার জন্যে নিজেই যোলা আনা দায়ী ভেবেছিল হয়তো। তাই মহলা শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে বলেছিল, আমি তোমার পথে কাঁটা দেব না বেশিদিন, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো দোষ করেনি।

তারাপদ সে কথার কোনো জবাব করেনি। সমস্ত মাথাটা যেন বিস্ফোরক পূর্ণ হয়ে আছে, জবাব দিতে গেলেই যেন ভয়ংকর একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। নিরুত্তরে সূচকেশটা হাতে করে সে নৌকায় এসে উঠেছিল।

হুকো হাতে শব্দর জনকী চক্রবর্তী বেরিয়ে এসেছিলেন। অল্প বিষয় হেসে



— কত কী ভেবে চলে শীতল।

বলেছিলেন, ঘরে বসে তাস পাশায় সময় না কাটিয়ে চাকরী থাকরীর চেষ্ঠা বরাই ভালো। পেঁছেই চিঠি দিয়ে বাবাজী।

তখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, লগির

জীবন যাত্রার পথ
নির্ভর করে আপনার
সম্পত্তি অর্থের
উপর

নবজীবন

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :

৮০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের
ও নিজের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার
ব্যবস্থা করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য টেলিফোনে
বড়বাজার ৫৫০৮ কিম্বা পত্র দ্বারা
অনুসন্ধান করুন।

সর্বত্র উচ্চ পারিতোষিকে
বিশ্বস্ত এজেন্ট আবশ্যক

এম. দত্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার শারদীয়া পূজা ফর্দে আমাদের লাভজনক.
ক্যাস সার্টিফিকেটের কথা লিখতে ভুলিবেন না।

মার্কেটাইল এন্ড চেঞ্জ

—ব্যাঙ্ক লিঃ—

—হেড অফিস—

পি এ, মিশন রো এন্ডটেনসন, কলিকাতা।

ফোন—

কাল—৩৮৩৯



ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
মিঃ জে. এন. সেন।

—ব্রাঞ্চ—
রাণাঘাট

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

মা! আপনার ইহাই প্রয়োজন!

মুরাটোন



জীবনের তথা মাতৃহের দায়িত্ব ও আনন্দ
অবিচ্ছেদ্য। প্রসবের পূর্বে বা পরে
অক্ষুধা, অজীর্ণ, মাথাঘোরা অথবা
অনুদ্রুপ স্নাত্যাহানিতে স্বাস্থ্য
ও শক্তির পুনরুদ্ধারে সুরা-
টোন অস্বিতীয়।



এসোসিয়েটেড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ

ক লি কা তা

খোঁচার চক্ৰবর্তী বাড়ীর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। মুখ বার করে কঠিন তিক্ত গলায় তারা পদ জবাব দিয়েছিল, হাঁ, আপনার আশ্বাসের চালের সাশ্রয় করে দিয়ে গেলাম।

জানকী চক্ৰবর্তী কী জবাব দিয়েছিলেন তা শোনা যায়নি। শুধু চোখে পড়েছিল, ঘাটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তারপরে তারা পদ চলে গেল পশ্চিমে। শুধু পশ্চিম নয়, পশ্চিম ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। দিল্লী, লাহোর, লায়লাপুর। আত্মীয় নেই, পরিচিত নেই, সহায় সম্পদ কিছু নেই। শত্রুগ্ৰীহীন রুদ্ধ কঠিন মাটি, আগুনের পিণ্ডের মতো সূর্য, উত্তপ্ত লুণের বাপটা, পাহাড়ের শহরে দুর্গন্ধ নোংরা গিল। কত দিন কেটে গেছে অনাহারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুসময় এল। একটা পশমের কারখানায় ছোট মতো একটা চাকরী জুটেছিল—এই পাঁচ বছরের মাইনে দাঁড়িয়েছে দেড়শো টাকায়। আজ অন্তত তারা পদ কারো মুখোপেক্ষী নয়, অন্তত অরুণাকে কাছে নিয়ে গিয়ে দুটি বেতে দেবার মতো সংগতি তার হয়েছে। আর সঙ্গে সংগেই মনে পড়েছে বাংলা দেশের শ্যামল মাটি, নদীর গেরুয়া জল, স্নিগ্ধ আকাশ। তাই এক মাসের ছুটিতে দেশে ফিরছে তারা পদ। জলে খেলে বাংলার স্নেহ গভীর স্পর্শ যেন তাকে আকুল করে দিয়েছে।

আর ক্রমাগত অরুণার কথা মনে পড়ছে, ভ্রমণে উঠছে একটা অতি তীব্র অনুতাপ বোধ। এতটা করবার কী দরকার ছিল। তা ছাড়া অরুণা কোনো দোষ করেনি। কোনোদিন একটি কথা বলেনি সে। শব্দের অগ্নি দিন যাপনের শ্লানিকর তারা পদর ভীষণে যথাসম্ভব সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টাই বরং সে করেছে। তবু কেন অরুণাকেই সে আঘাত করল সব চাইতে বেশি, কেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি লিখেও সে তাদের খোঁজ নেয়নি? কী যেন একটা বোঁক চেপে গিয়েছিল, অপমানিত পৌরুষের কোন কেন্দ্রবিন্দুতে যা লেগেছিল একটা। আজ তার জন্যে সে অনুতাপ, ক্ষতিপূরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করবে।

ও মাঝি, সাঁঝের আগে কি কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না? হাওয়াতো তেমন জোর টেকছে না। নইলে গুণাই নাও না।

শীতল আবার হাসল।

—বাস্তব হবেন না বাবু, গুলের সময় হয়নি এখনো।

পাড়ের দিকে একবার তাকাল শীতল। খাড়া পাড় প্রায় আট দশ হাত ওপরে উঠে গেছে পাহাড়ের মতো—থেকে থেকে বড় বড়

করে ভেঙে পড়ছে মাটির চাঙ্গাড়—খানিকটা ঘোলা জল ঘুরপাক খেয়ে উঠছে ঘূর্ণীর মতো। আড়িয়াল খাঁর শ্রান্তিহীন ভাঙন। এদিকের একটা গ্রাম প্রায় অধিকের বেশি নদীর ভলে নিশ্চিত হয়ে গেছে, দু' তিনটে পত্রহীন শুকনো নারকেল গাছ এখনো জলের মাঝখানে তির্যক রেখায় পড়িয়ে স্রোতের টানে থর থর করে কাঁপছে। উঁচু পাড়ের এখানে ওখানে খাঁড়ির মতো হয়ে নদীর জল ঢুকে গেছে—মাটির গায় অজস্র ফাটল, কাটা গাছ আর হিজলের ঘন সারি দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। ওখানে গুল নিয়ে নামা অসম্ভব। কিন্তু তারা পদর তাগিদ অন্তত বেশি, বড় বেশি স্বার্থপর মানুষের মন।



ক্রমাগত অরুণা ও মেয়েটার কথাই মনে পড়ছে।

তারা পদর শেষ নেই অবশ্য। বহুদিন পরে সে ফিরছে—দুঃপ্রবাসীর এই স্বার্থবাক্য মনোভাব অপরিচিত বা অস্বাভাবিক নয় শীতলের কাছে। আজ পাঁচ বছরের ওপর সে মাঝিগিরি করছে, মানুষের এই দুর্বল বাগ্মতা বিরক্তি জাগায় না তার সহানুভূতিই আকর্ষণ করে বরং।

কিন্তু এই নদী—এই গ্রামগুলো। তিন বছরে কী আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা বাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পরে গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত নিম্নমন্ডাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। গ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে। চরের ওপরে ওই বাড়িগুলো থেকে কীতনের সর এসেছে কতদিন, এসেছে রমানী গানের উত্তাল কণ্ঠ। কিন্তু দু' বছরের মধ্যেই সব আশ্চর্যভাবে নীরব আর নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। মানুষ যারা আছে

তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়বহীন জামামতি মাত্র।

হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে পালের মৃদুটা বদলে দিলে শীতল।

—কদিন পরে দেশে আসছেন বাবু?

কদিন? সে অনেক দিন হল বই কি—পাঁচ বছর।

—দেশের কিছুই জানেন না বাবু?

—না।—তারা পদ জু' কুণ্ডিত করলে, না, বিশেষ কিছুই—! এদিকে খুব দুর্ভিক্ষ গেছে না মাঝি? কাগজে যেন দেখছিলাম। আচ্ছা, মন্দ গায়ের কোনো খবর জানো তুমি?

না, শীতল জানে না। না জানলেও কিছু অনুমান করা কঠিন নয় তার পক্ষে। কিন্তু কী হবে সে কথা তারা পদকে বলে। দুঃসংবাদ দিয়ে তার লাভ কী। তা ছাড়া তারা পদ হয়তো বড়লোক। হয়তো তার আত্মীয়স্বজন সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়ে চলেছে। দেশের সব লোকই তো আর না খেয়ে মরেনি। কত মানুষ তো এই ফাঁকে দস্তুর মতো রাজা বাদশা বনে গেল।

অনামনস্কের মতো তারা পদ আবার বললে, গুলটা টেনে গেল—

শীতল সে কথার জবাব দিল না।

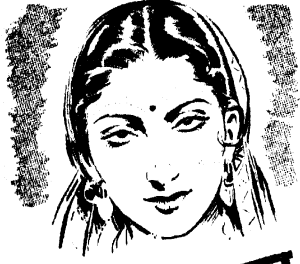
বাকের পর বাক। পথ যেন আর ফুরোয় না। ভাঁটার টান প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসছে, পালের বাতাস মন্দা। শুধু খাড়া পাড়ের গায়ো নদীর অচেতন হিংসা আঘাত করে যাচ্ছে, কুপরাপ শব্দে অনিশ্রাম ভাঙন। ঘোলা জলে এক রাশ ফেনা ফটে উঠছে, তারপরেই ছিন্ন মালা থেকে ছড়ানো রাশি রাশি ফুলের মতো খরস্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। তারা পদর নৌকোর ওপর একটা কাক বারকয়েক অকারণে চক্ক দিয়ে কা কা করে উড়ে চলে গেল।

অসীম বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা নিয়ে একটার পর একটা বাড়ি টেনে চলল তারা পদ। মাঝিটার যেন গরজ নেই কিছু, গুল টেনে গেলে এতক্ষণ—! কিন্তু বলে বলে হয়রাণ হয়ে হয়ে গেল সে। এত স্বার্থপর হয় মানুষ। একটুখানি গা ঘামালে এমন কি ক্ষতি হতে পারত লোকটার; পাঁচ বছর পরে সে দেশে ফিরছে অথচ যেন কোনো তাগিদ নেই, এতটুকু সমবেদনা নেই তার জন্যে।

অরুণা কী করছে এখন! হয়তো বিকেল বেলায় গা ধুয়ে ভিজ কাপড়ে খিড়কির ঘাট থেকে ঘরে ফিরছে। বাইরের চণ্ডীমন্ডপে জানকী চক্ৰবর্তী পাশার আসরে মেতে উঠেছেন। বড়শালা এইমাত্র হুইল আর তিনটে মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। মেয়েটা হয়তো দাদুর কোলের কাছে বসে তাঁর গাড়গাড়ির নলটা নিয়ে খেলা করছে।

বাকের ভেতরে চনচন করে উঠল, মনটা আর বাঁধ মানতে চায় না। নদীতে আজ কি আর জোয়ার আসবে না? অথবা এই পাঁচ বছরে

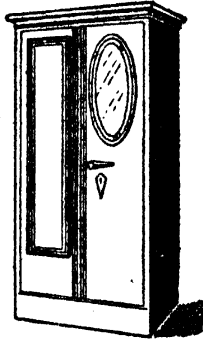
পবিত্র কপত্ৰা!



মুদ্রাস্তিত
সোহাগ সিন্দূর
নারীর দেহ মন
পবিত্রতর করে!



গুহ এণ্ড ব্রাদার্স
কলিকাতা



পোষাকপরিচ্ছদের
আলমারী।



বিস্তারিত বিবরণের জন্য

পত্র লিখুনঃ—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফীল

ওয়ার্কস

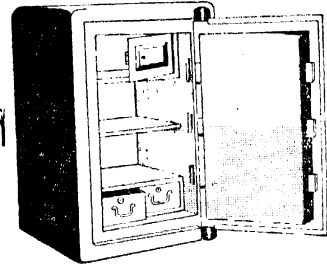
১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

“রিগ্যালের”

ইস্পাত নিশ্চিত

আলমারী, সিন্দুক,
অফিস আলমারী,
ক্যাস-বাক্স ইত্যাদি

দলিল ও অলংকারের জন্য
অখণ্ডনীয় সিন্দুক।



লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ।
সেই কল্যাণের স্বারা ধন প্রী লাভ করে;
কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ,
সেই সংগ্রহের স্বারা ধন বহুলায় লাভ করে।

—বরীন্দ্রনাথ

আর্থিক পরিচয়

মোট চলতি বীমা
২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর

বীমা ভরবিল
৫ কোটি ৪২

মোট সংস্থান

প্রায় ছয় কোটি টাকা

দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)
তিন কোটি টাকার উপর

নতুন বীমা (১৯৪০)
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

শরৎ লক্ষ্মীর
আগমনে

বাংলার গৃহ-সংসার কল্যাণ-
প্রীতে ভরসা উঠুক, সকল
দুঃখ দৈন্য ও বিপদে
অবসান হোক, নৈরাশ্য অবসাদ
ও সংশয়ের মেঘ কাটিয়া যাক,
দায়িত্ব পালনের দৃঢ় সংকল্পে
সমগ্র জাতি আজ জাগিয়া
উঠুক। দীর্ঘ সাঁইগ্রিশ বৎসর
ব্যাপী দেশের আর্থিক
স্বাধীনতালাভের এই প্রচেষ্টা
আপনাদের সকলের সহ-
যোগিতায় সফল ও সার্থক
হোক।

আজিকার দিনে ইহাই আমাদের
ঐকান্তিক কামনা।

হিন্দু স্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিন্ডিংস্, কলিকাতা।



বদলে গেছে সমস্ত, শব্দ ভাটাই আসে আজ-
কাল, জোয়ারের তান বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে!

—ও মাঝি?

—আর দেবী নেই কতী। সামনের বাক
ঘুরলেই খাল ধরব।

সামনের বাক সামনের বাক। তারাপদর
ইচ্ছে করল মাঝটাকে কষে একটা চড় বসিয়ে
দেয়। লোকটা যেন ইয়াকী করছে তার সঙ্গে।
ওঁকির রোদের রঙ রাঙা হয়ে উঠেছে, সূর্য
চলে পড়েছে পশ্চিমে, পূর্বের আকাশে কে যেন
হালকা তুলি দিয়ে ছায়ায় রঙ মাখিয়ে দিয়েছে।
সন্ধ্যা আসছে। অথচ—

সামনের বাক। সামনে তো যতটা চোখ
যায় ধু ধু করছে সোজা নদী, তারপর ওই দিক-
চকোলে—যেখানে স্পষ্ট করে কিছু দেখা
যায় না, ওখানে ওইটেই বাক নাকি। তাই হয়
তো হবে। কিন্তু ওখানে যেতে যেতেই তো
সন্ধ্যা লেগে যাবে। তারাপদ বিরক্ত ও হতাশ
মনে আর একটা বিড়ির জন্যে সার্টির পকেটে
হাত ঢোকালে, কিন্তু সময় বুঝে বিড়িগুলোও
ফুরিয়ে গেছে সব।

ক্রান্তি আর বিরক্তিতে বালিশে মাথা রেখে
শুয়ে পড়ল সে। উজ্জ্বল নীল আকাশ। রাজ-
হাসির পাখার মতো মেঘের রঙ। হাল ধরে
শীতল বসে আছে স্থির। নদীর জল বয়ে
চলেছে কলকল করে। ওই আকাশটার দিকে
এদিকে তাকাতে চোখ জুড়ে এল, তারাপদ
আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়ল।

উঠুন বাবু, এই তো ঘাট।

এক লাফে তারাপদ উঠে বসল। এতক্ষণে
তা হলে পথ সত্যিই ফুরিয়েছে। যেন বিশ্বাস
হতে চায়না সহজে : মধু গাঁয়ের চকোতি
বাড়ির ঘাট!

—হাঁ বাবু।

—তা হলে—সার্টি গায়ে চাড়িয়ে লাফিয়ে
তারাপদ নেমে পড়ল—হাটু পর্যন্ত মাথামাখ
হয়ে গেল কাদায়। কিন্তু সৈদিক জক্ষেপ না
করেই বললে, আমি এগোই, তুমি জিনিসপত্র-
গুলো নিয়ে এসো।

তারাপদ যেন হাওয়ার আগে টাউ চলে
গেল। এই তো চক্রবর্তী বাড়ি। সন্ধ্যার
অন্ধকারে সব যেন থমথম করছে। সুপারী
গাছের ঘন ছায়ায় স্তম্ভ হয়ে আছে শ্লান আর
নিরানন্দ অন্ধকার। এই সন্ধ্যায় ঠাকুর
ঘরে একটাও আলো জ্বলে না কেন! চণ্ডী-
মন্ডপটা মধু খুঁড়ে পড়ে আছে, তার অন্ধকার
কোণ থেকে একটা তক্ষক আকস্মিকভাবে
তারাপদকে অভ্যর্থনা করে উঠল ঠুঠক-কে-
ঠক-কা-ঠক-ক-অ-অ-অ—

বাড়ি ভুল হয়নি তো! না, কেমন করে হবে!
এই তো সামনে বড় গাব গাছটা, ওই তো
পশ্চিমের ঘর—জব?

—অনন্ত দা, অনন্ত দা! ও ভূনি। এই
সন্ধ্যা বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সমস্ত!
পশ্চিমের ঘরে একটা মিঠামটে আলো
জ্বলছে। কাঁপা বিরক্ত গলায় কে বললে, এখন

আবার কে ডাকাডাকি করে। আমাব জ্বর
এসেছে, বেরোতে পারব না।

—আমি তারাপদ।

—কে, কে?

—তারাপদ।

—তারাপদ!—একটা আত প্রতিনিধি,
পরক্ষণেই আবার নিব্বম মেরে গেল সমস্ত।
দ্রুত হুড়কো খোলার একটা শব্দ হল, একটা
মাটির প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এল বড় শালা
অনন্তের স্ত্রী প্রতিমা। নিরাভরণ হাত, ছিন্ন
শাড়ীর অন্তরালে একটা কংকালসার দেহ,
প্রতিমা নয়, প্রতিনিধী। দরজার গোড়ায় অনন্ত
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, গায়ে একটা ক'থা—
প্রদীপের আলোয় তার উদ্ভাসিত দৃষ্টি তার-
পদের চোখে পড়ল।

—এতদিন পরে এলে ভাই! কেন এলে?



জলে স্থলে বাংলার স্নেহ

একটা বুক ফাটা কাদায় প্রতিমা লুটিয়ে পড়ল
মাটিতে। হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে নিয়ে গেল।
বাড়ির পেছনে গাব গাছ থেকে পাঁচা ডাকতে
লাগল : নিম্ নিম্ নিম্—

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব শব্দে
গেল তারাপদ। কলরায় মারা গেছেন জানকী
চক্রবর্তী। ভূনি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ
হয়েছে। কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, শোনা
যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায়
বিক্রী করে দিয়েছে। আর অরুণা! পেটের ভাত
আর পরণের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী
থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে
সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের
অভাব ছিল না।

আশ্চর্য, তারাপদ তবু সোজা দাঁড়িয়েই
রইল। মাটিতে পড়ে গেল না, মাটিতেই বা তার
অবলম্বন কোথায়। শব্দ পা দুটো খর খর
করে কাঁপতে লাগল। আর পেছনে শীতলের

ছায়া মূর্তিটা অনুভব করে পকেট থেকে একটা
দশ টাকার নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে
দিলে।

—তুই বা মাঝি। শিধে আর তোকে দিতে
পারব না।

—ভাড়া তো আট টাকা ঠিক হয়েছিল বাবু।

আমার কাছে বুরো নেই।

—থাবু, ওই দশ টাকাই তুই নিয়ে যা।

সমস্ত নাটকটার নীরব এবং একমাত্র
দর্শক শীতল নিঃশব্দ অভিশপ্ত চক্রবর্তী
বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এমন সে আরো
দেখেছে দু চারবার। কিন্তু আজ যেন বুকের
মধ্যে বড় বেশি দোলা লাগল, বড় বেশি করে
মনের সামনে ভাসতে লাগল তারাপদের বিহীন
বিস্মারিত দৃষ্টি—যেন স্বপ্নের ঘোরে জাহ্নম

হয়ে আছে। শীতলও
তো এক মাসের মধ্যে
দেশে যায়নি, তার পরি-
বার পরিজন—!

অন্ধকার গাব গাছ-
টার তলা দিয়ে আসতে
আসতে সে শব্দে
পেল মাথার ওপরে অল-
ক্ষণে পাঁচটা তখনো
কাঁকিয়ে চলেছে নিম্
নিম্ নিম্। আর কী
নিব, নেবার আছেই বা
কী। অহেতুক বিস্ময়ের
একটা মাটির চাঙড়
কুড়িয়ে নিয়ে সে
পাঁচটার উদ্দেশে ছুঁড়ে
দিলে, ঝটপট শব্দে
একটা ছোট কাল পাখী
খাল পার হয়ে কোথায়
উড়ে চলে গেল। পেছনে
থেকে তখনো কাদার

সুর আসছে। এতদিন পরে কেন এলে ভাই,
কেন এলে?

আর মনে পড়ে গেল পলাশপুরের দত্ত
বাড়ির ছোট বউকে। স্বামীর অসুখের খবর
পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল শীতলের
নৌকোতেই। বয়স অল্প, স্বামীর অসুখের
সংবাদেও তার কচি কোমল স্নান্নের মুখে
দৃষ্টিস্তার ছাপটা গাঢ় হয়ে পড়েনি। আশার
আনন্দে তখনো উজ্জল, মাথায় টকটকে সিঁদুরের
ফোঁটা, গায়ে রাশি রাশি গরনা। অসুখ
মানুষের হয়, আবার সারেও তো। মাঝে মাঝে
খুশি মনে ছোট ছোট শাদা আঙুল দিয়ে
খালের জল নিয়ে খেলা করেছিল, পান খেয়ে
আরো রঙীন করেছিল রঙীন ঠোঁট দুটি—
একেবারেই ছেলেমানুষ! তারপর বাড়ির ঘাটে
যখন নৌকা ভিড়োঁছিল, তখন দেখেছিল
সামনের ভিত্তি বাড়িতে একটা চিতা জ্বলছে,
তার স্বামীর চিতা।

এম, এস, চৌধুরী

এও সস

জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচমেকার্স

স্থাপিত-১৯১৫

—হেড অফিস ও কারখানা—

২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ফোন: বি, বি ২৭৪৯



নিত্য নতুন ডিজাইন ও হাল-
ফ্যানের জড়োয়া গিগিম্বলের
নানাবিধ মনোমুগ্ধকর

অলংকার, রৌপ্যের বাসনাদি

এবং সর্বপ্রকার ঘড়ি

বিক্রয় সর্বদা মজুদ থাকে:

পানমরা বাদ নাই—মজুরী সুলভ।

জরুরী অর্ডারী মাল ২৪ ঘণ্টার
সরবরাহ করা হয়।

সিকিমাল্যা অগ্রিম লইয়া মফস্বলের
অর্ডারী ডি, পি যোগে পাঠান হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—কলিকাতা শাখা—

৬৩এ, কলেজ স্ট্রীট। ফোন—বি বি ৪৪৯৫

১৬১বি—রাসবিহারী এডেমিউ, বালীগঞ্জ।

ফোন—পাক ২১৭৫

সঞ্চয় করুন

সঞ্চিত অর্থ লাভবান হউন

আপনার সঞ্চিত অর্থ হইতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবেন যদি তাহা ইন্সট ইন্ডিয়া ষ্টক এন্ড শেয়ার ডীলার্স সিণ্ডিকেট লিঃএর মারফৎ শেয়ার মার্কেটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীগণের শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান যাহা ১৯৪০ সাল হইতে ক্রমাগত শতকরা ৭১% টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে এবং শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে যথাসম্ভব সকল রকমের সুবিধা-সুযোগের যথা নগদ-মূল্য দেওয়া, সহজ-কিন্তুতে মূল্য আদায় দেওয়া এবং সুনিশ্চিত লাভের পরিকল্পনা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। গ্রাহকদিগকে অর্থ-বিনিয়োগ সম্পর্কে এবং শেয়ারের অদলবদল সম্পর্কে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়।

আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কিমের টাকা খাটান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন।

ইন্সট ইন্ডিয়া ষ্টক

এও শেয়ার ডীলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

২ নং রয়েল এন্ড চেঞ্জ লেন্স, কলিকাতা

গ্রাম—হানিকম্বর

—শাখা-অফিস—

ফোন—কলি ৩৩৮২

বরিশাল, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বেনারস, ঢাকা, গ্রীহট্ট, জলপাইগুড়ি, লক্ষ্মী, লাহোর

ম্যালেরিয়া

বড় বড় ডাক্তারগণ কর্তৃক বহু
পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ম্যালেরিয়া
ও পালাজ্জরের অব্যর্থ মহৌষধ

‘আনন্দবড়ী’

মাত্র তিন দিন সেবনে
জ্বর বন্ধ হয়। ৩৬০ বড়ী ১০
টাকা, মাং ১১/০ মাত্র। গরীব রোগী-
দিগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক-
গণকে অর্থমূল্যে সর্বত্র পাঠাইয়া
থাকি।

কবিরাজ
শ্রীবিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য

দানাপুর ক্যান্ট (পাটনা)।

পূজার বিরাট
অকর্ষণ!

যুবক মহিলা এবং
শিশুদের জন্য নতুন
ধরণের রকমারী
শাড়ী ও পোষাকের
বিপুল আয়োজন!

আমাদের স্টকে নতুন
ফ্যাসানের ও বিভিন্ন
ডিজাইনের সিল্কের, সূতীর
ও বেনারসী শাড়ী, সকল
প্রকার পোষাক মজুত আছে।

ডালিয়া

টেলা রিঃ কোঃ লিঃ

কালজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আমাদের প্রতিষ্ঠান রবিবার বেলা ২টার পর
অধঃবিবস ও সোমবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

লগির খেঁচ দিয়ে শীতল নৌকাটাকে চক্ৰবর্তী বাড়ির ঘাট থেকে বের করে নিয়ে এল। বাজারের নীচে রামাবাসী করে একটু দূরিয়ে নিয়ে আবার রওনা দেবে শেষ রাতে। গয়া গায়ে অসীম প্রাণান্ত এসে বাসা বেঁধেছে কেন। মাতা বায়ান বছর বয়েস, এর ভেতরেই এত বড়ো হয়ে গেল শীতল। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে—

খালের দু'বাক উজানে নামতেই মধু গায়ের বজার। আলো নেই, মানুষ নেই, চক্ৰবর্তী বাড়ির মতোই বিম মেরে পড়ে আছে। খেঁজ করতে গেলে বাজারে হয়তো কিছুই মিলবে না। চাল নয়, তেল নয়, একটুখানি নুনের ছানো ভাবা তো পাগলামি মাত্র। আর এই বাজার! পাঁচ বছর আগেও শীতল একে দেখেছে, আলোয় ঝলমল করত, হঠাৎ দেখলে ভুল হত শহরের বাজার বলে। সেদিন আর এদিন।

সঙ্গে যা ছিল তাই দিয়েই চালে ডালে পেয়াজে খানিকটা খিচুড়ি রাখলে শীতল। কিন্তু 'আশুর্থা', একটা দুটো গ্রাস মুখে দিয়েই আর সে খেতে পারল না। অনিচ্ছুক শরীর, অনিচ্ছুক মন। কেবলই যেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাওদের বিহবল মুখখানা।

এক পেট জল খেয়ে হাঁড়টাকে সে ঢেকে রাখল। ভোরবেলা নৌকা ছাড়বার আগে খেয়ে নিলেই চলবে। প্রাণিতর জনেই বোধ হয় এত খাবার লাগছে তার। একটু ঘুমিয়ে নিলেই



.....দুজন লোক দাঁড়িয়ে

সব ঠিক হয়ে যাবে। কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে শূন্যে পড়ল।

খালের ওপরে বাজারটা নৈস্ফল্য। শূন্য নৌকোর তলা দিয়ে কলকল করছে কালো জল—মাথার ওপর দিয়ে পাখা মেলে উড়ে চলেছে রাত্রির পাখী। বাতাসটা ঠাণ্ডা নয়—খানিকটা উত্তপ্ত বাষ্পের মতো, যেন কারো নিঃশ্বাসের মতো গরম। পূর্ব বাংলার শ্মশানে যেন প্রেতের উচ্চ নিঃশ্বাস। শীতলের গায়ের মধ্যে ছম ছম করতে লাগল।

ভয় ভালো, বাজারে এখনো মানুষ আছে, বেঁচেও আছে। একটি কোমল কিশোরী কণ্ঠে 'মনসা-মঙ্গলের' করেকটি পংক্তি ভেসে এল কানে:

“বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও
তিজুবন রক্ষা করো তিজুবনের মাও”—

গলার শব্দে কন্ঠ কাতরজ। যেন এই বাজারটা, এই গ্রামটা, সমস্ত দেশটাই অসহায়

সুরে কেঁদে উঠছে, বাঁচাও আমাদের, বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও। কিন্তু তিজুবন কি সত্য সত্যই রক্ষা পাবে? আকাশের নীচে এই জমাট কালো অন্ধকার ভেদ করে সে প্রার্থনা কি গিয়ে পৌঁছাবে দেবতার কাণে। কে বলবে।



পাথরের মৃত্যুর মত দাঁড়িয়ে

অনেক রাতে একটা লণ্ঠনের আলো পড়ল চোখের ওপর। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে।

—ও মাঝি, ও মাঝি, ভাড়া যাবে?

আঃ, কে বিরক্ত করে এত রাতে। এখন সে কোথাও ভাড়া যেতে পারবে না। তারও মানুষের শরীর, তারও তো সুখদুঃখ আছে।

—না, ভাড়া যাব না।

—ও মাঝি, শোনো শোনো। বড় জরুরি। ভাড়া ডবল দেব। বিপদে পড়ে গেছি, উদ্ধার করে দাও একটুখানি। আর শূন্যে থাকা চলল না। অসীম বিরক্তিরে একটা হাই তুলে শীতল উঠে বসল, কে?

লণ্ঠন হাতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। যে কথা বলছে তার গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান, ছোট ছোট করে ছটা মাথার চুল। জান হাতে তিনটে আংটি, বাহুতে সোণার তাবিজ, গলায় বেনিয়ানের ভিতরে সোণার এক ছড়া হার চিকচিক করছে। বড়লোক এবং মহাজন নিঃসন্দেহ।

—কী হয়েছে বাবু?

—কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে। এই বেশি নয়, বস্তা দশেক।

কিন্তু আমার নৌকা তো মালের নয় বাবু, শোয়ারীর।

জানিরে বাবু, জানি।—লোকটা বিরক্ত হুঁতুপ করলে সেটুকু বোঝবার বৃষ্টি আমার আছে। বড় নৌকায় নেবার যদি উপায় থাকত, তা হলে কি এক মাল্লাই নৌকোর মাঝিদের তোয়ার করি না তিনগুণ ভাড়া

দিই! যত সব অকর্ম্ম ছোকরারা জোট বেঁধেছে, গায়ের খেঁকে চাল ডাল কিছু নিয়ে যেতে দেখলেই কাক করে এসে ধরে। আইনও নাকি হালে কী সব হয়েছে। পরসা দিয়ে ব্যবসা করব, তবু এসব কিরে বাবা।

—তা আমি কী করব বাবু।

—বেশি কিছু করতে হবে না।—লোকটা এদিকে ওদিকে তাকাল একবার: বস্তা দশেক মাল নিয়ে রাতারাতি বঙ্গভূমির মথুরা দাসের গোলায় পৌঁছে দেবে। আমিই মথুরা দাস, বুঝেছি। সঙ্গেই থাকব তোমার। খুশি করে ভাড়া দিয়ে দেব, কোন ভয় নেই।

একটা অকারণ নিষেধ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ অনায়া, এ অত্যন্ত অনায়া।

—না বাবু, পারব না।

—আরে বাবু, কত তোষামোদ করব আর। ওই যে কথায় বলে, মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে—এত হয়েছে তাই। আর দর বাড়াসনে, গা তোল দয়া করে।

—দেবেন কত?

—দশ টাকা।

—কুড়ি টাকার কমে হবে না।

—কুড়ি টাকা! বলিস্ কিরে!—মথুরা দাস চোখ দুটাকে ছানাবড়া করে তুলল: কুড়ি টাকার তো একখানা নৌকাই কেনা যায়।

—তবে তাই কিনুনগে না।—শীতল আবার শূন্যে পড়বার উপক্রম করল।



খড়োর মত তীর খরগোষ

আহা মাঝি, শোন শোন।—মথুরা দাসের গলায় ব্যাকুলতার আমেজ লাগল: নে ওই পনেরো টাকাই পাবি, আর দিক করিস নে বাপদন। বড় বিপদেই পড়োঁছি, নইলে—

—কুড়ি টাকার কমে পারব না। যদি রাজী থাকেন তো মাল আনুন কত।

—আঃ, এ যে ভদ্দরলোকের এক কথা। তবু তো ভাগিস ভদ্দর লোক নেোস। আচ্ছা যা, তাই হবে। বাগে পেয়েছিঁস কিনা। হুঃ, যত সব—

অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনেটুনে শীতল উঠে দাঁড়াল। বাগে পেয়েছে। সে আর পেয়েছে কতটুকু? তার চাইতে অনেক বেশি পেয়েছে মথুরা দাস। শূন্য একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে। শ্মশানের ওপর হাড়ের দৃশ্য যত আকাশ ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়িম্ব পাহাড়। আড়িয়াল খাঁ ভেঙে চলেছে দুর্নিবার ভাবে, গ্রামের পরে গ্রাম, নীড়ের পরে নীড়, দাঁড়িকে শ্মশান হয়ে চলেছে সমস্ত। আর সেই

বেণী রচনায় — মাদ্রাসা অতুলনীয়



লক্ষ্মীবলাপ

এম, এল, বসু & কোং, লিঃ

জনহীন চড়ায় একটা ভাঙা নৌকো উবুড় হয়ে আছে। তা থাক, মথুরা দাসের নৌকার অভাব হবে না কোনো দিন।

তারাপদ কী করছে এখন? চকিতের জন্যে শীতলের মনে পড়ল : তারাপদ কী করছে এখন? অশ্বকার উঠানের মাঝখানে এখনো কি সে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কত আশা করেই না এসেছিল লোকটা। দেশে ফিরবার জন্যে কত ব্যস্ততা, কত তাগিদ, কতদিন যে সে আপনার জনের মুখ দেখেনি। নাঃ, এমন জানলে কিহতেই ভাড়া নিতনা শীতল।

—আর কত মাল চাপাবেন বাবু? আমার নৌকো যে ডুবে যাবে।

—যাবে না বাবু, যাবে না। মোটে দশটা তো বসতা। দু'কোশ রাস্তা যাবি, বুড়ি টাকা কলে করোছি। কিন্তু খুব হাঁসিয়ার—কেউ জিগেস করলে—হ্যাঁ, যা বলে দিইছি মনে আছে তো?

একবার ইচ্ছা হল টান মেরে বসতাগুলোকে জগে ফেলে দেয়।

মুখে চোখে জল দিয়ে শীতল নৌকো খুলে দিলে। অশ্বকারে জল হয়ে চলেছে তরল খালের মতো তীক্ষ্ণ খর ধারায়। দু'পাশের বন জঙ্গল আর বেত কাঁটায় লগির আগা আঁকড়ে ধরে কচুরির জাংগল পথ আটকে নৌকোটাকে বাধা দেয় বারে বারে, যেন যেতে হবে না। দূরে কোথায় কারা চীৎকার করে কদিয়ে—মড়াকামা নিশ্চয়। মড়ার এমন সমারোহের মাঝখানে লোকের এখনো কাদিবার মতো কণ্ঠ যে অবশিষ্ট আছে এইটেই আশ্চর্য।

আকাশে অনেকগুলো জ্বলজ্বল করে একসঙ্গে ছায়া ফেলেছে খালের জলে জলটা ঝিলমিল করছে যেন বাঘের খাবা। পচা মাটি আর পাতার অত্যাগ গন্ধ ভাসছে বাঘের গায়ের গন্ধের মতো। একটা রক্তাক্ত হিংস্র হাসির আভাস দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠল—শেষ প্রহরের খণ্ড চাঁদ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিস্ময়করভাবে কুটিল আর হিংসাতুর হয়ে উঠেছে; রাগিটা যেন উঠে এসেছে শ্মশানের কোল থেকে, যেন রাশি

রাশি চিতার ধোঁয়ায় রূপ নিয়েছে এই অশ্বকার। আর এই রাগিতে মথুরা দাস চাল চুরি করে নিয়ে চলেছে—চুরি করে নিয়ে চলেছে মানুষের মূখের গ্রাস। সমস্ত পরিপার্শ্ব—সমস্ত পট-ভূমিই তার অন্তর্ভুক্ত।

—নৌকো কার? কোথায় যাবে?
বড়গলায় প্রশ্ন এল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দু'তিনটে টেচের বাঁঝালো আলো এসে পড়ল শীতলের চোখে মুখে—কী আছে নৌকোর? নৌকোর ভেতরে ততক্ষণ একটা চাদর মড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছে মথুরা দাস। ফিসফিস করে ভীরা গলায় বললে, মাঝি, ও মাঝি?
—কী আছে নৌকোতে? থামাও, ডিঙাও নৌকো।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলে শীতল।
—শোয়ারী আছে বাবু, ভেদবমি ধরেছে। ভরানক বিপদ। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে না পারলে—
—ভেদ-বমি! টেচের আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল; মিথ্যে বলছ না তো? মাল-পত্রের নৈই তো কিছ? চাল-টাল?

—এসে দেখুন না বাবু।
—আচ্ছা, যাও যাও। বড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যা বলবে না।
—জায়ে না।

জোরে জোরে আরো কয়েকটা খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল। খালের জলে বাঘের খাবা যক যক করছে—শেষ প্রহরের লালান্ড শ্মশানতায় সে খাবার নখগুলো যেন রক্তাক্ত। দিগন্তে চাঁদের রক্ত-হাসি। অশ্বকারটা যেন চিতার ধোঁয়ায় ঘনীভূত।

নিরাপদ জায়গায় এসে মথুরা দাসও হাসতে সুরু করে দিলে। দাঁতগুলো জ্বলে উঠলো উল্লাসে।

—বেড়ে, বেড়ে বলেছি মাঝি। ভেদ-বমির বুগী! হি-হি-হি! এখন বাকীটা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যেতে পারলে—হি-হি-হি।

শীতলের মনের মধ্যে বার বার করে একটা ভীরা ধিকার বেজে উঠছে, বড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যা বলবে না। মথুরার হাসির শব্দে হঠাৎ যেন তার চমক ভেঙে গেল। অবতেন জিহ্বাসের একটা প্রেরণা হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠল : কথা ক্ষণেও ফলে, অক্ষণেও ফলে। সত্যি সত্যিই কি এই মুহূর্তে ভেদ-বমি দেখা দিতে পারে না মথুরার?

খালের জলে অতি তীব্র জোয়ার এসেছে। দিনের আলোয় উজ্জ্বল আড়িয়াল খাঁর প্রশস্ত প্রসারিত স্রোত নয়—অবিচলিত পাড় ভেঙ্গে চলা শ্মশানের উদাস রক্ততাও নয়। রাগির অশ্বকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষিপ্ৰগতিতে লোকোতে চলেছে নিদ্রার শিথিল বিশ্রাম।



স্বামী : সুনীতি, আমাদের পোকাব মত যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন আমার বাবা আমার ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বলেই আমার জীবনের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে—একখানা বয়েজ্ ডেকার্ড পলিসী করে।

দ্বী : আমরাও তাঁর মত এখন থেকেই আমাদের খোঁকার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করবো।

বালকের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ পলিসী
(Boys' Deferred Assurance Policy)
এহণ করা প্রত্যেক পিতারই কল্যাণ।

ইন্সট্যান মিউচুয়াল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :- ১৫, ডিওরএন এভিনিউ, কলিকাতা





পৃথিবীর অনেক কিছই মার বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা অসার, মার-মের মতন। আত্মঘাতের এককোণে আরাম-চোয়ারে এলায়িত হয়ে সর্বমাত্র বিশ্ববাস্যের বিস্মৃত হতে চলেছি, চোখের পাতা প্রায় বজ্রে এসেছে, কি আসেনি, এমন সময়ে ভূইফোড় দৈতোর ন্যায় দীপেন আমার সামনে আবির্ভূত হোলো।

“বনস্পতিক দেখেচ ?” খোঁজ করল সে—একটু খাপছাড়াভাবেই।

“নাঃ। চারধার সাক্ষ। কোনো ভয় নই।” আমি তাকে অবশ্বস্ত করলাম।

“এসেছিল কি আসেনি?” দীপেন তথাপি জিজ্ঞাসু।

“আমি তাকে চোখেও দেখিনি, কানেও শুনতে পাইনি—এখানে আসা অবধি।” আমি জানালাম।

দীপেন বসে পড়ল।

“তাহলে তার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।” বলল সেঃ “অন্ততঃ একবারটির জন্যও সে এখানে আসবে। রোজই তো আসে—তাই না?”

আমি একদৃষ্টে দীপেনের দিকে তাকাই।

“তুমি অপেক্ষা করবে—ওর জন্যে?”

আরাম চোয়ারের আওতায় যাও বা একটু ঘুমঘুম এসেছিল ওর কথার ঝটকায় সে আমেজ এক ঝাপটে কেটে যায়। ঘোলা আনা সজাগ হয়ে উঠতে হয়ঃ “যা?—তুমি কার খোঁজ করছিলে? বনস্পতির না?”

“হ্যাঁ।” গম্ভীর মুখে ও ঘাড় নাড়ল।

“বনস্পতির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।”

আমি ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ান্বিত হই। ওর কথার মর্ম আমার মর্মে ঢোকে না, আমার নিরেট মাথার ঠেকে ঠেকে বাস্তব্যের প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সত্যি বলতে, ওর কথার কোনো অর্থ হয় বলে আমার ধারণা হয় না।

“তুমি দেখা করতে চাও—বনস্পতির সঙ্গে? এই কথাই বলবে না?” আমি ওর বিবৃতির ছিন্নস্বত্রগুলি আমার মানসপটে পরের পর সাজাই। শ্রুতি আর স্মৃতি আর সেই স্মৃতির জোড়াভাড়া দিয়ে পরস্পরায় সাজিয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বার করার চেষ্টা করি। রহস্যটা পরিষ্কার করতে চাই।

“তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও—সত্যি কি?”

“ঠিক যে চাই তা নয়—” দীপেন শূন্যপত্র সংযোগ করেঃ “তবে তার সঙ্গে আমার দেখা না করলে নয়।”

“কেন?” স্পষ্টবাক্যে আমি জানতে চাই।

“বললে পরে বুঝবে।” দীপেন বলেঃ

“কদিন আগে গোটা পঁচিশেক টাকার আমার দরকার পড়েছিল হঠাৎ। অর্থোন্মাদের মানসে এই আত্মীয় এলাম। বন্ধুবৎসল কোনো বন্ধুর দেখা পেয়ে যাই যদি। কিন্তু বনস্পতি ছাড়া তখন কেউ এখানে ছিল না। বাধ্য হয়ে ওকেই আমার হাতড়াতে হোলো।”

ধার করা দীপেনের এক বিলাসিতা।

সেকালের বীরকেশরীদের যেমন হীরণ শিকার করে আনন্দ ছিল, দীপেনের তেমনি এই ঋণ-স্বীকার। এক রকমের মগয়াই বই কি।

এবং এই মগয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অবশেষে। দীপেনের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়।—“পরশুদিন শনিবার ছিল বুঝি?” আমি প্রশ্ন করি।

দীপেন তানা-নানা করে। পরশুর শনিবারে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়, করতে পারলে বাঁচে, কিন্তু কাজটা নিতান্তই ক্যালেন্ডারবিরুদ্ধ বলে তেমন সূচ্যরূপে পারে না।

“কি রকম? কিছু সন্নিধি হোলো মাঠে?” আমার পুনরাপি প্রশ্ন। মগয়ার টাকাগুলো গয়র দেহা কিনা আমার জ্ঞাতব্য।

দীপেন এতেরাটাকেও এড়িয়ে যায়—“ও কথা আর বোলো না।”

সে কথা বলবার নয় তা জানি। দীপেন যে ঘোড়াকে ধৃতবীর বাইরে জ্ঞান করে সেই ঘোড়াই হাসন্তে হাসতে জিতে যায়, যাদের বাজে মনে করে তারা হেঁটে গেলেও বাজি মারে, আর দীপেন যাদের ওপর বাজি ধরে তারা চার পা মায় লেজ তুলে দৌড়েও প্রথম, শ্বিতীর, তৃতীয় এমন কি চতুর্থও হয় না—শেষ পর্যন্ত সেই ‘অলসো রান’ হয়ে পড়ে। এবং মুখেই ‘অলসো রান’, আসলে তাদের রান করতো নয়, শৃঙ্খল হরণ করা, দীপেনের মতো হতভাগদের নাজেহাল করা নাহক। নির্বাণ জেতার ঘোড়াও যে কি করে ডিগ্বািজ যায় সে এক রহস্য। দীপেনের কাছে এবং আমাদের কাছেও। অতএব, কথাটা অকণাই নাস্তবিক।

এই অকথাটার জন্য কতোবার ওকে আমরা বলছি, দীপেন, টাকাগুলো ঘোড়ার পশ্চাতে এমন অপব্যয় না করে আর কোথাও ওড়াও। আমাদের কথা বলিছিনে—তবে মেয়েদের পেছনে ওড়ালেও তো পারো। দীপেনের জবাব, চেনা মেয়েরা নাকি ওড়ার মতো নয়, তাদের জন্য খরচান্ত করা যায় না। আমরা বলি, না হয় অচেনা অশ্বচেনাদের জন্যেই করলে, ঘোড়ারও তোমার কিছু চেনা নয় তো? ঘোড়াদের জন্যে তুমি বহুৎ করেছ কিন্তু তার কোনো প্রতিদান পেয়েছ কি?—ওর এক-চতুর্থাংশও যদি মেয়েদের যথেষ্ট দিতে যোগ্য ফল পেতেই। ঘোড়াদের কাছ থেকে তুমি কোনো সম্ভাবহার লাভ করোনি—এত টাকা ঢেলেও এতদিনে একটা ঘোড়াকে উইন-স্পেস্ কোথাও পাওনি, কিন্তু মেয়েদের বেলা তার অন্যথা দেখতে। নেহাৎ তাকে উইন করতে না পারো (তোমার বরাত!) তবে স্পেসে তাকে পেতে নিশ্চয়। সিনেমার কি রেস্‌টুরি

ভাওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

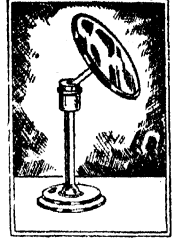
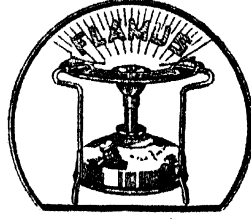
লিঃ

হেড অফিস : ১১৫নং ক্যানিং স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঢাকা, যশোহর, নৈহাটী ও
দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
শীঘ্রই খোলা হইবে।

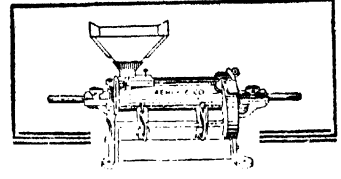
এজেন্ট ও ক্যাশিয়ার আবশ্যিক
সর্তের জন্য অধিলম্বে আবেদন
করুন।

রথীন কর,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর



Insist on ASHLY'S
KEROSENE STOVE, MIRRORS,
RICE MILL PARTS & OTHER
ENGINEERING STORES.

28, STRAND RD., CAL. Phone: Cal.3891.



জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে জাতের সহানুভূতি!



ফোন :

"ক্যাল ২৭৬৭"

(স্থাপিত-১৯০৫)

হেড অফিস-৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা

গ্রাম :

"জনসম্পদ"

শাখাসমূহ

কাঁধ	ভাগলপুর	ডোমার	বোলপুর
ঢাকা	মৈদীনীপুর	তনলুক	শাকটী
নারায়ণগঞ্জ	আনন্দপুর	বাঁকুড়া	পূরী
নীলফামারী	কর্ণেলগোলা	চাকুলিয়া	বালেশ্বর
মালদহ	বালীচক	কুসনগর	কটক
শান্তিনগর	কোলাঘাট	চুয়াডাঙ্গা	টাতনগর
মেহেরপুর	বেলদা		

কলিকাতা শাখা

বড়বাজার শ্যামবাজার হাওড়া দক্ষিণ কলিকাতা

১৯৪২ সালে শতকরা ৫, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সালে শতকরা ৬, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

ঋণ ও ওভার ড্রাফট—সদ্বিধাজনক সর্তে অনুরোধিত সিকিউরিটির উপর দেওয়া হয়।

এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এস. কে. জব্বার ও মিঃ পি. ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

ডাঃ এম. এম. চ্যাটার্জী

সে না এসে যেত না। হৃদয় না পাও, এমন নির্দয়তা পড়ে না।

এর জবাবে দীপেন মুখখানা যেন কি রকম করেছে। বিবাক্ত পৃথিবীতে বিষয় প্রতিভারা যেমন করে থাকে। সামান্য মানদ্রব না বন্ধলে বা একান্তই ভুল বন্ধে দোষ করলে মহাপুরুষদের যেমন করা দস্তুর। কিম্বা হয়তো,—শেলীকে আমি কখনো চোখে দেখিনি,—শেলীর মতই মুখখানা করেছে হয়ত। সেই দৃশ্য শেলের মত আমাদের বৃকে বেজেছে।

তার ভাবখানা জ্ঞানান্তরে হয়ত এইঃ বয়সগণ, তোমরা পাড়ি বেকু! দৃশ্যের সাধ কি ঘোলে মেটে? অশ্রুতক্ষা কি অন্য সূদায় মেটবার?



অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল।

আমরা মূখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অশ্বাহত দীপেনের দিকে তাকাতে পারিনি। ঘোড়ার চাট ঘোড়াতেই সইতে পারে। আর—আর পারে দীপেন। ও আমাদের কস্মে না।

তবে দীপেনের চাট মাঝে মধ্যে যে আমাদের সইতে হয় না তা নয়।

একদিনের কথা বলি। আমার নিজের কথা। মনে আছে এখনো। বর্ষাকাল কোনো এক রাস্তার মোড়, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। এক মাসিক পত্রিকায় গল্প বেটে করকের দশটি মূদ্রা নিয়ে ফিরছি—ওই সম্বল। দীপেন এসে পাকড়ালোঃ “ভাই ভারী বিপদ, গোটা দেশে টাকা আমরা দিতে পারো? ধার চাচ্ছি।” ওর চোখমুখ উদাস, চুল উসকু খুসকু, বৈরাগ্যের চেহারা।

“পাচ টাকা দিতে পারি।” আমি বললাম। এবং দখানা নোটের থেকে একজনকে ছাড়িয়ে এনে দীপেনের হাতে সমর্পণ করলাম।

দীপেন নোটখানাকে আলগোছে নিয়ে পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে তার মধ্যে রাখল। অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল। বৈরাগ্যবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—সম্বল কি? কিন্তু এই দৃশ্য দেখে আমার

চোখ কপালে উঠে গেছে; “হ্যাঁ, এত টাকা? তোমার আবার টাকার দরকার?”

“বাঃ, কাল শনিবার না? জানানো বাকি?” সে জবাব দিয়েছে।

তখনো শনিবারের রহস্য, আরো অনেক রহস্যের মত আমার অজানা। হিউমান্ রেস্ আর হস্ রেসের মাঝখানে দীপেন যে একটা মস্ত বড় যোগসূত্র সে কথা পরে অবশ্য জেনেছিলাম।

জেনেছিলাম পুরাকালীন অশ্বমেধের আধুনিক ডেমোক্রাটিক সংস্করণ কী। সেকালের বীরত্বের বিশ্বব্যাপী পরাকাষ্ঠাদের এককালীন মাঠময় রূপান্তর দেখতেও বাকী ছিল না। শনিবারের আগে দীপেনকে দেখেছি—সমুদ্রজল দীপিত—এবং শনিবারের পরেও দেখেছি—অশ্রুবল্লরীকষায় সেবনের পূর্বে ও পরে। কিন্তু পরে আর সেই আগের দীপেনকে দেখতে পাইনি। তার বদলে আমার সম্মুখে ভাবান্তরিত (এবং ভাবান্তরিত) দি পেন্-কেই প্রকটিত হতে দেখা গেছে যেন।

তার বেদনায় আমরা বীথিত ছিলাম না তা নয়। আমরা, বন্দ্যবান্ধবরা, আমাদের সাধামত তার অশ্রমেথ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে তো কাপণ্য করি নি। কিন্তু দীপেন অশ্রমেথ করছে কি অশ্রবা দীপেনমেথ করছে, আমাদের পক্ষে তা ঠিক করা একটু ঠঠিন ছিল বোধ হয়। অবশেষে একালের অশ্রমেথকে আমাদের রাজসূয় বলেই ভ্রম হয়েছে—দীপেন তো ছব, এমন কি, এ রাজাদেরও শূইয়ে দেয়, এমন ব্যাপার।

দীপেনকে শোয়ানোর একটা গল্প শুনেছিলাম। দীপেনের কাছ থেকেই। এক শনিবার ঘোড়াদের নিকটে বিড়ম্বনা লাভ করে মাঠের দুঃখ ঘাটে ভুলবার সে মনস্থ করল—সটান লেকে গিয়ে জলখাবি যাবে এই বাসনা। কিন্তু জলপথ তো এ একটি নয়—দুঃখ ভোলায়নার আরো অনেক জলযোগ আছে। রকমকের করে দুঃখ টুংখ ভুলে—ভুলতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ীর পথও দীর্ঘতর আর টলায়মান হয়ে পড়েছে দীপেনের। অগত্যা করে কি? কোথায় শোয়? পাহারোলার হাতে না পড়ে রাতটা কাটায় কি করে? হঠাৎ সামনে ঘোড়াদের একটা জলাধার দেখতে পেয়ে তার মাথায় কুংকড়ে সুকড়ে কোনোরকমে শূইয়েছে সর্পিধয়ে।

তারপরে যে ঘটনার কথা সে বলে, সেটা স্বপ্ন বলেই আমার মনে হয়। অনেক ভালো ভালো গল্প শেষটায় স্বপ্ন হয়ে যায় দেখা গেছে। দীপেনের উজ্জিতে অনেক রাতে ছাকরা গাড়ীর দট্টো ঘোড়া সেখানে নাকি জল খেতে এসেছিল। তাকে সেখানে দেখে তারা যা আশ্চর্য হ'ল তা আর কহতবা নয়। নিজেরের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, “বেখেচ এই লোকটার দশা? চিন্তে পারছ একে? আমরা যখন টালপঞ্জের মাঠে দৌড়াডাম তখন এই লোকটা আমাদের কতই না উৎসাহ

দিয়েছে! নাম ধরে ধরে আমাদের কতো না ডাকডাকি! হায়, আবার যে আমাদের এই ভাবে পুনর্মিলন হবে কে জানত? অদৃষ্টের পরিহাস দেখ! আজকে আমরা এই ছাকরা গাড়ীতে বাধা, আর সেই লোকটা কিনা এইখানে!”

দীপেন বলে, “দেখেচ, ঘোড়ারা কখনো ভোলে না। হারিয়ে দেয়, হারিয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখে। তোমার মেয়েদের চেয়ে ভালো।” কিন্তু আমার ধারণায়, ও দুটি ঘোড়া নয়, রাত্রের ঠুঁরা। অশ্বজাতীয়, তবে অন্যরূপ, দীপেনের নাইটমেয়ার।

“তা, হাতড়ে পেলে কিছ?” আমি জিজ্ঞেস করি, “বনস্পতির কাছ থেকে?”

“পেলাম।” অশোবদনে বলল দীপেনঃ “তিনটে বাজতে যখন দশ মিনিট তখন চেয়েছিলাম, আর পাঁচটা বেজে যখন হুড়ি, তখন পেলাম টাকাটা।”

“অনেক বলতে হোলো বাকি?”

“আমি? না, আমি না। আমাকে কিছ বলতে হয়নি—এ টাকাটা একবার মুখ ফুটে চাওয়া ছাড়া”—দীপেন সকাতে জানায়ঃ “একটা কথাও আমায় বলতে হয়নি।”

“খব বকল বাকি তোমাকে? তোমার এই অশ্রবোরগের জেনেই বোধ হয়?”

“বকল বলে” বকল। যেমন বকুনি তেমন বকুনি—তেমনই আবার বর্ণনা। তবে ঘোড়টোড়ার ধার দিয়েই না। বনজগতের ব্যাপার সব।

আমি বৃকতে পারি। বনস্পতি প্রকৃতি-রাসিক। বিস্মপ্রকৃতির লীলার সে আনন্দহারা।



দীপেনের নাইটমেয়ার—

গাছপালা কিলজগল বন-বাদাড় তার অন্তরঙ্গ। এমন কি, যখন সে বনমুখো নয়, তখনো সে বনের বিষয়ে মূখর। ওর বনস্পতি নাম ডাক এই কারণেই। ওকে শোনা মানে বনমর্মর শোনা।

“তোমার এখানে একলাটি পেয়ে খব বাকি বলে” নিল। ওর সব বন্য-অভিধান-কাহিনীই বাকি—?”

“শব্দই কি বন্য অভিধান? কতো কী!

চর্মরোগে



নিম্নের উপকারিতা
সম্প্রদেহ জা
পাখি বীর সকল
সভ্য জাতিই একমত

নিম্ন
য়েনো মাবান

নিয়মিত ব্যবহার করলে
চর্মরোগে ভুগতে হয় না।
নিম্ন টয়লেট সোপ প্রধান
উপযোগী সর্বাভিত সাবান
ইইলেও ইহাতে নিম্নের
চর্মরোগ নাশক শক্তি
পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

THE LISTER ANTISEPTICS
& DRESSINGS CO. (1928) LTD.
CHENNAI, INDIA



আপনার প্রসারিত
মেটোর
ক্যামেরা রাজ
আমাদের তৈরি
মহা ক্যামেরা

প্রতি ক্যামেরা আমেরা করে তুলুন।



=দেশের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান=

কুবের ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

হেড অফিস—৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

কলিকাতা
বড়বাজার
শ্যামবাজার
দক্ষিণ কলিকাতা
হাওড়া

ঢাকা
শান্তিপুত্র
তারকেশ্বর
রাণাঘাট
কুষ্মনগর
বেলুড়া
বালী

আড়াগ্রাম
ভদ্রক
সুত্রাগড়
বাগেরহাট
বাঁকুড়া
গিড়নী

দার্জিলিং
রাজসাহী
বগুড়া
শিলিগুড়ি
কালিঙ্গ
বালেশ্বর
চন্দনবাজার

অনুমোদিত জার্মান রাইম্মা স্পঞ্জ ও ওভার ড্রাফ্ট ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ফোন :
ক্যাল-৬১১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এস. কে. চক্রবর্তী

ফোন :- কাল ৭৮৮

টেলিগ্রাম : "জীবনতরী"

আর্থ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের কল্যাণসাধন এবং দীর্ঘকালব্যাপী সেবারতের ভিতর দিয়া জনসাধারণের আনুকূল্যে "আর্থ ইন্সিওরেন্স" দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মূলে রহিয়াছে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা-নীতি।

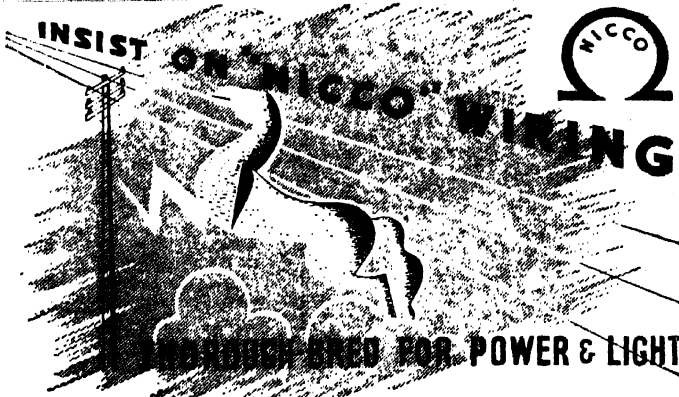
ক্রমোন্নতির পরিচয়

	১৯৩৯	১৯৫১	১৯৪৩
১। চলতি বীমার পরিমাণ	১৫,০১,০০০	৩৭,১০,৯০০	৬০,০০,০০০
২। জীবনবীমা তহবিল	১,৬৩,৪০০	৬,০০,০০০	১২,২৭,২০০
৩। গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি	১,৯৭,১০০	৪,০৩,২০০	৯,১১,৫০০
৪। বার্ষিক প্রিমিয়াম	৮৩,০০০	২,০৩,০০০	৩,৩১,০০০

ব্রাঞ্চ ও অর্গানাইজেশন অফিস

লাহোর, মাদ্রাজ, লক্ষী, বেনারস, পাটনা, গ্রীহট্ট, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি।

জেনারেল ম্যানেজার—জি সি পাল, বি-এল



Electric lines are the life-lines of the Nation. 'NICCO' is dedicated to accuracy and quality in Cables and Wires for all Electrical purposes.

We are, however, releasing only a limited part of our production capacity to meet demands from essential users supported by the necessary permits under the Non-Ferrous Metals Control Order. We are in a position to quote at present for BARE COPPER SOLID CONDUCTORS only.

NATIONAL INSULATED
CABLE CO OF INDIA LTD.
STEPHEN HOUSE :: CALCUTTA
PHONE : CAL 5660 (10 LINES) :: WORKS : MENGAON (C.P.) & MUMBAI (BENGAL)

বনের লাভ্য পৰ্যন্ত। আর বল বলে বল। সে কী কথা—আর কথা কী জেগে উঠে বাবা! যেমন করে তুর্ভি ঘাটে জেগে উঠে যেন কথারা তার ভেতর থেকে ছিটকে ছিটকে ছুটে বেরতে লাগল। প্রথম কথাতেই টাকার দিতে রাজি হয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত সব আশ্বাস সইতে হলো। কি করব?"

বেচারার প্রতি আমার মায়া হয়। আমি বুঝতে পারি... বনস্পতির প্রাকৃতিক রস কিছু কিছু আমাকেও চাখতে হয়েছে। ওর অনেক গাছপালা, আমার মধ্যে শেকড় গাঢ়তে না পারলেও, তাদের শাখা-প্রশাখা আমার নাক-কানের মধ্যে বিস্তার করতে শিখা করেনি। স্বভাবতই দীপেনের প্রতি আমার মহানুভূতি না হয়ে পারে না। এমন কি, কবেরার আমার সেই পাঁচ টাকার শোকও আমি ভুলতে পারি।

আমি বলি, "আহা!" এবং আরো বলি : "তাহলে তো ঐ পাঁচশ টাকা তুমি উপার্জন করেছ বলতে হবে। কয়েকশেই উপার্জন করেছ। একে তো ধার বলে না। তুমি ওকে কাজ দিয়েছ, তোমার কান দিয়ে কাজ দিয়েছ—তার বদলে ওটা তোমার হকের পাওনা। ওই রোজকার রোজগার।"

"কাজ? কেবল কাজ? এমন কন্টর কাজ আমি জীবনে করিনি। পাঁচশ টাকা উপায় করতে এর চেয়ে বেশি যত্না কখনো আমার পোহাতে হয়নি। এর বদলে মর্নিং গার্ডে সেদিনে কয়লা কেটে আনতে হলেও আমার চের বেশি আরাম ছিল।" দীপেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

"তাহলে ফের আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?" আমার আশ্চর্য লাগে।

বিশ্বাসের বিষয় বাস্তবিক। অশ্বমেধের জন্যই ওর গর্দভমেধ হলেও, দীপেন এক গাধাকে বারম্বার বধ করে না। পাঠরা জবাব দেয় বলে নয়, একবারের পাঠকে দু'বার জবাব করতে ওর কোথায় যেন বাধে। চক্ষু-লজ্জাতেই কি না কে জানে। একবার ধার করলে আর সে ধার মাড়ানো ওর স্বভাব নয়। পারংপক্ষে তাকে ভুলে যাওয়াই ওর অভ্যাস। এক হিসেবে সেটা ভালো—হতভাগাদেরও ভুলতে সময় দেওয়া হয়। সময়ের মত শোকখ্যা আর কী আছে?

এক এক সময়ে আমি ভেবেছি যে, ইনকম-ট্যাক সোলারাই মরে বন্ধ দীপেন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিচার করে দেখি—না, তাহো না। তাদের বারম্বার—দীপেনের একবার; তাদের একজনকেই পুনঃ পুনঃ, দীপেনের প্রত্যেক জনকে একান্তে; তাদের সাক্ষী জাতীয় ঠুকাঠক—আর ওর কামর-ধুলভ এক ঘা। বিবেচনা করলে দূরনের ধর্মই আলাদা। তাদের অর্থকামের নিবর্তি নেই, কিন্তু দীপেনের একেবারে মোক্ষম।

তবে কি ও স্বভাব বদলেছে? আবার ও বনস্পতিক তাহলে খেঁজে কেন?

শুভ শারদীয়োৎসবে—

আমাদের প্রীতি সন্তাষণ !



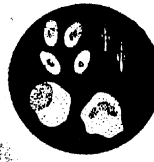
অত্যন্ত

আবিষ্কার

হেনেক্স



"১০ সি. সি. পানীয় এম্‌পিউল"
"মুরগীর শাবক হইতে প্রস্তুত কনক্রিট নির্যাস"
বিশেষ কঠিনা সন্ধিক্রমের উপলব্ধি, অবসরতা,
রক্তাৱতা ইত্যাদিতে বাধ্যত্ব হয়। দুইটি গছের
জন্ম ইহা সহজেই পাম করা যায়, প্রতিটি এম্‌পিউলে
৫০ গ্রাম কাঁচা চিকেনের সমতুল্য নির্যাস আছে।



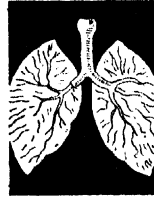
হিধোলেক্স

"১০ সি. সি. পানীয় এম্‌পিউল"
Haemoglobin. 2 cc., Liver Ext. 2 cc.,
Red Bone Marrow Ext. 2 cc., তামা,
ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ও ই সমন্বয়ে প্রস্তুত।
সকল প্রকার রক্তাৱতা, বিশেষ কঠিনা প্রসবের
পূর্বে এবং পরে ও কঠিন রোগ ভোগান্তে ব্যবহৃত
হয়।



লিভেক্স

"৫ সি. সি. পানীয় এম্‌পিউল"
Liver Ext. 3 cc., Red Bone Marrow
Ext. 2 cc এবং ভিটামিন বি, দোষ, তামা ও
ম্যাগনেসিয়াম সংযোগে প্রস্তুত।
রক্তহীনতা, শরীরের ভল্লম হ্রাসে এবং জীর্ণ-
শক্তি হীনতার ব্যবহার্য।



নিউধোলেটন

"৩ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"
সর্ষি, ক্যানি, ইনসুলিন ও ওকটাইনের বহু পরিমিত
ও পুরাতন প্রতিক্রিয়া।
উৎকৃষ্ট বিশেষীয় রসায়নিক জগাধি এবং এশিয়া
মহাদেশীয় গাছ-গাছড়ার সমন্বয়ে প্রস্তুত।



ফিভারিনা

"কাটম সংযোগে ৩ আউন্স শিশি"
ম্যালেরিয়া, সাধারণ জ্বর ইত্যাদির উৎকৃষ্ট প্রতিক্রিয়া
ও প্রতিকারক। কুইনাইন, ওয়ালকলফেট ইত্যাদি
মামান্বিত রসায়নিক সমষ্টি দ্বারা ইহা প্রস্তুত।



ভাইটামিন-এলোকা

"৪ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"
অশোক ছাল এবং অশোক এশিয়া মহাদেশীয় গাছ
গাছড়া, Vitamin B, E, ও Alcohol 20%
সংযোগে প্রস্তুত। সর্ষিকার গ্রীষ্মে ও ভরসু
যোগের অবধি প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ প্রসবান্তে
ইহা সেবনীয়।
সর্ষিকার ইহা একটি অর্থাৎ অর্যসুস্থ টনিক।



লিভারোন

"কাটম সংযোগে ৩ আউন্স শিশি"
গরু, Bile Salts ও গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তুত।
সর্ষিকার বহুত্ব বোধ ও যেরূপে নিষারক এবং
জ্বরের হ্রাস দায়ক।



ওয়াইনো

"১০ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"
ইহা গ্লিসেরফসফেট, লেকথিন, স্ট্রিকনিন
Glycerophosphates, Lecithin, Strychnine,
Alcohol 18% সমন্বয়ে প্রস্তুত। যে কোন প্রকার
আর্যবিক শৈথিল্য, অবসরতা, ক্যানি, পুষ্করহীনতা,
কঠিন রোগ ভোগান্তের পর, সর্ষিকার প্রসবের আগে
এবং পরে, ইহা একটি অসুস্থমান জগাধি টনিক।

বেঙ্গল ড্রাগস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লি:

ঘ্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি • স্থাপিত ১৯৩২

১১ রাজা রাজনারায়ণ স্ট্রীট • কলিকাতা



এম, নুরুল হোমেন

প্রথম দৃশ্য।
[রিজিয়ার পাঠ-গৃহ। দুইটি শেল্ফে সুক্লিত বই। বাম পাশের একখানা জল-চৌকির উপর একটি বীণা। দক্ষিণ পাশের ইজেলের উপর একখানি বোর্ড, তাতে সস্তরতা প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন অঙ্কিত। রিজিয়ার বাম হস্তে রঙের প্যালেট, ডান হাতের তুলি দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্নের উপর শেষ স্পর্শ দিচ্ছে। তির্যক ভঙ্গীতে দর্শকদিগের দিকে অর্ধ পিছন ফিরে দাঁড়ান, শব্দ, মূখের profile দেখা যাচ্ছে, চেনা যায় না। এই দৃশ্যে রিজিয়া কখনও দর্শকের মুখোমুখি হয়নি, তাই সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেছে।]

জাহাঙ্গীর। (নেপথ্যে) ভিতরে আসতে পারি কি?

রিজিয়া। আসুন, থোস-আমদেন, সুস্বাগতম।

[জাহাঙ্গীরের প্রবেশ]

জাহাঙ্গীর। একি? ছবি আঁকার আকাঙ্ক্ষা কবে আশ্রয় করল?

রিজিয়া। আশ্রয় করে নি, তবে বর্তমানে ঐ স্পহাটার পৃষ্ঠে চেপে তাকে মনের লাইনে চালাতে চেষ্টা পাচ্ছি, তার গতি-রেখা ধরা পড়েছে আমার এই ছবিতে, এই দেখুন।

জাহাঙ্গীর। এ যে সস্তরগু প্রকাণ্ড এক জিজ্ঞাসা-চিহ্ন একেছ, দেখছি। মনে হচ্ছে রামধনুকে বোর্ডে তুলি প্রশ্নে পরিণত করেছে? এ প্রশ্ন কার স্বরূপকে বুঝায়?

রিজিয়া। না, টীকায় সব ভেঙে যাচ্ছে। জীবনের বসন্ত দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, টীকা চলেবে না। এই আলোচনা দর্শন করুন।

কি দেখছেন?

জাহাঙ্গীর। দেখছি কবিতাগুরু।

রিজিয়া। ও শব্দ কবিতা নয়, ওগুলি হচ্ছে ঐ জিজ্ঞাসারূপী রামধনুর সস্তরগু—
Vibgyor—পাঁড়, শব্দন :
ল্যাভেন্ডার নীল বেগুনী
মনে তোলে যে সুবধুনী
চেখে ভাষা হালকা ফিকা,
সেই হাল কি আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। বলা কঠিন। অনুবর্তনীর রূপ দেখি ত?

রিজিয়া। বেশ—

মন সাঁতারে আকাশ নীলে,
প্রাণ হারে যে গাঙের চিলে,
সবুজ প্রাণের মঞ্জুলিকা।

বলব তারই আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। বলতে হচ্ছে হয় কিন্তু। বলতে না চাও, এগিয়ে যাও।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া।

জাহাঙ্গীর।

রিজিয়া। আচ্ছা, যাচ্ছি :
হৃদয় বাস ও দীর্ঘ বাণী,
পাঠে শ্রুত জাফরানী,
কম্পেজ-কুজ-খটিকা
রূপ পেলে কি আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। মৃদুস্বপ্নে ফেললে! শেষ রঙট

দর্শন করি আগে—

রিজিয়া। দেখুন—

কমালা বনে প্রজাপতি

চরণ লঘু ক্ষিপ্ৰগতি

রক্তলাল জগ্নিশিখা

দিনতে পেলে আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। বেশ পেলাম না। আজও না হয়-গুয়া

তোমার ঐ জিজ্ঞাসার সস্তবর্ণে স্তম্ভ হয়ে

থাকুন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রিজিয়া

বেগম তোমার মানস-মগ্ন যেভাবে প্রগতি

বিচার খুঁজে ফিরছে তাতে সে কতরূপী শব্দ

তোমার নিজ দেহে আবিস্কৃত হবে

না ত? (হাস্য)

রিজিয়া। (সহাস্যে) হবেই ত! জানেন, নতুন-

পুস্তকভরের ভাবধারা খুব নিবিড়রূপে

পরিপাক করছি! যে গ্রেডের আধুনিকা

সাজতে বলেন, তাই বনে যেতে পারি :

একেবারে made to order.

জাহাঙ্গীর। কিন্তু পদ্য পালিত জীব তুমি,

কত দূর চলনসই হবে, সে সম্বন্ধে

নিঃসন্দেহ হওয়া মুশ্কিল।

রিজিয়া। কেন? আমার বোনকে নিয়ে ত

বিলেতও যুগ্মেছেন? আপনাদের বিবাহের

পূর্বে তিনিও ত জেনানার বন্দিদাসী ছিলেন।

জাহাঙ্গীর। তা' বটে। তোমার বোন ত সবাইকে

জবাব করেছ। তরল-রঙীন আবহাওয়ার

ভিতরে তার মানসিক উজ্জ্বলতা ও সরস

গাম্ভীর্য তাকে এক মহানসী মূর্তি

অঙ্গ-দৌর্ভাগ্য দূর করিতে অথবা
অঙ্গ-বৈকল্য দূর করিতে



Successful Paralysis Treatment

সুখ-পদকপ্রাপ্ত প্রফেসর এ কে সাহা
চৌধুরীর সঙ্গে অম্বা সাক্ষাৎ করিবেন।
সাক্ষাতের সময়ঃ—বিকালে—৩টা—৭টা

সাধারণের সুবিধার জন্য সকালে ৭টা—রাতি ৯টা
পর্যন্ত মহিলা ও পুরুষ (MASSAGIST)
উপস্থিত থাকে। মেরুদেশের বৈকল্য, পক্ষাঘাত,
সাইটীকা, হাঁপান, জটিল ডিম্বেপিসিয়া, স্নায়বিক
দৌর্বল্য, হাড়-বিসান, রক্তচাপাধিক্য (Blood-
Pressure), বাত, পেটেবাত, মেদবৃদ্ধি ও অন্যান্য
রোগেরা এখা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অল্প সময়ে
আরোগ্য করা হয়। কুচরিত্র হাইকোর্টের প্রধান
বিচারপতি, রায় বাহাদুর মিঃ এস্ সি দত্ত বলেন,
“অঙ্গ-বৈকল্য দূর করিতে প্রোঃ সাহার চিকিৎসা-
পদ্ধতি সত্যই অভিনব।” আফিসের ভিতরে কিংবা
বাহিরে গিয়া চিকিৎসা অতিজ মহিলা ও পুরুষ
সেবক সবাই প্রস্তুত থাকে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য
লিখুন—

Prof. Saha's Massage Home, 119/1, S. N.
Banerjee Rd., Calcutta. Phone: Cal. 3485.

ত্রিপুরা ই গুা স্ত্রী জ কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিসঃ
১৫বি, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা

লম্বা আঁশের তুলার চাষ
বিপুল আয়তনে আরম্ভ
হইয়াছে। চাউলের কল
চলি তেছে এবং শীঘ্রই
কাগজের কল স্থাপিত হইবে।

ইহা একটি লভ্যাংশ যোষণাকারী
উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান।

জি, সি, সাহা,
মানেজিং ডিরেক্টর

“দারিদ্র্যদোষ মানুষের সকল গুণ বিনাশ করে”

আপনার উপার্জন যতই অল্প হোক, অর্থের মিতব্যয়ে
দুর্দিনে ও অভাবিত আয়োজনে নিরুপায় হবেন না।

*

মাত্র দু'চার টাকাকে যৎসামান্য বলে উপেক্ষা
না করে আজই সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করুন।

*

মনে রাখিবেন “বিসদ্ব বিসদ্ব জল সঞ্চিত হয়ে
একদা বিশাল সম্ভ্রুতে পরিণত হতে পারে।”

দি

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিতঃ—১৯২৯

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। ফোনঃ কাল—৫৯৪৪
অন্যান্য শাখা—বাকুড়া, ঘাটাল, টাটাশহর, নবম্পীপ, বেনারস, মির্জাপুর, এলাহাবাদ,
পুর্নুলিয়া।

কাগপুত্র ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্য সুবিধাজনক সর্বোৎকর্ষে করা হয়।

Aristocracy
ANJALI
PERFUMED
COCONUT OIL
SATISH & SON
27, Jagannath Ghat Road - Calcutta

কোরামতি। বহুত দিমাকওয়ার আদমি। ওই আভেহ!

[কোরালের প্রবেশ]

আহমদ। নমস্কার কোরালবাবু।

কোরাল। আলাব আরজ্ মিস্টার—মিস্টার—মিস্টার—

আহমদ। আবু আহমদ।

কোরাল। Yea. আবু আহমদ।

আহমদ। মিস্টার রশিদ ভিতরে আছেন?

কোরাল। (ইংরেজি ভাণ্ডা সহকারে) Yes, as surely as you are here.

আহমদ। তবে বাইরে যে আউট লেখা আছে, যদি লোক চলে যায়?

কোরাল। আপনি যান নি ত?

আহমদ। না।

কোরাল। তা হ'লেই হ'ল। 'No vacancy'

লেখটা দেখেছেন ত? চাকরির চেণ্টায় যদি কেউ আসেন, তাঁদের 'thus far and no further' করে দায় ওই 'আউট'। ও ডিঙিয়ে (ভাবাবেশে) সত্যিকার দর্শন-দরদারী এগিয়ে এলেই জেনে যাবেন আসল হাদিস। বৃদ্ধি খরচ করে আমিই করিয়েছি, সাহেব।

আহমদ। মানবচরিত্র অধ্যয়ন আপনার সার্থক, কোরালবাবু। যাক, মিস্টার রশিদকে একটু সংবাদ দেবেন? আমি দেখা করতে চাই।

কোরাল। আপনি বন্দু, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

আহমদ। রশিদ পাকা জহুরি, বেশ মাই-ডায়ার লোক একটা জুটিয়েছে দেখাচ্ছি।

[কোরালের পুনঃ প্রবেশ, সংগে রশিদ]

রশিদ। আহমদ কি মনে করে?

আহমদ। এলাম তোমার খোস-খবরি নিতে। জীবনকে ত জোলুসময় করার যোগাড় করেছে। দেখি, তারই কিঞ্চিৎ ভাগ যদি নিতে পারি, ছোটবেলার বন্দু তুমি।

কোরাল। আমি মেয়েদের ইন্টারভিউর ফাইল-গুলি নিয়ে আসছি স্যার। কিছু আবেদন-পত্র এখনও দেখা হয় নি।

রশিদ। আচ্ছা যান।

[কোরালের প্রস্থান]

বৃদ্ধে আহমদ? লোহার কারবারে জানান্য মলে লোকের প্রয়োজন তাই—

আহমদ। লোহাবলয়ে বন্ধন করতে চেণ্টা করছ জানান্যকে, আর অজান্যকে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বন্দী করার স্বপ্ন দেখছ, না?

রশিদ। কি রকমে?

আহমদ। তোমার বিজ্ঞাপন দিয়ে। (দৃঢ়স্বরে) সত্যি বল কি চাও তুমি? ভালবাসার রোমান্স, না বিয়ে? কোনটা?

রশিদ। কোনটাই না।

আহমদ। আলবৎ, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে।

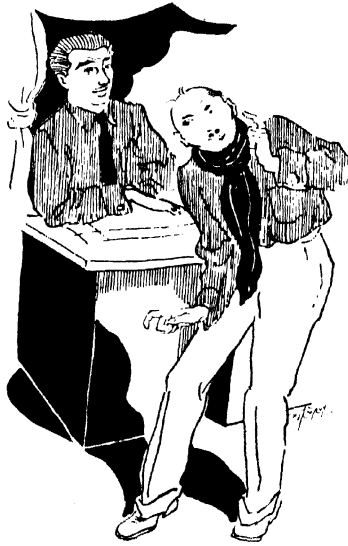
রশিদ। দেখ আহমদভাই, বিয়ে আমি আর করব না। যে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান কোরোজি ওদের মেয়েদের মধ্যে, তার এক কন্স দিয়েও এখন কেউ আমাকে সার্থক

করতে পারবে না।

আহমদ। (সংশেষে) তাই অতি-আধুনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত করে সাগরপারের নির্দেশ নারী-সংগম্পৃহাটিকে সাবলীল রাখতে চাও? নয় কি? (স-নিশ্বাসে) যাক, রিজিয়া সম্বন্ধে তোমার শেষ মত জানতে চাই।

রশিদ। (স্বধাভরে) তার স্ত্রী ত অস্বীকার করছি না, তবে পদারি অস্বীকারে যে মানুষ, সঙ্গিনী হিসাবে সে অনেকটা অচল—

আহমদ। রশিদ, তুমি রিজিয়াকে দেখ নি পর্যন্ত। শব্দে 'আখত' হয়েছিল, বিলাত যাওয়ার তাড়াহুড়োয় শব্দ-দৃষ্টিটা পর্যন্ত হয় নি। (মিনতিভরে) তুমি একবার নিজেই যাচাই করে দেখ না আধুনিক সাহিত্য ও



দেখুন ত স্যার, এইটাকে আপনার চেহারা দেখা যায় কি?

জীবন সম্বন্ধে সে কিরূপ সজ্ঞান? She can play the girl of to-morrow if you choose so, তার সম্পূর্ণ শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছে সেইভাবে—

রশিদ। Well, one of the earth is worth a dozen girls of theory.

আহমদ। রিজিয়া বলে, "খোদা সহজেই না দিলেন যদি, তবে জবরদস্তির বিড়ম্বনা থেকেও তিনি রক্ষা করুন।" তাই তোমার রক্ষা। নইলে, (কঠিনস্বরে) তোমার পক্ষী-রাজ মনটার বলগা টেনে খাঁশিমত চালাতে পারি, তা জান?

রশিদ। হাঁ, তা জানি, কাবিনের সত্য দিয়ে।

আহমদ। Fine. স্মরণশক্তিটা প্রথরই রেখেছ, দেখাচ্ছি। আঁস তা'হলে। কি বলব? (ভাণ্ডা-সহকারে) Ta-Ta na Cheerio.

[হাস্য ও প্রস্থান]

কোরাল। (নেপথ্যে) আসতে পারি, স্যার?

রশিদ। আসুন।

[কোরালের প্রবেশ]

কোরাল। ইন্টারভিউর বাকি কাজ আজই শেষ করে দেবী যাক।

রশিদ। আচ্ছা থাক। আমার মনটা বেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখুন ইন্টারভিউর তারিখ দু'সপ্তাহ পরে দিন।

[স্টেজ গ্রিপ সেকেন্ড অঙ্ককার থাকলো, কিছু সময় অজিবাহিত হয়ে গেল তাই প্রকাশ করতে। আলোবিকাশের পর দেখা গেল রশিদ ও কোরাল ফাইল দেখছে। রশিদ কলিং বেল টিপল।]

জাহির। হুজুর।

[জাহিরের প্রবেশ]

রশিদ। দরখাস্ত করণেওরালি আওর কোই বাকি হয়?

জাহির। জি নহি।

রশিদ। আচ্ছা, তোম' যাও।

[জাহিরের প্রস্থান]

কোরাল। সবার ইন্টারভিউ ত শেষ হয়ে গেল।

এখন মন কিছু স্থির করতে পারলেন, স্যার?

রশিদ। এই ত আপনাদের সব মেয়ে। এতগুলি বি-এ, এম-এ! কিন্তু মনে হয় মানসিক তীক্ষ্ণতা ও জীবনের প্রাচুর্য এদের মধ্যে তেমন marked নয়। আপনিও ত আধুনিকার একটা তালিকা দিরোছিলেন? কেউ ত তেমন উত্তরাতে পারলেন না। ব্যাখ্যা আপনার নাম পরিবর্তন করেছিলাম, কোরালবাবু। আপনার পছন্দ দেখছি সেই মাফ্যাতার আমলেই পড়ে আছে।

কোরাল। বলেন কি স্যার। মেয়েদের বেসব টাইপ ইনভারসিটি জীবনে বন্দনা পেয়েছেন, তারা সবাই আমার লিফটে বন্দিনী ছিলেন। রশিদ। নারীপ্রগতি, মানে 'নারী রোশনী'র খোঁজ রেখেছিলেন বহুকাল?

কোরাল। হ্যাঁ—

টাক-প্রশস্তিই বাদ সাধল।

রশিদ। (সহাস্যে) সে কি রকম?

কোরাল। দেখুন ত স্যার, এই টাকে আপনার চেহারা দেখা যায় কি?

মস্তক নত করণ ও ঘুরিয়ে দেখান। রশিদ। না। দেখি দেখি ভাব হয় বটে, কিন্তু দেখা যায় না।

কোরাল। যায় না ত? কিন্তু প্রগতিপরায়াস বলতেন, এই টাকটা নাকি আশির মত। বায়না ধরতেন, "মাথাটা একটু নীচু করুন না! খোঁপাটা ঠিক করে নিই।" কিম্বা কেউ ধাঁ করে মাথা নুইয়ে তাঁর মুখের সম্মুখে নিয়ে সন্তুষ্টভাবে বলতেন, "শাক, লিপ-পেণ্টটা লেপটে যায় নি।" এইরূপ চলন্ত জেনিং টেবিলরূপী হয়ে তাঁদের সমাজ আমার পূর্বোক্তার সচ্ছল গতি হয়ে উঠল, সময় বিশেষে, Spanish Tango ও সময় বিশেষে স্নায়বোশী নৃত্য।

[দুটো নাচেরই আভাস হস্তের সামান্য চম্পায়ে প্রকাশিত হল]

যে আমাতে তারা পেত ইন্টরেক্ট, সেই আমি হয়ে উঠলাম ইন্টরেক্টেণ্ট।

রশিদ। (হেসে) শেষে পালিয়ে বর্তিলেন?



রমিলা

লৌপসর্গ চর্চার

প্রিফেক্ট সাবান ব্যবহার করেন।

মুখশ্রী স্কুলের মেয়ের মত অটুট রাখার
সবচেয়ে সোজা উপায় "প্রিফেক্ট" সাবান মাখা।
ইহাতে আপনার ত্বক নিজস্ব কমনীয়তায়
সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধভাগিত হইয়া উঠিবে।

রমিলা

খ্যাতনামা চলচ্চিত্র

অভিনেত্রী

ঘনীভূত উল্লেখ

তেল হইতে

প্রস্তুত।

মোদী সোপ ওয়াক্স

মোদীনগর, বেগমাবাদ, ইউ পি

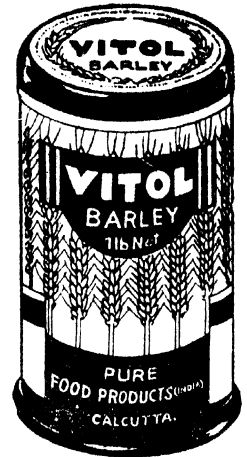
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: রায় বাহাদুর গঙ্গাজল মোদী।



জাতীয় স্বাস্থ্য গঠনে—

ভাইটল বার্লি

একমাত্র উপযোগী



পিওর ফুড প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া)

৮১নং সিকদারবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা।



বিশুদ্ধ স্বর্ণের
সুন্দর অলংকার
নির্মণেই আমাদের
বৈশিষ্ট্য।

স্থাপিত—১৯৫১

ডি, এন, চৌধুরী

এও কোং

জুয়েলার্স

সান্ অফ

এম, এস, চৌধুরী

১০২, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা।

GANESH

Brand
MUSTARD OIL

CONTROLLED RATES

বিশুদ্ধতার নিদর্শন গবর্ণমেন্টের
"আগমার্ক" শীল দিয়া বিক্রীত
হয়।বাজারে ছাড়ার পূর্বে প্রত্যেকটি টিন
কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়। ৫ সের ও
২৫ সেরের টিনেরও পাওয়া যায়।

PRAG OIL MILLS DEPOT

খান্ড রোড ১নং জেট্টী, কলিকাতা এবং খুলনা

ফোন—ক্যাল ১৬৩

কোরাল। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।
রশিদ। যাক্, এখন দেখুন ত লিস্টটা। কে
কিরূপ নম্বর পেলেন?

উত্তরের নিজ নিজ ফাইল দর্শন।
কোরাল। এই ত, Top করছেন মিস্ চিত্রাঙ্গদা
সেন।

রশিদ। বাপরে! নামটা কি জবরজগৎ। ওই নাম
বহন করে আধুনিকার মাপকাঠিতে কারও
উদ্ভূতগামী হওয়া অসম্ভব।

কোরাল। না স্যার, এমন কথা বলবেন না।
কলেজে উনি ছিলেন মিস্ চিত্রা, তম্বী
ভরুণী। ছেলেদের মধ্যে শুনোছি, ওর
চায়ের উচ্চারণের উপর নির্ভর করত বহু

স্বী-ট্রা

[ভয়ানকভাবে খুঁসি হয়ে]
এই! এমন একটি শব্দ হত। তার নামের
সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য চলত ছাত্রদের
মধ্যে Phonetics-এর কসরৎ। সেই যে
সি-সি-স্বীট্রা এখন হয়েছেন চিত্রা-ঙ্গদা,
কেন জানেন?

রশিদ। (সহাস্যে) না, কেন?

কোরাল। সেই তম্বগণী শব্দের মধ্যে ছাই দিয়ে
ভিত্তিমিন পণ্ডে হয়েছেন। কাজেই,
পূর্বেকার অঙ্গদা জড়িত হয়ে নামটি দেহের
ব্যালেন্স রক্ষা করছে, স্যার! (হাস্য)



তবে কেন এমন মনে হাচ্ছিল বলতে পারেন?

ছেলের আধুনিকতা। ডাক্তার মুসলিমের
নাম ত জানেন? ওর 'চটা' তাঁর নামের
শ্বিতীয় সয়ের উচ্চারণে—

[কঠিন উচ্চারণকে আয়ত্তে করার চেষ্টা ভঙ্গীতে।

সিট্রা—

shrug করে—

হ'ল না

উচ্চতর ভাবে]

শ্বিট্রা

[মাথা নেড়ে]

উ—

রশিদ। আপনার সি-সি-স্বীট্রা top করেছেন
বটে, কিন্তু টপকাতে পারেন নি? কুড়িতে
এগার নম্বর পেয়েছেন, বার ছিল quali-
fying mark, তাই নয় কি?

কোরাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[কাঁপে ডুবন্ত অবস্থায়]
রশিদ। ওর পরে হচ্ছেন—মিস্—মিস্—

[নাম বক্রতে অপারগ, বানানে
উচ্চারণ-প্রচেষ্টা—]

T-O-W-E-I, টাওয়ার! টাওয়ার! টাম্বার
প্যালিটে—

[প্রবল-প্রচেষ্টায়]

[পুনরায় উচ্চারণ—]

Miss Towei Tumber Palitte—

[মনের মত হ'ল না; মাথা বেড়ে]
নাম; নামটার acoustics ভুলে গেলার
যেন! শুনোছিলাম ত candidate-এর কাছ
থেকে, দেখুন ত উচ্চারণে কীনা?

কোরাল। [বানান করে] P-A-L-I-T-T-E:
প্যালিটে! [চিন্তাভ্রান্তভাবে] কোন
মেয়েটি? —which girl? —[হঠাৎ]

ওহ্ হো! উনি মিস্ টইটুম্বুর প্যালিত!
রশিদ। টইটুম্বুর প্যালিত! Gosh! নামটা
কি outrageously modern! টইটুম্বুর—

—tiptop! আচ্ছা, উনি প্যালিত লিখতে
শেখে! E দিয়েছেন কেন?

কোরাল। ওটা বুদ্ধলেন না স্যার, ডাক্টে—
গোটে—প্যালিটে—সম গোষ্ঠী বলে মনে
হয় না কি? ছোট্ট একটা E কিন্তু দেখুন
দিয়ে কিরূপ একটা continental
touch? আবার পুরাণ পন্থায় চলতে চান,
সো ডি আচ্ছা, প্যালিত কন্যাকে স্ত্রীয়া
'ঈপ' করে শেষের E-টাই ঈ-কারের সামিল
করুন।

রশিদ। [হেসে] তা' কেমন করে হয়?
প্যালিতের স্ত্রীলিঙ্গে 'আপ' হবে ভ?
প্যালিতা?

কোরাল। না, না, স্যার! [প্রচণ্ডভাবে জিভ
কাটলে] প্যালিত—রক্ষিত, একই অর্থ।
আ'কার যুক্ত হলে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়
বটে, কিন্তু 'স্ত্রী' থাকে না। রক্ষিতকে
try করে দেখুন না। বড় disconcerting!
[উত্তরের মন-খোলা হাসি]

রশিদ। আচ্ছা এর পর কে কে কবান
পেয়েছেন?

কোরাল। মিস্ রোকেরা খাতুন ও মিস্ জিন্দ
এলজেড, এন, সি।

রশিদ। এন, সি আবার কি?

কোরাল। কেন? নেটিভ খুঁটান।

রশিদ। ও, তা হলে একেবারে Cosmopolitan
Collection হয়েছে দেখছি।

কোরাল। হ্যাঁ, স্যার। আর মিস রোকেরা হ'ল
সেই ব'ব'ড্ চুল মেয়েটি। ওর নম্বরটা
কিছু বেশী হওয়া উচিত ছিল। যা হোক
ব'ব'ড্ চুল ত?

রশিদ। কোরালবাবু, ব'ব'ড্-চুল দেখে কিছ
আশাও হয়েছিল, মনে করেছিলাম এতদিনে
মুসলিম মেয়েরা ব'ব'ড্ অগ্রগতিতে অংশ
গ্রহণ করল। ও খোদা! বললেন, মাথার
উকুন হয়েছিল বলে আঁশ করে ব'ব'ড্
কেটে তার হাত থেকে পরিচাপ পেয়েছেন।
Phooh! নম্বর ঘাট করে কেটে দিচ্ছিলাম
আর কি? কিন্তু আধুনিকার awful
frankness-এর জন্যই অত নম্বর পেয়ে
গেলেন। সব হোপলেস্।

কোরাল। তাহলে কি ঠিক হ'ল?

রশিদ। কেউ নিষেজ হ'ল না।



**ঘোষ
প্রদীপ
জুয়েলার্স**

১১৪, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা
ব্রাঙ্ক:
ডলপাইণ্ডি
ফোন: বি.বি. ২২৫৯

‘বাংলা ভাষায় রোমান্টিসিস্‌মের নূতন আশ্বাদ’

‘মরণ ও মরু’

১৫০

অপূর্বকুমার মৈত্র

‘পথের শেষে’

১১

অপূর্বকুমার মৈত্র

পাবলিশার্স—দি বুক কোম্পানী লিঃ
কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং ভারতের গোড়া পত্তনে যে প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল অগ্রণী
উহাদের অন্যতম

নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস:
কুমিল্লা

কলিকাতা অফিসসমূহ:
ক্যানিং স্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলেজ স্ট্রীট, শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা—

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, শিলং,
তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী:—ভারতের বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে

সেভিংস ব্যাঙ্ক, চলতি এবং স্থায়ী
আমানতের হিসাবে নিরাপদে টাকা
রাখার ব্যবস্থা আছে।

উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা দান,
ড্রাফট, টি—টি বিক্রয়, বিল ডিসকাউন্ট
প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কিং কার্য
করা হয়।

কোরাল। Then I continue to play the role of the secretary and the P.A.—the beauty and the beast—
রশিদ। Well said, Coral Babu. The beauty and the beast. [হাস্য]

[জাহিরের প্রবেশ]
জাহির। হুজুর, একটো মিস-বাবা আয়ী—
রশিদ। মিসবাবা কিরে? গাউন পরে এসেছেন?

জাহির। জি নহি, বহত খাবসুরত আওর জুতাকা হিল বহত উঁচা।

রশিদ। ক্যা, এহি দোয়াত কা মাফিক—

জাহির। উওহ্ ত উছকা আখাই হোয়েগা, হুজুর।

রশিদ। [মিমত মুখে কোরালকে] দেখুন ত আশা-প্রদ মনে হচ্ছে—
কোরাল। এই যাচ্ছি।

[কোরালের হাস্য ও প্রশংসা]
রশিদ। জাহির মিয়া?

জাহির। জি হুজুর।

রশিদ। আনেকা ওকত্ তোমানে দেখা? কেয়ছা আয়ী?

জাহির। জি হা হুজুর দেখা, বহত ঠাট ছে আয়ী।

রশিদ। হম।

[একখানা Visiting Card নিয়ে কোরালের প্রবেশ]
কোরাল। এই কার্ড দিয়েছেন, উনিও একজন candidate.

রশিদ। দেখি, [কার্ড নিয়ে পড়ে] এ কি নাম লিখেছেন? Lady of the Park? মানে কিছু বুঝলেন?

কোরাল। না ত!

রশিদ। দেখতে সুন্দর?

কোরাল। Exquisitely, তুলনা হয় না।

রশিদ। বেশ ডাকুন।

[কোরালের প্রশংসা]
রশিদ। জাহির!

জাহির। হুজুর।

রশিদ। মেম সাহাব কোন 'বার্ভাচিত' করেছে তোমার সংগে—

জাহির। জি হুজুর, থোড়া বহত কিয়া। পছা, "তোমার সাহেব কা সাদি হইচে—"

রশিদ। সে কি, প্রথমেই বিয়ের কথা? তা' কি বল্লো তুমি?

জাহির। বোলা, নোহি হয়।

রশিদ। 'নোহি হয়'! হয় নাই বললে কেন?

জাহির। ক্যা জানে, মনসে বোলা কহনা ঠিক নোহি হোয়া—

রশিদ। তুমি ত দেখি গোড়ায়ই গেরো ফেলবার বন্দোবস্ত করেছে।

[নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করে]
এই যে আসছেন, হ্যাঁ সুন্দরই বটে—

[কোরালের পশ্চাতে Lady of the Parkের প্রবেশ]
L of P. Good morning.

রশিদ। Good morning. [হস্ত প্রসারিত করে] এই নিন হাত, shake করতে কোন আপত্তি নেই ত?

L of P. Not at all.

[হাত এগিয়ে দিল করমন্দের জন্য, রশিদের হাতে হাত রয়েই গেল]

রশিদ। How do you do?

L of P. How do you do?

রশিদ। আচ্ছা, এবার বসুন—

L of P. হাতটা ছেড়ে দিলে বসতে পারি।

[হাস্য]
রশিদ। Oh, I see হাতখানা আমার হাতে বন্দী হয়ে আছে দেখছি, মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পরিচয়।

[হস্তমোচন, বসতে বসতে]
আপনাকে দেখেছি কিম্বা কোন আলাপ

থাকতে পারে যুগযুগান্তরের—ঠিক সিনেমার flash back-এর মত—

রশিদ। [মৌহিতভাবে] সুস্ব-বিচার শক্তি আপনার চমৎকার দেখছি—

L of P. না চমৎকার কিছই না। নানা চিন্তায়, নানা কল্পনায় সেক্টোরীর একটা স্বরূপ আপনি মানস-চক্রে দাঁড় করিয়েছিলেন ত? আমাকে দেখে সেটা অনেকটা visualised হয়ে গেল, তাই এত পরিচিত লাগছিল।

রশিদ। হবেও বা। কিন্তু তার অতীত মনে হচ্ছিল কিছই। আপনার নামটা ত এখনও জানতে পারি নি—

L of P. ওই Lady of the Park. দেখুন Emille Zola-র লেখা পড়ার পূর্বেও আমার মনে হত যে নামটা মানুষকে অনেকটা প্রেক্ষাদিস করে দেয়। কাজেই পরিচয়ের প্রথমেই নাম দিয়ে একটা অনু-কূল Balance Sheet খোলা আমি সমীচীন মনে করি না। পাক' সাক'সএ থাকি শূন্য, তাই প্রকাশ করছি ঐ কার্ডটা—

রশিদ। আপনি ত দরখাস্তও করেন নি?

L of P. দরখাস্তের নিখাত আশ্চর্যতর জঞ্জাল টেলে, পাঁচ মিনিটে, আমার সত্যিকার রূপ উদ্ভার চলত কি? বরষ এই ইঠাৎ পরিচয়ের back ground-এ কথার ফাঁকে, আমার একটা হালকা মিঠে ছবি রূপায়িত হওয়া সম্ভব, নয় কি?

রশিদ। রাষ্ট্র ও! আপনার পড়াশুনা ভালই দেখছি—

L of P. আপনার বিচার শক্তি প্রশংসাহী।

রশিদ। কোরালবাবু।

কোরাল। আজ্ঞে স্যার।

L of P. ও ও'র নাম বুঝি প্রবাল বাবু?

রশিদ। হ্যাঁ, আমার P.A., ওর আসল নাম জানলেন কি করে?

L of P. বাবু! প্রবালের handy ইংরেজী কোরাল রয়েছে যে,—আর আপনার পাশ্চাত্য প্রীতি কারও অবিদিত নেই।

রশিদ। You are really brilliant

[হাস্য] ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু নাম পরি-বর্তন করেও ত ও'কে 'মডার্ন' করা গেল না।

L of P. না না বলেন কি? আমার নস্মখে গিয়ে এত নিখুঁতভাবে bow করলেন, যে আমার লক্কেটা ভীর মাথার স্থান বিশেষে সোনালী আভাষ ঝলসে ওঠায় মনে হ'ল, "ইঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝঞ্জাল করে চিত্ত—"

রশিদ। বিউটি! নিন কোরালবাবু, You are reclaimed. আপনার টাকটায়ও শেষ পর্যন্ত গতি হতে চলল। একে সেক্টোরী রাখলে আপনার পালাতে হবে না, ত?

কোরাল। না স্যার, একে ত আমাদের ভালই লাগতে, লাগতে না কি?

রশিদ। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

কোরাল। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—



রশিদের সন্ধে হাত রাখলো।

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ

১নং কে, জে,

পল্লিমল্লন নম্ব্য

মাদ্রাজী কড়া "র" নম্ব্য

গোল্ডেন স্পেন্স ল কড়া "র" নম্ব্য
"আর, বি"

রোজ ও জেসমীন নম্ব্য

গন্ধে, গন্ধে, বিশুদ্ধতায় অতুলনীয়

মহীশূরের সুবিখ্যাত

প্রীতীরামকৃষ্ণ মার্কা

সুগন্ধি পারিজাত ধূপ

অতুলনীয়, সমুদ্রের গন্ধ-সৌরভে তৃপ্তিদায়ক
পাইকারী ও খুচরা ভিঃ পিঃ পাইবার
বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান

সুশীলকুমার পাল

এও ব্রাদার

নম্ব্য, ধূপ ও মনিহারীরা

পাইকারী বিক্রেতা—

গ্রাণ্ড—৬৯।৪৪ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

হেড অফিস—

১৩-৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

এ, কে, নাগের

অনন্তশক্তি

সালমা

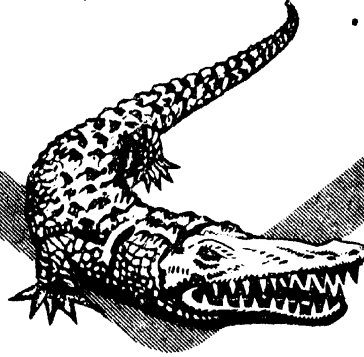
বাত, বেদনা ও রক্তদুষ্টির
মহৌষধ।

বাজারে প্রচলিত সালসাসমূহের মধ্যে বহু-
শরীকিত প্রভেদ ঐযথ। শরীরস্থ দূষিত রক্ত
বিশুদ্ধ করিয়া দেহে নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টি
করে। বাহ্যিক দীর্ঘদিন বাত বেদনায় ভুগিয়া
চলন্তাঙ্গীন হইয়াছেন বা মেহঘটিত দীর্ঘদিনের
বাত, হাত-পা ফোলা, গাট কন্ কন্ করা যত
রক্ত উপসর্গ থাকুক—ইহা ধ্বংসকারি মাত
কাব্যকরী। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক, ক্ধা-
বৃদ্ধিকর ও বলকারক ঐযথ। কখন ও ভ্রম-
ব্ধাশ্রয় পরম বস্তু। সকল ঋতুতে গ্রহণীয়।

সর্বত্র এজেন্ট ও ষ্টকিস্ট চাই

অফিস—৬০/১, ওয়েলিংটন স্ট্রীট,
কলিকাতা।

এই মার্কাটীর উশুর নজর রাখবেন



একবার জুড়লে আর ছাড়েনা

গ্রিপেক্স অফিস পেট ও লিক্‌উইড গ্যাম ব্যবহার করে যারা
সম্ভব হয়েছে, তারা নিশ্চয় জেনে খুশী হবেন যে এই গঁদের প্রস্তুত-
কারকেরা এখন নানাবিধ অফিস স্টেশনারী তৈরী করতে শুরু করে-
ছেন। এঁদের তৈরী ফাউন্টেন পেনের কালি, অফিস ফাইল
ইত্যাদির উপর কুমীর-মার্কাটিই এঁদের বিখ্যাত গঁদের সমতুল্য
উৎকৃষ্টতার পরিচয়-চিহ্নস্বরূপ।

গরুহীন-তাড়াতাড়ি জোড়ে

গ্রিপেক্স

ইন্ডিয়ান গ্রাউ

অফিস পেট এবং লিক্‌উইড গ্যাম

গ্রিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

সি ৬, রাইড বিল্ডিং, কলিকাতা

টেলিফোন ক্যালকুলা ৪৫২৯

কম্পকর্মী : ১২, ডাফার রোড, কলিকাতা

কোরাল। আর আপনারও যখন লাগছে, স্যার—
রশিদ। Lady of the Park আপনি

নিযুক্ত হলেন।

L of P. Thank you.

রশিদ। জিহর, তোমার মিসবাবাকে শেষ
পর্যন্ত রাখা গেল। ভাল করে খেদমত
করবে, বুঝেছে?

জিহর। জি হাঁ, হুজুর! মেমসাহাব বহত
আচ্ছা হায়—

উচ্চা হিল, দরজা দিল,
আছে ঠাট, মিঠি বাত,
খোড়া হো ত উনিশ বিশ
সব মেটাটা বকশিশ।

রশিদ। ও ব্যাটা প্রায়ই শ্লোক আওড়ায় মিস্
পার্ক।

L of P. আপনি Woodhouse-এর
Jeeves-এর একটি ভারতীয় সংস্করণ
জুটিয়েছেন দেখছি। [হাস্য]

রশিদ। [সহাসে] Jeeves, There you
are. ও আমার প্রায়ই তাই। ওর শ্লোকের
শেষের অংশের মানে—আপনার কাছে
বকশিশ আশা করছে—

L of P. আজ্ঞে না, মানে বকশিশ ভাল রকম
আগেই পেয়ে গেছে। I am English in
that sense. [হাস্য]

রশিদ। [সম্মত] তাই ত দেখছি, প্রথমে tip

দেয়াটা ইংরেজী মতে যে অতীব কার্যকরী,
তা' আপনিই দেখালেন। ও আপনার
সম্বোধে, তাই, সন্মুখায় পশুপদ হয়ে
উঠেছিল।

কোরাল। স্যার বিজ্ঞাপনের শেষাংশে দৃষ্টি
আকর্ষণ অবান্তর হবে কি?

[মস্তক ক'তুরন]

রশিদ। তা,—তা থাক্। নিযুক্ত যখন হয়েই
গেছেন—তখন—

L of P. বিজ্ঞাপনের শেষাংশে? ও, ঐ
গানের কথা—বেশ, তাহলে মিষ্টার রশিদ
অনুমতি দেবেন কি?

রশিদ। বিলম্ব, অনুমতি দেব না? নিশ্চয়ই—
নিশ্চয়ই—

L of P. গান

আজকে তুমি পেলে দেখা

পথের বাঁকে,

হে প্রিয় মোর, দেখলে তাকে,

চিনলে না কে?

কণ্ঠ ভরা গান যা ছিল

অঞ্জলি তার নিবোধিল,

রত্তরগে রাগিয়ে নিল

সুন্দর তার, কল্পনাকে।

[সকলের প্রস্থান]

[স্টেজ এক মিনিট খালি পড়ে থাকল, তিন মাস
অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই বোঝানোর জন্য।]

রশিদ। Miss Park, তোমাকে আমি Lady
of the Park-এর পরিবর্তে 'মিলেডি'
কিন্ধা আরও ছোট করে 'মিল' বলে
ডাকব। তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

L of P. না, ডাকায় আমার আপত্তি থাকবে
কেন? 'মিলেডি'—অর্থাৎ My
Lady ত? তাহলে সে হল আপনার
নিজস্ব কল্পনা-সুন্দরী। আপনার সঙ্গে
টারী সম্বন্ধে যে কল্পনা তা' যদি আমাতে
মুতিমতী হয়ে থাকে, তবে আপনার
'মিলেডি' ডাক নিশ্চয়ই আমাকে সার্থক
করবে।

রশিদ। না, না, আমি তোমাকে দিতে চাই যে
সহজরূপ, তাকে তুমি করতে চাও অপরূপ।
পড়ে, 'শা-জাহান':

"জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে

প্রেরণীরে

যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে

সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে

এইখানে

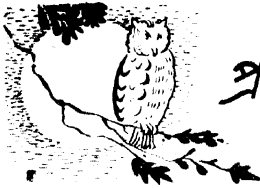
অনন্তের কানে"—

এ সেই নাম, এ সেই ডাক।

L of P. [সম্মত] আপনি প্রথমদিন যে
প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন, তাতে ত এরূপ
ডাকের অবকাশ ছিল না।

রশিদ। কিন্তু ডাকটা যে আমার জীবনে সত্য
হয়ে উঠবে তাকি আমিই বুঝতে
পেরেছিলাম?

L of P. কেন বুঝতে পারবেন না? আমার
সম্পর্কে, জ্যোৎস্নার ভলে ডাঙ্গা ঢেউগুলি,



প্রাক্তজনের জন্য কয়েকটি তত্ত্ব

১৯২১ সালে : বাঙ্গলাদেশে যখন বন্ধকী ও দাদনী কারবারকেই ভাল
কথায় ব্যাংকিং বলা হইত—বাঙ্গলার ব্যাংক যখন
শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই, তখন বাঙ্গলার
অধিবাসীদিগকে বাণিজ্যগত ধারায় ক্রমোন্নতিমূলক
ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সুবিধাদানকল্পেই ইন্টবেংকাল
কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৩০ সালে : বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি অভিমত প্রকাশ
করেন :—“জমিদারী ও তেজদারী কারবার প্রভৃতির সঙ্গে
সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবসায় চালানোর পুরাতন প্রথা অধুনা
ক্রমশঃ ত্যাগ করা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,
কলিকাতায় বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী পরিচালিত অধিকাংশ
প্রতিষ্ঠানই কলিকাতার গৃহসম্পত্তির বিনিময়ে টাক দান
কারিয়া থাকে। কিন্তু এমন কয়েকটি ব্যাংকও আছে
যাহারা বন্ধক ব্যাপারে দাদনের অপ্রাংশ মাইই শব্দ
বিনিয়োগ করেন। এমন কি মফস্বলে পর্যন্তও বন্ধকী
কারবার করেন না, এমন প্রতিষ্ঠান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ
বলা মাইতে পারে যে ইন্টবেংকাল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
(হেড অফিস ময়মনসিংহ) শব্দ নামে নয় কার্যেও একটি
কমার্শিয়াল ব্যাংক। ইহা ব্যবসা বাণিজ্যের পূর্জি
জোগানোর ব্যাপারে নতুন পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

১৯৪৪ সালে : “ব্যবসা বাণিজ্যের পূর্জি জোগানোর নতুন পথ প্রদর্শন
করার” পর হইতে এই ব্যাংক আজ পর্যন্ত বহুসংখ্যক
জাতীয় শিক্ষাব্যবসায়কে পূর্জি জোগাইয়া আসিয়াছে এবং
আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায় বিশেষ অভিজ্ঞ ইহার পরিচালক-
মণ্ডলী চিরদিনের মত আজও আপনাদের সেবার
নিয়োজিত।

দ্রি

ইন্ট বেংকাল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ

হেড অফিস—ময়মনসিংহ, কলিকাতা অফিস—১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট

Carbon Compound-এর না হয়ে ও আপনার কাছে হীরক বলে মনে হয় নি কি? গভীর রাতে কিংকির ডাক Rolls Royce Machine-এর revetting-এর মত আপনার কাছে মিষ্টি লেগেছে, জলে ডোবা ঘাসের ও সিক্ত ধুলোর মিষ্টি গন্ধ, পেট্রল ও মবিলের সুবুদ ঘ্রাণের মত আপনার প্রাণে আবেশ চলেছে। কল ও কম্পনা একছা হয়েছিল আপনার মনে। ওরূপ একটা ডাক আসি আসি করছে আপনার জীবনে, এতেও কি তা' বুঝতে পারেন নি?

রশিদ। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মিলি।
L of P. ঠাট্টা নয় মিষ্টার রশিদ! [সুড় বিদ্রূপের স্বরে] তবে অনুভূতিটা একটু দ্রুত হয়ে গেল—বিসদৃশ অল্প সময়ের মধ্যে কিনা? তাই—

রশিদ। তুমি কি বলতে চাও যে স্বপ্ন এসেছে বলে এ সত্যিকার নয়—

L of P. সত্যিকার বলেই ত ভয় বেশী। যে ডাক দ্রুত আসে, জীবনে নিত্য নরনারী সান্নিধ্য, তার ত একাধিকবারই আসবার কথা।

রশিদ। তুমি কি মনে কর আমি সেই পদার্থ? L of P. লীলাময় পুরুষেরা ত জানি একই মাটির তৈরী।

রশিদ। [গম্ভীরভাবে] Miss Park, যথেষ্ট হয়েছে, বাস্। আপনি আমার মধ্যে আর কোন দুর্বলতা দেখতে পাবেন না—

L of P. আপনি রেগে গেলেন মিষ্টার রশিদ? [গাড়ি স্বরে] আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, অনেক ঠেকে এ কথা বলছি, যদি জানতেন—

রশিদ। খুব জানি। গাড়ি কাটার সময় থেকে, ফুলে ফুলে উড়ে ফেরার সময় পর্যন্ত, প্রজাপতির বিচিত্র জীবনের ইতিহাস আমার অজানা নাই—

L of P. [সংক্ষেপে] আপনি অথবা রুড় ব্যবহার করছেন—

রশিদ। তাই, আপনার—আপনাদের প্রাপ্য—

L of P. [উজ্জ্বল হয়ে] আপনি না বিলেতের শিক্ষার বাহাদুর করেন? একটি মেয়ের মন অনেকটা জানতে পেরে, তারই উপর অথবা ক্রেশ দেয়ার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে আজও আপনি শেখেন নি! এমনি করে

আমাকে দেখাচ্ছেন—কী করছি আপনার! রশিদ। [গাড়ি স্বরে] মিলি।
L of P. বলুন।

রশিদ। দেখছি, আমার ভুল হয়েছিল। আমি তিক ধরতে পেরেছি, যে রঙের খেলা আমার আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করেছে তার ছোঁয়া তোমারও লেগেছে। নয় কি? L of P. কিন্তু আমাদের, আধুনিক আধুনিকাদের মনে এর অরুণিমা ত ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা।

রশিদ। হোক ক্ষণস্থায়ী, তবু ত প্রকাশ করবে, জীবনে অন্ততঃ একবার চাওয়ার মধ্যে জীবনের দৃষ্টি বদল হয়ে জীবনটাকে রংগীন করেছিল:

“নিজের গানের বাঁধিয়া ধীরে
চাহে যেন বাঁধী মম,
উত্তলা পাগল সম।

যারে বাঁধি ধরে, তার মাঝে অীর
রাগিনী খুঁজিয়া পাই না।

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।”

তোমার মূখের বাণীতে, আমার বাঞ্ছিত রাগিনী ক্ষণেকের জন্যও যদি স্বপ্নের নিয়ে ওঠে, তবে সেই ক্ষণটাই, আমার জীবনে হবে, অনন্ত।

L of P. বেশত, বাণী না হয় প্রকাশ করল: আপনার মনে যে রঙের পরশ তা আমাকেও ছুঁয়েছে। কিছু যাবে আসবে তাতে?

রশিদ। সে যতিয়ান আমি করব না। এই জানাটাই আজ আমার চরম বিত্ত। জীবনে হয়ত তুমি অনেক দান করেছ, কিন্তু আজও তোমার সব চাইতে বড় কাগলালী-বিদায় হয়ে গেল, মিলি।

[রশিদ ও L of P. প্রস্থান]
[কোরালের প্রবেশ, একটু পরে রশিদের প্রবেশ]

রশিদ। বলুন ত? আজ কোন কবিতা আবৃত্তি করতে মন চায়?

কোরাল। স্যার, এই:

“এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।”

রশিদ। দাত, বলা ত হয়েই গেছে, জীবনের সংগীনী হতে সে ত রাজিই হয়েছে। শুনুন মনের কথা:

“হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।”

কোরালবাবু, সত্যিকার দরদীর দেখা পেলাম এতদিনে।

কোরাল। মিনার মরুদ্যান আঁকা একটা সোনার সিগ্রেট-কেস কিনেছেন উনি, পরশু।

রশিদ। হ্যাঁ, ও উপহার দেবে ও জীবন সাহায্য যে মরুদ্যান সৃষ্ণের সাহায্য করেছে তাকে—

কোরাল। অর্থাৎ আপনাকে, স্যার। কিন্তু আজও ত আপনার কাছে দেখছি না সেটা?



নারীদেহের লাভগোর
তরল মহিমায় উচ্ছল
আবেগ আনে দয়া-
রামের শাড়ী। বর্ণ
ও ডিজাইনের প্রাচুর্যে
দয়ারাম আনে আধু-
নিক রুচির নতুন
সৌন্দর্য সুষমা.....

**দয়ারামের
শাড়ী**

**KING
OF
SAREES**

DAYARAM & Co
NEW MARKET · CALCUTTA

● AMINABAD PARK - LUCKNOW · THE MALL - MUSSOORIE



আধুনিক অভিজাত্য ঠিক বজায় রাখিতে গেলে রূপসজ্জার প্রয়োজন টুকুর সঙ্গে সঙ্গে দেহসজ্জাকেও স্বীকার করিতে হইবে। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাদের চির আদরের বস্তু

বেনারসী শাড়ী
বিভিন্ন বর্ণ, বিচিত্র ডিজাইন ও হাল ফ্যাসানের অক্ষরভূত ভাণ্ডার



ছাপাশাড়ী • ক্রেপ,
ব্রাকেড, কিংক্রাপ
• ব্যাসালোর

ইণ্ডিয়ান সিল্ক টেক্সটাইল

স্থাপিত ১৯২৪

৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট • টেলিফোন-বি.বি.৩১৬৪

রশিদ। [মায়ামিন্থ স্বরে] আপনি বস্তু বেসবুদ। তার প্রথম দানের লক্ষ্যটাকে জয় করে নৈয়ার সমস্তও ত দিতে হবে তাকে? কোরাল। আচ্ছা, মিস পাকের সব সংবাদ পেয়েছেন কি?

রশিদ। না, তবে ও বগেছে, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয় এরূপ কিছু তার জীবনে নেই। বিবাহের পূর্বে সে সব প্রকাশ করবে, কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কেবল।

কোরাল। আশ্চর্য মেয়ে, স্যার!

রশিদ। আর দেখুন, চমৎকার চিত্রশাস্ত্র। বলে, বিবাহ যদি না হয়, তবে তার নামের ও পারিচয়ের গলি বেয়ে দুর্নাম আর তাকে পেঁছতে পারবে না। তার এই জীবন নাটকের যবনিকা যদি এখানেই পড়ে তবে একে বড় জোর একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে; স্বপ্নের নায়িকার মত সে থাকবে স্পর্শাতিত।

কোরাল। স্যার, আধুনিকার সঙ্গে নাকি গভীর চিন্তার সংগত হয় না, এ'র বেলায় কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

রশিদ। তাই ত বলি,

“শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস

কলাপের মত করেছে বিকাশ,

আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া

উল্লাসে করে যাচেরে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে

ময়ূরের মত—”

[আহমদের প্রবেশ, রশিদ হঠাৎ থেমে গেলা। আহমদ, হঠাৎ যে। কী ব্যাপার?

আহমদ। রশিদ তোমার হৃদয়ের নাচনীটা একটু সংযত কর ত! ওদিকে রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় আর কি? হৃদয়ের এই ডাউন নর্ডনের উৎস কিহে? — কোরালবাবু, কিছু বলতে পারেন?

কোরাল। আহমদ সাহেব, তবে শুনুন,

[সুর করে]

“সুখ তখন পাটে নামে

রাজার কুমার ভাবছে একা

স্বপন পূরীর রাজ কন্যা

এমন সময় দিলেন দেখা।”

[কাঁবতা আর্দ্রতার চোখে]

অভিসারে চুপে চুপে

অতি-আধুনিকা রূপে!

[দ্রুত কথার মত] কথা পাকাপাকি হয়ে গেল, আসছে মাসে বিবাহ।

রশিদ। আঃ কোরালবাবু, কী যা'তা' বলে যাচ্ছেন—

আহমদ। কে এই রাজকন্যা? তোমার সেক্রেটারী নয় ত?

রশিদ। বেশ ধর, তাই যদি হয়—

আহমদ। তা'হলে বলব ক'মাস পূর্বে রোমান্স ও বিয়ের কথা বলা আমার ভুল হয় নি।

রশিদ। হ্যাঁ ভুল হয়েছিল। বিয়ে করার কথা

অকাল্ট হাউস

মানসিক পীড়া সকল স্ত্রীরোগ ও বৈশিষ্ট্য কঠিন হইলে বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি দত্ত, বি এ, এম ডি এইচ, পি এস ডি (আমেরিকা) মহোদয়কে রোগাবস্থা পরে বিস্তারিত লিখুন বা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞাপন করিয়া রোগ-মুক্ত হউন। সহস্র সহস্র রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে।

মানসিক পীড়া

বাবতীয় মানসিক পীড়া চিকিৎসার অস্বাভাবিক ঔষধ মনে ট্রেনেট আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা দ্বারা সর্ব-প্রকার মানসিক পীড়া যথা নিউরোসিস, অনিদ্রা, মানসীয় উদ্ভ্রম রোগ, হিষ্টেরিয়া, নিশ্চিত আরোগ্য হয়। মগী, মজ্জা, মৈলিশ্য, ভীতি ও শোক, নিদ্রারূপে মনঃপীড়া, নিদ্রাহীনতা এবং স্মৃতিভ্রাস প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মনো প্রাতি শিশি মাসোপযোগী—৬। বিশেষ চিকিৎসার জন্য রোগাবিবরণ ডাঃ পি দত্ত, বি এ, এম ডি এইচ, পি এস ডি (আমেরিকা) মহোদয়কে জানান।

সাক্ষাৎ সময়—প্রাতে ৯টা—১২টা, বিকালে ৪—৫টা।

অকাল্ট হাউস

দ্যান, ম্যাকচারিং কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট
৩নং (আ) ওয়েলসলী স্ট্রীট,
কলিকাতা।

বংশেশ্বরী কটন মিলস লিঃ

আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের অবগতির জন্য বংশেশ্বরীর কাপড়ের কতকগুলি রকমের বর্তমান মূল্যতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা অপেক্ষা উচ্চমূল্যে কাপড় ক্রয় করিবেন না।

কাপড়ের নং	মিলের মূল্য	খচেরা মূল্য
৫নং মিহি ধূতি ৪৫"×১০ গজ	... ৬/০	৭১০
৫১নং মিহি সাড়ী ৪৬"×১১ "	... ৮১/০	১০০
৩৬২নং ধূতি ৪৪"×১০ "	... ৫/০	৬৭০
৫৯২নং " ৪৪"×১০ "	... ৫৬/০	৭০
২২৩২নং " ৪৪"×১০ "	... ৪৬/০	৫৬০
৫৯৬নং সাড়ী ৪৪"×১০ "	... ৭	৮১০
১০৬৪নং " ৪৪"×১০ "	... ৬০/০	৭১০

মিলস :—
শ্রীরামপুর

—হেড, অফিস—
৬৩, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



ভুলে রাখনা

সকল শিক্ষার প্রেরণাতেই লক্ষ্মীর কোটার টাকা ভুলে রাখা প্রথার জন্ম। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সর্বত্রের প্রয়োজন আজ সব চাইতে বেশী। আপনার সজ্জিত টাকা ভাল একটু ব্যাঙ্কে রাখলে দরকার মত তা ত ফিরে পাবেনই আবার তাই দিয়েই জাতীয় শির-বাণিজ্য গড়ে উঠে জাতিকে তথা আপনাকে সমৃদ্ধ করবে। আজ থেকেই কিছু কিছু টাকা ভুলে রাখতে শুরু করুন। আর তোলা টাকা জমা রাখুন চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক।

দি চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রী বংশেশ্বরী রঞ্জন দাস
৩১, হাট স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার তখন মনে হয় নি। এ এল, দেখল,
জয় কল্ল।

আহমদ। [সংশ্লেষে] Congratulation—
জয়ন্তু। রশিদ, বাস্তবিকই তুমি খোদার
অভিনব সৃষ্টি!

[পকেট থেকে কেস বের করে নিজে একটা
সিগ্রেট টোটেস্ব করে স-সিগ্রেট কেস,
রশিদের দিকে হস্তপ্রসারণ]

একটা নেবে কি?

রশিদ। [কেস হাতে নিয়ে সাম্ভর্ষ্যে] এ-কি! এ
সিগ্রেট-কেস তুমি কোথায় পেলে?

আহমদ। কেন? সোনার ধ্বলে মনে হচ্ছে আমি
চুরি করেছি—

রশিদ। না। তা' বলছিনে, তবে—

আহমদ। শোন রশিদ, একজনের জীবন
সাহায্য মরদুদ্যান সৃষ্টি করতে সাহায্য

করেছি এ আমার তারই উপহার। উপরে
মিনার মরদুদ্যান দেখছ না?

[Lady of the Parkএর প্রবেশ]

L of P. মিস্টার রশিদ, আপনার একখানা
পত্র এসেছে, এই নিন।

[পত্র প্রদান, হঠাৎ আবু
আহমদকে দেখে]

আরে! মিস্টার আবু আহমদ যে! রশিদ
সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে,
তাৎ জানতাম না। বেশ হ'ল। মিস্টার
আবু আহমদ, Allenburyতে নতুন
মডেলের একখানা Vauxhall গাড়ি
এসেছে—

[চোরের পিছনে গিয়ে, আপনজনের মত,
স্বল্পে হাত দিলে, আবু আহমদ মুখ তুলে
চাইলে]

[আব্দারের সুরে] চলুন না! দেখবেন
অখন—

আহমদ। আজ আমার ত সময় হবে না,
লক্ষ্যটি! পরে না হয় একদিন তাতে
তোমার সঙ্গে লেক বেড়িয়ে আসব। কেমন?
রশিদ, তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।

রশিদ। আহমদ, আমি আজ ক্লান্ত। আজ না
হয় আমাকে একটু রেহাই দাও।

আহমদ। আচ্ছা, বেশ, তাহলে আমি আসি।
Good day to you all.

[আহমদের প্রস্থান]

L of P. মিস্টার রশিদ, সন্ধ্যা করুন,
আজকের বিরাট প্রোগ্রামটা rush in
করে যেতে হবে যে!

রশিদ। মিলি! আজকে আমাকে একটু একলা
থাকতে দাও। তোমাদের কাছে আমি জোড়-
হাতে ক্ষমা চাই—

L of P. বেশ ত, তাই থাকুন। আমি মিস্টার
আহমদকে একটা লিফট দিতে বলে দিই;
বাড়ি চলে যাই তার সঙ্গে।

[প্রস্থানের উদ্যোগ]

রশিদ। শোন, মিলি, মিলি!

[L of Pএর প্রস্থান]

চলে গেল। যাক্। যোনা! জীবনটাকে নানা-
সূত্রে কী যে এলোমেলো করে দিয়েছে,
তার গ্রন্থিমেচনই আর হ'ল না।
কোরালবাবু!

কোরাল। বলুন, স্যার! [নিঃশ্বাস পড়ল]

রশিদ। কি বলুন, সমন্যখীর বেদনা শুকে
বাজল?

কোরাল। হ্যাঁ, বাজলই ত! যুগপেবতা দেখছি
মানসিক আর নিরাসা রাখলে না, ভ্রম
করে আধুনিকারূপে ছড়িয়ে দিলে সারা
বিশেষ :

“পঞ্চশরে লক্ষ করে কয়েক এ কী সম্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ো।”

রশিদ। দেখুন, একে একটু বুঝিয়ে বলুন
গিয়ে, যাওয়ার আগে শুনতে যায় যেন।

কোরাল। এই যাচ্ছি, স্যার।

[কোরালের প্রস্থান]

রশিদ। কে পত্র লিখলে?

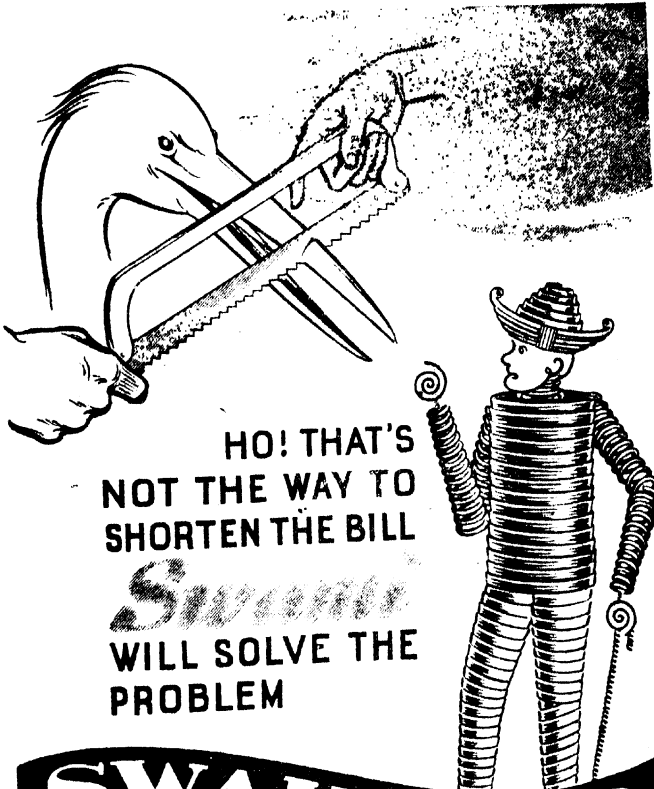
[পত্র খুলে ফেলল, পিছন হতে অদৃশ্যভাবে
এসে L of P চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়াল]

রিজিয়া! রিজিয়া আবার কি লিখলে?

[উচ্চ কণ্ঠে পাঠ]

পরম আরাধ্য আমার!

আমার এ সম্বোধন আপনার মনকে
আলোড়িত করার স্পর্ধা নিয়ে করা হয়
নাই। পত্র লেখার প্রধান কারণ, আমার
জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় রায় আমি আপনার
নিজ মুখ হতে শুনতে চাই। আমাকে একটা
বড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে বলে
আপনার কোন স্বেচ্ছা বা লজ্জার প্রয়োজন
নাই। কারণ, ওরূপ বঞ্চিত আমি জীবনে
আরও হয়িছি, অতি শৈশবে মা হারিয়ে-
ছিলাম। পাছে দুঃখ আমাকে স্পর্ধা করে,



SWAMI & CO.
SPRING SPECIALISTS

CALCUTTA • INDIA

The Pioneer and Premier Spring Manufacturer in India :
491, STRAND ROAD. PHONE:—OAL. 4660.

কী শরীর পালনে, কী রূপচর্চায়

—লিস্টল—

ক্লিন অপরিহার্য।

আপনার কণ্ঠস্বর যদি ককর্শ হয়
এবং আপনার প্রস্রাব যদি দুর্গন্ধ-
ময় হয়, তবে রূপসী হইয়াও
আপনি উপেক্ষিত হইতে পারেন।

THE SAFE, DEPENDABLE ANTISEPTIC

LISTOL



লিস্টল স্বরযন্ত ও তালু-
মূলের প্রদাহ দূর্য করিয়া
কণ্ঠস্বরের সুমধুর করে :
উহা দন্ত ও সিঁহদ মাড়ির
ক্লেদাপ্রসূত জীবাণুসমূহ
ধ্বংস করিয়া বহু উৎকট

ব্যাধির আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে
এবং প্রস্রাবও সুস্বাদু করে।

লিষ্টার এন্টিসেপটিক্স

কলিকাতা

আমাদের সমুদয় গ্রাহক ও

অনুগ্রাহকবর্গ

--পূজার-সাদর সম্ভাষণ--

গ্রহণ করুন



ডায়াক জয়াযুগ
পারফিউমারী ওয়ার্কস

৩/১, আর্টনো বাগান লেন—কলিকাতা

নিউ বেঙ্গল প্রাইভেট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত

হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস,
মিশন রো, কলিকাতা।

নিউ বেঙ্গল ভারতের বৃহত্তম প্রাইভেট ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান

আদার্কৃত মূলধন ... ৮,০০,০০০ টাকা

১৯৪৩ সালের নতুন কাজ ... ৬,০২,২০০ টাকা

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান—শ্রীযুত এস. এম. ভট্টাচার্য

ভ্যালুয়েশানের ফল

মিঃ এইচ কে সেন, এস সি আই আই, এফ এফ এ, একচুয়ারি কৃত ভ্যালুয়েশানে
(৩১-১২-৪৩ পর্যন্ত) সন্তোষজনক উদ্ভূত তহবিল দেখা গিয়াছে এবং

বাৎসরিক শতকরা এক টাকা হিসাবে ইন্টারেস্ট বোনাস

ঘোষণা করা হইয়াছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ভ্যালুয়েশান করা হইয়াছে এবং সুদের আয় শতকরা মাত্র তিন টাকা
হিসাবে ধরা হইয়াছে। একচুয়ারী বলেন :

“এই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভ্যালুয়েশানের জন্য

আমি ডিরেক্টরদের অভিনন্দন জানাইতেছি।”

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যিক

এস. কে, মজুমদার, বি এল, মানেজার।

শারদীয়া উৎসবে!

কৃষ্টিয়াল

নারিকেল তৈল

বিহার মিসেনে

সেই ভয়ে আশ্বা আমাকে বিয়ে দিতে চান নি। বড়ভাই আপনাকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর কথার ভিতরে আমি আপনাকে কল্পনার সৃষ্টি করে ফেললাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আশ্বা আজ নেই, তিনি আমার যথেষ্ট সংস্থান করে গেছেন, সৈদিকে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ জীবন! এ টেনে নিয়ে চলার প্রস্তাবনা মনকে স্বতঃই অসাড় করে আনতে চায়। সেই অসীম ক্লান্তিকে জয় করার শক্তি খোঁদা দিন, এইটুকু আশিস্ চাই।

হিত-রিজিয়া।

[ধীরে L of P রাশদের ক্ষেপে হাত রাখল, হঠাৎ রাশদ ফিরে তাকাল]
L of P. একি! আপনার চোখে জল!
রাশদ। তুমি কখন এসে পিছনে দাঁড়ালে, মিলি!
(সানিশ্বাসে) পড়েছি চিঠিটা?
L of P. হ্যাঁ, সবটাই পড়েছি, কী সুন্দর!
বিয়ে করেছেন তাত জানি না, কেন ত্যাগ করতে চান? অসুন্দর বলে?
রাশদ। না।
L of P. তবে?
রাশদ। মনে করেছিলাম, আধুনিকা ছাড়া আমার জীবনে চলেবে না, তাই—
L of P. আর এখন কি মনে করছেন?
রাশদ। মনে করি, তোমাকে ছাড়া চলেবে না।

মিলি, তোমাকে পাওয়ার মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—

L of P. আমাকে ভালবাসাটা মোহ বলছেন কেন?

রাশদ। নইলে আমি জানি তুমি আহমদকে ভালবাস। বাস না কি?

L of P. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাস—

রাশদ। তবুও দেখ, তোমাকে ত্যাগ করার সংকল্প করতে পারি না। রিজিয়ার অমন চিঠিটাও আমার মনের দ্বারের আঘাত করতে পারল না—

L of P. (উজ্জ্বল) আপনি বিলেত ঘুরেছেন। এখানেও আধুনিকতা নিয়ে আছেন। আপনার ত জানা উচিত, ভালবাসার পাশ্চাত্য সব সময়ে প্রণয়স্পন্দই হবে এমন কোন মানে নেই—আপনিও দেখাচ্ছিলেন সেই চিরন্তন পুরুষ—আপনি আমাকে রেহাই দিন।

রাশদ। বেদনাসিক্ত স্বরে) মিলি, অপরাধ আমিই করেছি। যেভাবে সুখী হও তেমনি করে নিঃশেষিত, নিপীড়িত কর। একটু, শান্তি, একটু, নিস্তার আমাকে কেউ দিও না।

[হঠাৎ উঠান করে।

(স্থিরকণ্ঠে) তুমি আহমদের সঙ্গে যোগে।

মিলি! আমি বড় শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করি গিয়ে, উঃ।

[প্রস্থানোদ্যত]

জাহির!

[জাহিরের প্রবেশ]

জাহির। হুজুর।

রাশদ। তোমার মিস বাবাকা হেয়া ঠায়ো। মায় যাতা।

[রাশদের প্রস্থান, আহমদের ভিন্ন দিক হতে প্রবেশ]

আহমদ। আমি ফিরে এলাম। Lady of the Park আমার সঙ্গে নাকি যাবেন?

L of P. হ্যাঁ মিস্টার আহমদ। জাহির।

জাহির। জি!

L of P. তুমি এখন যাও।

জাহির। আচ্ছা, যাতা হুঁ।

[জাহিরের প্রস্থান। আহমদ চতুর্দিকে চেয়ে দেখল, পরে]

আহমদ। Congratulation! Rezia,

L of P. আপনৈ বড়ভাই, শুনো ফেলেবে কেউ। আপনি আমাকে ভারি মুশ্কিলে ফেলেছেন।

আহমদ। মুশ্কিল কিসের আবার! Lady of the Park এর পাউ চমৎকার করে যাচ্ছিল—

L of P. যথাসব্বশ পণ থাকলে ওরূপ হয়।

কিন্তু আর না, ডাই—

আহমদ। কি হ'ল?

L of P. না, বড়ভাই, মাঝে মাঝে খামাখা ওর মনে কষ্ট দিচ্ছি—

আহমদ। তা' ও বেরূপ একটা কুম্ভামড়, ওর কিছু শাস্তি হওয়া দরকার।

L of P. না, না। অত দরকার নাই, সাতা বলছি কষ্ট দিতে আমার বড় ইয়ে-ইয়ে লাগে।

আহমদ। ই-য়ে কি? মায়?

L of P. আজ্ঞে হ্যাঁ।

আহমদ। ওরে বাবা, এর মধ্যেই—

L of P. জি হাঁ, ভারী এলে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, মায়। লাগতে কদিন লাগে? না, সাতা বলছি, ও ভারি ভাল লোক। আপনি ও আশ্বা ঠিক চিনেছিলেন। এত সানিশ্বা, এত ভালবাসা, কিন্তু একদিনও একটু অন্যায় ব্যবহার করেন নি। অথচ আপনি আর আমি, বেচারার মনে কষ্ট দিয়েই চলেছি—

আহমদ। আর একটু দিয়ে ওকে শাস্তি কর—

L of P. না, আর অভিনয় নয়। ওর মনে যে প্রতিজ্ঞার স্বেপাত হয়েছিল, তাতে করে Lady of the Park এর সঙ্গে আপনার রিজিয়াও ভেসে না যায়, আমার সেই ভয়—আহমদ। তোকে খুব ভালবেসেছে, ওর কি? L of P. (দুখে দু'দিলে) উনি যখন জানতে পারবেন যে রিজিয়াই ওরূপ করেছে, তখন বুঝি মনে সত্যিকার কষ্ট পাবেন না? আহমদ। ওরে বাপরে, পাবেন। বেশ ত, যত শীগগির পারিস যবানকা টেনে দে না। L of P. তাহলে আপনি এখন ফাল। ওকে

ফোন:-
৩৫৫২
৩৫৫২

এনামেলাস কলিকতা

শারদীয়া যাত্রাসম্বন্ধে
সার্থক ও প্রার্থনীয় করে তুলতে
চাই—
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
আধুনিক কৃতি সমস্ত নানাবিধ
হালুকের স্বল্প, মস্তা ও মজবুত

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
১১৩নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকতা

শারদোৎসবে

বাগবানগিলাদিগকে আনন্দ দান করিবে।

সুধা বিস্কুট কোং
১৭ প্রিন্সনাথ মুখার্জীর রোড কলিকাতা
REGISTERED PHONE-BB3009

সুধার
কনী
সুন্দর
মিন
নাইস
নোততা

SUDHA BISCUIT CO.
NONTA
CALCUTTA

SUDHA BISCUIT CO.
THIN
WROOT
CALCUTTA

ব্যবহারে তৃপ্ত ও নল লাভ করুন
সর্বত্র পাওয়া যায়।

সুধার অন্যতম অবদান
গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয়
কাপড় কাচা সাবান
বাহির হইয়াছে।

ভাইটিন
স্বাভাবিক দুর্বলতা
ও স্ত্রীলোকের শ্বেত
ও রক্তপ্রদরে অবার্থ

হোমিও রিসার্চ লেবোরেটরি
লক্ষ্য (বিশাল) স্থাপিত ১৯১৭ সন

কলিকাতা শাখা :
১২৪/২এ, রসা রোড,
কালীঘাট।

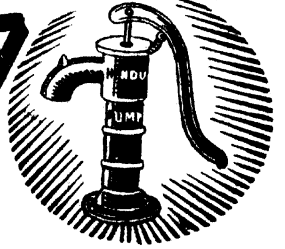


দেবব্রত

যাঁর জীবনে
কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না—
তাঁরও ইচ্ছামত্বের সময় ইচ্ছা
হয়েছিল—পাতালের পবিত্র জল পান
করার। পার্থ ছাড়া তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা
সেদিন কেউ মেটাতে পারেনি।

আজ আপনারও যদি স্বাস্থ্যের জন্য সেই নির্মল
জলের প্রয়োজন হয়ে থাকে—তাহলে ভাববেন
না; পার্থ না থাকলেও বিজ্ঞান সে অভাব
পূরণ করেছে। “হিন্দুস্থান ট্রেডার্স লিঃ”
এমনই একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, যারা
টিউবওয়েল, স্যানিটারি পায়খানা, স্নানক্ষেত্র
ব্যবস্থা আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে করে দেয়।

**হিন্দুস্থান
ট্রেডার্স লিঃ**



স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার্স ও
টিউবওয়েল কন্সট্রাক্টরস্,

৩৪নং স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন: কলিঃ ১০৭৬ : : গ্রাম—“এইচটি”, কলিকাতা।



জগতে অফুরন্ত সুখসম্পদ যৌবন দিয়েও মানুষের তৃপ্তি হয় না। স্বজন বাচ্চব পরিজনকে, এমন কি নিজের আত্মাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দ দেওয়া যায় একমাত্র উপায়ে খাদ্য দিয়ে। রসনাতৃপ্তিকর আহাধোর স্পর্শে দেহমনে নিশ্চিত আরামের পুলক-শিহরণ অনিবার্য হয়ে উঠবেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কেবল ভাল উপকরণ হ'লেই ভাল রান্না হয় না। যে পাতে জীবনের আনন্দরস প্রস্তুত হয়, তার রূপগুণ নির্ভর করে একমাত্র সেই পাতের উপর। 'লক্ষ্মী মার্কা কড়াই' এই প্রয়োজনের অছুরোধেই সৃষ্টি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রস্তুত এই কড়াই প্রতি রন্ধনশালার গৌরব। এতে করে প্রস্তুত ভোজ্যপ্রবো সুখমা ও স্বাস্থ্য জীবনে সন্ধান দেবে নোতুন উৎসাহের।

★

পাইপ, রেলিং, ঢালাই জালকাঠি, বালতি প্রস্তুত করা হয় ও সর্বপ্রকার ঢালাই কার্য করা হয়।

লক্ষ্মী মার্কা **এডাই**

প্রস্তুত কারক

ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেটাল কোং, হাওড়া

সোল এজেন্ট—যোগেশচন্দ্র সরকার : ২১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৪৬৫২

বড় কষ্ট দিয়েছি আজ। একটু মানিয়ে না আসলে—বুঝলেন না?

আহমদ। হ্যাঁ, খুব বুঝেছি, তুই মানাতে থাক, আমি তাহলে চলি।

[আহমদের প্রস্থান]

L of P. খোদা! আমার জীবনে সমস্যা সমাধানের যে উপায় করে দিয়েছে, তা' শেষ পর্যন্ত ঠিক রেখে। আমার স্বামীর সংসার এতদিন করতে যে অবকাশ দিয়েছে, তার জন্য তোমার দরগায় লক্ষ-কোটি সূক্‌রিয়্যা। ওঁ উনি আসছেন।

[রশিদের প্রবেশ]

রশিদ। কি, তুমি যাওনি আহমদের সঙ্গে?

L of P. না।

রশিদ। কেন?

L of P. আপনি ওভাবে চলে গেলেন কেন?

ওঁ কথাগুলি ওভাবে বলে আমাকে বাধা দিয়ে গেলেন কেন? আপনি কি আমার মনের কথা জানেন না?

রশিদ। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে এসো। হাতে হাত দাও। হ্যাঁ, এবার চাও, চোখে চোখে—বলত, সত্যিই তুমি আমার?

L of P. হ্যাঁ, আমি একমাত্র তোমার! তুমি জান না আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তোমাকে ঘিরে আছে, আমার আশা, আমার স্বপ্ন সবই তোমাতে ওতপ্রোত। তোমাকে অদের আমার কিছুই নাই।

রশিদ। (স্বামীর দিকে) মিলি, লক্ষ্মীটি, বড় দৃংখ দিয়েছি তোমাকে।

L of P. আচ্ছা, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না ত?

রশিদ। কি বলো?

L of P. রিজিয়ার অনুরোধ কি রাখবে না?

রশিদ। অনুরোধ? মানে গিয়ে বলে আসব—তার সম্পর্কে আমি নির্দ্বিগ্ন। তা পারব না।

L of P. এটুকু অনুরোধ না করলে, লক্ষ্মীটি, তার দৃংখ আমাদের সারা জীবনের শান্তিতে ছাপাপাত করবে যে,—এ তোমার কর্তব্যেই হবে।

রশিদ। বড় কঠিন কাজ।

L of P. কিছুই কঠিন নয়, আমার পরিচয় তাদেরকে দিও না, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, কোন অসুবিধা হবে না।

রশিদ। আচ্ছা, তাই হবে।

[স্টেজ এক মিনিট শূন্য রইল, কিছু সময় অতিবাহিত করছে তাই প্রকাশের জন্য, রশিদ ও L of P-র প্রবেশ]

রশিদ। মিলি, না গেলেই ভাল হত, চল ফিরে যাই।

L of P. কেন ফিরে যাবে? সে সংবাদ পেয়েছে আজকে তুমি যাবে, তার আশটুকু তুমি চরমার করে দিতে চাও?

রশিদ। গেলে ত আরও বেশী চরমার হবে যাবে।

L of P. না, ছিঃ! চল।

রশিদ। মিলি, দেখ, আমি বড় দৃংখ, জানি

ভারত
অর্থনৈতিক
জ্ঞান ও তৈরি
ব্যবহার
করুন

মিল-
২৪৩ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা
ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

পলিসি হোল্ডার অথবা এজেন্ট হিসাবে কোন লাইফ
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার
আগে দেখিবেন কোম্পানীটি সভাই প্রগতিশীল কিনা।

গত বৎসরে ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের প্রগতির পরিচয়
নীচে দেওয়া গেল :



নূতন কাজ বৃদ্ধি—শতকরা ৫৬ ভাগ
প্রিমিয়ামের আয় বৃদ্ধি—শতকরা ৯৮ ভাগ

“ইণ্ডিয়ান ইকনমিক” ভারতের
অন্যতম প্রেস্ট বীমা প্রতিষ্ঠান।

ডিরেক্টর বোর্ড :

শ্রীযুক্ত এস. এম. ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান।

শ্রীযুক্ত টি. সি. চ্যাটার্জি।

শ্রীযুক্ত করিশঙ্কর রায়, এম.এল.এ।

শ্রীযুক্ত এইচ. সি. সরকার।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, মানোজার।

শাখাসমূহ—বোম্বাই, দিল্লী, লঙ্কো, বেনারস, এলাহাবাদ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী,
ময়মনসিংহ, নাগপুর, পাটনা, শিলং ও অমরাবতী।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

কমার্শিয়াল হাউস—১৫, ক্লাইভ স্ট্রিট

ডাইরেক্টর বোর্ড

১। মিঃ জে. সি. মুখার্জি, বার-এ্যাট-ল।

ভূতপূর্ব চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন।
ডিরেক্টর—আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিমিটেড।

২। খান বাহাদুর এম. ই. মমিন, সি. আই. ই।

ডিরেক্টর—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড। আর্থ-
স্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড।

৩। মিঃ জি. ডি. সোমাইকা

ডিরেক্টর—সোমাইকা এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট লিমিটেড।
সোমাইকা অয়েল এন্ড প্রাইভেট কোং লিমিটেড।

৪। .. এন. সি. চন্দ্র

ডিরেক্টর—ন্যাশনাল স্টীল কর্পোরেশন লিঃ। বাসন্তী কটন
মিলস্ লিঃ। গ্রিপেক্স (ইন্ডিয়া) লিঃ। মহালক্ষ্মী কটন
মিলস্ লিমিটেড।

৫। .. বি. সি. ঘোষ

কন্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী
লিমিটেড।

৬। .. এস. দত্ত (মানোজিং ডাইরেক্টর)।

ডিরেক্টর—এচ. দত্ত এন্ড সন্স। রামদলভদ্র টী কোং
লিমিটেড। ব্রিটিশ ডিস্ট্রিবিউটার।

বিত্তীয় মূলধন	...	৯,২৫,০০০, টাকা
কার্যকরী মূলধন	...	১,৫০,০০,০০০, টাকা
রিজার্ভ	...	১,১০,০০০, টাকা

জে. এন. সেন, বি. এ. এফ. আর. ই. এস. (লন্ডন),
জেনারেল মানোজার।

না, কি করে বসব। ও বড় দুঃখিনী। বড় ভাষা করে আশ্বা, মনে রিজিয়ার বাবা, একে দান করেছিলেন। ওর ভাইকে রেখে আমাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ দিচ্ছি এইভাবে। কি একটা নেশা চাপল, মনে করলাম সে গ্রহণযোগ্য না। of P. বেশ ত, তাকেই গ্রহণ করুন, আমি আপনার পথ থেকে সরে যাই—

শিদ। রাগ করে না, মিলি। তোমার ভালবাসা কিরূপ একনিষ্ঠ হবে আমার জানা নেই, কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, তার যে প্রেম, সে একমুখী ও এককৃত। কাল রাত থেকে মনটা নানা চিন্তায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সব আকর্ষণ আমার মনের কোণে বাপসা হয়ে উঠেছে,—পিড়-মাতৃহীনা অসহায়কে আমি নিতান্ত কাপুরুষের মত ত্যাগ করছি—

of P. বেশ ত, তাকে গ্রহণ কর না! শিদ। সে হয় না, মিলি। আমি তোমাকে তুম্বয় হয়ে গেছি, ভবিষ্যৎকে অতল সাগর-জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। দুঃখকে আর আমল দেব না—

"অতীত যা তা দুঃখের স্মৃতি ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর দিল পিয়রা সাকী গো আজ

পেমাল! ভবে ঘুচাও মোর।" তোমার অষ্টোপাসের কঠিন বন্ধনে আমাকে ধরে রাখ। না, না, যাব না—আমি যাব না। L of P. আমাকে অপমান করো, মনে নেব না। কিন্তু তুমি চল—

রশিদ। আমি পারব না। L of P. কেন পারবে না? রশিদ। অনাথা, এতম! দেখে যদি ভালবেসে ফেলি? তার কথা, যদি তার পতের মত, আমার মনে বণ্ণকার তোলে? তবে?

L of P. তবে তাকে গ্রহণ করবে। সত্যি বলছি, তোমার মধ্যে আমি ভালবাসার বিলীন হয়ে গেছি, তুমি যাকে গ্রহণ করবে তার মাঝেই যদি রূপ নিতে না পারি, তবে বলত আমার ভালবাসার সার্থকতা কোথায়?

রশিদ। তুমি উদার, আমি তোমার অযোগ্য। L of P. তুমি আমার সর্বরূপে যোগ্য। [সর্বরূপ উপর জোর দিলে]

তৃতীয় দৃশ্য।

[আব, আহমদের বৈঠকখানা]

রশিদ। এই ত বাড়ি। L of P. এত মিস্টার আহমদের বাড়ি? রশিদ। হ্যাঁ, রিজিয়া আহমদের বোন।

L of P. আগে বলনি কেন? আমাকে ত ভারি অপমানিত করলে! এখন বল ত কি করি?

রশিদ। আমি কি জানতাম, তুমি আহমদের বন্ধু হয়েও এটুকু জান না?

L of P. [ব্যস্তভাবে দেখিয়ে] না, মিস্টার আহমদকে আমার দেখা দেয়া অসম্ভব। এরূপ জানলে আর আসতাম না। দেখ, আমি চলে যাই—তুমি রিজিয়ার সঙ্গে দেখা করো। সত্যি যদি তোমার মন চায় তাকে, মনের গতি ফিরিয়ে না। আর যদি মন সে না আটকে রাখতে পারে, তবে আমাকে খুঁজো, আমি দেখা দেব। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তবে ক্ষমা করো—হে বন্ধু বিদায়!

[L of P এর প্রস্থান]

রশিদ। যেয়ো না, মিলি। শোন—শোন—

[স্বাদের বাইরে উর্ক দিলে]
কই, এই বোরিয়েই গেল কোথা? হঠাৎ উধাও? আশ্চর্য!

[আহমদকে দেখে]

এই যে, আহমদভাই—

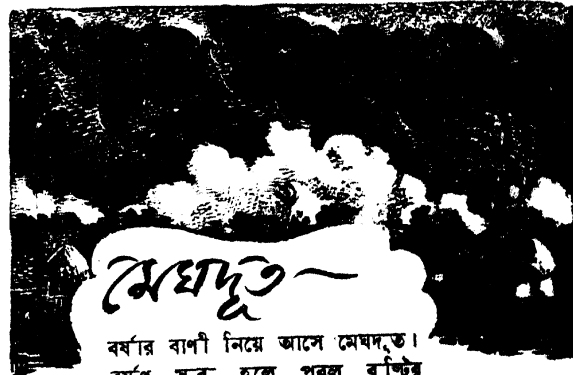
আহমদ। কি খুঁজছো রশিদ?

রশিদ। কিছু না, মানে, মানে, একটা বিড়াল— এই—সঙ্গে এসেছিল, এইদিকে বোরিয়ে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল—

আহমদ। ওই যে আঙিনার দরজাটা খোলা? ও দিলে ভিতরে গেছে বোধ হয়—দেখে আসব কি?

সূচনা

আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের যে সব কারখানায় মোটর গাড়ী হয়, তাহারা কিন্তু মোটরের সকল অংশগুলিই নিজেরা তৈরী করে না। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট যে সব কারখানা যে বিশেষ অংশটি তৈয়ার করতে পারদর্শী, তাহারা সেই বিশেষ অংশটি তৈরী করিয়া বড় কারখানাগুলিকে সরবরাহ করে। যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পে অগ্রণী সকল দেশেই প্রথমে ঐ ধরনের ছোট ছোট কারখানাগুলিই গড়িয়া উঠে। এই হিসাবে ৪০-১৫০ খ্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—ঠিকানার ভারতে প্রথম স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়ারার নির্মাণকারক মেসার্স স্বামী এন্ড কোং দেশে যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সূচনা করিয়াছেন বলা যায়। কেননা স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়ারার প্রত্যেক যন্ত্রেরই অপরিহার্য অংশ। যন্ত্রের জন্য অন্য দেশের মূখ্যোপকৃতি না ঘটিলে আমাদের শিল্পোন্নতি পদে পদে বাহত হইবে। কাজেই আজ হউক, আর কাল হউক দেশে যন্ত্র-নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবেই। সেদিন মেসার্স স্বামী এন্ড কোংর যথার্থ সমাদর হইবে। তাহারা মোটর গাড়ী, লরি, রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ী, ট্রাম, বরলরের সেক্টি ভালভ, সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, পাট কল, কাপড়ের কল ও গেমার কল প্রভৃতিতে ব্যবহার্য স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়ারার সকল উপকৃতি যাক্ততে নির্দিষ্ট শক্তি পরিমাণে প্রস্তুত করেন। তাহারা পুরাতন স্প্রিং-ওয়ার পাট রি-টেন্সার এবং সম্পূর্ণ স্প্রিংকে অধিকতর জোর বহনক্ষম করেন। ব্যায়াম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী তাহারা তৈরী করেন। নির্মিত প্রকার উৎকর্ষের জন্যই এতদিন পর্যন্ত তাহারা বিশেষী প্রকারে সহিত প্রতি-যোগিতার টিকিয়া আছে।



মেঘদূত

বর্ষার বাণী নিয়ে আসে মেঘদূত।
বর্ষণ সুরু হলে প্রবল বৃষ্টির
স্পর্শ থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে

ডাকব্যাক

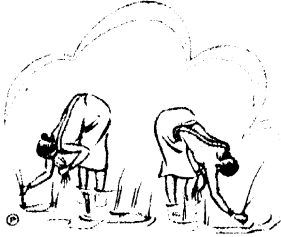
বর্ষার পক্ষের ঐচ্ছিক মাঝী
ডাকব্যাক

স্বাভাবিক প্রিয় বর্ষা



বেঙ্গল প্রাদেশিক ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

ফসল বাড়ান



কিন্তু বীজ উত্তম হওয়া চাই
উত্তম বীজের একমাত্র বিশ্বস্ত
প্রতিষ্ঠান।

মাম্বিগাড়া
আইডিয়াল
এগ্রিকালচারেল
ফার্ম



ওৎলাব নরসিংড ও প্রাচীন বীজ উৎপাদনকারী



প্রোঃ ফার্মার্স ইণ্ডাস্ট্রিজ
৩ নং, প্রজুরিমন মেন, কলিকাতা

আমাদের সকল গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক
এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদিগকে আমরা
শুভ শরদীয়া সন্তাষণ জানাই—

লোটা'স্ অয়েল কোম্পানী

১০নং বিডন রো, কালকাতা

ফোন বি বি ৪৮০৬

(খাঁটি সরিষার তৈল, তিসির তৈল, বাদাম,
রেড়ি, সাবান প্রস্তুত ও কলকারখানার জন্য
নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুতকারক।)

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা

কলিকাতা অফিসসমূহ—

১২।২, ক্লাইড রো

২৮১, আপার চিংপুর রোড (হাটখোলা)

৮৫, রাসবিহারী এভিনিউ (বালাীগঞ্জ)

২১৮-এ, ক্রশ স্ট্রীট (বেড়বাজার)

—o—o—o—

অন্যান্য অফিস—

নিউমিল্লী, বেনারস, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শিলং,
বর্ধমান, জামশেদপুর, সিলেট, গিরিদিহ,
কোড়হাট, গোহাটী, শিলচর, বোলপুর,
বগুড়া, লিউড়ী, নগাঁও, সন্দ্বাইগঞ্জ ও
হবিগঞ্জ।

গত ২০ বৎসরের

অধিককাল এই ব্যাঙ্ক ভারতের
শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টায়
সাহায্য করিয়া বিশেষ
জনপ্রিয়তা অর্জন
করিয়াছে।

কার্য্যকরী মূলধন

১,৭৫,০০,০০০

পোণে দুই কোটী টাকারও অধিক।
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম, এল, সি
ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, ভারতীয় লেজিস্লেটিভ এসোসিয়েশন।

রশিদ। না, না, থাক।

আহমদ। (গুরুদৃষ্টিতে) সত্যি, রশিদ, আমি মনে করিনি তুমি আসবে। রিজিয়া কিন্তু বলছিল তার ডাক যদি সত্যিকার হয়ে থাকে, তবে তুমি আসবে। তুমি এসে ভালই করেছে! নিজের যা-হয় বোকাপড়া করে যাও, আমার কর্তব্য থেকে আমি রেহাই পাই। চল, ভিতরে চল। আশ্চর্য! করতে গেছেন, আমি 'রসদুর্ভাগ্য', শব্দভ্রষ্টতা চুকিয়ে দিই; তারপর তোমার জ্ঞান বিবেচনায় যা কর্তব্য বোঝে, তাই করে।

রশিদ। বেশ, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান]

[দৃশ্য পরিবর্তন, অন্ধরমহল, রিজিয়া ওড়না ঘেরাও হয়ে একটু ঘরে কোচের পর আসনি।]

[উভয়ের প্রস্থান]

আহমদ। রিজিয়া, ওদিকে ফিরে বসে আছ কেন? রশিদ এসেছে, দেখ।

রশিদ। (গলা পরিষ্কার করে) দেখুন—মানে—বেশ—আমি—অর্থাৎ ডেকে তুমি, আমাকে বড় ঈশ্বর ফেলেছে—আমার যা বলার, তা বলার নয়—আমি তোমাদের কাছে স্বর্ণী। তা' চিরদিনই মানবো। তুমি আমার ক্ষমা কর—আমার মত হতভাগা ক্ষমার পাত্র। তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আজ যদিও আমার দুঃস্বপ্ন, কিন্তু জীবনে সব গোটাপালোট হয়ে গেলে, তোমাকে আর গ্রহণও করতে পারলাম না। তবে রিজিয়া, তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে বলেই এসেছি, আমার দিকে তাকাও। দৃষ্টিতে দৃষ্টি না পড়লে মানুষকে

চেনা যায় না। হ্যাঁ—চাও, দেখ, মুখ আর একটু ঘোরা—হ্যাঁ—এক?—আ—রিজিয়া! তুমিই মিলি? Lady of the Park?

রিজিয়া। হ্যাঁ। আমার তুমি ক্ষমা কর, আমি ক্ষমার পাত্রী।

রশিদ। ক্ষমা কেন? তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। কদিন থেকে মিস্ মিলি ও রিজিয়া নিয়ে মন যে নিবিড়ায়-শতধা হয়ে যাচ্ছিল, তাতে দিনে আমার আয়ুর্ দশ বৎসর করে কমিয়ে দিয়ে গেছে। সেই মানসিক দৃষ্টিভ্রষ্টতা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করেছ, তুমি আমার Guardian angel.

আহমদ। (ঠাট্টার সুরে) রশিদ, তুমি কিছু দ্রুত এগুচ্ছে, আমি বড়ভাই, একটু বোঁরিয়ে গিয়ে নই, কেমন?

[তিনজনের হাসা ও আহমদের প্রস্থান-ভিড়মুখে জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।]

জাহাঙ্গীর। কিন্তু আমার কথা শব্দন্ত, আমি ভুলনীপতি, কপন্যার ভিমগুলি শব্দকপ্রসং হওয়ার সময়ই তো আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। নয় কি, রিজিয়া বেগম?

রিজিয়া। বেশ তো! আমদুন জলসার জোলুস বাড়ান।

জাহাঙ্গীর। না হে। এখনি কেটে না পড়লে কটা হয়ে পড়বে যে! আসি তা'হলে। রিজিয়া, প্রার্থনা করি তুমি চির-বিজয়িনী হও।

[আহমদ ও জাহাঙ্গীরের প্রস্থান]

রিজিয়া। কিন্তু অভিনয় করে তোমার মন

ভুলিয়েছি যে! সে আমার ভারি লজ্জার কথা।

রশিদ। সেটাই ত ঠিক করেছে রিজি। তুমি আমাকে জিতে নিয়েছ। সত্যিই তুমি আমাকে সব দিকে রক্ষা করেছে। খোদা তোমাকে রাজ্যরাণী করুন!

রিজিয়া। রাজ্যরাণী ত করেছেনই রাজামশাই! কিন্তু রাজত্বশাসনটা যেন এবার থেকে benevolent despotism হয়। কথায় কথায় রাগ আর গোপন্য। যে ভাই এত করল, তাকে একটা সিগ্রেটকেসও দিতে পারব না? রশিদ। থাক, থাক, হয়েছে। এবার কিন্তু রাণীর কথা দিতে হবে রাজহু, যেন অরাজকতা না হয়।

রিজিয়া। যা হুকুম!

রশিদ। সত্যি আমি অবাক মামি, তুমি কি করে গতিবদ্বলভাবে আদর্শনকার মত সর্বত্র চলাচল করতে পারলে?

রিজিয়া। কেন পারব না? তুমিই ত সঙ্গে ছিলে—You had been a real husband!

রশিদ। I see. কাছে এসো না! আর একটু—হ্যাঁ।

রিজিয়া। এতদিনের পরিচয়েও তোমার মিলির সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করিনি, আর এখন এত কাঙালপনা কেন?

রশিদ। সে ত ছিল পর, তুমি ত বউ! (সহাস্যে) The real wife, I mean.

রিজিয়া। ঈ-স!

রশিদ। হ্যাঁ সত্যি, আশ্চর্য এই বন্ধন, মনে হচ্ছে যুগযুগান্তর হ'তে তুমি—

রিজিয়া। প্রণয়ী থেকে ব'ধুতে রূপান্তরিত হয়ে আসছ, কেমন? (হাস্য)

রশিদ। জি, না, রূপান্তরিত না। মৌলিক, অকৃত্রিম প্রেমসী।

রিজিয়া। উহু! বউকে ভালবাসলে সে যখন 'হ'ল প্রেমসী, আর প্রণয়ীকে গ্রহণ করলে সে যখন রূপেতে 'হ'ল বউ। ব'ধুরূপী হতে বহুরূপী হতে 'হ'ল ত? সেই 'হ'ল রূপান্তরের মায়াকাঠির স্পর্শ'। সেই মায়া-কাঠি নারীর জাগরণ আনতে পারে, যদি নরের হাতে তাই হয়ে ওঠে জীবনকাঠি।

গান।

রূপান্তর,

রাজার মেয়ে বন্দী ছিল

সাত মহলা পুরে

রাজার ছেলে বাজার বশী

বুঝে ভাঙানো সুরে

সুরের রেপে ভারসো পুরী

উৎসলে নিরন্তর;

রূপান্তর।

পায়ে ছিল সোণার কাঠি

রূপার কাঠি শিরে,

এক নিমেষে বদলে দিল

পেল গো প্রাণ ফিরে,

করলো কনের আখির ভাষা

জীবন্ত মন্ডর;

হলো, রূপান্তর।



বাইকল

ম্যাসেরিয়ার সর্বপ্রথম সজ্জিত ঔষধ
আজকের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা
ফার্মি কঠিন চেষ্টাতে কুইনাইন-
সমৃদ্ধ ঔষধি উপকরণের একটিরূপে তা পরিণত
ইহা সর্ববিশেষতঃ কুইনাইন প্রতি-
বেধক মতে। ভ্রমের সমস্ত ঔষধ
ক্রিয়াকর্মকে নির্ণয় করিয়াছে। অসংখ্য
পাকস্থলী, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড
কঠিনতা, ক্রিমি আক্রমণ, জ্বর, জ্বরের
জ্বর, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড
গতকালকার ঔষধের চেয়ে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড
কঠিনতা, ক্রিমি আক্রমণ, জ্বর, জ্বরের
জ্বর, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড



ব্যবহার ক্রিয়াকর্মকে নির্ণয় করিয়াছে। অসংখ্য
পাকস্থলী, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড
কঠিনতা, ক্রিমি আক্রমণ, জ্বর, জ্বরের
জ্বর, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড
কঠিনতা, ক্রিমি আক্রমণ, জ্বর, জ্বরের
জ্বর, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড
কঠিনতা, ক্রিমি আক্রমণ, জ্বর, জ্বরের
জ্বর, লজ্জার ফলে ইহা শিশুদের হৃৎপিণ্ড

সর্বত্র সর্বত্র সর্বত্র সর্বত্র সর্বত্র সর্বত্র

বাইকল ম্যাসেরিয়ার লিঃ

৭, রাবিবাসলি জাউ হাউ কলিকাতা



এলুমিনিয়াম

“ক্রাউন” এবং “গোল্ডমোহর”

এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

- দেখিতে উজ্জ্বল, ব্যবহারে সুবিধাজনক। সাবান কিম্বা নরম মাটি অথবা ছাই দ্বারা অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়।
- দামে সস্তা এবং অপরিহার্য; কারণ ওজন হালকা, কলাই খরচা নাই; অল্প আঁচে কম সময়ে রান্না হয়।
- স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ইহাতে রন্ধন করিলে ‘ভিটামিন’ অধিক পরিমাণে বজায় থাকে।
- সমস্ত ভাঙ্গা ধাতু অপেক্ষা, পদ্রান ও ভাঙ্গা এলুমিনিয়ামে বেশী মূল্য পাওয়া যায়।

● সাবধান !! সস্তা দামের এলুমিনিয়াম কিনিলে না কারণ তাহা বিশুদ্ধ নহে এবং রন্ধনকার্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনুপযোগী।

জীবনলাল (১৯৭৯) লিমিটেড

বিখ্যাত “ক্রাউন” ব্র্যান্ড নিৰ্মাতা এবং

দি এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের

বাসনপত্রের সোল সেলিং এজেন্টঃ

কলিকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ * রাজমহেন্দ্রী * দিল্লী * এডেন * রেঙ্গুন।

রঞ্জন ভি, সি, ফ্যান

ফ্যানের প্রয়োজন ও অভাব এ বছরের চাইতেও আসছে বছরে বেশী হবে। অসামরিক চাহিদা সরবরাহের জন্য সরকার মহোদয় শতকরা ৫টি মাত্র ফ্যান সরবরাহের অনুমতি দিয়েছেন। আপনার নাম আজই “ডিরেক্টর অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং” মহোদয়ের চনং এস্প্লানেড্ ইন্ট, কলিকাতা—ঠিকানায় দরখাস্তের মারফতে রেজিস্ট্রী করে রাখুন।

যুদ্ধ অবসানান্তে আপনাদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাবার সুযোগ কামনা করি।

জি, টি, আর কোং লিমিটেড

দমদম অফিস ও কারখানা—
৩৭নং দমদম রোড,
কলিকাতা।

কলিকাতা অফিস—
৬নং ক্রাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

সোভিয়েট বিজ্ঞান

ভারত তত্ত্ব

ডক্টর শ্রী ভূগোন্ধ্রমাত্র দত্ত

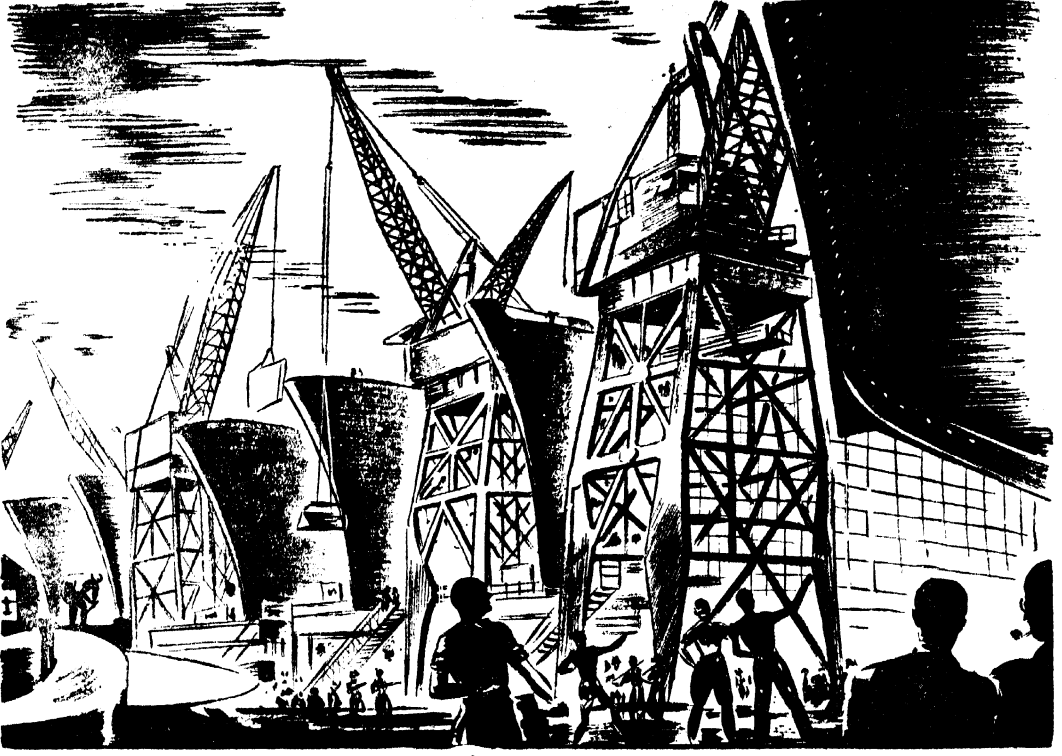
বর্তমান শ্রিতীয় জগৎব্যাপী যুদ্ধের একটি অংক হইতেছে নাৎসী জাতিগণ সোভিয়েট-রুশের উপর আক্রমণ। এই দেশের সহিত সোভিয়েট-রুশের অনাক্রমণমূলক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রুশ প্রতিপদে পশ্চাৎ হেঁসরণ করিতে বাধ্য হয়। নাৎসী সেনা-নায়কেরা নন্দ বরীয়া বলিয়াছিল, "চারি সপ্তাহে রুশ-বাহিনীকে পরাজিত করিব ও আর বাকী ক্ষয় মতাহে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া নিশ্চয় করিয়া দিবা।" কিন্তু জার্মান ঝটিকা বাহিনীর কাণ্ড-হেঁসরণও রণক্লেশভা সত্ত্বেও মাসের পর মাস গেল, সোভিয়েট বাহিনী পরাজিত হইয়াও ধ্বংস হইল না বরং আজ প্রতি-আক্রমণ স্বারা জার্মান সৈন্যদলকে রুশের শীমানা হইতে বিদূরিত করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া লোকের মনে প্রশ্ন উৎপাদিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় রুশের পশ্চাৎ অপসরণ দেখিয়া সোভিয়েট বন্দুরা মুহমান হইয়াছিলেন, শত্রুরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, "আপদ গেল, বাঁচা গেল।" তাহার বলিতে লাগিল, "ছি, এই সোভিয়েটের পদেদুই? চাবার দল যুদ্ধবিদ্যার কি বুদ্ধির এবং যুদ্ধসম্ভারও কি প্রস্তুত করিতে জানিবে?" এতশ্রী তাহার প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছিল, সোভিয়েট সম্মত সাম্যবাদ স্বারা একটা জাতি মহান ও শক্তিশালী হইতে পারে না, হিটলার প্রবর্তিত পদ্ধতি স্বারাই জগতে একটা জাতি প্রতিভাশালী হয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে, তাহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ জগতে চাষী ও মজুরের সাম্যবাদের সমর্থনকারী অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির তরফদারী করার লোকের সংখ্যা বেশী। বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে, যেখানে সুদূর অতীত হইতে লোকে বৈষ্ণোজ্ঞাতী শাসনে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং যথায় বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্য স্বাভাবিক ও চিরের প্রদত্ত বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়, তথায় সোভিয়েট সম্মত সাম্যবাদ হাস্যগণ্য করিবার লোক বিরল। আসল কথা এই, বিগত জগৎব্যাপী যুদ্ধের পর, রুশ বিপ্লবের প্রতিভাশালী যখন জার্মানীও অস্তিত্বহীন সোভিয়েট বিপ্লব হইল, পরে রুশের চারি পার্শ্বের দেশসমূহে ক্রমিক বিপ্লব হইল। ১৯২৫ খৃঃ "সব্জ বিপ্লব" হইয়া ওই সব দেশে কমিউনিস্ট প্রথা অন্তর্ভুক্ত হইল, পরে তুর্কীতে কমাল আতা-তুর্ক খেলাফত ও মুসলমান রাষ্ট্র-পদ্ধতি অপসারিত করিয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সম্মত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষ করিলেন, যখন জাপান,

চীন ও ভারতে শ্রমিক ও কৃষকসমূহ স্বাধিকার লাভের জন্য অস্ত্রের হইল, তখন বনিয়াদী স্বার্থের লোকেরা পৃথিবীর সবাইকে অস্ত্রহীন বোধ করিতে থাকে। একি বংশ মরাদ্দা, ধন ও পদের সম্মান থাকিবে না, পাদরী মোল্লা-পুরোহিতদের প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, কেবল চাষী মজুরেরাই সমাজে উচ্চপদ পাইবে, এ যে জগতে নতুন বিপ্লব। এইজন্যই সোভিয়েট-রুশকে নানাদিক হইতে বিধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চলে; কিন্তু জগতে কলাপকারী যখন তাহাদের পক্ষে অভিশপ্তিতে অকৃতকার্য হইলেন, তখন সোভিয়েট-রুশকে তাহার একমুখে করিলেন। ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের উদয় হয়। অবশ্য এই উদয় আক্রমণ নয়, জার্মানীর দেশী এবং তৎসঙ্গে বিদেশী ধনীরা ইহার জন্য অনেক দিন হইতেই ধনী জন্মলাইয়া বজ্র করিতেছিলেন। সেই মজবুত হইতে হিটলারের উদয় হয় এবং জার্মানীতে মার্ক্সবাদী দলসমূহকে বিধ্বংস করা হয়। হিটলার ক্ষমতা পাইয়া বলিয়াছিল—"আমাকে চারি বৎসর সময় দাও, তাহা না হইলে মার্ক্সবাদ বোলচেভিকবাদ জার্মানীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবে।" এই সব ইতিহাসের কথা, ইহার ফলে ধনতান্ত্রিক জগৎ স্বাধিকার নিশ্চয় করে। তৎপরে, হিটলারের দল নিজদের খিটি "আর" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল, সশস্ত্রকল্যাণিত পতাকা উত্তীর্ণ করিতে লাগিল। ইহাতে ভারতের গৌড়া হিন্দুর দল আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আর কি, কলিক অবতার জগতে প্রকট হইয়াছে, জার্মানীতে হিন্দু ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজিতেছে, হিটলার হিন্দু ধর্ম প্রচার করিতেছে (শেখোজ উজ্জ্বল লেখক স্বকর্ণে শুনিয়াছেন)। আসল কথা এই, হিটলারের যেসব সামাজিক বিশ্বাস এবং ইহুদীদের প্রতি যেসব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় তাহা হিন্দুর বর্ণাশ্রম এবং শত্রুর প্রতি ব্যবস্থারই অনুরূপ। গৌতমমুনি ও মনতে শত্রুর প্রতি যে ব্যবস্থা আছে তাহা ইহুদীদের প্রতি হিটলারীয় আচরণের সঙ্গে মিলে। এইজন্যই বর্ণাশ্রমীদের এত উল্লাস, গোলামের জাতি গোলামকেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে।

মহাই হউক হিটলারের অভ্যুদয় এবং শেষে ইংল্যান্ডের সহিত তাহার যুদ্ধ এদেশের লোকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জার্মানী ভারতের বুদ্ধ করিতেছে, এই ধারণা অনেকের মনে উদয় হয়। যে হিটলারের শত্রু ও এই যুদ্ধে ইংল্যান্ডের মিত্র তাহার প্রতি বিভ্রাট স্বভাবতঃ অনেকের মনে জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে সোভিয়েট রুশের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব অনেকের মনে উদয় হয়। একই এই দেশের বনিয়াদী স্বার্থের তরফদারীরা সোভিয়েট-রুশের প্রতি কখন রুসী ছিল না, তৎপরে এই যুদ্ধে অশ্রুতপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া রুশের প্রতি এই শ্রেণীর ভারতীয়দের মন বিক্ষুব্ধ হয়। "রুশ ভারতীয়ের মাউক" এই ইচ্ছাই তাহাদের অবিদিত মনের পদার নিহিত থাকে।

লেখক ১৯২৫ খৃঃ হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন যে, এই দেশের শিক্ষিত এবং অবশ্যপন্ন শ্রেণীর লোকেরা সোভিয়েট-রুশের ভাল দেখিতে চায় না, ভাল শুনিত চায় না। পরাধীন, পদদলিত, বৈষম্যমুক্ত সমাজের লোকেরাই মজুর বাতী ভরণ করিবে, তাহার পরিবর্তে তাহারাই এই বাতীর প্রতি বিরূপ। ইহার মনস্তত্ত্ব বর্ণিত হইতে পারে একটি কথা বর্ণিত হইবে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যপেক্ষা শত্রু বেশী ব্রাহ্মণবাদী ও গৌড়া। পূর্বে শত্রুর সামাজিকপদ যত নিম্নের দিকে যাইবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আচরণের গৌড়াম যত ততই করিবে। শত্রু ব্রাহ্মণ্য গৌড়াম করিলে মনে করে তাহার সমান এবং তৎক্ষণা সামাজিক পদ-মরাদ্দা বৃদ্ধি হইবে। এইজন্যই সে ব্রাহ্মণ্য গৌড়ামকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পূর্বে বিদেশের মুসলমানপেক্ষা ভারতের মুসলমান বেশী গৌড়া, আর ভারতের অন্য প্রদেশপেক্ষা বাংলার মুসলমান বেশী গৌড়া (শেখোজ অভিজ্ঞগণি লেখক তাহার সৈয়দ বংশীয় এক বিহারী বন্ধুর কাছ হইতে শুনিয়াছেন)।

এই মনস্তত্ত্বের অর্থ—নিম্নস্তরের হিন্দু, মনে করে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত বাদ্যীয় গৌড়াম ও বান্ধা সনাতন এবং একমাত্র পন্থা, ইহাকে আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল ও সামাজিক পদোন্নতি হইবে। রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস তাহার কাছ অজ্ঞাত, সে যে অবস্থায় জন্মিয়াছে সেই অবস্থাকে শাস্ত্রত বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। ইহার বাহিরে সে তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে অসমর্থ। শত্রু জানে না কি ভাষণ শ্রেণী সংগ্রামের ফলে সে পতিত হইয়াছে। তাহার ব্রাহ্মণ্য-পুরোহিত বিজেতা ও শাসক হইয়া মনোবৈহিত্য পূর্বে সংকলিত করিয়া তাহার প্রতি যে ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া সে আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। এই জনাই গোলাম মনোভাবপ্রসূত বুদ্ধিপ্রবণিত হইয়াই শত্রু জাতিগণের ধর্মের মোহাই দিয়া



We have a hand in it!

আধুনিক জগৎকে বর্তমান সভ্যতা দিয়াছে—সকল রকমের শিল্পকৌশল উৎপাদনের উন্নততর প্রণালী, সমস্ত নিকটবর্তী যাত্রা, মালপত্রাদি চালান দেওয়ার সম্ভব রকম সকল সুবিধা সুযোগ।

পৃথিবীকে উন্নততররূপে রূপান্তরিত করিতে যন্ত্রপাতির অর্থীৎ বাষ্পপোট, বাষ্পশকট, ট্রাক্টর, ট্রেন ও অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদিরও দাম উপেক্ষণীয় নহে; আর ব্যাপকভাবে সমগ্র জগৎ ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের নিকট বিশেষ স্বর্ণী।

ইহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, আমাদের কারখানায় ইউরোপীয়ান তত্ত্বাবধানে সকল রকম শিল্প-যন্ত্র ও সাপ্তাসরঞ্জামাদি প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের জিনিষপত্র ব্যবহারে নিশ্চয়ই সন্তুষ্টি হইবেন, আপনাদের সকল রকম খোঁজখবরাদিই সাদরে গৃহীত হইবে।

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করার বিরাত চাপ থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের অসামরিক গ্রাহক-বর্গের প্রয়োজনীয় মালপত্রাদিও সময়ে তৎপরতার সহিত সরবরাহ করিতে পারি। কোন অবস্থায়ই অবহেলা করা হয় না।

JAS. ALEXANDER & CO. LTD.

১৫, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীট (খিদিরপুর), কলিকাতা।

ফোন: সাউথ ১৪০১ Gram: "JASALEX"

নিজদের নিম্নান্বায় সন্তুষ্টি হইয়া আছে। এই বিষয়ে চৈতন্যস্বের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। তিনি পূর্বেতে কলির আচার বর্ণনাকালে বলিয়াছিলেন, কলিতে “চন্ডালিনী শূদ্র কলিরকে একাদশী...গ্রাহ্যে রাখিবে দাড়ী—পারস্য পড়িবে” (জ্ঞানদেবের ‘চৈতন্য মণ্ডল’ দ্রষ্টব্য)। এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। দাস তাহার অবস্থার পূর্বাধার ভাবিতে অসমর্থ, ভারতে তাহার জন্য হাজার দলে স্পার্টাকুসের ন্যায় চক্ষুঃস্মীলনকারী লোকের উদয় হয় না, বরং গোলামি প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থা ও ইহা হিন্দু মন্দের অনু-শাসন বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করা হয়। ব্যবহারিক দৃষ্টান্তক মনিয়, লইবার পরামর্শ উপনিষদের সময় হইতেই নানাতার চলিতেছে। ইহা নাকি হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এবং এই উপায়েই নাকি হিন্দু জাতি আজও জীবন সংগ্রামে টিকিয়া আছে। ফলতঃ সামা, ক্ষেত্রী, স্বাধীনতা, মানবের মূর্তি, জাতির সার্বভৌমত্ব কল্যাণ, সমাজ-শরীরের সর্বাঙ্গীন মূর্তি প্রকৃতি কথা এই দেশে বিশেষভাবে লোকের কাছে গহ্বরীত ও আদৃত হয় না। শিখিত লোকের মনোভাব এই: যে পশ্চাতিতে (Polity) সে অন্য লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিৎ করিয়া নিজের আর্থিক উন্নতি করিয়াছে বা করিতেছে এবং তালুকদারকে ধারকার সূচিব্য পাইতেছে, সে পশ্চাৎ তাহার দল প্রস্তুত ও প্রের। আর তাহার যে পারিবারিকের পরিকল্পনা করে সে তাহার শত্রু এবং তৎজন্ম মানবের শত্রু।

ইংরেজ ইট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে নিজকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ফলে আসবাব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই দেশে প্রবর্তিত করে। তাহার ফলে ইংরেজ গণপদেটের চাকরসমীচী ও বনহারজীবী শ্রেণীসমূহ উচ্চতর হয়। এই দুর্গমনি বস প্রদেশে সর্বাধিকার বৃদ্ধি রূপে ধারণ করিয়াছে। একপাক্তীত, পূর্বা ভারতে ইংরেজ শাসক নিজের অরক্ষণীয় করিবার একটা শ্রেণী সর্বাধিকার হইতেই সৃষ্টি করে। ইউরোপের অন্য বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ প্রবর্তিত জমিদারী প্রথা সূচ্যে পাগল, বিহার ও উড়িষ্যা আমদানী করা হয়। একপাক্তীত চিন্তাসমীচী জমিদার প্রচার উদ্ভাবন হয়, তাহারাই জমির কষক ও গণপদেটের মালিকত্ব ইহারা রাজনা আদায় করিবে, জমির উন্নতিকল্পে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা করিবে এবং তাহাদের রাজনা চিত্রসমীচী হারে নির্দিষ্ট থাকিবে, অন্য দিকে এই প্রচার স্মীয় জমির কষকের রাজনা আনিদিত্ব হারে থাকিবে ইত্যাদি সূচ্য সূচিব্য দশসালার বংশধরতঃ সংস্কারিত করা হয়। পাক্ত, এই চিন্তাসমীচী জমিদারী প্রচার অজ্ঞাতে একটা অতি বৃহৎ মধ্যবর্গভাগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অনেক স্থলে এই মধ্য স্বরের স্তরের সংখ্যা স্তরের পশ্চাৎ উন্নীত। ফলতঃ পূর্বা ভারতের লোক একমাত্র কষিকর্মের অর্থনীতির (Agricultural Economy) উপর প্রায় মুগ্ধ শত বৎসর পণ্ডায়মান হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তৎপরে, গমীশপন স্বারা-উৎপাদন প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায় একটা চাকরীজীবী বৃহৎ শ্রেণী উদ্ভূত হইতেছে। ইহারাও মধ্যপ্রাচ্য শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে। এই সব, জমির স্বত্বভোগী, ব্যবহার-জীবী, ভেষজজীবী, চাকরীজীবী প্রভৃতি নানা প্রকারের বংশীজীবী শ্রেণীসমূহ ভাবে, যাঃ এই

রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই ত ঠিক। ইহাতে আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার একটা ব্যবস্থা আছে। তৎপরে, পূর্বাধার ভবিষ্যৎ অবসর নাই না প্রবর্তি নাই বলিয়াই ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া, চক্ষুঃস্মীলিত করিয়া ইহারা বলেন, এই ব্যবস্থাই ভারতে শাস্ত্র ও সনাতন। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টির ঐতিহ্য কি আমরা এই মস্তেকার উদ্ভট মতসমূহ প্রবর্তনের দ্বারা হারায়াছি? ভারতে ওসব চলিবে না। এই সব লোক অন্য পক্ষে, স্বাধীনতা, স্বরাজ, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতির কথা বলেন এবং কেহ কেহ জাতীয় আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিও প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা সবক'র সাধনোদ্দেশ্যেই করা হয়। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা অর্থে, তাহারা নিজদের স্বদেশী শাসকশ্রেণীরূপে প্রবর্তিত হওয়া এবং তদুপায়ে স্বাধীনতা সূচ্যদল্লুক বাড়াইবার ফন্দি ব্যবহা। স্বাধীনতা অর্থে গ্রাহ্য-পূরোহিত ভাবেন, শূদ্র তাহার আরও বশ হইয়া “দেব ও লিজে প্রভাভিক” প্রদর্শন করিবে; জমিদার ভাবেন, তাঁকার জেগের চোট কিনিয়া আইন সভায় গিয়া টাকার দ্বারা তাহার তালুককে অক্ষয় করিবেন ও বাড়াইবেন; মধ্যবর্গ-ভোগীরা ভাবেন, তাহাদের মধ্যবর্গ ভোগকে জাতীয় অর্থ নীতির দেহাই দিয়া আরও ক্ষাস্যী করিবেন; ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার ভাবেন, জাতীয়তা ভাবের প্রচারের সঙ্গে তাহাদের প্রসার বংশীপ্রাণত বহাইবেন। চাকরীজীবী ভাবেন, তাহার চাকরীর পক্ষের বংশী করাইবেন ইত্যাদি। ইহারা ইংরেজী শাসন প্রবর্তিত বংশীন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বাহিরে কিছু ভাবিতে পারেন না। স্বাধীন শ্রেণীস্বার্থকে তাহার বান্ধাঘাটী স্বার্থ (Vested Interests) রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অস্তিত্ব ক্রমশী করিতে চান। এই জন্যই যে উপায়ে তাহারা নিজের স্বার্থ হরণ করেন, সেই উপায়েই তাহারা শাস্ত্র ও সনাতন বলিয়া তাৎপর্যে নানা উপায়ে চাকরীরা করেন। একবার মধ্যবর্গের কষিকজন উকিল, ডাক্তার ও জাতীয় লেখকের কাছে আসিয়া লোক-সমাজের যে কোন আছে তাহা ঠিক থাকিবে, অথচ দেশ স্বাধীন হইবে—এইরূপ পন্থা প্রদর্শন করিয়া দি। লেখক তাহার প্রত্যাহার বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি অক্ষম। ইহাই হইতেছে আমাদের দেশের শিখিত ও প্রবন্ধপাশ শ্রেণীদের মনোভূতি। এই জন্যই ইহারা ইউরোপের মধ্যবর্গ শ্রেণীর কৃষ্টির প্রতি এত ঘনরূপ প্রদর্শন করেন। এই জন্যই, আজও ইহারা পুরাতন ভিজৌরীয় যুগের মতসমূহকে শাস্ত্র বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহা ভারতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বলিয়া চালাটবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই মনোবৃত্তির জন্যই সোভিয়েট-রুশের প্রতি ইহাদের এত বিতৃষ্ণা! এইজন্যই সোভিয়েটের প্রতিপক্ষীয় কথাগুলি তাহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন; সোভিয়েটে পণ্ড বার্ষিকী পরিকল্পনা নাকি বার্থ হইয়াছে, সোভিয়েটে জমি সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম, তাহার স্ত্রী সমস্যার সহিত সোস্যালিস্ট পরিকল্পনার সমঝাব করায় সোস্যালিসম বার্থ হইয়াছে, কার্ল মার্ক্স জমি সমস্যা বিষয়ে কিছু বলেন নাই, আর রুশে জমি সমস্যা প্রধান সমস্যা, অতএব মার্ক্সের মত তথ্য চলিতে পারে না,

আবার মার্ক্সের অর্থনীতিক মতগুলি ভুল, বেশ লোকে তাহা আর বিশ্বাস করে, সোভিয়েটে মনোজ্যচারী (Totalitarian) শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, তথায় স্বেচ্ছাচারী নেপোলিয়নও প্রকট হইয়াছে ইত্যাদি সব বুলি, আমাদের দেশের সম্পত্তিশালী শ্রেণীদের ও তাহাদের ভাড়টিয়াদের দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এইসব শ্রেণী এখন গোড়া “ন্যাশনালিষ্ট” সাজিয়া হিন্দুর কৃষ্টি, ভারতের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের লক্ষ্য নামে নানা উপায়ে কার্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন—এই জন্যই, মার্ক্সের ধর্মঘটের পশ্চাতে ইহারা বৈদেশিক প্রচেষ্টা দেখেন, এই জন্যই “পাশ্চাত্য যার জমি তার” ধ্যান, সামাজিক বিপ্লবের উপায় আর মানবের অর্থনীতিক ও সামাজিক ঐশ্বর্য্য দুরী-করণকে ভারতীয় কৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। ভারতের গণ-শ্রেণীসমূহের মূষ্টির প্রচেষ্টাকে বৈদেশিক প্রভাব ও জাতীয় আন্দোলনের শত্রু বলিয়া গঠাইতেছেন। ইউরোপে খৃঃ ১৯১৯—১৯২৫ সাল পর্যন্ত তথাকার বর্জ্যোয়া ও তাহাদের ভবিষ্যৎদের মনেও এই ভীতি উপাদিত হইয়া-ছিল। রুশের ও মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের বিপ্লব সাগত হওয়ায় এবং ইউরোপের সর্বত্রই কম্যুনিষ্ট-দল সংস্থাপিত হওয়ায় এই শ্রেণীদের মহাত্ম্য সগার হয়। মধ্যপ্রাচ্যের জমিদারদের বংশধরদের আসন বিচুড়িত হইল, তাহাদের আর কেহ Gottes Gnade (ঈশ্বরের দয়াপ্রাপ্ত পুত্র) বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করে না, কারখানার মালিকদের ভয় হয়, যেহেতু শ্রমিকেরা বিনা রোজগারে লাহের (unearned increment) দখল চায় আবার কম্যুনিষ্টেরা তাহা দখল করিতে চায়, কৃষক প্রজারা জমির মালিক হইতে চায় ইত্যাদি দেখিয়া তাহারাও দিশাহারা হয়। তাহারাও নিজদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে এবং ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে—“বিশ্ব-বিপ্লব” (World Revolution) আসিল। চারিদিকে রব উঠিল—এসিয়ার বর্ষভর্য্য রুশের মধ্য দিয়া ইউরোপ গ্রাস করিতে আসিতেছে। এমনকি একজন জার্মান মনীষী ভীতি হইয়া Downfall of the occident নামে এক প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন! তিনি বলিলেন, প্রাচ্য ইউরোপের পতন হইতেছে। এই প্রকারে ভয়ে অনেকেরই মস্তিষ্ক বিকল হয়, ইহার মধ্যে একটা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হয়। খৃঃ ১৯২০ সালে সুইডেনের একজন লেখক একপ্রকারে ভীতি হইয়া কাগজে লিখিলেন, “বিশ্ব-বিপ্লব আসিতেছে, তাহাকে আর রোখা যায় না, রুশ বোলচেভিকরা এই কর্মের জন্য নানাপ্রকারের চর লাগাইয়াছে, ভারতীয় কাঁচ ঠাকুর ওই যে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও একজন বোলচেভিক চর!”

আমাদের দেশেও এইসব কারণে বান্দাদী প্রার্থের দলের লোকেরা নানা উপায়ে সোভিয়েট-রুশের নিন্দা ও সোভিয়েট কৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। সোভিয়েটকে, তাহারা অস্বীকার করিয়া জার্মানী-ইংল্যান্ড-আমেরিকাপ্রসূত বর্জ্যোয়া কৃষ্টিকে একমাত্র সত্য ও পন্থা বলিয়া আঁকড়াইয়া আছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে একদল নতুন ভাবকে সম্মিথ হইয়া-ছেন। তাহারা উনিবংশ শতাব্দীর বর্জ্যোয়া কৃষ্টির ভুল প্রদর্শন করিতেছেন এবং বলিতেছেন, ইহা

Charan 13 Mo

কার্সিয়াং (দারজিলিং)

আধুনিকতম প্রণালীতে পরিচালিত
উত্তর বঙ্গের বৃহত্তম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

দারজিলিং রোপওয়ে কোং লিঃ

যাতায়ত ব্যবস্থা { আকাশপথে : দারজিলিং — বিজনবাড়ী
মোটরে : শিলিগুড়ি — দারজিলিং

দারজিলিং প্রপারটিজ্ লিঃ

কার্সিয়াং হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক সান্দ্রাই কোং লিঃ

গোয়েন্কা এণ্ড কোং (সেলস্) লিঃ

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ

সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহ :—

গল্‌গলিয়া রাইস এ্যাণ্ড অয়েল মিলস্

এন্, সি, রাইস মিলস্, ইসলামপুর

গোয়েন্কা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

এজেন্টস্ :—

বার্মা শেল : হুগলী ক্লাওয়ার মিলস্ : ডানলপ রাবার :

রোহটাস সিমেন্ট : হ্যাডফিল্ডস্ পেইণ্ট : ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দারজিলিং, ভূম, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা,
ময়নাগুড়ি, কিশোরগঞ্জ এবং ৩০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—“গোয়েন্কা”

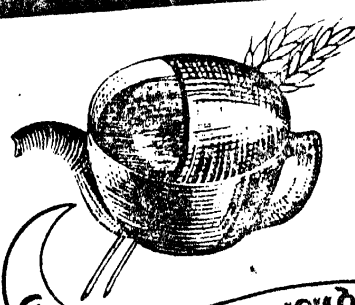
টেলিফোন :—৩৩

শ্রেণীস্বার্থ বিজড়িত। বহু পূর্ববর্তী ইতিহাসিক রচয়িতাদের ভাষায় *Martin's* নামক পুস্তক দেখাইয়াছেন, যে প্রকারে বর্তমান জ্ঞানোন্মেষের উন্নয়নের প্রকৃত করিয়া নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক মতে পরিণত করিয়াছেন। এক্ষণে অনেক সুখাইতেছেন, যে প্রকারে বর্তমানের ফিনল্যান্ড ইহাতে সমাজতাত্ত্বিক রেসিস্টার মার্কসের আদর্শবাদী করিয়া তাহার মনোনিবেশ করিবে যে বর্তমানের বর্তমানের প্রতিক্রিয়া-বাহিনী মানব সমাজে শাসন এবং শাস্যবাহিনী, এমনকি মানবের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যথা একসঙ্গে বিবাহ এবং তদুপরি যে পারিবারিক বন্ধন, কাঙ্ক্ষিত সম্পত্তি প্রভৃতি, তাহা মানব তাহার মানব পূর্ব-পুরুষ ইহাতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াছে (ভারতের লোকেরা বানরের একসঙ্গে প্রকৃতির কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিবে। কিন্তু পাকিস্তান পণ্ডিতেরা ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ, বর্তমানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রকৃতির ওকালতী করা ও চাই!) তৎপরে মার্কসের মতবাদে তাহা ভাষায় আমল ইহাতে সত্য দেশসমূহের শুল্ক ও কলঙ্কে স্যাবাই করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, ঐতিহাসিক উন্নতির সঙ্গে Germ-plasm-এর অপরিবর্তনীয়তা এবং প্রসারিত জীবনের মধ্যে Heredity শক্তির প্রাধান্য একমাত্র ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রচারিত করা হইতেছে। পূর্ব উল্লিখিত শতাব্দীর শেষ প্রত্যয়সময় যখন Colonial Imperialism (ঐতিহাসিক-পাকিস্তান) এর উদয় হয়, তখন উপনিবেশসমূহের অধিবাসীদের উপর নিজেদের শোষণ ও শাসন অতল কঠোর করা উপরন্তু ঐতিহাসিক মতসমূহও সৃষ্টি করা হয়। উপরন্তু Germ-plasm-এর ট্যান্টা এবং Heredity মতবাদ নর সমাজে প্রচারা বহিরা করা হইল "স্বতন্ত্র জাতি" নারী স্বাধীনতার অধিক, তাহারা অস্বতন্ত্র জাতির জগৎ ইহাতে বিজড়িত করিবে, ইহারা নিম্নশ্রেণীর মানবপুত্রী জাতি, তাহারা অস্বতন্ত্র জাতির অস্বতন্ত্র উন্নত ইহাদের "জাতিগত শক্তি" (Race-Capacity) তাহাদের নাই বা কমভাবে আছে। এইসব উন্নত মতবাদী জাতিগত অংশবিশেষের পর তত্ত্ব (Anthropology) নামক বিজ্ঞানের নামে চালান হইতে লাগিল। এইসব তথ্যবিশিষ্ট নর-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজতত্ত্বও সংগঠিত হইল। সেই সময় ইহাতে উচ্চতর ও নিম্নতর মানব জাতি, White man's burden (স্বতন্ত্র-জাতির ভার বা দায়িত্ব), Control of the Tropics (গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহের শাসন) প্রকৃতি নামমত জাতির ইহা সর্বত্র পঠিত ও গৃহীত হইতে থাকে। এই প্রকারে সাম্রাজ্যবাদীদের শ্রেণী-স্বার্থ প্রসারিত মত-বাদী সমাজের সত্য বলিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষালয়সমূহে পঠিত হয় এবং তাহা প্রাচ্য সভ্যতা বলিয়া আমরাও বিবেচনা করিয়া কৃতার্থ হই।

ইতিমধ্যে বস নামক একজন জার্মান পণ্ডিত আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতের আর্য ভাষাগুলির সহিত পশ্চিম এশিয়ার এবং ইউরোপের অনেকগুলি ক্রাসিকল ও বর্তমানের ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। তৎপরে, গ্রিম নামে আর একজন জার্মান পণ্ডিত তথ্য আবিষ্কার করিলেন, যে প্রকারে রাজন বর্ণের পরিবর্তন হইয়া (Shifting of the Consonants) এই সমস্ত ভাষার পার্থক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর,

জার্মান পণ্ডিত মাক্সমিলার সংস্কৃত ভাষায় সহিত একজোড়ায় ভাষাগুলির নামকরণ করিলেন— "ইন্ডো-ইউরোপীয়" বা আর্য ভাষা। ইহাতে সেই দলের আশ্রিত হইল, "ইন্ডো-ইউরোপীয়" নামটি জার্মানদের অসহ্য হয়। তাহারা ইহার নাম রাখিলেন— "ইন্ডো-জার্মানিক"। আর এক জাতীয় ভাষার জন্য "বাংলাসী" কৃষ্ণবর্ণ সহিত ইন্ডো-ইউরোপীয় আটকনের এক রক্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে মাক্সমিলার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেক ইউরোপীয় এবং আংলো-ইন্ডিয়ানদের বিশেষ আপত্তিজনক হয়। শেষে, মাক্সমিলার বসিলেন, আমি "আর্য" অর্থে একটা বিশিষ্ট জাতি বসি না, "আর্য" শব্দের সহিত মানবের চুলের বা চক্ষুর বা প্রান্তের বর্ণের সম্পর্ক নাই। "আর্য" শব্দে এক শ্রেণীয় ভাষা বসি। ইহাতে নেতিবাচকবাদের গাভরাহ নিবারণিত হয়। কিন্তু জার্মান জাতীয় পণ্ডিতেরা ছাড়িবার পার নন। যখন শতাব্দীবিংশ জার্মান রাষ্ট্রসমূহ পুনঃ পুনঃ প্রাচ্য ভাষা আক্রান্ত ও বিজিত হইতেছিল, তখন থেকেই জার্মান পণ্ডিতদের দ্বারা জার্মান জাতিদের সমীকরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। রাষ্ট্র-

দলিত্ব একই প্রকারে অসমর্থ হইয়া তাহারা জার্মান (Germandom) ভাব প্রচার করেন। এই সংগে তাহারা "জাতিত্ব" (Race-theory) মতের উপর জোর দিতে থাকেন। পরে, জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের নিজেদের "খৃষ্টিয়" বলিয়া জাহির করিতে থাকেন এবং একদল বলেন, প্রাচীন আর্যের উত্তর ইউরোপে উদ্ভূত হইয়া প্রাচ্যে অভিবাসন করে। প্রান্তের প্রাচীন জার্মানরাই নারী হাকিমিতি বর্ণের ইরানী ও বৈদিক আর্য ছিল! এই প্রকারের মনোভাব দেখিয়া একজন ফরাসী লেখক বাংলা করিয়া বলেন, "আর্য" মতটা ইন্ডো-ইউরোপীয় মত, এবং শেষে তাহা জার্মান মতে পরিবর্তিত হয়। (L. Finst L'arionie et mort de Race প্রস্তাব)। এই জার্মান পণ্ডিতদের উদ্ভটমতীর ফলে ফ্রান্সে Celticism মতটির উদ্ভব হয়। ফ্রান্সের দলের নর তাত্ত্বিকেরা বসিলেন, কেননিক মূল জাতিই আসল আর্য, তাহারাও এসিয়া ইহাতে ইউরোপে আর্য ভাষা ও মত শরীরকে আনিয়া কবিবার প্রথা আনিয়াছে। অতএব কেল্টিকদের বংশধর



নিখিল সার্বমণ্ডলীয় সমাজে নার!

শিক্ষিত ও একমাত্র খাদ্য

—কার্যে ইহা বহুল পরিমাণে সাম্যপ্রাণবিশিষ্ট, পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য।

সর্বজন সমাদৃত এবং ডাক্তারগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

মুণ্ডলের সুপার বার্লি

ক লি ক ভা।

এ যে
'ঢাকেশ্বরী'র
শাড়ী দেখছি!



ভেরী করার অসুবিধা আর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার
দরুন আজকাল হয়ত আর যত দরকার, তত
ঢাকেশ্বরী শাড়ী পাচ্ছেন না। তবু, যে গুলো
পাচ্ছেন, তাই বিশেষ যত্ন নিয়ে পরুন। পরে সুখ
আর পরতে দিয়ে সুখ, মোলায়েম ও টেকসই
এমন সুন্দর জিনিস আর কোথায় পাবেন?

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর - শ্রীমূর্ত্যু কুমার বসু।

হুতমানে ফরাসীরাই আসল আর্ব! ইহার পূর্বেই খ্রিঃ ১৮৭০ সালের ফ্রান্সো-জার্মান যুদ্ধের ফলে প্রোভেন্স-গার্দ এবং নর-ভুভের পিতামহ বংশ কাতারফাগ বলিয়াছিলেন, প্রুসিয়ার বর্বর ফিন জাতীয়, তরবারের সাহায্যে জার্মানদের উপর রাজত্ব করিতেছে। (অবশ্য প্রুসীয় গবর্ণমেন্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসহ শাখা ইহার প্রত্যুত্তর দেন যে তাহারা খ্রিঃ জার্মান এবং তৎজন্ম খ্রিঃ আর্ব!)। পুনঃ জার্মানদের জোড়ামি এবং অন্তরীণতাতে বিরক্ত হইয়া ইটালীয় নর তাত্ত্বিক সার্জি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন, জার্মানরা মিশ্রিত জাতি। এবং একটা গোল মাথা, লম্বা ন্রা সমুদ্র নাক বিশিষ্ট জাতি এশিয়ার পামীর উপত্যকা হইতে নতুন প্রস্তর যুগে ইউরোপে আর্ব ভাষা ও মতদেহকে খণ্ডনপূর্ণ করিবার প্রথম আদমনি করে। ("The Mediterranean Race" দ্রষ্টব্য)। এই কলহের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন রূপ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকেরাও ছাড়িয়ে কেন? তাহারা বলিলেন, তাহারা "আর্ব"। ফলতঃ কে আর্ব তাহা একটা রাজনীতিক-ন্যাসনানিষ্ট কলহে পরিণত হয় (Ripley—"The Races of Europe" পুস্তকে Aryan controversy নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, জার্মানীর নর তাত্ত্বিক বা ভাষা তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক এই "জার্মান" মতে সায় দেন নাই বা এখনও

দেন না। কিন্তু অশচর্যের কথা, এই উদ্ভট মতটাই ভারতে সত্য বৈজ্ঞানিক মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে! ইহা কি প্রকারে সংঘটিত হয় তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য।

যখন বিসমাক বলেন যে, প্রুসীয়রাই খ্রিঃ জার্মান এবং তৎজন্ম খ্রিঃ আর্ব! তখন ইংরেজ নর তাত্ত্বিক বেজে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া ছিলেন, তাহার শারীরিক আকৃতিই তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়! ইংরেজী Encyclopaedia Britannica, Vol. 12-1929 বলিতেছে, "That the migration of the Indo-Europeans was through Asia Minor is proved by the discovery in 1906-07 at a large mass of records dating from the fifteenth and fourteenth centuries B.C."

ইহার অর্থ, এসিয়ামাইনরে প্রাচীন মিডনাদের দেশ থেকে বৈদিক দেবতা, ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য স্বর্গের উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত ভাষার নাম ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎকার ইহাই অনুমিত হয় যে ইন্ডো-ইউরোপীয় বা আর্ব ভাষার প্রাচ্য হইতেই ইউরোপে আগমন করিয়াছিল। তৎপর, এই পুস্তকে বলিতেছে,

"In Germany many scholars... attribute to the Indo-Europeans all the characteristics of the idea of German. For this, however, there is no solid foundations." (Pp. 263-264).

ইহার অর্থ জার্মানীর অনেক পণ্ডিত

আদর্শ জার্মানের শারীরিক লক্ষণগুণিকে ইন্ডো-ইউরোপীয় জাতির উপর আরোপ করেন। তাহারা জার্মানকেই "আর্ব" বলেন। কিন্তু, এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য এই উক্তি বিগত প্রথম জগৎযুদ্ধে যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের মোহ ইংলণ্ডের নর তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের পাইয়া বসিয়াছে। এইজন্যই, জার্মান "নর্ডিকবাদ" তাহারা অকিডাইয়া ধরেন এবং সেই বিষ ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া উপনিবেশের শিক্ষালয়সমূহে প্রসার প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই উপরেই আমরা বাল্যকাল হইতেই শুল্ক পাঠ করি যে, আর্ব নামে একটা শ্বেত জাতি বিদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। আবার এক্ষণে একদল ভারতীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই শ্বেতকায় আর্বের নীল চন্দ্র, কটা চুল উত্তর ইউরোপীয়দের জাতি ছিল। তাহারাও উক্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সূত্রে সুর দিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য তাহারা জানেন। ইংরেজ পণ্ডিতেরা কি প্রকারে জার্মান nationalistchauvinistদের সূত্রে সুর মিলান তাহা ঐতিহাসিক মূর্খের বলিতেছেন, জার্মানরা নিজদের জাতের বড়াই করিয়া অনেক লিখেন, তন্মধ্যে ইংরেজ জাতিরও প্রশংসা ছিল এবং ইংলণ্ড nothing unflattered took it up ("Nationalism and Internationalism" দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ

অধ্যক্ষ যথুর বাবুর

শক্তি ঔষধালয়-ঢাকা



জগৎবিখ্যাত শ্রীমাক্ষ মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীমান্দ্র প্রমোদ শ্রীমান্দ্র রত্নানন্দ স্বামী মহোদয় শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার বর্ণনাবাদঃ—
"এই কারখানায় আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সমূহ এরূপ বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ ও পরিমাণে প্রস্তুত (manufactured) হয় যেখানকারি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম।
(Sd)—"রত্নানন্দ স্বামী"



শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের বিরাট ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হরিশ্চন্দ্রের কৃষ্ণমেলার অধিনায়ক মহাশয় "ভোলানন্দ গিরি মহারাজ অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশেষ আবেগের সহিত অধ্যক্ষকে বলিয়াছেন—"এহা কাম সত্য, দ্রোতা, স্বাপর, কালমে কোই নেই কিয়া, আপনো রাজচরবর্তী হ্যাম" ইত্যাদিঃ



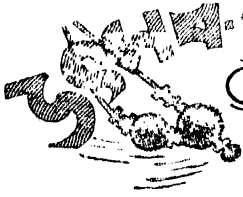
আয়ুর্বেদ যুগপ্রবর্তক
অধ্যক্ষ মহর্ষিবাবু



দেশবন্ধু সি আর দাশঃ—

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান বৈদ্য সূচ্যরূপে চলিতেছে, তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা সম্পন্ন আনাও সাধ্যাতীত।

প্রোগ্রাইটরিগঃ—অধ্যক্ষ মহর্ষিমোহন, লালমোহন ও শ্রীফণীন্দ্রমোহন মৃদার্জ, চক্রবর্তী।



ক্রেপের উৎস উৎসারিত হোক

কেশ পরিচর্যায় :
কুন্তল গরিমায় :
দশনকান্তির উৎকর্ষে :
অঙ্গরাগের উজ্জ্বলো :
তনুদেহের রূপলাবণ্যে :
সৌন্দর্য প্রভাব উজ্জীবনে :
বেশবাসের আবেশ সৌরভে :

■ ক্যান্টরল, ভুগল, কোকনল, তিলল,
লাইজ, (লাইম জুস গ্লিসারিন), সিল্‌ট্রেস (শ্যাম্পু)
নিম টুথপেস্ট, মার্গেফিস (নিম টুথ পাউডার)
মার্গে সোপ, মলয় (চন্দন সাবান)
লাবনী স্নো, তুহিনা (বিউটি মিল্ক)
রেণুকা টয়লেট পাউডার
কান্তা (গন্ধসার), ল্যাভেন্ডার



ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

সাম্রাজ্যবাদীর দল উপনিবেশবাদে শোষণ ও দমন করিবার হেতু এই নীতিক মতবাদে পান; সুইডেনই ইংরেজ নরভাজকেরা এই মত গ্রহণ করেন। পরে, সেই মতানুযায়ী যেসব তথ্য দৃষ্টকাকারে লিপিবদ্ধ হইল তাহা ভারতে একমাত্র নতুন বলিয়া গৃহীত হইতে থাকে।

ইহার ফলে, বৈদিক জাতি অগ্রেই প্রাচ্য দৃষ্ট বিশারদদের দ্বারা শ্বেতকায় জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহারা নীল চোখ—কচা চুল—লাল দাড়ি বিশিষ্ট উত্তর ইউরোপীয় জাতিতে পরিবর্তিত হইলেন এবং বর্তমান হিন্দু, আদিম অধবাসীর সাহিত্য উত্তর জাতির বিশ্রণের ফল বলিয়া নিশ্চয় প্রদত্ত হইল। আর আমাদের দেশের পাণ্ডিত্যেরা বলিলেন, পানস! আমরা কিছূ না হই, অন্ততঃ শাসক জাতির দোহাশীলা জাতি তো বটে!

এই নীতিক মতবাদ যে একটি ভীষণ সাম্রাজ্যবাদীর মত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ যখন জাতিগত বিদ্বেষ ও নারসিদলের প্রতিষ্ঠা হইল, এবং তাহারা বলিল জার্মানরাই আর্থ এবং একমাত্র Herrenvoelk (শাসক জাতি) তখন সাম্রাজ্যবাদীর ইংলণ্ডেরও মাথার টুকর নড়িল। হাডন ও ব্রাজলী নামক গৈজ্ঞানিকেরা নীতিক জগতের প্রতিষ্ঠাই অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন দেশীর ভাগ ইংরেজের মাথার চুল কাল! (We Europeans P 118 প্রত্যা)। তৎপরে গডন

চাইল্ড নামক বৈজ্ঞানিক আর্থদের নীতিক বলিয়া আনিয়া নিলেও নীতিক মতবাদকে তাঁরভাবে নিন্দা করেন। ইনি বলেন,

“The apotheosis of the Nordics has been linked with policies of imperialism and world domination”. (“The Aryans” p. 164).

ইহার অর্থ, নীতিকদের দেবের উত্তর করকে সাম্রাজ্যবাদীয় এবং অধঃশাসন নীতির সাহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমান যুগের পরে, “অপূর্ণ কিং ভাব্যতা”! সে সম্বন্ধে এখনই কোতুল জাগিতেছে।

এক্ষণে কথা এই, আমাদের দেশের পাণ্ডিত্যেরা ভারতের ইতিহাসে নীতিক জাতির চিত্র বঙ্কিত ও এত ব্যস্ত কেন? ইংরেজ পাণ্ডিত্য সিন্ধু উপত্যকায় নীতিক জাতির কয়েটি প্রাপ্ত হনান বলিয়া হতাশ হইয়াছেন। সিন্ধু সভ্যতার সাহিত যুদ্ধের জাতির কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে মতবাদ তিনি করিয়াছেন, এইটাই তাহার একটা মূল কারণ। কিন্তু “নীতিক কয়েটি” (Nordic Skull) বলিয়া কথা এ দেশেই কেবল শুন্য যায়। পূর্বে উত্তর ইউরোপের নরভাজকেরা লম্বা মাথা সরু নাক দীর্ঘ শরীর নীল চক্ষু কচা চুল উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ সম্বলিত লোককে উক্ত মূল জাতীয় বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু কেবল লম্বা মাথা ও সরু নাক বিশিষ্ট হইলেই নীতিক হয়

না। বাহা ইউক, নীতিক মতবাদী মাসকল সিন্ধু উপত্যকায় নীতিক পাইলেন না; অনেক জাতিগণ ও ইংরেজ পাণ্ডিত্য বেদে নাকি নীতিক জাতির লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু অন্য বেদ পাঠ করিলে তাহা প্রাপ্ত হন না; রূপক কল্পনাকে টানিয়া-টানিয়া সভ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া একদল লোক বেদে নীতিক জাতির অস্তিত্ব পান! বর্তমান ভারতে নীতিক না পাওয়া গেলে, সিন্ধু উপত্যকায় তাহা আবিষ্কৃত না হইলেও ভারতে নীতিকদের আনয়ন করা চাই, তাহা না হইলে আমাদের ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদীয় ব্যাখ্যা বিকল হইবে। এইজন্য শেষে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্তে যেসব পাবিত্রা জাতি আছে তাহাদের মধ্যে নীল চক্ষু ও কচা চুলের লোক আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই বৈদিক কৌমসংক্রান্ত জাতি অর্থাৎ বৈদিক কৌমসের জাতিরাই এই পাবিত্রাগুলে এখনও বাস করিতেছে। (পার্মি ও মন্ড এই বিষয়ে কি বলেন?)। বাহাদের প্রাচীন হিন্দু পাণ্ডিত্যেরা “পিশাচ” ও “প্রাচ্য” প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন; যঃ একাদশ শতাব্দীতে আল-বেরুনী বাহাদের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, পশ্চিম পর্বতদেশ লোকেরা ভারতীয় বা তাহাদের সম্পর্কীয় জাতি, ইহারা অতি বর্ণর (Prolegomena to Indica প্রত্যা)। এক্ষণে বেদে তাহাদের আনয়ন করা হইল। নীতিক দেবতাকে ভারতের ইতিহাসে আনিতেই

গুজার আনন্দ নিরর্থক!

দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত, ক্ষুধা প্রার্থীভূত, সর্বনাশা ও মৃত্যুপ্রাপ্তি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পণ্ড, শক্তিহীন সমগ্র বাংলার সন্তানদের

—হে সর্বশক্তিমান

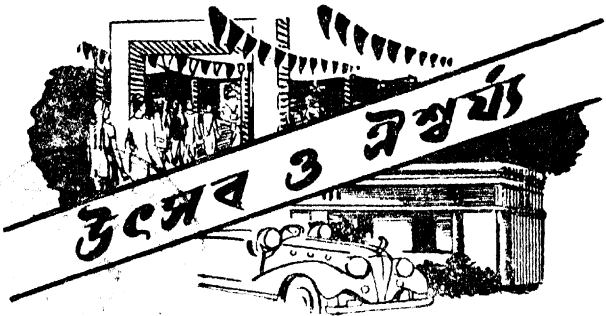
কর আশীর্বাদ, দাও শক্তি যেন মৃতপ্রায় সন্তানদের অকালমৃত্যুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া—সবল, সুস্থ এবং সুখ ও স্বচ্ছলতার প্রাপ্তবে—তোমার আশ্রয়ী উৎসব পূর্ণ-আনন্দে সাধক করিতে পারে।

“কুইনোসল”

শুধু ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক নহে—সর্বপ্রকার জ্বরের বীজ চিরন্তন নিমেষ করিয়া পুনরুৎপন্ন নিবারণ করিতে একমাত্র বিশুদ্ধ মহৌষধ।

এরিয়ান কোমিক্যাল
ওয়ার্কস

৩/২, বঙ্গাবন মালিক লেন, কলিকাতা।
ফোন: বি. বি. ৬০১৬



করাসী-বিপ্লবের অন্ততম স্রষ্টা, তৎকালীন একবার তার এক বক্তৃতা করা করেন—উৎসবের দিনে লোকে এত আনন্দ পায় কেন? দার্শনিক তৎকালে উত্তর দিলেন—“তার সঞ্চিত আর্থের কল্পনা করে।” এই উক্তির মূলে যে গভীর সত্য নিহিত আছে আজকের দিনে তাহাই মনে প্রাণে উপলব্ধি করা দরকার। উৎসবের মূলে যে ঐশ্বর্য্য সেই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইতে চাইলে, লক্ষ্যেও আগে যে কণাটি আপনাকে জানিতে চাইবে তাহা—“ব্যয়”। উৎসবের আনন্দের মধ্যে ব্যয়তর বাংলার লক্ষ্যজাতি যেন ইহা মরণ রাখেন।

গ্রেট ব্রেকল ব্যান্ক লিঃ

৩১১ ম্যাডো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শ্যামবাজার, নারায়ণগঞ্জ, হরিপাল, বরিশাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস: সেনাধ্যক্ষ ডাক্তারী

রেম্যানের—

“ম্যালোলীনা”



প্রাচীর গৌরব

ম্যালোরিয়া ও সর্ব-
প্রকার জ্বরে আশু
ফলপ্রদ—লীহা ও
যক্ষ্মসংযুক্ত প্রভৃতি
জীর্ণ জ্বরে বিশেষ
কার্যকরী।

৬ আউন্স শিশি ১১০, ডজন ১৫৫০, গ্রেস
১৬২, মাশুলানি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট
আবশ্যক।

একমাত্র পরিবেশক:

রেম্যান লাবরেটরীজ

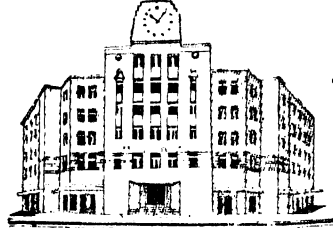
পোঃ বক্স ১২২১০, কলিকাতা।

গ্রাম- অশোকানিভট্ট, ফোন-বড়বাজার ৭৫৮

ইণ্ডিয়ান এণ্ড প্রডেসিয়াল

এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিসঃ
বোম্বাই



স্থাপিতঃ
ইং ১৯১০

নতুন বীমার পরিমাণ (ইং ১৯৪০) ...	১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমার পরিমাণ ৩১-১২-৪০	৮ কোটী টাকার উপর
জীবন বীমা তহবিল ৩১-১২-৪০ ...	২ কোটী টাকার উপর

আধুনিক বীমা প্রণালী সংক্রান্ত সকলপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুনঃ—

কলিকাতা অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার



বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক উন্নত
ধরণে প্রস্তুত আমাদের 'গৌরী' পাম্প
টিউবওয়েলের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাম্প
বলিয়া স্বীকৃত। 'গৌরী' পাম্প
অপর্যাপ্ত পাম্প অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও
সুদৃঢ় কাঠামো—অথচ মূল্যে বেশী নয়।
আজই একটি 'গৌরী' পাম্প বসান।

ডি.এন.সিঃএ কোং

১৩ অক্টোবর কারখানা—১১, শীতনাথ বোস স্ট্রিট, দিল্লি
পোঃ বক্স—৩২১১, কলকাতা, কলিকাতা।
(ফোন—৪০৮৩ ও ৪০৮৪)

দি ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—১০নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—ক্যালকাটা ৪৫৪৫ ও ৪৫৫০

পৃষ্ঠপোষক—মহামান্য ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর।

অনুমোদিত মূলধন—	... ১,০০,০০,০০০, টাকা
বিক্রীত মূলধন—	... ৯,২৫,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—	... ৬,২১,০০০, টাকা
মজুত তহবিল—	... ১,৬২,১০০, টাকা

শতকরা ৮ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন

—শাখাসমূহ—

চৌরঙ্গী (ফোন—কাল ১২০৩), কলকাতা, পার্ক সার্কাস, মাণিকতলা,
ভবানীপুর, শ্যামবাজার (ফোন—বি বি ৩৪০৩), খিদিরপুর, শালকিয়া, হাওড়া,
চুঁচুড়া, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, কুষ্টিয়া, জামালপুর, ঢাকা, শিলিগুড়ি।
বেনারস, আসানসোল, জামশেদপুর, দিল্লী, লাহোর, কাটিহার ও চট্টগ্রামে সহর
পাখা অফিস খোলা হইবে।

দক্ষতার সহিত সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ক কার্য করা হয়।

আরও ১৫,৭৫,০০০, টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষ আইনের ৯৪-এ
ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে স্মরণ
রাখিবেন যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদ্বারা প্রচারিত কোন পরিকল্পনার
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবর্তিত অথবা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও
দায়িত্ব লইতেছেন না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ

শ্রীমান্দীন জাহমেদ, এম এল এ, বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী।

হয়ে সেই জন্য এই ব্যক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

এই প্রকারে 'নৃগত' হয় নীতিক মতবাদ আশ্রয় করা ভারতের ইতিহাস, কৃষ্টি, নরতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই জন্য ভারতের অমরদের ইতিহাসের করণ' পাইতেছি।

এশ্যাতীত ভারতে নিগূঢ়ো (ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো বা কৃষ্ণ) জাতির আনুতত্ত্ব খোঁজা হইতেছে। ইহাও রাজস্বাদায়ী মতের অন্যতম। বর্তমানের ভারত-রক্ষার ভণ্ডের সম্মুখে আঁত নীচ' করিয়া প্রশ্ন করা হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য। ইহার কারণ ক্যাপিটালিস্ট দেশসমূহে মূল জাতিতে (Race) বিশেষভাবে বিশ্বাস করা হয়। আমেরিকার স্যাক্স রাষ্ট্রে ইহা চমকে উঠিয়াছে; তথায় রাশ-কর্তিত ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি Race-theory দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। শ্বেত জাতিতে তথ্যের সূত্র উন্মীলিত করা হইয়াছে এবং বর্ণ সাংকক্ষিক বর্ণনা করা হয়। স্মুটজ নামক ওই দেশের একজন রাশি-তাত্ত্বিক লেখক বর্ণ সাংকক্ষের দোষ দেখাইয়া গিয়াছেন,

The Noble Hindu is dead, he died in the white-yellow-black, quagmire ("The Race or Mongrel")

ইহার অর্থ শ্বেতকায় প্রাচীন মহান হিন্দু রাজ-বংশের কর্মে ডুবিয়া মরিয়াছে। এভাবে যাহকে মারা হইল, এখনকার ভারতবাসী নীচ-রক্তের মিশ্রিত জাতি। যাহার ধর্মমতে নগ্রো জাতীয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে সে মণীনতার কথা কহে কি? ফলতঃ সাম্রাজ্য-বাদী মতগুলি নরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, নরতত্ত্ব প্রভৃতির আকারে এই দেশে প্রচারিত হইতেছে। আর ইহার বাহন হইতেছেন অনেক রসাদী ও অধঃসরকারী ভারতীয় পণ্ডিতেরা। কেহ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" যুক্তি ধরিয়া ঐ বৈজ্ঞানিক আকারে লোকের সম্মুখে ঘরিত-ন। কেহ বিনিয়াদী স্বার্থের রক্ষাকল্পে ইহাকে 'জাতিক সত্য' বলিয়া জাহির করিতেছেন। রাগে অশা এই অজ্ঞতাপ্রাপন দেশে এতদ্বারা নেশনাল গায়ুপাদ, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রাচীন ত্রিষ্টোনগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহা বীত-নাবাগ্নিত বুজোয়াত্তর ভাবিত্তে, Race-theoryর দোহাই দিয়া নিজেদের পদ রক্ষা হতে পারিবেন। এইসব দেখিয়া সে অস্বপ্নকার গবে যে বিজ্ঞানে শ্রেণী লক্ষণ নাই। এইজন্যই শী চেতনাবস্তুর ভারতীয় বুজোয়া শ্রেণী ত্রিষ্টো কৃষ্টির প্রতি এত বিবৃষ্ট।

এক্ষণে সোভিয়েট রুমে কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতেছে তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। উপায় র্ণবাদীরা রাষ্ট্রের আওতায় মূল জাতি, বংশ-রমা, জীবগণের পৈতৃক গুণে বহনকারী ক্ষমতা, স্ক জাতি, নীচ জাতি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীয় মত-গীত হইল। মানব তাহার বাতাবরণের দ্বারা গভাস্বিত হয় এই তথ্যই স্বীকৃত হয়। লেখকের মণি নর-তাত্ত্বিক অধ্যাপক ফন লুসান বসিয়া-ব বাতাবরণ (Environment) দ্বারাই একটা ন জাতি (Race) উদ্ভূত হয়। কিন্তু ইহার লাভবিত্ত হিটলারীয় অধ্যাপক ফিসার নিজের বের মত পরিত্যাগ করিয়া হিটলারীয় অনু-নান্দ্যাদী বলেন, লুসান ইহার অনুকূলে কোন ক্ষ দেন নাই।

("Human Heredity by Fischer and Lent

অন্যদিকে রুশ-আমেরিকান অধ্যাপক সোরোকিন বলেন, Numerous statistical, anthropometrical and experimental studies have shown that there is a series of correlation of various degrees between economic position (degree of poverty or wealth) and the bodily, biological, and mental characteristics of the population of the same age and, sex in the same society ("Contemporary Sociological Theories" P. 547).

ইহার অর্থ, একই সমাজে একই বয়স ও লিঙ্গের লোকের মধ্যে দাঁড়িয়া বা স্থান-সাধে শারীরিক, জীবতাত্ত্বিক এবং মানসিক পার্থক্য সমুদ্ভূত হয়, ইহা অনেক সংখ্যাগাণিত্য, নর তাত্ত্বিক মাপযোজ এবং পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। এতদ্বারা পক্ষপাতশূন্য কথা কে বলিতেছেন তাহা পাঠকই স্থির করিবেন।

পুং লেনিনগ্রেডের বিখ্যাত অধ্যাপক পলফ-স্পারিত Pavloff Institute তাহার শিষ্যেরা যে সব জীবতাত্ত্বিক অনুশ্লথান করিতেছেন, তাহা Race-theoryর মূলে কুঠারঘাত করিতেছে। সোভিয়েট physiologist অধ্যাপক আনোশিন বলিতেছেন,—

We, in particular, already fifteen years ago, undertook a study of the "plastic" properties of the nervous system, etc. We proved that there are no absolutely unalterable nerve functions and that they are only relatively stable. It is interesting to note that these results of our long years of research were embodied by Prof. Eichen, a German scientist in exile in a book exposing the race-theory (published in Paris '36) ("Moscow News" June 25, '43.)

ইহার অর্থ, সোভিয়েট জীবতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকেরা দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, শরীরের স্নায়ুসমূহের কর্ম অপরিবর্তনীয় নহে। পরীক্ষার এই ফলটি প্রবাসী জার্মান বৈজ্ঞানিক আইখেন Race-theory (মূলজাতিতত্ত্ব) রূপ মতটি খণ্ডন করিবার সময়ে তাহার পুস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্মরণে, ইহাও দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য যে, তিনি জার্মান রাজনীতিক গোড়ারির প্রতিকল্পে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি আজ নির্দোষ! এতদ্বারা সাম্রাজ্যবাদী মতের গোড়ারির বিপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে যে, মানবের স্নায়ুসমূহের অপরিবর্তনীয়তা নাই এবং এতদ্বারা ইহাও উন্মীলিত হয় যে, একটা মূলজাতি বাতাবরণ দ্বারা অভিকৃত হয়, তজ্জনা অন্য হইতে পৃথক-কৃত হয়।

পুং সোভিয়েট Academy of Sciences এর (বৈজ্ঞান-পরিষদ) অধিবসনে স্নায়ুজাতিসমূহের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উদাটস্ফ মহোদয় যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাসিয়াছেন, উক্ত স্থানের প্রাচীন জাতিসমূহের বংশধররাই বর্তমানের স্নায়ু জাতি। এই অনু-সন্ধানের বৈশিষ্ট্য এইঃ

"Reflected in the work of the session were the new methods of investigation applied by Soviet scientists and their new approach to problems of ethnogeny i.e. they trace the origin of modern peoples, and in

particular the Slavs, through the involved process of interrelation, crossing and mutual cultural influences of ancient tribes. These methods recognize no artificial biological barriers between various peoples, which are raised by German pseudo-scientific "science" that tries to divide mankind into "superior" and "inferior" races" ("Moscow News" Feb. 23, '44.)

এতদ্বারা জার্মান নরতাত্ত্বিকদের শারীরিক উচ্চ ও নিম্নতরের জাতিসমূহের লক্ষণ দ্বারা পৃথক করিয়া কল্পনা করার পরিবর্তে বিভিন্ন কৌমার পারস্পরিক সম্বন্ধ, রক্ত-সংমিশ্রণ এবং কৃষ্টির পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা একটা 'জাতি' সৃষ্টি হয়, গবেষণার এই নতুন পন্থা সোভিয়েট নর-তাত্ত্বিকেরা উত্তর করিয়াছেন।

আবার, উপগোষ্ঠ বিভাজন পরিষদের সদস্য অধ্যাপক পুট্টেভে কেসেস এবং এসিয়ার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক আর্কিউট ব্রহসমূহের পরীক্ষা দ্বারা তথাকথিত "আর্য" এবং "অর্য" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তিনি নামসী জার্মানদের আশ্রয়ের দাবী বিষয়ে বলেনঃ

"Historical facts show that all these claims of the Fascist pseudo-scientists are an invention from beginning to end"

তৎপর, তিনি বলিতেছেনঃ

"This exposes the German fascist fabrication that the Aryans are a northern, or as the fascists put it, a "nordic race". The Aryans originate not in the north but in the south, more precisely in the southern part of the Caucasus. Also incorrect in the light of the latest scientific data, Academician Struve pointed out, is the claim made by the fascist falsifiers of history that the ancient Aryans were an Indo-European tribe How did it happen that the name "Aryans" began to be applied to certain Indo-European tribes and how was German fascism able to concoct the fable about the "Aryan" race of masters, representing to-day by the Germans? The answer is very simple. History knows of a similar example when all of Greece came to be called after the small tribe of Hellenes. For the same reason ancient historians later began to call several Indo-European peoples neighbouring the tribes of Aryans by their name, The fascists have been able for so long to keep up the book of their 'Aryan' blood although the origin of the modern Germans in general has nothing to do with the ancient Aryans, only because we did not possess until recently sufficient facts about the latter, and their place in history ("Moscow News", May 28, '43.)

ইহার অর্থ, আকাডেমিসিয়ান স্ট্রুভে বলিতেছেন, পুরোষ্ট এসিয়া মাইনর প্রাচীন মিটানী জাতি সংশ্লিষ্ট ইন্দু, বৃশ্ণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের নামের সহিত সংযুক্ত সংস্কৃত ভাষার নাম একটা ভাষা বাহা আবিস্কৃত হইয়াছে এবং বাহা জার্মান পণ্ডিত হুসিএব মতে নীতিবাদের ভারতের পথে যাইবার একটা আভা মার ছিল ("The dynasts were Indians, but Indians on their way to India"—Voelkerschiechten in

দেশবাসীদিগের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া
অন্নশান ক্লেশ ও দুর্দশা দূর করুন।

দরিদ্র ও পক্ষিল বসতিসমূহের উচ্ছেদ করুন।

দেশী বিড়ি প্রস্তুত ব্যাপারে সহস্র সহস্র নরনারী ও বালকবালিকা ঘরে বসিয়া কাজ পায়।

দুর্বল অক্ষম আতুরদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া দৃঃখ দূর করিতে

আপনিও

আনাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন
ভারতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন

ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন।

ইহার বিশুদ্ধতা ও গুণের জন্য আমরা গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি।

আমাদের অন্যান্য বিড়ির মার্কা
ত্রিশূল, পাখা ছাপ, শিকারী
সুন্দরী, নাগকন্যা, ১১১নং, ৬০৮নং
ও ৬১নং প্রভৃতি।

মূল্য তালিকা ও পাইকারী
দরের জন্য লিখুন :-

আমাদের বিশিষ্ট বিড়ির তামাক—
১নং, ৫৫এ, ২, ২এ, ৫৫এ, ৯৯এ,
৯৯৯, ১৫০এ ও ১৫০নং প্রভৃতি।

একমাত্র প্রত্যাধিকারী ও প্রস্তুতকারকঃ

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

—ঃ হেড অফিস :—

৫১নং এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা।

—ফ্যাক্টরী—

মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস্,
গোবিন্দিয়া, সি. পি.
আও গালাদ (মুর্শিদাবাদ)।

—শাখাসমূহ—

১৬০, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
সয়াদাগঞ্জ, মজঃফরপুর,
(বি, এন, ডবলিও, আর)।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের উপাদান (তামাক ও পাতা) খুচরা ও
পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য লিখুন।

allern Iran' p. 210) তাহা দক্ষিণ ককেশস প্রদেশের জর্জিয়ার্জিক ভাষা। এই জাতি নিজেকে "আর্থ" বলিত এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ আর-মেনিয়া, আর-মাজির, আর-রাট প্রভৃতি নাম দ্বারা মূল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আর, চতুঃপার্শ্বের ইজো-ইউরোপীয় জাতিগণে ক্রমে বিদেশী ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই নামে অভিহিত হইতে থাকে। ফ্যাসিস্টেরা এতদিন ধরিয়া নিজেদের জাতি বলিয়া দাবি করিতেছিল যদিচ বর্তমানের জর্জিয়ার্জিকের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। অন্যত্র এতদিন এই বিষয়ে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাই নাই বলিয়াই জার্মানদেরা এই গাণ্ডারাজ্যী করিতে পারিয়াছিল। এই অমূল স্টুভের যে মতামত সমাদরপূর্তে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জাতি শব্দের ভারতীয় উৎপত্তির দাবীকরা বিবর্তিত হয় নাই। তিনি বলেন, প্রতিবেশী মিড ও পারস্যেরা এই আর্থ নাম ধার করিয়া দেয়। যদ্বা ইহাও এইস্থলে স্বীকার্য যে অনেক জাতিগণ পণ্ডিত আছেন যাহারা উত্তর ইউরোপের নাজিকদের জাতিমত স্বীকার করেন এবং প্রাচীন ভাষার বাহির হইতে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। Poist— "Germanen und Indo-Germanen" প্রভৃতি গ্রন্থে স্বীকার করেন। আবার পণ্ডিত সের্গেই কোরোও এই কথা বলেন (Sergii, Paudler প্রভৃতি)। কিন্তু অন্যদিকে নাজিকদের জাতিমত স্বীকার করিয়া ফিসার প্রভৃতি আর্থ ও নাজিককে এক করিতে চান। কিন্তু বেশির ভাগ জাতিতাত্ত্বিকেরা আদিম আর্থ-ভাষীদের হয় এশিয়া মাইনর না হয় মধ্য-এশিয়া-উচ্চত্ব বলেনঃ (Koppers— "Die Indo-Germanische Frage in Anthrop. Bk. 30, 35 পৃষ্ঠা)

এতদ্ব্যতীত, সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মধ্য এশিয়ার নানানস্থানের ভগ্নভূত হইতে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষসমূহ আবিষ্কার করিতেছেন। ইহার মধ্যে বিগত বৎসরের আবিষ্কারটি অতি মহৎ। ফারবাজের ভগ্নভূত হইতে খ্রঃ প্রথম শতাব্দীর একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার উল্লম্ব আর একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা খ্রঃ পূঃ ২-৩ হাজার বৎসরের আনাত সহরের (আস্খাবাদের নিকট) সভ্যতার অনুরূপ (I. Mikhaïlov in "Soviet Union News" Vol. III No. 7) আমেরিকার ডাঃ পাম্পেলী কার্ণেজীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আনাতুতে একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পান। ইহাতে যেসব নর করণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা সাজির মতে ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত, গ্রীকিতে (Gern) পোরা কচি ছেলের শব্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Carnegie publications No. 73) এবং প্রকারের সমাহিত শিশুর শব্দ ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন দেশসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে; আর হিন্দুদের আজ পর্যন্ত শিশুর শব্দ এই প্রকারেই সমাহিত করা হয়। এই প্রকারের হাড়ি শিশু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য আনাত সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্থদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা গবেষণার বস্তু। পূর্বে সোভিয়েট পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, প্রাচীন ইরানের ধর্মগ্রন্থ অবিস্মৃত্য রচনার সময় যাহা প্রাজাত্ত্বিকশাসনের স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তাহা

অপেক্ষা আরও প্রাচীন। এতদ্বারা বেদের বয়সও ব্যক্তিগত হইবে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক, নরতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারা প্রচুর ইতিহাসের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এতদ্বারা ভারতের কৃষ্টির ইতিহাসের নতুন মাথা প্রদত্ত হইতে বাধ্য। ভবিষ্যতে ভারত তত্ত্বক (Indology) সোভিয়েট আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে হইবে। উদ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের ভারতীয় ভাবদোষেরা যাহারা ভারতের কৃষ্টির বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাদের মতামত খুলিয়া পড়িতে বাধ্য। সোভিয়েট বিশ্বেবিদ্যালয়সমূহে প্রাচ্য দেশসমূহের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হইতেছে এবং প্রাচীন সংস্কৃত, পাণ্ডি, তৈলুগু, ইয়ারী প্রভৃতি সাহিত্য ভাষান্তরিত হইতেছে। এমন দিন আসিতেছে যখন ভারতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সোভিয়েট দৃষ্টি দিয়া বিজ্ঞান ও প্রাজাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাহাদের জ্ঞান ভাঙার ব্যর্থ করিতে হইবে। এইজন্যই সোভিয়েট বিজ্ঞান সাম্রাজ্যবাদীয় মত বিরহিত হইয়া প্রাচ্য ও ভারতবর্ষে দৃষ্টি দিয়া গবেষণা করিতেছে, কিতাসমূহ আবিষ্কার করিতেছে, তাহা অবগত হইয়া ভারতের কৃষ্টির যথাযথ ইতিহাস বিষয়ে অবগত হইতে হইবে।

তৎপর আছে সোভিয়েটের ফলিত বিজ্ঞানের কথা। আত্মকাল এদেশের শিক্ষিত লোকেরা স্বাধীন করিতেছেন যে, সোভিয়েটের প্রদত্ত উৎসাহের ও

অফরন্ত শক্তির পশ্চাতে আছে লেনিন-স্ট্যালিন প্রবর্তিত Socialist Organized Planning। তথায় সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিবাহী পরিকল্পনা, সমন্বয় কৃষি (Kolkhoz) প্রভৃতি দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণীয় সঞ্চিত শক্তিদ্বারা শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। তথায় উৎপাদন ক্ষেত্রে কার্গিটালিষ্ট যথেষ্টাচার নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে অভিনব উপায়সমূহ গৃহীত হইতেছে। সভ্য জীবনের সর্ব বিভাগেই সংঘবদ্ধভাবে পরি কল্পনা দ্বারা লক্ষ্য সম্পাদন করা হইতেছে। এই-জন্যই আজ এদেশের অনেক Technical ইঞ্জিনিয়ার এবং Industrialist সোভিয়েট organized planning-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আজ কোন ভারতবাসী যদি বলেন সোভিয়েটের পদ্ধতিবাহী পরিকল্পনা অকৃতকার্য হইয়াছে, যদি বলেন Kolkhoz কৃষকে গোলামি প্রথায় প্রত্যাবর্তন করায় তাহা হইলে তিনি হয় অজ্ঞ না হয় উলামবোধী ব্যক্তি।

সোভিয়েটের সাফল্য দেখিয়া জগতের সকলেই মোহিত হইয়াছেন। সোভিয়েটের সোসালিষ্ট পরিকল্পনা কি তাহা জানবার জন্য এদেশের নিরপেক্ষ লোকের কৃতজ্ঞ হইয়াছে। সোভিয়েট কৃষ্টির গতি দেখিয়া আমাদের ধারণা সোভিয়েট বিজ্ঞান ভবিষ্যতে ভারতে প্রভাব বিস্তার করিবে, আর তাহা। হইতে আমরা কি উপকার লাভ করিব তাহা এদেশের অনাধীনের অনুসন্ধানের বস্তু।

মল্লিকের

মাছ ও বীজ

কৃষিজগতে যুগান্তর আনয়নে

উৎকৃষ্ট বাঁধাকপি বীজ ... প্রতি তোলা ২, মাত্র
ফুলকপি, ওলকপি, বাঁটপালম ... " " ৫০ "

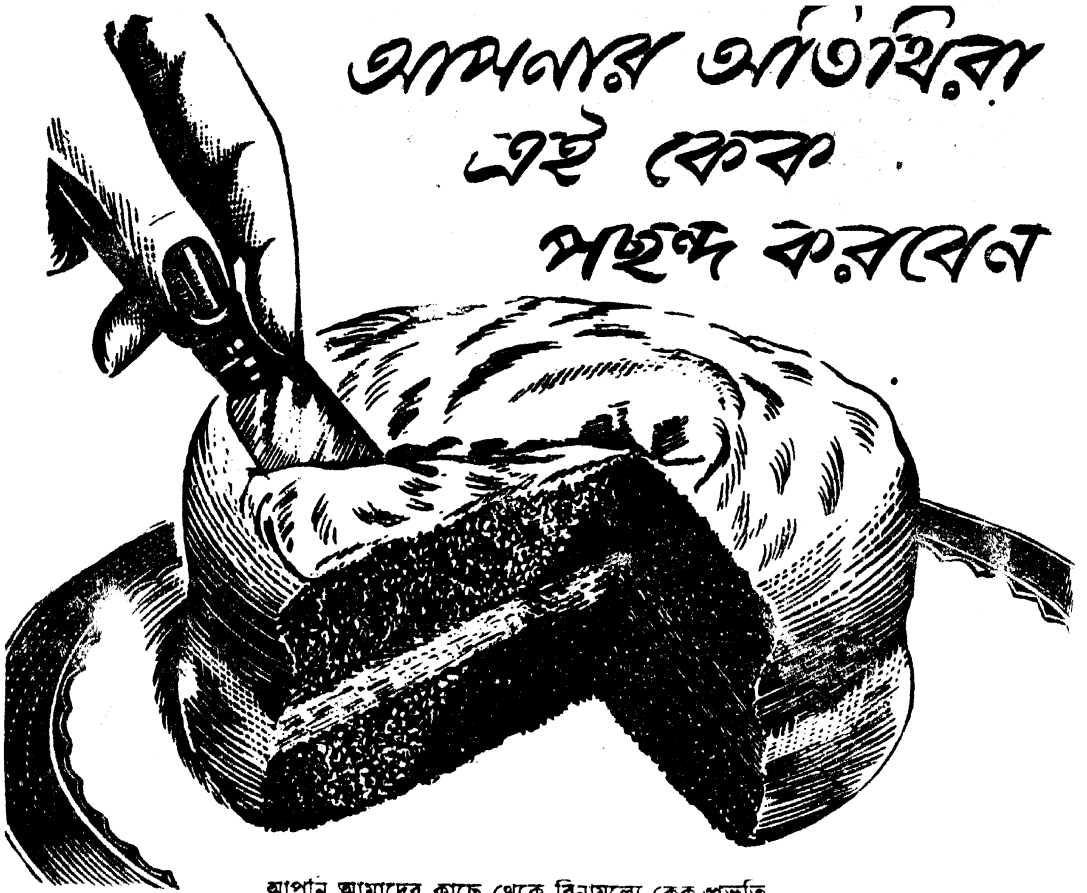
ক্যাডালগা কি

মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ যোগে বীজ পাঠান হয়।

মল্লিক্স নাশারী

৯২, কৈবর্তপাড়া লেন

সালকিষা, হাওড়া



আমাদের আতিথিবা
এই কেক
সহজ করবেন

আপনি আমাদের কাছে থেকে বিনামূল্যে কেক প্রভৃতি
তৈরী করার পুস্তিকা পাবেন। ইউনিভার্সাল কর্ণ-
ফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড পাউডার দিয়ে আপনি চমৎকার
মুথরোচক কেক, ডেজার্ট, পুডিং, বিস্কুট এবং মার্বিন
তৈরী করতে পারবেন। উৎকৃষ্ট উপাদানে তৈরী
ইউনিভার্সাল কর্ণফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড-
পাউডার সহজ পাচা এবং পুষ্টিকর।



ইউনিভার্সাল

কর্ণফ্লাওয়ার এবং
কাসটার্ড পাউডার



বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য আজই চিঠি লিখুন

বি. এস. এণ্ড সি লিঃ

৫, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা

নিখিল বেশী ঝড়িয়া পড়িয়াছিল, সা—কারিয়া শব্দ করিতে যাইবে, রত্ন হাকে সন্তপণে অথচ ক্ষিপ্ততার সহিত নিয়া লইল, বলিল—“ঘাড়ে পড়বেন নাকি?” অতুল ঘুঁষি বাগাইয়া শুনিতোছিল, রিল—“তাকে ফেলা করা দরকার তো!” মোটা বন্ধু একটু হাসিয়া বলিল—“তুমি রবে নাকি ফেলা?”

অনেকক্ষণ হইতে ইসারা-টিপনি চলিতছে, এবার শরীর এবং শক্তি লইয়া যুবতীর ঘমনে স্পষ্ট-বিদ্রূপ, অতুল চট্টয়া গেল, রিল—“না, উনি বণ্ডা-গুন্ডার কথা বলছেন, এর পেছনে বণ্ডা-গুন্ডা গোছেই একজনকে পাঠান দরকার।”

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই যুবতীর দৃষ্টি একবার মোটা বন্ধুর উপর গয়া পড়িল, বন্ধুর কাণ দুইটা হঠাৎ উত্তর হইয়া উঠিল, তাঁক্ষ দৃষ্টিতে একবার অতুলের পানে আড়ে গাইল, কিন্তু কিছু বলিবার বা করিবার পূর্বেই যুবতী মিনতির স্বরে অতুলকে বলিল—“না তাকে ধরবার চেষ্টা করে আর চোচাচোচি করবেন না; একটা গোলামাল হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়, পুলিশ-কেস হলে আরও খারাপ। আপনারা যাবেন কোন দিকে? অস্তরতঃ ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত যদি আমায় পৌঁছে দেন.....”

রত্ন বলিল—“আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন.....”

ওর মুখের কথা কাড়িয়া গইয়া নিখিল সেটাকে সম্পূর্ণ করিল—“আমরা কোথায় যাই সে তো পরের কথা, আগে আপনাকে পৌঁছে দিগ.....”

যুবতী অতুলকেই বলিতোছিল, উত্তরটা অতুলেরই দিবার কথা; ইহারা ওপর-পড়া হইয়া দিয়া ফেলায় নিখিলের পানে চাইয়া বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলিল—“ট্রাম স্টপ পর্যন্ত পৌঁছেই সটকান দেবেন?—বাঃ দিবি!.....”

নিখিল একটু উগ্রভাবেই প্রশ্ন করিল—“হাই বললাম?”

মোটা-বন্ধুও সদুযোগটা ছাড়িল না, অতুলের পানে জুঁকুটি করিয়া বলিল—“তাই বললেন উনি?—পারেন কখনও বলতে? এই বৃষ্টি নিয়ে.....”

রত্ন বলিল—“খামো তোমরা, উনি বিপদে পড়েছেন, আর এই সময় বৃষ্টি নিয়ে.....”

যুবতীকে প্রশ্ন করিল—“হ্যাঁ, আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন, ট্রামস্টপ কেন, আগে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে আমরা নিজেদের গন্তব্যের কথা ভাবব।”

রমেন একটু গলাখাকারি দিল, মেয়ে দেখায় দেয় হইয়া যাওয়ার কথা বলিবে ঝড়িয়া—রত্ন তাহাকে বা হাতে একটু টিপিয়া মানা করিয়া দিল। যুবতী বলিল—“আমি

যাব তিয়াত্তর নম্বর বস্ বোসের গলিতে, গ্রে স্ট্রীটের ট্রাম থেকে নেমে.....”

“হব্ বোসের গলি!”—সকলে উন্নয়িত হইয়া উঠিল। রত্ন বলিল—“হব্ বোসের গলি? বাঃ, আমরাও তো এ দিকেই যাচ্ছি..... আমাদের নম্বরটা কত হে রমেন?”

রমেন, নিখিল এবং অতুল এক সংগে উত্তর করিল “তেরো।”

“বাঃ, তবে তো কোন কথাই নেই; আপনাকে পৌঁছে দিয়ে.....”

বন্ধু প্রশ্ন করিল “আগে তিয়াত্তরটা পড়বে কি আগে তেরোটা?—যদি তিয়াত্তরটা পড়ে তো.....”

অতুল বৃষ্টির সম্পর্কে খোঁচা খাইয়া—মুখাইয়া ছিল, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিয়া উঠিল—“না, তিয়াত্তর তো চিরকালই তেরোর আগে, ধারাপাতে মত্থস্থ করেন নি?.....”

বন্ধু উত্তর দিবার আগেই যুবতী বলিল—“না, উনি মত্ন করছেন, এটা যদি গলির উত্তো দিক হয়তো বড় নম্বরগুলোই আগে পড়বে কিনা। আর ব্যাপারও তাই, এই দিকটাই শেষ দিক গলির।”

অতুল কথাটা বলিয়াই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছিল, একটা ঘেঁটি গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—“তথলে চল রত্ন, আর এখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মিছে গলতান করা কেন?”

যুবতীকে মাঝে বাখিয়া এবং একেবারেই পাশে থাকিবার জন্য একরকম স্টেলাস্টেল করিতে করিতেই সকলে অগ্রসর হইল।

(৩)

বন্ধু বলিল—“একটা রিকশা ধরে নিরে আসব না হয়?”

“সে আর জিগেস করতে আছে?..... দু’মিনিট—একটুপ নিয়ে আসাচ্ছি এই মোড় থেকে”—বলিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি পা বাড়াইতেই যুবতী বাস্তু ভাবে বলিয়া উঠিল—“না, না, এটুকু যেহে আমার কোন কণ্ঠেই হবে না, অবশ্য আছে হাটা.....”

এক রমেনের মাধ্যমেই উপকারের নেশা ঢোকে নাই, বরং সমস্ত ব্যাপারটি সে একটা দৈব উপদ্রব বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতোছিল, বলিল—“তা ভিন্ন ঠর দেয়ও তো হয়ে যাচ্ছে? রিকশা আনতে-করতে.....”

রত্নর দিকে চাইয়া আরম্ভ করিল—“ওদিকে আমাদেরও.....”

রত্ন চোখের ইসারা করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

নিখিল বলিল—“ওকে কিন্তু ভালো করে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাওয়া সরকার, কে জানে কার কি রকম অভিসন্ধি আছে। আসেপাশে কেউ ওৎ পেতে আছে কিনা.....”

আগলানোর মধ্যে কোন খুঁত ছিলই না তাহার উপর আরও ভালো করিয়া আগলাইবার জন্য সে একটু, স্টেলাস্টেল হইল তাহাতে কতকটা ভারসাম্য হারাইয়া অতুল যুবতীর প্রায় ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছিল, মোটা-বন্ধু বেশ কড়া হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া—পিছনে টানিয়া লইল, ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতই



বন্ধু বেশ কড়াভাবে তাহাকে পিছনে টানিয়া লইল



সুখ ও সাড়ী

মিলের নরম একথানা আটপোরে সাড়ীতে যে আরাম দেশের মেয়েরা পান—সে আরাম দামী সাড়ীর সীমানার বাইরে। জরিতে ভারী, শল্মাতে খসখসে, চুমকিতে জাঁচড়। তবে দামী সাড়ীরও উপযোগীতা আছে বৈকি। সখ ও সময় বিশেষে এর ব্যবহার অনিবার্য। যে পরিমাণে আরামী-সাড়ী তৈরি করে আমরা সুখ পেতাম বর্তমান কামানের ধোঁয়ায় তা অসম্ভব। তবে সুখের কথা এই যে, ধোঁয়া ফিকে হয়ে আসছে। আশা করি আসচে পূজায় কারণ দেখিয়ে আর কতব্যের কাছে মাগ চাইতে হবে না। আশা করি সোজাসুজি বলতে পারবো—আমুন, পরিধানে যদি সুখ চান, মহালক্ষ্মীর সাড়ী কিনুন।

মহালক্ষ্মী
কটন মিলস লিমিটেড

ব্যানিং: এজেন্ট: এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লি: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

ক বা যাই হোক, একটা কাকিন লাগিল
মুনের। ওরা তিনজনে একটু আগাইয়া
ভুল।

অতুল রুখিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল
“এর মানে?”

বন্ধু বলিল—“ঘাড়ে
ভুলে নাকি ভদ্র-
হিলার?”

টের না পাইয়া
হারা আরও একটু
মাগাইয়া গেছে। অতুল
সইহুপ উগ্ৰভাবেই
বলিল—“আলবৎ পড়ব,
তোমার কি?—হোয়াট
ইজ দ্যাট টু ইউ?”

এত রোগা লোকের
দুখে এতটা বেপরোয়া
উত্তর বন্ধু আশা করে
নাই, একটু থতমত
খাইয়াই মুখের পানে
ঢাছিয়া কি উত্তর দিবে
ভাবিতেছে, রমেন ঘাড়
ফিরাইয়া বলিল—“ওক,
তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে,
দেীর হয়ে যায় যে!”

যুবতী, নিখিল
এবং রত্নও ফিরাইয়া
তা কাইল, যুবতী
দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভীত-
ভাবে বলিল—“কি হল,
দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?”

অতুল বন্ধুর পানে
একটা কটাক্ষ হানিয়া
সহজ কণ্ঠে বলিল—
না, বন্ধুর চোখে একটা
কি পোকা পড়ল, তাই.....”

বন্ধু দাঁতে দাঁত পিষিয়া চাপা গলায়
বলিল—“যে বলে তার চোখেই পোকা পড়ুক।”

তাড়াআড়ি আসিয়া যখন নিজের নিজের
গয়গা লইল চাপা আক্সো তখন দুই জনেরই
নে ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

গলি বহিয়া সকলে বিভ্রম স্ত্রীতে আসিয়া
পড়িল। রমেনের মনটা অন্য দিকে, ব্যাক
দপাইয়ের মধ্যে একটু উপকার করিবার জন্য,
একটু কথা কহিবার জন্য, একটা কথার একটু
ইত্তর দিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে।
বদপগলা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়া
গঠিতেছে, চাহনি আরও উৎকট। বিশেষ করিয়া
নিখিল, অতুল আর মোটা বন্ধুর মধ্যে। রত্ন
মনেকটা সংযত, একটু কাণ্ডজ্ঞানও আছে;
খন খুব বাড়বাড়ি হইয়া পড়িলার মতো
হইতেছে, দু’একটি কথা বলিয়া ঠান্ডা করিয়া
দিতেছে।কেমন হাসিতে হাসিতে
কসঙ্গে বাহির হইয়াছিল, এখন

তাহার চুয়ায়শ হাঁও বকের মধ্যে মরণ-বাধনে জড়াইয়া ধরিল

পবনস্রবের সমন্বিত প্রমেই বিযুক্ত হইয়া
উঠিতেছে। যুবতী একবার এর সঙ্গে একটু
কথা কহিয়া, কি ওর দিকে একটু মিষ্ট,
লজ্জিত দৃষ্টিপাত করিয়া, কি তাকে একটু
সমর্থন করিয়া বিযুক্তক সেন মাঝে মাঝে
আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

শুধু উপকার আর কথা কওয়া লইয়াই
না; যাহার যাহা লইয়া পরিচয় সে সেইটাকেই
গড় করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়াতেও
গোলমাল, কথাকাটাকটির সৃষ্টি হইতেছে।...
নিখিল কলেজের কথা তুলিবার চেষ্টা করিল
কয়েকবার, কলেজ মাগাঠানে একটা পদ
দিবার জন্য এডিটার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে
—সে-কথাটাও। বোটা-বন্ধু কলেজ বা কবিতার
ধার ধরে না বিশেষ, রমেনের বালাবন্দু,
পাড়ার থিয়েটার—জিমেনেসিরামের পাণ্ডা, সেই
হিসাবে চলিয়াছে, কবিতার কথায় বলিল—
“এসব রাবিশ কবিতা-টবিতা এখন ধামাচাপা

দিন মশাই, এখন দেশ চায় সোলজার—নাড়—
সিটিস মাসল”

নিজের দক্ষিণ হাতটা মূঠা করিয়া
বাকিইয়া ধরিল।

কথাবার্তায় যুবতীর একটু পরিচয়ও

পাওয়া গেছে, প্রশ্ন
করিল—“মিস্ সেন কি
বলেন?”

মিস্ সেন একটু
মিষ্ট হাসিয়া বলিল—
“আমি যে অবস্থায়
পড়েছি তাতে আমায়
জিগোস করাই বাহ্যল্য
নয় কি?”

বিশেষ এ মন
হাসির কথা না হইলেও
সবাই হাসিয়া উঠিল,—
অবশ্য নিখিল ছাড়া।

অভ্যাসবশেই ডান
হাতটা একটু শক্ত
করিয়া বাকিইয়া বন্ধু
বলিল—“এ ক দিন
আসুন না আমাদের
জিমেনেসিরামে আমাদের
কাপ, মেডেল সব
আপনা কৈ দেখাই।
সেদিন উত্তর মুখার্জি
এসেছিলেন, সব দেখে-
শুনেন...”

অতুল হিংসা
এ কে বা রে জুর্লিয়া
খিচাইয়া বলিল—“আরে
হাইতেছিল, একটু
রেখে দাও তোমার
জি মনে সি য়া ম,—

গুডামির আন্ডা একটা; সেবারে হাতীবাগানে
অশ্বিনকাণ্ডের পর থেকে আমার ও জিনিসটার
ওপরই বিতংটা ধরে গেছে...”

বন্ধু দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুইটা বড়
করিয়া গলাটা বাড়াইয়া বলিল—“তোমার
বিতংটা ধরে গেছে!—এতবড় একজন এ্যাথলেট
মিষ্টার পাম লীফ সিপর?—আমি কালই গিয়ে
তুলে দেব জিমেনেসিরামটা.....”

অতুল আর বন্ধুকে কিছু বলিল না,
রোগে কাঁপিতে কাঁপিতে রমেনের পানে ঢাছিয়া
বলিল—“রমেন, আমি এখান থেকেই ফিরলাম
ভাই, দুঃখ করো না, এমন একজন অদ্ভুত
যে-কম্পানিতে.....”

বন্ধু বাকিয়া দাঁড়াইল, গজনি করিয়াই
বলিল—“অদ্ভুত!!!”

রত্ন দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া একোকাটাও
সামলাইয়া লইল। আর ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা
জানিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—“মিস সেন কণ্ঠটা
দুঃখিত হচ্ছেন তাবো দাঁকিন!!”

(৪)

দুইগতই হইয়াছে মিস সেন, একটু নিরাশও; একটা সন্ধ্যা নষ্ট হইলে কে না হয়?—তবে সে ভাবটা চাপিয়া একটু হাসিল বলিল—“না, না, এতে আর দুঃখের কি আছে? নিজের নিজের বাস্তবতা অভিমত.....”

বংকু আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, শরীরটাকে শক্ত করিয়া লইয়া বলিল—“বাস্তবতা অভিমত! অল্প বললে সমস্ত কম্পানিটাকেই অল্প বলা হোল না? অথচ আপনি—একজন ভদ্রমহিলা সেই কম্পানিতে.....”

অতুল আবার দুখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—“খলরদার ওকে এর মধ্যে টানব না বংকু, লেডিদের আমি কতটা সম্মান করি তুমি জান না.....”

রত্ন আবার অগ্রসর হইয়া আসিল, দুই-জনকে দুইদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল—“আঃ, থায়ে না ভাই; বেশ জো, সম্ভ্রম করো তো অমন করে আস্তিন গুটোচ্ছে কেন?.....”

রমেনের বিলম্ব হইয়া যাঁতেছে; বিরক্ত এবং অশীর্ভাবের নাকটা কুচকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—“তার চেয়ে আমি বলি, অতুল যেমন বেতে চাইছিল ওকে যেতেই দাও না.....”

অতুলের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল,—অভিমনে মূখটা গম্ভীর করিয়া রমেনের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—“তুমি এই কথা বললে রমেন?—তুমি—ইউ!”

রমেন থমতন খাইয়া অপ্রতিভভাবে বলিল—“না, না, তুমি নিজে বললে, তাই.....”

“বললে তো এই কথা?—নিজে ইনভাইট করে?”

“না না; মানে এদিকে এদর দোর হয়ে যাচ্ছে.....”

“মানে রেখো, আমার আর দোষ রইল না,—নিজেই ডেকে নিজেই তাড়ালে.....”

“না, না, আমার ভুল বুদ্ধি না অতুল, এরও দোর হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও একজন মেয়েকে কনসারভ—তাই.....”

“মাই-জ, তোমার কাজেই যাচ্ছলাম গুড্ বাই.....”

মনে হইল যেন গলাটাও একটু ধারিয়া গেছে। ঘুরিয়া মাথার উপর হাতটা তুলিয়া আবার দুইবার “গুড্ বাই, গুড্ বাই” বলিয়া উল্টানিকে পা বাড়াইতেই রত্ন ধারিয়া ফেলিয়া বলিল—“কি ছেলেরানবী হচ্ছে অতুল—মিস সেনের সামনে?.....”

যেমন হয়, অভিমানটা বাড়িয়াই গেল। “তবে তুমি অতুল মিথ্রকে চেন না ভাই!”—বলিয়া একটা ফাঁকি দিয়া ই হাতটা ছাড়াইয়া অতুল অশ্রুকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সকলে একটু স্তম্ভিত

হইয়া দাঁড়াইল। তারপর রত্ন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল—“আমাদের মার্জনা করবেন, মিস সেন।”

এবারও মিস সেন একটু মিষ্ট হাসিয়াই বলিল,—“কি! এতে মার্জনার কি আছে? নিজের নিজের অভিমত.....”

দলটা আবার অগ্রসর হইল।

গলি অপেক্ষা সদর রাস্তায় লোক চলাচল বেশি, অশ্রুকার তো আছেই; এদিকে চার-জনেরই এমন করিয়া আগলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা যাহাতে মিস সেনের গায়ে অন্য কাহারও গাতি না লাগে। প্রাক আউটের রাস্তায় লোকে একটু বাস্তব বিস্তৃত হইয়াই চলে, কয়েকজনের সঙ্গে ছোটখাট একটু, সংঘর্ষও হইয়া গেল। বেশ নয়, কথাকাটি পর্যন্তই, কেননা মোটা বংকু সব ক্ষেত্রেই আগাইয়া দাঁড়াইতেছিল বলিয়া ব্যাপারটা বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, তবু বিলম্ব হইতে লাগিল।

হয়ত নিখিলই শূন্য করিল—“চোখ নেই মশাই? দেখছেন একজন মেয়েকেলে যাচ্ছেন...”

“যান না উনি, আমি তো তফাতে আছি।”

“যান না উনি মানে? আমি এগিয়ে না এলে আপনি তো যাড়ে পড়ছিলেন ঠর।”

“যাড়ে পড়ব—পাগল না ব্যাপা?”

“উলটে আমাকেই পাগল না ব্যাপা বলছেন?”

কি অন্যায়টা বলিছে? নাহক্ যেমন গায়ে পাড়ে ঝগড়ার জোগাড়.....

নিজের দর বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মোটা বংকু অশ্রুকারে একটু আড়ালে থাকে, এই রকম মোক্ষম সময়টিতে আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া ধারিয়া বলিল—

“কি ঝগড়ার জোগাড়ের কথা হচ্ছে যেন?—আমি একটু শুনতে পাই?”

লোকটা আপাদমস্তক একবার দেখিয়া

লইল। বলিল, “না, বলছিলাম—সন্দেহ রাতে যদি এতো বেহুশ হই যে একজন ভদ্রমহিলার যাড়ে পড়ি তো পাগল ভিন্ন কি বলবে লোকে আমার?”—এই কথাই বলছিলাম ওকে।”

একটু হাসিবার চেষ্টাও করায় আর গোলমাল বাড়িল না।

কিন্তু অন্যদিকে গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। নিখিল ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। একবার সামান্য উপলক্ষ্যেই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল উত্তাপটা। নিখিল বলিল—“আঃ, এবার আপনিই যে যাড়ে এসে পড়বেন মশাই!”

বংকু প্রশ্ন করিল, “কর?”

“আমার, আবার কার?”

“সরে দাঁড়ান আপনি, একটু গায়ে গাঠেকলেই যদি মনে করেন যাড়ে পড়ছি তো.....”

“সরে দাঁড়ান মানে? সবাইকে কি অতুল-বান্দু পেয়েছেন নাকি? আমার যাড়ে একটা কতবোর বোকা আছে, যতক্ষণ না সে বোকা নামকে ততক্ষণ নিখিল গাঙ্গুলী নিজের পোষ ছাড়বে না জানবেন। এই তার প্রিন্সিপল—এর জন্যে সে আত্মবলি দিতেও প্রস্তুত, আমি অতুলবান্দুর মতন.....”

বংকু ঠোঁট কুচকাইয়া শ্লেষের দৃষ্টিতে শূনিতোড়ল, বলিল “শুধু ফাঁকা ভাষায় জোরে যদি এসব ডিউটি সারা যেত.....”

নিখিল দাঁড়াইয়া পড়িল, অল্প পরিসর বৃকটা চিতাইয়া বলিল—“অনা রকম শত্রিও অভাব নেই, যদি মনে করেন গুড্‌সেদের মতন আনন্ডার মাটি মাখলেই.....”

বংকু একেবারে ঘুরি বাগাইয়া দাঁড়াইল, হুঁকার করিয়াই বলিল—“আর একবার বলুন তো ও-কথাটা.....”

রত্ন, রমেন দুইজনেই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের চলাচল বেশি, বেশ কয়েকজন



হুই কে? অতুল না নিখিল?

ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকশন

কোম্পানী লিমিটেড

গৃহ ও সৌধাদি নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, পথ-ঘাট
প্রস্তুত, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি সকল প্রকার
নির্মাণকার্যের ভার গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে “ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানী” সরকারী ও রেলওয়ে সংক্রান্ত
নির্মাণকার্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত আছে। কিন্তু যুগ্মের পরে আপনার
প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্মাণকার্যে কোম্পানী আপনাকে সাহায্য করবে।

টেলিফোনঃ
ক্যাল ১৩০৭

এস. সি. সরকার,
মানেজার।

ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

সংগ্রামে ও শান্তিতে হিন্দুস্থান কটন মিল্‌স্

সমভাবে জনসাধারণের সেবা করিতেছে।

“হিন্দুস্থানে”র ধুতি ও শাড়ী মে ল্যায়েম
সুদৃশ্য ও টেকসই অমট হুস্তি নয়।

“হিন্দুস্থানে”র বস্ত্র সর্ববিষয়ে
আপনার পরিবারের উপযোগী

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান :

শ্রীযুক্ত.এস. এম. ভট্টাচার্য

হিন্দুস্থান কটন মিল্‌স্ লিঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস্
মিশন রো, কলিকাতা।

ঘিরিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসাবাদ, হস্তগত
সালিশী;—বেশ খানিকটা গোলমালের পর
যখন সবাই সরিয়া গেল, দেখা গেল অতুল
আবার কখন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।
উদ্ভাসনভাবে প্রশ্ন করিল—“আমায় ডাকছিলে
তোমরা কেউ?”

সকলেই অম্বকালে যেন ভুত দেখিয়াছে
এইভাবে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া
পাড়িল। রমেন, রত্ন, নিখিল একসঙ্গে প্রশ্ন
করিয়া উঠিল—“তুমি! চলে গিয়েছিলে যে,
আবার...”

অতুল একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—“না,
ইহা খাচ্ছিলাম—খাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল কে
যেন দ্বার ‘অতুল, অতুল’ বলে ডাকলে—
তমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ভাবলাম, তারপর
কোন বিপদ হয়েছে মনে করে উদ্বেগে ছুটে
আসছি...”

উদ্বেগে ছুটিয়া আসার মত হাঁপাইতেছে
না মনে পড়িয়া যাওয়ার তখনই সেটা আরম্ভ
করিয়া দিল। মিস সেন একটু সরিয়া
দাঁড়াইয়াছিল—মনে হইল যেন “থক্-থক্-
করিয়া দুইবার চাপা হাসির শব্দ হইল—কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গেই জোর কাশির শব্দ আরম্ভ হওয়ার
সে সন্দেহটা আর বাড়বার অবসর রহিল না।

কিন্তু গোলমালটা আবার মাথা চাড়া
দিয়া উঠিল। একে নিখিলই অসহ্য হইয়া
উঠিয়াছে, তাহার পর অতুল গিয়া আবার
ঘিরিয়া আসিল—চাপা রাগে মোটা বন্ধু ফোস
ফোস করিতেছিল, মনের ভাবটা আর চাপিতে
পারিল না, বলিল—“বন্ধুর একটু
গোয়ার-গোবিন্দ বলে বদনাম আছেই—পেটের
কথা চেপে রাখতে পারে না—তুমি যদি সত্যিই
চলে যেতে অতুল তো এতক্ষণ বোধ হয় হাইল
খানেক তফাতে থাকতে—নিখিলবাবু, বার
দুইকে তোমার নাম করেছেন কি না করেছেন
অতদূরে তার আওয়াজটা...”

অতুল গর্জন করিয়া আগাইয়া আসিল—
“যাই নি হো আমি চলে—গোয়ার-গোবিন্দের
হাতে ভরমাইলাকে ছেড়ে...”

মাথায় যে আগুনটা ধোঁয়াইতেছিল,
একেবারে মগ্ন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—বন্ধু
হুৎকার করিয়া উঠিল—“জিব টেনে বের
করে নোব!”

একেবারে মাথার উপর ঘাসি ডুলিয়া
ধরিল। এবারে আর রত্ন, রমেন আসিয়া পড়িতে
পারিল না: তাহার আগেই “কি করছেন, কি
করছেন, ছিঃ!”—বলিয়া ব্যর্থ করিবার
অভিলাষেই নিখিল মাঝখানে পড়িয়া বন্ধুর
বুকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে প্রায়
পড়-পড় হইয়াই নেহাৎ জিম্মান্যাস্ত্রের জোরে
কোন মতে সামলাইয়া লইল। তাহার পরই
সামনে একটা লক্ষ দিয়া দুইজনকে এক সাপটে
তাহার চুম্বাশিশ ইণ্ডি বন্ধের মধ্যে মগ্ন-বাঁধনে
জড়াইয়া ধরিল।

হাত পা চালানর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের
শব্দটা লাগিয়া থাকে বলিয়া কলিকাতার রাস্তার

মারামারি দ্বারী হর না। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই যে আর কাজ ভালভাবেই সারিয়া লয়। ...ওইটুকুর মধ্যেই জায়গাটের ভিড় জমিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারও হইয়া গেল। রহিল মাত্র দুইজন, তাহার মধ্যে একজন রমেন। তাহার সংগী বসিয়া পড়িয়া দু' হাতে মুখটা চাপিয়া গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করিতেছিল, রমেন বলিল—“ওঠ, পুলিশ এসে পড়বে একদিনি—ওদিকেও দেরি হয়ে গেল।—তুই কে?—অতুল, না, নিখিল?—সে ছড়িটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না; কোথা থেকে কালসাপিনী এসে জুটল এক...”

পরদিন সন্ধ্যার পর সেই বকুল শাখার আড়ালে আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। মলিনার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়া সুকুমার বলিল—“এই নাও তোমার শাড়ি, ব্লাউস আর ভানিটি ব্যাগ; আর এই ছাতা... ক'জন এসেছিল দেখতে?”

মলিনা চাপা গলায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, এবার যেদিন থিয়েটারে ফিল্মে পাট করবে তোমার মেডেল দোবা আমি...এসেছিল দু'জন; আহা সে যদি অবস্থা দেখতে! একজন লজ্জায় তো মুখ তুলতেই পারলে না; অতদূর থেকে এসে দুটি প্রশ্ন—‘কি নাম, আর কি পড়; যেন কোন রকমে পালাতে পারলে বটে, আর একজন বাঁ হাতে গালটা চেপে মাঝে মাঝে শব্দ গ্যাঙিয়েই কাটিয়ে দিলে। হ্যাঁগা, মার খাওয়ালে কি করে? আহা...”

হাসি চাপিবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল।

সুকুমার বলিল—“ঐতেই হেসে সারা হচ্ছ, সব ইতিহাসটা শুনলে তো পাড়ার লোক জড় করে ফেলবে।”

মলিনা জিদ ধরিয়া বলিল—“না, শুনতে হবেই আমরা।”

একটু কি ভাবিয়া বলিল—“এক কাজ করো; খুঁড়িমা-টুঁড়িমা সবির সামনেই কর গল্পটা, তুমিই মেয়ে সেজেছিলে আর আমায় দেখার কথা বাদ দিয়ে...হ্যাঁ, তাই করো...”

“পাগল হয়েছ? এত তাড়াতাড়ি করা চলে এ গল্প? একজন আবার এসে গ্যাঙাচ্ছিল বলছ...তবে বলব'খন একদিন—শীপিরই...শব্দ খুঁড়িমা থাকবেন না...”

“কবে?”

সুকুমার স্মিত-দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল মলিনার পানে, বলিল—“বিয়ে হয়ে গেলে একদিন।”

মলিনা একটা চটুল হাসিতে ঠোঁট দুইটি ফুগিত করিয়া লইয়া বলিল—“তবে তো খুবই শীপির!—বসে থাক সে আশায়—অন্ততঃ দশটা জায়গা থেকে দেখে না গেলে আমি

রাজিই হব না, দেখো; খান দশেক নমুনা আমি দেখব এখনও...মিলিয়ে নিয়ো...”

হাসি চাপিবার জন্য আবার অঁচল মুখে গুঁজিয়া দিল।

নীচে বাড়ীর ও-কোণ হইতে খুঁড়িমার

গলা শোনা গেল—“অল্ল, সাবান, তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই যে গা ধুতে চলে গেল; কি ভুলো মন বাপু মেরে!...”



নৃত্যকুশলা ছায়া-
চিত্র শিল্পী শ্রীমতী
সাধনা বসু র
অনিন্দ্য সুন্দর
অভিনয় ও নৃত্য
পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে, তাহার
অঙ্গের নিখুঁত স্বক
ও উজ্জ্বল বর্ণ-
সম্বলয়ে; এ বৎ
আমাদের গর্ব এই
যে, তিনি স্বীকার
করেন যে, প্রাচীন
নিয়মিত ওটীন
ক্রীম ব্যবহারের
ফলেই তাহার
নিখুঁত স্বক ও
উজ্জ্বল বর্ণ এখনও
অক্ষান আছে।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sadhona Bose



ততঃ কিম?

ডক্টর স্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত

যুদ্ধের মোড় ফিরিয়াছে। যে বিরাট দানবের ছায়ায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া নিদারুণ আশঙ্কা ও আশার ক্ষীণতম আলোকরেখার জন্য আকুল প্রতীক্ষা ও উদ্বেগে অধীর হইয়াছিল, সে আজ আহত। আজ আশা করিবার হেতু হইয়াছে যে হয়তো তার বক্ষে শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, তার পতন সুনিশ্চিত।

মোড় ফিরিলেও যুদ্ধের সমাপ্তি একেবারে আসন্ন, এ আশা এখনও করা যায় না। হয়তো এখনো সময় লাগিবে। তার পর কি হইবে? এই কথা লইয়া আজ চিন্তা ও গবেষণার অন্ত নাই। সেই সমস্যা লইয়া পৃথিবীর ধূরন্ধরগণের বাস্তবিক মতামত বিস্তার শোনা যাইতেছে, কনফারেন্সের পর কনফারেন্স বসিতেছে। মতামতের বৈচিত্র্য আর অবধি নাই। ইহা শৃঙ্খল স্বাভাবিক নয়, ইহা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু এই সব মতামতের ভিতর আজ যে সব সুর প্রধান হইয়া বাজিতেছে, তাতে দৃষ্টিভ্রমের অবসর আছে।

পরিশ্রান্ত পৃথিবী আজ কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি। যুদ্ধের পর আসিবে চিরশান্তির যুগ, হইবে সবজাতির সুখ ও সমৃদ্ধি, এই আশা লইয়া অনেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রশ্ন এই যে, তাহা হইবে কি?

যুদ্ধোত্তর জগতের সমস্যাগুলি তিন দিক হইতে বিবেচনা করা যায়—রাজনৈতিক, আর্থিক ও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া আমি রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার কথাই আলোচনা করিব।

যুদ্ধোত্তর রাজনীতি।

যুদ্ধের আরম্ভ যেসব কথা হইয়াছিল তাতে বলা হইয়াছিল, এ যুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষ কোনও রাজ্যের দেশগত অধিকার প্রসারের কামনা করেন না। ইউরোপে—ইহারা ইউরোপের কথাই বরাবর ভাবিয়া থাকেন—প্রত্যেক ছোট বা বড় রাষ্ট্রের নিজ নিজ ভৌগোলিক সংস্থান বহাল থাকিবে, কেহ কাহারও দেশ কাড়িয়া লইবে না, ইহাই ছিল মিত্রপক্ষের নায়কদের প্রতিশ্রুতি এবং জার্মানীর প্রতি ইহাদের প্রধান অভিযোগ ইহাই ছিল যে, জার্মানী বাহুবলে পররাষ্ট্র গ্রাস করিয়া দস্যুবৃত্তির পরিচর্য দিয়াছে এবং ইউরোপে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া শক্তিশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। এই দস্যুবৃত্তি ও এই গণতন্ত্র-বিরোধিতার বিরুদ্ধেই ইংলন্ড ফ্রান্স করিয়াছিলেন অভিযান।

অবশ্য যে পোল্যান্ডের উপর আক্রমণ উপলব্ধ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হয়, সে রাজ্য গণতান্ত্রিক কখনও ছিল না এবং সে স্বয়ং এক বৎসর পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ার ভূমি গ্রাস করিয়াছিল জার্মানীর সঙ্গে মিজলি করিয়া। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ও হৃদয়বস্ত্র চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বনাশে ইহারা শৃঙ্খল ভাঙে—প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য

কিছুই করেন নাই। তবু যুদ্ধটা প্রথমে হইয়াছিল দস্যুবৃত্তির দ্বারা পররাষ্ট্র অপহরণের বিরুদ্ধেই এবং ইংলন্ড ও ফ্রান্স সত্যসত্যই তাহাদের নিজ নিজ দেশে গণতন্ত্রের অবসান শঙ্কায়ই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমে একটির পর একটি গণতান্ত্রিক ছোট রাজ্য আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া মিত্রপক্ষের আশ্রয়ে আসিয়া যথাস্থিতি যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং ক্রমে সংগ্রামটা দাঁড়াইল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমবায়ের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত শক্তির।

তারপর রাশিয়া ও আমেরিকা আসিয়া দলে ভিড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণভাবে লেখা হইয়া গেল আটলান্টিক সন্দেশে।

আজ সেই রাজনৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে কি? আশঙ্কা হয় যে, অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মতেরও বৃদ্ধি-বা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

একটা মোটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যুদ্ধটা ছিল মিলিত শক্তিবৃন্দের United Nationsএর—তার ভিতর ছিলেন সবাই, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, পোল্যান্ড, চেকো-স্লোভাকিয়া, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি। তাদের সম্মিলিত বৈঠকে সব কথার আলোচনা হইত।—এখন আর সে কথা বড় শোনা যায় না। এখন বৈঠকে বসেন, ইংলন্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও মাঝে মাঝে চীন। শৃঙ্খল সংগ্রাম পরিচালনা নয়, পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিধানও করেন তাঁরাই। আর সকলকে মাঝে মাঝে ডাকা হয়, কেবল এই বিশিষ্ট চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তে সহায়তা করিবার জন্য।

তার পর কথা শোনা যায় যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তিরক্ষার ভার লইতে হইবে এই বিশিষ্ট বা চতুষ্টয়ের নিদেবশাচালিত সৈন্য-সামন্তাদির। কোনও ছোটখাট রাষ্ট্রের তাতে দায়ও থাকিবে না, অধিকারও থাকিবে না।

হয়তো ইহা প্রয়োজন, হয়তো এমনি একটা পদূলি বাহিনী সর্বদা সজাগ না থাকিলে ভাবিয়াতে যুদ্ধ নিবারণ করা হইবে না। কিন্তু ইহাতে যে ভবিষ্যৎ বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন বহু রাষ্ট্রের নয়—রাষ্ট্র-সমবায়েরও নয়—এই বিশিষ্টের World hegemony-র। ইহারা হইবেন নাবালক রাষ্ট্র-গণের শক্তিময় গার্জরান বা অভিভাবক। এই অভিভাবকদের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্রগণের কতটুকু স্বাধীনতা থাকিবে? তাহাদের অবস্থা হইবে রক্ষণাধীন রাষ্ট্রের মত। ক্রমে তাহাদিগের অবস্থা দাঁড়াইবে আমাদের দেশীয় রাজন্যগণের মত।

একথা সকলেই হয়তো স্বীকার করিবেন যে, নিছক যুদ্ধের দিক হইতে আজকার পৃথিবীতে এতগুলি খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র স্বাধীন



অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক
সবদিকেই আজ ভারতের আমূল পরিবর্তন
ঘটছে। এর ফলে নতুন করে ভারতবর্ষের
ইতিহাস লেখা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।
এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দের বিষয় এই যে ভারত
বর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লেখবার জন্য খাঁটি
ভারতীয় লেখনীও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে।
ভালো কাগজ তো কতোদিন
আগে থেকেই এখানে তৈরি
হচ্ছিল, ভালো কলিও; অভাব



ছিল শুধু ভালো নিবের। এবার তারও
অভাব দূর হল আমাদের উদ্যোগে। যারা
বিদেশী নিবের আমদানী বন্ধ হবার ফলে
বাধ্য হয়ে আমাদের "রেড্‌ ইন্ড" ও "১১৬
নং রয়্যাল" মার্কা নিব ব্যবহার করে দেখে
ছেন তাঁরা সবাই মুক্তকণ্ঠে আমাদের নিবের
প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন : আমাদের
নিব, যে কোনো ভালো বিদেশী
নিবের সমপার্থ্যে পড়ে। অবশ্য
গতিতে লেখা চলে এ-নিব দিয়ে

স্টেটম্যান্স

• মিল অ্যান্ড মেটাল প্রডাক্টস্‌ লিঃ, ১১৬, মনোহর পুর রোড, কলিকাতা
সোল ডিস্ট্রিবিউটর্স্‌ : ক্যালকাটা সিটি কমার্শিয়াল কোং লিঃ, পোস্ট বক্স নং ৫২৬, কলিকাতা

রাষ্ট্রের কোনও স্থান নাই। বিশ্বের ভিতর নিরন্তর 'মান-প্রদান,' দেশে-দেশে সংযোগের ক্ষেত্রে যেরূপ নিবিড় ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমা ভাঙিয়া সমস্ত পৃথিবীকে একীভূত করিতে পারিলেই 'মানবসমাজের' সর্বাপেক্ষা আশঙ্ক মণ্ডল হইবে। কিন্তু দীর্ঘ ইতিহাস, জাতীয়তার তীব্র শক্তি, দেশে দেশে পৃথকসংঘাত এইরূপ একীকরণের পরিপন্থী। তাই সমন্বয়ের পথ খুঁজিতে হয় দেশের সীমা বজায় রাখিয়া।

এই সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জার্মানীর ভূতপূর্ব প্রতিনিধি হের ফ্রেডেরমান লীগ অফ নেশনসে একাধিকবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র মিলিয়া United States of Europe প্রতিষ্ঠার। বলা বাহুল্য, সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু প্রতি দেশের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা যদি মানবকল্যাণের অনুকূল না হয়, তবে এই সর্বজাতীয় সমন্বয় বা ফেডারেশনই এ সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। এই ফেডারেশন নীতি গ্রহণ করিয়া আমেরিকা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিও এই নীতিতে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এই নীতির আধুনিকতম পরীক্ষা সাফল্য ও গৌরবে নীত হইয়াছে। নামে ফেডারেশন না হইয়াও বৃটিশ সাম্রাজ্য এই নীতির মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াই একটা প্রকৃত বিশ্বশক্তি হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর জগৎকে এই ফেডারেশনের বন্ধনে বান্ধিতে পারিলেই মানবের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং চৌনিহনের 'Parliament of Man and the Federation of the World'এর স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

কিন্তু কি আটলান্টিক চ্যার্টার, কি যুদ্ধোত্তর জগৎ সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণা কোথাও এই আদেশের দিকে অগ্রসর হইবার কোনও চেষ্টাই দেখা যায় না। যে পথে পৃথিবীর গুরুত্ববাহী দৃষ্টি-সে হিংস্র hegemony।

আশঙ্কা হয় যে, যদি এই পরিবর্তনশীল শান্তি-সভায় জয়যুক্ত হয়, তবে তাহাতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে শুধু নতুন অশান্তি ও নতুনতর বিশ্ববঙ্গোদয়ের বীজবপন। ইহার ফলে এই চতুঃশক্তির বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির ক্ষয় স্বাধীনতা চাপা আগুনের মত জ্বলিতে জ্বলিতে কবে যে আবার একটা বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ড পর্যবসিত হইবে কে জানে?

বিশ্ব-সমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণে অনেক বাধাই আছে, তার মধ্যে একটা প্রধান অন্তরায় ফ্যাসিস্ত-শাসিত দেশগুলি লইয়া-বিশেষতঃ, জার্মানী ও জাপানকে লইয়া।

যুদ্ধের আরম্ভে হয়তো ভুল বিশ্বাসের বশে-নেভিল চেমবারলেন জার্মান জনসাধারণকে নাসিগণ হইতে পৃথক-জ্ঞানে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, সেকথা যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আর কাহারও মনে এখন শোনা যায় না। শোনা যায় একটা তীব্র প্রতিহিংসার অথবা প্রচণ্ড সন্দেহ সাবধানতার সুর। জার্মানীর বিধর্দিত জন্মের মত ভাঙিয়া না দিলে সে আবার শীঘ্রই একটা তীব্রতর সংগ্রাম বাধাইবে, এই আশঙ্কা লইয়াই আজকাল আলোচনা চলিতেছে-বিধর্দিত কিসে ঠিক ভাঙা যাইবে? এ আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়, কিন্তু তার প্রতিকারের যেসব উপায়ের কথা শোনা যাইতেছে, সেই পথই প্রশস্ত পথ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে।



মা

শিল্পী-হাসান আলী, শাস্তিনিকেতন

জার্মানী ও জাপান এই যুদ্ধে বিশ্বের বহু বড় দারুণ অমঙ্গল করিয়াছে, সেকথা কে না অনুভব করে? কিন্তু যোগে যোগে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, জার্মান ও জাপানী উভয় জাতিই অশুভকর্মা। জার্মানী শব্দে চিত্তলার হিম্মতের দেশ নয়, তাহা কাট ও হেগেলের দেশ, গাটে, শিলার ও মানের দেশ, লাইবনিটজ, আইনস্টাইন, বৌর প্রভৃতির দেশ, মোটসার্ট বাথ, বিটোফেনের দেশ, মাক্স ও এংগেলসের দেশ। অপূর্ব দীর্ঘজীবী বলে জার্মান জাতি যুগে যুগে জগৎকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চর্চন, শিল্প ও লীলিতকলায় অশেষ অবদান দিয়াছে। অধুনা বিপথে চালিত হউক, কিন্তু শক্তি ও শৌর্য তাদের বিচ্ছিন্নের বস্তু।

এমন একটা জাতিকে যে কোনও শক্তি বা শক্তি-সমন্বয়ের পন্থা না করিয়া রাখিয়া চিরদিন তাহাদিগকে শাস্তির পথে রাখিতে পারিবে, এ ভাষা দুঃশা। এ চেষ্টা আজই প্রথম নয়, আর দুইবার হইয়াছে। নেপোলিয়ান ভ্যাবিয়াছিলেন জার্মানীকে চিরতরে শিথী করিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু ১৮৭০ সালে দেখা গেল তার সে চেষ্টা

বাথ' হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর আর একবার এই চেষ্টা হইয়াছিল, সে চেষ্টা আরও বেশী ব্যর্থ হইয়াছে। ভাসি-সিন্ধুর সর্বগুলি সমগ্র জার্মান জাতির ভিতর ধুমায়িত হইয়াই তার পিচল বৎসর পরে এই বিশ্বব্যাপী অশান্তিকালে পর্যবসিত হইয়াছে।

এত বড় না হইলেও ইহার সমশ্রেণীর আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় Boer জাতির সঙ্গে সেখানকার ইংরেজ উপনিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল Disraeli আমলে। আবার তাহা জর্জিয়া উঠিয়া শেষ ব্যুর-যুদ্ধে পরিণত লাভ করিয়াছিল। প্রচণ্ড বটিশ শক্তির সমবেত পরাক্রমে অবশেষে যত্নে এই ক্ষুদ্র জাতি পরাভূত ও পদানত হইয়াছিল। যদি সেই পরাজমটাকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইয়া ইংলণ্ড তাহাদিগকে শাসন করিতেন, তবে এতদিন আবার কি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিত, কে জানে? ভ্রূগার, ক্রিজ, বোথো, স্মাটসের জাতি যে চিরদিন এ পরাজয় মাথা পাতিয়া লইত না, আজও মাঝে মাঝে Hertzog-এর আশ্বাসননে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ড পরাজিতকে পদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সমন্বয়, বোয়ার জাতি ইংরেজ উপনিবেশিকের মতই স্বাধীনতালাভ করিল। এই নীতির ফল এই যে, ভূতপূর্ব বোয়ার সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্মাটস আজ ইংরেজের একটি প্রধান মন্ত্র-দাতা ও সুহৃৎ, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরেজের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

ছোট হইলেও এ দৃষ্টান্ত বড়র ক্ষেত্রেও হয়তো সমান খাটে। বোয়ারের বিধর্ষিত ভাঙ্গা পড়িয়াছিল ফেডারেশনে। জার্মানী কি জাপানেরও ফেডারেশনেই শৃঙ্খল আসিতে পারে সেই তৃপ্তি, যাহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হইবে। নতুবা পদানত পরাভূত জার্মানীকে যতই নিরস্ত কর, তাহার ভিতর ধুমায়িত বাঁহকে দমন করিবার জন্য বটিশ-আমেরিকান পুলিশ বাহিনীর সবদাই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, হিটলারের গেষ্টাপোকে ধ্বংস করিয়া আবার এক নতুন গেষ্টাপো সৃষ্টি করিতে হইবে। অশান্তি অনেকদিন দমন করিয়া রাখা যাইতে পারে, চিরদিনের তরে তাহা ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

একথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিধিনিষ্টা রক্ষা করিতে হইলে লীগ অফ নেশনস্ কেবলমাত্র যুক্তিতন্ত্রের উপর যতখানি আস্থা লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, ততখানি আস্থা তার উপর রাখা চলিবে না। হয়তো একটা প্রবল আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্বও অপরিহার্য—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে বেশী জোর দিতে হইবে এক নতুন রাষ্ট্র গঠনের উপর—প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এক বৃহৎ রাষ্ট্র-সমবায় যেখানে প্রত্যেক জাতি সমান সম্মান ও সমান স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। বলা বাহুল্য, ভারতের মত জাতি যারা আজ পরাধীন ও পদানত, তাহাদিগকেও এই রাষ্ট্র সমবায় সমান অধিকার দিতে হইবে। নতুবা বিশ্বের চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

পুলিশ বাহিনী দিয়া জোর করিয়া যে শান্তিরক্ষা হইবে, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

জানী রাষ্ট্রতন্ত্র।

এ সংগ্রামের সূত্রপাত হইতেই অনেক হোমরাচোমরা লোক বলিয়াছেন যে, ইহা জগতে গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নাসী-ফ্যাসিস্ত জাপ শক্তিতন্ত্র সংগ্রামের বাঁজ থাকে—সুতরাং শক্তিবাদের উদ্বেগ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শান্তির জন্য প্রয়োজন এবং ইহাতেই জগতের মঙ্গল, এই কথাটাই বার বার বলা হইয়াছে।

একথা নির্বিশেষে মানিয়া লওয়া বার কিনা সন্দেহ। প্রকৃত গণতন্ত্র জগতে কোনদিনই ছিল না, এখনও নাই। প্রাচীন রোম বা এথেন্সে ছিল জনসাধারণের শাসন-ব্যাপারে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপের অধিকার, কিন্তু সেখানেও প্রকৃত অধিকার ছিল মূর্খিমের নেতার হাতে। আধুনিক গণতন্ত্রের পত্তন হইয়াছিল বটিশ পার্লামেন্টে

প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রে। ইহাতে সাধারণের সাক্ষাৎ অধিকার নাই, আছে শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার। প্রতিনিধিরা অধিকাংশের মতানুসারে যাহাদিগকে পোষণ করেন, তাহাই করে শাসন। ইহারই নাম গণতন্ত্র।

প্রকৃত গণতন্ত্র বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সত্যসত্যই জনগণকে শাসনাধিকার দিতে গেলে রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের পরিচালন ক্ষমতা স্থানীয় জনগণকে দিয়া কেবল রাষ্ট্রের সমগ্র হিতানুষ্ঠান মাত্র রাখিতে হয় প্রতিনিধিগঠিত রাষ্ট্রসভায়। এই আদর্শে রচিত হইয়াছে নোভোরোষ্ট রাষ্ট্রগঠন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলেই যে যুদ্ধ ও হিংসার মূলেচ্ছেদ হইবে, একথা বলা চলে না। একথা সত্য যে, আক্ষকাল যুদ্ধ সৃষ্টি করে মূর্খিমের লোক তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হিংসা ও সন্দেহ আগ্রহ করিয়া; জনগণ চায় শান্তি। কিন্তু একথাও সত্য যে, জনসাধারণের খুব বড় একটা অংশ রাষ্ট্রশাসনের নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। ভাবনাচিন্তার ভার, কাজের ভার নেতার হাতে দিয়া বিনা প্রশ্নে তাঁকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জনগণের এত বেশী যে, যে কোনও দূর্ঘট শর্তমান ব্যক্তি তাহাদিগকে নাচাইয়া মাতাইয়া তাহাদিগকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করািতে পারে। জার্মানীর জনসাধারণকে দেখিতে দেখিতে ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে হিটলার যে সংগ্রামে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, ইহা নিছক শক্তিসংযোগ বা গেষ্টাপোর প্রয়োগের ফল নয়, জনসাধারণের সত্যসত্যই হিটলারকে অনুমোদনের ফল। কেন তাহা অনুমোদন করে, তাহা হিটলারের মাইন কাম্পফ্ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশেও নেতাকে অশ্রদ্ধাভাবে অনুসরণ করিয়া যে কোনও দুঃসাহসিক কার্যে নিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত না আছে এমন নয়। একথা দুঃখের সাহিত স্বীকার করিতে হয় যে কোনও দেশেই জনসাধারণের ভিতর এতখানি বুদ্ধি-বিদ্যার প্রাচুর্য নাই, যাতে তারা প্রত্যেক জাতীয় ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার করিয়া সুসিদ্ধান্তে আসিতে পারে। আর জনসাধারণের পোষকতা পায় স্থিরবুদ্ধি বিচক্ষণ নেতার চেয়ে যারা মাতাইতে পারে, তাহাই বেশী। যাকিছু একটা ধূয়া ধরিয়া লোককে মাতাইতে পারিলে জনশক্তি তোমার পিছনে দাঁড়াইবে, যিনি শৃঙ্খল বজাইয়া যুক্তি দিয়া লোকের কাছে আবেদন করিবেন, তিনি সে পোষকতা পাইবেন না। একথা সব দেশেই অল্প-বিস্তর সত্য।

কর্মকুশলতায় গণতন্ত্র যে ফ্যাসিজমের কাছে মাথা তুলিতে পারে না, তাহা একরকম স্বতঃসিদ্ধ এবং বর্তমান যুদ্ধে তাহা সকলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন। আজ যে মিশ্রশক্তি ক্রমে অধিক তৎপরতা লাভ করিয়াছেন, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, যুদ্ধের চাপে গণতান্ত্রিক দেশগুলি অপর্যাপক পরিমাণে দেশনায়কদের দিয়াছেন ডিক্টেটরের মত অব্যাহত ক্ষমতা। নতুবা প্রত্যেকটি বিষয় পার্লামেন্টের বিচার-বিতর্ক দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে আজও যুদ্ধের মোড় ফিরিত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু শৃঙ্খল যুদ্ধায়েজনে নয়, শান্তির সময়ে দেশের হিত-সাধনেও ডিক্টেটরী শাসন অসাধারণ শক্তি ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে এবং প্রধানতঃ সেই কর্মকুশলতার জেরেই ফ্যাসিজম জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। রাশিয়ায় যে অশুভ অভ্যুদয় দশ বৎসরে হইয়াছিল এবং তার পরও সমান বেগে চলিয়াছে, তাহা ঠিক গণ-নিয়োজিত নয়, গণ-হিতব্রত ডিক্টেটর পরিচালিত।

সুতরাং গণতন্ত্র নামে শৃঙ্খল ভেটতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যে মানব-কল্যাণের দিক দিয়া শেষ কথা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। পক্ষান্তরে গেষ্টাপোর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বহু মনীষীই একথা মনে করেন যে, রাষ্ট্র-পরিচালন এমন একটা দুঃস্থ কার্য, যাহা সুশীলকৃত বিশেষজ্ঞই ঠিক করিতে পারে, অশীলকৃত জনসাধারণের অজ্ঞ হস্তক্ষেপ ঘটনা ভাল করে, মন্দও হয়তো তার চেয়ে কম করে

না। তাই স্বেচ্ছাে তাঁর রিপাবলিকে শাসনের ভার দিয়াছিলেন বিশেষ ভাবে শিক্ষিত বিচক্ষণ পণ্ডিত গাজিয়ানদের হাতে। এই মতবাদের জন্যে যে একটা নির্ভাজ সভ্য আছে, সেখান্দা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু এই সন্দেহ হয় যে, পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ কর্মকুশল হইলেও স্বার্থের টানে তাঁর জনকল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কাজেই, তাঁর রাশ টানিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে এবং সে কাজ করিবে জনসাধারণ।

ভবিষ্য রাষ্ট্রনীতির পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন—কিন্তু সে গবেষণা হইবে কি?—করিবে কে?

ডেমোক্রেসী বলিয়া যারা সব চেয়ে বেশী হৈঠক করেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ডেমোক্রেসী চান না, চান জনগণের নাম করিয়া নিজের মত ও প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা। তাই ধীরবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়াছে একদিকে অল্প আবেগ ও অপর দিকে প্রোপাগান্ডা। যাকিছু একটা প্রোগ্রাম লইয়া জোর প্রোপাগান্ডা করিলেই জনগণের সমর্থন পাওয়া যাইবে, এই ভরসায় বেশীর ভাগ জননায়ক গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হন। জনগণের সমর্থন পাইয়া তাঁরাই দেশের সব চেয়ে বেশী মঙ্গল করিতে পারিবেন, একথা অনেকে মনে করেন, অনেকে হয়তো মনে করেন শুধু নিজের গণগোষ্ঠী জাতির মঙ্গলসাধন। ডেমোক্রেসীতে প্রকৃত নিশ্বাসী জগতে বিরল। অথচ অধিকাংশ দেশেই ডেমোক্রেসীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতে সাহস কাহারও নাই।

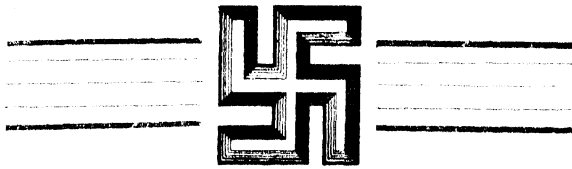
ডেমোক্রেসী বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন রাষ্ট্রগঠনের শেষ কথা নয়। বর্তমান যুগে অতীতের অভিজ্ঞতামূলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

কোনও পরিকল্পনা আবশ্যক হইয়াছে। সেদিকে ভবিষ্য রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি পড়িবে কি?

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত ইংলণ্ডে উদ্ভাবিত প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু তার পর সোস্যালিজমের উত্তরোত্তর প্রসারের সঙ্গে আর একটা মতবাদ ক্রমে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনই শেষ কথা নয়। শাসনের যন্ত গঠনের চেয়ে শাসনের নীতি ও প্রকৃতির উপর সোস্যালিজম্ বেশী জোর দেয়। রাষ্ট্রনীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, যাতে অসাম্য দূর হইয়া সকলের সমানভাবে আরামে বাঁচিবার অধিকার, কাজ করিবার অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার সুনির্দিষ্ট হইবে। নিধানকে শৃঙ্খল, ভোটার অধিকার দিলেই তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কেননা তার মতগ বাচনের সোনার কাঠিটি আছে ধনীর হাতে। এই সোনার কাঠি ধনীর হাত হইতে কাড়িয়া না লইলে গণতন্ত্রের কোনও সাধাৰ্হতা থাকে না।

মালদারী অর্থনীতি যে রাজ্যে চলে, সেখানে মালদারের শক্তি ডেমোক্রেসীর উপর যে কত প্রচণ্ড প্রভাব প্রয়োগ করে তার দৃষ্টান্ত আছে বহু। তার উপর আর একটা বিপদ এই যে, সকলেরই প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকে বড়লোক হইবার মালদার হইবার। যার স্বযোগ ও সুবিধা আছে, তার সে সুবিধার ব্যবহার করিয়া নিজের অর্থশক্তি বৃদ্ধির একটা লালসা প্রায় অবশ্যস্বার্থী। মালদারী সমাজে এই লালসাকে দোষের বলা যায় না। কেননা, যেখানে 'চাচা আপন বাঁচাই একমাত্র নীতি', সেখানে নিজের ও নিজের আত্মীয় পরিজনের সুখ-সমৃদ্ধি স্থায়ী করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় ও বৃদ্ধি ছাড়া অন্য উপায় নাই।

আমাদের শুভানুধায়ীগণকে শারদীয়ার
সাদর-সন্তাযণ জ্ঞাপন করিতেছি।



দি বেঙ্কল ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

রেজিঃ অফিস—কুনিহুনা

সেন্ট্রাল অফিস—পি-২৯, মিশন রো এক্সটেনশান, কলিকাতা।

শাখাসমূহঃ—বনগাঁ (যশোহর) * বড়বাজার (কলিকাতা)।

মিঃ এ. বি. ঘোষ, ডিরেক্টর,

মিঃ এস. কে. ভট্টাচার্য,

জেনারেল ম্যানেজার।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শারদীয় আহিত্য



পূজোর আর বেশি দেরি নেই। বছরের যে সময়টুকুর জন্ম প্রত্যেক বাঙালী অধীশ প্রতীক্ষায় দিন গোনে সে হচ্ছে এই পূজোর কটা দিন। নিরানন্দ বাঙালী-জীবনেও খুশির ছোঁয়া লাগে। বিশেষ করে বাংলার সাহিত্যিক মহলে যে চাকুলা দেখা যায় তা একদিক থেকে যেমন আনন্দের ভেমনি আবার করুণও। বাংলার সাহিত্যিকদের আর্থিক দুঃস্বস্তার কথা তো সর্বজনজ্ঞাত। বই কিনে পড়ার ব্যাতি বাঙালীর কোনো কালেই নেই, কিন্তু পূজোর সময়ে আশ্চর্যভাবে তারও ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাজেই পূজোর সময়ে সাহিত্যিকেরা যখন একটু উৎফুল্ল হবার সুযোগ পান তখন আমাদের মনে বেদনা জাগে বৈকি। ছোটো, বড়ো, বিখ্যাত, অখ্যাত সব রকম দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার পরিচালকরাই তাঁদের সাধ্যমতো শারদীয় সংখ্যা বার করে' লেখকদের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করেন। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা তাঁদের ব্যাতি বাড়ানোর কথা অক্ষুণ্ণ রাখবার সুযোগ পান, অনেক নবীন লেখক আত্মপ্রকাশ করেন প্রথম। এ-বছরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যুদ্ধঘটিত নানা অসুবিধা—কাগজের দুঃসাপ্যতা, অস্ত্রাস্ত্র জিনিসের দুর্মূল্যতা, এর উপরে সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও অগণিত নতুন বই বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে, শারদীয় সংখ্যা পত্রিকা তো আছেই। বাংলার ছোটো, বড়ো সকল লেখকই লিখেছেন এ-সব পত্রিকায়, বই-এ। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এদের মধ্যে অনেক লেখাই পার্ক ইন্স।

পার্ক ইন্স।

প্রস্তুতকারক :— এ্যাকাডেমিক ম্যানুস্ক্রিপ্টস্‌ অ্যান্ড আর্ক্‌স্‌।

এ জে কে স্‌ :— ক্যালকাটা সিটি কমার্শিয়াল কোং লিঃ।

পোষ্ট বক্স নং ৫২৬, কলিকাতা

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে, শিশুদানের পদ্ধতি ও শিক্ষার ভার নেয় রাষ্ট্র প্রত্যেক লোক কাজ করিয়া অন্যায়ের দ্রাবণের জীবন-মরণ ও আরামের উপায় সবদে নিশ্চিত হইতে পারে, তবে সমুদয়ের এ তীব্র কামনার কোনও ব্যতিকঙ্গত হেতু থাকে না, এ প্রবৃত্তিও পরিপূর্ণ হইতে পারে না। ক্ষমতা পাইলে তাহার অপ-ব্যবহার করে লোকে প্রধানতঃ নিজের দুঃপরস্যা করিবার জন্য, সে দুঃপরস্যা করিবার সুযোগ যদি না থাকে, তবে ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করিয়া দশকে বণ্ডিত করিয়া ক্ষমতার অপ-ব্যবহারের খুব বড় একটা হেতু চাওয়া যাইবে। নিষাচিতি প্রতিনিধি অন্ততঃ অর্থ-শোভে বা আর্থিক সুযোগ সুবিধার লোভে বিপথে যাইবেন না।

তাই সোসালিজম্ যদিও চায় যে শাসনকার্য জনগণের সম্মতি লইয়া এবং তাদের প্রতিনিধির দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, কিন্তু ইহা আরও চায় যে ইহা ছদ্ম শাসনতন্ত্রে বক্তৃৎগুলি মূলস্রোত মারিয়া লইতে হইবে। মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন, তাহা উৎপাদনের উপায় যে ভূমি কারখানা প্রভৃতি, তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। সকল উৎপাদনশীলতা ও সম্পদ বৈত্তরক ব্যবস্থার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যাহাতে সকলে তাহার সমান সুবিধা পায়। পঞ্চমতরে, সোসালিজম্ বলে যে বসিয়া খাইবার অধিকার কাহারও থাকিবে না, খাইতে পাইবে সবাই, কিন্তু সবারই খাটিতে হইবে। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ এক ব্যবস্থার দ্বারায় দেশের সমস্ত শ্রমশক্তি নিয়োজিত হইবে এমনভাবে সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে যাহাতে সবসামান্যের সুবিধা। অধিক উপকার হয়। সোসালিজমে এই সব মূলস্রোত গত পঞ্চাশ ষাট বৎসর হইল অসংখ্যক পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ধনিকতন্ত্র উগ্রভাবেই চলিয়াছে, কিন্তু শ্রমিক ও জনসাধারণের হিত-সাধনের নীতি অল্পে অল্পে শাসনকার্যে স্বীকৃত হইয়াছে। ফরাসী ও ইতালী ও বাস্কী জাতিগণ সোসালিজমের অনেক নীতি তাদের নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের সমুদয় শ্রমশক্তি ও সম্পদ সৃষ্টি শক্তির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিয়াছিল ফ্রেঞ্চ এবং সে সব নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমস্ত দেশবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রণের শাসনস্বর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছিল রাষ্ট্র। শেষে তাদের এই সংহত নীতি সোসালিজম্ নীতি অনুযায়ী নিয়োজিত হইয়াছিল। একেছাড়া নৈতিক নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল দেশের

একমাত্র রাষ্ট্রায়ার সোস্যালিস্ট নীতির প্রকৃত পরিণাম হইয়াছে। জনগণের স্বচ্ছ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেখানে দেশের সমস্ত সম্পদ ও শ্রমশক্তির সংহতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালী ও জার্মানীতে যাহা হয় নাই, তাহা এখানে হইয়াছে। এই বিশাল কার্য কোনও স্বেচ্ছাচারী নৈতার একার হস্তে ন্যস্ত হয় নাই। ইহার প্রত্যেক অংশ নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িয়াছে সেই অংশে নিযুক্ত শ্রমিকদের সোজায়েট বা সমিতির উপর।

এখন সেই সোভিয়েট নীতির বৈশিষ্ট্য। শাসনাত্মককার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা নিরূপণ করা হইয়াছে শ্রমিক জনসাধারণের উপর। এ কাজ অনার্য্যে হয় নাই। একদিনেও সম্পন্ন হয় নাই। অনেক ভুলভ্রান্তি হইয়াছে, অনেক বাধাবিঘ্ন উদ্ভূত হইয়াছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মূলনীতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে রাশিয়ার মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, যার ফলে নিম্নপন বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিরূপিত এক বিরাট রাষ্ট্রব্যাপী প্রচেষ্টা আদ্যোপান্ত শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তার ফলে ক্ষেত্রে বা কারখানায় যারা কাজ করে, তারা একথা অনুভব করে না যে, তারা পরের কাজ করিতেছে। তারা নিজেরা শূন্য নিজেদের সকলের কাজ করিতেছে, সে কাজের যা ফল তার সম্পূর্ণ উপকার করাই পাইবে, একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অনসার্য্য যাতো লাভের কাম-বেশই হইবে না।

প্রথমে কাজটা ঠিক জনসাধারণের স্বেচ্ছন্দ সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় নাই। ডিক্টেটর পরিচালিত শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল

মনেকটা। কিন্তু জোর করিয়া কাজ করা ইবার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল একটা প্রচণ্ড সুব্যবাপী শিক্ষার আয়োজন। বিদ্যালয়ের শিশু হইতে আশ্রিত করিয়া প্রবীণ নিরক্ষর শ্রমিকদের সকলকেই নানাভাবে সোতিয়েও রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও কর্মনীতিতে অক্লান্ত অপ্রান্ত-ব্যাপী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তার ফলে ডিক্টেটোরী স্থলে উচ্চতম রাষ্ট্র পারব্যয়েও প্রতিনির্দম্বলক শাসন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছে।

এরূপ করিয়া সমগ্র জাতিটাকে শিক্ষা দিয়া কাজ করাইয়া যে সম্পূর্ণ সংহতি সৃষ্টি হইয়াছিল তার সম্পূর্ণ সফলতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার প্যান প্রায় পনেরো বৎসর সম্পূর্ণ রূপে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য, তার বিরাট শিল্পগঠনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তার ভিতর যুদ্ধোজ্ঞেনের স্থান সামান্যই ছিল। সেই হিপ্পল শক্তি যুদ্ধোজ্ঞেনের নিয়োজিত হইয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধের প্রাকালে। তাই যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে রাশিয়া হিটলারের প্রতিরোধে সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু যত দিন গেল, অয়োজন বত পারিপূর্ণ হইল, সমবোধপূরণ হাতে আফ্রিকা দিল ইংলণ্ড ও আমেরিকা, তখন আর রাশিয়াকে ঠেকাইবার শক্তি হিটলারের হইল না। শান্তিময় সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণ সাধনায় রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি যেমন সফলতা লাভ করিয়াছে, ঠিক তেমন সফলতা লাভ করিয়াছে সে সংগ্রামে।

অনেক বিচক্ষণ বিদেশী রাশিয়ার এই সর্বাঙ্গীণ সফলতার
 হেতু অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার প্রধান মূল্য এই যে
 রাশিয়ায় বেই মনে করে না যে পরের জন্য খাটিতেছে—দেশে থাকিছু
 আয়মান, সব তারা মনে করে তাদের নিজেদের কাজ। প্রত্যেক মৈনিক
 মনে করে যে যুদ্ধটাও তাদের নিজেদের যুদ্ধ। যাকিছু রাশিয়ার
 শ্রমিক করে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ প্রত্যেক রাশিয়ান পায়। আবার
 কারখানায়, চাষের ক্ষেত্রে, শাসনকার্যে সর্বত্র পরিচালনের ক্ষমতাও
 নাক্ত আছে কোনও উপরওয়ালার হাতে নয়, তাদেরই সোভিয়েটের
 হাতে। এই পরিপূর্ণ আত্মীয়তাবোধের উপর তাদের যে দেশাত্মবোধ
 প্রতিষ্ঠিত, তাহা একটি নিরতিশয় সত্য বস্তু।

রাশিয়ার এই সাফল্যের দৃষ্টান্ত ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। তাদের শিল্প-প্রচেষ্টা যতই বৃহৎ ও আতিকায় হউক, তার ভিতর রাশিয়ার তুলনায় শ্রমিকের জারায়িতব্যবোধের যে যথেষ্ট অভাব আছে, সোঁসকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই সে সব দেশেও একটা সাদা পড়িয়া গিয়াছে যে, শ্রমিককে স্বাধী ও সংকুল করিবার জন্য এখনকার চেয়ে অধিক পর্যা্যত আয়োজন করিতে হইবে। ক্যাপিটালিজমের খাচা বহাল রাখিয়া শ্রমিকের মঙ্গলসাধনের জন্য কত দূর কি করা যায়, তার সমাবেশ নানা গবেষণা হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বোভারিজ প্যান ভায় একটী ফল।

বেভারিজ প্ল্যান আভিশ্য সৃষ্টিস্থিত এবং অনেক বিষয়ে দেশের জনসাধারণের হিতসাধনের পরিকল্পনা অনেকটা অগ্রসর। কিন্তু হাজার হইলেও ইহা সোশ্যালিজমের পথে একটি বিশ্রামগার মাত্র। সামাজিক মঙ্গলসাধন প্রচেষ্টায় ইহাকেই শেষ কথা বলিয়া মনে করা যায় না। ইহার ভালমন্দ লইয়া অনেক বিচার-বিবেচনা হইতেছে—ইহার উপকারিতা ঠিক কতখানি হইবে, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে, সমাজেট পদ্ধতির সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই সফল পরীক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ না লইয়া তার অর্থপথে দাঁড়াইয়া একটা নতুন পরিকল্পনার চেষ্টার পক্ষে অপর কোনও যুক্তি নাই। কেবল-নাং ইংলেণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্যাপিটালিজমের মধ্যে সংঘর্ষ যথাসম্ভব নিবারণের চেষ্টাই ইহার একমাত্র হেতু ও ঘৃণ্ত।

সে যাহাই হউক, আজকার দিনে একথা অবিসম্বাদিত যে, কেবলমাত্র প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না। স্বাধীনতা, জাতীয় সুখসমৃদ্ধি ও সমবায় শক্তি সাধন, সব কাজের জন্য প্রয়োজন এমন একটা সংগঠনের, যাহা



ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের

সেবায় নিযুক্ত...

এ-বৃহত্তর ফলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হয়েছে তেমনি আবার এ-দেশের শিল্প-পতিরা বুঝতেও শিখেছেন যে তাঁদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এপর্যন্ত আমদানী করা মালের উপর কতখানি নির্ভর করে এসেছে। আজ নানা প্রতিবন্ধকতায় বিদেশী বহু মূল-উপাদানের আমদানি এক রকম বন্ধ, অথচ চাহিদা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ।

সোয়াইকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুবিধ মূল-উপকরণ তৈরি হয়। বিশেষ করে গুলিইক এবং ক্রিসলিক এ্যাসিড জাতীয় কেমিক্যালগুলি তৈরি করার ব্যাপারে এঁরাই এদেশে পথ প্রদর্শক। তা'ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ভিদ্ধ তৈল, রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ সোয়াইকাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যোগাচ্ছেন; এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লুক্‌রিক্যান্ট ও কোল-টার বাইপ্রডাক্টের প্রাপ্তকরক হিসাবেও সোয়াইকা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন।

সোয়াইকা অয়েল মিলস্—'ককুম' মাকা
বিবিধ উদ্ভিদ্ধ তৈল ও ডিলিনডেকট্যান্টের
ককুম ব্যাট।

সোয়াইকা কেমিক্যাল অ্যান্ড মিনারেল
কোং লিমিটেড—খনিজ সালফিট, রাসায়নিক
প্রস্তুতকারক ও বিবিধ খনিজ পদার্থ এবং রাসা-
য়নিকের সাহায্যকারী বিক্রয় ও সরবরাহকারী।

সোয়াইকা কার্ভাইলইজার লিমিটেড—
নানাপ্রকার বৈল ও সল্লু সাবের ইজ সর-
বরাহকারী।

সোয়াইকা স্ট্যাণ্ড অয়েল অ্যান্ড ভারলিস
কোং লিমিটেড—স্ট্যাণ্ড অয়েল ও বারলিস
প্রস্তুতকারক।

সোয়াইকা এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট
লিমিটেড—মাল আমদানি ও রপ্তানিকারক।

সোয়াইকা অয়েল অ্যান্ড প্রোডাক্টস্ কেম
লিমিটেড—গ্রীষ্ম, লুক্‌রিক্যান্ট প্রভৃতি প্রস্তুত-
কারক।

সোয়াইকা মিনারেল ক্রাসিং মিলস্ অ্যান্ড
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড—খনিজ পদার্থ চূর্ণ ও
সরবরাহকারী।

সোয়াইকা সান্দ্রাই কর্পোরেশন লিমিটেড
—মিল ও কারখানার মাল সরবরাহকারী।

সোয়াইকা ব্রিক ওয়ার্কস্—ইট প্রস্তুতকারক
ও গৃহনির্মাণের মালমশলা সরবরাহকারী।

সোয়াইকা শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ

হেড অফিস : "পোলক হাউস" ১৮এ, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "শ্যাডলক"—কলিকাতা। ফোন : কলিঃ—৩১৭১-৭২।

কারখানা : লিসুয়া ও বারানসী। শাখা সমূহ : - বোম্বাই, বারানসী, কারউই এবং জব্বলপুর।

সোভিয়েট শাসনের অনুদ্বৈপ : সেই সংগঠনের কয়েকটি মূল সূত্র ধরা যাইতে পারে।

১ম। দেশের সকল উপাদান ও শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুনীত প্রণালীতে সর্বাধিক সমৃদ্ধি সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২য়। এই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার উপকারিতা কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষে নিবন্ধ থাকিবে না, সর্বসাধারণ ইহাতে সমান অধিকারী হইবে।

৩য়। এই সমগ্র ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞের কাজ বিশেষজ্ঞেরা করিবে, কিন্তু ইহার নিয়ন্ত্রণের কার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা ই সম্পন্ন হইবে।

৪র্থ। এই সংহতিয় অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিবার জন্য অতিন্দুতভাবে শিক্ষার কাজ চালাইতে হইবে, যাহাতে প্রথমে ইহা শাসনমূলক বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরিশেষে প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তাবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই ব্যবস্থাই রাষ্ট্রগঠনের নবতম ও সফলতম সূত্র, যাহা সোভিয়েট রাশিয়ায় পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশভেদে, অবস্থাভেদে এই মূলসূত্রের প্রয়োগে প্রভেদ অবশ্যই হইবে, কিন্তু এই মূলসূত্রই জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

কিন্তু গ্রিস্তির নানা সম্মেলনে যেসব আলোচনা হইতেছে, তাহাতে এমন কোনও আশাই হয় না যে, যুদ্ধোত্তর জগৎ এই সব নীতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন। তাহাদের রূপনার সীমা Atlantic Charterএর Four Freedoms এবং Beveridge Plan, Keynes Plan প্রভৃতি। এ সবগুলিরই মূল ভিত্তি মালদারী ও ব্যক্তিগত স্বার্থের অক্ষুর স্বাধীনতা যাহা অস্বীকার করিয়াই সোভিয়েট অসামান্য সফলতা লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর ভারত।

বিশ্বের বিরাট ক্ষেত্র ছাড়িয়া ভারতের দিকে চাহিলে নৈরাশ্য আরও গভীর হইয়া পড়ে।

ভারতে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের এক চিন্তা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা : আর অর্থনৈতিক নেতাদের একমাত্র পরিকল্পনা, মালদারী ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সহায়তায় পশ্চিমের সমকক্ষ বৃহৎ শিল্পগঠন। ইহার অধিক চিন্তার কথা বিশেষ শোনা যায় না।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনা কত দূর আছে জানি না। গ্রীপস্ প্রস্তাবের সময় ভারতকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যতখানি আগ্রহ ইংলণ্ডের ছিল, তার সুযোগ গ্রহণ করা আমাদের নেতৃবৃন্দ অসম্মানকর মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ রাজাপোলাচারিয়ার মারফৎ সেই প্রস্তাবেরই সংস্কৃত সংস্করণ বিষয়ে ইংলণ্ডের তার কাছাকাছি আগ্রহও দেখা যায় না।

সুযোগ যে হারানো হইয়াছে, সে কথা দুঃখের বিষয় ; কিন্তু ইংলণ্ড যে আজ আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দান করিতে আগ্রহ-শীল নন, তাহা ততটা দুঃখের নয়। কেমনা, স্বাধীনতা দান করিবার জিনিষ নয়, তাহা অর্জন করিতে হয়।

তার চেয়ে গভীরতর দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের যে সকল নেতা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লইয়া আলোপ-আলোচনা করিতেছেন, তাঁদের দৃষ্টির ক্ষেত্র এত অপরিমিত ও বর্তমানকালের অবস্থার অনুপাতে এত অনগ্রসর।

শাসনতন্ত্র হইবে প্রতিনিধিমূলক, ইংলণ্ডের কোনও আদর্শপত্র থাকিবে না ইহার অতিরিক্ত কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর কিছু বলিবার নাই। তাঁদের বিপক্ষে যারা দাঁড়াইয়াছেন তাহাদের দৃষ্টি বৃষ্টি

জনসেবার আদর্শে পরিচালিত, নিরাপদ ও সম্ভ্রান্ত

ইন্সওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস :—২২, ক্যানিং স্ট্রীট

আসাম শাখা :—ডিব্ৰুগড়

“ক্যাপিটাল”

১৫ই জুন, '৪৪ সন বলেন—(বঙ্গোপদ্রব্য) “বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাণিজ্য প্রদেশে যে কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ ইন্সওরেন্স অব ইণ্ডিয়াই সর্বাধিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে। নতুন কাজ ও প্রিমিয়াম যাবদ আয় বিশেষ সন্তোষজনক। গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতেই প্রায় সমস্ত টাকা লগ্নী আছে।”

আর্থিক পরিচয়

(১৯৪০ সন)

নতুন বীমাপত্র	...	১৬,০০,০০০, টাকার উপর
প্রিমিয়াম বাবদ আয়	...	২,০০,০০০, " "
বীমা তহবিল	...	৩,৯০,০০০, " "
সম্পত্তির পরিমাণ	...	৫,৫০,০০০, " "

বোনাস

মেয়াদী বীমায় ... ১০, আজীবন বীমায় ... ১৬,

(প্রতি বৎসর প্রতি ১০০০, টাকার পলিসির উপর)

উত্তম সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যিক।

মেসার্স : ম্যানেজারস লিঃ
চীফ এজেন্টস্

ইউ পি সি পি ও লিমিঃ
২৫, শ্রীরাম রোড, লক্ষ্মী

মিঃ এন সি দত্ত, এম এল সি
চেয়ারম্যান



মেডাবেব অবসান

গত দুবৎসরের কঠিন পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। বন্যায়, রোগে, দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা বেঁচে আছি। দুর্দশার যে অবসান ঘটেছে তা' নয়, এখনো চলছে অগ্নিপরীক্ষা, তবে আগুনের তাপ ক্রমেই কমে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মত—যুদ্ধ শেষ হতে আর বিশেষ দেরি নেই। খাদ্য-সমস্যাও কিছু পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারও ক্রমবর্ধমান। চারদিকেই যেন সম্ভাবনার, সুদিনের ইংগিত। এরই প্রতীকরূপে আনন্দময়ীর আগমন। হাতে তাঁর বরাভয়, অসীম করুণা তাঁর দৃষ্টিতে। মনে হয় সকল অভাবের এইবার অবসান হবে।



সি,কে,সিএন এণ্ড কোংলিঃ

জ বা কু সু ম হা উ স ক লি কা তা

জরও সংকুচিত। জিম্বা সাবেক ও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ ধার করিয় সন্তুষ্ট—শুধু তাঁরা চান পাকিস্থানকে তফাৎ করিয়া লইতে। আর কতক লোক চণ্ডল হইয়া উঠিয়াছেন মাইনিরটির রক্ষা-কবচের জন্যে।

এ সকল দাওয়া দাবীর খুঁটিনাটির বিচার আমি করিতে চাই না। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের অভিজ্ঞতা এই যে, যাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা প্রতিনিধিত্বের দ্বারা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার জন্য চাই আরও এমন কতকগুলি ব্যবস্থা যাহাতে প্রত্যেক দেশের সকল সুবিধা ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত অংশ পায় এবং সেই ব্যবস্থা নিশ্চয় করিবার জন্য চাই এমন একটা শাসন পদ্ধতি যাহাতে শাসনের কাজ ভাগিয়া নিম্নেন্দ্রীকৃত করিয়া সকলকে অস্প-বিস্তর প্রত্যক্ষভাবে শাসনের কাজের অধিকার দেওয়া হয়। পৃথিবীর এই অভিজ্ঞতার দিকে একেবারে অন্ধ হইয়া কেবলমাত্র উনিবিংশ শতাব্দীর আদর্শ প্রতিনিধিবাদের শেষ কথা খরসা আমরা যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিতেছি ইহা পরিত্যেপের বিষয়।

আবার দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টায় যে বোম্বাই স্ট্যান্ডার্ড সরকারে পেশ করা হইয়াছে তাহাও ঠিক এমনি অসাময়িক। বড় বড় কারখানা গড়িয়া প্রচুর মূলধন লইয়া ঘেঁটেটের সহযোগে দেশের যত কিছু শিল্পজাত গড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহা পরিপূর্ণরূপে ব্যস্ত করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা। এ কাজ অবশ্য কঠিন, কিন্তু কে করবে? কি প্রণালীতে ইহা করা হইবে? ইহার দ্বারা দেশের যে সম্পদ বৃদ্ধি হইবে তাহার সুযোগ সমস্ত দেশ-বাসীর মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টনের কি ব্যবস্থা হইবে একথা যে আগে হইতে ভাবিবার কথা সে কথা ইহার ভাবিয়াছেন মনে হয় না। তা ছাড়া এ স্ট্যান্ডার্ড হইয়াছে মূলতঃ যুদ্ধের পূর্বের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির মূলে। তার কটকট যুদ্ধের জগতে থাকিবে সে কথাও ভাবিবার বিষয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত দিন চলিয়াছে এই নীতিতে যে যার যত শক্তি আছে মাল সৃষ্টি করিবে আর তারপর বিপুল অয়োজন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে সেই মাল কেন ইবার ব্যবস্থা করিবে। এই নীতির সংগে সংগে অনেক দেশকেই এইরূপে বিদেশী মালের dumping নিবারণের জন্য ও স্বদেশীয় শিল্পের রক্ষার জন্য রক্ষণনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইহা হইতে হইয়াছে প্রচুর অনিষ্ট ও প্রচুর সমর্থ্য। ইহাতে যে সব দেশ শিল্পে আগে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহার সমস্ত বাজার প্রায় গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে; তাদের বিপুল শনাক্তির সামনে ছোটখাট অনগ্রসর দেশের মাথা তুলিবার পথ নাই। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসাম্যের পাশে অবশ্য প্রতিযোগিতার ফলে দেশে দেশে বিস্তর হিংসা বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিয়াছিল এবং বর্তমান যুদ্ধের এটা একটা প্রকাশ্য হেতু। হিটলার স্বদেশে আসর জমাইয়াছিলেন এই Plutoerদের প্রতি বিদ্বেষের দ্বারা তুলিয়া।

যুদ্ধের পরে ঠিক এই ব্যবস্থা থাকিবে না। কি হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনার অবধি নাই—আজও কোনও স্থির নীতি গৃহীত হয় নাই। কিন্তু আটলান্টিক চটপটের একটি সূত্র এ বিষয়ে একটা দিক নির্দেশ করিতেছে যেটা ভারত বা চীনের পক্ষে চিন্তার বিষয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সকল দেশের সকল কাঁচা মাল পাইবার সমান অধিকার অন্য সকল দেশের হইবে। ভারত, ব্রহ্ম বা চীনের মত দেশে অনেক অবাধত কাঁচা মাল রহিয়াছে, সেগুলি সেই দেশের ভবিষ্যতের আশা। ভারত যে খুব দ্রুত তার শিল্প শক্তি সংহত করিয়া ইংলণ্ড বা আমেরিকার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সেই কাঁচা মালের সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এখনে সমান ভাগের সুযোগ পাইবে শুধু অগ্রসর শিল্প-শক্তিমান দেশ, কাঁচা মালের দেশ শুধু কাঁচা মালই জোগাইতে থাকিবে। এ নীতি ভারতের পক্ষে ভয়াবহ।

কিন্তু জগতে আর্থিক সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই আন্তর্জাতিক নীতির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। শিল্প-জাত প্রস্তুত করিবার অব্যাহত স্বাধীনতা ও তারপর সেই শিল্প যেন যেন প্রকারণ দেশ বিদেশে কাটাইবার অনিয়ত চেষ্টা উঠাইয়া মালের উপাদান ও দেশে দেশে আসান প্রদান একটা সুনিয়ত ব্যবস্থা অনুসারে করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক দেশ বাহির হইতে পাইতে পারে ঠিক যাহা তার প্রয়োজন ও যাহা সে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না এবং বিনিময়ে সে অপর দেশকে দিতে পারে যে সব কাঁচা মাল ও শিল্পজাত সে নিজে সৃষ্টি করে এবং যাহা তাহার প্রয়োজনের অধিক।

যুদ্ধের পূর্বে এই নীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনও একটা সুনিয়ত পদ্ধতি ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন দেশের গবর্ণ-মেন্ট মাকে মাকে দেশের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কতকটা অজ্ঞেয়ে হিসাবের উপর করতেন অন্যান্য দেশের সংগে বাণিজ্য চুক্তি। ইহা ঠিক স্ফুটভাবে ও সুনিয়তভাবে হইতে পারিয়াছিল শুধু রাশিয়ায় যেখানে বিহবাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের একচাটিয়া।

বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে এই সমস্ত লেন দেনের চুক্তি একটু ব্যাপকভাবে হইয়াছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সকল দেশেই বিহবাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ সব ব্যবস্থা খুব কার্যকরী হইয়াছে।

আটলান্টিক সনদের ইংগিত এই যে, কাঁচা মাল সম্বন্ধে লেন-দেনের চুক্তি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, কিন্তু ঠিক কি প্রণালীতে হইবে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। আর শিল্পজাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আটলান্টিক সনদ একেবারে নীরব।

তথ্যটি ভবিষ্যৎ জগতে শিল্পজাত কি কাঁচা মাল উভয় বস্তুর বাণিজ্যে যে পার্থক্যের মত অবশ্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে কিনা এ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা যুদ্ধের পূর্বে যেমন অনেকটা হইয়াছে যুদ্ধের পরেও তেমনি ঘেঁটেটের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শক্তিমান মালদারেরা শুধু তাদের নিজাদের স্বার্থের জন্য international curtel প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগতকে তাদের অধীন করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা আছে।

আমাদের শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এ সব সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এবং কেবল-মাত্র নায়নীতিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবসার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সেগুলিকে মালদারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির হেতু না করিয়া সর্বজনীন হিতানুষ্ঠান করিয়া তুলিতে হইবে। এক কথায় কৃষি, শিল্প, খনিজ-উদ্ভাব প্রভৃতি সকল কার্যই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে সর্বদেশবাসীর হিতার্থে যাহাতে নিয়োজিত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাশিয়ার পাঁচসনা পরিকল্পনা বাহারা করিয়াছিলেন, তাহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। তাহারা কেবলমাত্র দেশের সর্ববিধ সম্পদ সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার দ্বারা বর্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা ইহাও হিসাব করিয়া-ছিলেন যে, রাশিয়ার তখনকার যে লোক-সংখ্যা ছিল এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে যে লোক-সংখ্যা হইবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক রাশিয়ানের যাওয়া-পাড়া ও আরামের জন্য কত কি প্রয়োজন হইবে এবং প্রত্যেকের জন্য কাজ জোগাইবার জন্য কি ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। এতখানি হিসাব করিয়া তাদের স্ট্যান্ডার্ড হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ

জনসংঘ বা সোভিয়েটগুলির অপরিশ্রান্ত চেষ্টায় ইহা কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল। তাই সোভিয়েট প্লান ও সোভিয়েটের সকল বৃহৎ প্রচেষ্টা এত অসামান্য সফলমান্ডিত হইয়াছিল।

যুগ্মোত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় যদি আমরা কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিয়া বাসিয়া গরি, আধুনিক রাষ্ট্রঘটিত ও অর্থনীতিঘটিত তথ্যগুলি আয়ত্ত করিয়া পরিকল্পনা করিতে অগ্রসর না হই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কারণ নাই।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দিক হইতে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, বর্তমান জগতে অস্বাধীনতার (Independence) কোনও মানে বা স্থানে নাই। কোনও দেশই অপর দেশের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আমাদের দেখিতে হইবে যে, অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দার্থ নিষ্ঠার সম্পর্ক, তাহা যেমন কি রাষ্ট্রীয়, কি অর্থনৈতিক অস্বাধীনতার সম্পর্ক না হইয়া সমান সমান রাষ্ট্রের সমন্বয়ের সম্বন্ধ হয়। এই দিক হইতে যুগ্মোত্তর জগতের পরিকল্পনায় ভারতের যদি কোনও স্থান থাকে, তবে ভারতকে প্রবলভাবে প্রকাশ বা প্রস্থল সর্বনিম্ন hegemony-র কল্পনার প্রতিরোধ করিতে হইবে, সর্বজগতের সমন্বয়ে রাষ্ট্র-সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠায় সম্মুখ হইলে চলিবে না, দৃষ্টি রাখিতে হইবে দেশের স্বাধীনতার সমান অধিকারলাভের দিকে। আর্থিক ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থা যেমন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির

আয়োজন করিতে হইবে, তেমন সেই সৃষ্ট সম্পদের সুযোগ বাহাতে সর্বদেশবাসীর সমান ভাগে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইজন্য সমস্ত শাসন যন্ত্রের পরিচালনার ভার শুধরে শুধরে জনসংঘের হাতে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং সেই সব জন-প্রতিষ্ঠানকে intensively শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সে ভার সৌষ্ঠবের সহিত বহন করিতে উপযুক্ত করিতে হইবে। যে শাসন-ব্যবস্থা হইবে তাহাতে এসব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে, বাহাতে সেই নীতির ফলে অসহায় ভারত আর একটা নতুন শোষণযন্ত্রের চাপে না পড়ে।

সর্বশেষে নীতি বা পদ্ধতির আবিস্কারে আমাদের অতিমাত্র মৌলিকতার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের আদর্শ সংগ্ৰহ করিতে হইবে। অন্য দেশে যাহা হইয়াছে, ঠিক তাহাই যে অবিকল এদেশেও হইবে, এমন হইতে পারে না। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই সব বিদেশী আদর্শ ভাঙিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু অনেকের এমন একটা মোহ আছে যে, আমরা এমন একটা কিছু করিব, যাহা জগতে কেহ কোথাও করে নাই, যার সম্বন্ধে কোথাও কাহারও অভিজ্ঞতা নাই। এই “নতুন কিছু করা”র অতিমাত্র মোহ এবং বিদেশী সকল আদর্শ ও অনুষ্ঠানের প্রতি অহেতুক বিশ্বাস বর্জন করিয়া প্রাথমিক সহিত আমাদের আলোচনা করিতে হইবে সকল দেশের সকল অনুষ্ঠানের এবং পৃথিবীর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

হারাধনের কয়টি ছেলে ?

—১—

হারাধনের কয়টি ছেলে

কাজ কি আমার গুনে ?

সব ক'টি যে নেইক বেঁচে

তাই রেখেছি শূন্যে !

—২—

কিন্তু যদি থাকত বেঁচে

(আর) জন্মাত এই যুগে,

(আর) হারাধনই বিদায় নিভ

ম্যালেরিয়ায় ভুগে !

—৩—

অনাথ হলেও ছেলে ক'টির

অভাব থাকত কি,

হারাধনের থাকত যদি

“হাওড়া-পলিসি” ?

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৩০ নং ব্রাড রোড কলিকাতা

AA5/M12

চেয়ারম্যান : কর্ণবীর আলামোহন দাশ।

কলকাতা শহরে তিন তিনটে বাড়ি। তবু এসে আছে এই অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে।
ঘটছে, কোন দিন কেউ যা স্বপ্নেও
জাপানীরা বর্মামূল্যে নিয়ে
নিয়ে, সেই আতঙ্ক শহর প্রায় খালি।
ভুলোকেরা গাঁয়ে এসে জুটেছেন।

ছেলেবরসে সুপ্রিয়া দু-একবার এসেছে,
গ্রন্থপার অনেকদিন— প্রায় বছর পনের পরে
ই এল। ভারি ভাল লেগেছে। অনুপমকে
স্তায় হস্তায় চিঠি দেয়, তাকে লিখেছে,
বুজ গাছপালা, মাঠভরা ধান, শান্ত ঘর-
স্থালী—তুমি এসো একবার, এছবি কোন
দিন ভুলতে পারবে না! দোতলার ঘরে
থাকতে এক মিনিটও মন চায় না। ইচ্ছে করে

যায় আসে? এখানকার মানুষ নই তো
আমরা!

রথের ছুটিতে অনুপম এল। সুখবর
নিয়ে এসেছে। না—কোন রকম উপদ্রব হয়নি
কলকাতায়। মানুষ-জন ফিরে আসছে, বাস্‌তায়
লোক চলাচল বেড়েছে। তিনটে বাড়ির মধ্যে
একটায় ভাড়াটে জুটে গেছে। কম ভাড়া
অবশ্য—তা হলেও জুটেছে তো! হরিহর
সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

চণ্ডল-পায়ে সুপ্রিয়া এসে ডাকল, বাবা—
ও বাবা—

হরিহর বলেন, আর দেখ বাবাজি, এই
এক মূর্খকিল। পাগলী মা ফেলেপে উঠেছে,
মেলায় যাবে।

হরিহর মুখ টিপে হেসে দাসকে বাসন
করলেন।

মেলায় এসে সুপ্রিয়া মশগুল হয়ে গেল।
মাটির পুতুল, রকমারি বাঁশী, চিত্রবিচিত্র
হাঁড়ি সরা অনারস আর ডেয়োফল—কিনছে
তো কিনছেই। কি কমে লাগবে এই সমস্ত
আর কে-ই বা নিয়ে যাবে—

অনুপম বলে, ফেরা থাক—

নাগরদোলা ঘুরছে বন্বন্ব করে, বাজনা
বাজছে। বাঁশ বহুরের মেয়ে ছোট খুঁকীটির
মতো ছুটলে সেদিকে। ভিড় জমেছে, জুতো-
পরা সুপ্রী সবেশ মেয়েটার কাণ্ড দেখে মানুষ-
জন তাগজব হয়ে গেছে।

বিরক্ত হয়ে অনুপম বলে, কথা মোটে
কানে নিচ্ছ না—কি রকম মেঘ করেছে
দেখছ?

ভিজব মশায়, ভিজব। খুঁ-উ-ব মজা
লাগে ভিজতে। অবহেলা ভরে খাড় ফিরিয়ে

সুপ্রিয়া বলে, বৃষ্টি
বৃষ্টি করছিল বাবা! কি
রকম বোদ উঠেছে দেখ।
চারিদিক শুষ্ক নো
খাটখটে।

বিস্ততভাবে হরিহর
বললেন, কিন্তু গাড়ি-
পাশ্বক যে ঠিক। হয়নি।
যাঁব কিসে?

সুপ্রিয়া হেসে বলে,
রক্ষে কর। যা এখানকার পাশ্বক আর
গরুরগাড়ি—গোলাকার হয়ে তো বসতে হয়।

দাসকে জিজ্ঞাসা করে, ও দাস, কন্দুর
সে যায়গা? বিলপারে ঐ যে বটগাছ দেখা যায়
—ঐ তো?

নিমন্ত্রন

শ্রী মনোজ ব

চাষাদের সঙ্গে কাদামাটি
মেখে মাঠে মাঠে বেড়াই।
আকাশ ফাঁটিয়ে গান করি—

শুধু চিঠিতে কবির করা
নয়, মনের ভাবটা তার
সিঁতাই এই রকম। হরিহর
রায় সর্বদা টিক্‌টিক্‌ করেন,
কিন্তু আদরে মেয়েকে
নামলাতে পারেন না। এই যেমন আজ ধরে
পড়েছে— বাকাবড়িশ গ্রামে রথের মেলা হয়,
খুব নামডাক, তিন দিন ধরে হৈ-হল্লা চলে—
সুপ্রিয়া যাবে সেই মেলা দেখতে।

মেয়েছেলে যাবে ছোটলোকের ভিড়ের
মধ্যে—ছি-ছি! এ অঞ্চলে ও-সব রেওয়াজ
নেই, নিন্দে রটে যাবে। হরিহর কড়া সুঁরে
মানা করলেন। সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে নো-
ঠোট দুটো চেপে অশ্রু সামলাবার চেষ্টা করে।
বা-মমা মেয়ে — মনটা নরম হয়ে গেল
হরিহরের। বলেন, বৃষ্টি-বাদলার সময় যে
মা, অসুখ করে বসবে — সেইজন্য বলি।
নইলে লোকে কি বলল, আর না বলল, কি

বটগাছ ছাড়িয়ে আরও এক কোশ হবে
দিদিমাণি।

হোকগে। হেঁটে যাব — হুটিতে আমি
খুব পারি। উড়ে চলে যাব দেখিস।

শেষ পর্যন্ত হরিহরকে মত দিতে হয়।
অনুপমকে বললেন, তুমি এসেছ — রক্ষে
পেয়োছ বাবা। তুমিও যাও—দেখে এসেগে।
মেলাটা ভাল। মেয়েকে বললেন, বেলাবেলি
ফিরনি কিন্তু—

যাব আর আসব বাবা—
বাপকে মিশিচত করে দুটিতে রওনা
হল। দাস, টৌর কাটাঁছিল। কিন্তু না—
দরকার নেই। কত লোক যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে
স্বচ্ছন্দে চিনে যেতে পারবে।

হে-লোকটা নাগর-
দোলা চালাচ্ছে তাকে
বলে, থামাও —
আমি চড়ব।

এক লাফে একটা
খোপে উঠে বসল। অনুপমকেও ডাকে,
এসো—এসো না—

অনুপম বলে, পাগল হয়নি তো আমি!
বটে! তড়াক করে নেমে সুপ্রিয়া তার
হাত ধরে ফেলল। উঠতে হবে—হবেই—

টপ্-টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ল।
সেই সঙ্গে বাতাস বড় বাশমাগাছটার পাতা
ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বৃষ্টি—বৃষ্টি—মৃদল-
ধারে বৃষ্টি। মেলায় জন্য অস্থায়ী ঢালা
বাঁধা হয়েছে। যেখানে দশজনের জায়গা,
পঞ্চাশজন মাথা ঢুকিয়েছে সেখানে। রশি-
খানেক দূরে চাষীপাড়া, কলাবনের আড়ালে
ঘরের চাল দেখা যাচ্ছে। এরা ছুটল,
সৌদিকে।

এক বাড়িতে গিয়ে উঠল। চিনের আট-চাল, দুটো গোলা পাশাপাশি। বাহিরের দিককার দাওয়ায় তারা উঠেছে। মাটির দেয়াল দিয়ে অন্তঃপুরে আলাদা করা। খানিকটা জায়গায় দেয়াল নেই, বর্ষা এসে পড়ায় দেয়াল দেবার অবকাশ হয়নি হয়তো, সেখানটা সুপারিপাতার বেড়া দেওয়া। সম্পন্ন গৃহস্থ—মেয়েদের সুখের অগোচর না হোক, মানুষের চোখের আড়ালে রাখবেই।

কাপড়চোপড় ভিজে জ্বজ্বলে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাড়ির কত! স্মারিক সদীর গামছা হাতে ছুটেতে ছুটেতে এল। জল-চৌকিটা ঝেড়ে দিয়ে বলে, এসো মা, জলটা আগে মোছ। কি করা যায়! আমাদের ঘরের কাপড় দিই কেমন করে?

সুপ্রিয়া বলে, একটুখানি ভিজছে। ও গায়ে গায়ে শুকিয়ে যাবে।

স্মারিকের তবু সেয়াসিত নেই। শীত করছে, আগুন পোহাবে মা? আনব আগুনের মালসা?

সুপ্রিয়া হেসে তাড়া দেন, আপনি ঘরে যান দাঁক। কিছু লাগবে না আমাদের।

মাঝে মাঝে বৃষ্টিটা একটু কমে, এরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখনই আবার চেপে আসে। মেঘাধকার বিদ্যুৎ-চমক চিনের চালে জল পড়ার আওয়াজ — চারদিক তোলপাড় করে তুলেছে।

বেড়ার ভেতলে কার্তিক জল ছপছপ করতে করতে উঠোন পার হয়ে এসে খবর দেয়, রামার যোগাড় হয়ে গেছে। আসুন।

রামা? ভালো যে ভালো—রামা এখন কে করতে যাচ্ছে?

উপোস করে থাকবেন? সে হবে না।

অনুপম বললে, বৃষ্টি থামলেই আমরা চলে যাচ্ছি। তোমারা খাওয়া-দাওয়া করো গে ওদিকে—

হঠাৎ স্মারিক বেরিয়ে আসে। যেন আগের সে মানুষ নয়। হৃৎকার দিয়ে ওঠে—নামো দাওয়া থেকে—

অনুপম অস্বাভাবিক হয়ে বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে?

জেলোপালে নিয়ে ঘর কর। ভিটের উপোস করে পড়ে থেকে অকল্যাণ ঘটবে?

যে রকম মেজাজ, মুখে যা বলছে—কাজেও ঠিক তাই করবে। সুপ্রিয়া ভরে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। কার্তিকের দিকে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি। এক্ষুনি গিয়ে চাপাব।

অনুপম কিন্তু নির্বাক। ইতিমধ্যে মাদারের উপর লম্বা হয়ে শূন্য পড়েছে, আর পা নাচাচ্ছে।

সুপ্রিয়া বলে, ক্ষুধিত যে গায়ে ধরে না!

তোমার রামা জাত খাব আজকে। ভাত বেড়ে, বাজান সাজিয়ে আমার ডাক দেবে, তার আগে নড়েও বসছি না।

সুপ্রিয়া বিপন্ন ভাবে বলে, আচ্ছা বলে তো—এ সব কি জানি, না করোছি কোন দিন? রামা ঘরে উঁকি মেরেও দেখতে দেন না বাবা।

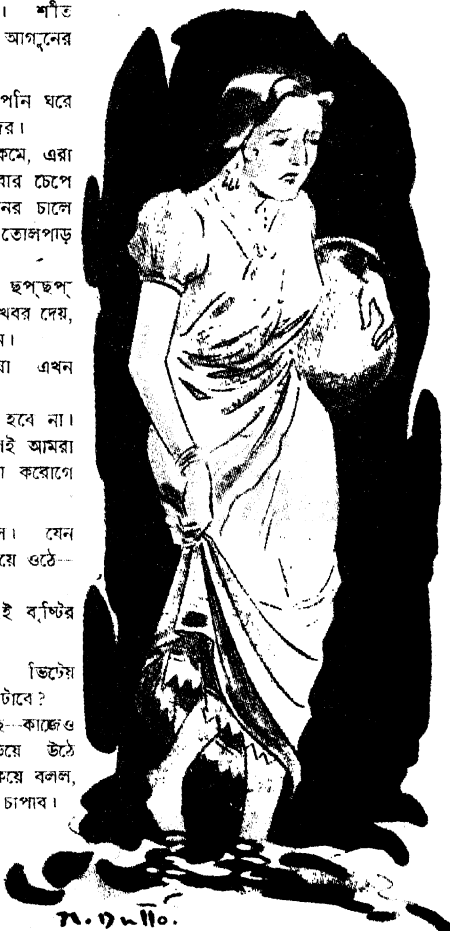
অনুপম বুক ঠুকে বলে, এই আমার কিন্তু সমস্ত জানা। হোস্টেলে যত পিকনিক হোত, রামার ভার আমার উপর—

ওঠো তবে—

বদনাম রটে যাবে যে—বলবে, বউমুখো। আর তোমাকে কি বলবে জানো? গহরশোকা বউ—বরকে দিয়ে রাখাচ্ছে।

পা নাচাতে নাচাতে এবার গুনগুনিয়ে গান ধরল অনুপম।

স্মারিক আবার এল, হাতে লণ্ঠন আর প্রকাণ্ড আয়তনের এক কলসি। বলে, চলো মা, ঘাট দেখিয়ে দিচ্ছি। তালের খেতে—বস্তু পিছল, কলসি নিয়ে সাবধান হয়ে উঠতে হবে।



অসহায় ভাবে সুপ্রিয়া বলে, ও-বাবা! অত বড় কলসি টানতে পারব না। তো। জলটা কেউ আপনারা তুলে দিন।

স্মারিক বলে, পোড়া কপাল! রাহুগ-সেবার জল আনব, সে কপাল করে এসেছি কি মা? জল-চল জাত হলে তোমায় কল দিতাম না।

অনুপম উঠে বলে, আমি — আমি এনে দিচ্ছি। অসুখ থেকে উঠেছে কিনা দেহটা ভারি দুর্বল—

সুপ্রিয়া এক ঝাঁকিতে কাছে তুলল কলসি। ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুপমকে আড়াল করে বলে, আলো তুলে ধরুন কতী, দেখা যাচ্ছে না।

উঠান জলে ভর্তি। জুতো খুলে শাড়ির আঁচল দো-ফেরতা কোমরে জড়িয়ে সুপ্রিয়া শীতে হি-হি করতে করতে ঘাট থেকে জন নিয়ে এল।

ভাত চেপেছে, টগবগ করে ফুটছে, সেই সময় অশ্বকরে অনুপম এসে উঠল। বলে, অত বড় অসুখ থেকে উঠলে, পেরে উঠবে না। মাছটা আমি রাখব।

ঘাড় দু'লিয়ে সুপ্রিয়া বলে, পারব — খব পারব গো। কাজে ভুড়ল দিও না বলছি। আগে ছিল অভিমান, এখন এই একটা রাতের গৃহিণীপনায় সত্যি সত্যি তার খুব আমোদ লাগছে। খানিক উঁচিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ঝংকার দিয়ে ওঠে, যাও বলছি, যাও—

ঘরের ভিতর কার্তিকের বউ যামিনী আর বোন পুষ্টি মধ্যে খুব হাসাহাসি হচ্ছে তখন। যামিনী পুষ্টিকে টানতে টানতে বেড়ার ধারে নিয়ে এসেছে। বলে, শোন দিদি, কি বলছে শেনি। বর রাধিতে এসে দাঁড়িয়েছে—বউটার নাকি বস্তু অসুখ। তিনটে কুমীরে খেয়ে উঠতে পারে না—অসুখে তিনি মরে যাচ্ছেন। হি—হি—হি—

মর পোড়ারমুখী, হেসেই খুন হলি। চণ্ডল বউটার গাল টিপে দিয়ে পুষ্টি নিজের কাজে গেল।

সেই বেড়ার ধার থেকে যামিনী নড়ল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুপ্রিয়ার কাণ্ড-কারখানা। আবার ননদের কাছে ছুটে গিয়ে হেসে লুটোপুটি। বলে, খিগা মাগী রামা করছে দেখে যাও। জুতো পরে গটমট করে বেড়ায়—ইদিকে বেড়ি ধরতেও জানে না। মুখে আঁচল দিয়ে সে হাসে। হাসির বেগ ঠেকাতে পারে না।

চূপ কর—শুনলে কি মনে করবে, চূপ চূপ। বলতে বলতে পুষ্টিও হেসে ফেলে। সেও কিছু কিছু দেখেছে। তারপর বউকে যুঁটি দেয়, পুষ্টিয়ে জ্বালিয়ে ফেলেছে—আহা, মুখে দেবে কি করে! ওখানে গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিগে যা—

যামিনী জিজ্ঞাসা করে, যাব দিদি? দোষ হবে না?

পূরুষমানুষ তো কেউ নেই ওদিকে—
যাই তাহলে? যামিনী ছুটল।
পুটি সামাল করে দেয়। চালের নিচে
দান্নে কিন্তু—খবরদার! ভাত মরে যাবে।
গোলগাল কালো বউটা কুম্‌কুম্‌ পালং-
গাতা মল বাজিয়ে রামার জায়গার খানিকটা

বেশ লাগে বউটিকে। কথায় কথায়
হাসে, আর ভাঙাটি এমন—যেন কত বড় গিয়া!
সুপ্রিয়া দেবী—বড় বড় দুটো সমিতির
সেক্রেটারি আর একটার ভাইস প্রেসিডেন্ট—
চায়াবউ তাকে একদম অপদার্থ আনাড়ি ভেবে
বসেছে।

খেতে বসেছে অনুপম। খেতে খেতে
বলে, তুমিও বসে যাও সুপ্রিয়া। সেই কখন
খেয়েছ। সন্ধ্যায় চা-টা হয়নি—

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বেড়ার ওধারে শুনিয়ে
শুনিয়ে বলে, ওমা কি ছেয়া! মেয়েমানুষ
পূরুষের সামনে বসে থাকে—কি যে বলে
তুমি!

অনুপমের সামনে মাটির উপর সে চেপে
বসল। বলে, ভালটুকু ঢালো
বলছি। ফেলতে পারবে না, মাথা
বাও। বলে ফিক করে হেসে
ফেলল।

অনুপম চোখ তুলে
বলে, নূন পুড়ে
যবক্ষার হয়ে গেছে,
গলায় উঠছে না।
জল ঢেলে নাও,
প্লাসে জল রয়েছে।

তারপর মাছের ঝোলের বাটি থেকে এক
হাতা কেটে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, এটা?
পানসা। মোটেই নূন দাওনি।

নূন মেখে নাও। পুতে দিয়ে দিইছি।
একটা হাতপাখা ছিল ওদিকে, কুড়িয়ে এনে
সুপ্রিয়া জোরে জোরে বাতাস করে।

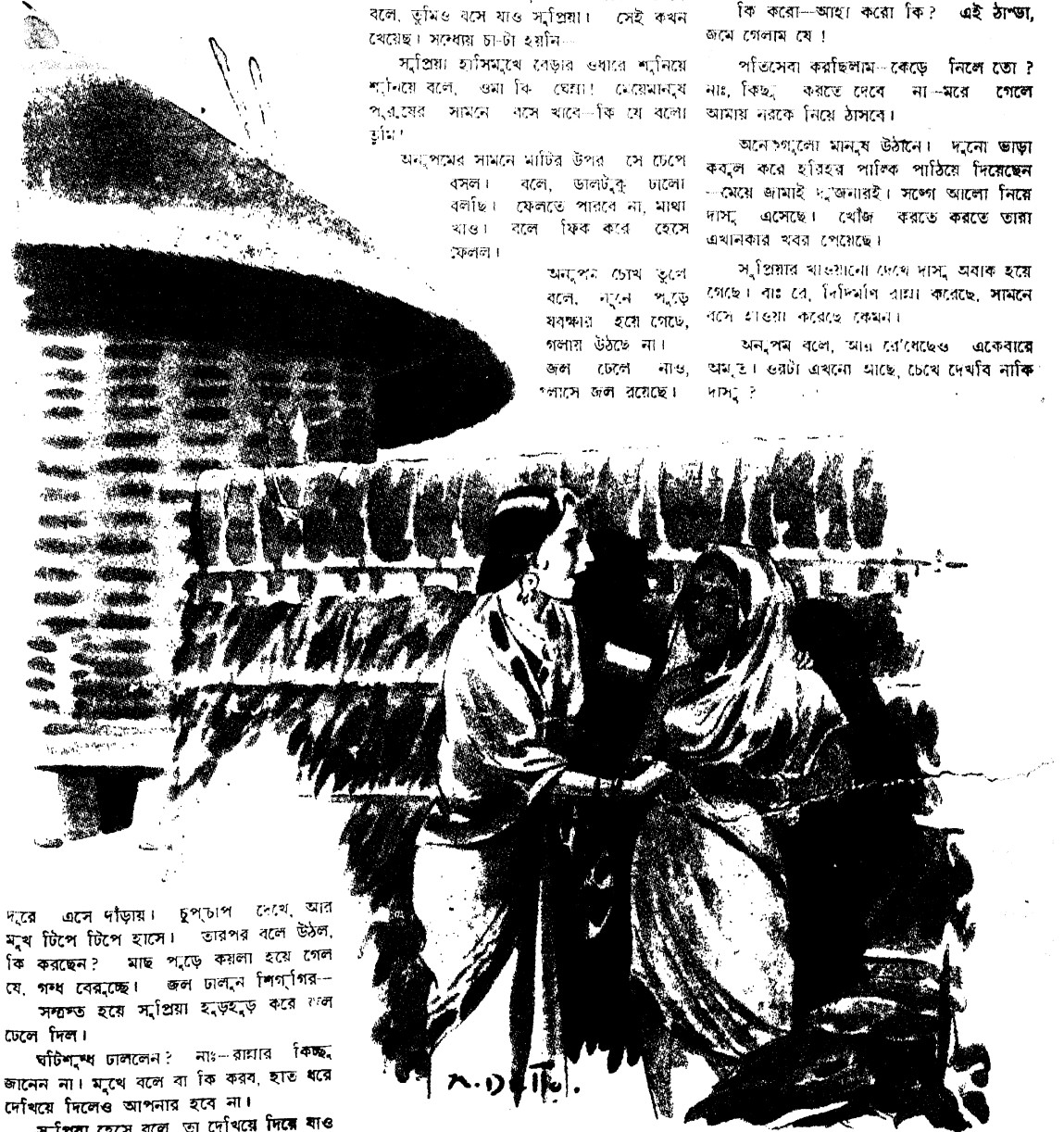
কি করো—আহা! করো কি? এই ঠান্ডা,
জমে গেলাম যে!

পাতিসেবা করছিলাম—কেড়ে নিলে তো?
নাঃ, কিছ—করতে দেবে না—মরে গেলে
আমায় নরকে নিয়ে ঠাসবে।

এনে খগুলো মানুস উঠানে। দুনো ভাড়া
কবুল করে হিরহর পাঙ্কি পাঠিয়ে দিয়েছেন
—মেয়ে জামাই দুজনারই। সপ্পে আলো নিয়ে
দাসু এসেছে। খোঁজ করতে করতে তারা
এখানকার খবর পেয়েছে।

সুপ্রিয়ার স্বাক্ষরানো দেখে দাসু অবাক হয়ে
গেছে। বাঃ বে, দাঁদিমান রামা করেছে, সামনে
বসে হাওয়া করেছে কেমন।

অনুপম বলে, আর বেঁধেছেও একেবারে
অমত। ওরটা এখনো আছে, চেখে দেখবি নাকি
দাসু?



দূরে এসে দাঁড়ায়। চুপচাপ দেখে, আর
মুখ টিপে টিপে হাসে। তারপর বলে উঠল,
কি করছেন? মাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেল
যে, গন্ধ বেরুচ্ছে। জল ঢালুন শিগগির—
সম্প্রস্তু হয়ে সুপ্রিয়া হুড়হুড় করে গলে
ঢেলে দিল।

ঘটিশব্দ ঢাললেন? নাঃ—রামার কিছ
জানেন না। মুখে বলে বা কি করব, হাত ধরে
দেখিয়ে দিলেও আপনার হবে না।

সুপ্রিয়া হেসে বলে, তা দেখিয়ে দিয়ে যাও
না ভাই হাতটা ধরে—

বাঁধি নিশ্চয় বাঁধি। তুই তোর বর তোর শ্বশুর—তোদের বাড়ি নূন খাল কলকাতায়



পালঙ্কিতে উঠবার সময় স্মারিক আর কাতিক এসে পাঁড়াল। স্মারিক বলে, গৃহক চাডালের ঘরে রামচন্দ্র এসেছিলেন মা, আমাদের হল সেই বিস্তারিত। আমিও একদিন যাব তোমাদের গিয়ে, রায়-কর্তার চরণধূলো নিয়ে আসব।

সুপ্রিয়া বলে, আমরা কলকাতায় ফিরছি। অনুপমের দিকে কটাক্ষ করে বলে, খুব শিগগিরই—ভ্রমদূত এসে উপস্থিত।.....তা চলো না কেন কলকাতায়। যাবে :

স্মারিকের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে কলকাতার নামে। আজব শহর। কল টিপলে আলো জ্বলবে, কল ঘোরালে জল পড়ে। অমাবস্যার রাতও অন্ধকার নেই, জ্যার ক্ষতির জয়গা।

এক খড়ের কাশামি সঙ্গে স্মারিক সর্দার কলকাতায় গিয়ে ছিল তিন দিন। আজ তিন বছরেও তার গল্প শেষ হল না। ছেলের নতুন বিয়ে দিয়েছে, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর

তামাক সেজে নিয়ে মাদুর বিছিয়ে শোয়, চোত-বোশেখ অনেক দিন চলে গেছে। যামিনী-বউ শব্দরের পায়ে তেল মালিশ করে ক্ষেতের ধান বাড়ি এসেছে, কিন্তু গোলায় দেয়। বড়ো ভুড়ক-ভুড়ক - তামাক টানে ওঠেনি। ধানের পালায় পালায় উঠানে পা সেই সময়টা, আর কলকাতার গল্প করে। ফেলা যেত না—এত ধান গেল কোথায় ?

অনুপমও বলল, নৈমন্ত্যর করে যাচ্ছি। যেও কিন্তু, সর্দার। আমাদের বাড়িতে থাকবে, রাখলে বিপদে পড়বে সর্দার। আর দরটাও এমন হাঙ্গামা নেই। ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

স্মারিক উজ্জসিত হয়ে বলে,

লোকে ভয় দেখাতে লাগল, ধান বেশি রাখলে বিপদে পড়বে সর্দার। আর দরটাও এমন—যা সাতপুরুষে কেউ কানে শোনেনি। প্রথম-চেষ্টে চাষারা ধান বেচে দিয়েছে। অগণিত নোট—সিকের ঝোলানো লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে এনে এনে রাখত, নোটে নোটে স্তূপাকার হয়ে উঠল। আউশ, উঠবার মুখে দর নামবে—টাকার কাঁড়ি রইল, ডাবনা কি? সেই সময় ধান কেনা যাবে যার যেমন খুশি।

সেই নোটের বোঝা শূন্যে পাতার মতো যেন বাতাসে উড়ে গেল। এক জোড়া কাপড় কিনবে তো গুণে দাও এক গাদা নোট। নুন কিনবে, কেরোসিন কিনবে—দাও এক এক মুঠো। আর এমন হয়েছে, আজকে নোটের পাহাড় ঢেলে দিলেও সমস্ত অণ্ডলে এক খঁচি ধান কেউ দেবে না। ধান-চাল ভৌঁস্কতে উড়ে গেছে।

হরিহর রায় শূন্য নন, যত সন্তজনের। এসেছিলেন কেউ আর নেই। ইস্কুল করবেন, নতুন রাস্তা টিউবওয়েল বসাবেন, সোনার গ্রাম গড়ে তুলবেন—সে সব সাধ সঙ্কল্প মূলতুই রইল। জল-জংল সাপের ভয় ম্যালেরিয়া তার উপর জিনিষপর কিছু পাওয়া যায় না—এর চেয়ে বোমার ঘা খেয়ে মরায় আরাম অনেক বেশি। শহুরে মানুষরা পাগল হয়ে শহরে পালাচ্ছে।

পালাচ্ছে গ্রামের মানুষরাও। পেটের ক্ষিপে ছিটকে পড়ছে। পৌঁচকা বেঁধে কাঁধে নিয়েছে শীতল; পিছনে শীতলের মা বোন বড়ছেলেটা আর কোলের মেয়ে। উন্নন ভেঙে দিল। আর কেউ এসে না রাখে—অলক্ষণ। ছেলেটা যেতে যেতে বলে, দাঁড়া পিসি, দোর-ঘড়িটা রয়েছে মাচার উপর; নিয়ে আসি। পিসি বলে, তাইতো—মাচা ভরতি আমার মশালের গাদা। পাটকাঠিতে গোবর দিয়ে সমস্ত মাঘমাস সে মশাল বানিয়েছে, বর্ষাকালে পোড়াবে বলে।

ফুটপাথের উপর ঘেরেপুরুষ নানান বরলী, বেহায়া—বেআনন্দ.....

অত করে বলেন কেন? যাব, ঠিক যাব। শহর তো নয়, সগগোখাম। ক্ষেতের ধান গোলায় তুলে দিয়ে চোত-বোশেখের ওদিক গিয়ে উঠব।

সুপার-পাতার বেড়ার আড়ালে যামিনী। মল আর কাচের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিয়া তার কাছে গেল। আলগোছে প্রণাম করে যামিনী বলে, কথাবার্তা শুনোছি। আমিও কিন্তু যাব, দিদি—

যাবি, নিশ্চয় যাবি। তুই তোর বর তোর শব্দর—তোদের বাড়িসুখ হাস কলকাতায়—

এবার আর শুনল না সুপ্রিয়া। বউটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে সে পালঙ্কিতে উঠল।

মুসলমান পাড়ায় শোন গলা-ফাটিয়ে কাঁদছে আতর বিবি, ধুলোয় আছাড়-পিছাড় যাচ্ছে। ওদের যে আমি এক কুড়ি বছর চোখে চোখে চোঁকি দিচ্ছি—কার কাছে রেখে যাব আজকে? বছর কুড়ির আগে আতর বিবির একটা চুল পাকেনি, দেহে কুণ্ডলনরেখা পড়েনি—তিন দিনের আগ-পাছ তার বর ও ছেলেটা মরে যায়। উঠানের ধারে ভেঁতুলতলার তাদের কবর। বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে অনেক দুঃখে এতদিন ভিটের ছিল—শুধু ভিটের মাটি চিবিয়ে থাকবে আর কেমন করে?

গ্রাম থা-থা করে। বন্যা এসে যেন মানুষ-জন ঘর-গৃহস্থালী ভাসিয়ে ভেঙে দিয়ে গেল।

সহর অবধি খাওয়া করল বন্য। বন্যার জলে মড়া ভেসে এসেছে—জীবন্ত মড়ার দল দেখতে দেখতে সহরের রাস্তা গলি পার্ক ভরতি করে ফেলল।

শহরের যত আলো চুটিতে মুখ ঢেকেছে। ভাগে গ্যাক-আউট—তাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ গৃহস্থালী নজরের আড়ালে থাকে। হরিহর রায়ের চিরকালের অভ্যাস, ভোর থাকতে উঠে গঙ্গা স্নানে যাওয়া। ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে মানুষ বাধে, হেঁচটি খেয়ে পড়ে যেতে হয়, পদপিষ্ট খুমন্ত মানুষ হাউমাউ কুরে চোঁচিয়ে ওঠে—যাবেন কি করে? ঘর থেকে তিনি বেরোনই না। চীৎস বহরের চেনা কলকাতা আজকে যেন এক নতুন ভয়ানক জায়গা। ফুটপাথের উপর মেয়ে-পুরুষ—নানান বয়সী, বেহায়া, বেআবরু। অবোধ-শিশু কেঁদে কেঁদে গলা ফাটিছে—কোথায় দুধ? মা গিয়ে রাস্তার কলে আজলা আজলা জল খাওয়ায়।

সকালে ঘুম ভেঙে শহরের কর্মবাস্ততা জাগে। রাস্তা গলি খোঁচিয়ে সাফ-সাফাই হচ্ছে, করপোরেশনের ময়লা-গাড়ি ছুটছে, ছুটেবেড়াচ্ছে এ. আর. পি. আর সিভিক গার্ডের দল—এই একটা মড়া, ঐ যে ওখানে একটা, ঐ.....ঐ.....ঐ.....

হঠ, যাও—এই, আরে ওঠ, না হারামজাদী—পালা—পালা—।

ভাড়া টিনের মগ কি মাটির মালসা হাতে কেউ ছুটল লগ্নরখানায়, কেউ বা গৃহস্থ-পাড়ায়, কেউ বা গিয়ে দাঁড়াল ট্রাম-বাস যে জায়গায় গিয়ে থামে সেখানে। পথচারীর পা জড়িয়ে ধরছে, গরুর সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আস্তাকুড় হাতড়াচ্ছে, ভাড়া খেয়ে খেয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরছে।

কামাঙ্জিত কণ্ঠে সুপ্রিয়া অনুপমকে বলে, চলো—পালিয়ে যাই। আমি বাঁচব না এখানে থেকে—

নিচে সদর-দরজার দিক থেকে একটানা আতঁনাদ—মা, মাগো, ওমা—

অনুপম সাম্ভবনা দেয়, ভয় কিসের? মা বলছে—মা' ডাকের চেয়ে ভাল আছে কিছ? কেমন এক ভয়ানক বিপর্যস্ত স্রুতি হয়েছে সুপ্রিয়ার। অনুপম নাইরে এসে রৌপ্য শহর নিচে তাকায়। অন্ধকারে অবশ্যই শহর পরিভ্রমণ শব্দশানভূমির মতো লাগছে।

তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে আনন্দ। আবছা দেখতে পাচ্ছে, একটা-দুটা নয়—অনেকগুলো, যেন প্রেতের মেলা বসেছে। বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকছে, মা—মাগো, ফ্যান দাও, একটুখানি ফ্যান। ভাত চাইতে ভরসা কুণোয়া না, ভাত কে দেবে এমন দিনে?—অবিরাম চোঁচাচ্ছে, ফ্যান ফ্যান ফ্যান

পুরুষমানুষ অনুপম—তারও বৃকের ভিতরে গুদা-গুর করে ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে, শুনতে পাস না এই দাস? এই—এই—

দাসদের ভাত ইতিপূর্বে এদনি একটা দলকে দিয়ে আবার রান্না করতে হয়েছে। খেয়ে দেবে এই সব একটুখানি চোখ বুজেছে—

ফ্যান—ফ্যান দাও—

সুপ্রিয় অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে ওরে দাস! বিদেয় করে দে ওদের—

দিচ্ছি, দাঁড়া—

ঘুম চোখে দাস! রান্নাঘরে ছুটল।

বাবা রে, মেরে ফেলেছে রে! গরম ফ্যান উপর থেকে হাঁড়িসমূহ ঢেলে দিয়েছে মালসার ভিতর নয়, ওদেরই কাণ্ডে মাথায়। কামার চোঁচামোঁচতে খণ্ডপ্রখ্য বাদল। রাগের মাথায় কাণ্ডটা করে দাস! বেকুব হয়ে গেছে। দ্রুত সে নিচে নামে। টা' জেরেলে অনুপমও ছুটল, পিছনে সুপ্রিয়া। কমবয়সী একটা বউ পোড়ার

স্বাস্থ্যোচ্ছল হাসিখুশি বউটির কথা—যামিনীর কথা। গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল, এসেছে নাকি 'ধবদু' আর সেই নতুন বউটি শহরে—আছে কোথাও কোন এক দলের সঙ্গে? বিপাকে পড়ে তিনটি মাস গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামেই ভালবেসেছিল, সেই ছবি সুপ্রিয়ার মনে ভাসে—বাগলা দেশের সর্ব-কালের চেহারা। উঠানে পোয়ালগাদা, একটা বাছুর শূয়ে পড়ে আপন মনে পোয়াল চিবোচ্ছে.....নারিকেল গাছের ফিকে দূর-প্রসারিত সবুজ বিল.....পুকুর একটা—টোকা-শেওলা আর কলমিলতায় ভরা, লাউয়ের মাচা ঢলে গেছে অনেকখানি জল অবধি.....কলাগাছ ও বনকচুর উপর দিয়ে কিশোগাছ লতিয়ে চলেছে—হালদে হালদে ঝিঙে ফল.....খুঁসু ডাকছে এদিকে-সেদিকে, ডাকছে মাছরাঙা ফিঙেপাখী.....পুকুরে মাছের আফাঁল, খোমটোদেওয়া বউরা ঘাটে এসে বাসন মাজছে। নিরুদ্দেশন ঘর-গৃহস্থালী, সুপরি-পাতার বেড়ায় ঘেরা পরিপাটি অস্ত্রপুত্র।



জরালয় ভট্টাট করছে, গলা-কেটে দেওয়া পাখীর মতো। রাস্তার উপর গড়াগড়ি বাচ্ছে।

আর সারা চোঁচাচ্ছিল, এদের দেখে চক্ষুর পলকে সরে পড়ে। হয়তো আরও গরম ফ্যান নিয়ে এসেছে, কিম্বা নতুনতর কোন অস্ত্র। অস্থিরতার অশক্ত এক বড়ো কেবল নড়ে না, 'হায়' 'হায়' করছে আর মাথায় ঘা দিচ্ছে। সুপ্রিয়ার দিকে কি রকম চাইছে! মেরেমান্দ্র দেখে বোধ করি সহানুভূতির প্রত্যাশায় জোড়-হাতে টলতে টলতে তার দিকে এগুতে লাগল। সুপ্রিয়া কিশোর মতো অনুপমের হাত ধরে টান দেয়, এসো, চল এসো। দুয়োরে খিল এটে দিল।

নিশ্চয়.....ভিখারীর দল পালিয়েছে। শূয়ে শূয়ে সুপ্রিয়ার মনে পড়েছে, নিটোল জায়গা নেই।

কমবয়সী একটা বউ পোড়ার জরালয় ছুটিট করছে।

আবার যদি যায় কোনদিন, দেখতে পারে সেই বাঁকাবড়িশ-মাদারভাড়া? সকালে খবরের কাগজে থাকে যুদ্ধের খবর—যেমনার আগুন হোসোচ্ছল কত জনপদ নিশিচয়। হয়ে থাকে। খবরের কাগজে বাঁকাবড়িশ-মাদারভাঙার কথা কেউ লেখে না। এসব বাজে খবর, কাগজে জায়গা নেই।



নও জোয়ার

কথা

একি—জরার জোয়ার এল জীবনে!
দুঃখ অঙ্গের তটে
খরস্রোতে উন্মল
তীরতরু থর থর পবনে।

চোখে চোখে ছলোছল
নিস্তল কালো জল
ফেনায়ে উছাল উঠে
শূন্য চপল কেশগুচ্ছে।
জমাতে সাঁঝের পাড়ি
স্বক-তরঙ্গ পড়ি'
জীর্ণ প্রেমের তরী ডুবছে।
হাল ছেড়ে ভরা গাঙে
ঝাঁপ দিল যৌবন
অতলে তলায়ে গেল
সেই তনু অতুলন,
লবণের বন্যায়
ভাসল লাবণ্য,
গাঁহন ভাঙন-মুখে
ভাংগা রূপগঞ্জ
নিশ্চিন্দা যে আসন্ন।

ফাটা পাড়ে ধরে টান
গাঙে পাখী ছাড়ে খোপ,
কপু-কাপু ভেঙে পড়ে
যাই ফাড় বেনাকাপ,
ভাঙা ডাল ছেঁড়া ফুল
ভেসে যাওয়া স্বত জুল
কোথায় ফিরছে আজ কে জানে,
চোখের সমুখ দিয়ে উজানে!
তপন ডুবছে বায়ে
আবছা গেরুয়া গায়ে,
ডাইনে উঠছে অমাবস্যা,

তেজ কোটালের মুখে
দুঃখারে পড়েছে বৃকে
চৈতি ধরণী নিঃশাস্য।
কলে কলে উঠে ফলে
দুঃসহ এ জোয়ার,
পরান ধরিতে নারে
তনুহারণের ভার,—সাথী গো!
কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
রাঙায় অন্ধকার রাত গো!

উজান জোয়ারি হাওয়া,
হে মম বিহঙ্গমী,
সাধা ত নাই আর
দুঃজনে অতিক্রমি;
ওগো যৌবন সখি,
বুঝেছ কি, বুঝিছ কি?—
দিবসের শূকশারী—
রজনীর চখাচখী?
আসিছে বাঁশীর ডাক—
জীবন উজানি' যাক,
যৌবনী অপরাধ
তুমি ক্ষম' আমি ক্ষম,
অবশ্যম্ভাবীরে
তুমি নম' আমি নম।

হে মম বিহঙ্গমী,
এই নও-জোয়ারে
এমনই বা কোন্ ক্ষতি?
ভেঙে চূরে ধূয়ে যদি
অকলে একল যায় খোয়া রে!

পুরাণো দিনের জন্য অশ্রু
নতুন দিনের জন্য অভিসম্পাত।
হিংস্র দাঁত,
লুপ্ত হাত,
হে অক্লান্ত করাত!
(হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে
পুরুষেরা বলে,
তোমায় প্রণিপাত!
মেয়েদের সহিষ্ণু হাতে
রক্ত শিশুর নৈবেদ্য নিলেন বিধাতা।
পুণ্য সপ্তয়ের সন্মোগ পেলেন দাতা।
গ্রামে মড়ক, নদীতে বন্যা,
ক্ষুধার যজ্ঞাগ্নিতে
অমরহর্য নিলেন
ভিটে, মাটি, তৈজস এবং বন্যা।
নির্লিপ্ত রাজপথ
এক শূন্যতা থেকে
অন্য শূন্যতার দিকে হাত বাড়ায়।
পথের শেষ কোথায়?
নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন,
দূর বনগন্ধের মতো প্রেম,
নিভৃত হৃদের মতো দাম্পত্য!
—তোমাদের হরিস্বৰ্ণ আন্তরণে
পৃথিবীর কতোটুকুই বা ঢাকে?
শব্দ লাখে লাখে
যুবক-যুবতীর শোভাযাত্রা নিশ্চয় হয়।
তারপর
এক ফানুসের জয়,
অন্য ফানুসের পরাজয়।
দূর বনগন্ধের মতো প্রেম,
নিভৃত হৃদের মতো দাম্পত্য!
নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন!
সমস্ত ভূমিকা মুছে
কে আছে?
চিরঞ্জীব কথারা বাঁচে।

• ন্যায়ালয় কোলাহল •

এখন সে কত রাত;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুজরগ হতে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।

পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়িয়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকে।

নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেমসীর মত হতে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয়;
প্রেম নেই—প্রেমবাসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।

কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যানেটিক মাইন, অনন্ত কন্ডুয়;
মানবদের রক্ত সাকো;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।

সূর্য অনেক দিন জ্বলে গেছে মিশরের মত নীলমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুবুখের আকাশে।
তারপর চের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হতে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্ধানী যাত্রীদের মত
জীবনের মানে বার করে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হয়ে আরো চেতনার ব্যাঘাত চলেছে।

মাঝে মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রাণ
হ'ল তাই মানুষের ইতিহাসবিবরণ হৃদয়
নগরে নগরে গ্রামে নিঃপ্রদীপ হয়।

হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবল ভেঙে যায়
সংশ্লিষ্টতার অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পূর্ব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতারা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইস্রাফীর লেন-দেন উল্লারে প্রত্যয়;
এই সব মৃত হাত তপে
নব নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি?—
ভেবে কারু রক্ত স্থির প্রীতি নেই—নেই—
অগণন তাপীসাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিগম নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

—প্রীতীবনানন্দ দাস।

• ভবিষ্যৎ •

মেঘ ভেঙে পড়ে। বলমলে সূর্য ওঠে জ্বলে
প্রাণের আকাশে;
কালের যে রথচক্র অশান্ত ঘর্ষণে তার
শ্মলিগ্ন বাতাসে—
অগ্নি জ্বলে আবজনাশূন্যে; লোভ, নীচতার
অতরালে যে দূর্বৃত্ত ছিল ছন্দবেশে—
বাহিরে এসেছে অবশেষে।
সহস্র প্রাণের দীপ্তি সহস্র সংগ্রামে
সহরে ও গ্রামে
মাড়া আনে স্তম্ভিতহীন একাবশ্য সহস্রের প্রাণে;
শ্মলিত যে বুদ্ধিজীবী
আপন সংস্কারে আত্মহারা—
বন্ধ দীর্ঘ করে তার ক্ষমাহীন দীপ্তির কৃপাণে।

চারিদারে পোড়ামাটি তবু জানি যে ছোঁয়াবে নব স্পর্শমণি
তার সাথে আছে পরিচয়—
দুঃখদৈন্যে দৃষ্টিক্ষেপে তাই দিন গণি
গাই সেই জীবনের জয়।

মৃত্তিকায় রক্ত ঢালি। আরো রক্ত প্রতিপ্রসূত
মৃত্তিকার লাগি;
সম্মুখে দিগন্ততেরখা স্থির; যদিও পথের
অন্ধকারে আজো ফণা রয়েছে উদাত।
প্রতিক্রিয়া পিণ্ড দেশ-দেশে। নব-নব রূপে
সে রিগানী
বিষমাপ তবুও ভড়ায়—
(মৃত্যুজয়ী সৈনিকেরা থেকে হুঁসিয়ার!)
বহু ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী সওদাগর বিষম্ব কেরানী
রাত্রিদিন সে-পাক জড়ায়।

অসমাপ্ত আজো পরিচয়। আকাশে এখনো কিছু মেঘ;
এখনো বাতাস
যেন কার নিরালম্ব বৈরাগ্য নিঃস্বাস—
পৃথিবনে ফোর্টেনি ভো ফুল, পাখীর কুজন
আজো নিরুদ্ধার; হস্তো বা গেছে সব উড়ে
বহু দূরে

যেখানে আকাশ ঘেরা নয় আর বাতাসপূর্ণ মেঘে,
যেখানে মৃত্তিকা

শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকা;

যেখানে প্রাণের স্রোত বয় এক উদ্দাম আবেগে।

এখানে আমার মন কিংবদন্তের রক্তমা-লাঞ্ছিত।

আজো তো তাদের একজন

ছিল যারা অভাজন, যাদের চেতনা

মর্ম্মলে এনেছে প্রেরণা

বন্যাবেগ সংগ্রামের, সংগ্রামজয়ের।

বিচলিত বুদ্ধিজীবী অক্ষম ভ্রুকুটি তুলে ধরে,

অক্ষুত হত্যা তার স্বরে—

কেবলি কাঙাল সূরে আপনার শৈবরাচার সমর্থন করে।

সব কথা সব চণ্ডালতা

কিন্তু ক্রমে চূপ হয়ে আসে;

ক্ষিপ্ৰবেগে তন্দ্রাহীন চল সগ্নী সহস্রের সাথে

যেখানে রাতের শেষে

সূর্য জ্বলে সমুজ্জ্বল নতুন আকাশে॥

—কিরণবন্ধন লেনদেস্ত।

২২শে শ্রাবণ

২৫শে বৈশাখ ছিল
মুখারিত আনন্দ উৎসবে;
উৎসবের নব শংখধ্বনি
দিক্ হতে দিগন্তরে,
ধ্বনি হতে প্রতিধ্বনি বোপে
জীর্ণ ক্রান্তি বিনারিয়া
জীবনের মহানন্দ স্রোতে
এনে দিত তরঙ্গ ভাঙ্গিমা।
প্রভাতের আলো এসে দিত ডাক্
—এল আজ ২৫শে বৈশাখ।
বর্ষ-প্রবেশের ধ্বারে
সন্মুখে হানিয়া করাঘাত
দিনান্তের বিষয়তা, সুদীর্ঘ রাত্রির অবসাদ
মুহুর্তে নিঃশেষ করি'
বার বার এসেছে বৈশাখ
সন্মানিত ২৫শে বৈশাখ।

জীবনের অভিযেদে
নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ দিনে
উৎসারিত আলোর প্লাবনে
উজ্জলিত ২৫শে বৈশাখ।
শরণীরে উচ্চকিয়া
সংগারিয়া জীবন-হিল্লোল,
বার বার দেখা দিল
প্রতীক্ষিত ২৫শে বৈশাখ,
জ্যোতির কনক পদ্মাসনে
যানমণি দেখিনু কবিরে;
বহিঃ-বীণা ঝংকারিল তাঁর
জীবনের প্রথম প্রত্যয়ে—
সে বীণা নীরব হ'ল
মুচ্ছনার উদ্দাম আবেগে

মন্দভাগ্য ২২শে শ্রাবণে॥
এই দিনে, ২২শে শ্রাবণে
আজি সে উৎসব নহে
যে উৎসবে জীবনের গান
আপন নির্মোহ ভেদি' উদার আকাশে
মুক্ত বিহংগম সম ডানা মেলি বিপুল উল্লাসে
ছুটে চলে বাধা-বন্ধ-হারা;
আপনার অন্তর-আবেগে
আপনি সে দুর্দম নির্ভয়,—
আজি সে উৎসব নহে
আলোর প্রসাদ লভিবারে
এ মোদের তপস্যার দিন,
উৎকণ্ঠা-অতিষ্ঠ প্রাণ
সমুৎসুক আলোর ভিখারী
আজি তার তীর্থ-পরিভ্রম।
অতীতের উদয়-শিখরে
তমিস্র রাত্রির পরে
উষার অক্ষট বাণীটরে
যে রাব ফুটাল ধীরে ধীরে
দলে দলে আলোর কমলে;
প্রভাতের প্রথম কুসুম
আঁকি দিল অনুরাগে
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন—
সে রাব ডুবি ধীরে
অস্ত-গিরি যবনিকা পারে;
পশ্চাতে রাখিয়া গেল তার
আনন্দ-রাপিণী বাণী
সন্মুখের শাস্বতী প্রতিমা,
বহিঃ-বীণা ঝংকারের
ঝঞ্জাকুন্ড ভৈরবী রাগিণী
রেখে গেল আকাশে বাতাসে।

তাই মনে মনে ভাবি'
বিগত-বৈভব নহে হতভাগ্য ২২শে শ্রাবণ,
সর্বরিক্ত নহে এ দুর্দিন—
জ্বালার তরঙ্গ আছে—
আছে ছন্দে রুপের আহ্বান
“শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ”—
আর আছে—কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ।
অন্তরের যত বাধা
ক্ষয়-ক্ষতি শোকের আক্রোশ
যতই দুঃসহ হোক' আজি,
আরতির দীপশিখা
হোক' না যতই অনুজ্জ্বল,
দিগন্ত-আবৃত মেঘে মেঘে
সন্ধ্যা-অনুগামী রাব
একদিন নবীন প্রভাতে
এনেছিল যে অনল-শিখা,
বৈশাখের হোমানলে
প্রজ্বলিত যজ্ঞশালাতলে
যে তপস্যা সুরু হ'ল
দুঃসহ বাথার মন্ত্রবলে;
দুঃখের সমিধ লভি'
যে অনল সত্ব শিখায়
একবার উঠিল জ্বলিয়া,
ঝঞ্জার জ্বকুটি-ভাঙ করি অবহেলা
মেঘশ্যাম শ্রাবণের দূরন্ত বর্ষণে তুচ্ছ করি'
সে তপস্যা উদ্যত বাহুরে
মৃত্যুর উৎসব মাঝে
এনে দিলে প্রসন্ন প্রভাত,
রাবহীন জগতের
মেঘচ্ছন্ন ২২শে শ্রাবণে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সজ্ঞান

তপাংকুরে পরিবৃত্ত
জারা-ঘেরা পথের দুধার—
পারে নি কিনারা দিতে;
জীবনের অজস্র বিস্তার
ঠেলে দেয় ক্রমাগত—
সমুদ্রের দিকে;
দিগন্তের সোণা রঙ হয় হোক ফিকে—
রাত্রিশেষে আছে জানি—
নল সর্বোদয়—
পারে ফিরে লুপ্ত গতি স্তিমিত সময়।
আপাতত এই পথ
প্রান্তর-বিলীন:
মনে হয় কত দীর্ঘ
ক্রান্তিকর সীমানা-বিহীন।
থমথমে কালো রাত্রি আকাশের গায়ে—
রেখেছে সযত্নে বৃষ্টি কফিন বিছারে।

নীচে তার ভারী বায়ু—
বারদের গন্ধে ভরপুর—
নির্বিশেষে গেছে মুছে
সমুদ্র সুন্দর;
দূর থেকে বাজে শব্দ মৃত্যুর নৃপদর।
মনে হয় মৃত্যু-নীল বিজগীষু জীবনের সূর।

অন্ধকার মন-স্তম্ভে
কাঁপে তবু স্তিমিত প্রদীপ;
দীর্ঘপথ যেন সরীসৃপ
এঁকে বৈকে চলে গেছে
কত স্তম্ভ প্রান্তর ছাড়িয়ে—
যেখানে আলোকে আছে দুবাহু বাড়িয়ে—
জীবনের ছন্দ সমুদ্র—
সেই মৃত্যু-তীর্ণ দেশ আর কতদূর?

গোপাল ভৌমিক

একটুকু

সম্পাদক দাস

বদন সম্পাদকের প্রতি—

কেন ডাকছ আবার হেথা ভাঙা যে আসর,
চুলের গোড়ায় ত্বের ধরল যে পাক—
বল মন্দিরে কে বাজায় ভগ্ন কাসির,
শিখে অনেক ঠেকেই তবে আছি নির্বাক।
জানি লিখেছি একদা আমি 'কেডস'-স্যাণ্ডাল,
নব "কুমার-অসম্ভব" "চল্‌তি ছাঁদে"—
হ'ল প্রশংসা কিছ, আর বহু স্কাণ্ডাল,
ফের চাইনে সেই পুরানো ফাদে।
ফাঁকা ইয়াকি নয় আর, তবুও যখন
ডাক দিয়েছ—যদিও জানি এ ডাক চরম—
নারি অভাবে অবহেলা করতে তখন,
জানি হবে না ঘৃণা-চানা গরমাগরম।
সব দেখিয়া শুনিয়া মন যায় যে দমে,
চাই যেদিকে সেদিকে হেরি মৃত্যু-আধার—
যেন দূর্ভাগা জাতটাই থামবে সমে
পথ শ্মশান হবেই হবে ডাহিন-বাঁ ধার।
হেথা পাবক অগ্নি শূন্য গেছেন নিভে,
শব পড়িয়া রয়েছে সারি—জ্বল না চিতা;
ছেড়ে গেছেন মোদের হায়, শ্মশান-শিবে,
হবে রচনা করতে নব-মৃত্যু-গীতা।
সেটা সম্ভব নয়, জানি প্রেস-অফিসার,
হ'লে একটু বেচাল লেখে গোপন-লিপি,
হেথা স্বামী কঙ্কাল-কোলে নাচ বেহুলার,
ভরা বোতলের অঝো মারে সোলার ছিপি!
তবে নিষ্কৃতি পেতে পারো মাতাল হ'লে,
মদে আপনাকে ভুলে থাকো হাত-পা ছুঁড়ে—
সুখে বেহুস হইয়া থাকো মাটির কোলে,
পরে শেয়াল-কুকুরে খাবে কবর খুঁড়ে।
দে'তো হাসির আড়ালে যদি কান্না ফোটে,
দাদা, সে নয় কাহারা দোষ, মোরা দুর্বল—
হাসি দেখতে ঋষিরা পায় মড়ার ঠোঁটে,
মোরা চাঁপিয়া রাখতে নারি চক্ষুর জল।
তাই অনেক ভাবিয়া স্থির করেছি বিশেষ,
এই শ্মশানেই দেখবে যে সিনেমা-ছবি;
বিষ খাবার আগেই নারী বাঁধেও তো কেশ,
শুয়ে ফুলশয্যায় সংঘে মরেও কবি!
মোর পুরা মনে পরদা জুড়ে গল্প জাগে,
ক'হিনী নহে তা, যেন স্বপ্নে পাওয়া,
পূরা একটুকু কথা, ছোঁওয়া একটু লাগে—
চায় অপূর্ণতাই এই যুগের হাওয়া।

(এক)

রাজার দুলাল বাঁধতে পরেনি ঘর,
বাঁধিতে পারেনি রাজপুত্রী তারে অজো;
মনে মনে সে যে খুঁজিছে তেপান্তর,
শুন্যে ছুটিছে ঘোড়া সে পক্ষীরাজ্যে।
অন্ত-পূরেতে বহু দুঃখসানো শেজে
ব'সে আছে ঠায় চরণে আলতা মেজে
দেউড়িতে ঘড়ি প্রহরে প্রহরে বেজে
ঘোষণা করিছে কেন বৃথা হায় সাজো—
রাজার দুলাল এখনো রয়েছে পর,
ঘরের মায়ায় বাঁধা পড়ে নাই অজো।

রাজার দুলাল, ঠিক মনে নাই তার
বাঁগজো গিয়ে, হ'ল সে অনেক দিন,
সাত সমুদ্র তেরটি নদীর পার
বলি সুমাত্রা হয়তো বা মহাচীন—
পথে যেতে যেতে সহসা পড়িল চোখে
সম্মা তখনো ঢাকে নাই দিবালোকে
মেঘের মতন থম্‌থম্‌ করে ও কে
আঁখি দুটি তার কোন দিগন্তে লীন!
দিশ্বজয়ীর অকারণ মনভার
কোথা সে সন্দেরে, কে জানে সে কতদিন!

হ'ল পরিচয়, প্রান্তর নদীতটে
এসেছিল নেমে পাহাড়-দেশের মেয়ে,
মনের কথা সে কহে নাই অকপটে
ছোট আঁখি দুটি শূন্য দেখেছিল চেয়ে।
নদীতরণে ছায়া ভেঙে ভেঙে যায়
দুর্জনীর মন ভারী-ভারী বেদনায়
এপারে-ওপারে নিশীথ আঁধার ছায়
পাহাড়ের মেয়ে আনমনে ওঠে গেয়ে।
রঙের বিলাস জাগিতে আকাশ-পটে
লাজে নত-আঁখি পাহাড় দেশের মেয়ে।

দিন কেটে যায়, নেশা ধরে যায় মনে,
রাজপুত্রের পুড়ে ছাই হ'ল পাখা
মুগ্ধ স্বপন ঘনায় নয়ন-কোণে
দূর পথখানি ক্ষণিক মায়ায় ঢাকা।
বনের হরিণ দিতে নাহি দিতে ধরা
বুড় কম্পনে কাঁপল বসুন্ধরা
বাঁধা হতে হতে খসে গেল গটিছড়া
সচল হইল অচল রথের ঢাকা।
বনের হরিণী ছুটে চলে গেল বনে
পাখা-পোড়া পাখি পুন ঝাপটিল পাখা।

নয়নের ক্ষুধা বৃকে রয়ে গেল জমা
কতু আঁখিপথে বিগলিত কামনায়।
ক্ষণপরিচিতা হ'ল চিরপ্রিয়তমা
অধরা—স্বপনে ধরা দিয়ে দিয়ে যায়।
পাহাড়ের শিরে মেঘেরা জমিল আসি
কবে যে ঋষিবে প্রান্তরে ভালবাসি
নিবিড় আধারে হাসিবে পৌর্ণমাসী
তাহারই পূলকে অমাবাসী মূরছায়।
দেহে পলাতকা মনে হ'ল মনোরমা
মন ফিরে ফিরে কাঁদে দেহ-কামনায়।

এমনি করিয়া মাস মাস হ'ল পার
রাজার দুলাল বসিল রাজ্যপাটে,

হাওড়া

মোটর এ্যাকসেসরীজ্
এজেন্সী লিমিটেড
ঘোষণা করিতেছেন
যে,



জে নু ই ন ফোর্ড ও
মার্করী পার্টগুলির
জন্য

তাহারা ভারত সরকার কর্তৃক
রেজিষ্টার্ড ডিলার নিযুক্ত
হইয়াছেন

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ফোর্ড
ও মার্করী স্পেয়ার
পার্টস্ বিক্রয়ার্থ মগ্ন
আছে

তা, ম্যাসা লেন,
পোঃ বক্স ৩৪৩
কলকাতা।

টেলী } ফোন : ক্যাল ২৯০, ২১৯৯
গ্রাম : কটোমেন্ট

শাখাসমূহ :

শেটারস্ :- ১, চাঁদমারি রোড
ওয়ার্কস্ :- ৬, ডবসন্ রোড
(হাওড়া)

এ্যাস্বেষ্টস্ • সিমেন্ট • হাড ওয়ের

সীট ও পাইপ

দেশী ও বিলাতী

স্যানিটারী ও

মিউনিসিপ্যালিটির আবশ্যকীয়

এজেন্টস্
কনকিস্ট
ইমপোর্টারস্

ইঞ্জিনিয়ার্স
কন্ট্রাক্টরস্
ম্যানুফেকচারার্স

বুহের এণ্ড কোং

সাকরাইস্ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্
৬ ও ৭নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।



একটি
দামাস্কা
প্রসাধনী
ট্যাল্কম্ বাথ পাউডার



এমন মধুর! দামাস্কা ট্যাল্কম্ পাউডারের সুগন্ধ
আপনার দেহে ছিরে একটি স্বপ্নের পরিবেশ
সৃষ্টি করবে। রানের পর মেখে দেখুন
সারাদিন কেমন সজীব ও শীতল থাকবেন।
প্রস্তুতকারক

দাঁ কেমিক্যাল
ও হার্কন্স

১৫৫, আদার টিংপু রোড, কলিকাতা

অলস দু'পায়ে শব্দে স্মৃতিটুকু সার
হাজারো কাজেতে এ-বেলা ও-বেলা কাটে।
মেদুর মেঘেতে আকাশ পড়িল ঢাকা
পালঙ্কে শুয়ে মনে হয় ফাঁকা-ফাঁকা
দেখে দিগন্তে পথ চল গেছে বাঁকা—
কলসককে বধূরা চলেছে ঘাটে—
কেটে যায় নেশা মন করে হাহাকার,
বেলা গেছে বয়ে সূর্য নেমেছে পাটে।

(দুই)

দেখা কি হয়েছে তাহার পর?
অনেক ব্যাপারে অনেক বর—
গৃহহীনা করে কাহার ঘর,
জলে ভেসে যায় নয়ন তার।
দেখা হলে মৃদু হাসিয়া বয়,
শরীর তেমার ভাল তো নয়!
মনে মনে ব'লি, হায় কপাল,
এমান কাটিবে চিরটা কাল!

নিজে মুখ ফুটে বলে না কিছু,
মন বলে, মোরে কর আপন—
চোখোচোখি—করে নন নীচু
কামনাজড়িত নিশি যাপন।
অনেক কামনা হায় রে মুক,
বুক ফেটে য় ফেটে না মুখ।
সময় শব্দই বহিয়া যাত—
গাছের কুসুম ধুলিরে চায়।

বহুরে বহুরে পাহাড়-দেশে
শীত জমে যায় কলসর
ছলছল জল গগা শেষে
রচে বাধান পরস্পর।
বহুরে বহুরে একটি বার
নামাতে নামাতে মনের ভার
বড় বড়দিন তাও ফুরায়
বলি বলি বলা হয় না হায়!

একটুকু ছোঁওয়া কথা খানিক
মধুর হয় যে মধুরতর
বিরহের তাপে হয় মানিক
যা ছিল একদা শব্দ পাথর।
চিঠির কাগজে পড়ে না দাগ
এ হেলি-খেলার ওড়ে না ফাগ
দেহখপ শব্দে পড়িয়া যায়
আপনি পড়িয়া বাস বিলায়।

(তিন)

স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় সদ্য
পদা জমিয়া হয় গদ্য
দেহে ধীরে নেমে এলে ক্রান্তি
তখন মনেহো হয় শ্রান্তি।
নারী নহি জনে আল পক্ষা
সীবন করিয়া ছেঁড়া কক্ষা
তাহারই মাঝারে খোঁজে মুক্তি।
পূরুষের দেহ খোঁজে ভুক্তি
বিহ্বল হয়ে আসে দৃষ্টি,

বিধাতার অপরাধ সৃষ্টি
ছড়ানো রয়েছে সারা বিশ্ব
আঁখি মজে নবতর দৃশ্যে
আঁখি হতে মন নহে ভিন্ন
দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ছিন্ন।

(চার)

রাজার পুত্র পাহাড়ী মেয়ের লেখে লিখন
স্থল হয় তাই একদিন যাহা ছিল চিহ্ন।
পাহাড়ের দেশে এসেছিল মেঘ বোরালা হয়ে
ছায়াবিবর্ণ পাহাড়ীকণা খবর বয়ে
ছুটে চলেছিল নৃত্যচপল উপল ঠেলে
মেঘ-সংবাদ দিবর সঙ্গী যদি বা মেলে।
এমন সময় প্রান্তর হতে বার্থী এসে
পাহাড়ী মেয়ের মন নিয়ে গেল নিরুদ্দেশে
প্রহরে প্রহরে দেয়ালের খাঁড় চলিল খেঁজে
একই লিপিরানি বারবার করি পড়িল সে যে—

(পাঁচ)

“এ কি আলসা, এ কি ভুল, এ কি ভয়?
পথিক দুজন পাশাপাশি চল চোখের ভাষায় কি জানি কি বলে
মুখের ভাষায় কেহ মানিবে না কাণে কছে পরাজয়!
আকাশে সূর্য জ্বলে আর নেভে, কতখানি দেব কতখানি নেবে,
দেওয়া ও নেওয়ার জানাইতে দাবী হয়স যাড়িয়া যায়—
চাঁদে ও চক্রেতে এ চিরবিরহ জোৎস্নার দরিয়ায়।

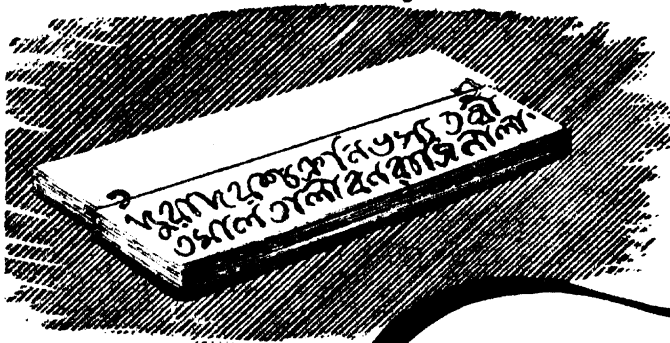
হয় সখি, হায়, ভাল ভুনাংশই,
মতটুকু আসে বাহুরাশনে সূর্যমুখের হিসাবে তা গণে
চোখ মেলে দেখ, ফেলে রেখে দাও প্রেমের পাঠ্য বই!
প্রেমের সত্য যা আমার কাছে—তুমি ভেঙে যাব পড়িল সে ছাঁচে
তোমার সত্য তোমাতাই আছ দেহের সীমানা ঘিরে
সিঁধুর ডেউ গণনা করো না জীবন-হটিনীতীরে।

সম্মান কর শঙ্কিত বাসনায়—
তোমার জগৎ নয়ন তোমার তার খেলি তাহা কিছু নহে আর
সেই স্বাদ তব ধরা পড়ে যাহা তোমারি ও রসনার
গাণ্ডুষে করে সমস্ত পান সেই সমুদ্রে মূনি ভেসে বাস
তোমার চিত্ত তীর্থক্ষেত্র লভে যদি গোপপদে
ততৈই ফোটায়ে সংগত সখি, তব মন-কোকনজে।

‘বৃহৎ বিরাট কঠিন এ আয়োজন’—
মনে মনে যদি ভেবে থাক তাই অতৃপ্ত রবে ছোট্ট ক্ষুধাটাই
আসিয়া আসিয়া ফিরে ফিরে যাবে অনেক শূভক্ষণ।
সব ছেড়েছিল তাই তো রাখিলা রাসিকজনের চিরপ্রাণাধিকা
তুমি কি ভেবেছ জানিত না রাখা কক্ষের ইতিহাস—
ফসি যদি তুমি খুলিতেই চাও নির্ভয়ে পর ফাসি।”

(ছয়)

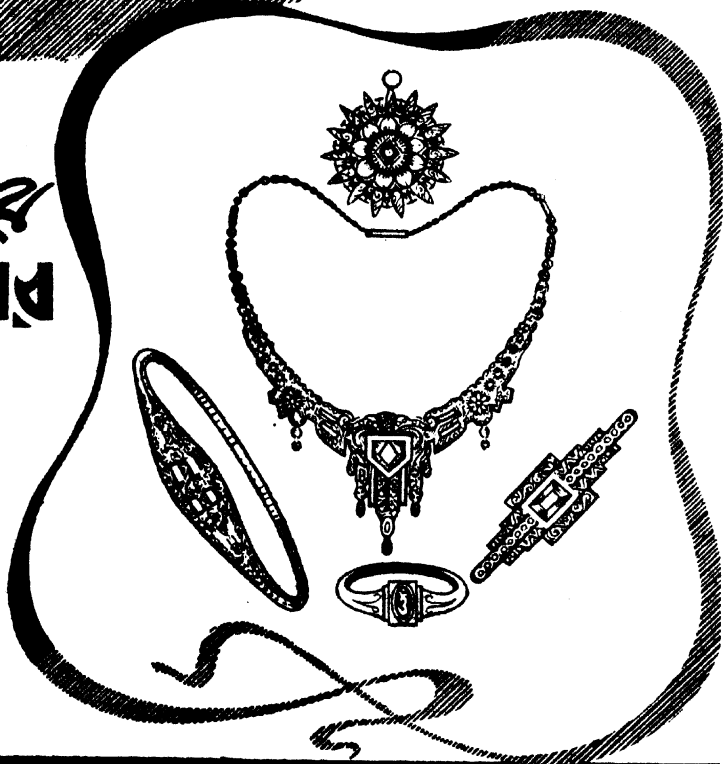
পাহাড়ী মেয়ের চোখে ছলছল করে জল স্নান হাসি খেলে তার ওষ্ঠে,
বলে, হে অহংকারী, উজ্জ্বল দীপ শত জানো থাকে একই প্রকোপে
শিখা-বন্ধনে শব্দ; সে সীমা হইলে পার একই দীপ আনে মহাধ্বংস।
তুমি দেখিয়াছ সেই সূক্ষ্মবন্দ দীপশিখা, দেখেছ কেবলি অপ-প্রশং।
লক্ষ্যনি পূর্বে তুমি, শব্দ, কথা কণা পেয়ে পূর্ণ জয়ের কর গর্ব
জাতি-ব এ তুল তব শব্দ সেই বিশ্বাসে আমি যাপি এ বিরহ-পর্ব।
কাঁটল মনের প্লানি সবতনে লিপিরানি তুল রেখে নিল হাতবাক্সে,
পুন বলে মনে মনে, আমার মনের বাধা গোপনেই মোর বুকে থাকে সে।
তুমি ভাব অভিমান, করি না কিছুই দাবী—অভিমানী নয় তাহা সজ,
হে অধীর, তুমি শব্দ ঘটনা দেখেছ চোখে জানো না, কি পিছে তার তথ্য!



উপস্থাপনা
কালিদাস

সলফার
এস, সরকার

ইহা অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত
যে এই প্রেস্ট ও "নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান" এর কাজ সত্যই
অতুলনীয়।



এস, সরকার ও কোং
সম্প্রদায়িক চাহিদা, জুয়েলাস
১২৫, বহু বাজার ট্রাফে, কলিকাতা

যদি মন একবার পেঁচে লক্ষ্য তার দেখে না তো কোথা সেই লক্ষ্য—
হস্ত ধিক্বরে টেলে না মোদের মন করিলেও গুরুগব্ব বক্ষ।
তোমরা বৃত্তিতে নারো সহজ নিভরতা, অবহেলা ভেবে হও ক্রুদ্ধ—
তোমারে সে অবকাশ দিলাম বশু আজ, মন থাকে বৃকে অবরুদ্ধ।

(শান্ত)

জবাব না পেয়ে রাজকুমার
চেনা-অচেনার করে সন্মার
আগে দর্শন, পরে চুমার
ধুম লেগে যায় চমৎকার,
কাঙালী যদি বা শিকারী হয়
লোভে ফ্রোপ পায় তাহার ভয়
সেও করে ধীরে সর্বজয়
অসি বন্বন্ব বনবকার
বীর সুখ্যাতি রটিয়া যায়
ঘটিত না যাহা ঘটয়া যায়
পাহাড়ী মেয়ে কি চটিয়া যায়?
উদ্দেশে তার লেখে কুমার—

(আট)

“কাহারে দিয়েছি মন?
কৃষ্ণচূড়ার শোণিত-শোভায় মধুপ-গুঞ্জরগ
শূনি বসন্তে, বর্ষায় স্নাত কেতকী কটিার বনে
সেই মৌমাছি গুঞ্জন করে শূনিয়াছি মনে মনে।
কৃষ্ণচূড়ার রক্তপরশ শূত্র কেয়ার গায়
লাগিলে কেয়া কি শিহরিয়া উঠে অভিমান বেদনার?
প্রকৃতি আপন খোয়ালেই চলে নাহিক বলহ যত্নী শতনলে
মৌমাছি করে মধু সমুদ্র—নিদিত ফলবন
চলে না বিবাদ অরণ্যপথে কথার প্রলপ অভিমান-ক্ষতে
বলিবে কি তুমি ফুলদের শূদ্র শোভা আছে নাই মন?

আমি কি করছি ভুল,
এই সংসার করিয়া তুলেছি অরণ্য সমুদ্র।
হাল্কা পাখায় উড়িয়া বেড়াই বাতাস করিয়া ভর
ফুলের বৃকেতে বসি ততদিন যতদিন সমাদর
যেখানে যেটুকু মনে মনে পাই সংগ্রহ করে আমি
জানি একদিন মরিবে হুমর শ্বাবরে ফুলেরা জানি
দল বেধে এসে বসি মৌচাক গজেনহীন মাছি থাকে কাঁকে
শত্রু কোথায়, সন্ডয়ে চাহিয়া উদাত করি হুল
পুষ্পের স্মৃতি বিস্মৃতি-পথে মিলাইয়া যায় মধুপ-জগতে
না হয় গেলই, মানিব না তবু আমি করিয়াছি ভুল।”

(নয়)

গিরি আর প্রান্তরে
সন্ধ্যার বহু আগে
প্রান্তর-নিন্দায়
পার্বত্যী নেমে আসে
গম্ভীর ধারে সেই
তারি ধার খেঁবে এল
কুশল পুছিতে গিয়ে
গাল বেহরে করে করে
কলে, আমি এসেছি যে
কবি বলে, শোনো শোনো,
নির্জন সন্ধ্যায়
কবিভার সুরে সুরে
ব্যবধান বেড়ে যায়
নেমে আসে আদিয়ার
সারা পর্বত ছায়
বৃক্ষে নিতে আধিকার।
পুরাতন তরুতল
বর্ষ ব জলধার
নরনের নোনা জল
কাটাল কি মনভার?
আছে আজো প্রয়োজন?
কাবা সে পড়ে যায়—
কেটে যায় শূন্যখন?
মন তারো ভরে যায়—

(দশ)

“বহুরে যা এক করে আমি সেই বাখিত সাগর
বিস্তীর্ণ বিক্ষিপ্ত কি না চাঁদ শূন্য জানে ইতিহাস—
যে বা বলে মেনে নেব দৃষ্টির লম্পট নাগর
হে তটিনী ভিন্নমুখী করও না তব জলোচ্ছ্বাস।
সবারে সমান প্রেমে বাহু মেলে বৃকেতে জড়াই
সমান গজনি করি বৃকে বৃকে সর্বমোহনায়
সামান্য বিনয় ঘাট, নহে স্বর্ধ, মিথ্যা এ বড়াই
বহুতে মিলিত আমি কাঁদি না ততো অনশোচনায়।
দক্ষিণ-সাগর কড়, কড় হিম উত্তর-সাগর
স্পন্দনহীন জলরাশি জড়তায় স্তম্ভ হয়ে যায়
সে স্তম্ভতা গলে যাবে মেল তব ও আমি ডাগর
উধ্বাহু তরঙ্গরা তটে লেগে হবে ফেনময়।”

(এগার)

কথা কহিল না পাহাড়ী মেয়ে
মদু মদু, সুরে গাহিল গান
আধার নামিল অকাশ ছেয়ে
বাতাসে ভাসিতে লাগিল তান—
“একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শূনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মন ফাল্গুনী।”

(বারো)

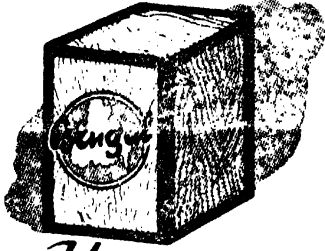
রাজপুত্রের ভায়ারি হইতে—

“গভীর প্রেমের কোনো পরিচয় পাইনি খাঁজিয়া মুখে ও চোখে
ভয় হয় বৃষ্টি ছিল না কখনো, হয়নি কখনো হবে না কড়।
নরনে পাই না খটনে খাঁজি
বাহির করি যে স্মৃতির পুঁজি
কখনো ভাবি যে ঠাকুরা গিয়াছি কখনো ভেবেছি ভালই হ'ল—
রজনী দুপুরে ওরে মশায়ির তলপি-তলপা যা আছে তোল।
বোকার মতন চেয়ে বসে থাকি হঠাৎ দেখি কি নেশার ঝোঁকে,
বৃষ্টি তুমি নও আর কেউ হবে, আমি ভাল জানি তুমিই তবু।

প্রেমে বলমান উজল বাসে
লোভ জাগে মনে টানিতে পাশে
চাঁকতে আবার সাবধানতায় নিঃজরে ভুলিয়া আমারে তোলা।
মন কম আজো নামনি সন্ধ্যা, প্রকাশ্য বল, তলপি তোলা।
আকাশ জুড়িয়া আলো-উৎসব, জাগো জাগো পাখি, আলোকে জাগো,
নিখর রজনী অস্থিরপদে বিদায় নিয়েছে জানো না তরু?
পুরাতন দিন আসে না ফিরে
নতন জন্ম নয়ন-নীরে
নিমেষ সমান কেটেছে কখন জীবন-সায়রে বছর বোলো—
আজ কালগতি মথুর হবে? মিছে সে হাঁকিছে তলপি তোলা।

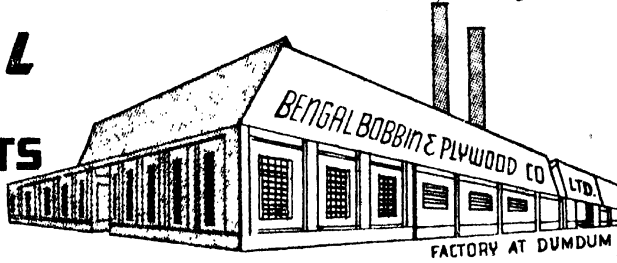
বৃকে জড়তে চাহিছ যখন, হে ভাঁব, তখন বিদার মাগো!
আবাহন পুরা না হইতে দেবী, যজ্ঞশেবের মন্ত শ্বাহা?
মানুষের মন দেবতা জানে
শূন্য কথা হার, কি তার মানে?
বাসর-শরনে সাপের কামড়ে বেহুলায় শ্বাহী বৃষ্টি কি মাল?
শুকুনো হাড়ই গজাল-মাসে—মৃত্যুর বলি তলপি তোলা।
রাত কেটে গিয়ে ভোর হ'ল পূন, গুণো বিহঙ্গ নয়ন খোলা,
ওই হের পথে ছেঁড়া মেঘ হস্ত আলোর নেশায় রঙীন হ'ল।
মিশাহীন আশা পাখায় তব
মেরিকে তাকাও অসীম নভ
নীড়ের অরয়ে রহিল বাহারা নীড়ের আধারে স্তরাই হ'ল
ভোমার আঁখিতে জীবনের ডারা—প্রেরণী, সুখের স্পর্শি তোলা।”

ঘেঁতী শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি নন্দন !



Use
BENGAL
BRAND
TEA CHESTS
BENGAL
PLYWOOD

আধুনিক কলকজার সাহায্যে
নিজস্ব ক্যান্টরীতে প্লাইউড
বোর্ড ও চায়ের বাক্স প্রস্তুত
করিবার একমাত্র ভারতীয়
যৌথ প্রতিষ্ঠান।



UPCO

বেঙ্গল বব্বিন এন্ড প্লাইউড কোং লিঃ

ম্যানেজিং : এজেন্ট : মন্ড্রোষ চাটাজিঃ এন্ড কোং : ৪৪-৪৬ ক্যানিং স্ট্রীট কলিকাতা :

“বড় সাততির” একটি

ভারত ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ (১৮৯৬)

হেড অফিস :- লাহোর

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ জে সি জৈন, এম এ

এই কোম্পানীতে শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে।
সতর্কিত অতীত লোভনীয়।

১৯৪৩ সালে নূতন কাজ	...	২,১৫,০০,০০০ টাকার উপর
১৯৪২ সাল পর্যন্ত মিটান দাবীর পরিমাণ	...	২,৬৭,৭৮,০০০ টাকার উপর

বিশেষ বৈশিষ্ট্য :-

জয়েন্ট লাইফ স্কীম, এডুকেশন এন্ড ইটি, ম্যারেজ এনডাউমেন্ট, ইমিডিয়েট, এন্ড ইটিস্, চিলড্রেন এনডাউমেন্ট ও ফ্যামিলি পেন্সন স্কীম ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য লিখুন :-

কলিকাতার রাণ্ড ম্যানেজার,

মিঃ জে এন সেনগুপ্ত, বি এ, বি-কম্ (এডিন), ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।

বা নিম্নলিখিত যে কোন রাণ্ড অফিসে :-

ঢাকা, জলপাইগুড়ি, পাটনা।

আগমনীর আগমনে—

নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :
৬, মাদ্রাসা লেন
কলিকাতা।

আপনারদের
সম্প্রদায়
অভিবাদন
জানাইতেছে।

General Manager:
L. M. Ghosal
Managing Director
MR. H. M. GHOSE,
B.Sc. (Chicago), F.R.E.S.
(London)

অজস্র অফুরন্ত মনোরম সামগ্রী “ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল” প্রসাধনসামগ্রী

ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল—প্রকৃতিজাত খাঁটি তৈলানি দ্বারা প্রস্তুত, সমান একটু মাখিলেই চুল পরিপাটি হয়, মাথার খুলি পরিষ্কার ও সুস্থ থাকে, মরামাস হয় না। ৪ আঃ শিশি—১১০ টাকা।
ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল—মাথায় সমান একটু মাখিলেই চুল নরম হয় ও চুলের জেলা বাড়ি। ল্যাভেন্ডার গন্ধযুক্ত। টিনে ১১০ আনা ও বোতলে ১৫ আনা।

আসুন !

দেখুন !

“ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল” প্রিয় সামগ্রীগুলির বিরাট আয়োজন

প্রিমিয়ার হেয়ার ডাই—সাদা, ধূসর বা লাল চুল, এই ডাই ব্যবহারে চকচকে বাদামী বা কাল রংয়ের হয়। ইহাতে ঘূকের বা চুলের কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। মনোরমগন্ধযুক্ত। ৪ আঃ—১৫০ আনা।
আমেরিকান বে রুম—ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল বিশেষভাবে প্রস্তুত। একটি চমৎকার অপরিহার্য প্রসাধন সামগ্রী—৪ আঃ শিশি ১১০ টাকা।
সেটিং লোশন—চুল কৌড়াইবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। এই সেটিং লোশন বেশ করিয়া সর্বত্র সমান করিয়া চুলে লাগাইয়া দিন, তারপর আংগলে, চিরুণী বা কার্পার দ্বারা ইচ্ছামত কৌড়াইতে পারিবেন। ৪ আঃ শিশি ১১০ টাকা।
স্ট্রোনারোয়া—সম্পূর্ণ নিরোধ, বিস্তী ঘাম নিরোধ করার জন্য প্রত্যহ ব্যবহার্য। স্মিট গন্ধ। ৪ আঃ শিশি—১১০ আনা।

আফটার শেভ লোশন—কামাইবার পর এই লোশন মাখিলে ঘূকের সর্বপ্রকার ময়লা দূর হয়। উহাকে পরিষ্কার, মসৃণ ও কোমল করে। ৪ আঃ শিশি ২ টাকা।
লিকুইড ক্রিমেট—অতি মনোরম মসৃণ মধুর গন্ধ; চুলকে পরিপাটি করে এবং উহা নরম ও চকচকে হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। ৪ আঃ শিশি ১১০ টাকা।

আপনি কি জানেন

কোমড ক্রীম—যেকোনো সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে, কেবল ঘূকের উপরিভাগ নহে, লোম-কপগুলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহা-দিগকেও পরিষ্কার করে। রঙে মাখিয়া শয়ন করিলে তন্তুসমূহ সজীব হয়। সুমধুর গন্ধযুক্ত এবং সামান্য একটুতেই বেশ কাজ হয়। মূল্য—১০ টাকা।
ট্যালকম পাউডার—সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে, নিজস্ব সৌরভের জন্য সমাহিত বায়ুর মত হালকা, স্নানের পর ব্যবহারে বিশেষ আরামপ্রদ। প্রতি টিন—১/০ আনা।

ডের্মাটিক্স—চমৎকার আরামদায়ক, দাঁত পরিষ্কার করে, মুক্তার মত স্বচ্ছকর সাদা হয়, সুস্থ ও সুন্দর অবস্থায় রাখে। টিনে—১১০ আনা, স্মিট—১০ আনা।
পিউরিফাইড ককোনাইট অয়েল—স্বাস্থ্য, অত্যন্ত দারিদ্র্য তৈল, সামান্য পরিমাণ মাখিলেই চুল বড় এবং চকচকে ও নরম হয়। ৪ আঃ শিশি ১৫০ আনা।

এন্টিফেজ টোনিক—যেকোনো লাবণ্য বৃদ্ধি করে, মাংসপেশী ও তন্তুসমূহকে সজীব করে, ব্যবহারে মস্তিষ্ক স্মৃতিশক্তি ও কৃপণ-বৈশিষ্ট্য হইবে। ৪ আঃ শিশি ২ টাকা।

লিকুইড সোপ—এই পচন-নিরোধক লিকুইড সোপে শতকরা ২৫ ভাগ কেসোল আছে, মশার কামড়, ঘামাচী ও চুলকানি ইত্যাদি দূর করিতে অকার্য। ৪ আঃ শিশি—১১০ আনা।

“ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল” মার্কা রূপ-প্রসাধনগুলি একমাত্র ঘূকের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্যই প্রস্তুত।

ড্যানিং ক্রীম—দিনে ব্যবহার্য, লোমকপ বৃদ্ধি করে না, যেকোনো কোমল থাকে, সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং উত্তর উপর পাউডার মাখিলে, সারাদিন নিবৃত্ত থাকে। মূল্য ২ টাকা।

ফেস্—পাউডার—সারাদিন নিবৃত্ত অবস্থায় থাকে, লোমকপ বৃদ্ধি করে না, আপনার পছন্দমত যে কোন রঙের পাইবেন, বহু ঘণ্টা টিউকা মনোরম গন্ধে ভরপুর রাখে। সাত রঙের পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি বাক্স ৫ টাকা।

স্মিথস শ্যাম্পু

আপনার মৃৎস্ত্রীর সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কেশের সৌন্দর্য্যও তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নহে। এজন্য ঠিক ঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত, শ্মিথের শ্যাম্পু এ সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী, উহা মাখিলে চুলের জেলা বাড়ি ও রেশমের মত হয়।

ওল্ড ইংলিশ ল্যাভেন্ডার—অত্যন্ত উজ্জ্বল জিনিস তৈরি। ল্যাভেন্ডার স্কাওয়ার—ছোট ৫০০ আনা, মাঝারি—১১০ ও বড় ৪ টাকা।

ইউ-ডি-কোলোন—অতীব আরামপ্রদ, ক্রান্তি-নাশক। ছোট—৫০০ আনা, মাঝারি—১১০; বড়—৩৫০ আনা।

হোয়াইট-এণ্ডয়েজ

কলিকাতা

ফোন—ক্যাল ৬২০৪

গাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত ১৮৯৫)

হেড অফিস- -
৪৭নং মল, লাহোর।

কলিকাতা অফিস :
১৩৫।১৩৬, ক্যানিং স্ট্রীট,
৯নং লিঙ্ডসে স্ট্রীট (নিউ মার্কেট)

কার্য্যকরী মূলধন- -
৩৬ কোটি
টাকার উপর

ভারতবর্ষে সর্বত্র ১৩৯টি শাখা
এবং লন্ডন ও নিউইয়র্কে
এজেন্সী আছে।

কর্মে বিনিয়োগই মানদ্ব ও অর্থ
উভয়েরই পূর্ণ সাধকতা।

উত্তম সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ
করা হয়। চলতি হিসাব, সেভিংস
ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদির
সুদের হার লিখিয়া স্থির করিতে হয়।

এই ব্যাঙ্কের বহু শাখা থাকার
দরূণ বিলের টাকা অতি
সহজে আদায় করাই ইহার
বৈশিষ্ট্য।

মোহরাজ,
জেনারেল ম্যানেজার।

এস. কে. পাণ্ডিত্য,
ম্যানেজার,
ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী পয়সা



যুদ্ধের সময় যে নূতন পয়সা বেরিয়েছে, তাতে পরসার দাম কমেনি।
কিন্তু ওতে যে তামা বাঁচছে—যুদ্ধের যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে তাতে কম
সুবিধে হয়নি। আজকের দুদিনে সাধারণ লোকের পক্ষে খরচ বাঁচান
খুবই কঠিন; তবুও একটী করে পয়সাও যদি বাঁচাতে পারি, তাহলে
সেই সঞ্চয় যুদ্ধোত্তর কালের চরম দুদিনে কম সম্পদ নয়।

ইষ্ট বেঙ্গল

মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২০/১ লালবাজার স্ট্রাট, কলিকাতা।
আপনার টাকা রাখবার একটী নিউরমোণ্ড প্রতিষ্ঠান

(COMARTS-1)

1. INCORPORATION 16. 8. 32
2. CHANGE OF NAME 16. 12. 38
3. SANCTION OF INCREASE OF CAPITAL 18. 12. 37
4. CHANGE FROM PRIVATE TO PUBLIC LIMITED CO. 14. 2. 42
5. DECLARATION AS SCHEDULED BANK 4. 4. 44

**FOOT PRINTS
ON
THE SANDS OF
TIME**

THE HOOGHLY BANK LTD

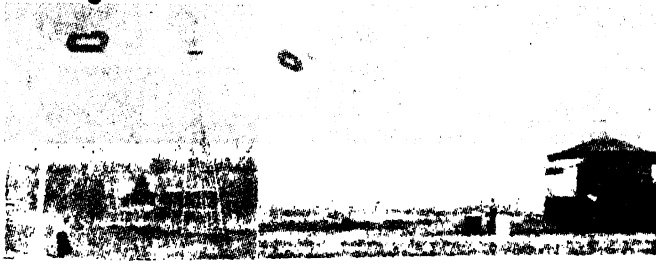
বিজ্ঞানীর মেঘদূত

আনন্দিহারী ঘোষ

“আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে” কবি কালিদাস যদুত কাব্যের অবতারণা করেছিলেন, রূপ কথিত আছে। আষাঢ়ের বহাওয়া প্রত্যেক নরনারীর মনে যে দূহিত ও আবেশের সৃষ্টি করে—তারই ছবি রহী যক্ষের মেঘদূত সম্ভাবনের মধ্যে দিয়ে নি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু এ ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ড ও উত্তরমেঘের গতি কোন পথে হবে, মণির পর্বত থেকে ঐ মেঘের গন্তব্যপথে

কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। চন্দ্রের চারদিকে যখন “দেবতাদের সভা বসে”, পাখীরা যখন নীচু হয়ে উড়ে, ঈশান কোণে যখন কালো মেঘ দেখা যায়, বাদল-পোকা যখন বোড়িয়ে বেড়ায়; পর্বতমালা যখন মাথায় মেঘের আবরণ পরে তখন দেশ বিশেষে বিশেষ বিশেষ আবহাওয়ার আগমন সূচনা হয়ে থাকে। এই সকল কিম্বদন্তীর মূলে বিজ্ঞানীর বক্তব্য কি? আবহাওয়া বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের

সৌধাবলীর ভূনাবশেষ পাওয়া গেছে—তার থেকে দেখা যায় যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের যখন সময়ের প্রবাহ নিরূপণেরও কোনও উপায় ছিল না—তখন তৎকালীন তথাকথিত যাজ্ঞকপ্রণীর ব্যক্তিগণ নক্ষত্রের গতিপথ দেখে আবহাওয়ার সংবাদ আগে থেকেই তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের জানবার চেষ্টা করে এসেছেন। একদিক থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞান একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান—যা গড়ে তুলতে মানুষের আগ্রহ সভ্যতার প্রথমেই দেখা যায়। কিন্তু আজও এই বিজ্ঞানের উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। অনেকে মনে করেন, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ বিস্ময়করভাবে সফলতা পেয়ে থাকলেও—আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রকৃতিরূপে সফলতা পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও বর্তমানে মানুষের কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে—এই আবহাওয়া-বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থাও এর মূল্য মানুষের কাছে প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি।

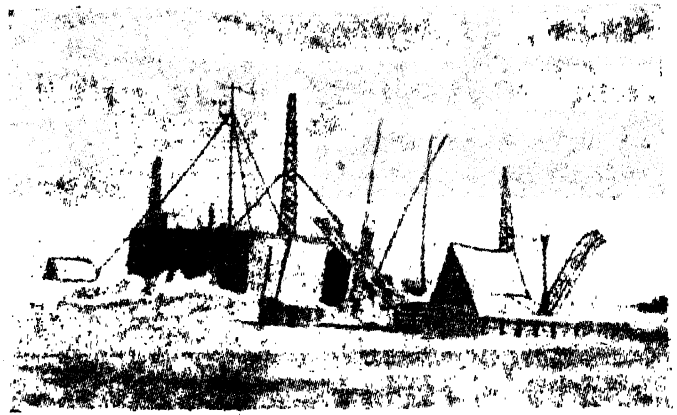


ঘাড়ির সাহায্যে আবহাওয়ার তথ্য-জ্ঞাপক যন্ত্রাদি আকাশে পাঠান হইতেছে।

অলকাতে যক্ষপ্রয়ার কাছে সংবাদ পাঠান সম্ভব হবে কিনা,—এ ধারণার মধ্যে কাল-বর্ণনার সংগে সংগে কবি কালিদাস হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই আবহাওয়া তত্ত্বের আংশিক আভাস দিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাধারণ নরনারী-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বকালে, সর্বদেশে নিজেদের পরিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সংগে একাত্তরপে পরিচিত। তাই নিজের নিজের দেশে বৎসরের কখন কোন সময়ে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে—কেন মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন সময় কি বায়ু, বড়, তুষারপাত, কুয়াসা, শীত বা গ্রীষ্মের আগমন সূচনা করে—এ ধারণা প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা বিশেষে অঙ্গবিস্তার থেকেই থাকে। আকাশ মেঘের সঞ্চার দেখে কালিদাসের যক্ষ সেই মেঘের অলকার পথে যাত্রার সম্ভাবনা ধারণা করেছিল। কৃষক ও নাসিকগণও কোন কোণে কি আকারের মেঘের সমাবেশ হলে ঝড়, জলের সম্ভাবনা—তা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে।—ভারা সাবধান হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জরিজর মধ্যে আবহাওয়া সৃষ্টির সূচনা নির্দেশের জন্য অনেক ভিন্ন ধরণের

যন্ত্র নিজেদের ক্ষেত্রে বতখানি এগিয়ে গিয়েছে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন ক্ষেত্রে এর মূল্য বতখানি? পুরাতন ধনুসাবশেষ থেকে যে সমস্ত

নেপোলিয়ান তাঁর রুশ অভিযানের প্রাক্কালে—রাশিয়ায় শীতকালের আবহাওয়া কিরকম হতে পারে সে সম্বন্ধে তৎকালীন গ্রীসিথ ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাসকে জানাবার জন্য



সেতুপ্রদেশে আবহাওয়া তথ্য লুপ্তাবশেষ জন্য একটি কেন্দ্র

LATEST HOMOEOPH PUBLICATION

হোমিও শিক্ষা সংগ্রহ
ডাঃ শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

মূল্য—৩
DR. P. P. WELL'S
"Diarrhoea & Dysentery" Rs. 2/-
DR. E. B. NASH'S
"Leader for the use of Sulphur" Rs. 2/-
DR. H. C. ALLEN'S
"Materia Medica of the Nosodes" (Enlarged) Rs. 9/-
DR. WM. J. GUERNSEY
"Hæmorrhoids" Rs. 3/-

SETT DEY & CO.,
Original Homoeopathic Pharmacy
40A, STRAND RD., P.B. 563, Calcutta.

ইউ.সি.বঙ্গ
সিদ্ধমলয়

যাবতীয় দুঃস্বাদ ক্ষতরোগের মহোদধি
সিদ্ধ মলয় প্রথমাবস্থায় প্রয়াগে স্বেচ্ছাচকিদি
মিলেইয়া যায় এবং দুঃস্বাদে ক্ষতরোগও বিনা-
অস্ত্রে পাকিয়া ফটিয়া পুষ্টি নিঃসরণে নির্দোষ-
রূপে ভাল হয়। শিশি ১০। মাশুল স্বতন্ত্র।
শান্তি বটিকা—নতুন পুরাতন আমাশয় এবং শ্বেত
ও রক্তমাশয়, উদরভঙ্গ, প্রবাহিকা, তরলভেদ
স্মৃতিকাজিনত দস্ত, উদরাময় গ্রহণী ও আম-
গ্রহণী রোগে অবাধ। শান্তি বটিকায় মমর্ষ
রোগীও শীঘ্র দক্ষা পায়, এমন কি ওলাউঠা রোগের
প্রথমাবস্থায়ও সমভাবে কার্য করে। শিশি ১০।
গরব ফর্মেশন, কলিকাতা।
৭-১৩, রামনারি ঘোষ লেন, পোঃ আমহার্ট স্ট্রীট।

০ মুক্তি—

০ পথে—

উমানাথ

গাংগুলী প্রমোজিত

ইউরেকা পিকচার্সের
ডাউন

সংসার-আবর্তে মানুষের
চলার পথ নিরবচ্ছিন্ন হয় না।

এই মানুষকে কখনও না কখনও দোটার
স্রোতে পড়তে হয়। এমনি এক ফেনিদোচ্ছল
ঘটনার ভেতর বাপ পেয়েছে "দোটার"।

পরিচালনা :
অমল্য বন্দ্যো

প্রভুল ঘোষ

সুর-শিল্পী :

কালী সেন

পরিবেশনা :

ভূমিকায় :

* জহর গাংগুলী, লতিকা মল্লিক

* শৈলেন চৌধুরী, রমা বানার্জি

* রতন বন্দ্যো, রবি রায়, প্রভা,

* শ্যাম লাহা, দুনিয়াবাল, কানু বন্দ্যো।

শ্রী হু গা ডি স্কি বি উ টা রু



আপনার দায়িত্ব!

আমাদের উপরেই ছাড়িয়া দিন না কেন!

আপনার বিবেকবৃদ্ধিতে ইহা আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু
আংশিকভাবে আমাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন।

আপনার পরিজনবর্গের জন্য ন্যাশনাল ইন্ডিয়ানের একখানি "বীমাপত্র"।
এ বৎসরের পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার হইবে না কি?

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট লিখুন।

ন্যাশনাল
লাইফ ইনসিওরেন্স



ইন্ডিয়ান
কোম্পানী, লিঃ

দেন। লাপ্লাস যতখানি সংগ্রহ খোঁজ-
নিয়ে বলেন যে, জানুয়ারী মাসের আগে
রায় ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয় না।
গালিয়ান—এই আবহাওয়ার সম্ভাবনা
বারী তাঁর অভিযানের পরিবর্তন করে।
তু ডিসেম্বরেই হঠাৎ ভীষণ শীত ও
রপাতের ফলে—নেপোলিয়ানের সৈন্য-
হীন লন্ডন হয়ে পড়ে ও তিনি বিফল
য় ফিরে আসেন। বর্তমানের মহাযুদ্ধে
লারের রুশ অভিযানের ব্যর্থতার মূলে আর
থাক অন্ততঃ এই ধরনের আবহাওয়ার
ই আবির্ভাবের কারণ ছিল না। লাপ্লাস
হিসাবে ভুল করেছিলেন তা নয়। যে বিরাট
যুদ্ধলী। এই পৃথিবীকে চারদিক দিয়ে
রে আছে তার আলোড়ন বিলোড়নের ধারা
ই অস্থির, এতই সামান্য কারণে তার পরি-
বর্তন ঘটে যে, পৃথিবীকালের আবহাওয়ার
নাবলীর সংগৃহীত তথ্য থেকে—

ঘনঘোর পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে এই ব্যারো-
মিটার যন্ত্রে বায়ুর চাপেরও পরিবর্তন দেখা
যায়। যে স্থানে এই চাপের পরিমাণের হঠাৎ
হ্রাস হয় সেখানে সম্ভাব্যতাই ধারণা করা যেতে
পারে যে, সেই বিশিষ্ট স্থানের বায়ুর পরিমাণ
ও ঘনত্ব কোন কারণে কমে গেছে। সুতরাং
আশপাশের উচ্চ চাপের বায়ুর্তর সেই স্থানের
বায়ুর চাপ বৃদ্ধির জন্য সেইদিকে প্রবাহিত
হবে। অর্থাৎ সেই স্থানে বায়ুর গতি বৃদ্ধির
সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বা তালের আবির্ভাব ঘটবে।
গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী এই ধরনের আবহাওয়ার
সূচনা হতে পারে বলে কেবলমাত্র ব্যারোমিটারের
উপর নির্ভর করে যে সমস্ত যোগ্য করতেন
তা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল দেখা গেল। তখন
অন্যান্য যন্ত্র ও সম্ভাব্য আবহাওয়ার যোগ্যতার
জন্ম অন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা চলতে
লাগলো। আধুনিক আবহাওয়া নির্যয় প্রণালীর
প্রথম গোড়াপত্তন হয় ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে—

একটি কলিকাতায় ও আর একটি পুণায়।
বর্তমান যন্ত্রের আগেকার ব্যবস্থায় গোটা
ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করে পূর্বভাগকে
রাখা হয় কলিকাতা কেন্দ্রের অধীন ও পশ্চিম
অঞ্চলকে পুণা কেন্দ্রের অধীন করা হয়।
সুতরাং বর্মাদেশের নীচে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত
থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সমস্ত ভূভাগে
কতগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক ও গ্রামে আবহাওয়া
পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি করা হয়। এই সকল পর্য-
বেক্ষণের কেন্দ্র থেকে দিনের কোন একটি
নির্দিষ্ট সময় স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিজ নিজ
স্থানের বায়ুর চাপ, গতি, বৃষ্টির পরিমাণ, তাপ,
বাস্যতা, মেঘ প্রভৃতির পর্যবেক্ষণের বিবরণ
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগে টেলিগ্রাফের
সহায়তায় পাঠিয়ে দেন। এখানে আবহাওয়া
বিজ্ঞানী ও বিশারদের অধীনস্থ একদল কর্ম-
চারী সংগে সংগে সমগ্র দেশের এই সকল বিভিন্ন
স্থানের পর্যবেক্ষণের সংবাদ ভারতবর্ষের মান-
চিত্রের উপর বিশিষ্ট প্রণালীতে চিত্রিত করে
ফেলেন। কোথায় বারিপাত, কোথায় ঝড়া,
কোথায় কুয়াসা, কোথায় শৈত্য, কোথায়
অসহ্য গ্রীষ্ম, কোন্ স্থানের বায়ুর চাপ কত,
গতি কোন দিকে, মেঘের আর্দ্রতা কি, কোথায়
নিম্নল, স্বচ্ছ, সান্দ্র বা আকাশ, বায়ু স্থির
অথবা মন্দমন্দ গতিতে বহমান এই সমস্ত
তথ্যের একটি অসংখ্য চিত্র আবহাওয়া বিজ্ঞানীর
সামনে পড়ে তোলা হয়। একই দিনে একই
সময়ে সমগ্র দেশের আবহাওয়ার কাহিনী
চোখের সামনে থাকায় ও দিনের পর দিন এই
চিত্রে কি পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে জানা থাকায়
আমি বিশেষ মতান, গ্রাম, সহরগুলির দিকে কোন
বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া দেখা দিয়ে
তা এই বিজ্ঞানীর পক্ষে যোগ্য করা এখন সহজ-
সাধ্য হয়। কতকটা পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক তথ্য,
কতকটা দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা
ও কতকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও অনু-
মানের উপর আবহাওয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে আনু-
মানিক যোগ্য করা হয়। উপরোক্ত প্রণালীতে
আবহাওয়ার যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে যে
সমস্ত স্থানের বায়ুর চাপের পরিমাণ একই
বকম সেই সেই স্থানকে এক বর্গ রেখায়
সংযোগ করে নিলে প্রায়ই দেখা যায়, সমস্ত
দেশের আবহাওয়া-চিত্রে দুইটি কি তিনটি
বৃহৎ আকৃতি হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণতঃ
একটির মধ্যে যে স্থানগুলি গম্ভীর হয়
সেই সেই স্থানগুলিতে বায়ুর চাপ সর্বনিম্ন,
আর তার পরের স্থানগুলির বায়ুর চাপ
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অন্য আর একটি
বৃহৎ সৃষ্টি করেছে। এই বৃহৎ নিবন্ধ
স্থানগুলির বায়ুর চাপ সর্বোচ্চ দেখা যায়। এর
প্রথমটিকে বলা হয়, বায়ুচাপের নীচস্থ কেন্দ্র
(centre of low pressure on depression)
আর অন্যটিকে বলা হয়, বায়ুর উচ্চ চাপের
কেন্দ্র (Centre of high pressure)।



সেই দেশের আবহাওয়া তথ্য অনুসন্ধানী দুইজন
একদলের বাসস্থান। এরাই নেপালের পাখা

বিজ্ঞানীর মতদেহের সম্মানে উদ্বারকারী
এই বরফের বাসস্থানের আচ্ছাদন।

আগামী আবহাওয়ার সৃষ্টি কি ধরনের হতে
পারে—তা বলা একেবারেই অসম্ভব যদি না
বর্তমানকালের কার্যপ্রণালীর ধারা মেনে চলা
হয়। একজন রসিক—আবহাওয়া সম্বন্ধে
মন্তব্য করে বলেছিলেন—সবটাইতে আশাবাদী
কে? যে আবহাওয়া বিভাগের যোগ্যতার
নির্ভর করে বর্ষাকালেও ছাড়া না নিয়ে বাড়ীর
বাঁহরে যায়।" মন্তব্যের মধ্যে তিক্ততা ও সত্য
অনেকখানি থাকলেও বর্তমান আবহাওয়া
বিজ্ঞানের উন্নতি ও আনুর্ভাবিক চেষ্টা ও
সফলতা উপেক্ষণীয় নয়।

পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুস্তরের, পৃথিবী
পৃষ্ঠে চাপের পরিমাণ নির্ণয় হয় ব্যারোমিটার
(ব্যারোমিটার) যন্ত্রের দ্বারা। আবহাওয়া বিশা-
রদের এটি একটি প্রধান অস্ত্র। আধুনিক আব-
হাওয়া বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয় এই ব্যারোমিটার
যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। আবহাওয়ার
সাধারণ অবস্থার দেশের বিশিষ্ট স্থানে একটি
নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ এই যন্ত্রে দেখা যায়।
হঠাৎ কোনও কারণে—উপরিস্থিত বায়ুর তাপ বা

আমেরিকায়, ব্যারোমিটারের পরে টেলিগ্রাফের
আবিষ্কার ও তার দ্বারা সংবাদ আদান-
প্রদানের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এই
সময়েই আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে আব-
হাওয়া বিভাগের ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে না।
১৮৫৩ সালে ম্যাকফ্রিন্টেন মারে আমেরিকা
থেকে ইংল্যান্ডে আসেন ও স্বীয় চেষ্টায় জনমত
গঠন করে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইংল্যান্ডে আব-
হাওয়া নির্যয় বিভাগের স্থাপনা করেন। সমগ্র
ইংল্যান্ডের নির্দিষ্ট গ্রামে ও সহরে আবহাওয়া
পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র স্থাপিত হয় ও ১৮৬১ খৃঃ
অব্দ থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক
গবেষণা ও বিচার ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য
সম্ভাব্য আবহাওয়ার সৃষ্টির যোগ্যতা ও সেইমত
প্রাকৃতিক দর্শনপাক থেকে নিরাপত্তার জন্য
সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগ খোলা হয়।
ভারতবর্ষেও অনুরূপ প্রণালী অনুসৃত হয়।

ভারতবর্ষে আবহাওয়া নির্যয় ও আবহাওয়া
সংক্রান্ত যোগ্যতার জন্য দুইটি কেন্দ্র আছে।

একটি কলিকাতায় ও আর একটি পুণায়।
বর্তমান যন্ত্রের আগেকার ব্যবস্থায় গোটা
ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করে পূর্বভাগকে
রাখা হয় কলিকাতা কেন্দ্রের অধীন ও পশ্চিম
অঞ্চলকে পুণা কেন্দ্রের অধীন করা হয়।
সুতরাং বর্মাদেশের নীচে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত
থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সমস্ত ভূভাগে
কতগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক ও গ্রামে আবহাওয়া
পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি করা হয়। এই সকল পর্য-
বেক্ষণের কেন্দ্র থেকে দিনের কোন একটি
নির্দিষ্ট সময় স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিজ নিজ
স্থানের বায়ুর চাপ, গতি, বৃষ্টির পরিমাণ, তাপ,
বাস্যতা, মেঘ প্রভৃতির পর্যবেক্ষণের বিবরণ
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগে টেলিগ্রাফের
সহায়তায় পাঠিয়ে দেন। এখানে আবহাওয়া
বিজ্ঞানী ও বিশারদের অধীনস্থ একদল কর্ম-
চারী সংগে সংগে সমগ্র দেশের এই সকল বিভিন্ন
স্থানের পর্যবেক্ষণের সংবাদ ভারতবর্ষের মান-
চিত্রের উপর বিশিষ্ট প্রণালীতে চিত্রিত করে
ফেলেন। কোথায় বারিপাত, কোথায় ঝড়া,
কোথায় কুয়াসা, কোথায় শৈত্য, কোথায়
অসহ্য গ্রীষ্ম, কোন্ স্থানের বায়ুর চাপ কত,
গতি কোন দিকে, মেঘের আর্দ্রতা কি, কোথায়
নিম্নল, স্বচ্ছ, সান্দ্র বা আকাশ, বায়ু স্থির
অথবা মন্দমন্দ গতিতে বহমান এই সমস্ত
তথ্যের একটি অসংখ্য চিত্র আবহাওয়া বিজ্ঞানীর
সামনে পড়ে তোলা হয়। একই দিনে একই
সময়ে সমগ্র দেশের আবহাওয়ার কাহিনী
চোখের সামনে থাকায় ও দিনের পর দিন এই
চিত্রে কি পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে জানা থাকায়
আমি বিশেষ মতান, গ্রাম, সহরগুলির দিকে কোন
বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া দেখা দিয়ে
তা এই বিজ্ঞানীর পক্ষে যোগ্য করা এখন সহজ-
সাধ্য হয়। কতকটা পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক তথ্য,
কতকটা দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা
ও কতকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও অনু-
মানের উপর আবহাওয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে আনু-
মানিক যোগ্য করা হয়। উপরোক্ত প্রণালীতে
আবহাওয়ার যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে যে
সমস্ত স্থানের বায়ুর চাপের পরিমাণ একই
বকম সেই সেই স্থানকে এক বর্গ রেখায়
সংযোগ করে নিলে প্রায়ই দেখা যায়, সমস্ত
দেশের আবহাওয়া-চিত্রে দুইটি কি তিনটি
বৃহৎ আকৃতি হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণতঃ
একটির মধ্যে যে স্থানগুলি গম্ভীর হয়
সেই সেই স্থানগুলিতে বায়ুর চাপ সর্বনিম্ন,
আর তার পরের স্থানগুলির বায়ুর চাপ
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অন্য আর একটি
বৃহৎ সৃষ্টি করেছে। এই বৃহৎ নিবন্ধ
স্থানগুলির বায়ুর চাপ সর্বোচ্চ দেখা যায়। এর
প্রথমটিকে বলা হয়, বায়ুচাপের নীচস্থ কেন্দ্র
(centre of low pressure on depression)
আর অন্যটিকে বলা হয়, বায়ুর উচ্চ চাপের
কেন্দ্র (Centre of high pressure)।
পূর্বোক্ত কেন্দ্রটি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক
দুর্যোগের লীলাভূমি—ঝড়, বজ্রঝড়, অবল বায়ু-
(৩১১ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন)

নাটকীয় কথা

(২২ পৃষ্ঠার পর)

সেই মার খাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয় তখন আমরা কান্দিয়া আকুল হই। অনেক সময়ে 'সাদু' বা 'ভালমানুষ' অর্থে 'স্বাধ'বুদ্ধিহীন ভাববিহীন পুরুষই বুদ্ধিতে হইবে—অর্থাৎ, অতিশয় শক্তিহীন মানুষ। যে আদৌ আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, সেও একরূপ মহাপুরুষ; এই মানুষই যখন জীবনধর্ম-লঙ্ঘনের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পায়, এবং যখন তাহার চরিত্রের নিদারুণ দুর্বলতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়—সে যখন একই দুর্বলতার বশে উন্মাদ হইয়া আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনি ক্ষতিবিক্ষত করিতে থাকে (যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকের 'যোগেশ') তখন আমাদের ভাববিহীনতার অন্ত থাকে না—এই self-pityই আমাদের উৎকৃষ্ট ট্রাজিডি-রস। পুরাণ-প্রথিত অবতার-রূপ 'পুরুষ'কেও আমরা শক্তিমান 'চরিত্র'রূপে পূজা করিতে পারি না—জাবের অশ্রু-স্লাবনে তাহাকে মৃৎপুঙ্খের মত বিগলিত করিয়া না তুলিলে আমাদের নাটকাত্মনয় সার্থক হয় না। ইহা ছাড়া, আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে—পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুণ্ডরাক আছে, ভাব-ভক্তির প্রবল বন্যা আছে—এ সকলের তুলনায় জীবন বলিতে বাহা বৃক্ষায় তাহা তুচ্ছ; সে রহস্যভেদ করিবার শক্তিও আমাদের নাই, প্রবৃত্তিও নাই—আমাদের জাতীয় সংস্কারই যেন তাহার বিরোধী।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিদেশীরা অনুকরণে আমরা রঙ্গমণ্ড নির্মাণ করিয়াছি। যে জীবন হইতে ওখানে যে নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে—আমাদের জীবন সেদূর নয়, তথাপি সেই নাটকের আদর্শে আমরা নাটক রচনা করিয়া থাকি। এককালে আমাদের কবিরা ফেনন মহাকাব্য লিখিয়া মহাকবি আখ্যাত করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ, কুমড়ার গাছে নারিকেল ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেইরূপ যাত্রাগানের আসরেই আমরা বলিভাষী থিয়েটারের মাচা বান্ধিয়াছি। নাটক যদি জীবনেরই সাক্ষাৎ আভিনয়িক রূপ হয় তবে আমাদের জীবনই যেমন আমাদের নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে, তেমনই আমাদের নাটকের আকৃতি-প্রকৃতিও স্বতন্ত্র হইবে; যে ছাঁচে যুরোপীয় নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে সে ছাঁচে আমাদের নাটক গড়িলে তাহার styleই ভুল হইবে, অতএব তাহা সার্থক সৃষ্টি হইবে না। আমি খাঁটি নাটকের যে আদর্শ ধরিয়াছি—তাহাতে জীবনের যে রূপটির উপলব্ধি চাই, তাহার চেতনাই যদি আমাদের সংস্কারে সহজ না হয়, তবে যুরোপীয় আদর্শে আমরা যে রঙ্গমণ্ড খাড়া করিয়াছি, এবং যেসব চরিত্র ও অভিনয় তাহাতে যুক্ত করিয়াছি—সে সকলই বাধ হইতে বাধ্য; 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বা 'বিশ্ব-মঙ্গলোৎসব' মত নাটক যে বিশুদ্ধ নাটক হইতে পারে না, ইহা স্পষ্টসিদ্ধ। আমি গল্পের কথাই বলিতেছি না—গল্প যেমনই হোক, তাহাকে নাট্যরূপ দেওয়া যায় কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; কিন্তু বাহা মূলে একটা ভাব-জীবন মাত্র, বাহাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিগত প্রাণধর্মের প্রেরণা নাই, তাহাকে যদি অভিনয়-বস্তু করিয়া তোলা হয়, তবে তাহা নাটক নয়—দৃশ্যকাব্য; তাহা গোড়া হইতেই একটা ভাবরসের গীতোৎসাহ—তাহাতে যে ঘটনাদুলি ঘটে, তাহা প্রবৃত্ত প্রাণশক্তির কারণে ঘটে না; তাহাতে বাহিরের সংগে, বাস্তবের সংগে, কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নাই; 'চরিত্র' বলিতে পূর্বে বাহা বলিয়াছি, সেখানে সে বস্তুই প্রয়োজনই হয় না। ভাবোদ্দীপনাই বাহুর একমাত্র অভিপ্রায় তাহাতে মানুষকে এক একটি ভাবের গ্রন্থিরূপে সাজাইয়া লইলেই হয়; অর্থাৎ বীর, কবর, হাস্য, প্রভৃতি কতকগুলি রসকে মানুষের মত পোষাক পরাইয়া রঙ্গমণ্ডে নাচাইতে পারিলেই হইল। কেবল পৌরাণিক নাটকই নয়—আমাদের সকল নাটকই—সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক—এইরূপ ভাবপ্রবল মেলোড্রাম। আমি থুবু আধুনিক নাটকের কথা বলিতেছি না।

এইরূপ না হইয়া উপায় নাই, কারণ, আমাদের দেশের দর্শক-আছে—বাহাতে জগৎ ও জীবনের দুঃখের রহস্য বিদ্যুৎচুম্বকের মত ঝন্ডলি আর কিছুতেই সাজা দিবে না—দিতে পারে না। তাহা

হইলে, নাটকের আদর্শ যেমনই হোক—নাট্যকলা ও নাট্যরসের মূল প্রেরণা যেমনই হোক, যেহেতু নাটক যুগের প্রভাব, জাতির চরিত্র এবং সামাজিক সংস্কার এই ত্রিদোষকে আশ্রয় না করিয়া পারে না—সেই হেতু আমি নাট্যরসের যে তত্ত্ববিচার করিয়াছি, সেই তত্ত্বই অধীন করিয়া দেখিলে, একদিকে যেমন খাঁটি ও উৎকৃষ্ট নাটকের বড় অভাব ঘটিবে—আর একদিকে তেমনই কেবল বহুজনের মনোহরণ করিয়াছে বলিয়াই বহু নাটকের সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমটির কারণ বুদ্ধিতে পারা যায়—পূর্বের আলোচনাতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে কারণ এই যে, এরূপ খাঁটি জীবনরস-রসিকতার অনুকূল অবস্থাওয়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে ও জাতির জীবনে ক্রিচ্ছ সুলভ হইয়া থাকে। বাহিরের অবস্থার সাহিত্য অন্তরের এরূপ রসামস্তার যোগাযোগ একটা বড় মাহেশ্মুদ্রণেই সম্ভব—সে যেন মৃত্তা ও স্মৃতি-নিষ্কৃত্যমিত প্রবাদের মত। তবু ওই প্রবাদও এক অর্থে সত্য; এমন অনেক বস্তুই আছে বাহা অনুকূল দেশ-কাল-পাত্রের সংযোগেই সম্ভব হয়, এজন্য তাহা দুলভ হইতে বাধ্য। তথাপি, একবার যদি তাহা কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহাকেই আদর্শ বলিয়া মানিতে হয়, এবং পরে আর কোথাও ঠিক তেমনটি না হইলেও, সেই আদর্শের মানদণ্ডেই সেই জাতীয় বস্তুর উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার আদৌ অসম্ভব নয়। ইহাও সত্য যে, এক একটা জাতি এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে—তেমন আর কেহ করে নাই; এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তথাপি জাতি ও যুগকে বাদ দিয়া সেই শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞানটুকু আর সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। নাটকের ব্যাপারেও তেমনই, প্রাচীন গ্রীক, অর্বাচীন ইংরাজী বা ত্রুপনীয় নাট্যকলা নাট্যরসের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা সার্বভৌমিকতা দাবী করিতে পারে—উৎকৃষ্ট নাটক যে কি বস্তু তাহার দৃষ্টান্ত ঐ নাটকগুলির মধ্যে মিলিয়ে।

স্বাভাবিকতার সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সত্য বটে, দর্শকচিত্তে সম্যক সাজা জগাইতে পারিলেই নাটক এক হিসাবে সার্থক। এজন্য যুগ ও জাতির বিশিষ্ট রস-চেতনার দ্বারা সকল নাটকেরই অভিনয়-সাফল্য একরূপ সীমাবদ্ধ। যুগের দ্বারাও বটে—কারণ এক যুগের রুচি ও রস-সংস্কার অন্য যুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তথাপি, জীবন-রসরসিকতা যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা হইলে বাহিরের উপকরণ ও সাজসজাই নূনতম হওয়া আবশ্যক—প্রাচীন নাটকের ঐগুলিই বাধা হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের রসপ্রেরণার কোন পরিবর্তন হইবে না। এইরূপ রসপ্রেরণার নাই নাটকও যদি অতিশয় জনপ্রিয় হয়, তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, তাহা সাময়িক রুচি ও রসবোধের বড় উপযোগী হইয়াছে, এবং ঠিক সেই গুণে তাহা নাটক হিসাবে সাধারণভাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণেই তাহা উৎকৃষ্ট নাটক নহে। যদি সেই অভিনয় সাফল্যের মূলে খাঁটি নাটকীয় রস না থাকে, তবে সাময়িক রুচি ও রসবোধের তৃপ্তি সাধন করিয়া সে নাটক অচিরেই কালসঞ্চিত আবর্জনা রাশির সাক্ষ্য হইয়া যাইবে; সে নাটক সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির অমরত্ব দাবী করবে না—রঙ্গমণ্ড হইতে বাহির হইয়া শাস্তব সারস্বত চক্রে আরোহণ করিবে না।

আমাদের এ যুগের সাহিত্যে আমরা বহুবিধ রস-রূপ সৃষ্টি করিয়াছি—বাঙালীর কবিপ্রতিভা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু নাটকীয় রস-সৃষ্টিতে আমাদের প্রতিভা সত্যি হার মানিয়াছে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত আমরা এমন একখানিও নাটক সৃষ্টি করিতে পারি নাই, বাহা রঙ্গমণ্ডে সাময়িক প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোনরূপ গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা এ পর্যন্ত অতিশয় অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের মেলোড্রামাতেই চরিতার্থ হইয়াছে। এমন একখানি নাটক আমাদের নাই বাহাতে মানব-চরিত্র

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাংক লিঃ



হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

“ক্যালকাটা ন্যাশনাল” প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার বিপুল আর্থিক সংগতি জমার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখে এবং সমগ্র ভারতবাসী শাখা প্রশাখা ও বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ব্যাংক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নিতর্যযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, লাহোর ও দিল্লীতে
এবং নিম্নলিখিত স্থানে এই ব্যাংকের শাখা অফিস আছে :-

কলিকাতা	অমৃতসর	মাদ্রাজ	কলকাতাবৈ
ক্যানিং স্ট্রীট	মেন্টন রোড	মীরট	(বোম্বাই)
বড়বাজার	(নাগপুর)	পেরলী	আমেদাবাদ
শ্যামবাজার	পানিনা	লক্ষ্মী	নাগপুর
ভবানীপুর	গয়া	আমিনাবাদ	ইটওয়ারী
বালীগঞ্জ	কটক	(লক্ষ্মী)	(নাগপুর)
ঢাকা	এলাহাবাদ	আজমীর	বায়পুর
ময়মনসিংহ	কটক	অমরাবতী	লক্ষ্মণপুর
নারায়ণগঞ্জ	(এলাহাবাদ)	(পেরলী)	জম্মলপুর ক্যান্টনমেন্ট
চট্টগ্রাম	ধেনাস		

কারেন্ট একাউন্ট : শতকরা বার্ষিক চারি আনা হারে সুদ দেওয়া হয়।

সেভিংস ব্যাংক একাউন্ট : এই ব্যাংকের সেভিংস ব্যাংক একাউন্ট খুবই জনপ্রিয়।

শতকরা বার্ষিক ১২% টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

এইচ. সি. সরকার,
জেনারেল ম্যানেজার

তথা মানব-নির্মিতর উদ্ঘাটনে সেই স্থির-গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে—যাহাতে জগৎ ও জীবনের দুঃখের রহস্য বিদ্যোৎসর্গের মত উদ্ভাসিত হইয়া বাস্তব অনুভূতিকেই একটি অপূর্ণ রসে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। জীবন-সত্যকেই এমন রস-সত্য করিয়া তোলা শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার কাজ—এই জন্যই একজন নাট্যকারই জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই কেন, এই আলোচনা হইতেই তাহা কতকটা হৃদয়গম্য করা যাইবে।

এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই— কারণ, যে গাছে যাহা ফলিবার তাহাই ফোটে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমরা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছি এবং আমাদের এক নাট্যকার সেন্স-পায়ারের চেয়ে বড়, এইরূপ আশ্চর্য্য করিলে এবং সেই আশ্চর্য্যলনে রাসিকতাভিমাত্রী ব্যক্তি-গণও যোগদান করিলে, তাহা শৃঙ্গুরী হাস্যাকর নয়—যৎপরোনাস্তি লজ্জাকর হইয়া থাকে। বাঙালী অনেক কিছু পারিয়াছে এবং আরও অনেক কিছু পারিবে, কিন্তু নাটক-রচনার পক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্র ও বহুকালাগত সংস্কার এমনই যে, ভবিষ্যতেও আমরা তাহাতে সম্মান সফলতা লাভ করিব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ফায়ার এণ্ড জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

ডিরেক্টর বোর্ড :

- শ্রীযুক্ত এস. এম. ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান
- শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, এম. এ.
- শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সরকার
- শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সোম
- শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

“ফায়ার এণ্ড জেনারেল” একটি সম্পূর্ণ

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

সকল প্রকার অগ্নিবীমার কার্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়।

টেলিফোন : ক্যালকাটা ৭০৬৭

এইচ. এন. চ্যাটার্জি, বি. এল.
সেক্রেটারী।



সর্বত্র সমস্ত দোকানে
পাইবেন।

পেনম্যান ইঙ্ক

কোং

৬৮, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র

চাঁদার হার —

সডাক বাৎসরিক—৪৮,
.. যার্মাসিক—২৫,
.. ট্রেমাসিক—১২।০

অর্ধ-সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

যেখানে দৈনিক ডাক পৌঁছে না, সেখানে দেশের
খবর পাইতে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্র।
প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবারে প্রকাশিত হয়।সডাক বাৎসরিক—১২,
.. যার্মাসিক— ৬।০
.. ট্রেমাসিক— ৩।০

দেশ

বাংলায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত—সাপ্তাহিক
সাহিত্য পত্রিকা। রচনা, প্রবন্ধ, গল্প সম্ভারে
সমৃদ্ধ।

প্রতি সংখ্যা—৩০ আনা

.. সডাক বাৎসরিক—১০,
.. যার্মাসিক— ৫,

প্রাপ্তিস্থান :

১নং, বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গ-ভঙ্গ !

আবার হবে !!!

বিগত দিনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে বাঙালী যে
আন্দোলন করেছিল তার মূলে ছিল আনন্দমঠের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের

বন্দে-মাতরম্

সঙ্গীত

আজ বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালীর সেই প্রতিবাদকে
জাগ্রত করতে রয়েছে — সেই গানের প্রতিধ্বনি

আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের

প্রচেষ্টায় প্রস্তুত

প্রাণ মাতানো সুরের ভরা

‘বন্দে-মাতরম্’

সংগীত-রেকর্ড

(১২" ইন্ডি ডবল সাইড রেকর্ডে গৃহীত)

সুপ্রসিদ্ধ সুদর্শিনী তাম্রবরণের পরিচালনায়

এ গান গেয়েছেন বাংলার সুকণ্ঠ চারণবন্দ

এ গান আবার ঘরে ঘরে ধ্বনিত করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

দি মেগাকোম কোম্পানী

৭৭-১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

দি ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্, লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস :

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

কারখানা

১১৯নং গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, বেলুড়া (হাওড়া)।

ফোন—হাওড়া ৯৩৬

সরুপ্রকার ঢালাই করা, রোল করা জিনিষ, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি,
মেশিনের অংশ ও মেশিন ইত্যাদি প্রস্তুত করাই আমাদের বিশেষতা।

গ্যালভানাইজিং ও ইলেক্ট্রিক গ্যাসওয়েল্ডিং-এর কাজও করা হয়।

কে. এন. দালান,

ম্যানোজিং ডিরেক্টর।

বিজ্ঞানীর মেঘদূত

(৩০৭ পৃষ্ঠার পর)

গু, বারিপাত ও আকাশে মেঘের ঘনঘটা এই দৃশ্য দেখা যায়। এই দূর্যোগ-কেন্দ্রের যাত্রাপথ নির্দেশ করে, গতি কতটা, কোন্ কোন্ দিক এরা স্ফারা প্রভাবান্বিত হবে তারও ন্যূন প্রতিনিয়মের আবহাওয়া চিত্র থেকেই প্রত্যাশা করা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানেই এই কেন্দ্রের সংগঠন সেই স্থানের বায়ু অচঞ্চল, আকাশে মেঘের ঘটা আর এই কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘর্ষিত বায়ুর বেগও বেশী ও বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত হয়। কেন্দ্রের মধ্যস্থিত স্থানের বায়ুর বেগ কম থাকায় কোন কোন অসুস্থ ব্যক্তির পরিত্রাণ হয়, পশু ও পক্ষীকুল চঞ্চল হয়ে উঠে। সেই স্থানের লোকেরা বায়ুমণ্ডলীয় এই অচঞ্চল নির্বাহিত, নিষ্কম্প অবস্থা দেখে কেন্দ্রের পূর্বে 'লক্ষণ' অনুমান করেন। যৌদিক এই দূর্যোগ-কেন্দ্রের গতি হয়, সেই দিক কেন্দ্রের পুরোভাগে তরল জলীয় মেঘ সূর্য বা চন্দ্রের এক রকমের স্থান আভার সৃষ্টি করে। এই কেন্দ্রের পুরোভাগে যদি কোন পর্বতমালা থাকে, তাহলে এই সব মেঘগুলি তাদের শিখরদেশে আগ্রস গ্রহণ করে। স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে নানারকম প্রত্যাশিত বিসদ্বন্তীর মূল কথা ইহাই।

বায়ুর উচ্চ চাপের কেন্দ্রের অবস্থা ঠিক বিপরীত। যেখানে এই কেন্দ্রের স্থিতি পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানগুলিতে ও তাহার চতুঃপাশের স্থানগুলিতে নির্মল আল হাওয়ার সঞ্চার হয়।

আবহাওয়ার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্য গবেষণা ও বিচার, অনুমান ও ঘোষণার মোটামুটি প্রণালী এই। এর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার দেশের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা ও আবহাওয়ার প্রতিফলিত চিত্রের গঠনের পদ্ধতিপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। এইজন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ (Surface observations) ছাড়াও পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের (Upper air observations) তথ্য দরকার হয়। পৃথিবীর উপরে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত যে অংশ, তাকে বলা হয় 'ট্রোপোস্ফিয়ার'। পৃথিবীর বাসিন্দাদের কাছে বায়ুস্ত্রোত বন্ধা বিদ্যে মেঘ বৃষ্টি সবকিছুইই, আবির্ভাব ঘটে, এই ট্রোপোস্ফিয়ার থেকে। এই অংশের বিভিন্ন স্তরের আবহাওয়ার সংবাদ নেওয়া হয় বেলুন, ঘড়ি প্রভৃতিতে সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। বর্তমানে এই উচ্চস্তরের আবহাওয়ার সংবাদ সর্বশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক

বিমানচালনার যুগে পৃথিবীর কত উপরে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে জানা থাকলে চালক তার বিমান সেইভাবে চালনা করে বা সাবধান হয়। আজকাল শত্রুপক্ষের বিমানহানার জন্য অনেক সহরেই 'বেলুন ব্যারজের' সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময়ে এগুলিকে অতি উচ্চ উঠান অবস্থায় দেখা যায়, এর অর্থ এই নয় যে, শত্রু বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় পৃথিবী পৃষ্ঠের বায়ুর স্রোত অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের বায়ুস্ত্রোত অপেক্ষা প্রবল থাকায় এইগুলিকে উচ্চস্তরে নিরাপত্তার জন্যই তোলা হয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার একটা শৈথিল্য আছে। ভারতবর্ষের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশের আবহাওয়ার রীতিনীতি বিভিন্ন। বাংলাদেশে কালবৈশাখী এক বিশিষ্ট সময়ের বিশেষ প্রাকৃতিক লীলা যা পাশাপাশি অন্য স্থানে দেখা যায় না। এর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক রকম মতবাদ গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে মাঝে মাঝে যে প্রবল ঝড় বা ঘূর্ণিবাত্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে তার প্রায় সমস্তগুলিইই উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগর। যুগ্মের পূর্বে ক্রমের কতকগুলি স্থান থেকে ও বঙ্গোপসাগরস্থিত জল-যান থেকে আবহাওয়ার সংবাদ আসতো। ফলে ঝড়ের কেন্দ্রের (storm centre) গঠনের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থানকাল গতি-পথও স্রোতের পারিচয় পাওয়া যেত ও সেই মত বন্দর, তাহাজ ও ভূভাগের লোকজনকে ঝড়ের সম্পর্কে রেডিও ও টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ দিয়ে সতর্ক করা হত। এই সকল ঝড়ের কেন্দ্র যতক্ষণ না মিলিয়ে যায় ততক্ষণ তাকে মানচিত্রে উপরি উক্ত প্রণালীতে এনে সতর্ক দৃষ্টিবন্দী করে রাখা হত। এদের বিশেষত্ব ছিল বঙ্গোপসাগর থেকে যখন ভারতবর্ষের কোন ভূখণ্ড এসে পৌঁছাত সেখানে এসেই হয় অতি ক্ষিপ্ৰগতিতে ভূভাগের উপর দিয়ে ঘুরে মিলিয়ে যেত, আর না হয় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেত। পূর্বাঞ্চল অবস্থায় যখন সতর্ক হবার আগেই লোকজন, পশু ও ধন সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয় যেত। কিছু দিন পূর্বে যে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা মেদিনীপুর অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে গেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ইহাই। আমাদের দেশে শীতকালে এক ধরনের আবহাওয়া দেখা যায়। এটিরও রীতিনীতি এই দেশেরই

বৈশিষ্ট্য। শীতকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এক ধরনের বায়ুচাপের কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবহাওয়া বিভাগ এর নাম দেন "উত্তর-পশ্চিম দেশের চঞ্চলতা" (North-Western disturbances)। এই "চঞ্চলতার" কেন্দ্র প্রায়ই বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হয়। এর পুরোভাগের স্থানসমূহের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, অল্প বিস্তার বারিপাতও হয় ও শীতের পরিবর্তে একটু গরমের আবির্ভাব হয়। এই কেন্দ্রের পশ্চাতে আকাশ নির্মেঘ হয় ও শীতের প্রকোপও বৃদ্ধি পায়।

আবহাওয়া তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হতে পারে না তার কারণ অনেক। অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পৃথিবীর একদিকে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় অনেক সময় পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠস্থিত স্থানগুলির আবহাওয়া তাদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেক মনে করেন, ভারতবর্ষীয় আবহাওয়া অনেক অংশে দক্ষিণ আমেরিকার আবহাওয়ার দ্বারা সর্বশেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। মধ্য ইউরোপের আবহাওয়া উত্তর মেরুর বিশাল ভূযাত্রায় স্থানের ভূমির পাতের ক্রমবর্ধী উপর নির্ভরশীল। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। তার কারণ, এর একদিকে আছে সুবিশাল ভূখণ্ড আর অন্যদিকে আছে বিশাল আর্টফিটকের জল-রাশি। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, আবহাওয়া সম্পর্কে নির্ভরশীল ও নির্ভুল তত্ত্ব গড়ে তুলতে হলে সেই দেশ বিশেষের আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের তথ্যই যথেষ্ট নয়—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ও উপরিভাগের সমস্ত স্থানের আবহাওয়ার সংবাদের প্রয়োজন। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই দুই স্থানের আবহাওয়াই সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়ার সমষ্টিগতরূপে অক্ষপাতিস্তর প্রভাবান্বিত করে। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীর অভিযান হ'ল সূর্য, গৃহবাসী বিজ্ঞানী স্বয়ং স্বাচ্ছন্দ্যর শেষ করে সেদিয়ে পড়লো অজানার সম্মানে প্রাণকণ তুলে করে। বিজ্ঞানের বেদমন্ডলে এদের দেহ ও প্রাণ দিয়ে পূজা বিফল হয় নাই। দুঃখ দুর্দাম মেরু প্রদেশে পৃথিবীর উপরি-স্থিত বায়ুস্তরও বিজ্ঞানী তার অভিযান সফলতার সঙ্গে শেষ করেছেন। মানবতার কল্যাণে এই দরদী, নির্ভীক, সর্বাত্মক বিজ্ঞানীর সাধনা যুগে যুগে যে সাফ-সফল হ'য়েছে। সেই সফলতা মানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হোক—তার ধনুসের জন্য নহে



কে ঐ নারী! যার মুখে বিষাদের ছায়া, চোখে অশ্রুকণা, আজ
এই আনন্দের দিনে যার বুকভরা বেদনা। এই সেই হিন্দু বিধবা
নারী যার সম্বন্ধে কবি 'হেমচন্দ্র' বলিয়াছিলেন,—

“সোনার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির
বিদেশের স্ত্রী-পুরুষ এদেশে আসিত,
পাতিব্রতা বলে তারে নয়নে হেরিত”।

ভগবান ইহার প্রতি বিমুখ, কিন্তু মানুষও ইহার প্রতি বিমুখ
কেন? ইনি ত কোন দোষে দোষী নহেন। সমাজ ইহার কি
প্রতিবিধান করিতেছে? বিধবার উপর সমাজের নিষ্ঠুর শাসন
আজও কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

সামাজিক নিষ্ঠুরতা ত আছেই—তদুপরি যদি আর্থিক
অভাব দেখা দেয় তবে ত অসহায় বিধবা নারী নিজের এবং
পুত্রকন্যার প্রতি কর্তব্য পালনে অসমর্থ। তবে সুখের বিষয়
আজ এই যে আর্থিক অভাবলাঘবে জীবন বীমা চেষ্টা করিতেছে।
জীবন বীমা আজ এই বিধবার ভবিষ্যতের নিরাপত্তা—
পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহের ভার গ্রহণ করিতেছে।

আমরা জীবন বীমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

৫নং সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা।

--পূজার ছুটিতে পড়িবে--

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় .

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর

কর্তৃক রচিত

রূপবাণী

সহজ সরল ভাষায় রচিত — নতুন ধরণের
টাইপে মুদ্রিত — পুস্তায় পুস্তায় বিচিহ্নিত—
আট/দশ বৎসরের ছেলেমেয়েদের পড়িবার
উদ্দেশ্যে রচিত — এমন ধরণের বই
পূর্বে আর বাহির হয় নাই।

—মূল্য প্রতি খণ্ডে দেড় টাকা—

—(০)—

—বাঙলায় বিশ্বসাহিত্যের সেরা বই—

রোবিন হুড—১১০ বেনহুর—১১০

হিউগোর ছান্দ্রব্যাক অফ নব্রদাম—১১০

লিও টলস্টয়ের ছোটদের গল্প—১১০

লান্সট ডেজ অফ পম্পেই—১১০

শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডী—১১০

শেক্সপীয়ারের কমেডী—১১০

আংকল টম্‌স কেম্বিন—১১০

গালিভারস ট্র্যাভেল্‌স—১১০

এন্ডারসেনের গল্প—১১০

লা' মিয়ারেব্ল্‌স—১১০

ডন কুইকজোট—১১০

—আরো কয়েকখানি ভালো বই—

লাল ফোজের কাহিনী—১১

লেনিন—১১০ স্টালিন—১১০ ডরোশলভ—১১০

ট্রট্‌স্কী—১১০ চার্চিল—১১০

জওহরলাল—১১

যুগে যুগে—১১০ মোসলেম জগৎ—১১০

নতুন যুগের নতুন মানুস—১১০

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—১১০

আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী—১১০

মোসলেম জাতির কর্মবীর—১১০

খ্রীষ্ট জাতির কর্মবীর—১১০

মেবারের বীর তনয়—১১০

রুশ জাতির কর্মবীর—১১০

ছেলেদের একাঙ্ককা—১১০

বিজ্ঞানের আবিষ্কার—১১০

বিজ্ঞানে সন্তর্পণ—১১০

= প্রাপ্তিস্থান =

ইউ, এন্, ধর প্ল্যান্ড সন্স লি:

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা



দাদামশায়ের উপহার

দাদামশায়ের উপহার, হুমি আর মধ্যস্থতি।
 একবারে দিতে দিতে হতে কখনও বাকি।
 এতে দাদামশায়ের দোষ example,
 মতের বসন্তের দোষের example।
 দাদামশায়ের হতে উত্তীর্ণ
 যখন প্রাকৃতিক হুমি, হতে হতে জীব।

দাদামশায়



কার কার লেখা আছে?

রবীন্দ্রনাথ, জবনীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, নিশিকান্ত সেন, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী,
 সুবিনয় রায়চৌধুরী, কল্যাণ বসু, গজেন্দ্র মিত্র, বিমল ঘোষ, ফটিক বসেন্দ্রনাথ, বীণা
 দেবী, বসন্ত আলি মিত্র, সাবিত্রী বসু, দীপেন বসু, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অনুরাগ বসু।

ছবি এঁকেছেন

শিলাপী সমর দে, সুবীন ভট্টাচার্য, শৈল চক্রবর্তী, জ্যোতিষ সিংহ, দীপেন বসু, অমর দে,
 কামিনী সেন, কল্যাণ সেন ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

হেতুদের সকলের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ—
 এতে দাদামশায়ের দোষের একদিন
 ওপরের এ ছবি ও কবিতা উপহার
 দিতেছিলেন। আর দাদামশায়ের দোষ,
 দোষের সেই হেতুদের পুত্রের উপহার
 হিসাবে প্রকাশিত হল। 'দাদামশায়'





স্বাভাবিক ন্যায় চাকুরি

স্বাভাবিক ন্যায় চাকুরি

এরে অ আ ক কা তালে বেতালে হুশী দীঘী হুশু দীঘু
রি লী এ ও ও কেউ কেউ এলো সেটা জনো কেউ।

জানি জানি কেও কেউ নয় ওটা—

মোটাগোটা হবে কেউ

রাশভাণী!

খবরদারি বড়ভারি কেউ

ওরে লী, ওরে লী।

কাঁকোটা মাকোটা

জলহাওয়ার কাপোটা

রাত এখন বতোটা, রাত হ'লো বারোটা।

সুখপাল ওটা, পার্থক ওটা, মার্কি ওটা

কোইত জেগে নাই কেউ

আরে লী, ওরে লী।

স্বরে অঃ স্বরে অঃ হুশী দীঘী হাঃ হুশী, কাঃ হুশী কাঃ হুশী, মাকুনে
করে না খয়ে না বেহারা হুশী।

হুশী মাকুনে

কিউকিনা মাকুনে মাকুনে কন্যা

এরে ওটা, ওকেও কেউ, নয় কেউ।

কাঁক ভুসুজা বকোটা

পাখি মাকুনা কপুচা না

বকবকায় বকম পাকো

উক পাকি হাকো

এরে অ আ ক কা

স্বাভাবিক ন্যায় চাকুরি

স্বাভাবিক ন্যায় চাকুরি

এক

রাজকনো।

রোদ ঝলমল দিনে মাস্তপাখীতে হাঃ হাঃ।
রাজকনো জেহননা কলংখা রাত শাকপাখীতে আসেন।
রামধনুর রং পুরী। সাতমহনের পর দুঃসায়ের। দুঃসায়ের
রাজকনোর দুঃ ধবংস শেষত মেল।

হীরের খাটে পা, সোনার বরণ বেশ,

কুঁচবরণ গা, কাঃখাঃখা কেশ,

কুলহাসন খাটে রাজকনো ঘুমান।

আর, রাজকনোর পুতুলেরা ঘুমাঃ মণি মণিকোর লোলাঃ।

কুরুর বাতাসে জেহননা হেসে লুটোপুটি... রাজকনো,
রাজকনো! ঘুমাঃ না, খেলবে? না, খেলবে না ঘুমাঃ?

রাজকনোর কাজলখাঃ কেশ বাতাসের কচি আঃলে। চোকের
পাতার জেহননার কচি আঃলে। শূঃ শূঃ শূঃ শূঃ! রাজকনো
আশ্বে স্বপ্নে চোকের পাতা মেলেন। ওমা!

তুলতুল, গুঃ

দলদল, গা,

ঝিলঝিল বক

উড়, উড়, পা,

"কানো গো, কানো?"

"আমরা?"

ঘুমন্তের পাঃখাঃ

কোলাঃ ঘুমন্তেরা, চোকে মেলেন রাজকনো। দেখেন
দুঃসায়ের এক শেষপাখী।

দুঃসায়ের, "রাজকনো, রাজকনো,

দুঃসায়ের— চেউ,

যাবে না তো কেউ?"

যাবে না? হে হে হে হে, শেষপাখী ফিরে যাবে! উঠে
রাজকনো রাজ্যভাঃ সিঁথিপটি বাটেন, জেলন শরী পড়েন
নুঃপুঃপাঃ হাঁটেন।

বুঃ, বুঃ, বুঃ

চলেন।

দুই

শেষপাখী চলে গেল গেল।

দুঃসায়ের চেউ দুঃ, মেঘের চেউ চুঃ, অঃসায়ের চেউ কুরুর,
শেষপাখী শেষপাঃ এসে পাঃ। শেষত নদীর সৈতি
চিক, চিক, চিক।

"হাঃ!" টুকটুকে আঃলে গালে, খাঃখেয়ে রাজকনো বলেন,

"কি যে করলেম!"

দুঃ বোনের চমক, "কি, কি? রাজকনো, কি?"

রাজকনো ছুঃ। কোলে দুঃখান হাত, না কথা না কিছু,
বলেন, "এলেম তো, মিছে! খেলব কিসে?"

"কেন রাজকনো, কেন?" থমাঃকে দুঃসায়ের।

"ভুলেমে রঙী পুতুল, ভুলেমে সংগী পুতুল, ভগণী, তরগণী,
অত পুতুল, তা-ও আমলেম না—বোনা!"

"রাজকন্যা, রাজকন্যা!" হেসে ওঠে দ, কোন,
 "মাগি মাগিকের দৌলনা
 থাকে থাক্ তোলানা,
 ভুলোছি তো ভুলোছি।
 কোথায় যে এসেছ,
 জানো
 রাজার কি?"

তিন

রাজকন্যা অবাক!

চলেন, আকাশে নেই চাকনা, কোথেকে মেঘে পাহারা, চাঁদের দেশ!

শেখতপস্বী ঘাটে ফিড়ে। আর, বর্শাভে সুর।

বলো চলে পাহার, পাহাড় ওড়ে ঢাকায়, করুণা হেসে
 জোনাক্ জ্বলে।

রাজকন্যা এদিকে চান, ওদিকে চান; রাপেলী ওন, হীরেলী
 ফল, ক্ষীরের সায়র টল্ টল্, ফাঁপের মাছ, মল্লোর নাচ।

দুপোন বলে, "রাজকন্যা, নামির"

নামেন, আলপনায় চাকণ, পগতো না মাখন, নুপুতের
 সুর হারিয়ে যায়।

চলেন, সারি সারি মনোহরী, বিতল বাজার বলেন,
 সিঁড়ি, রাজকন্যা আসেন চলেন, টানেন।

চার

পাহার শিল্পী
 তে ইহ কল্যাণ
 পাহার চোখ বোঝে বলে
 "রাজকন্যা, রাজকন্যা!"



রাজকন্যা কি, শোমন? রাজকন্যার চোকে পলক পড়ে না।

ঘুমপাহাড়ের তল, ঘুমপাহাড়ের তল..... রাজকন্যা দেখেন.....
 ফুলপাহাড়ের চেয়ে উচ্চ! ঘুম পাহাড়ের পাহার, ঘুমপনের পাতা
 জোছনায় নেয়ে আছে।

তাই ঘুমপাহাড়ী পাহার পুতুলপুতুলী হাট! ঘুমঘুমোনা
 পাহারের মত অসল পুতুল

পলক তেন জোছন দেখেন পলক নেন। টুকটুকে আঙুল
 চোখে রাজকন্যা দেখেন, যত যে কন্যা, যত রাজকন্যা, ঘুমপাহাড়ের
 পাহার গির্জাঘর! অঙ্গনকে দেখেন, যত যে পুতুল, পরী হয়ে ওড়ে,
 কণা কণা মিস্ ফিস্!

রাজকন্যা কি আর পলক নড়ে? ওদী ভাগী মগী আসে
 আসেন পুতুল, রাজকন্যা রাজকন্যা!

যত কন্যার মল্লুর সুর, "রাজকন্যা রাজকন্যা!"

রাজকন্যা?

খতমত!

ফিরে

চোকে চান যেই,

দু' বোন তো,

নেই!

ভোর!

—তা'পর?

কোয়ে রাজকন্যা জোছন, বল'মন্' রোদ!

কিনের চাঁদের তপস, মাগির তোলায় পুতুল, মাগিকের
 শোলায় পুতুল।

অশ্রু ফেরা!

নিশ্চয় হাত!

রাজকন্যা বেমতো ঘুমো! অসল চাঁদের তপস!

ঘুমের করুণা!

পাহারা বলে, "রাজকন্যা, কিনের তোলা যাই, পুতুল হয়ে
 নেই। চাঁদের তপসের বাসী, ঘুম দিগে আসি!"

কন্যা বলে, "রাজকন্যা শেখতপস্বী থাক, আস তো না, আমরা
 চাঁদের হাসি, দিন হয়ে যাবে, ঘুমের মাগি পাহার সায়ে আসি 'ভাই!'"

ঘুমো মিলন,

রাজকন্যা জোছন,

"পুতুলনা কি চাঁদের পরী?

মেয়েরা কি চাঁদের জোছনা?"

রাজকন্যা জোছন।

মেয়েরা পাহারী গান করে বলে "ভাই তো!"

মাগির পাহারী বাসায় ফিরে বলে, "ভাই তো রাজকন্যা!"

শুভেচ্ছা

আমার ছোট বংশুদা,

শরৎ ভোরে শ্বেতা নাত মন, মনের প্রীতি

শরৎ অর্থে সাংগে দিল্লার সকল জনের গীতি

রূপকথায় গল্পে ছড়ায় গান গোরোতন মারি

আমার তোমার সকলেরই প্রশনা হন তাঁরা

প্রশ্না করে এসো সবাই তাঁদের কথাই শুন।

পুজোর ছুটির দিনগুলি ভাই অর্মান করেই গুণি।

—মৌমাছি



সাঁও জীব

শ্রীমূর্খিমল রস

(হাস্য কবিতা)

বাণীসবু বেজায় বেজায় চলিল ডেকে চাকরে—
 "যখন যখন জমল তখন তাকে আঁকিস? হাঁ ক'রে?
 মিলে যাও হেঁরা মৌচাকানা দেবেত নাঁর নুচোয়ে
 বাড়াবাড়ি করান তবু তাড়িয়ে দেব ছুচোকে।
 পাচা যেন বাজপুতুর, বাদুশাহী চাল বড় হয়,
 ইচ্ছামত কাঁচ করান কেবল নিজেই গরজে?
 শূণ্য ঘরে মরবে ঘাবি, এ হচ্ছাড়া বে আড়া—
 ফেনি সরাই ফেনি ঘাটার কুঁহের মতন চেঁচায়া।
 গরুর ঘোষায় ঘোষা থাকে, হাত দিসনা বাড়তে—
 হাত সরায়ে উঠে কেন জল দিসনা গাড়তে?
 আরও উপর ফাট গরোজ, পারিস না তা সারাহে?
 হেরে মত হুই ফল গাড় কে আড় এই পাড়াহে?
 অগোচরে ভাঁকি গাওয়ান, গুড়ছে নাকি নজরে?
 চুটি করে গরুর উপর চড় লাগাবো সজরে।
 যখন যখন বুড়ার মজা, তখনার নামটি বাবাজী,
 কান বগরে হাড়া না হুই, সমুখ থেকে যা পাড়ী।
 বাসন মজা বাগড় বাগড়, একটা মাজা বাজারে,
 দুইটি ফেল বায়া শূণ্য, এমামবুত সাজা বে,
 এই কালেতেই দিন কেটে যায়। চলল ফাঁকি, চালানিক,
 দিন কাটল তাড়া মরিকায় শূণ্যেই পাহা না, কালা কিত
 আকালকাল আকাল, আমি মলোঁজলাস দুপরে,
 —আমি হাড়ে আমি, কুঁড়ির মাঝে আড় হাড়ে উপরে।
 আকাল না কিম, লক্ষ্যকড়া, শূণ্যলি না তা কুঁড়হে?
 বল, বরদা কি জবাব দিল, তাকস কেন নীচুতে?
 বল কেন টিক পাড়ল নাকি, তাজল নাকি এলার—
 স্বপ্নে হুইল বরদা বাটা, হুইরে হুই কে গারো?
 বাহু মটু মরতি বরদা বরদা চাকর হারিকী,
 "সব করোই এই জীবন।" তখন কখনো পাড়ানি।
 আমেরা কল হাস নুগীর মতন কোরো প্রাণী না—
 মানুষ হলে কেমন করে তিম পাড়ুর, জীন না।"



কৃষ্ণদয়াল রস

নীতি-কাহিনী

কল, সাহসে পদ বিদেশ থেকে—
 "বয়সার-চিহ্ন, বিদেশ ভাড়াই দেখা—
 অবাধ, বন্দু চিঠিবারি খুলে দেখা—
 অমর কুঁটিল হাসির মুটিয়া দেখা।
 শূণ্য, লেখা হাস—বন্দু, খোলাই প্রাণী।
 আমি জানো আমি—ইতি।"

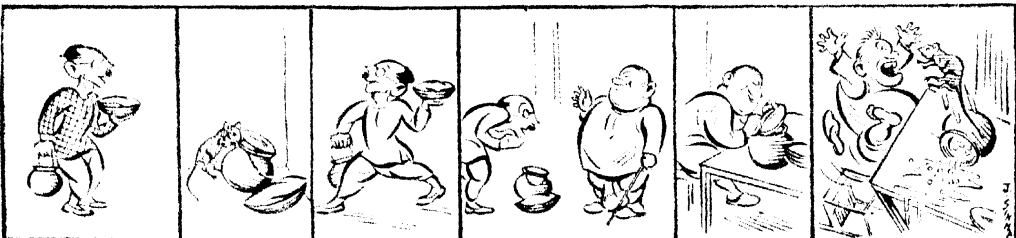
এই তো বরদা!—এই লীল অকারণ
 তবু মাশুলে সেই চিঠি হুই বিহে?
 "জীব প্রতিশোধ,"—হুইল বন্দু মনে,
 "শুটে শাসি—নীতি এই পুঁথিবিহে?"
 উদ্দেশ্য বলে, "হুই, হুই, হুই খল,
 এই জীব প্রতিশোধ।"

হুইল এক সাতার বরদা পুঁথি—
 এতবার শূণ্য, আশনার মল হুইল—
 সেটীন্দর সেই দুপরেই, বন্দু
 বরদা মলোঁজলাস পুঁথিইল সেই
 উল্লসে উল্লসে, হুইল হুইল হুইল।
 মাশুলে কল হুইল হুইল।

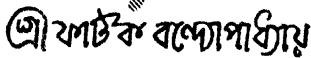
আকালের বিশাল, উল্লসে হুইল হুইল—
 উল্লসে লালসার কল হুইল হুইল হুইল।
 বন্দু জাবল, লালসার উপর হুইল।
 যা লালসে হুইল, হুইল হুইল হুইল।
 নিজে লালসার, হুইল হুইল হুইল হুইল।
 হুইল, হুইল হুইল হুইল।

এই কল, "আমি"—কলোঁজলাস হুইল হুইল—
 হুইল চিঠি হুইল হুইল হুইল হুইল।
 কুঁড়িল "বন্দু, হুইল হুইল হুইল হুইল।
 হুইল হুইল হুইল হুইল হুইল হুইল।
 অবাধ, বন্দু হুইল হুইল হুইল হুইল।
 হুইল হুইল হুইল হুইল হুইল।

পুঁথির হুই—শাসন। জ্যোতিষ সিংহ



হুই বিনে—এনে ভাঁড়ের রাখসা—সকালে চলে—বড়বান্দা, সম্মশনে। দেখি কিঞ্চৎ চোখে—ওরে বাব্বা!



পূজোর সওয়া

[illegible]

কিশোরের ব্যথা — শ্রীসুবোধ রায়

শব্দে শব্দে, ধরন মতো
 সুখীকো ফোয়ার বাঁসি,
 জগৎকে দুখনে মার্চিয়ে দিলে
 বোঝা আনোরে বাঁসি।
 সেও সুখেরে মূল্য দিলেন
 গাইতে যে চাই গানে,
 ছিলোও তোমার জীবনের কালে
 নদীর কলহে ন
 কিন্তু মা ছো, - গেরেতে গিয়ে
 ব্যস্ততা পানির না যে,
 তবে আনন্দে আচ্ছাদন দিয়ে
 স্বপ্নে বাফাই বাজে।
 ব্যতী করি - কবিতা আমার
 সুখ যে মার্চি ফোটে।
 সকলো বাঁসি চেয়েছে তোমার
 অশ্রু, হায়ে কুটে!
 অন্যদের, কোণে কুণে,
 কত মানুষের থোকা
 মারফো যে হাতা দিনে দিনে
 যায় কি লেখা-জোখা
 মানুষের কোলে মানুষো যে না,
 তারা পথেরে ধায়ে,

একে কেউ ভাল বসবাসের
 নিয়োগ না দেবে তাইতো;
 কিনা সেখানে আসবে মনে
 বড় মাসের ছেলে
 জবাবেরে দেবে চলে
 অনেক রাসের সেকৌ!
 কখনও মনে, কখনোনা
 সে সব মাসের মুখ
 হাতে কে না এত সাধের দিনে
 কখনো তেমন লাগে।
 সে সব মাসের মধ্যে বড়
 জগৎকে কি আর হাসি?
 শব্দ আসে তাদের তার
 বাজবে কি বাঁশী?
 তাই তো কেবল ভাবি—“কোন
 এমন নিয়ম হাসি।
 কেউ বা পথে মরে, কেউ বা
 ঘোড়ার চড়ে মার!
 শাবার ছড়ায় কেউবা, কেহ
 খেয়েই নাহি পার।
 লগেখীর পানে খনীরা কেউ
 ফিরে নাহি চায়।”

গল্পের চৈয় অঙ্কুর

আ গভীর কুমার দিত

ক্রীড়নী-গল্প

অনেক দিন প্রায় তিনশ বছর আগেকার কথা। ভিন্সেন্সিসও বলে একটি সাত বছরের ছেলেকে থেকে তার বাবা বললেন, দেখে বাবা, তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারি, সে সাপাতি আমার নৈই। বাসিয়ে খাওয়াতেও পারব না। আর এখন ও দিবা বড় হয়েছে, এইবার তুমি তোমার পথ দেখ। সংপথে থেকে তাহলে ঈশ্বর আর মানুষ দু'জনেই দয়া পাবে।

এই উপদেশ আর অল্প গুনিমিতর ঢাকা দিয়ে তিনি ছেলের সিনে বাসনা দেখিয়ে দিলেন।

ইতালীর যে প্রচলিত গুদের বাড়ী, তার কাছাকাছি শহর হাল ফোরেন্স। ভিন্সেন্সিসও আর কি বলে সে গুটি গুটি কপড় জামার গাউজলটি বগলে করে শহরেই এল। বয়স কম, লেখাপড়া আরও কম। কিন্তু বাসিন্দারি ছেলটির ভালই ছিল, সে শহর এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল পয়সা বোজগারের কোন ফিকির করা যায় কি না।

তখন মাজিক লন্ডন সবে বেরিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে একটি বোকানের সামনে এই রকম লন্ডন সাজানো রয়েছে দেখে একটা মতলবে কাঁ করে ওর মাথায় খেল গেল। এ জিনিষ এখনও নতুন, গ্রামে গ্রামে যদি এর ছবি দেখানো যায় ত দ, পয়সা হতে না। সে বোকানদারকে গিয়ে বলল, এক করে এতে ছবি দেখাতে হয় আমার বুকের দাও।

বোকানদার ভাল করে বুকের দেয়ার পর সে পকেট থেকে সমস্ত টাকা পয়সা তার করে ওর সামনে ধরে বলল, এরা কত দাম জারি না, কিন্তু এতে কি হবে?

বোকানদা হেসে বলল, গুদর ত হয়েই না, ওর দশগুণ টাকাতও হয়ে না।

ভিন্সেন্সিসও বুঝে গেল। তার মতলব থেকে একানী আগেই শূন্যেছিল, তাই দিয়ে বাবার সমস্ত ওর চোখ জলজল করছে দেখে বোকানদার সর হাল, সে বললে, কখনও তুমি পারবে না; তা এক কাজ করো না কেন, তুমি ভাড়া নিয়ে যাও। তোমাকে দেখে সব ছেলে বলেই মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করে চেড়ে দিত পারি। এ ছবি দেখিয়ে যা পয়সা তুমি পাবে তার অর্ধেক তুমি প্রতি শনিবার এসে আমারে বুকের দিয়ে যেও, সেইটাই হবে আমার ভাড়া।

ওর মনে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ঘরটি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

* * *

ভিন্সেন্সিসও সেই লন্ডন দিয়ে গ্রামে গ্রামে খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিন দেখিয়েই বুঝতে পারল বোকানদার দেখবার যতটা চাও, পয়সা দেবার বেলায় তার কিছুই নৈই। এক সংগ্রহ পরে যা টাকা ও পেলে তা নিয়ে বোকানদার কাছে গিয়েই এর কাজ করে হাল। এবার পরে দিয়ে যা বটিল, তা থেকে এক বেলা খেতেও ওর কুলোয় না।

এমনি করে আরও দু'দিন সংগ্রহ ও ঘুরে বেড়ান। অতঃপর আরো প্রায় সাতটি ঘরটি হলে গেল তলস। তাছাড়া এমন করে না খেয়ে আর কদিন পারবে। শেষে ও সিদ্ধ করল যে, গ্রামে না ঘুরে শহরের ঘুরবে, শহরের লোকের পয়সার বেশী সম্ভব বেশী দা পয়সা হবার পারে।

কিন্তু হয়, হার। বোকানদার রাস্তায় রাস্তায় সাবাদান ধরে ঘুরেও কোন সাবিলে হাল না, সংগ্রহের শেষে দেখলে আগের হারও চেয়ে তার আনা মত বেশী পেতেছে।

তব, সে হাল ছাড়ল না। শীঘ্রই বোকানদারের পকেট না খোলেও সিনের পর দিন একটা করতে লাগল। অবশেষে একদিন ওর মনেই জন্ম হাল। সৌন্দর্য যার খাও, ও শহরের একটা মোড়ে বসে ভিজছে আর শীঘ্রই এক টের করে কাঁপে—এমন একজন লোকও সকাল থেকে পয়সার ছবি দেখে দু'টা পয়সা হতে দেয়। একবারে সমস্ত সমস্ত একটি হুটোমাত্র সেই পথ দিয়ে

থেকে দেখে ও প্রায় কান-কান হয়ে গেল তাকে বললে, একবার, একটা দাঁড়িয়ে আমার লন্ডনের ছবি দেখে বান না। অসহ্য পট্ট মিনা, সুখের ছবি আছে বিস্তর।

কতলোক ওর মুখের দিকে চেয়ে একটা মতো হাসলেন, বললেন, সুখের ছবি দেখবার বোকাম আছে চলে দেখ।

ওর ত মহা উৎসাহ। ছবি দেখাতে দেখতে সৌরভগ জার সুখের সম্মখে, ও বোকানদার বড় থেকে যা শনেছে, একটা বক্তৃতায় দিয়ে দিয়ে উল্লেখকটি স্বপ্ন মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। সাত বছরের ছেলের বুদ্ধিমত্তাও মুখের দিকে চেয়ে তিনি কী দেখলেন বুঝে তিনিই জানেন, বললেন থাকা তুমি এর সব আরও ভাল করে শিখো চাও।

ভিন্সেন্সিসও সাগ্রহে জবাব দিলে তাহা। এমনি যদি তোমাকে এই সব শেখাবার প্রসঙ্গ করে দিই, তুমি যত্নে আমার সাপাতি পাকলে আমার আফ।

আশায়, উজ্জ্বল হয়ে ওর চোখ জ্বলল উল্লাসে সে বলল—থাকবে।

এমনি থেকে ভিন্সেন্সিসও সেই বড় বোকানদার আশ্রয় পেলে। তিনি যে জগতের তিনিই শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানিক প্রাণিন্দিত্যে হাল করে সমস্তই যাঁর ব্যবসায় ও আবিষ্কারের সত্য পৃথিবীতে তার বাসিয়ে দিচ্ছিলেন, ভিন্সেন্সিসও হালই প্রথম ঘরে সত্যের এসে বোকানদারের হাতের।

বিশ্ববিশ্ব আর কি। বিজ্ঞান বিজ্ঞানিক ভিন্সেন্সিসও ভিজ্ঞানদার কথা কে না শুনল। আশা বড় বয়স পর্যন্ত তিনি বোকানদারের কাছ থেকে বেশ দিনটি পয়সা বিজ্ঞানের ওর করে কটিয়েছেন। দেশ বিদেশের রাজ্য রাজ্যের পণ্ডিতপ্রমত্তরা হাল সমস্ত দেখিয়ে দিতেবার সন্য হয়েছেন। এমন, সেই মাজিক লন্ডনটি তিনি যেন দেখতেছিলেন কিম্বা বোকানদারের ওর দিচ্ছিলেন—তা ঠিক জানা যায়নি।

ওরুও আমায়'গদা' বলে!



"বাছুর নিয়ে খেলতে আসো—খেলি তাহলেই নিয়ে গিয়েছি না সে হুড়ই টানি নরক শড়ি দিয়ে।"



"আজ্ঞা যেটা পারলে পেছি, আমার কাঁকি দিয়ে, খেলার গদা হুড়ি বাধা তাই এসেছি নিয়ে।"
(সোমনের পাড়ার দেখ)



"আমার গদা নিয়ে খেলা—সাহস বটে বলি, হাটিকা টানে জিনিষ নিয়ে বদমেজাজী ভলি।"

ব
ল
ত
ক
কি
আ
ছে
?



(পদ্মী-কবিতা)

খোকন যাবে বাণিজ্যেতে

বলে আলী মিয়া

খোকন বাড়ী কলম ডাক্তার গায়
শালিক ঘুম ডাকে সেখায় সবুজ পাতার ছায়।
সেইখানেতে ফোটে শালুক পদ্ম বিলের জলে
পানকোড়ি ডুব ভাঙিয়া সত্যার দিলে চলে;
সেই বিলেতে দাম বেঁধেছে কলমী বাজল লতা
সেখায় বসে ডাহুক বকে জানায় মনের কথা।
পাল তুলিয়া ওই গা পানে নৌকা ভেসে যায়
মাঝরা সব বৈঠা ফেলে সারির গান গায়—
সে গান শুনি খোকন মগ্ন রইতে নারে ঘরে
বেরিয়ে আসে আগড় খুলি পদ্ম-বিলের চরে।
চেয়ে থাকে চোখ তুলে সে দূরের সীমানাঃ
যখন বড় হবে খোকন যাবে সে ওই গায়,—
খোকন যাবে বাণিজ্যেতে দশখান যাবে না
লোকজন সে কত যাবে নাই তার ঠিকানা।
ময়নমতী-কন্যা আছে কোন বা অচিন দেশে
নৌকা নিয়ে ঘুরে ফিরে সেখায় যাবে শেষে।
সোণার কাঠি ছুঁইয়ে তার ভাঙিয়ে দেবে ঘুম—
তাহারে নিয়া ঘরেতে আসি লাগিয়ে দেবে ঘুম।
খোকন থাকে কলম ডাক্তার গায়

ফুলের বনে প্রজাপতির সাথে সে বেড়ায়
তালিপাতার আবডালেতে চাঁপে ওঠে রাতে
বাঁশের বনের দীঘল ছায়া পড়ে আঁধারেতে।
জোনাকীরা হাঁসের মত জ্বলে কেবল জ্বলে
ঘুম-পরীরা দল বাঁধিয়া নাচে গাছের তলে,—
খোকন গায়ে কাঁড়কুড় দেয় যে স্বপন বাড়ি
ঘুমের ঘোর হলে সে তাই আঁধারে সেম ডুড়ি।
পাখীরায়ে চড়ে খোকন মায়ার দেশে যায়
পিচ্চা হতে দাঁত দানা ধরতে পিচ্চা যায়।
বীর সিপাহী খোকন দাঁড়ায় খলে তরেয়ালা
বাঁ হাতে তার ঝুলকে ওঠে মকর-মুখী ঢাল।
সড়কী হাতে বাগিয়ে ধরে খোকন যায় তেড়ে
পালিয়ে বাটে ধৈর্যেরা সব—পালার সে দেশ ছেড়ে।
ঘোড়ায় চড়ে হাওয়ার বেগে এগিয়ে আরো যায়
সোণার গাছে মাগিক ফলে দেখতে সে দেশ পায়।
হাঁসের ফল জ্বলে সেখায় মৃত্যু পাহাড় ঘিরে
কেঁচড় ভরে নিয়ে খোকা আসবে দেশে ফিরে।
মা দেখে হবে হবেন খুঁসি—চুমো খাবেন মুখে
গর্ব ভরে খোকন বসে হাসবে মনের সুখে।

ছবি ও কবিতা—শিল্পী শৈল চক্রবর্তী



“চালা কাঠে বাঁধবে দড়ি—দিবা গরু হবে!
এখান ওখান টানবে তাকে—মুখ বজ্জে সব সবে।”

“কাঠটা নিয়ে গেলি কোথায়?” মা বলেন হেঁকে—
দৌড়ে এসে দড়ি থেকে ছিনিয়ে নিলেন কেঁকে।

দড়ি দিয়ে বাঁধবে কাকে? কোথায় গরু ধীরে?
নিজের কোমর থাকতে কেন মিথো খাঁসি মীরে!

নিজাওহা

নিজস্বকল্প সেনা

[ইতিহাসের গল্প]

অমর সিংহ ভারতগোবিন্দ মহাবীর প্রতাপ সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন মিবাবের সিংহাসনে বসলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল। অমর অনেক দিন পিতার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম রাজ্যের শাসন ও অন্যান্য সে সব দাবত্ব করেন, তা বেশ প্রশংসার ভোগাই হয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি পিতার আদেশেই চলছিলেন বলে মনে হয়। সময়ে সেই আদেশের ছাপ যেই মন থেকে মুছে গেল, অমর তাঁর পতন আরম্ভ হলো। না রইল তাঁর রাজকাজে মন, না রইল কোনো কর্তব্যজান; অত্যন্ত হালকা সুখের মোতে তঁর মন গা জাসিয়ে দিলেন।

মিবাব—প্রতাপ সিংহের সাধের জন্মভূমি—মিবাবের অমরের মুখের দিকে কাঁচের নরনে চেয়ে রইল। ও বীরভূমি একদিন দিল্লীর শক্তিমান বাদশার হাতে চলে গিয়েছিল। প্রতাপ উদ্ভার করলেন। কি করে জানো? দুঃখ ও বিপদকে চিরসঙ্গী করে, জীবনভোর যুদ্ধে বলবীর্য স্বাধীনতা সব ক্ষয় করে, বড় দরদী আত্মীয়স্বজন আর অনুগত সর্দার-সামন্তদের জীবন বিসর্জন দিয়ে।

কিন্তু এত করেও কি পেয়েছিলেন সবটা ফিরিয়ে আনতে? না, তা পাবেন নি। প্রতাপের কল্পনার স্বপ্ন, পূর্বপুরুষদের পুণ্যমূর্তির পবিত্র ভাব চিত্তের তখনো মোগল বাদশার হাতে।

প্রতাপের মনে শান্তি ছিল না। মরণকালে তাঁর ঐ অশান্তি চোখে ওঠে। তখন তিনি পেসোলা-সরায়ের হাটের মতুশখান শূয়ে। ওখানে খান-কতক কুটীর প্রতাপ নিজেই তাঁর করিয়েছিলেন। রাজ্যপ্রাসাদ থেকে সর্দার-সামন্তদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ওখানে এসে বাস করতেন। কুটীর থেকে কোটা যে তিনি গড়তে পারতেন না, তা নয়; কিন্তু তেমন ইচ্ছাই হয়নি তাঁর। সাবেক রাজধানী চিত্তোর যতদিন উদ্ভার না হয়, ততদিন কোনো দরম খোশখোয়ালে ভোগাবলসে মন দেবেন না—এই ছিল তাঁর পণ।

প্রতাপের মৃত্যুকালে তাঁর অশান্তি বৃদ্ধিতে পেরে সর্দারেরা যখন কারণ জানতে চাইলেন, তিনি বললেন, চিত্তোর উদ্ধার হলো না। আর যে হবে, তারও সম্ভাবনা নেই। আমার স্নেহের দলিল অমরের শ্বারা সে কাজ হবে না। সে তার সম্পূর্ণ অনুগত। এত কষ্ট করে, এতদিনের চেষ্টায় যে রাজ্য উদ্ধার করলাম, তাও সে পারবে না দক্ষ্য করতে। দুঃখকষ্ট বাক্যে বলে তা সে জানে না, সে আসেসী—ভোগবিলাসী। এই যে কুটীর তোমরা আজ এখানে দেখছ, দুদিন বামে আর তা পারবে না দেখতে। এখানে জমকলো বাড়ী উঠবে—বিলাসভবন তৈরি হবে। জন্মভূমি দুঃখ ভুলে অমর ভোগবিলাসের দাস হবে। এবং তোমরাও তার সে অকাজের সহায় হবে।

সর্দারেরা প্রতাপকে ভস্মা দিয়ে বললেন, না, তা শেরালের পাট আজির করহেন—এ খবর তাঁর



হবে না। কেন আপনি ভাবলেন? অমরের অমন কুমতি কখনো হতে পারে না। আর হলেও আমরা কখনো তার প্রসার দেব না। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন যে, যতদিন একজন রাজ-পুত্রের দেহও প্রাণ থাকবে, ততদিন জন্মভূমি মিবাবকে তারা শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবেন না।

সর্দারদের সে সব কথা, এখন কথার কথা হয়ে দাঁড়াল। প্রতাপ যা যা অনুমান করেছিলেন, একে একে সবই ফলতে চলল। অমর কুটীর থেকে সত্যি সত্যিই প্রমোদভবন তুললেন। নাম হলো তার,—অমরমহল। এখানে মোসাহেব পারিষদের দল তাঁকে চেপে ধরল, আগাছার মতো। ওরা যে তাঁরই রস-সার শুষে নিয়ে তাঁকে জেরবার করে তুলবে, তা তিনি মনেও করলেন না।

নিশ্চিন্ত মনে ওদের সঙ্গে হাসিগল্পে খেলা-ধুলায়, পানভোজনে দিন কাটাতে থাকলেন। রাজপুত্র জাতির ধর্ম যে অশ্রদ্ধাস্রবের চর্চা, তা তিনি একারকম ভুলেই গেলেন।

হয়তো অমর ভাবছিলেন, জীবনটা তাঁর এমনি করে একটা সুখস্বপনের মতোই কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধল, মিবাবের প্রান্তে মোগলের রণভংকা বেজে উঠল আড়ম্বরের সঙ্গে। প্রতাপ সিংহের মতো প্রবল শত্রু আকবর বাদশার আর কেউ ছিল না। আকবর মিবাবের ঐ সিংহটিকে স্বীকৃত ফেলবার জন্যে চেষ্টার কোনো চেষ্টা করেন নি। এক রকম গোটা ভারতেরই মালিক তিনি। তাঁর চেষ্টা তো বড় চারিটখানি কথা নয়। তাতেও পারেন নি তাঁকে আটকাতে। উল্টে তিনিই তাঁর হাত থেকে মিবাব কেড়ে নিয়ে ওঁকে অপদম্ব্য করেছিলেন।

এহেন প্রতাপের বংশধরদের ওপর যে আকবরের বংশধরদের আক্রোশ থাকবে, আশ্চর্য কি? আকবর তখন বেচে নেই। পুত্র জাহাঙ্গীর বসেছেন বাদশাহী তক্তে। মিবাবের রাণা অমর সিংহ সিংহবিক্রম তুলে

অগাচর ছিল না নিশ্চয়ই। তিনি ব্যকৌছিলেন, এই হচ্ছে উত্তম সুযোগ। রাণা প্রতাপের দলবল এখানেই ধরে মোগলদের যে হারান বরোতে, এনারে হার শোধ ফুটিয়ে হলে সুদ-দ্রাসলো। হোততোচ কথা এসে মিবাবের গণচাবাস ঘা।

অমর চমকে পারিষদের মুখের দিকে চাইলেন, ব্যাপার কি?

দলের মুরাশি ভস্মা দিলেন, কিছু নয়। উতলা হবার কারণ নেই। মোহ করি, কোনো উপ উপলক্ষে বাদশাহী সেনারা মিছিল করে বেরিয়েছে ও তারই ফাঁকা আওয়াজ।

কিন্তু দূত খবর নিয়ে এসে বলল, আওয়াজটা মিথ্যা নয়। বাদশা জাহাঙ্গীর অসংখ্য সৈন্য নিয়ে মিবাব আক্রমণ করতে আসছেন।

মুরাশি বললেন, তা হলেই বা কাত হয়ে কি লাভ? যা কতে হবে, ছোটেচিন্তেই করা ভাল। চট করে বাধা দিতে যাওয়া বৃশ্মমানের কাজ হবে না।

কথাটা যদিও অমরের মনের মতোই বটে, তবু, বাধা না দেওয়াটা প্রতাপ সিংহের পুত্রের উপযুক্ত কাজ হবে কি না—অমর গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন।

মুরাশি বললেন, ওরা কতদিন ধরে প্রস্তুত হইছিল, কে জানে। আর আমরা একেবারেই অপ্রস্তুত। এমন অবস্থায় যুদ্ধ করতে গেলে হার নিশ্চিত।—মিছিমিছি কতকগুলি জীবননাশ, আর অধের প্রাশ্ম।

রাণা বললেন, তা হলে কি যুদ্ধ না করাই তোমরা আমাকে হার মানতে বলছ?

মুরাশি বললেন, তা কেন বলব? রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র যে কাপুরুষ নয়, তা আমরা জানি।

চিন্তিতভাবে রাণা বললেন, তা হলে কী কর যায়? যুদ্ধও করব না, আবার নতি-স্বীকারেও রাজি হবে না।—

মুরাশি বললেন, সখি! সখি ছাড়া আর কিছুই করার নেই রাণা।

ভূম, কুচকে রাণা বললেন, তাতে যে ওরা রাজি হবে, তা কে বললে? যদি না-হয় রাজি?

মুরাশি মুরাশি-আনা চালে বললেন, আলবৎ হবে। রাণা প্রতাপের প্রতাপে মোগলদের কতি হয়েছে অসম্ভব, হরমণিও কম হয়নি। বহুবীর বহু বংশে আকবর তাই তাঁকে ধ্বংস করার চেষ্টা



বেরছেন: কিন্তু পেরে ওঠেন নি। তাঁর পত্রকে আকবরের পত্র যদি বিনা যত্নেই হাত করতে পারেন, সে কি তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা?

রাণা ভাবতে থাকেন, প্রস্তাব করবেন, কি করবেন না; এবং করলে কি কি সর্তে করা যায়।

রাণার অবস্থা দেখে তাঁর আত্মীয়স্বজন, সেনা-সামন্তরা সবাই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা তোমরা মনে করো না। অনেক দিন থেকেই অনেক মনে মনে খুব অশোয়াসিত বোধ করছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। তাঁরা দেখছিলেন পারস্যের দল তাঁকে চাক্ষুষ দৃষ্টাই ঘিরে বসে আছে। তাঁদের কথাতাই তিনি ওঠেন বসেন, যোৱেন ফেরেন—এদের অমতে তাঁর কিছুই করার উপায় নেই। এই প্রকথায় গাণ্ডী কেটে লম্বাকৈ ধরা এবং তাঁকে সুপুণ্ডে সবার মতো শান্ত কাজ আর কিছুই নেই।

কিন্তু আজ রাণার সর্বনাশের আর বড় বাকী নেই দেখে কতকগুলি সর্দার আর পারলেন না স্থির থাকতে। ধরলেন গিয়ে চন্দাবৎ সর্দারকে। তাঁদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবার চেয়ে সাহসী এবং বিচক্ষণ। তাঁরা যে যোগ্য ব্যক্তিই স্বরণ নিয়েছিলেন, তার সন্দেহ নেই। সর্দার তাদের সবাইকে নিয়ে তখন হাজির হলেন গিয়ে অমর-মহলে—যেখানে পারস্যবদগণ অমরকে নিয়ে আসার প্রমাণে।

চন্দাবৎ সর্দার মজলিসের সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে বললেন, মহারাণা, এ কী দুর্ভাগ্য আপনাকে! প্রথম শত্রু এসে রাজ্যে হানা দিয়েছে; এখনো আপনার হাঙ্গামেই! চাঁটকাবাদের চাঁটকাবাণীতে ভুলে বসে আছেন! এমন করে আর কতক্ষণ চলবে? রাজা যাবে, রাজপুত্রের মা-বোনরা বৈজ্ঞব্য হবে, দেশের ও দেশের দুঃখ-দুর্ভাগ্য হাত থাকবে না। পারবেন এসব চোখে দেখে বরাদ্দ করতে? আপনি না মহাবীর প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র! যদি না পারলেন বুঝে-পুঝে সর্দার কীভাবে, জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে, কেন তবে এ পিঠা বীর কল্লের জন্মগ্রহণ করছিলেন? দিক—শত ধিক্ আপনাকে!

সর্দারের উত্তেজনাশ্রু দিল্লার সভায় যেন ফেটে পড়তে লাগল: কিন্তু আশ্চর্য এই, রাণা ও রাজপারিসরবর্গ সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁদের কাণে যে একটি কথাও প্রবেশ করেছে, ভাবে তা মনে হলো না। তাঁরা নিজেদের ভাবে যেমন বিভোর হয়েছিলেন, তেমনই বিভোর হয়েই রয়েলেন।

ক্রোধে ও ঘৃণায় সর্দারের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। তিনি এই অসাড় অচেতন রাজ-মজলিসকে চোঁড়িয়ে তোলবার জন্যে একটা অশ্রুত কাণ্ড করে বসলেন। সভায়ের একদিকে এক-

খানি মস্তবড় আরনা ছিল দাঁড় করানো। ওটি ঘরের শোভা ও সৌভ্যের একটি প্রধান আসবাব; কাজেই খুব দামীও। সর্দার মেজের ওপর থেকে একখানি পাথর তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলো তাঁর গায়ে। উত্তরাত শব্দে আরনাখানি ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মজলিসের চটকা ভাঙতে আর দেয়ী হলো না এক মুহূর্তে। তখন মজলিস-ওয়ালাদের মনের ও মুখের ভাব যে কি হয়েছে, সে আর বলবার নয়।

কিন্তু কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরবার আগেই সর্দার ছুটে গেলেন অমরসিংহের কাছে। তাঁকে ধরে নিয়ে সিংহাসন থেকে নামলেন। সংগের সর্দারদের ডেকে বসলেন, আসুন, সবাই আমার অশ্রুশব্দ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—শত্রুসেনার সম্মুখীন হই। প্রতাপসিংহের পত্রকে মহাকলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করি। এই না বলে রাণাকে ধরে রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

রাণা অমরকে যে এই রকম অপলব্ধ হতে হবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অধীন, স্নেহের পাত্র যে সর্দার, সেই বরছে তাঁর ওপর জ্বলন্ত-জ্বরদীপ্ত! সেও আবার আর কোথাও নয়, তাঁরই অন্তরঙ্গ পারিসরবর্গের সম্মুখে! ক্রোধে উমত্ত হয়ে মুখে বা এল, রাণা সর্দারকে তাই বলতে লাগলেন—অসভ্য, গোঁয়ার, রাজদ্রোহী—আরো কত কি।

কিন্তু চন্দাবৎ সর্দারের প্রাণে তখন আনন্দের বাণ ডেকেছে। রাণাকে তিনি কাপুরুষের দল থেকে—দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে পৌরুষের ও স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছেন; এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ আর কিছু আছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। এখন যদি রাণা তাঁকে কেটেও ফেলেন টুকরো টুকরো করে, তাতেও তাঁর দুঃখ নেই। উৎসাহ মনে হলো যেন আশীর্বাদ—স্বর্গের পক্ষপাতি।

হঠাৎ এক আশ্চর্য পরিবর্তন! কিছুক্ষণ বন্দীর মতো আনিচ্ছায় পথ চলবার পর রাণার মনের ভাব গেল একদম বদলে। তাঁর চেতনা ফিরে এল। চন্দাবৎ সর্দারের ওপর যে রাণা ও বিরাজিত জন্মেছিল, তা দূর হয়ে, মনে তাঁর কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হয়ে উঠল। মধুর স্মরণ কণ্ঠে তিনি সর্দারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তুমিই আমার পিতার প্রকৃত বন্ধু, আমার সত্যিকারের হিতৈষী বাগদার। নইলে কেন জোর করে, আমার ঘোর নিষেধন সহ্য করেও, তুমি আমার সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে আসবে!

রাণার কথা শুনে আর তাঁর পরিবর্তন দেখে সংগের সর্দার সামন্তরা উৎসাহ-উল্লাসিনী অধীর হয়ে উঠল। আকাশ ফাটতে রব তুলছে, জয়!

রাণা অমরসিংহের জয়! দিকে দিকে পাহাড়ে বনে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজল। বরষে তুল্য নিখর মেঘের দেখতে দেখতে সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। রাজপুত্র যোগেশ্বর নানাদিক থেকে জল-ক্রোড়ের মতো পৌরিয়ে এসে রাণার দলে যোগ দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যেমন হলো বিশাল, তেমন দুর্দম। অন্যপক্ষেও ঘটা বেশী বই কম ছিল না, বাদশা অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও অশ্রুশব্দ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ দেবীর মাঠে যে যুদ্ধ বাগল, সে অতি ভয়াবহ। কিন্তু রাজপুত্র সেনাদলের প্রচণ্ড বেগ যোগলরা রোপ করতে পারলে না—চিহ্নভয় হয়ে তারা পালাতে বাধ্য হলো। বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে রাণা অমরসিংহ মহা উল্লাসে রাজধানী উল্লসপুর্বে ফিরে গেলেন।



ভেঁজে গেলো!



জামা-জুতো, শাড়ি পরে
পাচিট ই'দুর সেজেগেজে—
খাবার জিনিষ সাজিয়ে নিয়ে,
বসলো খেতে চন্দ্র বড়ো।
সহসা এক ঝড়াল মশাই
মা'ও বলে দেয় সেখায় লাফ
আতকে উঠে ই'দুর যত,
দৌড়ে পালায় "বাপরে বাপু!"

ছড়া ও ছবি
খ্রীস্টমাস দে

টিপ্ দিয়ে যা

(ছড়া)

বীণা দেবী

'চরকাকাটা বড়ি' দেখি বসে' চাঁদের মাঝে
কদমতলার বাসন্ত বড়ই স্তোতা কাটার কাজে।
ধলা গাইয়ের খবল হুমে সাত-সাগরের ঢেউ,
কে দেখেছে প্রথম এসব—জানি না তো কেউ?
শুধুই জানি—সুতোটি না কাটলে চাঁদের মা
জোয়ার-ভাটা, কাপড়-জামা কিছই হবে না!
শুধুই জানি চাঁদামা টিপ্ দিয়ে যায়।
ভাইতো ডাকি সবাই মিলে আর চাঁদ আর।
চাঁদের টিপের শোভা শুধুই গৌরব শিবের তালে,
ভাই কি সবাই চান্ মা তোরা—চাঁদ-কপালে ছেলে?
ভাই কি হো না ডাকিস্ জেগে—আর চাঁদ আর,
দাঁড়ি কপালে মোর টিপ্ দিয়ে যান—?

ভরসা কোন নাই

সুবিনয় রায় চৌধুরী

দেশ জুড়ে আজ চিনির আকাল, সবাই বলে হা
বাজার ঘুরে একপো চিনি মেলাই হ'লে দায়।
ছোট খোকাবাবু বসে শূকনো রুটি হাতে,
ভাঙে বসে, কেমন করে মাথায় চিনি তাত্তে।
মৌমাছি এক কানে কানে বলতেছে গদগদনি,
"তেমার মুখে কেন এত ভাবনা বল শূনি।"
খোকা বলে, "কেমন করে শূকনো রুটি খাই,
বাজারেতে খুঁজে খুঁজে চিনিই মেলে নাই।"
মৌমাছি তায় বলল হেসে, "ভাবনা কেন করো
যাচ্ছি আমি, তোমার তরে করব মধু জড়ো।"
সারাটা দিন খোকাবাবু শূকনো মধুর আশে,
সন্ধ্যাবেলা মৌমাছিকে খোঁজে ঘরের পাশে।
দাদাটি তার দেখতে পেয়ে সুধায় "ওরে খোকা!
সন্ধ্যাবেলা ঘরের পাশে কি খুঁজিস্ বোকা?"
খোকা বলে, "আজ সকালে মৌমাছি ভাই,
আমার তরে মধু জড়ো করল শূকন, তাই
খুঁজি আমি মৌমাছিরে, সুধাব তায় ডেকে,
কত মধু জমাল সে অজকে সকাল থেকে।"
দাদা হেসে বলে, "ওরে এ তো খুবই সোজা,
হিসের করে দেখলে পরে সহজে যায় বোকা।
বই এ লেখে, একপো মধু জমাতো তার চাকে,
বারো বছর ফুলে ফুলে ঘরতে হবে তাকে।"
আজ দুপুরে এক-আধ ফোটা জমেও যদি থাকে,
দুইটি মাস আরো তবু খাটতে হবে তাকে;
তবে তোমার রুটিতে তাই মাথায় খেতে পাবে,
তারপরে পথ চেয়ে আবার দুইটি মাস যাবে।"
শূনে খোকা হতাশ হয়ে বলতেছে, "দূর ছাই!
চিনি ছেড়ে মধু খাবার ভরসা কোন নাই।"

* হিসাব করে দেখা গেছে, এক পাউণ্ড
(প্রায় আধ সের) মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌমাছির
২৫ বছর সময় লাগবে।



ছোট ছেলেমেয়েদের

পূজার ছুটিতে

অভিনয়ের জন্য

নাটক

শ্রীমদলাল বসু,র

আঠখানি গঠন

ও একরঙা হাব

এক টাকা

টাকডুমাডুম



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় ছুটির আগেই পাওয়া যাবে



বাংলা থিয়েটারের একটি বহুয়

(১৩৫০ ডান্ড ইয়ুথ
১৩৫১ ডান্ড)

- ত্রিাশচিন্ৰনাথ সেনগুপ্ত

এ বছরে বাংলা থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা প্রায়ও উন্নত। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, স্বল্প-সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত রোজগারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, হয়ত বা কর্মবাস্তবতার জন্য চিত্তবিনোদনের আগ্রহবৃদ্ধিও থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন কোন থিয়েটার স্বল্পমাত্র হলেও, কোন কোন থিয়েটার ভবিষ্যতের জন্য কিছু-কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছেও সমর্থ হয়েছে। এমন থিয়েটারও আছে যেখানে একাধিক অভিনেতা মাসিক হাজার হাজার টাকা উপার্জন করছেন—থিয়েটারের কর্মপক্ষ তাসেরক গল্পগ্রহ বলে মনে করেন না। আবার এই বছরেই শহরের শ্রেষ্ঠ একটি থিয়েটার গৃহ-হারা হয়েছে। সেই থিয়েটারটি 'নাট্যভারতী' নামে পরিচিত ছিল। প্রতি-শীল থিয়েটার বলেই 'নাট্যভারতী' প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। 'নাট্যভারতী'র কর্ম-বাস্তবতা যারা পরিচালনা করতেন থিয়েটারের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অসীম। থিয়েটারকে মানুষ রূপ দেবার কর্মসূচী তাঁদেরকাজে উদ্দেশ্য করেছিল। তারা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শিশির দাশের আর শ্রীযুক্ত সত্যু সেন। দুজনেই পাশ্চাত্য দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশে এসেছেন। দুজনেই চাইছেন এদেশের থিয়েটারকে জাতীয় কল্যাণে নিয়োগ করতে। লৌচ-সংক্রান্ত সোলাসোপের জন্য তাঁদেরকে 'নাট্যভারতী' থেকে দিচ্ছে। সে সময়ে শহরে আর একটা বাড়ি যদি তারা পেতেন, তাহলে তাঁদের কাজে বাধা পড়ত না এবং আশা করা অসম্ভব হোত না যে, এক বছরে তারা থিয়েটারের প্রগতির পরিচয় দিতে পারতেন। 'নাট্যভারতী'র অর্থায়ন সত্যু সেনের প্রভাব এ-বছরের আর্থিকোপ মণ্ড-রূপে চোখে পড়ে। বাড়ির অভাবে বাধা হয়ে শ্রীযুক্ত মল্লিককে আজ নাট্য-জগতের বাইরে থাকতে হয়েছে। আর শ্রীযুক্ত সত্যু সেনও বহুমেঘে যোগ দিয়ে তাঁর সাধনায় বিঘ্নিত হয়েছে।

বায়োস্কেপের প্রতিযোগিতা

'নাট্যভারতী'র বিলুপ্তি নাট্যরসিকদের বাধার বিষয় হয়ে রয়েছে। বাধা বা বাবসায় অসামান্য 'নাট্যভারতী'র বিলুপ্তির কারণ নয়। তার বিলুপ্তির কারণ বায়োস্কেপের সর্বগ্রাসী দাবী। বাড়ির মালিক বায়োস্কেপ প্রদর্শকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতি পেলেন, ভাড়া হিসেবে কোন থিয়েটার সে পরিমাণ টাকা দিতে অসমর্থ। থিয়েটারে সপ্তাহে সাধারণতঃ পঁচটি অভিনয় হয়, কিন্তু বায়োস্কেপ হাউসে সপ্তাহে হয় একুশটি অভিনয়। লোকবৃদ্ধি ও অর্থবৃদ্ধির জন্য বায়োস্কেপের আয় তাই থিয়েটারের আয়ের অনুপাতে অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। যত্মের আগে বায়োস্কেপ-বাড়ির ভাড়া যোগাতে প্রদর্শকদের কাল-খাম হুটে যেতো। আজ তাইই যে কোন ভাড়া দিয়ে বাড়ির পর বাড়ি দখল করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। যদি লীজসংক্রান্ত আইন বলবৎ না থাকতো, তাহলে আজ কলকাতার একটিও থিয়েটারের বাড়ি বায়োস্কেপের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতো না। বায়োস্কেপের এই জোর কিন্তু থিয়েটারের দুর্বলতার দরুণ বৃদ্ধি পাইনি। বায়োস্কেপের মত থিয়েটারও আজ সকল দর্শকদের ঠাঁই দিতে পারেন না। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বাংলাদেশে থিয়েটার আজও বঞ্চিত নয়। বায়োস্কেপ হচ্ছে ধনিকদের বাবসা। লাখপতি রোডপটীরা এ বাবসায় টাকা ঢালছেন। আর বাংলা থিয়েটার গড়ে তুলছেন প্রায় নিঃস্ব স্ব লোক। তাঁদের মাঝে যদি কিছু মনোভা করতে পেরেছেন, তাঁরা শব্দ, শব্দের জোরে, নির্ভার জোরেই তা করেছেন। বায়োস্কেপের নিজস্ব বাড়ি আছে, একটি থিয়েটারেরও তা নেই। তা না থাকবার কারণ এই যে, বাড়ি করবার মতো মূলধন নিয়ে কোন থিয়েটারই বাবসা শব্দ করি নি। যে-কোন বাড়ির মালিক যে-কোন থিয়েটারের বাড়িকে বায়োস্কেপের জন্য ছেড়ে দিতে পারেন। 'নাট্যভারতী'র বাড়ির মালিকও তাই দিয়েছেন। বাকি কতনা থিয়েটার বাড়ির মালিকও যদি তাই করেন, তাহলে বাংলা দেশ থেকে স্থায়ী থিয়েটার লোপ পাবে। তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে থিয়েটারের নিজস্ব বাড়ি। এই কাজের থিয়েটারের যে-সব মালিক অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের উচিত নিজস্ব বাড়ি করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। থিয়েটারের প্রতি প্রাথমিক বাঙালী ধনিকেরও অভাব নাই। তারা যদি থিয়েটারের জন্য বিশেষ করে কয়েকটি বাড়ি করেন,

তাহলে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞ হতে হবে না। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই স্থায়ী থিয়েটার রয়েছে এবং কোন প্রকার সরকারী সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র বাঙালীর, প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার জোরেই টিকে রয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী ধনিকরা যদি থিয়েটারের সহায়তায় এগিয়ে আসেন, তাহলে বায়োস্কেপের অ-বাঙালী ধনিকরা থিয়েটারকে গৃহ-চ্যুত করতে পারবেন না। লিমিটেড কোম্পানী করে বেশী মূলধন সংগ্রহ করে থিয়েটারের বাবসা শব্দ করলে বাংলা থিয়েটার অসম-প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করবার অবসর পাবে।

বছরের জনপ্রিয় নাটক

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' এ বছরে সব চেয়ে বেশী দর্শক আকর্ষণ করেছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন বিহারক ডট্টগাঙ্গী এবং তাকে মস্তোপযোগী করে দিয়েছেন স্বয়ং নাট্যচর্চা শিশিরকুমার। শব্দ তাই নয়, উদ্ভাবন-বায়ের এবং পরবর্তী দুইটি অভিনয়ের প্রাকালে তিনি তাঁর থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকদের চোখা জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রাজ্ঞ ভাষায় তিনটি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিভার সম্পদ তাঁর অনূঢ় পঞ্চ লক বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর হাতে ন্যস্ত করে নাট্য-জগৎ থেকে আশুপাতঃ অবসর গ্রহণ করছেন জানিয়ে তাঁর থিয়েটারের প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি ও সমর্থন যাক্তা করেছেন। সহৃদয় দর্শকরা নাট্যচর্চাকে নিরাশ করেন নি। তাঁর থিয়েটারও করে নি দর্শকদের হতাশ। সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট, সু-অভিনয় দ্বারা 'বিপ্রদাস' দর্শকদেরকে প্রীত করেছে। 'বিপ্রদাস' যে জনসমাগম এবং থিয়েটারের বেরূপ অর্থগম হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

'নাট্যভারতী'র শেষ নিবেদন 'ধাত্রীপান্না'ও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু দর্শক অভিনয় ছাড়ার পরই 'নাট্যভারতী'কে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয় বলে 'ধাত্রীপান্না'র অভিনয়ও বন্ধ হয়ে গার। 'ধাত্রীপান্না' থিয়েটার এই নাটকখানির পুনরাবিনয়ের আয়োজন করছেন। 'ধাত্রীপান্না'র নিষেধ ছিল এই যে, নাটকে কোন অশ্লীল দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় নি, অথবা নাচ-গান দিয়ে নাটকের গতিতে ব্যাহত করা হয়নি। অভিনয়ই যে নাটকের সব চেয়ে বড় বিষয়, তাই যোকাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ছিল লক্ষ্য সোলের পরিকল্পনা।



যে কথাচিত্রখানি ৩৯ সপ্তাহেও অল্পান গৌরবে চলিতেছে!



শৈলজানন্দ

মুদ্রিত: সুবল দাশগুপ্ত

রূপবাণী

প্রভা :

২-৩০, ৭-৩০, ৮-৩০

• ইন্টার টকীজের
বিজয়-বৈজয়ন্তী •

ভূমিকা: ডাহর
ধীরাজ, নরেশ
ফণী, মলিনা
রেণুকা, প্রভা



আসিতেছে

শৈলজানন্দের

অপূর্ব ভাবধারার রসপূর্ণ
আর একখানি যুগান্তকারী চিত্র

কালী ফিল্মসের

ঊহন্ন থেকে দূরে

পল্লীর স্নিগ্ধশ্যামল পরিবেশের মধ্যে পরিকল্পিত
শৈলজানন্দের এই সাধক সৃষ্টি বাংলার
সর্বত্র সকল চিত্রের রেকর্ড ভংগ
করিয়েছে।

ঊহন্ন থেকে দূরে

অভিনয় নম



কাহিনী ও পরিচালনা : শৈলজানন্দ

পরিবেষক : ইন্টার টকিজ লিঃ,

ফোন : ক্যাল ৪৯৮৯ ৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

—মতিমহল থিয়েটার্সের নিবেদন—

শ্রীদুর্গা

—দ্রুত সমাপ্তির পথে—

কাহিনী ও পরিচালনা : শৈলজানন্দ

ইন্টার টকিজ রিলিজ

পরিবেষক : মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

৬৮, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

